পুজো ১৪২৬

সানন্দা



পুজো ১৪২৬

সানন্দা

সূচিপত্র



উপন্যাস ৩



৩১০

স্বাতী নক্ষত্রের আলো

রাজশ্রী বসু অধিকারী

স্বাতীর সঙ্গে প্রেমাংশুর বিচ্ছেদটা হয়েই যায়। কিন্তু ডিভোর্সের পরেও কোনও এক অজানা টানে স্বাতী ছুটে যায় প্রেমাংশুর কাছে। ওদিকে রঞ্জনা প্রেমাংশুকে ভালবাসে। রঞ্জনার ভালবাসাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য ফিরে আসার পরেও স্বাতী প্রেমাংশুর জীবন থেকে সরে যায়। আবার করুণাময়ের স্বাতীর প্রতি দুর্বলতাও কারওর অজানা নয়। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে কি তারা মিলতে পারবে? নাকি তাদের প্রত্যেকের জীবন নিজস্ব খাতে বাঁক নেবে?



উপন্যাস ৪



৩৮৮

এখানে আকাশ নীল

দেবব্রত বিশ্বাস

কুয়াশার মধ্যে এক মায়াবি স্বপ্নের ঘোর কাটি কাটতেই বাস্তবের জমিতে পা রাখে শ্রীকান্ত। বারবার যেন একটা সুরিয়্যালিস্টিক জগৎ ত হাতছানি দেয়। সঙ্গে চলতে থাকে কিছু মজ কথোপকথন।



গল্প ১



১৫৬

সাইক্লোন

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

থানার দায়িত্বে থাকা দীপেন তার বড়কর্তার কাছে ভর্ৎসিত হয় ফোনে। বাইরে চলতে থাকে সাইক্লোন। মনের ভিতরেও। ব্যর্থতার সমস্ত রোষ সে উগরে দেয় বারবার তার হাত ফসকে যাওয়া এক অপরাধীর উপর।

(ভিতরের পাতায় এই গল্পের নাম ভুলবশত 'মা সাইক্লোন' ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।)

গল্প ২



২৮৪

মেরিলের অন্তহীন ভ্রমণ

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শহরের জনপ্রিয় সোশ্যালাইট মেরিল। সবাই তার সঙ্গে সময় কাটাতে চায়। কিন্তু সে ভীষণ একা মনের গভীরে। ক্রমশ একা হতে থাকা মেয়েটির জীবনের হিসেবনিকেশ বদলে দেয় একটা দুর্ঘটনা।

গল্প ৩



৫২২

খাঁচার পাখি

সিজার বাগচী

এক সময় ঝুমুরের জীবন থেকে আকাশকে চলে যেতে হয়। ঝুমুরের সঙ্গে অন্য কারও বিয়ে হয়। কিন্তু সবটাই কেমন যেন গুলিয়ে যায় ওদের জীবনে। পাঁচ বছর পর আবার দেখা হবে ঝুমুর আর আকাশের।

অন্দরসাজ



৩০০

কলকাতার 'মেঘমুলুক'

বাড়ির নাম রেখেছেন 'মেঘমুলুক'। বাড়ি জুড়ে বিরাজ করে এক অনাবিল প্রশান্তি। সিনেমার পোস্টার, বই আর নানা শোপিস দিয়ে সাজানো তাঁর পরিবেশবান্ধব বাড়ির তিনটে তলা! সংগীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্যর অন্দরমহল যেন তাঁর শিল্পীসত্তারই বহিঃপ্রকাশ।

সৌন্দর্য ১

Lip ফ্যান্টাসি

চিরাচরিত লাল কিংবা গোলাপি নয়। ঠোঁটের ক্যানভাসে এখন প্রাধান্য পাচ্ছে অনন্য সব রং। কখনও নীল, কখনও মেরুন, কখনও বা গাঢ় কালো। অভিনব লিপস্টিকে হয়ে উঠুন অনন্যা। শারদীয়ার স্বতন্ত্র সাজ নিয়ে ফোটোফিচার।

১৪২



সৌন্দর্য ২

Experimental Eyes

লাইনারে একইরকম আই ফ্যাশন তো অনেকই হল এবার পুজোয় নজরে থাকুক অন্যরকম আই মেক-আ হাই ডেফিনিশন কালার, গ্লিটারে, কালার প্যালেটে রঙ এক্সপেরিমেন্টাল আইজ়ের লুকবুক।

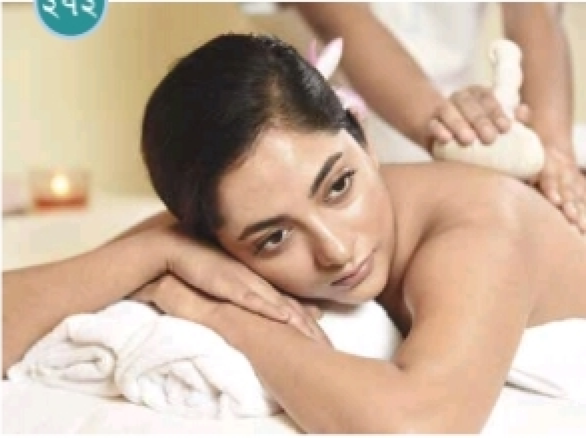


সৌন্দর্য ৩

Spa ঘরে ও বাইরে

শরীর-মনের ডিটক্সিফিকেশনের দাওয়াই বডি স্পা। অবগাহন করুন দেশি-বিদেশি স্পা-থেরাপিতে আর নতুন করে আবিষ্কার করুন নিজেকে।

২৭২



সৌন্দর্য ৪

ত্বক ও মেক-আপ কম্বো

কমপ্লেকশন যেমনই হোক না কেন, সঠিক মেক-আপের ম্যাজিকে আপনিও হয়ে উঠতে পারেন গ্ল্যামারাস। রইল স্কিনটোন অনুসারে মেক-আপের টিপ্‌স।

২৭৮



সৌন্দর্য ৫

মেক-আপে লেটেস্ট ট্রেন্ড

নিয়ন আইশ্যাডো বা উজ্জ্বল পার্পল লিপস্টিক। হাফ উইংগড্‌ আইলাইনার বা এক্সপেরিমেন্টাল পনিটেল। এরকমই জনপ্রিয় মেক-আপ ট্রেন্ডের সন্ধান দিলেন দেশের সেরা তিন সেলেব্রিটি মেক-আপ আর্টিস্ট।

৩৭৬



ফ্যাশন ১

আনন্দরূপেণ সংস্থিতা

দেবীর আবির্ভাবে বাংলার ভুবনে নেমে আসে উৎসবের আমেজ। দেবীর যেকোনও রূপের প্রকাশেই আনন্দ। এবারের ‘আনন্দ’সাজে রাইমা সেনের রূপনির্মাণে দেবীসজ্জার আভাস। রাইমা সাজলেন স্বাহা থেকে শাম্ভবী— পঞ্চরূপে।





ফ্যাশন ৪

স্পটলাইটে নিয়ন

পোশাক থেকে অ্যাকসেসরিজ়, সর্বত্রই তীব্র রঙের অফুরান জোয়ার। কোথাও উজ্জ্বল সবুজ, কখনও আবার কটকটে কমলা। রঙের উজ্জ্বলতায় ভেসে আসে উৎসবের সুর। নিয়ন কালার প্যালেটে অত্যুজ্জ্বল ফ্যাশনস্কেপ।

২৮৮



ফ্যাশন ৫

এই বঙ্গের শাড়ি-সাজ

বাংলা সেই কবে থেকে রেশম আর তাঁতের ঐতি বহন করে চলেছে। সনাতনী বালুচরি কিংবা ট্রে বেগমপুরি, ফুলিয়ার তাঁত থেকে সোনামুখী সি পুজোর সাজে এবার খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয় শাড়ির স থেকেই বেছে নিন নিজের পছন্দ।

৪৫



ফ্যাশন ৬

পুজোয় অন্যরকম

এথনিক থেকে ওয়েস্টার্ন, ফ্যাশনে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই ছেলেরা! এই পুজোয় ছেলেদের আদর্শ সাজের উদাহরণ নিয়ে অভিনেতা নীল ভট্টাচার্য ও দিব্যজ্যোতি দত্ত।



মুখোমুখি



নৃত্যের দর্শনযাত্রায় অক্লান্ত পথিক

সদা হাস্যময় মুখ, জীবনে যা পেয়েছেন তাই বেশি মনে হয়। কলকাতায় প্রায় ছ'টি দশক নৃত্যশিল্পের উত্তরাধিকার তৈরি করে চলেছে থাঙ্কমণি কুট্টি। নাচ, সংসার এবং ছাত্রীরা... জীবনের অঙ্গাঙ্গি অনুষঙ্গ উঠে এল কথায়।

রান্নাঘর ১



আশ্বিনের শারদ পা

বাঙালি পাতের শুরুতে কী খেতে ভালবাসে স্টার্টার বা অ্যাপেটাইজ়ার শব্দগুলো যখন বা মেনুর সঙ্গে জুড়েই গিয়েছে, তখন আসুন জে এপার-ওপার বাংলার কয়েকটা আদ্যন্ত 'বা অ্যাপেটাইজ়ারের রেসিপি।

রান্নাঘর ২



১৭৬

বাংলাদেশি ভাতে বাজিমাত

মোরগ পোলাও থেকে মাসকলাই ডালের খিচুড়ি, বাংলাদেশে ভাত দিয়ে তৈরি হয় হরেক স্বাদের রান্না। তালিকা সাজালেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট শেফ।

রান্নাঘর ৩



২৬৬

শাক দিয়ে মাছ...

দুয়ের অমোঘ রসায়ন স্বাদকোরককে যে স্বর্গীয় অনুভূতির জন্ম দেবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোফতা থেকে পাতুরি, ভাপা থেকে ভর্তা, শাক আর মাছের মিশেলে পুজোর জমজমাট ভূরিভোজের আয়োজন।

রান্নাঘর ৪



৩০৪

পিচ-পারমেজ়ানে মাটন

বাঙালি বা মোগলাই মাটন একঘেয়ে লাগছে? এবার মাটনের নানা কন্টিনেন্টাল পদ রেঁধে ফেলতে পারেন সহজেই। রেসিপি বলে দিলেন শেফ রণবীর ব্রার, সঞ্জীব কপূর এবং শন কেনওয়ার্দি।

রান্নাঘর ৫



৪৯৬

শেষ পাতে বেশ তো!

চেনা র‍্যাসপবেরির স্বাদটাই যদি বদলে দেওয়া যায় নিমেষে! সব উপকরণই পাওয়া যায় হাতের মুঠোয়। বিদেশি ডেজ়ার্টে দেশি ছোঁয়া লাগিয়ে কীভাবে ডেজ়ার্ট বানাবেন, রইল তার হদিশ।

বেড়ানো ১



৪৫৪

বৌদ্ধ সংঘের ছায়ায় মায়াময় ওড়িশা

রত্নগিরি-উদয়গিরি-ললিতগিরি-পুষ্পগিরিতে রয়েছে সৌন্দর্য ঘেরা এক বৌদ্ধ সার্কিট। যেখানে এক পা এগোলেই ইতিহাসের মুখোমুখি হওয়া যায়। ঘুরে আসা যায় একটু গবেষণা করে বেরিয়ে পড়লেই।

বেড়ানো ২

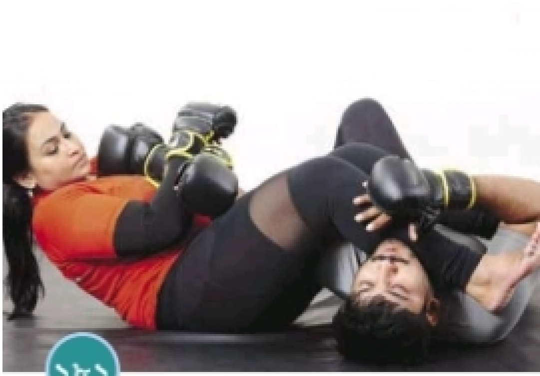


৫০২

প্রকৃতি, মন ও রোম্যান্টিকতা

যে মন থেকে সৃষ্টি হয়, তাকে প্রবল প্রশ্রয় দিতে পারে প্রকৃতি। এই প্রকৃতি একেবারেই তার আদিম নির্জনতা ও প্রশান্তি নিয়ে ছেয়ে আছে ইংল্যান্ডের লেক ডিস্ট্রিক্টে।

ফিটনেস ১

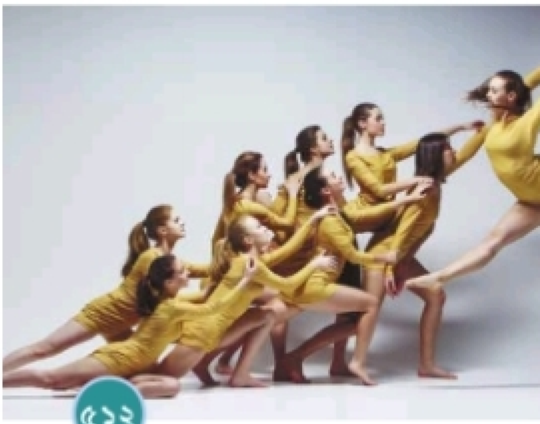


১৮১

ফিট থাকতে মিক্সড মার্শাল আর্টস

মুয়ে তাই, বক্সিং, কিকবক্সিং, জুডোর ম
একাধিক কমব্যাট স্পোর্টসের টেকনিকে
সমন্বয়ে তৈরি মিক্সড মার্শাল আর্টস এখ
জনপ্রিয়। ফিট থাকতে যেমন লোকে এমএ
শিখছেন, তেমনই আত্মরক্ষার অস্ত্রও এ
বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে বিশেষ প্রতিবে

ফিটনেস ২



৫১২

নাচের ছন্দে সুস্থ শরী

ভরতনাট্যম, কত্থক থেকে হিপ হপ, সালসা;
ফিট রাখতে নাচ একেবারে আদর্শ। রইল ওয়
হিসেবে নাচের উপকারিতা।

বিনোদন ১



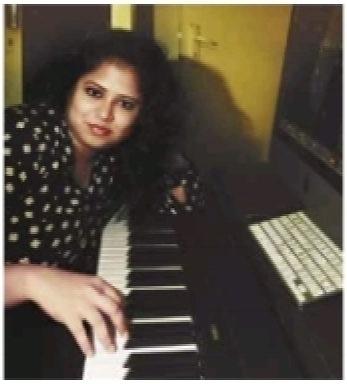


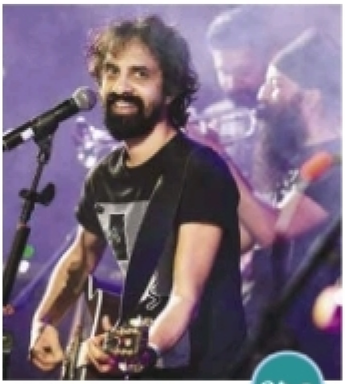
৩৮২

সুন্দরী ও রাজনীতি

ইন্দিরা গাঁধী, বেনজ়ির ভুট্টো থেকে শুরু করে সনিয়া গাঁধী এবং হালের মহুয়া মৈত্র। রাজনীতিতে সুন্দরীদের জয়জয়কার। সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির কৌশলেও সমানভাবে দক্ষ এই নেত্রীদের নিয়ে নিবন্ধ।

বিনোদন ২





৪৯০

গান ভালবেসে...

গান বানানো কিংবা তাতে রূপদান, হিন্দি মিউজ়িক ইন্ডাস্ট্রির তরুণ তুর্কিরা সবেতেই পারদর্শী! শ্রোতারাও তাঁদের শুনছেন ভালবেসে। এই ইয়ং ব্রিগেডের মিউজ়িক-মন্ত্র আসলে কী? একটি প্রতিবেদন।

বিশেষ রচনা





৪৭০

এভাবেও ফিরে আসা যায়

জীবনের কঠিন পরীক্ষা পেরিয়ে এঁরা ‘কামব্যাক’ করেছেন। এগিয়ে গিয়েছেন অভীষ্ট লক্ষ্যে। স্বপ্না বর্মন, দীপা মালিক, লিজ়া রে ও কৈলাশ খের— এমনই চার ব্যক্তিত্ব। রইল তাঁদের সাক্ষাৎকার। সঙ্গে আরও একাধিক ‘কামব্যাক’ কিংদের কথা।

প্রচ্ছদমডেল: দর্শনা
মেক-আপ: নবীন দাস, ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
পোশাক: অনামিকা খান্না, ফোন: (০৩৩) ২২৮১৪৪২৫
গয়না: রাজ মহতানি কুতুর জুয়েলারি (সতরামদাস ধলামল)
ফোন: (০৩৩)২২২৯৮১৩২
স্টাইলিং: আশিস শর্মা
সহায়তা: অরিজিৎ মাইতি, ফোন: ৯৮০৪৪৭৮৭৪৯
হসপিট্যালিটি ও ফুড পার্টনার: কেনিলওয়র্থ হোটেল
ছবি: সোমনাথ রায়

সম্পাদক: পায়েল সেনগুপ্ত

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রবীর বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকা
এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, ২১১/২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রি

RNI NO. 44046/86

Puja 2019



এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,

মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে...

কবি মধুসূদন দত্ত যতই ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিকতা বাংলায় নিয়ে আসুন না কেন, তাঁর 'আশ্বিন মাস' কবিতায় উমার প্রতিবছরের ফিরে আসার কথা বলেছেন একেবারে ট্র্যাডিশনাল স্টাইলে। আসলে দুর্গাপুজা শব্দটি এমনভাবে সনাতনী বাঙালি মননে জড়িয়ে গিয়েছে যে, মধুসুদনের মতো বিপ্লবীও তাকে ঠিকমতো ভাঙতে পারেননি। মা দুর্গা হোন, বা উমা...প্রতিবছর তাঁদের আবাহন এক নতুন প্রত্যাশার জন্ম দেয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে আবাহনী রূপ। 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী'র আকুতি আমাদের স্ট্রেসবিধ্বস্ত নাগরিক জীবনে হয়ে গিয়েছে ক্যালেন্ডারের বিশেষ চারটি দিনের ফিরে আসা। নতুন বছরের ক্যালেন্ডার পেলেই প্রথম দেখা কবে পুজো, মানে কবে ছুটি আর কিছুদিন মুক্তি দৈনন্দিন ক্লান্তি থেকে! আমাদের এই মুক্তির মাঝে দেবী, যাঁকে আমরা 'মা' বলি, বা 'উমা', তাঁর স্থান তা হলে কোথায়? সম্ভবত, অশান্ত বিক্ষুব্ধ সমাজে শান্তির প্রতীক্ষায়। সাজসজ্জা থেকে রসনা, সর্বত্র যেমন অনাবিল আনন্দ রয়েছে, তেমনই রয়েছে নিজেদের দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, যন্ত্রণাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা। সেই চেষ্টা ছেড়ে এবারে বরং সৎ হয়ে নিজের মুখোমুখি হওয়া যাক। সমস্ত হঠকারিতা, কুণ্ঠা আর দ্বিধাকে দূরে সরিয়ে বরং কুর্নিশ জানানো যাক সেইসব মায়েদের ও মেয়েদের, কোনও বাধা-বিপত্তিই যাঁদের দমিয়ে রাখতে পারে না। আয়নায় নিজেদের প্রতিফলনকে দূরে রেখে দৃষ্টিকে পাঠানো যাক স্বার্থসীমার বাইরে। অসহায় হাতগুলো ধরে নিয়ে যেন বলতে পারি, 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী', তোমাকে প্রণাম!

জগতের আধারস্বরূপা মহাদেবীর আবাহনে বাংলার ভুবনে নেমে আ

আনন্দরূপেণ

রাইমা সেনের আনন্দ শাড়ির সাজে দেবীসজ্জার আভাস।

সংস্থিতা

রাইমার এই সনাতনী রূপনির্মাণের পরিক্রমায় তিতাস চট্টোপাধ







পরিমিত এই সাজ যেন দেবী ঐন্দ্রীর। অলিভ গ্রিন, প্যাস্টেল শেডের গোলাপি, বাদামি, পার্পল ও হলুদ রঙের কাতান বেনারসির উপরে ফ্লোরাল মোটিফ ও রাংকাট ডিজ়াইন।

ব্লাউজ়: কুশল সেন
ফোন: ৯০৫১৪৭৩৬০৬
গয়না: প্রিটিওজ় বাই দিতি ভুওয়ালকা,
প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা
ফোন: ৯৮৩০০৮৭১৩৪



কৌমারী

গ্রিন বডি ও পিঙ্ক সরু পাড়ের কাতান বেনারসিতে রাইমা যেন সাক্ষাৎ কৌমারী। শাড়িতে নেভি ব্লু, মেরুন, মাস্টার্ড কালারের পাখি ও পুতুলের মোটিফ করা।

ব্লাউজ়: ভি-কাট
ফোন: ৯৮৩১০৯৮৮৩০
টিকলি: সাওন সুখা জুয়েলার্স, ক্যামাক স্ট্রিট
ফোন: ২২৮৯৫২৮১/৮২
ইয়ারিং: প্রিটিওজ় বাই দিতি ভুওয়ালকা,
বাকি গয়না: আভামা জুয়েলার্স বাই অভিষেক কাজারিয়া





ভ্রাম

ইন্ডিগে
রাইমার
সঙ্গে পি
চওড়া প
শাড়িজু
সিলভা
পাড়ে
পেজলি

গয়না: অ
বাই অ
ক্যামাক
মার্কেট,
সেকেন্ড
ফোন: ৯



শাম্ভবী

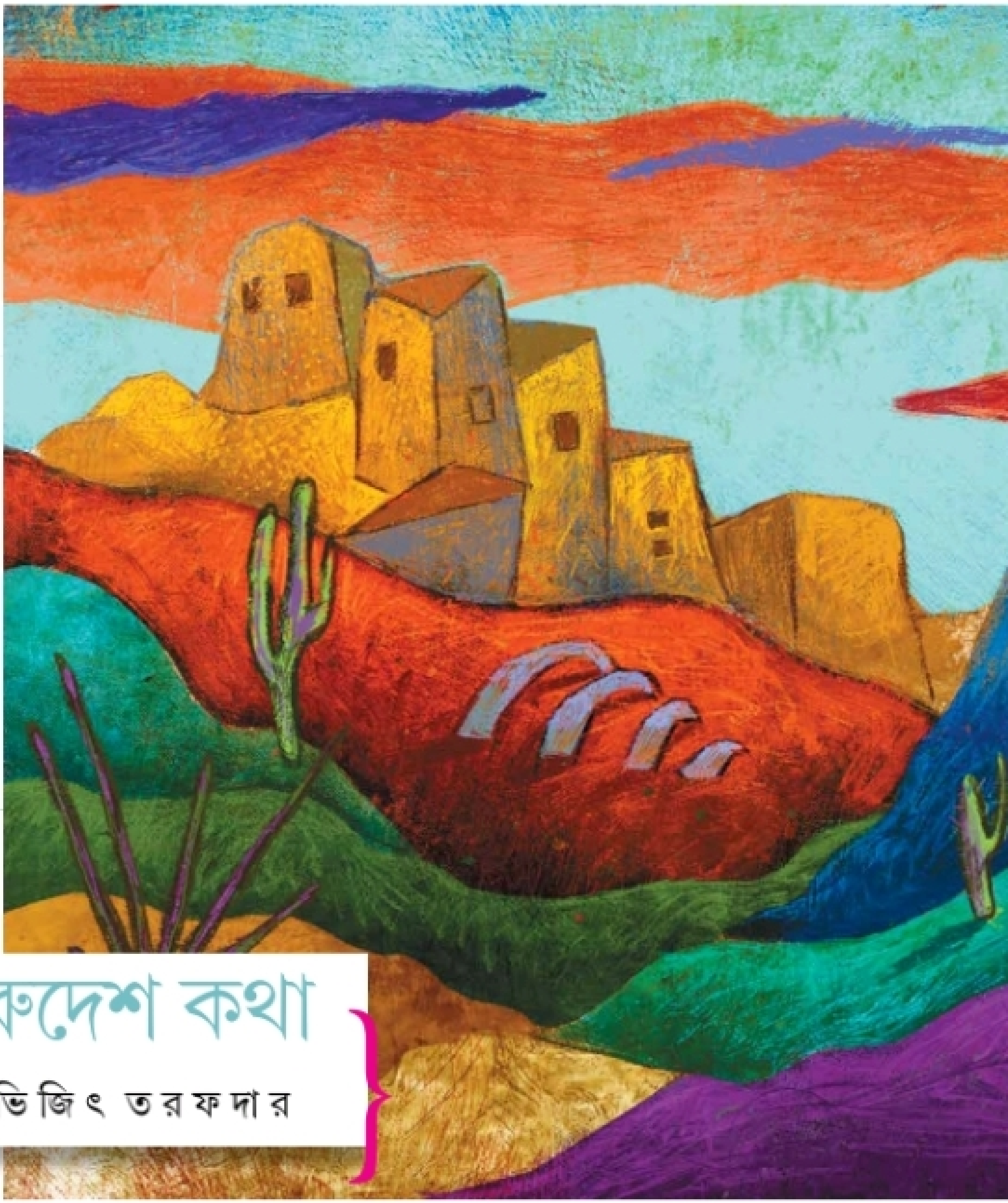
ঘন নীল রঙের কাতান বেনারসিতে রাইমার নাম দেওয়া যাক শাম্ভবী। শাড়ি জুড়ে হলুদ, অরেঞ্জ, মাস্টার্ড ও রাস্ট কালারের ফ্লোরাল ও জিওমেট্রিক মোটিফ করা। পাড়ে রুপোলি জরির সূক্ষ্ম কারুকাজ।

ব্লাউজ়: ভি-কাট
গয়না: আভামা জুয়েলার্স বাই অভিষেক কাজারিয়া



শাড়ি: আনন্দ, কুইন্‌স ম্যানসন
১৩ রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১, ফোন: (০৩৩)২২২৯২২৭৫, (০৩৩)২২২৯৪১৩৮

মেক-আপ: নবীন দাস, ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮, লোকেশন সৌজন্য ও ফুড পার্টনার: গঙ্গা কুটির, রায়চক অন গ্যাঞ্জে
ফোন: ৪০৪০-৪০৪০, ওয়েবসাইট: www.raichakonganges.com, ছবি: সোমনাথ রায়



মরুদেশ কথা

অভিজিৎ তরফদার

কলকাতায় কি এখনও পাখি আছে?
না-থাকলে ডাকে কারা? উৎসব ফুরিয়ে যায় যখন, যেমন রোশনচৌকিতে নিঃসঙ্গ একটি সানাই বেহাগের সুর ধরে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সামান্য কয়েকটি পাখি এখনও সকাল-সন্ধে করুণ কণ্ঠে দিনের শেষ ও শুরু ঘোষণা করে এই শহরে।
দিনশেষের পাখির ডাক শুনতে-শুনতে, এইসবই এলোমেলো ভাবতে-ভাবতে লম্বা করিডর ধরে হেঁটে যাচ্ছিল ঝিলম। দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা আওয়াজ!
একটু আগেও কলধ্বনিতে গমগম করছিল স্কুল-চত্বর। ছুটির ঘণ্টা বাজতে না-বাজতেই একটা সমবেত হুঙ্কার শোনা যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে স্কুল খালি করে উধাও হয়ে যায় ছেলের দল। স্কুলটা যে আনন্দনিকেতন নয় কয়েদখানা, তাদের উল্লাস এবং স্কুল পরিত্যাগের দ্রুততাই তার প্রমাণ। ছড়ানো-ছিটানো কাগজ, ডাস্টারের ধুলো, ব্ল্যাকবোর্ডে আফ্রিকার ম্যাপ এবং দু'হাজারের কাছাকাছি ছাত্রের স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে স্কুলবিল্ডিং প্রতীক্ষা করে পরবর্তী দিনটির জন্য।
শেষ ক্লাসটা তিনতলায় ছিল ঝিলমের। রোজকার অভ্যেসমতো বোর্ডের লেখাগুলো ডাস্টার দিয়ে মুছে দিল। ক্লাস থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেই ছেলেদের কলরোল ফিকে হতে-হতে মিলিয়ে গেল। একতলার একপ্রান্তে সিঁড়ি। তারপর দীর্ঘ করিডর। অনেকটা এগিয়ে গেলে প্রিন্সিপালের ঘর।
কিন্তু আওয়াজটা আসছে কোথা থেকে?
একপাশে মাঠ। স্কুলবিল্ডিং আর মাঠের মাঝখানে বাগান।



সেখানেই খুটুরখুটুর করছে হরিপদ। হরিপদ মালি। হরিপদর হাতের গুণেই বাগানভর্তি ফুলের প্লাবন।

হরিপদ কি কোনও যন্ত্র চালিয়েছে? ঘাস-ছাঁটা মেশিন? অথবা অন্য কিছু?

না, ওই তো মাথা নিচু করে খুরপি দিয়ে মাটি কুরকুরে করছে হরিপদ।

বাইরে কোনও কনস্ট্রাকশনের শব্দ?

তাও তো নয়। আর আওয়াজটা বাইরের নয়। আসছে ভিতর থেকে।

রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ, পাখির কিচিরমিচির, সবকিছু ছাপিয়ে ঝিলম পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে একটা শব্দ, যাকে কোনওভাবেই যান্ত্রিক বলা যাবে না। মানুষের গলা থেকেই বেরোয় ওইরকম আওয়াজ। যেন গোঙানির শব্দ। কিছুক্ষণ টানা চলে থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার শুরু হচ্ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের ক্লাসরুমটা দেখল ঝিলম। সেভেন সি। দরজা খোলা, ভিতরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

গুটি-গুটি ক্লাসরুমে ঢুকল ঝিলম।

বোর্ড ভর্তি অঙ্ক-কষা। প্রসুন চট্টরাজ? সম্ভবত। এত চমৎকার ঝরঝরে হাতের লেখা আর কোনও শিক্ষকের নেই। তবে ক্লাস শেষ হলে ব্ল্যাকবোর্ড মুছে দেওয়া, ঝিলম দেখল, অভ্যেসটা প্রসুনদারও নেই।

বোর্ডের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ঝিলম। শব্দটাও কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল। ঝিলমকে চমকে দিয়ে আবার শুরু হল। ঝিলমও দেরি না-করে সঙ্গে-সঙ্গে

পৌঁছল সেখানে। শব্দের উৎস তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। থার্ড রোয়ের কোণায় দেওয়াল ঘেঁষে দুটো বেঞ্চের মাঝখানে ছেলেটা ঘাড় গুঁজে পড়ে রয়েছে। কাঁধের ব্যাগটা কাত হয়ে আটকে রয়েছে ডেস্কের খাঁজে। দুটো হাত ছড়ানো। একটা পা ভাঁজ হয়ে ঝুলছে। চোখ বন্ধ। কষ বেয়ে গড়িয়ে নামছে লালা।
"হরিপদ, শিগগির এসো," গলায় যতখানি জোর আছে সবটুকু জড়ো করে চেঁচিয়ে উঠল ঝিলম। তারপর নিজেই চেষ্টা করল ছেলেটাকে বের করে আনার।
স্ট্র্যাপ খুলে ব্যাগটা প্রথমে সরিয়ে রাখল। ডেস্ক টেনে কিছুটা স্পেস তৈরি করার চেষ্টা করল। ততক্ষণে হরিপদ এসে গিয়েছে। হরিপদ ডেস্ক দুটো ঠেলে দিল দু'পাশে। তারপর দু'জনে মিলে ধরাধরি করে



ঝিলমের মনে হল, সৈকতের মা এখন কী করছেন? খাবার সাজিয়ে বসে আছেন? দেরি হচ্ছে দেখে বারবার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছেন? ওর বন্ধুদের ফোন করছেন?

ছেলেটাকে বের করে এনে শুইয়ে দিল করিডরে।
হাঁপিয়ে গিয়েছিল ঝিলম। হাঁপাতে-হাঁপাতে হরিপদকে বলল, "তুমি এখানেই থাকো। কোথাও যেয়ো না। ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আমি কাউকে নিয়ে আসছি।"
ছুটছিল ঝিলম। প্রিন্সিপালের ঘর। খালি। পাশের ঘরে শিরিন বসে, সেক্রেটারি। টেবিলের উপর অ্যাটেনডেন্সের খাতা খোলা। শিরিন নেই।
ঝিলম গলা তুলল, "হ্যালো! কেউ কি আছেন?"
পিছনে লাইব্রেরির লাগোয়া ঘুপচি একটা ঘর। সেখানেই মলয়দা বসেন, মলয় সরকার। টিচার-ইন-চার্জ। সেখানে চেয়ার-টানার আওয়াজ পাওয়া গেল।
ঢুকল ঝিলম। মলয়দা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।
"তোমার গলা শুনলাম মনে হল?"
"হ্যাঁ মলয়দা, এক্ষুনি চলুন! সিরিয়াস!" হাঁপাতে-হাঁপাতে ওইটুকুই বলতে পারল ঝিলম।
"কী হয়েছে? হাঁপাচ্ছ কেন? বোসো। জল খাবে?"
মলয়দাকে ধরে ঝাঁকুনি দিল ঝিলম, "না মলয়দা। এতটুকুও সময় নষ্ট করা যাবে না। একটা ছেলে... সেভেন সি... আনকনশাস... গোঙাচ্ছে... আমি আর হরিপদ বাইরে এনেছি... প্যাসেজে শুইয়ে রেখেছি..."
মলয়দাও দৌড় লাগালেন। পিছন-পিছন ঝিলম। সেইভাবেই শুয়ে আছে ছেলেটা। হরিপদ পাশে বসে গামছা নাড়িয়ে হাওয়া করছে। গোঙানির শব্দ দূর থেকেও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। নিস্তব্ধ স্কুলবিল্ডিংয়ে আওয়াজটা যেন আরও বেশি জোরে বলে মনে হচ্ছে। মলয়দা একমুহূর্ত সময় নিলেন। তারপর হরিপদকে বললেন, "তুমি পায়ের দিকটা ধরো, আমি মাথাটা ধরছি। গেটের কাছে নিয়ে চলো। ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে শিফ্‌ট করতে হবে।"
ঝিলমকে বললেন, "তুমি সামনে-সামনে যাও। একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাও। হাসপাতাল বললে অনেক সময় রাজি হয়।"
কলকাতার ট্যাক্সি বলামাত্র যেতে রাজি হয়েছে, বৃহস্পতির দশা না থাকলে সেরকমটা ঘটে না। ঝিলমের মুখে কী ছিল বলা শক্ত। একবার বলতেই ঘাড় ঘুরিয়ে ঝিলমকে দেখে রাজি হয়ে গেল।
পিছনের সিটে ঝিলম বসল, ছেলেটার মাথা কোলে নিয়ে। সামনের সিটে মলয় সরকার বসে একটা নার্সিংহোমে যেতে বললেন।
ঝিলম জিজ্ঞেস করল, "পাশের হাসপাতালে নিয়ে গেলে হত না? দেরি হয়ে যায় যদি?"
মলয়দা জবাব দিলেন, "সরকারি হাসপাতাল তো! বলা যায় না, হয়তো ভর্তিই নেবে না। যেখানে যাচ্ছি ওটা আমার পরিচিত। দু'-একজন ডাক্তারও আছে বন্ধুস্থানীয়। ট্রিটমেন্ট শুরু হতে দেরি হবে না।"
একটু ইতস্তত করে ঝিলম বলল, "ওর বাড়িতে একটা খবর দিলে হত না?"
"অবশ্যই দিতে হবে। সেটারই পাত্তা লাগাচ্ছি।"
মলয়দা সামনের সিটে স্কুলব্যাগটা কোলে নিয়ে বসেছিলেন। ব্যাগের চেন খুলে একটা খাতা বের করলেন।
"সৈকত সাধু, নামটা পাওয়া গেছে।"
সেভেন-সিতে পড়ায় না ঝিলম। পড়ালে মুখ দেখেই রেকগনাইজ় করতে পারত।
"সেভেন সি-এর ক্লাসটিচার তো প্রশান্ত, প্রশান্ত নস্কর। ঠিক বলছি তো?"
ঘাড় নাড়ল ঝিলম।
সেলফোন খুলে প্রশান্তর নম্বর খুঁজতে লাগলেন মলয়। খুঁজতে-খুঁজতে ঝিলমকে বললেন, "দ্যাখো তো, তোমার মোবাইলে ওর নম্বর সেভ করা আছে কিনা?"
নেই, জানে ঝিলম। নম্বর সেভ করা অনেক ঝকমারির কাজ। ভাল পারেও না ঝিলম। একে-ওকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। তাই চেষ্টাও করে না।
খুঁজতে-খুঁজতে একসময় মলয়দাই পেয়ে গেলেন প্রশান্তর নম্বর। "রিং হচ্ছে, ধরছে না," কয়েকবার ডায়াল করে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিলেন মলয় সরকার।
"হয়তো ব্যস্ত আছে। মিস্‌ড কল দেখতে পেলে কলব্যাক করবে।"
"ব্যস্ত তো অন্য কিছুতে নয়, টিউশনি। ঝাঁপ খুলে বসেছে। মোবাইল সাইলেন্স-এ দেওয়া আছে। আমি ফোন করেছি দেখলে তো আরওই ধরবে না।"
ঝিলম জবাব দিল না। কথাটা মিথ্যে নয়। যাদের টিউশনির বাজার খুব ভাল, প্রশান্ত তাদের মধ্যে পড়ে। এই সময় ওর ব্যস্ত থাকারই কথা।
প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বলল, "শিরিনকে ফোন করলে হয় না? ওর কাছে হয়তো সব স্টুডেন্টের পার্টিকুলারস পাওয়া যাবে।"

"ভাল বলেছ তো! দেখছি ফোন করে।"
মলয়দা যখন ফোনে ট্রাই করছেন, ঝিলম সৈকতের মুখের দিকে তাকাল।
কতই-বা বয়স? তেরো-চোদ্দো বড়জোর। বাড়ন্ত চেহারা। ফরসা রং। কপালের উপর ঘামে লেপটে রয়েছে ক'গাছা চুল। মাঝে-মাঝে শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে, তখনই গোঙানির শব্দ বেরোচ্ছে মুখ থেকে। তারপরই শিথিল হয়ে আসছে সারা শরীর। আগে যত ঘন-ঘন ওটা হচ্ছিল, তার থেকে যেন কমই হচ্ছে শক্ত হয়ে আসা। বরং যত শিথিল হচ্ছে শরীর, ততই যেন ভারী লাগছে মাথাটা।
মনে হচ্ছে ফোন লেগেছে মলয়দার।
"কে, প্রশান্ত? কতক্ষণ ধরে তোমাকে ট্রাই করছি ... হ্যাঁ-হ্যাঁ, জরুরি দরকার। তোমার সেকশনের একটা ছেলে, সৈকত, সৈকত সাধু, হঠাৎ আনকনশাস হয়ে পড়েছে। ঝিলম গোঙানির আওয়াজ শুনে ক্লাসে ঢুকে ওকে ওই অবস্থায় দেখতে পায়। এখন আমরা হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি। ওর কোনও ফোন নম্বর তোমার কাছে আছে? বাড়িতে একটা খবর তো দেওয়া দরকার।"
ওদিক থেকে প্রশান্ত কী বলল শুনতে পাওয়া গেল না।
কিছুক্ষণ কানে ফোন লাগিয়ে রেখে কেটে দিয়ে হতাশ হয়ে ঝিলমের দিকে তাকালেন মলয়দা, "প্রশান্ত জানে না।"
"শিরিন?"
"ফোন ধরল না। কলব্যাকও করল না।"
"ওদের ক্লাসের অন্য কোনও স্টুডেন্টের কোনও নম্বরও যদি প্রশান্তর কাছে থাকে, বা এমন কেউ যাকে ও টিউশন পড়ায়, তার কাছ থেকে কিন্তু সৈকতের নম্বর পাওয়া যেতে পারে।"
"দেখা যাক," গজগজ করতে-করতে মোবাইলের বোতাম টিপতে লাগলেন মলয় সরকার, "ওই জন্যই আমি স্টুডেন্টদের স্কুলে মোবাইল ফোন না-আনার রুলটা অপোজ় করেছিলাম। দ্যাখো তো, ওর সঙ্গে ফোন থাকলে কত সুবিধেই না হত!"
চলন্ত ট্যাক্সি থেকে কলকাতার উথলে ওঠা ফোটো দেখতে-দেখতে ঝিলমের মনে হল, সৈকতের মা এখন কী করছেন? খাবার সাজিয়ে বসে আছেন? দেরি হচ্ছে দেখে বারবার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছেন? ওর বন্ধুদের ফোন করছেন?
প্রায় আধঘণ্টা লাগল নার্সিংহোমে পৌঁছতে। মলয়দা ঠিকই বলেছিলেন। সরকারি হাসপাতালে, যেখানে নিজেদেরই ইমার্জেন্সিতে রোগীকে নিয়ে গিয়ে ধপাস করে একটা বিছানায় ফেলতে হয়, এখানে তা নেই। মলয়দা ভিতরে গিয়ে বলতেই সঙ্গে-সঙ্গে ট্রলি এসে গেল। দু'জন ট্রলি-বয় সৈকতকে ট্যাক্সি থেকে বের করে ট্রলিতে চাপাল। কিছুক্ষণ হল কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে ছেলেটা। একটা হাত ধরে ইমার্জেন্সির গেট পর্যন্ত গেল ঝিলম। তারপর সৈকতকে নিয়ে ট্রলি ভিতরে ঢুকে যেতে, বাইরে ওয়েটিং লাউঞ্জে গিয়ে বসল।
সৈকতের সঙ্গে মলয়দাও ভিতরে গেলেন। অনেক চেষ্টা করেও সৈকতের বাড়ির ফোন নম্বর পাওয়া যায়নি। স্কুল-ব্যাগটা ঝিলমের জিম্মাতেই রয়েছে।
আশপাশে উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজনদের ভিড়। তাদের মধ্যে বসে থাকতে-থাকতে ঝিলম অনুভব করল, তার সঙ্গে অন্যদের, ভেবে দেখতে গেলে, কোনও তফাত নেই। সৈকত সাধু, সেভেন-সি, এই মুহূর্তে শুধু তার বই-খাতা-স্কেল-জ্যামিতিবক্স-ইংরেজি বই বোঝাই একটা স্কুল-ব্যাগের জিম্মাদার হয়ে বসে আছে ঝিলম তা তো নয়! যে উদ্বেগ, যে উৎকণ্ঠা সৈকতের মা-দিদি অথবা যে-কোনও নিকটাত্মীয় বহন করে, ইমার্জেন্সি-সংলগ্ন লাউঞ্জে অপেক্ষারত ঝিলমের উৎকণ্ঠা তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। শুধুই প্রতীক্ষা, একটা ভাল খবরের... সৈকত ভাল আছে, ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।

২

কাত হয়ে শুয়ে আছে ঋক। বালিশটা মাথার নীচ থেকে সরে গিয়েছে। ঠিক করে দিল ঝিলম। ডায়াপারে হাত দিয়ে দেখল, ভিজিয়ে ফেলেছে কিনা। ওষুধের তাকে সাজিয়ে রাখা রাতের ট্যাবলেটগুলো গুনে দেখল। তারপর বাথরুমে ঢুকে স্নান করে রাতের পোশাক পরে আলোটা ডিম করে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। ঘাড় কাত করে ও পাশের ঘরের দিকে তাকাল। দরজা বন্ধ। দরজার নীচে যে সামান্য ফাঁক, সেখানে আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে সোমনাথ জেগে। জেগে মানে, হয় কম্পিউটারের স্ক্রিনে নিমগ্ন, নইলে স্মার্টফোনের পরদায় আঙুল সাপের মতো ওঠা-নামা করছে। আগে ফোনে কথা বলত মানুষ। আজকাল লিখে-লিখে কথা। টেক্স মেসেজ। হোয়াট্‌সঅ্যাপ।
বাইরের ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে সোফায় বসে টিভি অন করল ঝিলম। আগের টিভিটা অন করলেই ছবি আসত। এটায় সময় নে অজস্র চ্যানেল। পরিচিত চ্যানেলের নম্বরগুলো মুখস্থ। সিরিয়াল, সিনেমা দেখতে-দেখতে একসময় বুকের মধ্যে ঢেউ উঠত। আজকাল কেন যেন কিছুই ভাল লাগে না।
চ্যানেল সার্ফ করতে-করতে যেখানে পৌঁছল, সেটা একটা নিউজ় চ্যানেল। ব্রেকিং নিউজ়। বেড়ালে হাঁচলেও আজকাল ব্রেকিং নিউজ়। তবু দেখার চেষ্টা করল। দক্ষিণের এক নামী অভিনেতা রাজনীতির জগতে প্রবেশ করেছেন। তাই নিয়েই চর্চা।
সোমনাথকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা, অভিনয় ছেড়ে অভিনেতারা রাজনীতিতে আসছে কেন বলো তো?"
"গেস! তুমিই বলো।"
"অভিনেতাদের অনেক ফ্যান-ফলোয়ার থাকে। শূন্য থেকে শুরু করার বদলে একটা ভোট-ব্যাঙ্ক সঙ্গে নিয়ে রাজনীতিতে নামলে সুবিধে হয়।"
"পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান। রাজনৈতিক দলগুলোও সেই সুবিধেটা ইউটিলাইজ় করার চেষ্টা করে। আলটিমেটলি তোমার স্ট্রেংথ তো নাম্বারে। কতগুলো সিট তোমার দল দখল করতে পারছে, সেটা দিয়েই বিচার হবে তোমার শক্তি। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে সংখ্যাটাই শেষ কথা। তাই সব দলই একটা ভাল সংখ্যক অভিনেতাকে ভোটের ময়দানে নামিয়ে দেয়।"
"তা হলে সব অভিনেতাই, মানে যাদের একটু নাম-টাম আছে, তারাই তো ভোটে দাঁড়াতে পারত।"
"পারত না।"
"পারত না? কেন বলছ?"
"বলছি কারণ, অভিনেতাগিরির চেয়ে নেতাগিরি অনেক কঠিন কাজ।"
"কঠিন? কী হিসেবে?"
"অভিনয় ক্ষমতার হিসেবে!"
"বুঝতে পারলাম না।"
"একজন অভিনেতার তুলনায় একজন রাজনৈতিক নেতাকে অনেক-অনেকগুণ ভাল অভিনয় জানতে হয়।"
বোকার মতো তাকিয়েছিল ঝিলম। সোমনাথ হেসে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসেছিল।
"কোনওদিন সিনেমা বা সিরিয়ালের শুটিং দেখেছ?"
ঘাড় নেড়েছিল ঝিলম।
"এই যে ছবিটা রিলিজ় হচ্ছে, হাঁ করে দেখছে মানুষ, তার প্রতিটা দৃশ্য শুট করার সময় কতবার রিহার্সাল দিয়ে তবে ওকে হয়, জানো?"
"না।"
"চান্স পেলে দেখে এসো। প্রতিটা শট বহুবার টেক করা হয়। ভুল

করলে শুধরে নেওয়া যায়। স্ক্রিপ্ট পড়ে মুখস্থ করে তবে অভিনেতা ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান।"

"তাই?"

"হ্যাঁ, তাই। আর নেতাগিরি হল..."

"নেতার কথা আবার এল কোথা থেকে?" ঝিলম কথার মাঝখানে বাধা দিল।

"আসবে না? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। নেতা গিয়েছেন হাসপাতালে দেখতে। হাজারটা ক্যামেরা। রোগীর আত্মীয়স্বজন। কোনও স্ক্রিপ্ট নেই। কোনও রি-টেক নেই। একটা মাত্র চান্স। এতটুকুও না-থমকিয়ে, চোখের পাতা না-ফেলে, ক্যামেরার দিকে সোজা তাকিয়ে নেতাকে বলে যেতে হবে। দুঃখ-বেদনা-সমব্যথা একফোঁটা কম হলে চলবে না। অনর্গল প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে, যার আশিভাগই মিথ্যা। এদিক-ওদিক হয়েছে কি, ক্যামেরা ধরে ফেলবে। পরদিনই হইহই পড়ে যাবে... চাট্টিখানি কথা? অভিনেতার তুলনায় একশোগুণ ভাল অভিনয় দরকার নেতার। সেই আত্মবিশ্বাস যার আছে, সেই নেতাগিরিতে নামে। সবার দ্বারা ও কাজ হয় না।"

ঋক কি আওয়াজ করল?

উঠে গেল ঝিলম। ঋকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। অক্সিজেন স্যাচুরেশন কি কমে যাচ্ছে? দিনের বেলা যে নার্সটি দেখাশোনা করে, তার কাছ থেকে ঝিলম শিখে নিয়েছে। নিজেই টেস্ট করে দেখল। একটু কমের দিকে। অক্সিজেন দিলে ভাল হয়। কিছুক্ষণ অক্সিজেন চালাল। স্টেব্‌ল মনে হল যখন, অক্সিজেন বন্ধ করে বাইরের ঘরে এসে বসল।

টিং করে মোবাইলে আওয়াজ হল। মেসেজ। সোমনাথ?

মেসেজ দেখল, 'কাল সকাল-সকাল বেরোব। ব্রেকফাস্ট মিটিং। খাবার রেডি রাখার দরকার নেই।'

ও-ঘরের আলো নিভে গিয়েছে। শুয়ে পড়েছে সোমনাথ। ফোনটা সাইলেন্সে দিয়ে দিল। টিভির আওয়াজ অফ করে দিল। রান্নাঘরে ঢুকে সকালের খাবার যেগুলো রেডি করে রেখেছিল, আবার ফ্রিজে ঢোকাল। তারপর সোফায় এসে বসল। দুটো দরজা। কোনও দরজাতেই চৌকাঠ নেই। অথচ ঝিলম ঘরে ঢুকতে গেলে দরজায় টোকা দেয়। অপেক্ষা করে। কাম-ইন শুনে দরজার ল্যাচ ঘুরিয়ে ভিতরে ঢোকে। দু'-তিন পা। ল্যাপটপ থেকে মুখ তুলে সোমনাথ তাকায় ঝিলমের দিকে, "বলো।"

দরকারি কথাগুলো এক ঝটকায় বলে ফেলে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর সোমনাথের জবাব শুনে বেরিয়ে আসে। সোমনাথ সকালে অফিস যাওয়ার সময়, অথবা রাত করে ফেরে যখন, ড্রয়িংরুম হয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার আগে একঝলক তাকায়। ঋক যেখানে কুড়িটা বছর একভাবে শুয়ে, সেদিকে। দৃশ্য বদলায় না। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে, যেন অস্পৃশ্য, যেন দেখতে মানা, নিজের ঘরে সেঁধিয়ে যায়।

ঝিলমও, যেন অপরাধটা তারই, বুকের মধ্যে আটকে থাকা নিশ্বাসটা একটু-একটু করে ছাড়ে, সোমনাথ ও ঋকের এক ফ্রেমে থাকা ফোটোটা মুছে যেতেই। যখন ছেলের নাম রেখেছিল ঋক, সোমনাথ হেসে উঠেছিল, "ব্যাপারটা কী? তোমার কি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা?"

বুঝতে না পেরে তাকিয়েছিল ঝিলম।

এই বিশটা বছর সোমনাথ আর ঝিলম, ঝিলম আর সোমনাথ তাদের দাম্পত্যকে মোড়কে পুরে সকলের সামনে সাজিয়ে রেখেছে।



"ঋক সাম যজু অথর্ব, এইভাবে কি চলতেই থাকবে?"

লাজুক হেসেছিল ঝিলম। ভালও লেগেছিল, মনে-মনে ভেবেছিল, হলেই-বা, ক্ষতি কী?

ছ'মাস যেতে না-যেতেই মত বদলাতে হয়েছিল।

বাচ্চা বাড়তে থাকলে তার কতগুলো পরিবর্তন হয়। স্বাভাবিক মাইলস্টোন। কাত হওয়া। হামাগুড়ি দেওয়া। বসা। দাঁড়ানো। ঋকের সেসব কিছুই দেখা গেল না।

ছুটল পেডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে। তিনি দেখলেন, ওষুধ দিলেন। কিছু ইনভেস্টিগেশনও করতে দিলেন। রিপোর্ট করানো হল। সেসব নিয়ে আবার যাওয়া হল। ডাক্তারবাবু উলটে-পালটে দেখলেন। কিন্তু বোঝা গেল, অসুখটা তাঁর আয়ত্তের বাইরে। রেফার করে দিলেন নিউরোলজিস্টের কাছে।

আরও টেস্ট। আরও খরচ। এবার নিউরোলজিস্টও মনে হল আতান্তরে পড়েছেন।

যখন কোনও সুরাহাই হচ্ছে না, সোমনাথকে নিয়ে ঝিলম চলল মামার কাছে। মামা তখন কলকাতার সবচেয়ে বড় হাসপাতালের একটি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। যত্ন করে বসালেন। কাগজপত্র দেখলেন। তারপর মুখ গম্ভীর করে বললেন, "আমার মনে হয় এদিক-ওদিক না ঘুরে নিমহ্যান্স-এ যাওয়াই ভাল।"

"নিমহ্যান্স?"

"বেঙ্গালুরু, নিউরোলজির সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান।"

অতএব নিমহ্যান্স। দু'সপ্তাহ অফিস থেকে ছুটি নিল সোমনাথ। অফিসেরই গেস্টহাউস আছে বেঙ্গালুরুতে। সেখানে থাকল। অনেকে মিলে দেখলেন ঋককে। বোর্ড বসল। তারপর দু'জনকে ডাকা হল।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ডাক্তারবাবুরা যা বললেন, তার সারমর্ম, অসুখটা জটিল। কোনও চিকিৎসা নেই। পরীক্ষামূলকভাবে কিছু ওষুধ দেওয়া যেতে পারে, তবে লাভ হবে এমন গ্যারান্টি কম। ওষুধের খরচও অনেক।

রিপোর্টসুদ্ধ আবার গিয়ে সোমনাথ দেখা করল মামার সঙ্গে।

যা নিমহ্যান্সে জিজ্ঞেস করতে পারেনি সেটাই এবার খোলাখুলি সোমনাথ জানতে চাইল। জানতে চাইল যে, এভাবে ঋকের আয়ু আর কতদিন?

"আমি কি ভগবান? না জ্যোতিষী?"

"তবু?"

মামা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জানলার কাছে গেলেন, চশমা খুলে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। ফিরে এসে গলা পরিষ্কার করে বললেন, "সতেরো-আঠারো, কুড়িও হতে পারে।"

কুড়ি পার হয়ে গেল ঋকের। সেই মামা বছরদুই হল হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে চলে গেলেন।

কুড়িটা বছর। একটু-একটু করে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে। ঘর আলাদা হয়েছে। বিছানা পৃথক হয়েছে। সোমনাথ ডুবে গিয়েছে তার কাজের চৌহদ্দিতে। ঝিলমের পৃথিবী ঋক আর স্কুল এই দুই বৃত্তের পরিধিতে আটকে গিয়েছে। একই বাড়ির দুটো ঘর, তার অস্তিত্বহীন চৌকাঠ উঁচু হতে-হতে কখন যেন দেওয়াল হয়ে উঠেছে। অনেকদিন আগে, যখন সদ্য বিয়ে হয়েছে, সবাই বলেছিল, "জানিস তো, তোর বর নামী কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার।"

একদিন সুযোগ পেয়ে জানতে চেয়েছিল, "হ্যাঁ গো, মার্কেটিং কী

জিনিস?"
সোমনাথ হেসে তাকে কাছে টেনে বলেছিল, "মার্কেটিং হচ্ছে মিথ্যেকে সত্যি করে দেখানোর শাস্ত্র।"
"তার মানে?"
"ধরো, যে-জিনিসটা আদৌ কাজের নয়, মার্কেটিংয়ের গুণে তাকেও তোমার অসাধারণ কিছু মনে হতে পারে। মনে হতে পারে, সেটা না কিনলে তোমার জীবনই বৃথা।"
"তাই হয় নাকি?"
"হয়। আমরা যা যা কিনি, যা-যা পাওয়ার জন্য ছুটে মরি, তার অনেকগুলোই অন্তঃসারশূন্য। মোড়ক খুললে দেখা যাবে ভিতরটা ফোঁপরা।"
এই বিশটা বছর সোমনাথ আর ঝিলম, ঝিলম আর সোমনাথ তাদের দাম্পত্যকে মোড়কে পুরে সকলের সামনে সাজিয়ে রেখেছে। মার্কেটিং ছাড়া তাকে আর কী-ই বা বলা যায়?
টিভিটা খোলা ছিল। একসময় খেয়াল হল, টিভি দেখছে না ঝিলম। তাদের ফেলে আসা সম্পর্কের বিশটা বছর যেন টিভির পরদায় সরে-সরে যাচ্ছে, সেটাই দেখছিল এতক্ষণ।
টিভি বন্ধ করে দিল।
সেলফোনটা চার্জে দেওয়া ছিল। খুলতে গিয়ে নজরে পড়ল, মিস্‌ড কল। ঝুমা মিত্র।
ঘরে ঢুকে দরজার পাল্লা ভেজিয়ে ফোন করল ঝিলম, "তোমার মিস্‌ড কল দেখলাম ঝুমাদি।"
"হ্যাঁ, তোকে কল করেছিলাম।"
"বলো। জরুরি কিছু?"
"জরুরি? তা বলতে পারিস। টিভিতে স্কুলের ঘটনাটা দেখাচ্ছে।"
হাত ঘামতে শুরু করল ঝিলমের। কান গরম হয়ে উঠল। নিজের হৃদ্‌স্পন্দন নিজেই শুনতে পাচ্ছে যেন।
"কোন চ্যানেলে?"
চ্যানেলের নামটা জেনে নিয়ে আবার বাইরের ঘরে গেল ঝিলম। টিভি অন করল।
প্রিন্সিপাল। পরদা জুড়ে তাঁর মুখ। আর বুম ধরে আছেন যে-সাংবাদিক, তিনি প্রশ্ন করে চলেছেন।
প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অধিকাংশই অবান্তর। তবু যথাসাধ্য শান্ত গলায় প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন প্রিন্সিপাল।
উত্তর শেষ হলে প্রোগ্রামের অ্যাঙ্কর শুরু করলেন তাঁর ভাষণ, "এই হচ্ছে কলকাতার সেরা স্কুলগুলোর হাল। বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের কী ভরসায় তা হলে স্কুলে পাঠাবেন?"
টিভির সুইচ অফ করে ভিতরে চলে এল ঝিলম। জল খেল। ঋকের কপাল মুছিয়ে দিল। বুকে হাত রেখে দেখল সব ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর হঠাৎই ভিতর থেকে একটা কান্না যেন উথলে উঠল। ওই তো তার ঋক, এখনও বিছানায় শুয়ে। এখনও বাতাস তার ফুসফুসকে আচ্ছন্ন করে আছে। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি অভিঘাতে প্রাণ তার উপস্থিতি ঘোষণা করছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জাগতিক প্রতিটি লক্ষণ নিয়ে ঋক এখনও জীবিত। তথাপি কেন এই শোক, এই দুঃখবোধ? কোনও এক জায়গায় কি সমস্ত মাতৃত্বের সমাপতন? প্রতিটি জননীরই কি দুঃখবোধ স্বতন্ত্র অথচ অভিন্ন? সন্তানস্নেহ কি কোনও একটি বিন্দুতে গিয়ে সম্মিলিত হয়?
ঈশ্বরকে সেইভাবে কখনও অনুভব করেনি ঝিলম। ঝিলমের ঈশ্বর তিনিই, যাঁর অবধারিত সাহচর্য প্রতিটি মুহূর্তে সঙ্গ দেয় তাকে। গীতবিতান খুলে পড়তে শুরু করল সে, "আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়/ তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাইনি।"
হঠাৎ ঝিলমের মনে পড়ল কবিতাপাঠের যে অনুষ্ঠানে ঝিলমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যাবে না এমনটাই সে মনস্থ করে ফেলেছিল... সেটা ছিল সামনের রবিবার।
যাবে না ঝিলম?
তা হলে নিজের জন্য আর কী পড়ে রইল?
উঠে ড্রয়ার ঘাঁটতে শুরু করল। কার্ডটা এখানেই তো ছিল। কী যেন নামটা ভদ্রলোকের? আর ফোন নম্বর?

৩

রবীন্দ্রসদন-নন্দন-শিশিরমঞ্চ। এখানে এলে ভিতরটা শান্ত হয়ে আসে। স্রোতস্বিনী যেন মোহনায় পৌঁছয়। কেউ জোরে-জোরে গান গাইছে। কেউ সদ্য লেখা কবিতা সঙ্গিনীকে পড়ে শোনাচ্ছে। কেউ আপাতদৃষ্টিতে কিছুই করছে না, শুধু ঘাসে গা হেলিয়ে নীল থেকে কালচে হয়ে আসা আকাশে প্রথম ফুটে ওঠা সন্ধ্যাতারাটি খুঁজে বেড়াচ্ছে।
সোমনাথ আওয়াজ দিতে ছাড়ে না, "শিল্প নেই, কৃষিতেও ভাটা পড়েছে। খালি সংস্কৃতির চাষ। হবে না? ওটাতে তো পরিশ্রম লাগে না, তাই বাঙালি আছে।"
ঝিলম জবাব দেয় না। মনে পড়ে সোমনাথের বাবার কথা। ছোটবেলার বন্ধু এসেছেন দেখা করতে। কথায়-কথায় তিনি জানতে চাইলেন, "ছেলে কী করে?"
আজীবন শিক্ষকতা করেছেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোমনাথের বাবা বললেন, "কী আর করবে? সাবান আর টুথপেস্ট বিক্রি করে।"
বন্ধু চমকে উঠলেন, "সে কী? লেখাপড়া করেনি?" শিক্ষাব্রতী মানুষটির ছেলের এহেন পরিণতি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না তিনি।
সোমনাথের বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের নাম করেছিলেন। তারা সাবান আর টুথপেস্ট তৈরি করে। তারপর বলেছিলেন, "আমার ছেলে ওই কোম্পানির ম্যানেজার। অনেক টাকা মাইনে পায়। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে। ভাল ছাত্র ছিল। কী লাভ হল? একটা সিট নষ্ট করল।"
অনুষ্ঠান শুরু হতে কিছুটা দেরি আছে। আয়োজকরা ঝিলমকে দেখে এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন। তারপর সামনের রোয়ে বসিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন পাশের অতিথির সঙ্গে।
"নাম শুনে থাকবেন, ইনি বিদ্রোহ বসু। ওঁর গল্প নিয়ে রচিত একটি শ্রুতিনাটকও আজ পড়া হবে।"
নমস্কার করে বসল ঝিলম। খেয়াল করল, পাশের ভদ্রলোক বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করছেন।
নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠান শুরু হল। কোনও সভামুখ্য বা প্রধান অতিথি নেই। সামান্য মুখবন্ধের পর সরাসরি প্রোগ্রাম সূচনার ঘোষণা হল।
শ্রুতিনাটক দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা। উদ্যোক্তারা এইরকম একটি ইন্ট্রো দিলেন: "গল্পকার বিদ্রোহ বসু পেশায় চিকিৎসক। অল্প সময়ের মধ্যেই ভিন্নধারার গল্প লিখে নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর সাড়াজাগানো একটি গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন নাট্যকার সঞ্জয় তলাপাত্র। আর বাচিক শিল্পী রঞ্জন হালদার এবং তন্ময় দত্ত কোনও পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না। চারজনকেই আমরা মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি।"
দু'বারের চেষ্টায় ডাক্তার বসু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ফর্মালিটিজ় শেষ হলে আবার যখন ঝিলমের পাশে এসে বসলেন, ঝিলম দেখল এইটুকু পরিশ্রমেই মানুষটি হাঁপিয়ে গিয়েছেন। হয়তো কোনও অসুখ আছে। ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলল ঝিলম। ডাক্তারের অসুখ! আর তার ডায়গনোসিস করছে কিনা এক স্কুলশিক্ষক! তারপর নিজেকেই বোঝাল। ডাক্তার যদি সাহিত্যিক হতে পারে, তারই-বা ডাক্তারি করতে বাধা কোথায়?
তৎক্ষণে স্টেজের দু'ধারে দু'জন শিল্পী জায়গা করে নিয়েছেন।

মাইক্রোফোন পরীক্ষা ইত্যাদির পর শুরু হয়ে গেল শ্রুতিনাটক। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক ডাক্তার। তাঁর কাছে ফোন আসতে থাকে। প্রথমে সাধারণ কথাবার্তা। আলাপ করার অছিলা। আস্তে-আস্তে বোঝা যায় সেই ব্যক্তি ডাক্তারের কাছ থেকে তাঁর বিচ্যুতি, তাঁর স্খলনের জায়গাগুলি জেনে নিতে চায়। ডাক্তার পুলিশের শরণাপন্ন হন। ফোনগুলি আসছে ল্যান্ডলাইন থেকে। একসময় সেটারও সন্ধান পেয়ে যায় পুলিশ। মানুষটিকে গ্রেফতার করা হয়। ইন্টারোগেট করে পুলিশ জানতে পারে, ওই ব্যক্তির মেয়ে চিকিৎসাবিভ্রাটে মারা গিয়েছিল। ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগও আনা হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণের অভাবে ডাক্তার ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলেন। সেটা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারেনি ওই ব্যক্তি। তাই টেলিফোন করে ডাক্তারকে শাস্তি দেওয়ার পথ বেছে নেয় হতভাগ্য পিতা।

বিদ্রোহ কিন্তু আগাগোড়া ঝিলমের উপর থেকে চোখ সরাননি। শ্রুতিনাটক শেষ হতে ঝিলমের দিকে ফিরে বললেন, "ওই টেলিফোনের মানুষটি কিন্তু আসলে ডাক্তারের বিবেক। একটা রূপকের আড়ালে গল্পটা লেখা, বুঝতে পেরেছেন তো?"

ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়ায় ঝিলম। এবারে তার টার্ন।

আবৃত্তি ও পাঠের অনুষ্ঠান আজকাল লেগেই থাকে। একঘেয়েমি কাটাতে শিল্পীরা কেউ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজ়িক ব্যবহার করেন। কেউ-বা ছন্দের কবিতা পড়ার সময় তবলাবাদককে সংগত করতে বলেন। ঝিলম এগুলোর মধ্যে যায় না। সে সরাসরি অডিয়েন্সের সঙ্গে কমিউনিকেট করে। তা ছাড়া বই বা স্ক্রিপ্ট সঙ্গে রাখে না। স্মৃতি থেকে বলে যায়।

এইভাবে শুরু করল ঝিলম: "আমি যে কবিদের কবিতা বলব, তাঁরা কেউই জীবিত নেই। এক-একজন কবির কবিতা বলা শেষ হয়ে গেলে জানতে চাইব কবির পরিচয়। তারপর অন্য কবিতায় যাব। রাজি?"

চোখ বন্ধ করে আবৃত্তি শুরু করল ঝিলম:

"...স্বর্গ এবং যখন ভোর এসে আলখাল্লা পরিয়ে দেবে তোমরা
দেখবে আনন্দ নেই, ফুল্লতা নেই,
কোনও কলহাস্য-মুখরতা নেই, অট্টহাসি নেই,
শুধুমাত্র সমস্ত দুঃখ পান করা একটি মোমবাতি,
এক শব্দহীন মৃত রাত্রির জন্য সমবেত প্রার্থনা।"

থেমে যায় ঝিলম। শ্রোতাদের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়। সেখানে কোনও তরঙ্গ, কোনও ঝিলিক দেখতে পায় না। তারপর বলে, "এর পরের ছোট-ছোট কবিতাগুলি একসঙ্গে বলে যাব। শেষ হলে জানতে চাইব কবির পরিচয়। বলাবাহুল্য, সবগুলোই একজনের লেখা।"

"আমার বাড়ির শোকার্ত দেওয়াল এবং দরজা
বর্জিত তৃণভূমি, এখানেই যদি বসন্ত
হেমন্ত দেখতে কেমন জানতে চাইছ কেন?"

"আমাকে একটি মরুভূমি দাও,
আমি অবশ্যই সমুদ্রকে আমন্ত্রণ জানাব।"

"অশ্রুত, কর্ণপাত না-করা
দীর্ঘশ্বাস থেকেই জন্ম নেয় চিরবসন্ত।"

যেন কবিতা নয়, ভিতর থেকে উঠে আসা নিরুক্ত বাণী, চোখ বন্ধ করে এভাবেই বলে যাচ্ছিল ঝিলম। এবারে চোখ খুলল। স্তব্ধতা।

"বলুন, কার রচনা?"

পক্বকেশ, সৌম্যদর্শন, ধুতি-পাঞ্জাবি, সামনের আসন আলো করে বসেছিলেন। অধ্যাপকসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে জবাব দিলেন, "সুধীন দত্ত।"

"হল না। আর কেউ?"

দ্বিতীয় সারির একজন হাত তুললেন।

"বলুন? "

"প্রেমেন্দ্র মিত্র?"

"প্রেমেন্দ্র মিত্র নন।"

"জীবনানন্দ? "

"না।"

"রবীন্দ্রনাথ?"

হেসে ফেলল ঝিলম, "না, রবীন্দ্রনাথ তো ননই।"

পিছনের রো-এর ঝাঁকড়া চুল বড়-বড় চোখ যে ছেলেটি একটু আগেই বাইরে রেলিংয়ের উপর পা ঝুলিয়ে বান্ধবীর গায়ে গা ঘেঁষে কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিল, গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "গালিব।"

"চমৎকার," গলায় উত্তেজনা ফিরিয়ে আনল ঝিলম, "এই কবিতা বা গজ়লগুলি মির্জা আসাদুল্লাহ্ খান গালিব-এর রচনা। ইংরিজি অনুবাদ থেকে বাংলায় তর্জমা করেছেন কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য।' এবারে উত্তরদাতার চোখে চোখ রাখল ঝিলম, "কী লক্ষণ দেখে গালিবের কবিতা চিনতে পারলেন, একটু যদি বলেন ভাই!"

যুবক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল, "স্বল্প পরিধিতে অতখানি জীবনদর্শন, গালিব ছাড়া আর কে-ই বা দিতে পারে বলুন?"

দর্শকদের দিকে ফিরে ঝিলম বলল, "আসুন, আমরা হাততালি দিয়ে উত্তরদাতাকে অভিনন্দন জানাই।"

হাততালি থামলে সামনের সারির সেই 'সুধীন দত্ত' অনুযোগ করলেন, "আপনি কিন্তু প্রতিযোগিতার নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন।"

অবাক হল ঝিলম। সামনে এগিয়ে গেল, "কেন?"

"আপনি অনুবাদ কবিতার কথা বলেননি। আমরা ধরে নিয়েছি কবিতাগুলি সবই বাংলাভাষায় লেখা।"

ঝিলম ঢোক গিলল, "ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি, এবারে যে কবির কবিতা বলব, তিনি এই কবিতাগুলি বাংলাভাষাতেই লিখেছিলেন। ইনিও আর জীবিত নেই। কিন্তু কে না জানে, একজন কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শতসহস্র বছর বেঁচে থাকেন।"

অধ্যাপক ঘাড় নাড়লেন।

ঝিলম চোখ বন্ধ করল।

"জিরাফের বাবা বলে,
'খোকা তোর দেহ
দেখে দেখে মনে মোর
কমে যায় স্নেহ।
সামনে বিষম উঁচু
পিছনেতে খাটো
এমন দেহটা নিয়ে
কী করে যে হাঁটো!'
খোকা বলে, 'আপনার
পানে তুমি চেহো—
মা যে কেন ভালোবাসে
বোঝে না তো কেহ।'"

চোখ খুলে মুচকি হাসল ঝিলম, "বলুন, কার কবিতা?"

"সুকুমার রায়? "

"না।"

"সুভাষ মুখোপাধ্যায়? "

"না।"

"নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী?"

"না, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও নন।"

তারপর গলা নামিয়ে বলল, "ঠিক আছে, এবারে শোনাচ্ছি তাঁর

গদ্যকবিতা। আশা করি চিনতে ভুল হবে না।"

"বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল। এইটুকু ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুরবেলা।

ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়।

কিন্তু একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।"

শেষ হতে না-হতেই চারিদিক থেকে 'রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রনাথ' পুষ্পবৃষ্টির মতো উড়ে আসতে লাগল।

ছোট একটা নমস্কার করল ঝিলম। তারপর নিজের সিটে গিয়ে বসল।

প্রোগ্রাম শেষে অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ভাবতে-ভাবতে হাঁটছিল। গালিব, ঠিক আছে, চিনতে নাও পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? প্রথম কবিতটা কেউ বলতেই পারল না? বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেলেন রবীন্দ্রনাথ! এত তাড়াতাড়ি?

ভিতরে একটা কষ্ট জন্ম নিচ্ছিল ঝিলমের। যেন রবীন্দ্রনাথ নয়, তাকেই কেউ অপমান করেছে। আলোকিত অঙ্গন পার হয়ে যে অংশটা অন্ধকার, সেখানেই পৌঁছে যেতে চাইছিল।

হঠাৎ পাশ থেকে কেউ বলে উঠল, "অসাধারণ!"

দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিলম।

"যেমন নির্বাচন, তেমনই পাঠ। খুবই ব্যতিক্রমী।"

"কিন্তু আমি তো পাঠ করিনি। আমার সঙ্গে কোনও বই বা স্ক্রিপ্ট ছিল না!"

"সেই জন্যেই আরও ভাল লেগেছে। মনে হচ্ছিল, কথাগুলো যেন কবির লেখা নয়, আপনারই মনের কথা। অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। মনে থাকবে।"

গেটের দিকে এগোচ্ছিল দু'জনে। ঝিলম কথা বলছিল না। আসলে প্রশংসা শুনলে গুটিয়ে যায় ঝিলম। কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে বুঝে উঠতে পারে না।

"আমার গল্প কেমন লাগল, বললেন না তো?"

"ভালই তো!"

এদিকটায় আলো কম। ম্লান চাঁদের আলোয় যেটুকু বুঝতে পারল, ঝিলমের উত্তরে ভদ্রলোক নিভে গেলেন।

এবারে অন্যভাবে উত্তরটা দিল ঝিলম, "আসলে আজ যেটা শুনলাম সেটা তো গল্প নয়, গল্পের নাট্যরূপ। গল্পটা পড়লে তবেই গল্পের ফ্লেভারটা ঠিকঠাক পাওয়া সম্ভব।"

এবারে উৎসাহিত হলেন বিদ্রোহ, "ঠিক বলেছেন। আমার একটা গল্পের বই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। পড়ে দেখবেন। তারপর গল্পগুলো সম্বন্ধে আপনার মতামত..."

পার্স হাতড়ে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করলেন বিদ্রোহ। একরকম জোর করেই ঝিলমের হাতে কার্ডটা গুঁজে দিতে দিতে বললেন, "আমার ফোন নম্বর, ই-মেল আইডি সব দেওয়া আছে। দিনের বেলা ফোন ধরি না। আপনি স্পেশ্যাল। ফিল ফ্রি টু কল মি এনি আওয়ার অফ দ্য ডে।"

কার্ডটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে ঝিলম, বিদ্রোহ বললেন, "আপনার ফোন নম্বর কিন্তু আমাকে দিলেন না। আপনি কি ফেসবুকে আছেন?"

হেসে ফেলল ঝিলম, "ফেসবুক-টুইটার-হোয়াটসঅ্যাপ কোথাও আমি নেই।"

বিদ্রোহ তার দিকে ঘেঁষে এলেন, "কে বলল আপনি কোথাও নেই? এমন অসামান্য কবিতা বলতে পারে যে, সে কোথাও নেই হতে পারে?"

বিদ্রোহের নিশ্বাসের উত্তাপ ঝিলম পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। বিদ্রোহ জবাবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। জবাবটা মনে-মনে তৈরি করছিল ঝিলম।

জবাবটা এইরকম, 'আচ্ছা বিদ্রোহবাবু, আপনার স্ত্রী যদি সঙ্গে থাকতেন, তা হলেও কি ঠিক এইভাবেই এই কথাগুলো বলতে পারতেন?'

বলা হল না। সেলফোনটা সাইলেন্সে দেওয়া ছিল। আলো জ্বলে উঠল। শিরিন।

"এক্সকিউজ় মি। একটা জরুরি ফোন," এগিয়ে গেল ঝিলম।

"রায়?"

"বলছি।"

"একটা এফ আই আর লজড হয়েছে। পুলিশ এনকোয়ারি করতে কাল স্কুলে আসবে। দুপুর একটায়। কিপ ইওরসেল্ফ অ্যাভেলেবল।"

আলো নিভে গেল।

সেলফোনটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ঝিলম। মুছে যাচ্ছে কলকাতার নিজস্ব আওয়াজ। কানের মধ্যে যেন ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ।

ঘুরল।

অন্ধকার।

ঝিলমের জন্য কোনও বিদ্রোহ সেখানে অপেক্ষা করে নেই।

৪

রোল কল করছিল ঝিলম। ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ... থার্টি-ফোর-এ পৌঁছে রেজিস্টারে চোখ আটকে গেল।

স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী রোল নম্বর ঠিক হয় নামের ইংরেজি বানানে আদ্যাক্ষর দিয়ে। এই ক্লাসে যেমন, রোল নম্বর ওয়ান, অবির অধিকারী। এইভাবেই সাক্ষন আচার্য, তারপর সায়ন্তন ব্যানার্জী। কয়েকটা নাম পার হয়ে সৈকত সেনগুপ্ত।

এইখানেই থেমে গিয়েছিল ঝিলম।

মনে হচ্ছিল, সৈকত সেনগুপ্তর আগে তো আর একটা নাম থাকার কথা। সৈকত সাধু। রেজিস্টার থেকে এত তাড়াতাড়িই নামটা ডিলি করে দেওয়া হল?

হঠাৎ সংবিত ফিরল ঝিলমের। কী আবোলতাবোল ভাবছে? সৈক সাধু তো এই ক্লাসের ছাত্র ছিল না। ছিল সেভেন সি-র। এমনকী, সৈকতদের ক্লাসও নিত না ঝিলম। ঝিলমের কি মাথাটা গিয়েছে? চশমার ফাঁক দিয়ে দেখল, ছেলেগুলো অবাক হয়ে তাকে দেখছে। রোল কল করতে-করতে থেমে যাওয়া! নাম ডাকতে ভুলে যাওয়া রায়ম্যামই তো?

সামলে নিল ঝিলম। এক নিশ্বাসে পরের নম্বরগুলো আউড়ে গেল ক্লাসে কী পড়াল খেয়াল রইল না।

ক্লাস শেষ করেই দৌড়ল টিচার্সরুমে। এক গ্লাস জল খেল। মাথায়, ঘাড়ে জলের ঝাপটা দিল। ফ্যানটা ফুল স্পিডে চালিয়ে একমিনিট বসে রইল।

পরের ক্লাস নাইন এ।

প্রত্যেকের পড়ানোর একটা নিজস্ব স্টাইল থাকে। কোনও না-কোনও শিক্ষক বা অধ্যাপকের কাছ থেকে সেই স্টাইলটা আয়ত্ত করে ছাত্র। ঝিলমও ব্যতিক্রম নয়।

প্রেসিডেন্সিতে ঝিলমদের পড়াতেন এস বি— সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও চোখ বন্ধ করলে শুনতে পায়, "শব্দের গা হাত বুলিয়ে দ্যাখো, ওরা কথা বলবে।"

এস বি যে-কোনও কবিতা পড়ানোর আগে কবির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন, "স্রষ্টাকে জেনে তবেই তাঁর সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হতে হয়।"



যদিও এই নিয়ে মতান্তর হয়েছে, সৃষ্টিই স্রষ্টার মোক্ষম পরিচয়, এটাই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে ঝিলম এবং আরও অনেকে, পড়ানোর সময় এস বি-র স্টাইলটাই ফলো করে এসেছে সে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়।

রজনীকান্তর একটা কবিতা আজ পড়ানোর কথা। এটা সহপাঠ্যে আছে। ঝিলম নিজেই চেয়েছিল কবিতাটা পড়াবে। কিন্তু পড়ানো শুরু করতে গিয়ে হঠাৎ হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল।

রজনীকান্ত। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু পদবিটা কী যেন? সেন? রজনীকান্তও সেন, অতুলপ্রসাদও সেন? ঠিক বলছে তো? ভুলটা একবার বলে ফেললে আর শোধরানো যাবে না। তাই জীবনে যা কখনও করেনি, তাই করল ঝিলম। আড়চোখে নামটা দেখে নিল।

ক্লাস-শেষের ঘণ্টা পড়লে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তাড়াতাড়ি স্টাফরুমে ফিরে ফ্যানের তলায় বসল। গলার ঘাম মুছে উপর দিকে তাকাল। ফ্যানটা কি আজ অন্যদিনের চেয়ে আস্তে ঘুরছে? পরের পিরিয়ডটা অফ ঝিলমের।

শব্দ করে পাশের চেয়ারে বসল মালিনী। খুশি হল ঝিলম। মালিনী মোটাসোটা গায়েগতরে। মোটাদের গরম বেশি লাগে। রোগা-পাতলা কেউ হলে বলত, 'শীত করছে না ঝিলমদি? ফ্যানটা কমিয়ে দেব?'

তবে, ঝিলমের ধারণা, রোগা মানুষের তুলনায় মোটারা একটু সরল প্রকৃতির হয়। ঘোরপ্যাঁচ কম। মালিনীও ব্যতিক্রম নয়। খেতে ভালবাসে, খাওয়াতেও। নতুন-নতুন রান্নার এক্সপেরিমেন্ট করা ওর হবি। আগের সপ্তাহেই পোস্ত-চিংড়ি রান্না করে এনেছিল— ডিলিশাস।

যা ভেবেছে। কৌটো খুলে ঝিলমের দিকে বাড়িয়ে দিল।

"খাও।"

"কী এটা?"

"দহিবড়া।"

"তুই বানিয়েছিস?"

"না, শাশুড়ি। টেস্ট করে দ্যাখো।"

আজকাল দইবড়া আর বলে না কেউ, বলে দহিবড়া। মালিনী তো বলেই না। প্রকাশ, ওর স্কুলবেলার বেস্ট ফ্রেন্ড, মাড়োয়ারি। চাকরি পেয়েই বিয়ে করেছিল ওরা। সব ভাল, মালিনীকে ভীষণ স্নেহ করেন প্রকাশের মা, ফ্যামিলিটাও সাপোর্টিভ। একটাই সমস্যা, ওরা কট্টর ভেজিটেরিয়ান।

"কষ্ট হয় না?"

"হয় না আবার?"

"কী করিস?"

"বাড়িতে ভেজ, বেরোলেই নন-ভেজ।"

"প্রকাশ?"

"কনভার্ট করে নিয়েছি।"

চামচ দিয়ে একটুখানি কেটে মুখে দিল ঝিলম।

"ব্যস? আর নেবে না?"

"না রে, ইচ্ছে করছে না।"

মালিনী একটু ইতস্তত করল, খাবার নাড়াচাড়া করল। তারপর বলল, "তোমাদের তো আজই ইন্টারোগেশন, তাই না? "

ঢোক গিলল ঝিলম, "হ্যাঁ।"

"ক'টায় যেন?"

"একটা।"

"তা হলে তো খুব একটা দেরিও নেই।"

দেওয়ালে ঝোলানো বড় ঘড়িটার দিকে তাকাল ঝিলম, ঘাড় নাড়ল।

তখনই দরজায় শিরিনকে দেখা গেল।
উঠে দাঁড়াল ঝিলম, "যাই রে।"
"যাও। টেক কেয়ার। বেস্ট অব লাক।"
যেতে-যেতে অন্যদের দিকে তাকাল। কেউ টিফিন খাচ্ছে। কেউ কাগজ পড়ছে। ঝিলমের মনে হল, সকলেই জানে আজ ইন্টারোগেশন। জানে, কিন্তু প্রসঙ্গটা সামনে আনেনি। মালিনী আনল। মেয়েটা সত্যিই সরল।

প্রিন্সিপালের ঘরের আগে টিচার-ইন-চার্জের বসার ঘর। ঝিলমকে অবাক করে সেখানেই ঢুকল শিরিন।
"বোসো। ডাক পড়লে নিয়ে যাব।"
ডাঁই করা কাগজপত্র। এককোনায় জড়সড় হয়ে বসে ছিলেন মলয়দা। ঝিলমকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, "তোমাকেও এখানেই পাঠিয়ে দিল? কোথায় বসাই বলো তো?"
টুলের উপর রাখা আবর্জনা সরিয়ে ধুলো ঝেড়ে বসতে-বসতে ঝিলম বলল, "আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। এই তো আমার বসার জায়গা হয়ে গেল। ...এখনও শুরু হয়নি?"
"হবে। আমাকে দিয়েই শুরু হবে। আগে আমার, তারপর তোমার। বুঝেছ? আমাদের কিন্তু চিন্তার কোনও কারণ নেই। অভিযোগটা স্কুলের এগেনস্টে। আমরা পার্টি নই। টেনশন কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"
হাসি পেয়ে গেল ঝিলমের। মলয়দা নিজেই টেনশন করছেন। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছেন বারবার। হাত কাঁপছে। একটা পেপারওয়েট এ-হাত থেকে ও-হাতে নিতে গিয়ে হাত ফসকে পড়ে গেল। ঝিলমই টেবিলের তলা থেকে বের করে এনে দিল।
শিরিনকে দেখা গেল আবার, "মিস্টার সরকার, আপনাকে ডাকছে।"
মলয়দা বেরিয়ে গেলেন।
একা-একা বসে অপেক্ষা করার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু নেই। এক বান্ডিল খাতা নিয়ে এলে ভাল হত, দেখা হয়ে যেত। রবীন্দ্রনাথ থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম থেকে সমরেশ বসু, বাংলা সাহিত্যের মাথা থেকে ল্যাজা সমস্তটা যখন ভাবা হয়ে গিয়েছে, বাইরে একটু পায়চারি করে এলে হয় ভাবছে, তখনই শিরিনকে আবার দেখা গেল।
"চলো, এবার তোমার টার্ন।"
মলয়দার ইন্টারোগেশন কেমন হল, ইন্টারোগেশনের পর মলয়দা বাড়ি চলে গিয়েছেন না রয়েছেন, জিজ্ঞেস করবে কি না ভাবছে, তার আগেই ঝিলম আবিষ্কার করল, সে প্রিন্সিপালের ঘরে। আর সেই ঘরে প্রিন্সিপ্যাল, মলয় সরকার কেউই নেই, অপেক্ষা করে আছেন এমন এক ভদ্রলোক, যাঁকে সহজেই অধ্যাপক অথবা কর্পোরেট ওয়র্ল্ডের কেউ বলে মানুষ ভুল করতে পারে।
সিভিল ড্রেসে থাকা মানুষটি হাতজোড় করে নমস্কার করলেন, "আমার নাম শাশ্বত চ্যাটার্জি। আমিই ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। আপনাকে ডেকে পাঠানোর জন্য দুঃখিত। বুঝতেই পারছেন, পেশার খাতিরে কিছু অপ্রিয় কাজ আমাদের করতে হয়... আপনি কমফর্টেবল তো?"
উলটোদিকের চেয়ারে বসতে-বসতে ঝিলম বলল, "ঠিক আছে। বলুন, কী জানতে চান।"
ভদ্রলোক নোটবুক খুললেন। চোখ বোলালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "সৈকতকে তো আপনিই প্রথম দেখতে পান?"
"হ্যাঁ।"
"ঠিক কখন, কী অবস্থায় দেখেছিলেন, যদি বলেন।"
"ক্লাস ডিজ়লভড হওয়ার পরে যখন করিডর দিয়ে হেঁটে আসছি..."
"সরি, আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছি, আপনি একাই আসছিলেন? সঙ্গে অন্য স্টুডেন্টরা ছিল না?"
"ঘণ্টা বাজতে না-বাজতেই ওরা হইহই করে বেরিয়ে যায়। জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরোতে একটু সময় তো লাগেই। তা ছাড়া ওর বাচ্চা ছেলে, বেরিয়েই ছুট লাগায়। আমি কি ওদের সঙ্গে পারি?"
"ঠিক আছে। তারপর?"
"করিডর দিয়ে হাঁটছিলাম, হঠাৎ একটা গোঙানির আওয়াজ কানে আসে। দাঁড়িয়ে পড়ি, সেভেন সি-র দরজা খোলা ছিল। মনে হল, আওয়াজটা ওদিক থেকেই আসছে।"
"ঢুকলেন?"
"হ্যাঁ। ঢুকে দেখলাম, থার্ড রো-র কোনায় দেওয়াল ঘেঁষে একটা ছেলে কাত হয়ে পড়ে আছে। জ্ঞান নেই। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে।"
"দেখে কী করলেন?"
"বাগানে কাজ করছিল মালি হরিপদ, ওকে ডাকলাম। দু'জনে মিলে ধরাধরি করে ছেলেটাকে করিডরে শোয়ালাম। মনে হল, একা ওই সিচুয়েশন আমার পক্ষে হ্যান্ডল করা সম্ভব নয়। ছুটলাম প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে। প্রিন্সিপাল ছিলেন না। সেক্রেটারি শিরিনও নয়। শুধু মলয়দাকে দেখতে পেলাম, মলয় সরকার, টিচার-ইন-চার্জ। তখনও ঘরে বসে কাজ করছিলেন। ওঁকেই সব বললাম।"
"তারপর উনি এলেন, আপনারা দু'জনে মিলে সৈকতকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেলেন, তাই তো?"
"এগজ্যাক্টলি," অফিসার তার কথাগুলোই বলে দিলেন দেখে আশ্বস্ত হল ঝিলম।
"এবারে কয়েকটা প্রশ্ন করব, ভেবেচিন্তে উত্তর দেবেন।"
গুছিয়ে বসল ঝিলম, "বলুন।"
"সৈকতের বাড়িতে সঙ্গে-সঙ্গে খবর দেওয়া হল না কেন?"
"তখন মনে হয়েছিল ওকে হসপিটালে শিফ্ট করাই প্রায়োরিটি। তা ছাড়া ট্যাক্সিতে যেতে-যেতে সেভেন সি-র ক্লাস টিচারকে কনট্যাক্ট করে যতটুকু করা সম্ভব মলয়দা করেছিলেন।"
"দ্বিতীয় প্রশ্ন, স্কুলের গায়েই হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও আপনারা দূরের নার্সিংহোমে নিয়ে গেলেন কেন?"
"কথাটা আমি তুলেওছিলাম। মলয়দা বলেছিলেন, লাগোয়া হাসপাতালটা সরকারি। অনেক সময় চিকিৎসা শুরু হতে দেরি হয়।"
"তার মানে, নার্সিং হোমে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা ছিল মলয়বাবুর, আপনার নয়?"
হাত-পা শক্ত হয়ে গেল ঝিলমের। মনে হল, এই প্রশ্নগুলো মলয়দাকেও করা হয়েছিল। দু'জনের জবাবের মধ্যে কোনও অসংগতি আছে কিনা, সেটাই অফিসার দেখতে চান।
ঝিলম বলল, "না, ডিসিশনটা ছিল কালেক্টিভ। মলয়দার কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, ঠিকই বলছেন মলয়দা। তাই রাজি হয়েছিলাম।"
"নার্সিংহোমে যখন পৌঁছলেন, কী অবস্থায় ছিল সৈকত? ওর জ্ঞান ছিল? বেঁচে ছিল সৈকত?"
ভাবতে একটু সময় নিল ঝিলম। তারপর বলল, "গাড়িতে ওঠানোর সময় ওর গোঙানির শব্দ পাচ্ছিলাম। নার্সিংহোমে যখন পৌঁছলাম গোঙানির শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। বেঁচে ছিল কি না বলতে পারব না।"
"নার্সিংহোমে কী হল?"
"সঙ্গে-সঙ্গেই ট্রলি নিয়ে দু'জন এল। সৈকতকে শুইয়ে ওরা ভিতরে চলে গেল। সঙ্গে গেলেন মলয়দা।"
"আর আপনি?"
"ট্যাক্সির ভাড়া মেটালাম।"

"দাঁড়ান-দাঁড়ান। ট্যাক্সির ভাড়া আপনি দিয়েছিলেন?"
"হ্যাঁ।"
"কত ভাড়া দিয়েছিলেন মনে আছে?"
"মিটারে আটচল্লিশ টাকা উঠেছিল। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আর ফেরত চাইনি।"
"তারপর আপনি কী করলেন?"
"সৈকতকে নিয়ে ওরা ভিতরে চলে গেল। আমি ওয়েটিং লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।"
"কতক্ষণ?"
"অনেকক্ষণ। ঠিক কতক্ষণ সময় বলতে পারব না।"
"তারপর?"
"মলয়দা এলেন অনেক পরে। মাথা নিচু, বিপর্যস্ত অবস্থা।"
"কী বললেন মিস্টার সরকার?"
"ভাল করে কথা বলতে পারছিলেন না মলয়দা। চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার চেয়ারটাতেই বসালাম ওঁকে। কোনওরকমে বললেন, "খুব খারাপ খবর ঝিলম। সৈকত ইজ় নো মোর।""

৫

স্কুল বিল্ডিংটা ভি-এর মতো। ভি-এর যেটা মাথা, সেখানেই অডিটোরিয়াম। অডিটোরিয়ামের সামনে দাঁড়ালে খেলার মাঠটা স্পষ্ট দেখা যায়। সেখান থেকেই ঝিলম বোঝার চেষ্টা করছিল অশোকের আর কতক্ষণ লাগবে।
কিছুদিন ধরেই ইতস্তত করছিল শীত। টাইমিংটা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। দিনদুই হল হাজির হয়েছে। তবে লম্বা মাঠটায় যতক্ষণ রোদ্দুর বিছানো থাকে, পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে শীত অপেক্ষা করে। ছায়াগুলো দীর্ঘ হতে শুরু করলে পাঁচিল ডিঙিয়ে এদিকে চলে আসে।
স্পোর্টসের প্রস্তুতি চলছে। হিট, জ্যাভলিন থ্রো, ডিসকাস, হাই জাম্প, ব্রড জাম্প এগুলোর হিট হয় না। দৌড়ের ইভেন্টে অনেকে নাম দেয়। তাই বেছে ফাইনালে তুলতে হয়। দৌড়েরও আবার রকমফের আছে, হান্ড্রেড মিটার, ফিফ্‌টি মিটার। এগুলো স্প্রিন্ট, আটশো, পনেরোশো এরকম লং ডিস্ট্যান্স দৌড়গুলোর এনডিওরেন্স জাজ করে।
এ সবই অবশ্য অশোকের ফান্ডা।
নাম কা ওয়াস্তে গেমটিচার একজন আছেন, বিনোদ মহাপাত্র। রিটায়ারমেন্টের দেরি নেই। অশোকটা খেলাপাগল। ওর ঘাড়ে দায় চাপিয়ে বিনোদদা আরামেই আছেন।
মাথায় টুপি অশোকই হিট-ইভেন্টগুলো সুপারভাইজ় করছিল। বিনোদ মহাপাত্র অডিটোরিয়ামের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিজের কর্তব্য সারছিলেন। ঝিলমকে দেখে এগিয়ে এলেন।
"কাউকে খুঁজছ?"
"হ্যাঁ। অশোক বলেছিল একসঙ্গে ফিরবে। ওর কি দেরি হবে?"
"মনে হয় আর-একটু সময় লাগবে। দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করে আসি।"
"না-না, আপনাকে যেতে হবে না। আমি অপেক্ষা করছি।"
ঝিলমের কথায় আমল না দিয়ে টুকটুক করে হাঁটিতে হাঁটিতে অশোকের কাছে গেলেন বিনোদদা। মাথা নামিয়ে কিছু বললেন। অশোক ঘাড় ঘুরিয়ে ঝিলমকে দেখল। তারপর হাত নেড়ে চলে যেতে বলল।
তার মানে আজকেও একসঙ্গে ফেরা হবে না।
ক'দিন আগে অশোকের বাড়ি গিয়েছিল ঝিলম। গিয়েছিল অশোকের চাপাচাপিতেই। অনেকদিন ধরেই অশোক লেগে পড়েছিল, "চলো না, আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করে আসবে। দেখো, খারাপ লাগবে না।"
সেদিন কী কারণে যেন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। আর ঝিলমেরও দক্ষিণাপনে যাওয়ার ছিল, অশোক বলতে রাজি হয়ে গেল।
অশোকের মা হাসিমুখে এগিয়ে এসে হাত ধরেছিলেন, "অশোক তো ঝিলমদিদি ঝিলমদিদি করে পাগল। কত যে কথা শুনেছি তোমার। এতদিনে দেখতে পেলাম।"
ঝিলম চোখ পাকাল, "কী বলে অশোক? খুব রাগী? সবাই ভয় পায়?"
কিশোরীর মতো মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসলেন মাসিমা, "দিদিমণি বলে কথা, একটু ডাকাবুকো না হলে চলে? তা নয়। ও তোমাকে নিজের দিদির মতোই ভালবাসে। তাই ভাবলাম, একটু আলাপ করি।"
"তা, আলাপ করে কী মনে হল?"
"দিদিমণি কোথায়? এ তো ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে!"
অশোকের মাকে খুব ভাল লেগে গেল ঝিলমের। কেউ-কেউ আছে, খুব সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারে। ঝিলম কী-কী রান্না করতে পারে দিয়ে শুরু করে টুক করে চলে গেলেন কী খেতে ভালবাসে, তাতে। তারপর নিজেই রান্নাঘরে ঢুকলেন ওর পছন্দের জিনিস বানিয়ে আনতে।
ওদিকে অশোকও গেল বাথরুমে।
ঝিলম এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে রান্নাঘরেই ঢুকে পড়ল মাসিমাকে হেল্প করতে।
এ কথা সে কথার পর গলা নামালেন অশোকের মা, "একটা কথা এই সুযোগে বলি, আমি যে বলেছি, অশোকের সঙ্গে আলোচনা কোরো না যেন।"
ঝিলম অবাক হল, "না-না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কী কথা?"
"অশোকের ইয়ে... মানে পছন্দের কেউ কি আছে? তোমাকে বলেছে কিছু?"
"না মাসিমা, এ বিষয়ে আমার সঙ্গে অশোকের কোনও আলোচনাই হয়নি।"
অশোকের মাকে অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল।
"জিজ্ঞেস করলাম বলে কিছু মনে করলে না তো মা? আসলে দেখতে-দেখতে বয়স আটত্রিশ পার হয়ে গেল। বেকার তো নয়, একটা মানুষকে ঘরে আনলে খাওয়াতে পরাতে নিশ্চয়ই পারবে। অথচ জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যায়। আমারও বয়স হচ্ছে। কখন কী হয়ে যায়, কিছু ঠিক আছে?"
"না-না, আমি কিছুই মনে করিনি। ঠিক আছে, সুযোগ পেলে আমিই কথাটা পাড়ব।"
অশোকের মায়ের কথাগুলো মাথায় ঘুরছিল। হঠাৎই পরশু কে যেন মারা গিয়েছেন, কনডোলেন্স মিটিং। পাশাপাশি বসে কথাটা পাড়ল। সরাসরি নয়, ঘুরিয়ে।
"চন্দ্রার ব্যাপারটা দেখলি?"
"কী ব্যাপার?"
"কেমন সবার চোখ এড়িয়ে মিটিং অ্যাটেন্ড না করেই কেটে পড়ল। নির্ঘাৎ বয়ফ্রেন্ডকে ফোন করে কোথাও আসতে বলেছে। সবারই কিছু না-কিছু আছে। তোরই কিছু জুটল না।"
ভেবেছিল কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবে। উলটে গম্ভীর হয়ে গেল অশোক। বলল, "তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে ঝিলমদি।"
"বলে ফেল।"
"এখন... আজ বলা যাবে না। সময় লাগবে। পরশু ফ্রি আছ?"
"পরশু তো হিট। তুই ফ্রি আছিস?"
"হিট হয়ে গেলে। তাড়াতাড়ি হিট সেরে চলো, কোথাও গিয়ে বসি। কতগুলো কথা... তেমন কাউকে পাচ্ছি না যার সঙ্গে খোলাখুলি ডিসকাস করা যায়। ওদিকে মা-ও..."
"হ্যাঁ। সেদিন আমাকেও বলছিলেন।"
"বুঝতে পেরেছি। তা হলে ওই কথাই রইল। পরশু, হিটের পর।"
আজ সেই পরশু।
বোঝা যাচ্ছে অশোকের সময় হবে না।
গুটিগুটি স্টাফরুমের দিকে এগোল ঝিলম।
লকার খুলে জিনিসপত্র বের করছে, পাশে কেউ এসে দাঁড়াল।

ঝুমা মিত্র।
"এ কী ঝুমাদি? এখনও যাওনি?"
"না রে। পরের মিটিংয়ের অ্যাজেন্ডায় কয়েকটা পয়েন্ট ঢোকানোর ছিল। সেগুলোই ফাইনালাইজ় করে..."
ঝুমা মিত্র টিচার্স রিপ্রেজ়েন্টেটিভ। আগে শিক্ষকদের প্রতিনিধি শিক্ষকরাই ঠিক করত। গতবছর এক নির্দেশনামায় স্কুল জানিয়েছে, প্রতিনিধি নির্বাচনের মতো তুচ্ছ বিষয়ে শিক্ষকরা কালক্ষেপ না করলেও চলবে। সেই থেকে ইলেক্টেড-এর বদলে সিলেক্টেড রিপ্রেজ়েন্টেটিভ। এবং তিনি শ্রীমতী ঝুমা মিত্র।
খাতার বান্ডিলটা ব্যাগে ঢোকাচ্ছিল ঝিলম, ঝুমা উঁকি মারলেন।
"তোর সেই ঝোলা ব্যাগ?"
"হ্যাঁ," হাসল ঝিলম।
"কতগুলো যেন ঝোলা ব্যাগ তোর?"
"গুনিনি। তবে যতগুলো শাড়ি, ততগুলো ব্যাগ।"
"বলিস কী?"
"না হলে চলে? একটা জাফরান রঙের শাড়ি, তার সঙ্গে কটকটে নীল একখানা ব্যাগ। মানায়? তুমিই বলো?"
"তা তো বটেই। কিন্তু হিসেব রাখিস কী করে?"
"কেন? সব ক'টা শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ়, পাশাপাশি ঝোলাব্যাগ। অসুবিধেটা কোথায়? তোমরা যে দামি দামি চামড়ার ব্যাগ ব্যবহার করো, তার একটার দামে পাঁচখানা ঝোলা হয়ে যায়। তা ছাড়া হালকা! বইতেও সুবিধে!"
"তা যা বলেছিস। তা ছাড়া, তোরা লিটারেচার পড়াস। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা, বেশ টেগোর টেগোর ব্যাপার।"
জবাব দিল না ঝিলম। ঝুমাদিদের কাছে রবীন্দ্রনাথ থাকেন না, থাকেন টেগোর।
কথা ঘোরানোর জন্য বলল, "পুরনো আমলের কমিউনিস্টদের মনে আছে? কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, হাতে কৌটো। কৌটো বাজিয়ে চাঁদা আদায়!"
"মনে আবার নেই? গালভর্তি দাড়ি, হাওয়াই চপ্পল, গায়ে ঘামের গন্ধ! দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বললে যাওয়ার পর রুম ফ্রেশনার স্প্রে করতে হত।"
গেট পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল দু'জনে।
ঝিলম বলল, "ঠিক আছে, আমি এগোই। তোমার তো বেহালা। আমার আবার অন্য দিক।"
ঝুমা মিত্র হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "বাড়ি ফিরবি তো? জে ইউ-তে একটা প্রোগ্রাম আছে তোর দাদার। রাস্তায় তোকে ড্রপ করে যাব।"
ঝুমা মিত্রর পাশে হাঁটতে-হাঁটতে ঝিলম ভাবছিল, বামপন্থী আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে ঝিলম। কখনও কি করেছে ঝুমাদির মতো মানুষদের অ্যাসেসমেন্ট?
গাড়িতে যেতে-যেতে কলকাতাকে দেখছিল ঝিলম। শীতের বিকেল। ঝুপ করে সন্ধে নামে। শপিং মল, ঝলমলে শোরুম। বারাঙ্গনাদের মতো ডাকাডাকি করছে। এই পর্যন্ত ভেবেই নিজেকে চোখ ঠারল। ভাবনাটা মেল শভিনিস্টদের মতো হয়ে গেল না তো?
ঝুমাদিকে আড়চোখে দেখল।
কার ভাগ্য কাকে কোন দিকে নিয়ে যায়!
ঝুমা বিশ্বাস মাঝারি মানের ছাত্রী। পড়তে-পড়তেই ক্লাসমেটের সঙ্গে প্রেম, বিবাহ। বিয়ের পরেই দু'জনে চলে গেলেন সেই দেশে, যেখানে একবার গেলে কেউ ফিরতে চায় না।
ঝুমা ফিরে এসেছিলেন।
এসেছিলেন, কেননা ততদিনে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে এবং ঝুমার ততখানি যোগ্যতা ছিল না, যা দিয়ে ওদেশে একটা সম্মানজনক সংস্থান জোগাড় করা যায়।
ফিরে এসে ফেলে যাওয়া রিসার্চের কাজটা শুরু করেছিলেন। গাইড সুবর্ণকমল মিত্র।
সুবর্ণকমল তখনই একটা ফেনোমেনন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁর অধীনে পিএইচডি করার জন্য হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। অত তাড়াতাড়ি কী কৌশলে ঝুমা বিশ্বাস সুবর্ণকমলের অধীনে রেজিস্ট্রেশন করাতে পারলেন, তা নিয়ে যখন তুমুল গবেষণা, তখনই কয়েকটা ঘটনা ঘটল। সুবর্ণকমল বিবাহিত ছিলেন। স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনলেন। স্ত্রী ডিভোর্স দিলেন না। হঠাৎই দিঘার সমুদ্রসৈকতে সুবর্ণকমলের স্ত্রী ডুবে মারা গেলেন।
অভিযোগ এল। তদন্তও হল। ঘটনার সময় সুবর্ণকমল জুরিখে আন্তর্জাতিক কোনও সেমিনারে ভাষণ দিচ্ছিলেন। স্ট্রং অ্যালিবাই তাঁকে বাঁচিয়ে দিল।
তারপর তো সময়ের অপেক্ষা। ঝুমা বিশ্বাসের ঝুমা মিত্র হয়ে ওঠা। তবে লোকজন অপেক্ষা করছিল দেখার জন্য, ঝুমা মিত্রর ডক্টরেট পেতে কতদিন লাগে।
ডক্টরেট আর পাওয়া হয়ে ওঠেনি ঝুমার। ডক্টর সুবর্ণকমল মিত্রর স্ত্রী ঝুমা মিত্র অ-ডক্টরেটই থেকে গেলেন। অবশ্য তাতে যে খুব অসুবিধে হয়েছে বলা যাবে না। রিটায়ারমেন্টের আগেই অধ্যাপক মিত্র ডাক পেলেন পাশের একটি রাজ্য থেকে। নতুন তৈরি হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানেই উপাচার্য হওয়ার আহ্বান।
আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ডক্টর মিত্র।
সমস্যা হল একটাই, সারা জীবন অধ্যাপনা করেছেন, রিসার্চ এবং পড়ানো, এই দুটো কাজে খামতি দেননি। কিন্তু উপাচার্য তো শুধু অধ্যাপক কিংবা গাইড নন। এক গন্ধমাদন পাহাড় তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হল, যার নাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সেটা কে সামলাবে?
এগিয়ে গেলেন ঝুমা মিত্র।
উইকএন্ডে ঝুমা স্বামী-সন্নিধানে যাত্রা করতেন। সারা সপ্তাহের ফাইল ডাঁই হয়ে থাকত। ঝুমা গেলে তাঁর পরামর্শমতো সেগুলিতে মতামত দিতেন ডক্টর মিত্র। সোজা ভাষায়, উপাচার্যের কাজটা বকলমে চালাতেন শ্রীমতী মিত্র। কেমন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতেন ঝুমা? চূড়ান্ত কন্ট্রোভার্সির মধ্যে সুবর্ণকমলকে উপাচার্যের পদ ছেড়ে আসতে হল।
আর্থিক অনিয়মের তদন্ত করতে কমিশন বসে। দেখা যায়, টেন্ডার ছাড়াই একের পর-এক কাজের বরাত পেয়ে গিয়েছে একটিই কোম্পানি, যার নাম 'বিশ্বাস এন্ড অ্যাসোসিয়েটস'। নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম। অ্যাডভারটাইজ়মেন্ট হয়নি, অথচ নিয়োগ হয়েছে বিভিন্ন দফতরে। সেখানেও আঙুল ওঠে উপাচার্যের দিকে। শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও যেসব ব্যক্তি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন, কোনও না-কোনও সূত্রে তাঁরা ঝুমা বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমস্ত তদন্তের মতো এই তদন্তটিরও কালের গতিতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছিল। ততদিনে ঝুমা ও সুবর্ণকমল চৌরাস্তায় তাঁদের নতুন কেনা ফ্ল্যাটে উঠে এসেছেন।
"সেদিন পুলিশ খুব ডিস্টার্ব করেনি তো?"
অতীত থেকে বর্তমানে আছড়ে পড়ল ঝিলম। দেখল, পাশের সিট থেকে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ঝুমা। চোখে গভীর আগ্রহ।
"না," দায় এড়ানো জবাব দিল ঝিলম।
"কী জিজ্ঞেস করল?"
এবারে সতর্ক হল ঝিলম। তাকে পুলিশ কী জিজ্ঞেস করল তা জেনে ঝুমা মিত্রর কী লাভ?
ঝুমা মিত্র টিচার্স রিপ্রেজ়েন্টেটিভ। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে তাঁর নিত্য ওঠা-বসা। এতজন শিক্ষকের মধ্য থেকে তাঁকে নির্বাচন করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এমনিই? কোনও কারণ ছাড়া?
ঝিলমের এও মনে হল, তার কাছে আসা, ঝোলাব্যাগ নিয়ে গল্প ফাঁদা, লিফট দেওয়া, এর পুরোটাই ছক। আসলে ঝিলমের কাছ থেকে জেনে নেওয়া, সেদিন ঠিক কী-কী প্রশ্ন পুলিশ করেছিল এবং ঝিলম তার উত্তরে কী-কী জবাব দিয়েছে।

"তেমন কিছু নয়," ঝুমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দিল ঝিলম।
"বলিস কী? একটা ছেলে স্কুলের মধ্যে বেঘোরে মারা গেল আর পুলিশ কিছু জানতে চাইল না?"
"সৈকত তো স্কুলের মধ্যে মারা যায়নি। যখন ওকে আমরা ট্যাক্সিতে তুলি, তখনও ওর দেহে প্রাণ ছিল।"
"ও-ই হল। মারা গিয়েছিল সেটা তো আর মিথ্যে নয়। পুলিশ জানতে চাইল না, কী পরিস্থিতিতে মারা গেল? কারা-কারা রেসপনসিবল? কোনও ফাউল প্লে আছে কি না?"
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঝিলম।
সামনের সিগনালটা অনেকক্ষণ লাল ছিল। এবার সবুজ হল। গাড়িগুলো নড়তে শুরু করল।
"না গো, এসব কিছুই জানতে চায়নি। যে-অফিসার এসেছিলেন, সত্যিই ডিসেন্ট। ...আমি এসে গেলাম। সিগনাল পার করে ধার ঘেঁষে দাঁড় করাতে বলো ড্রাইভারকে। ...হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ফর দ্য লিফ্ট। আর দাদাকে বোলো, অনেকদিন দেখা হয় না ...একবার সময় করে..."
পিছনের গাড়িগুলো হর্ন দিচ্ছিল। নেমে হাত নাড়ল ঝিলম। ঝুমা মিত্রর মুখটা ভাল করে দেখতে পেল না।

৬

স্বপ্না আর অমিতাভর রিলেশনটা ফার্স্ট ইয়ারেই সেটল করে গিয়েছিল। তখন অবশ্য স্বপ্নাকে দেখে ঈর্ষাই হত ঝিলমদের। সবাই যখন বই আর নোটের ভারে কেতরে-কেতরে হাঁটছে, স্বপ্নার তখন বওয়ার জন্য একজন তো আছেই, অমিতাভ!
বিশাখাটা বিশ্বফাজিল। বলেছিল, "রোজ বিকেলে সবাই যখন কফি-হাউসে আড্ডা মারতে যায়, অমিতাভ যায় বৌবাজার ব্যায়াম সমিতিতে।"
"কেন, কেন?"
বিশাখা জবাব দিয়েছিল, "কাঁধের মাস্‌লের স্ট্রেংথ বাড়ানোর জন্য। এম এ-তে আরও বেশি বই, আরও নোট্‌স। কাঁধের জোর না বাড়ালে চলে?"
ওরা বিয়েটাও করেছিল তাড়াতাড়ি। পড়তে-পড়তেই কিংবা জাস্ট পাস করে।
বিশাখারা এখন দুবাইয়ে সেটলড। আর ফিরবে না। মাঝে-মাঝে মধ্যরাতে ঝিলমকে ফোন করে, "তুই কি স্মার্টফোন নিবিই না ঠিক করেছিস?"
চুপ করে থাকে ঝিলম। জবাব দেয় না। জানে, তার জবাবটায় বিশাখা সন্তুষ্ট হবে না।
"আজকাল স্মার্টফোন ছাড়াও ইন্টারনেট কানেকশন নেওয়া যায়। সেটা অন্তত নে।"
"আছে তো।"
"আছে?" বিশাখার লাফিয়ে ওঠার শব্দ এতদূর থেকেও শুনতে পেল ঝিলম।
"আছে, তবে আমার নয়, সোমনাথের।"
"তুই না... কী বলব... একটা যাচ্ছেতাই! একটা হোয়াট্‌সঅ্যাপ করব তারও জো নেই!"
"কী জন্য ফোন করেছিস এবার বল।"

পাতাজোড়া ছবি। একটি নারীদেহ। গায়ে সুতোটা পর্যন্ত নেই। বিশেষ-বিশেষ অংশ হাইলাইটার দিয়ে দাগানো। নীচে ক্যাপশন 'কুমকুম ম্যাম'।



"বলছি। স্বপ্না আর অমিতাভকে মনে আছে তোর?"
"মনে থাকবে না? সেই বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি," খিলখিল করে হাসল বিশাখা।
"যা বলেছিস। সারাটা জীবন বেচারা স্বপ্নার ব্যাগ বয়েই কাটাল! ভাগ্য করে এসেছিল বটে স্বপ্নাটা!"
ঝিলম রেসপন্ড করল না। ভাগ্যের ডেফিনিশন এক-একজনের কাছে এক-একরকম।
বিশাখা এবারে ভাঙল, "স্বপ্নারা পাশ করেই বিয়ে করেছিল মনে আছে? তাড়াতাড়িই মা হয়েছিল স্বপ্না। ওদের মেয়ের এনগেজমেন্ট।"
"বলিস কী? আমরা এত বুড়ি হয়ে গেলাম? স্বপ্নার মেয়ের বাচ্চা হলে সে তো দিদিমা বলে ডাকবে!"
"ওই জন্যেই তো আমরা ওধার দিয়ে যাইনি।"
চুপ করে গেল ঝিলম। বিশাখার দু'বার মিসক্যারেজের পর আর বাচ্চা হয়নি। এটা ওর দুঃখের জায়গা। এই যে সমীরণ আর ও দুবাইতেই সেট্‌ল করল, তার একটা কারণ হয়তো ওটাই। কিন্তু বিশাখার যা ক্যারেক্টার, নিজের দুঃখ নিয়েও মশকরা করতে ছাড়ে না।
"তোকে কে বলল, স্বপ্না?"
"হ্যাঁ। ওকে মাঝে-মাঝে হোয়াটসঅ্যাপ করি। ফেসবুকেও আছি আমরা। ওর মেয়ে পাশ করেই চাকরিতে জয়েন করেছে। মা-র মতো ও-ও বিয়ে করছে ওর ছোটবেলার বন্ধুকে।"
ঝিলম জবাব দিল না। স্বপ্না-অমিতাভ, ওদের সঙ্গে দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা আছে ঝিলমদের। ঝিলমের আগেই খবরটা বিশাখাকে জানিয়েছে, হতে পারে ঝিলম তো সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই, জানানোর সুযোগ হয়নি। তা ছাড়া আজকাল সবাই নিজের-নিজের বৃত্তে এতখানিই আটকে, যোগাযোগটা জোর করে না রাখলে আর থাকছেই না।
বিশাখা বোধ হয় বুঝতে পারল। বলল, "তুই তো ফেসবুক-টেসবুক করিস না। তাই জানিয়ে উঠতে পারেনি। দেখিস, ঠিকই খবর দেবে।"
ঝিলম জানতে চেয়েছিল, "তুই... তোরা আসছিস?"
"সমীরণ যাবে কি না জানি না। আমি তো এই সময়টা বাবা-মাকে দেখতে একবার কলকাতায় যাই-ই। ভাবছি, অ্যাটেন্ড করেই আসব।"
"গিফ্‌ট কিনেছিস?"
"কিনব। এখনও হয়ে ওঠেনি।"
"শুনেছি দুবাইয়ে সোনা সস্তা। সোনার কিছু দিবি?"
"দেখা যাক। তবে মেয়েকে কী দেব ডিসাইড না করলেও, মেয়ের বাবা-মা'র জন্য গিফট ঠিক করে রেখেছে সমীরণ।"
"কী গিফ্‌ট?"
"আমাদের ব্যাচের টর্চ বিয়ারার হওয়ার জন্য স্বপ্না আর অমিতাভকে দেবে এক প্যাকেট ভায়াগ্রা।"
ঝিলম জবাব দেয়নি।
বিশাখা হাসতে-হাসতে বলেছিল, "তুই কিন্তু ব্লাশ করছিস।"
"তোর ফোনে দেখাও যায়?"
"আলবত যায়। যখন যাব, দেখাব।'
স্বপ্না-অমিতাভ শেষপর্যন্ত এসেছিল। ফর্মালি নেমন্তন্নও করেছিল। তবু ঝিলম ভিতর থেকে উৎসাহ পাচ্ছিল না। সোমনাথ একরকম

জোর করেই নিয়ে গেল, "একা-একা ব্রুড করার চেয়ে, লোকজনের মধ্যে গেলে ভাল লাগবে।"

তা ছাড়া বিশাখা আসছে, দেখা করার একটা আগ্রহ ছিলই।

এনগেজমেন্ট সকালে হয়ে গিয়েছে। এখন মূলত আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব। বাইরের বড় ঘরটায় বন্ধুরা। ভিতরে দুটো ঘর মিলিয়ে আত্মীয়। খাওয়াদাওয়ার আয়োজন ছাদে। গিয়ে প্রথমেই ঝিলম যেটা আবিষ্কার করল, বিশাখা ছাড়া অন্য বন্ধুরা কেউই আসেনি। স্বপ্নার কলিগ, অমিতাভর সহকর্মী, তারাই ভিড় করে আছে। বাইরের ঘরটায় নড়াচড়ারও জায়গা কম।

সবচেয়ে যেটা সমস্যা, সবারই হাতে-হাতে ঘুরছে রঙিন পানীয়। সোমনাথ অভ্যস্ত। সেও একটা গ্লাস নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। স্বপ্না একবার এল। জিজ্ঞেস করল, "নিবি নাকি একটা ব্লাডি মেরি?"

বিশাখা কাছেই ছিল। ওর হাতেও গ্লাস। আঁচল সামলিয়ে চোখ টিপে বলল, "কী যে বলিস? ও ভদকা ছাড়া কিচ্ছু খায়ই না।"

পায়ে-পায়ে ক্রাউডটাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকল ঝিলম। আর ভিতরে ঢুকেই চমকে উঠল।

টুলুপিসি!

এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল, "টুলুপিসি তুমি?"

"ঝিলম না?"

হাত ধরে পাশে বসাল টুলুপিসি, "বোস, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

টুলুপিসির পাশে বসে অনেক বছর পিছিয়ে যাচ্ছিল ঝিলম। এইরকমই একটা অনুষ্ঠানে টুলুপিসির সঙ্গে প্রথম দেখা। ঝিলমকে দেখে এইভাবেই হাত ধরে পাশে বসিয়েছিল পিসি। তারপর কথায়-কথায় জেনে নিয়েছিল বাবার নাম, পরিচয়, ঠিকানা, ফোন নম্বর। কেন, তখন বুঝতে পারেনি। পারল, যখন সোমনাথদের বাড়ি থেকে যোগাযোগ করা হল। ওদের গুরুজনরা ঘুরে গেলেন। পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তরাঁয় মুখোমুখি বসে বোকা-বোকা ক'টা প্রশ্নের জবাবও দিতে হল। কোনও পক্ষেরই আপত্তি ছিল না। চারহাত এক হয়ে গেল।

"কী কথা পিসি, বললে না তো?"

"কী শুরু করেছিস তোরা?"

অবাক হয়ে গেল ঝিলম, "আমরা? কী আবার শুরু করলাম?"

"একটা একরত্তি ছেলে ইশকুলে গিয়ে মরে পড়ে রইল, কেউ খোঁজ পর্যন্ত নিল না?"

কান গরম হয়ে গেল ঝিলমের। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, অনেকেই ঘুরে তাকাচ্ছে। বলতে নেই, জনসভায় টুলুপিসি মাইক ছাড়াই দিব্যি চালিয়ে দিতে পারবে।

"খোঁজ না নিলে হাসপাতালে নিয়েটা গেল কে?"

"হাসপাতালে তো নিয়ে গিয়েছে একটা মৃতদেহ। ডেডবডি। ততক্ষণে সব শেষ।"

"বাজে কথা। নিয়ে যাওয়ার সময়ও ওর প্রাণ ছিল। হাসপাতালে পৌঁছনোর পর ওকে ডেড ডিক্লেয়ার করা হয়।"

"ওসব সাজানো ব্যাপার। স্কুলের সঙ্গে সাঁট আছে নার্সিংহোমের। ওই জন্যেই তো গায়ের কাছে হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ছেলেটাকে।"

"ঠিক নয় পিসি। হাসপাতালে রোগীর ভিড়। অ্যাটেনশন দিতেই দেরি হয়ে যেত। আমি ছিলাম সৈকতের সঙ্গে। আমার কোলে মাথা দিয়েই সৈকত গিয়েছে পুরোটা রাস্তা। আমারও মনে হয়েছিল, ওকে নার্সিংহোমেই নিয়ে যাওয়া উচিত।"

"জানি তো। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সবাই জনে-জনে জিজ্ঞেস করেছে, এ-ই তোমাদের ঝিলম না? এর কথাই তুমি সাতকাহন করে বলতে? লজ্জা! লজ্জা!"

চোখে জল এসে যাচ্ছিল ঝিলমের। মনে হচ্ছিল সবাই টুলুপিসির কানে যতখানি বিষ ঢেলেছে, পুরোটা না ওগরানো পর্যন্ত পিসির শান্তি নেই।

"ইশকুলগুলো শুরু করেছে কী? একটা দুধের শিশু, স্কুলে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাড়িতে জানানো পর্যন্ত হল না? বিনা চিকিৎসা পড়ে রইল! হাসপাতালে যখন নিয়ে যাওয়া হল, সব শেষ! এরা মানুষ, না পশু?"

"ভুল পিসি। সৈকত যে অসুস্থ, সেটা জানা গিয়েছে স্কুল ছুটির পর। আমিই ওকে দেখতে পাই। সেই অবস্থায় বাড়িতে জানানোটা জরুরি ছিল, নাকি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া? তা ছাড়া বাড়িতে জানানো তো হয়েছিল।"

"কখন হয়েছিল? না, যখন সব শেষ। লোকে ভরসা করে ইশকুলে পাঠায় বাচ্চাকে। কী, না ইশকুল দেখভাল করবে। দেখভালের নামে ঘণ্টা। কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা গুনে নিয়েই ওদের কম্মো শেষ। ভর্তির জন্য ডোনেশন। বছর-বছর ফি বাড়ানো। ড্রেস কেনার টাকা। বই কেনার টাকা। অথচ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সামান্য চিকিৎসাটাও পাবে না? এদের ধরে-ধরে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানো উচিত।"

ঝিলম দেখল পিসির গলা শুনে গুটিগুটি অনেকেই ভিড় করছে। পিছনে সোমনাথের মুখও দেখা গেল।

কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল ঝিলম, এক দাবড়ানিতে তাকে থামিয়ে দিল টুলুপিসি।

"আগে ইশকুল ছিল মানুষ গড়ার আখড়া, আর শিক্ষকরা তার কারিগর। এখন? টাকা পেষার যন্ত্র।"

আর থাকতে পারল না ঝিলম। বলল, "টাকা টাকা করছ, জানো এক-একজন টিচার কত মাইনে পায়? নতুন নতুন ছেলেমেয়ে, ভাল কোয়ালিফিকেশন, সবে জয়েন করেছে, স্কেল এ মাইনে পায় না। মাস গেলে কত হাতে পায় জানো? জিজ্ঞেস করো তোমার ভাইপোকে। ওদের অফিসের লিফটম্যানও তার চেয়ে বেশি মাইনে পায়।"

"রাখ তোর মাইনে। স্কুলের মাইনেটা তো হাতখরচ। আসল রোজগার তো টিউশনি। স্কুলগুলো হচ্ছে ছাত্র-শিকারের জায়গা। বঁড়শিতে গেঁথে কোচিং সেন্টারে নিয়ে ফেলো। তারপর যতটা পারো দুয়ে নাও।"

"সবাই তাই?"

"সব্বাই, কেউ বাদ নেই। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়," শব্দ করে উঠে পড়ল টুলুপিসি।

"যাই, রাত হচ্ছে। দেরি হয়ে গেলে আবার ড্রাইভার মুখ করবে।"

গাড়িতে উঠে ভেঙে পড়ল ঝিলম, "ওই জন্যেই আসতে চাইনি।"

সোমনাথ জবাব দিচ্ছিল না। আজ ড্রাইভারকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ড্রাইভ করছিল সোমনাথই। আজকাল হেলমেটহীন বাইকআরোহী এত উপদ্রব, একচুল অন্যমনস্ক হলেই অ্যাক্সিডেন্ট। আর অ্যাক্সিডেন্ট হলে যত দোষ গাড়ির চালকের। গাড়ি থামিয়ে বের করে উত্তমমধ্যম। তাই গাড়ি চালানোর সময় খুব সতর্ক থাকে সোমনাথ।

"কী হল? কিছু বলছ না যে!"

"তুমিও ওভার-রিঅ্যাক্ট করছিলে ঝিল। পিসির বয়স হয়েছে। কথা শুরু করলে থামতে পারে না। জবাব না দিলে পিসি নিজে থেকেই চুপ করে যেত।"

"তার মানে আমারই দোষ, তাই তো! তুমিও পিসির দলে!"

"আমরা কেউ কারও দলে নই ঝিল। তবে মনে হয় সময় এসেছে কোনও একটা দলে নাম লেখানোর। নইলে, বিপদে পড়লে পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকবে না।"

৭

স্টাফরুমের এককোনায় খাবার জায়গায় জটলা করছিল তিনজনে। রুটিটা ঝিলমই আনে। আসলে ঝিলমের রান্নার লোক অসম্ভব ভাল রুটি বানায়। যেমন নরম, তেমনই পাতলা। অন্যরা পালা করে আনে একটা-দুটো পদ।
আজ চিংড়িমাছ দিয়ে লাউয়ের তরকারি এনেছে কুমকুম। স্বাতী এনেছে ভাজা পিঁয়াজ শুকনো লঙ্কা মেশানো আলুসেদ্ধ। এক চামচ মুখে দিয়ে চোখ বন্ধ করে টেস্ট করছিল ঝিলম, দেখতে পায়নি, গলার আওয়াজে চোখ খুলল।
"কী মেনু রে আজ তোদের?" গলার স্বরটা বাইশ বছরে নামিয়ে এনেছেন ঝুমা মিত্র।
কথা না বাড়িয়ে বাটি দু'খানা সামনে এগিয়ে দিল ঝিলম। ঝুমাও অম্লানবদনে দু'খানা রুটি, লাউয়ের তরকারি আর আলুসেদ্ধ তুলে খেতে-খেতে বললেন, "আলুর প্রিপারেশনটা তো জম্পেস হয়েছে। কার বানানো?"
ওরা জবাব দিল না। আসলে জবাবের প্রত্যাশা করে প্রশ্নটা করেনওনি ঝুমা। যে-কারও টিফিনে ভাগ বসানো ওঁর বার্থরাইট। খাওয়া যখন শেষপর্যায়ে, হন্তদন্ত হয়ে টিচার্সরুমে ঢুকল চিরন্তন।
"কী খবর চিরন্তনবাবু? মুখ অন্ধকার কেন?"
ঝিলমের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে টেবিলের উপর একটা খাতা খুলে মেলে ধরল চিরন্তন।
সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পাতাজোড়া ছবি। একটি নারীদেহ। গায়ে সুতোটা পর্যন্ত নেই। বিশেষ-বিশেষ অংশ হাইলাইটার দিয়ে দাগানো। নীচে ক্যাপশন 'কুমকুম ম্যাম'।
সবার আগে কুমকুমই রিঅ্যাক্ট করল, "কী দারুণ এঁকেছে রে! ড্রয়িং সেন্স আছে। কোন ক্লাস? কী নাম?"
"তুই হাসছিস?" রেগে গেল চিরন্তন।
"হাসব না তো কী? পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসব?"
"একটা ক্লাস সিক্সের ছেলে খাতায় এই সব এঁকেছে আর তুই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিস?"
চিরন্তনকে দৃশ্যতই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। মুখ লাল। মনে হচ্ছিল কুমকুম নয়, তারই একটা নগ্ন ছবি এঁকেছে ছেলেটা।
"কী নাম ছেলেটার? কোন সেকশন? ক্লাসটিচার কে?" ঝুমা মিত্র এতক্ষণ চুপ করে সব দেখছিলেন। এবারে তাঁর একগুচ্ছ প্রশ্নের মুখোমুখি হল চিরন্তন।
"অত্রি। অত্রি চ্যাটার্জি। সিক্স। ক্লাস-টিচার... মনে হয় শুভদীপ।"
"বাড়তে দিও না চিরন্তন। এখনই না-আটকালে এই ছেলেই একদিন পাশের বাড়ির মেয়েকে রেপ করবে। পেরেন্টসদের ডেকে পাঠাও।"
"সেটাই তো। সেই জন্যেই খাতাটা নিয়ে এসেছি। প্রিন্সিপালকে দেখাব। আর চিঠিও একটা..."
"পাঠানো হয়ে গিয়েছে?" ঝিলম জিজ্ঞেস করল।
"এখনও হয়নি। তা ছাড়া চিঠির কনটেন্ট কী হবে... প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞেস না করে ঠিক... তোমাদেরও যদি কোনও সাজেশন থাকে..."
বলতে-বলতেই দরজার কাছে শুভদীপকে দেখে লাফিয়ে উঠল চিরন্তন, "ওই তো শুভ। আয়, দেখে যা তোর স্টুডেন্টের কাণ্ড।"
শুভদীপ ঘরে ঢুকল, "কী হয়েছে?"
ঝুমা মিত্র এগিয়ে গেলেন, "অত্রি চ্যাটার্জি, তোমার সেকশনের স্টুডেন্ট। চেনো?"
"কেন চিনব না? ভেরি শার্প। কিন্তু ওয়েওয়ার্ড। আসলে বাড়িতে সমস্যা আছে। বাবা-মা সেপারেটেড। কেন, কী করেছে অত্রি?"
ছবিটা শুভদীপের দিকে বাড়িয়ে দিলেন ঝুমা।
ছবিতে একবার চোখ বুলিয়েই হো হো করে হেসে উঠল শুভদীপ।
"তুইও হাসছিস?"
"হাসব না? ওই বয়সে তুইও ওইরকমই ভাবতিস। এলেম ছিল না বলে ছবি আঁকতে পারিসনি। দে, খাতাটা দে, আমি পাতাটা ছিঁড়ে ফেলছি।"
শুভদীপ হাত দেওয়ার আগেই ছোঁ মেরে খাতাটা তুলে নিলেন ঝুমা, "মোটেও না। এসব জিনিস লাইটলি নিতে নেই। কমপ্লেন একটা হওয়া দরকার," খাতাখানা বগলে নিয়ে গটগট করে হাঁটা দিলেন ঝুমা।
হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল শুভদীপ। চিরন্তনের দিকে ফিরে বলল, "এসব কী হচ্ছে? এর পর কি পেরেন্টসদের ডেকে পাঠানো হবে?"
"আমার তো মনে হয় সেটাই উচিত," গম্ভীর গলায় চিরন্তন জবাব দিল।
"ক্লাসটিচার হিসেবে আমি কিন্তু অপোজ় করব।"
"ছেলেটাকে কোনও পানিশমেন্ট দিয়েছিস?" ঝিলম জানতে চাইল।
"সময় পাইনি। ক্লাসের ছেলেরা কাড়াকাড়ি করে ছবিটা দেখছিল। উঠে গিয়ে দেখে তো আমি স্তম্ভিত! তাড়াতাড়ি খাতাটা নিয়ে আমি স্টাফরুমে চলে এলাম।"
"ভাল করেছিস, রাগের মাথায় কিছু করে বসিসনি। এমনিতেই ডিস্টার্বড চাইলহুড। শাস্তি দিলে ওই বয়সের ছেলে কীভাবে নেয়, বলা তো যায় না। আমি শুভদীপের সঙ্গে একমত। ব্যাপারটাকে লাইটলি নেওয়াই ভাল।"
শুভদীপ চলে গেল।
চিরন্তনও "দেখি আবার প্রিন্সিপাল কী বলেন," বলে স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে গেল।
এখন শুধু ঝিলম, স্বাতী আর কুমকুম। খাওয়াটাও চটকে গিয়েছে। খেতে হয় তাই মুখ নামিয়ে খাচ্ছিল।
আড়চোখে কুমকুমের দিকে তাকাল ঝিলম। সোমনাথও সেদিন বলেছিল, ঝিলম নাকি ওভার-রিঅ্যাক্ট করেছে। হয়তো-বা। যে করে, সে তো আর ভেবে করে না। আজ চিরন্তনও কি ওভার-রিঅ্যাক্ট করেনি?
কিন্তু কেন?
তা হলে, গত ক'দিন ধরেই ঝিলম যেটা আন্দাজ করছে, সেটাই কি ঠিক?
বেসিনে টিফিনকৌটো ধুচ্ছিল কুমকুম। ঝিলম পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ট্যাপ ঘুরিয়ে জলের ফ্লো কমিয়ে দিল কুমকুম।
"মাথাটা একদম গেছে।"
"কার?" ঝিলম যেন বুঝতে পারেনি।
"কার আবার? চিরন্তনের।"
"মাথাখারাপের কী দেখলি?"
"মাথাখারাপ না হলে কেউ ওরকম করে? ভাগ্যিস বারণ করলে! নইলে আর-একটু হলেই ঝুমাদির কথায় নেচে পেরেন্টসদের ডেকে পাঠাত। আর আমার কথা তো..."
কুমকুমের চোখ থেকে চোখ সরাল না ঝিলম, "কী বলছিলি বল। তোর কথা..."
পিছলে কৌটোর ঢাকনাটা হাত থেকে বেসিনে পড়ে গেল। কুড়িয়ে আবার সাবান ঘষতে লাগল কুমকুম।
"বললি না, তোর কথা শুনলে কী করত চিরন্তন?"
"বলার আর কী আছে? দেখতেই তো পেলে। একটা ক্লাস সিক্সের ছেলে ছবি এঁকেছে। তাই নিয়ে কী পাগলামোটাই না করল! আমার দোষ কী? না ছবিটা দেখে আমি হেসে ফেলেছি। কেমন তেড়ে এল দেখলে না? যেন আমাকে মডেল করে ছবি এঁকেছে।"
"ওর মাথাটা খারাপ করল কে, সেটা ভেবে দেখেছিস?"
শক্ত হয়ে গেল কুমকুমের চোয়াল। ঝিলমের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। বাটিগুলো মুছে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ইচ্ছে করেই কথা ঘোরানোর জন্য বলল, "তোমার কি ফিফ্থ

পিরিয়ড অফ আছে?"

"না, কেন?"

"আমার সেই এইট এ। তিনতলায়। এখনই ঘণ্টা পড়বে। চললাম।"

ঝিলমের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যই যে কথাগুলো বলা, বুঝতে অসুবিধে হল না।

ছুটির সময় গেটের কাছে ধরল, "আজ আমার গাড়ি আছে। চল, তোকে নামিয়ে দিই।"

সোমনাথ অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছে। অফিস থাকলে সোমনাথই গাড়িটা রাখে। আজ ঝিলম ব্যবহার করতে পারছে। ভেবেছিল, কুমকুম কাটিয়ে দেবে। দিল না। আসলে এই সময় সকলেই ক্লান্ত থাকে। লিফট পেলে 'না' করে না।

গাড়িতে উঠে ঝিলমই শুরু করল, "কেমন আছে সন্দীপ? দেখানো হয়েছে?"

"হ্যাঁ, নিউরোলজিস্ট দেখেছেন।"

কুমকুমের হাজব্যান্ড সন্দীপ একসময় ফুটবল খেলত। গোলকিপার। ন্যাশনাল খেলেছে। ঘরভর্তি কাপ-মেডেল। খেলার সুবাদেই চাকরি। লম্বা পেটানো চেহারা। হাসিটাও চমৎকার। কিছুদিন হল সন্দীপের পা দু'খানা শুকিয়ে যাচ্ছে। আজকাল সাপোর্ট ছাড়া দাঁড়াতেও পারে না। অথচ ডাক্তার-বদ্যির ব্যাপারে ওর ভীষণ অনীহা। বলে, "কী হবে দেখিয়ে?"

"কী বললেন নিউরোলজিস্ট?"

"কিছু টেস্ট লিখে দিলেন। দামি-দামি ইনভেস্টিগেশন। বললেন, সম্ভব হলে বেঙ্গালুরু নিয়ে যেতে। সেখানে নাকি নার্ভের ভাল সেন্টার আছে।"

"হ্যাঁ তো! এখনই চলে যা। রোগ ফেলে রাখতে নেই।"

"কী করে যাই বলো তো? ও রেলে কাজ করে। সেখান থেকে রেফার করাতে হবে। নইলে একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না। যে-ক'টা দিন থাকব না, তিতলিকে কোথাও রাখার বন্দোবস্ত করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, যাকে নিয়ে যাব, তাকে রাজি হতে হবে। অনেক বলে-কয়ে এটুকু করানো গেছে। এর পর বেঙ্গালুরু।"

"বলিস তো আমি গিয়ে সন্দীপের সঙ্গে কথা বলব। নিমহ্যান্স ভাল জায়গা। আমার পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই দেখিয়েছে।"

"ও আর ভাল হবে না ঝিলমদি।"

চমকে কুমকুমের দিকে তাকাল ঝিলম। দেখল, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্নাটাকে ফেরত পাঠাচ্ছে কুমকুম।

"কী বলছিস আবোলতাবোল? আজকাল মেডিক্যাল সায়েন্সের কত উন্নতি হয়েছে। দেখিয়ে আয়। ঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করলে ঠিকই সেরে যাবে।"

কুমকুম বাইরে তাকিয়ে রইল। ওর চশমার কাচে পিছলে যাচ্ছে লাস্যময়ী কলকাতা। চশমার ওপারে চোখ। সেখানে টলটল করছে অশ্রুবিন্দু।

"ডাক্তার আমাকে আড়ালে বলেছেন। অসুখটা প্রোগ্রেসিভ। সারার সম্ভাবনা কম। ও-ও সেটা বুঝতে পারে। তা ছাড়া অন্য কিছু অসুবিধেও হচ্ছে ওর।"

ঝিলম কুমকুমের দিক থেকে চোখ সরাল না।

কুমকুম বলল, "ও ফিজিক্যালি ইনকেপেবল হয়ে গেছে। আমি কী মিন করছি বুঝতে পারছ? পারে না বলে আমার ওপর চোটপাট করে। আমি নাকি কো-অপারেট করছি না। কত চেষ্টা করি। ওর কিছুই হয় না। আর ততই রেগে যায় ও। এখন গায়ে হাত তোলাও শুরু করেছে।... আমি আর পারছি না ঝিলমদি।"

গাড়ি চালায় যে ছেলেটা, দীপক, বছর ছাব্বিশ বয়স। ও কি শুনছে এসব? আড়চোখে একবার ওর দিকে তাকাল ঝিলম।

কুমকুম শান্ত হলে জিজ্ঞেস করল, "আর চিরন্তন? ওকে জড়ালি কেন? ও তোর চেয়ে বয়সে ছোট, সেটা জানিস?"

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল কুমকুম, তারপর বলল, "ইচ্ছে করে জড়াইনি, বিশ্বাস করো। বাড়িতে আসত। ডাক্তার দেখানো, ওঠানো-বসানো, অতবড় চেহারার মানুষটা, আমি কি একা পারি, বলো? ওর হেল্পটা কাজে লাগত। এই করতে-করতেই কেমনভাবে যেন সম্পর্কটা তৈরি হয়ে গেল।"

"ভাল করিসনি কুমকুম। এখনও বিয়ে করেনি চিরন্তন। পরে অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে রিলেশনে যেতে সমস্যা হবে।"

হঠাৎ গলা তুলল কুমকুম, "তার মানে কী দাঁড়াল? আমাকেই সাফার করে যেতে হবে, তাই তো? একটা অক্ষম পুরুষমানুষকে বয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই আমি সতী-সাবিত্রী! আমার কোনও চাহিদা থাকতে নেই! থাকলেই আমি খারাপ!"

স্টাফরুমে চিরন্তনের রিঅ্যাকশনটা ফ্ল্যাশব্যাকের মতো ঝিলমের মাথার মধ্যে ঘুরে গেল। কুমকুমকে সকলের সামনে বেআব্রু করেছে অত্রি চ্যাটার্জি। সেটাই মেনে নিতে পারেনি চিরন্তন। সেই কারণেই ওভার-রিঅ্যাক্ট করেছে।

"ড্রাইভার, রোককে রোককে... ঝিলমদি, এখানেই নেমে যাব আমি... থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য লিফট।"

দরজা খুলে হন্তদন্ত হয়ে নেমে গেল কুমকুম।

৮

হঠাৎ স্কুলে যেন পরিবর্তনের হাওয়া। এটা যে হবে, সেটা কানাঘুষোয় শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। 'স্কুলের মালিকানা বদল হয়েছে', 'নতুন হেডমাস্টার অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে', 'মলয় সরকারের চাকরি গেছে'। এই জাতীয় কথাবার্তা শিমুলতুলোর মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল।

গুজব যে কখনও কখনও সত্যি হয় বোঝা গেল, যখন একজন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় সটান স্টাফরুমে ঢুকে নিজের পরিচয় দিলেন, "আমার নাম পেয়ারেলাল শর্মা। দু'দিন হল হেডমাস্টার হিসেবে জয়েন করেছি। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।"

ব্যাপারটা অভিনব, সন্দেহ নেই।

আগের হেডমাস্টার নিজেকে আলাদা রাখতে ভালবাসতেন। কদাচিৎ দেখা হত। 'গুড মর্নিং', 'গুড আফটারনুন'-এর বাইরে আলোচনা এগোত না।

স্কুলটা চালাতেন মলয় সরকার। নামে টিচার-ইন-চার্জ, কিন্তু রুটিন বানানো, পরীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক করা থেকে শুরু করে কোন টিচার এলেন না, সেই জায়গায় কাকে পাঠানো হবে, সমস্তই ঠিক করতেন মলয়দা। টিচাররাও লিভ অ্যাপ্লিকেশন মলয়দাকে দিতেন। মলয়দা প্রিন্সিপালের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এমনকী, জরুরি দরকারে মলয়দাকে ফোন করেও ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া যেত।

হ্যাঁ, তখন হেডমাস্টারকে প্রিন্সিপাল বলাই রেওয়াজ ছিল।

নতুন হেডমাস্টার প্রথম দিনেই এসে বেড়াটা ভেঙে দিলেন। প্রিন্সিপাল নয়, হেডমাস্টার। স্যার নয়, শর্মাজি। যে-কেউ যে-কোনও প্রয়োজনে তাঁকে অ্যাপ্রোচ করতে পারে। শুধু শিরিনকে জানিয়ে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। মলয়দার চাকরি গেল না বটে, তবে পদ খোয়ালেন তিনি। টিচার-ইন-চার্জ পোস্টটাই তুলে দেওয়া হল। সব শিক্ষকের মতো মলয় সরকারও পড়ানোতেই মন দিলেন। তাঁকে একটা সেকশনে ক্লাসটিচারও করে দেওয়া হল।

খোলা হাওয়া! সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল, শর্মাজির মতো মানুষ হয় না। কী অমায়িক ব্যবহার! ঘরে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে বসতে বলা। প্রবলেমটা বোঝার চেষ্টা করা। সঙ্গে অ্যাশিওরেন্স, সবরকম দরকারে তাঁকে পাশে পাওয়া যাবে, নিশ্চিন্ত মনে পড়ানোটা যেন চালিয়ে যাওয়া হয়।

হানিমুন কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হল না। তফাতগুলো একটু-একটু

করে প্রকাশ পেতে থাকল।
প্রথম: ছুটি। আগে মলয়দাকে বললেই হয়ে যেত। এখন সরাসরি শর্মাজি। মেল করা যায়। কিন্তু জাস্টিফাই করতে হবে। "লিভ কোনও রাইট নয়, দেওয়া না-দেওয়া কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা," মুখের উপর বলে দিলেন শর্মাজি।
এক সপ্তাহের মধ্যে মিটিং ডাকলেন হেডমাস্টার। মিটিং জিনিসটার অস্তিত্বই ছিল না আগের জমানায়। মিটিংয়ে সবাই গেল আগ্রহ নিয়ে... নতুন হেডমাস্টার কী বলেন।
ভণিতা না করে শর্মাজি শুরু করলেন, "একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম ও শেষ প্রায়োরিটি ছাত্র। আমাদের কর্তব্য তাদের ভাল রাখা। ছাত্ররা সবাই সমান হবে তার কোনও মানে নেই। কেউ



"আপনি বলতে চাইছেন আমি মিথ্যা কথা বলছি? আমার ছেলের অসুখ হয়নি?" রাগে-দুঃখে চোখে জল এসে গিয়েছিল ঝিলমের।

পড়াশোনায় খারাপ হতে পারে। তেমনই কোনও-কোনও ছাত্র একটু ডানপিটে দুষ্টু হবে না এমনটা নয়। সেই কারণে ছাত্রদের শাস্তি দেওয়া কোনওভাবেই চলবে না। কর্পোরাল পানিশমেন্ট তো নয়ই, এমন কোনও কথাও বলা চলবে না, যাতে তাদের কোমল মন আঘাত পায়। সোজা কথা, কোনও অভিভাবক যদি শিক্ষক সম্বন্ধে অভিযোগ জানান, সেই অভিযোগ কর্তৃপক্ষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবে।"
প্রসুন চট্টরাজ কিছু একটা বলতে গিয়েছিলেন, তাঁকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে শর্মাজি বললেন, "কিছু বলার থাকলে মেল করে জানাবেন, মিটিং শেষ হয়ে গিয়েছে।"
সবাই স্তম্ভিত।
শুধু ঝুমা মিত্রকে বলতে শোনা গেল, "হ্যাঁ, এবারে একজন সত্যিকারের হেডমাস্টার পাওয়া গিয়েছে বটে।"
করিডরে, টিচার্সরুমে, খাওয়ার জায়গায় সিসিটিভি বসে গেল। ফিসফিসানি শুরু হল, "এবারে ওয়াশরুমেও ক্যামেরা ফিট করা থাকবে।"
শুভদীপ একদিন স্টাফরুমে বিজয়ীর মতো ঘোষণা করল, "একটা ছেলে আজ ক্লাসরুমে কন্ডোম ডিসপ্লে করছিল।"
"কী করলি?" সবাই জানতে চাইল।
চোখ টিপে জবাব দিল শুভদীপ, "পরের ছেলে পরমানন্দ। জানলা দিয়ে বাইরে সিনেমার হোর্ডিং দেখলাম।"
সবাই মানিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু মানিয়ে নেওয়া তো একদিনে হয় না, সইয়ে-সইয়ে মানাতে হয়। গোলমাল পাকিয়ে ফেললেন প্রসুনদা, প্রসুন চট্টরাজ।
হতে পারে সেই যে মিটিংয়ে ধমক দিয়ে প্রসুনদাকে বসিয়ে দিয়েছিলেন হেডমাস্টার, সেটা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তার চেয়েও যেটা হওয়া বেশি সম্ভব, ইদানীং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনায় মাঝে-মাঝে ভুল করে ফেলছিলেন প্রসুনদা। এবং তার কারণও ছিল।
নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা প্রসুন চট্টরাজ ছাত্র হিসাবে কৃতী ছিলেন। কিন্তু নিজের খরচ নিজেই চালিয়ে নেওয়ার গরজে হিন্দু হস্টেলে থাকাকালীনই টিউশনি করতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে প্রসুন চট্টরাজের নাম ছড়াতে শুরু করে। অঙ্কটা প্রসুন পড়ান সম্পূর্ণ নিজের স্টাইলে। অঙ্ক যে ভীতিকর কোনও বস্তু নয়, আসলে একটা খেলা, সেটাই ছাত্রদের ধরিয়ে দেন প্রসুন। তখন ছাত্ররা অঙ্ককে ধাঁধা হিসাবে দেখতে শুরু করে। যে-কোনও পাজল সলভ করলে যে মজা পাওয়া যায়, প্রসুনের ছাত্ররা অঙ্ক কষে সেই মজাটাই পেয়ে থাকে।
এম এসসি পড়তে-পড়তেই চাকরি নেন প্রসুনদা। প্রথমে উত্তর কলকাতার একটা স্কুলে। তাঁকে নিয়ে কলেজ স্ট্রিটের কোচিং সেন্টারগুলিতে ততদিনে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। তাঁকে একরকম ডেকে নিয়ে আসা হয় এই স্কুলে। ছুটি নিয়ে পিএইচ ডি-ও করে ফেলেন প্রসুন চট্টরাজ। কিন্তু ছোট-ছোট ছেলেদের অঙ্ক শেখানোর নেশা এমনভাবে তাঁকে গ্রাস করে ফেলে, স্কুলের চাকরি আর ছাড়া হয় না প্রসুনদার। শোনা যায় বাড়িতেই একটা হলঘরে শ'খানেক ছেলেকে প্রতি ব্যাচে অঙ্ক শেখান। ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, অসম, ওড়িশা, বিহার থেকেও ডাক আসে। মাসে একদিন করে অঙ্ক শেখাতে যান।
সুতরাং যে-প্রসুন চট্টরাজ নিজেই একজন লেজেন্ড, তাঁর পক্ষে ভুঁইফোঁড় কোনও হেডমাস্টারের নিয়মকানুন হজম করা শক্ত। তবে অন্য কারণও ছিল। সেটা প্রসুনদার অত্যন্ত দুঃখের, অত্যন্ত সেনসিটিভ একটা জায়গা। প্রসুনদার ছেলে সুস্মিত তাঁর মতোই মেধাবী। আই আই টি-তে প্রথম একশো জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট-এ সেকেন্ড। কিন্তু অঙ্ক-প্রীতি ওকে টেনে নিয়ে গেল স্ট্যাটিসটিক্সের দরজায়, আই এস আই-তে ভর্তি হল সুস্মিত।
আই এস আই-তে সুস্মিত ফার্স্ট ইয়ারে ভাল রেজাল্ট করতে পারল না। বাড়িতে নিয়ে এসে বকাবকি করলেন প্রসুনদা। জানতে চাইলেন, সমস্যাটা কোথায়! গুম হয়ে রইল সুস্মিত।
ক্যাম্পাসে ফিরে গেল সে। সেকেন্ড সেমেস্টারে। সবক'টা পেপারে ফেল করল।
এবারে অথরিটিই ডেকে পাঠাল প্রসুনকে। অধ্যাপকরা প্রসুনদার সঙ্গে বসলেন। জানানো হল, সুস্মিত ড্রাগ-অ্যাডিক্ট।
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল প্রসুন চট্টরাজের। জানতে চাইলেন, ছেলেকে তো এখানে তাঁদের জিম্মাতেই রেখে গিয়েছেন। সেই ছেলের ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে যাওয়ার দায় কেন তাঁর উপর চাপানো হচ্ছে?
অধ্যাপকরা জবাব দিলেন, একই হস্টেলে একই বছরে আড়াইশোজন ভর্তি হয়েছে। যদি হস্টেলের পরিবেশই দায়ী হয়, তা

হলে বাকি দুশো উনপঞ্চাশজনের ড্রাগের নেশা ধরল না কেন? বিতর্কে না গিয়ে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে এলেন। কাউন্সেলিং, ডি-অ্যাডিকশন। এক বছর পর আবার নিয়ে গেলেন। কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে নিল। ক্লাস শুরুও করল। তারপরেই এল সেই দুঃসংবাদ... রুমমেটের অনুপস্থিতির সুযোগে ফ্যানের ব্লেড থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েছে সুস্মিত।

একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। কাউকে দায়ী করেনি। শুধু বাবার ইচ্ছেপূরণ করতে পারেনি বলে বারবার ক্ষমা চেয়েছিল। বছরদুয়েক হতে চলল। কিন্তু এখনও সামলে উঠতে পারেননি প্রসুন চট্টরাজ।

অঙ্কের ব্যাপারেও একটা নিজস্ব মনোভাব পোষণ করতেন প্রসুনদা। বলতেন, "না পারলে আমি শিখিয়ে নেব। কিন্তু অঙ্ককে অবহেলা আমি সহ্য করতে পারি না।"

আসলে অবহেলাটা অঙ্ককে নয়, যেন প্রসুনদাকেই করা হচ্ছে, এমনটাই মনে করতেন প্রসুনদা। আর, ঠিক সেটাই করল ক্লাস নাইনের শশাঙ্ক জয়সওয়াল।

প্রসুনদার স্টাইলটা ছিল, ক্লাসে অঙ্কের ফরমুলাটা বুঝিয়ে দিয়ে, কয়েকটা অঙ্ক কষিয়ে হোমওয়ার্ক দেওয়া। প্রত্যেক ছাত্রের হোমওয়ার্ক চেক করতেন। শুধু তাই নয়, কার কোথায় অসুবিধে হচ্ছে জেনে, তাকে সেইমতো গাইড করতেন। শশাঙ্ক পরপর তিনটে ক্লাসে হোমওয়ার্ক করে এল না। তৃতীয় দিন কারণ জানতে চাইলে চুয়িংগাম চিবোতে-চিবোতে জবাব দিল, "ফিকর মত কিজিয়ে, হো জায়েগা।"

ক্লাসের বাইরে করিডরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রসুনদা। কান ধরতে বলেছিলেন। কানে হাত দিয়েওছিল শশাঙ্ক। হেডমাস্টার তখনই সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ওই অবস্থায় দেখে কান থেকে হাত সরিয়ে নিতে বলেন। ক্লাস শেষ হতেই প্রসুনদা হেডমাস্টারের ঘরে গিয়ে দেখা করেন। জানতে চান, তিনি যেখানে শাস্তি দিয়েছেন, কোন অধিকারে হেডমাস্টার সেখানে হস্তক্ষেপ করেছেন!

প্রসুনদা যে গলা চড়িয়ে কথা বলছিলেন, তা স্টাফরুম থেকেও শোনা গিয়েছিল। হেডমাস্টার কোনও জবাব দেননি। শুধু শান্ত গলায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রসুনদা ঠিক করেননি।

স্টাফরুমে ফিরে এসেও প্রসুনদা অনেক কথা বলেছিলেন। ঝিলমের মনে হয়েছিল, মাথা ঠান্ডা থাকলে ওই কথাগুলো হয়তো উনি বলতেন না।

ঝুমা মিত্র উপস্থিত ছিলেন। মালিকানা বদল হলেও যে সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি নিজের জায়গা খোয়াননি, ঝুমা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ঝুমা যে প্রসুন চট্টরাজের প্রতিটি কথা গিলছেন, সেটা তাঁর মুখ-চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

সিসিটিভি তো ছিলই।

ক'টা দিন ছুটি নিয়ে বসে রইলেন প্রসুন চট্টরাজ। যেদিন জয়েন করলেন, সেদিনই তাঁর হাতে চিঠি ধরানো হল।

চিঠির বক্তব্য পরিষ্কার: একটি নিষ্পাপ বালককে শাস্তি দিয়ে প্রসুন অপরাধ করেছেন। সেই কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে বালকটির পিতা হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করেছেন।

গুঞ্জন শোনা গেল, চিঠির বয়ান নাকি হেডমাস্টার তৈরি করেই রেখেছিলেন। বাবাকে ডেকে শুধু সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রসুনদাকে লেখা কর্তৃপক্ষের চিঠিতে এ-ও অভিযোগ আনা হয়েছে, প্রসুন চট্টরাজ হেডমাস্টারের অফিসে ঢুকে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার তো করেইছেন, স্টাফরুমেও অশালীন ভাষায় তাঁকে অপমান করেছেন। সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ইনসাবঅরডিনেশনের চার্জ কেন আনা হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

চিঠি পেয়েই হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন প্রসুনদা। শিরিন পথ আটকাল, "প্রায়র অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করার অনুমতি নেই।"

প্রসুনদা আবার ছুটি নিলেন।

ঝুমা মিত্র ঝিলমের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসের ভঙ্গিতে চিৎকার করে বললেন, "শর্মাজি কী বলেছেন জানিস? বলেছেন, স্কলার টিচার দিয়ে আমার কী হবে? আমার দরকার ওবিডিয়েন্ট টিচার।"

প্রসুন চট্টরাজ আর এলেন না। এল তাঁর রেজিগনেশন লেটার। এক মাসের মধ্যে অন্য একটা স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক পদে বহাল হলেন প্রসুন।

৯

জয়ন্ত ঘোষ। মামা ডাকত জয়। শুনতে-শুনতে ঝিলমও জয়মামাই ডাকতে শুরু করেছিল।

অবশ্য আর-একটা নামেও ডাকত মামা। পার্টনার। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় দু'জনের রোল নম্বর ছিল পাশাপাশি। মামা, জীবনময় ঘোষ। তার আগের রোল নম্বরই ছিল জয়মামার।

মামার ভাষায় "ডেডবডি থেকে মাইক্রোস্কোপ, সবেতেই আমরা ছিলাম পার্টনার।"

সেই মামাই যখন 'জীবনময়' নামটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ঝপ করে চলে গেলেন, জয়মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "পার্টনারের কথাটা একবারও ভাবলি না শালা!"

জয়মামার সঙ্গে ঝিলমের সম্পর্কটা অবশ্য রয়ে গেল।

জয়মামা মুক্ত পুরুষ। বৃদ্ধ মা আর নিজে, সংসার বলতে এইটুকু। নব্বইয়ের কাছাকাছি বয়সে কিছুদিন হল দেহ রেখেছেন মা-ও। রিটায়ার করে বাড়িতেই থাকেন মামা। প্র্যাকটিস করেন না। জিজ্ঞেস করলে বলেন, "সারাটা জীবন তো গাধার খাটুনি খেটেই কাটালাম, এবার কাজ না করে পয়সা পাওয়ার আনন্দটা উপভোগ করে নিই। পেনশনের যে টাকা ক'টা পাই, একার জন্যে তা যথেষ্ট।"

মামা চলে যাওয়ার পর কিছুদিন 'জয়মামা' বলত ঝিলম। আস্তে-আস্তে জয়টা কখন খসে পড়ল, মামার জায়গাটা অধিকার করে নিলেন জয়মামা। মামাও ঝিলম না বলে ডাকতে শুরু করলেন ঝিলমিল।

কিছুদিন হল ঋকের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ঋক কুড়ি পার হয়ে একুশে পড়ল। ভাবতে গেলেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায় ঝিলমের। ঘুমের মধ্যেও চমকে-চমকে ওঠে। ঋকের নাকের কাছে হাত নিয়ে বোঝার চেষ্টা করে, নিশ্বাস পড়ছে তো! মাসখানেক আগে কাশি হয়েছিল খুব। অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে কমল। কিন্তু পুরোটা গেল না। একটা ঘুষঘুষে জ্বরও থেকে-থেকে আসছে। ভয় পেয়ে গেল ঝিলম। মনে হল, মামার কাছে একবার যাওয়া দরকার।

বেল বাজাতে মামা নিজেই দরজা খুলে দিলেন। খালি গা, পরনে গামছা, দরদর করে গড়িয়ে নামছে ঘাম।

"তুই! ভাবলাম গ্যাস নিয়ে এসেছে ছেলেটা। বোস, গামছা ছেড়ে পাজামাটা পরে আসি।"

"থাক। পাজামা পরতে হবে না। কিন্তু এ কী অবস্থা তোমার? ডিহাইড্রেশন হয়ে যাবে তো!"

"হবে না," একগাল হাসলেন জয়মামা, "এই দেখ, ওআরএসের জল বানিয়ে রেখেছি। দশ মিনিট পরপর এক ঢোক করে খাচ্ছি।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু এত ঘামছ কেন? কী করছিলে?"

"রান্না।"

ইদানীং রান্নায় পেয়েছে মামাকে। আগের দিনও রান্না নিয়ে অনেক জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন, "বুঝেছিস, রান্নাটা আসলে একটা আর্ট। উচ্চমার্গের শিল্পকর্ম। কেন যে এতদিন বুঝিনি!"

"ওই জন্যেই তো মেয়েরা অন্য শিল্পকলায় তোমাদের সঙ্গে কমপিট করতে যায়নি। জানে, এ জায়গাটায় তোমরা ছেলেরা মিসফিট।"

আড়চোখে ঝিলমের দিকে তাকিয়েছিলেন জয়। মিটিমিটি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "জানিস নিশ্চয়ই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শেফ আর কুকরা সবাই পুরুষ।"

"কী রান্না করলে আজকে?" বসতে-বসতে জিজ্ঞেস করল ঝিলম।

ফ্যানটা অন করে দিলেন জয়। গামছার উপর একটা তোয়ালে জড়িয়ে উলটোদিকের সোফায় বসে বললেন, "পোস্ত দিয়ে কচুর শাক।"

"পোস্ত দিয়ে কচুর শাক? কোথায় পেলে রেসিপি?"

"রেসিপি দেখে রান্না তো গাড়লে করে। বই দেখে পরীক্ষায় উত্তর লেখার মতো। আসল রাঁধুনি নিজের রেসিপি নিজে তৈরি করে... দেব নাকি একটু? টেস্ট করে দেখ।"

মুখে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করল ঝিলম। চোখ বন্ধ করে স্বাদটা বোঝার চেষ্টা করল। তারপর চোখ খুলে বুড়ো আঙুল তুলল, "পাশ।"

"শুধু পাশ বললে হবে? বল, অনার্স-সহ পাশ। ভাবছি এই প্রিপারেশনটার পেটেন্ট নিয়ে নেব। ...আর-একটু খাবি?"

"না থাক, গলা চুলকোয় যদি?" প্লেটটা তুলে বেসিনে নিয়ে গেল ঝিলম।

"তুই আবার তুলতে গেলি কেন? কাজের মাসি বিকেলে তো আসবেই।"

মামার কথায় আমল দিল না ঝিলম। প্লেট ধুয়ে রান্নাঘরের তাকে তুলে রাখল। তারপর ফিরে এসে বসতে-বসতে বলল, "রান্নাঘরে একটা চিমনি লাগিয়ে নিয়ো। নইলে সাফোকেশন হয়ে যাবে।"

"ভাল বলেছিস। সাজেশনটা মাথায় রাখব।"

আজ রবিবার। ছুটির দিন। সোমনাথ দুপুরবেলা বাইরে কোথাও যাবে। সোমনাথ বেরনোর আগেই ঝিলমকে ফিরতে হবে।

"হ্যাঁ, যে কারণে এসেছিলাম..." ঝিলম শুরু করল।

"ঠিক কথা। কারণ ছাড়া এই বুড়ো মামাটাকে দেখতে ঝিলমিল আসবে কেন?"

"আবার বাজে কথা? চুপ করে বোসো," চোখ পাকাল ঝিলম।

মামা সোফার উপর পা তুলে বসলেন।

"ঋক... ওর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। জ্বর, কাশি ঘুরে-ঘুরে হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিকে তেমন রেসপন্ড করছে না। কী করা যায় বলো তো?"

"কত যেন বয়স হল ওর?" মামার গলাটা গম্ভীর শোনাল।

"কুড়ি পেরিয়ে একুশে পড়ল।"

"কাউকে দেখিয়েছিস?"

"ওকে তো নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পাড়ার ডাক্তারবাবু, ছোটখাটো সমস্যায় যাঁকে দেখাই, বারদুয়েক এসেছিলেন। ওষুধপত্র দিয়েছিলেন, সাময়িক উপকার হয়। কিন্তু রোগ আবার ফিরে আসে।"

খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভাবলেন জয়। তারপর বললেন, "আমার এক ছাত্র অন্বয়, তোদের ওদিকেই থাকে। ফোন নম্বর দিয়ে দিচ্ছি। আমার রেফারেন্স দিয়ে ফোন করিস। দেখে আসবে। কী বলল, পরে জানাস।"

দু'দিন পরেই ফোন করল ঝিলম। সকালের দিকে। তিনবার রিং হতেই ওপাশ থেকে, "হ্যালো।"

মহিলাকণ্ঠ।

দমে গেল ঝিলম, তবু দরকারটা তারই, "ডক্টর অন্বয় পাল আছেন?"

"আছেন। স্নানে ঢুকেছেন। কী দরকার বলুন?"

"দরকার... মানে ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হত।"

"আমাকে বলুন, কী বিষয়ে কথা বলতে চান। আমি কনভে করে দেব।"

"আমার ছেলে খুব অসুস্থ। উনি যদি বাড়ি এসে দেখে যান।"

"উনি তো হোম-কল নেন না।"

"যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি জানতে পারি আমি কার সঙ্গে কথা বলছি?"

"আমি ওঁর স্ত্রী।"

"খুব বিপদে পড়ে ফোন করছি। আমার ছেলে হাঁটতে-চলতে পারে না। ওকে নিয়ে চেম্বারে যাওয়া অসম্ভব। যদি সময় করে উনি একবার..."

"ঠিক আছে, বলব। আপনার নম্বর তো আমি দেখে রাখলাম।"

অপেক্ষা করল। কোনও ফোন এল না। ভদ্রমহিলা কি ডাক্তারবাবুকে জানিয়েছিলেন?

> এত কথা হল। ওরা তো একবারও ঝিলমের স্কুল নিয়ে একটা কথাও জানতে চায়নি! টিভি, কাগজ, হইচই! চোখে পড়েনি তা তো নয়।



দিনদুই পরে ঝিলম আবার ফোন করল, এবারে রাত দশটা নাগাদ। রিং হয়েই কেটে গেল। আবার ট্রাই করল। একই রেসপন্স।

বাধ্য হয়ে যেটা ভাল পারে না সেটাই করতে বসল। একটা টেক্সট মেসেজ। চোখে চশমা লাগিয়ে ধরে-ধরে একটা একটা অক্ষর টাইপ করল: 'আমার নাম ঝিলম রায়। আমি ডক্টর জয়ন্ত ঘোষের রেফারেন্সে ফোন করছি। ডক্টর ঘোষ, এক্স হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, হেমাটোলজি। আমার ছেলে খুব অসুস্থ। হাঁটতে পারে না। চেম্বারে দেখাতে নিয়ে যাব সে সাধ্য নেই। দয়া করে একবার যদি বাড়িতে এসে দেখে যান।'

দু'মিনিটের মধ্যে ফোন, "অন্বয় পাল বলছি। আপনিই মেসেজ করেছিলেন? বলুন, কী দরকার।"

পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল ঝিলম, "আমি একা পারব না। প্লিজ, তুমিও থেকো।"

সোমনাথ জবাব দিয়েছিল, "একুশটা বছর যখন পেরেছ, এখনও পারবে। সব ডকুমেন্ট বের করে রেখে যাব। ইললিটারেট তো নও, যে বোঝাতে পারবে না! আর ডাক্তাররা চোখ বোলালেই সব বুঝে যায়।"

অনেক বলার পর সোমনাথ নিমরাজি হয়েছিল, "ঠিক আছে। উনি যদি আমার কনভিনিয়েন্ট টাইমে আসতে পারেন, চেষ্টা করব পৌঁছে যেতে।"

সেই কনভিনিয়েন্ট টাইম রাত দশটা।

ডক্টর পাল তাতেই রাজি হলেন, "ঠিক আছে, চেম্বার শেষ করে ফেরার পথে আমি দেখে আসব। কাইন্ডলি আপনার হাজব্যান্ডকেও থাকতে বলবেন। কিছু কথা আপনাদের দু'জনের সঙ্গেই ডিসকাস করতে চাই।"

পৌনে দশটায় সোমনাথ টেক্সট করল, 'সরি, আসতে পারছি না। জরুরি মিটিং। এখনও চলছে'।

চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে ডাক্তারবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকল ঝিলম। দশ মিনিট দেরিতে বেল বাজল।

"মিসেস রায়?"

"হ্যাঁ। প্লিজ় ভিতরে আসুন। থাক-থাক, জুতো খুলতে হবে না। দিন, আপনার ব্রিফকেসটা আমার হাতে দিন।"

কোনও কথাতেই কান দিলেন না ডাক্তার। জুতো খুলে দরজার বাইরে রাখলেন, নিজের ব্রিফকেস নিজেই ক্যারি করলেন। শুধু জানতে চাইলেন রোগী কোন ঘরে আছে।

পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল ঝিলম।

স্টেথোস্কোপ ও অন্যান্য যন্ত্র বের করতে করতে ডক্টর পাল বললেন, "ডক্টর জয়ন্ত ঘোষ কে হন আপনার?"

সত্য সামান্য দুমড়ে নিল ঝিলম, "মামা।"

"রিমার্কেবল পার্সন। আউটস্ট্যান্ডিং ডক্টর অ্যান্ড আ গ্রেট টিচার।"

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে রইল ঝিলম।

ঋককে দেখতে-দেখতে জবাব দিলেন ডক্টর পাল, "সকাল আটটার আগে ডিপার্টমেন্টে আসতেন। আউটডোর শেষ হলে তাদের রক্ত পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে তবে ছাড়তেন। পাশাপাশি ইনডোর রাউন্ড তো আছেই। কোনওদিনই রাত ন'টার আগে ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরোতেন না।"

দেখা হয়ে গিয়েছিল। বাইরে সোফায় এসে বসলেন।

পুরনো রিপোর্ট, কাগজপত্র এগিয়ে দিল ঝিলম। দেখতে-দেখতে ফেলে আসা কথার সুতোটা আবার ধরলেন ডাক্তার, "আমরা যারা ছাত্র ছিলাম, কাছ থেকে দেখেছি, সবাই চেষ্টা করেছি নিজেদের ওঁর আদর্শে তৈরি করার। ডিফিকাল্ট... ডক্টর জয়ন্ত ঘোষ হওয়া খুব-খুব ডিফিকাল্ট।"

ভাল লাগছিল ঝিলমের। আবছা শুনেছে অন্যদের কাছে। আজ সাক্ষাৎ এক ছাত্রের মুখ থেকে শুনে ভিতরের একটা শূন্যতা যেন ধূপের গন্ধের মতো ভরে উঠছিল।

"মামার কাছে একটা কথা জানতে চাইবেন?"

"কী কথা?"

"চাকরিটা উনি ছাড়লেন কেন?"

"মামা চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। বছরখানেক বাকি ছিল রিটায়ারমেন্টের। হঠাৎ ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টের অ্যাপ্লিকেশন করলেন। আমরা অনেক বুঝিয়েছি। কিছুতেই রাজি হলেন না। আর যেদিন অবসর নিলেন, তারপর থেকে একটা দিনের জন্য স্টেথো ধরেননি ডক্টর ঘোষ। স্ট্রেঞ্জ। ভেরি-ভেরি স্ট্রেঞ্জ।"

কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না ঝিলম। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করল, "চা খাবেন?"

"না। অসময়ে চা খাওয়ার অভ্যেস নেই। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

উলটোদিকের সোফায় পা গুটিয়ে বসল ঝিলম।

কাগজপত্র দেখা হয়ে গিয়েছিল। চোখ থেকে চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাচ মুছলেন ডক্টর পাল। তারপর সোজা ঝিলমের দিকে তাকালেন, "আপনি... মানে আপনার হাজ়ব্যান্ডকে দেখছি না?"

"উনি জরুরি মিটিংয়ে আটকে গিয়েছেন। আমাকে বলতে পারেন।"

"দেখুন, অসুখটা জটিল। চিকিৎসাও নেই। আস্তে-আস্তে মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে আসছে। যে-কোনও কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

"কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা তো ইনফেকশন। জ্বর ছাড়ছে না, কাশি ঘুরে-ঘুরে আসছে।"

"একটা ট্রেন যখন চলে, তার কামরাগুলো, চাকা সবই চলে। কিন্তু আসলে যে চালায় সেটা হচ্ছে ইঞ্জিন। ইঞ্জিন অকেজো হলে ট্রেনটাই থমকে যায়। আমাদের শরীরের ইঞ্জিন মস্তিষ্ক, ব্রেন। সেটা অকেজো হয়ে গেলে হার্ট, লাংস, লিভার সবই বিকল হয়ে পড়ে।"

একটা কান্না গিলে ফেলতে-ফেলতে শেষ প্রশ্নটা করল ঝিলম, "কিছুই কি করার নেই?"

"যা করা হচ্ছে। ইনফেকশন হলে অ্যান্টিবায়োটিক, জ্বর হলে জ্বরের ওষুধ। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে নার্সিং হোমে শিফট করা। অ্যাসিস্টেড ফিডিং, অ্যাসিস্টেড রেসপিরেশন।"

ভিজ়িটের টাকাটা ফিরিয়ে দিলেন ডাক্তার। নমস্কার করে বললেন, "মাফ করবেন, ওটা নিতে পারব না।"

১০

টক্করটা লাগল ছুটি নেওয়া নিয়ে। আগে ছিল, মলয়দাকে জানিয়ে দেওয়া। ফোনে, যাদের হোয়াটসঅ্যাপ, ই-মেল আছে, সেগুলোয়। লিভ অ্যাপ্লিকেশনের বালাই ছিল না। নতুন হেডমাস্টার এসেই নোটিস সারকুলেট করলেন, ছুটি নিতে গেলে হয় আগে অ্যাপ্লিকেশন করে স্যাংশন করিয়ে নিতে হবে, নইলে জয়েন করে উইথ এভিডেন্স দরখাস্ত করতে হবে।

চিঠিতে তো কত কিছুই লেখা থাকে। গায়ে মাখেনি ঝিলম। ঋকের শরীর খারাপ, দুটো দিন স্কুলে যেতে পারেনি। যেদিন জয়েন করল, সেদিনই শিরিন বলল, "লিভ অ্যাপ্লিকেশন আনোনি?"

সই করতে দিল, কিন্তু পইপই করে বলে দিল, কালকের মধ্যে যেন অ্যাপ্লিকেশন আনা হয়।

পরদিন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে যেতে একবার চোখ বুলিয়েই বলল, "হেডমাস্টার ঘরেই আছেন, অ্যাপ্রুভ করিয়ে নিয়ে এসো।"

পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকল ঝিলম। দেখেই উলটোদিকের চেয়ারে বসতে বললেন শর্মাজি।

"বতাইয়ে।"

ছুটি নিয়েছিল সেটা বলে অ্যাপ্লিকেশনটা এগিয়ে দিল।

একঝলক চোখ বুলিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা ফিরিয়ে দিলেন হেডমাস্টার।

"ছেলের অসুখ?"

"হ্যাঁ।"

"ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি প্রেসক্রিপশন করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"সেটার অ্যাটেস্টেড কপি অ্যাটাচ করে দিতে হবে।"

"তার মানে?"

"আপনি যে-গ্রাউন্ডে ছুটি নিয়েছেন, তার এভিডেন্স অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে জমা না দিলে ছুটি মঞ্জুর হবে না।"

"আপনি বলতে চাইছেন আমি মিথ্যা কথা বলছি? আমার ছেলের অসুখ হয়নি?" রাগে-দুঃখে চোখে জল এসে গিয়েছিল ঝিলমের। কেউ এইভাবে তাকে মুখের উপর মিথ্যেবাদী বলেনি।

যখন দেখল, হেডমাস্টার কোনও জবাব দিচ্ছেন না, নিজেই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে ক্লাসে চলে গিয়েছিল।

তারপরেও যে লিভ অ্যাপ্লিকেশনটা জমা দেয়নি, তার দুটো কারণ। এক, ডক্টর পাল সত্যিই কোনও প্রেসক্রিপশন করেননি। অসুখ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভবিষ্যতে কী হবে তার সম্ভাবনা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনও ওষুধ বা অ্যাডভাইস দেননি। সেদিন শর্মাজির প্রশ্নের জবাবে 'ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করেছেন' বলেছিল বটে, কিন্তু আসলে তার হাতে কোনও প্রেসক্রিপশন নেই।

সেটারও সমাধান হয়ে যেত। ডক্টর পালকে অনুরোধ করলে তিনি নিশ্চয়ই একটা প্রেসক্রিপশন পাঠিয়ে দিতেন। অথবা স্থানীয় জিপি তিনিও বললেই লিখে দিতেন। কিন্তু কোনওটাই ইচ্ছে করল না ঝিলমের। মনে হল, লোকটা তাকে মিথ্যেবাদী বলেছে। সরাসরি নয়, কিন্তু ঘুরিয়ে। সে প্রেসক্রিপশন জমা দেবে না। দেখা যাক ও

কতদূর যেতে পারে।

এ সবের মধ্যেই এসে গেল পেরেন্ট-টিচার মিটিং। রেজাল্ট আউটের আগে পেরেন্টদের ডেকে পাঠানো হয়। মূলত যাঁরা ক্লাসটিচার, তাঁরাই পেরেন্টদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন। তবে পেরেন্টরা চাইলে অন্যদের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন। স্টুডেন্টদের কার কোথায় ডেফিশিয়েন্সি, কোন-কোন জায়গায় উন্নতি করার স্কোপ আছে, সেগুলোই আলোচনা করা হয়। টিচারদের কেউ-কেউ এই মিটিংটা এনজয় করেন। দামি জামাকাপড়, পারফিউমের হিড়িক পড়ে যায়। যেন পেরেন্ট নয়, হবু বর বা বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। ঝিলমও যত্ন করেই প্রগ্রেসন শিট তৈরি করে। কার কোনখানটায় ইমপ্রুভমেন্টের স্কোপ আছে, তার লিস্ট বানায়। এই একটা দিনেই পেরেন্টদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ। সেটা ইউটিলাইজ় না করার তো কোনও যুক্তি নেই।

যথারীতি কয়েকজন বাবা-মা অবুঝের মতো প্রশ্ন করতে থাকলেন। তবে মায়েরাই বেশি।

"আচ্ছা, ও বাহাত্তর না পেয়ে একাত্তর পেল কেন?"

"একাত্তর আর বাহাত্তর কী তফাত?"

"বাহাত্তর মানে তো এইট্টি পার্সেন্ট। আর-একটা নম্বর পেলেই..."

"পরের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই বাহাত্তর পাবে।"

"ওর বন্ধু সুজয় তো চুয়াত্তর পেয়েছে। কী করলে চুয়াত্তর পাওয়া যায়?"

"হাতের লেখাটা আর-একটু ভাল হওয়া দরকার। প্রশ্নের উত্তরগুলো জড়িয়ে না যায়, দুটো উত্তরের মধ্যে যেন স্পেস থাকে। একটু মার্জিন রাখা। বানান ভুলও যেন কম হয়।"

তবু মা খুশি হন না। বোঝানো যায় না, নীচের ক্লাসে একাত্তর পেল না বাহাত্তর, তাতে কিছু যায় আসে না। এমনকী, ফাইনাল পরীক্ষাতে এককুড়ি নম্বর নিয়ে পাশ করেও ছেলে ভবিষ্যতে তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি, এমন উদাহরণ ভূরি-ভূরি।

তবে প্রবলেম চাইল্ডও যে নেই তা তো নয়। যেমন প্রাঞ্জল। প্রাঞ্জলের বাবা এসে নমস্কার করে দাঁড়ালেন, "বলুন ম্যাম।"

"আপনার সঙ্গে একটু আলাদা করে কথা বলতে চাই।"

"চলুন, কোথায় যেতে হবে?"

আগে যেটা মলয়দার ঘর ছিল, সেটাই এখন হয়েছে কাউন্সেলিং রুম।

মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসল ঝিলম। জিজ্ঞেস করল, "হঠাৎ এরকম শুরু করল কেন প্রাঞ্জল?"

"কী করেছে প্রাঞ্জল?"

"ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছে আজকাল। সেদিন ওদের ক্লাসেরই আর-একটা ছেলে বিশাল, তাকে এমন ঘুষি মেরেছে প্রাঞ্জল যে, নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে শুরু করল। তার বাবা এসে যাচ্ছেতাই করে বলে গেলেন। ও নাকি অন্যদেরও ভয় দেখিয়েছে, চাইলে সব ক'জনকে মেরে শায়েস্তা করে দিতে পারে।"

চুপ করে রইলেন প্রাঞ্জলের বাবা, তারপর ধীর গলায় বললেন, "আমাদেরই ভুল হয়েছে। ওর জ্যাঠার ছেলে ক্যারাটে শেখে, ব্ল্যাকবেল্ট হয়েছে। ও-ও চেয়েছিল শিখতে। বারণ করেছি। বলেছি, আর-একটু বড় হও, ঠিকই ভর্তি করে দেব। সেই রাগে কম্পিউটারে যতরকম মারামারি কুংফু, ক্যারাটে, জুডোর ছবি দেখা শুরু করেছে। যা শেখে, সেগুলোই বন্ধুদের উপর এক্সপেরিমেন্ট করে। কী করা যায় বলুন তো?"

"ওকে জুডো বা ক্যারাটের ক্লাসে ভর্তি করে দিন।"

"বলেন কী? তা হলে তো আরও মারকুটে হয়ে উঠবে। এখন তবু সামলানো যাচ্ছে, তখন একেবারেই পারা যাবে না।"

"ঠিক উলটো। ওই সব কোর্সে প্রথমেই সেখানো হয়, মার্শাল আর্টস আত্মরক্ষার জন্য, অন্যের উপর প্রয়োগ করার জন্য নয়। অসহায় বন্ধুদের উপর তো নয়ই। ভর্তি করে দেখুন। তিন মাসের মধ্যে ও পালটে যাবে।"

"বাঁচালেন ম্যাম। কী চিন্তায় যে ছিলাম!"

সবশেষে এলেন আস্তিকের বাবা। আসলে আলাদা করে কথা বলবে বলে ওঁকে বসিয়ে রেখেছিল ঝিলম।

আস্তিক ছেলেটা শান্ত। বয়সের তুলনায় বেশিই শান্ত। ছোটখাট চেহারা, খুব ফরসা। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল। বড়-বড় চোখ। চোখের তারা ঘন কালো। শাই, ইন্ট্রোভার্ট। হতে পারে, অন্য স্কুল থেকে এসে সবে ভর্তি হয়েছে। এখনও বন্ধু জুটিয়ে উঠতে পারেনি। অন্যরা যেমন এই স্কুলের রীতি অনুযায়ী তাকে ম্যাম বলে, আস্তিক এখনও মাঝে-মাঝে গুলিয়ে ফেলে বলে ওঠে আন্টি। বয়সেও, ঝিলমের ধারণা, অন্যদের চেয়ে একটু ছোট।

"ডেকেছিলেন ম্যাম?"

"হ্যাঁ, বসুন।"

ক্লাসরুম ফাঁকা। কথা বলার জন্য আর মলয়দার ঘরে উঠে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

কী বলবে একটু ভেবে নিল ঝিলম। তারপর মুখ খুলল, "কী হয়েছে আস্তিকের? আগের পরীক্ষাতেও পারফরম্যান্স ভাল ছিল। কিছুদিন হল কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। পড়াশোনায় মন নেই। মাঝে-মাঝেই কামাই করছে। এবারের রেজাল্টও তো ভাল হয়নি। প্রোমোট করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এইভাবে চললে পরের ক্লাসে যথেষ্ট অসুবিধে হবে।"

ঝিলম দেখল, আস্তিকের বাবা নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন। তারপর হাল ছেড়ে দিলেন। একজন বয়স্ক মানুষ হঠাৎ কান্নাকাটি শুরু করলে সেটা একটা সিন হয়ে দাঁড়ায়। অস্বস্তিতে পড়ে গেল ঝিলম। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি কি অজান্তে কোনও দুঃখ দিয়ে ফেলেছি? ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যদি কোনও দোষ হয়ে থাকে..."

হাত নেড়ে 'না' বললেন আস্তিকের বাবা। রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। ধাতস্থ হতে সময় নিলেন। তারপর পায়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন,"আস্তিকের মা খুব অসুস্থ, ক্যানসার। বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। আস্তিককে বলা হয়নি। কিন্তু সেনসিটিভ ছেলে তো! ঠিকই বুঝতে পারে। ওকে দেখবেন ম্যাম। ও আমার একমাত্র ছেলে। ওরও কিছু হয়ে গেলে..."

কতক্ষণ একা বসেছিল খেয়াল নেই। খেয়াল হল, যখন করিডর দিয়ে যেতে-যেতে দেখতে পেয়ে ঘরে ঢুকল স্বাতী।

"এ কী, ঝিলমদি! একা-একা বসে কী ভাবছ? পেরেন্ট-টিচার মিটিং শেষ হয়নি?"

একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোল ঝিলম।

বলল, "হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেছে, এবার যাব।"

স্বাতী তাড়া লাগাল, "আজ তো স্যালারি ডে। তাড়াতাড়ি যাও। এবারে তো ওরা উঠে পড়বে।"

ঘড়ি দেখল। ঠিকই, দেরি হয়ে গিয়েছে। পৌঁছে দেখল, তখনও খাতা খুলে বসে আছে অ্যাকাউন্টসের লোকজন।

সই করে স্যালারি ড্র করতে গিয়ে মনে হল, গত মাসের চেয়ে কম টাকা তাকে দেওয়া হচ্ছে।

পাশেই বসেছিলেন গুরুপদবাবু, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক।

জিজ্ঞেস করল।

গুরুপদবাবু খাতা দেখে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, কমই তো পেয়েছেন। দু'দিন অ্যাবসেন্ট ছিলেন। তার মাইনে কেটে নেওয়া হয়েছে।"

১১

বিএড এমন একটা কোর্স, যার জাস্টিফিকেশন কোনওদিনই

খুঁজে পায়নি ঝিলম। যা-যা ওই কোর্সে পড়ানো হয়, তার কিছুই ইমপ্লিমেন্ট করা যায় না। এখন শোনা যাচ্ছে, ওটা নাকি এক বছরের জায়গায় দু'বছরের হতে চলেছে। কাদের যে মাথায় আসে এসব!
একটা প্লাস পয়েন্ট অবশ্য আছে। বি এড পড়তে-পড়তে কয়েকটা বন্ধু-প্রাপ্তি ঘটেছে ঝিলমের। তার মধ্যে টিকেও আছে কয়েকজন। যেমন প্রজ্ঞা, যেমন অপর্ণা।
অপর্ণা কলকাতার কাছেই একটা সরকারি স্কুলে পড়ায়। ওদের বাড়ি উত্তরপাড়া থেকে রোজ যাওয়া-আসা করে।
প্রজ্ঞার স্কুলটা শহর ছাড়িয়ে দূরে। আর ওর বাড়ি কল্যাণী থেকে যাওয়া-আসা করতেই দু'ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা চার ঘণ্টা লেগে যায়।
ওরা তিনজনে ভাল বন্ধু।
ভাল বন্ধু বলতে কী বোঝায়?
যেমন ধরা যাক, বছরদেড়েক হতে চলল ওদের দেখাসাক্ষাৎ নেই। যেটুকু যোগাযোগ ফোনে-ফোনে। অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে মিস করে। দেখা করার একটা হ্যাংকারিং আছে। আর-একটা কারণও ঝিলম ভিতরে-ভিতরে বুঝতে পারে। ঝিলম যে-ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসেছে, অপর্ণা আর প্রজ্ঞা সেখানেই বিলং করে। ওদের সঙ্গে বসলে, কথা বললে, ঝিলম ওর অতীতকে খানিকটা ফিরে পায়।
আজ এর অসুবিধে, তো কাল ওর ছুটি নেই।
শেষ পর্যন্ত যে একসঙ্গে হল, তার পিছনে প্রজ্ঞার ইনিশিয়েটিভই বেশি।
যে বি এড কলেজে ওরা একসঙ্গে পড়েছে, তার কাছেই যে খাবার ঠেকে ওরা আড্ডা দিত, সেখানেই বসা হয়েছে আজ।
আগের মতোই ফিশফ্রাই আর কফির অর্ডার করা হয়েছে। অবশ্য তখন রেস্ত কম ছিল। ফিশফ্রাই-কফি জুটত ন'মাসে, ছ'মাসে। আড্ডাটাই ছিল আসল। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অপর্ণার বিবাহবিচ্ছেদ পরবর্তী উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলোর কথা। ওরাও একবারের জন্যও ঋকের প্রসঙ্গ তোলেনি।
ঝিলম জানতে চেয়েছে, "হ্যাঁরে, বাবুন কেমন আছে? অ্যাডজাস্ট করতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"
প্রজ্ঞার ছেলে বাবুন। অসম্ভব মেরিটোরিয়াস। এবার আই আই টি ক্র্যাক করেছে।
তবে যে-আই আই টি-তে চান্স পেয়েছে, সেটা নতুন তৈরি। ভর্তি হওয়ার পর প্রজ্ঞা আর ওর হ্যাজ়ব্যান্ড গিয়েছিল সেট্‌ল করে দিয়ে আসতে।
"ভালই আছে বাবুন। যা লেখে তাতে সেরকমই মনে হয়।"
"আসেনি এর মধ্যে?"
"দুটো লম্বা ছুটি, উইন্টার আর সামার। উইন্টার ভেকেশনে এসেছিল। যে-ক'টা দিন থাকল, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরেই কাটিয়ে দিল।"
"ফ্যাকাল্টি ভাল? প্লেসমেন্ট?" অপর্ণা জানতে চাইল।
"আই আই টি-গুলোর সবক'টাতেই ফ্যাকাল্টি ভাল। আর প্লেসমেন্ট? সবে তৈরি হয়েছে তো! প্লেসমেন্ট বোঝার এখনও সময় আসেনি।"
"অ্যামবিয়েন্স? গিয়েছিলি তো শুরুতে। কেমন দেখলি? দুর্দান্ত না?" হাসল প্রজ্ঞা।
"হাসলি যে?" ঝুঁকে এল অপর্ণা।
"হাসব না? একবারও মনে হল না ভারতবর্ষে আছি। যে-ছাত্রগুলো পড়তে এসেছে, ছাত্র কেন, ছাত্রীরাও দেখে মনে হল না, ওরা এ দেশেরই কোনও শহর-গ্রাম থেকে উঠে এসেছে! হাঁটা-চলা, কথা বলা, ভাবভঙ্গি... মনে হচ্ছিল, ওদের আমেরিকাতেই জন্ম। দয়া করে ক'টা দিন এদেশে থাকতে এসেছে। কোর্স শেষ হলেই স্বদেশে ফিরে যাবে।"
হি হি করে হাসল অপর্ণা। মেয়েটার এত দুঃখ। তবু যে কী করে এমন হাসতে পারে!
"তার মানে বাবুনও ফিরবে না?"
"পাগল? সেই কথাটাই ওর বাবা আর আমি বলাবলি করছিলাম। ছেলেকে যে রেখে এলাম, আসলে আর কখনও ফিরে পাব না। ওখান থেকে বেরিয়ে যা হোক কিছু জুটিয়ে ও ঠিকই আমেরিকায় চলে যাবে।"
"যা হোক কিছু বলছিস কেন? ভাল কিছুই পেয়ে যাবে। বেটার জব অপরচুনিটি।"
"না রে, ওদেশে যারা যায় তারা সবাই গুগ্‌ল-মাইক্রোসফ্‌টের সিইও হয় ভেবেছিস? ম্যাকডোনাল্ড-এ রুটি দেওয়ার চাকরি পেলেও ওরা আর ফিরে আসে না। আই আই টি-গুলো সেভাবেই ওদের গ্রুম করে।"
আলোচনাটা অন্য দিকে এগোচ্ছে দেখে হাল ধরল ঝিলম। বলল, "বল, তোদের স্কুলের পরিস্থিতি কেমন?"
"আমার তো গ্রামে চাকরি। ট্রেন থেকে নেমে দু'মাইল ভ্যানরিকশা চেপে যেতে হয়। সভ্যতাও ওই রেললাইন পর্যন্ত গিয়েই থমকে যায়। পরের দু'মাইল, যত এগোই, ততই সভ্যতা পিছোতে থাকে... উনবিংশ শতক, অষ্টাদশ শতক হয়ে আরও পিছনে।"
"বুঝলাম না।"
"স্কুল এখন আর হেডমাস্টার-হেডমিস্ট্রেস চালায় না, চালায় ম্যানেজিং কমিটি। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের গড় যোগ্যতা ক্লাস এইট। তবে এখন শুনছি আইন করে তাদের যোগ্যতা বেঁধে দেওয়া হবে। অন্তত গ্র্যাজুয়েট।"
"গ্র্যাজুয়েট হলেই শিক্ষিত? আমি এমন মানুষ দেখেছি, যারা তথাকথিত অশিক্ষিত হলেও আমাদের বসিয়ে পড়াতে পারে।"
"দাঁড়া-দাঁড়া। কমিটির সদস্যদের শিক্ষার উদাহরণ তো আগেই দিলাম। প্রথম নিয়ম, শিক্ষকদের স্কুলে ঢোকা আর বেরনোর সময় অ্যাটেন্ডেন্স খাতায় সই করতে হবে।"
"সে তো আমাদের স্কুলেও নিয়ম।"
"রাখ তো নিয়ম। সেই খাতা স্কুলের অফিস-ঘরে থাকবে না। থাকবে দারোয়ানের হেপাজতে। যার তদারকি করবে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা।"
"অ্যাটেন্ডেন্সে এত কড়াকড়ি, নিশ্চয়ই শিক্ষকরা যখন খুশি আসছিল-যাচ্ছিল!"
"যুক্তির খাতিরে সেটাও মেনে নেওয়া গেল। ফতোয়া হল, শিক্ষিকারা শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু পরে স্কুলে আসতে পারবে না।"
"তুই তো শাড়িই পরিস।"
"আমার কথা ছেড়ে দে। আমি তো সাতবুড়ির এক বুড়ি। নয়না, সবে জয়েন করেছে শাড়িটাড়িতে তেমন অভ্যস্ত নয়, তাও এমনি দিনে নয়, স্কুলের স্পোর্টস, দৌড়তে সুবিধে হবে বলে জিন্‌স-টপ পরে এসেছে। কী যে হেনস্থা করল!"
"জিন্‌স খোলাল?"
"পারলে খোলাত। ঢুকতেই দিল না। রেলস্টেশন পর্যন্ত তাড়া করল ভয়ে বেচারি তিনদিন স্কুলেই এল না।"
"তা হলে অবশ্য সমস্যা।"
"মজাটা হচ্ছে, যে-অভিভাবকরা নীতি নিয়ে বারফট্টাই করে, তাদেরই যখন বলা হয়, মেয়েগুলো বাড়ি ফেরার সময় যারা বাইক নিয়ে তাড়া করে, আজেবাজে কথা বলে, ওরাও তো আপনাদেরই ছেলে। একটু দেখুন। শাসন করুন। তখন কী জবাব আসে জানিস?"
"কী জবাব?"
"বলে, আহা, যে-বয়সের যেমন। ছোট-ছোট সরলমতি বালক। ভুল যদি করেই ফেলে, নিজগুণে ক্ষমা করে দিন। বয়স বাড়লে ঠিক শুধরে যাবে।"
হেসে ফেলল ঝিলম।

রেগে গেল প্রজ্ঞা, "তুই হাসছিস? আমার তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে রি রি করে। কবে যে এই পাপ থেকে মুক্তি পাব?"
ফিশফ্রাইটা সামনে ঠেলে দিল অপর্ণা।
"কী হল রে? ভাল লাগছে না?"
"ঝাল।"
"আমার তো ঝাল লাগছে না!" প্রজ্ঞা বলল।
"মুখে লঙ্কা পড়েছে বোধ হয়," বলল ঝিলম।
হাসল অপর্ণা। বলল, "হয়তো কোনওটাই নয়। সেই বি এড পড়ার সময়, ঝালটা ঝাল মনে হত না। বয়স বেড়ে গিয়েছে তো, ঝাল আর সহ্য করতে পারি না। দোষটা ফিশফ্রাইয়ের নয়। আমার জিভের। বয়সের।"
হঠাৎই আলোচনাটা গম্ভীর হয়ে গেল। প্রজ্ঞা চামচ দিয়ে পেঁয়াজকুচোগুলো একজায়গায় জড়ো করতে লাগল। ঝিলম ফিশফ্রাইয়ের শেষ টুকরোটা মুখে ঢোকাল।
"তোদের কী খবর? তোর তো গ্রামের স্কুল নয়!"
ঝিলমের প্রশ্নের জবাবে অপর্ণা প্রথমে কিছু বলল না। টিসুপেপারে হাতের আঙুল মুছল। ঠোঁট ভেজাল। তারপর গুছিয়ে বসল।
"দেখ, দোষটা কিন্তু আসলে আমাদেরই।"
"মানে?" প্রজ্ঞা ভুরু কোঁচকাল।
"এই যে তুই, বাবুনের ইনস্টিটিউটে গিয়ে দেখলি, আই আই টি-তে পড়া ছেলেগুলো হাবেভাবে, চলায়-ফেরায় যেন বিদেশ থেকে ল্যান্ড করেছে। দোষটা ওদের?"
"তা হলে কার?"
"আমাদের। মানে বাবা-মায়েদের। অথবা যাদের কাছে দিনের সাত-আট ঘণ্টা কাটায় বাচ্চারা, সেই শিক্ষকদের।"
"কেন বলছিস এরকম?"
"বলব না? নিজের রেজাল্ট, নিজের খাওয়া, নিজের ভাল, এর বাইরে কিছু ওদের শেখানো হয়? পেরেন্টদের দেখিস না? ছেলেমেয়ের রেজাল্ট নিয়ে কী পাগলের মতো করতে থাকে? আর স্কুলে? সমস্ত এমফ্যাসিস কিন্তু রেজাল্টে। যে ছেলেটা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে স্কুলের গেটে ঘুগনি বিক্রি করা মানুষটাকে একখানা গেঞ্জি কিনে দিল, শুনেছিস, কোনও স্কুলে তাকে পুরস্কৃত করা হয়?"
ঘাড় নাড়ল প্রজ্ঞা, ঝিলমও।
"বাচ্চাদের সবার হাতে একখানা সেলফোন, সেখানেই পৃথিবীটা ধরা। আর হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল শব্দটার ভিতরে যে-সামাজিকতা আছে, কোনও মিডিয়াতেই তার অস্তিত্ব নেই। ফেসবুকে দেখেছিস পাড়ায় ডেঙ্গু হয়েছে, তার জন্য সবাইকে জড়ো হতে বলা হচ্ছে? শুধু নিজের ঢাক পেটানো। এই একখানা পোস্ট দিলাম। তারপর গুনে দেখা কতগুলো লাইক এল। লাইকের আনন্দেই সপ্তম স্বর্গে উঠে গেল বান্দা।"
অপর্ণার কথাগুলো সব যে মেনে নেওয়া যায় তা নয়। আবার ফেলে দিতেও ইচ্ছে করে না।
অপর্ণা, হয়তো একা থাকে বলেই, জমে থাকা কথাগুলো উগরে দিচ্ছিল দুই বন্ধুর কাছে, "আর-এক হুজুগ সেলফি তোলার। সেলফি মানে কী? না নিজের ছবি। নিজের ছবি, নিজের গান, নিজের লেখা। পোস্টের পর পোস্ট। নার্সিসিজম-এ পেয়েছে জেনারেশনটাকে। আর জেনারেশনকেই-বা দোষ দিই কী করে? আমরাই কি নিজেদের সরিয়ে রাখতে পেরেছি এসব থেকে?"
বিল এসেছিল। ছাত্রী অবস্থা থেকে যা নিয়ম, তাই ফলো করা হল।

খুব কাছে পাশাপাশি হাঁটছিলেন বিদ্রোহ। একটা গন্ধ, যা সোমনাথ পার্টি থেকে ফিরলে ওর নিশ্বাসে মিশে থাকে, সেটাই পাচ্ছিল ঝিলম।



বিলের টাকা সমান তিনভাগ হল। দিয়ে, তারপর উঠল তিনজনে।
বাইরে বেরিয়ে প্রজ্ঞা বলল, "আর, তোর স্কুলের খবর?"
অপর্ণা বলল, "নতুন আর কী শুনবি? তোর গ্রামের স্কুল, আমারটা না হয় শহরের। শহর আর গ্রামের মানুষ কি আলাদা? গ্রামের মানুষই তো একদিন শহরে এসেছে, না কি? বদমায়েশিগুলো আরও সফিস্টিকেটেড, আরও সূক্ষ্ম। হরেদরে সব সমান।"
হাঁটতে-হাঁটতে ময়দানের দিকে এগোচ্ছিল ওরা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে প্রজ্ঞা বলল, "পাপড়ি চাট খাবি?"
"একবার এখানেই খেয়েছিলাম, মনে আছে?" ঝিলম বলল।
"আর তারপর আমার কী পেটখারাপ!" অপর্ণা বলল।
"আজ পেটখারাপ হবে না... এটা কিন্তু আমি খাওয়াব," পার্স থেকে টাকা বের করল প্রজ্ঞা।
কাছেই রবীন্দ্রসদন। সেই দিকে তাকিয়ে অপর্ণা জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, তুই যে আগে কবিতা বলতিস...শ্রুতিনাটক, সেসব ছেড়ে দিয়েছিস?"
ঘাড় নাড়ল ঝিলম, "ছাড়িনি। কিন্তু সবই কেমন বদলে গিয়েছে। যে-সব শ্রোতা শুনতে আসেন, তাঁরাও আগের মতো নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে চিনতে পারে না, ভাবতে পারিস?"
চাটের ঠোঙা চাটতে-চাটতে প্রজ্ঞা বলল, "আমাদের জানাস। ঠিক চলে আসব। তোর প্রোগ্রাম! না এসে পারি?"
ওদের মিনিবাসে তুলে দিল ঝিলম। দু'জন দু'দিকে। প্রজ্ঞা যাবে শিয়ালদায়। অপর্ণা হাওড়া স্টেশনে। রবীন্দ্রসদন মেট্রো স্টেশনের দিকে যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিলম।
এত কথা হল। ওরা তো একবারও ঝিলমের স্কুল নিয়ে একটা কথাও জানতে চায়নি! টিভি, কাগজ, হইচই! চোখে পড়েনি তা তো নয়। অনেক জায়গায় তার নামও বেরিয়েছিল।
বন্ধু!
ঝিলমের যন্ত্রণার জায়গাটায় ওরা আঙুল ছোঁয়াতে চায়নি।

১২

ভুলটা ঝিলমেরই। বুঝতে একটু দেরি হয়ে গেল, এই যা। যতক্ষণে বুঝতে পারল, গুলিটা বন্দুক থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।
আসলে মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল।
একে তো ঋকের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ঘুরে-ঘুরে জ্বরে পড়ছে। তার ওষুধ, দেখভাল। অ্যাটেন্ডেন্ট...আসলে আয়া। তারা কাঁথা পালটাতে পারে। কিন্তু ঘণ্টায়-ঘণ্টায় শিরার মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক পুশ করতে হলে ট্রেন্ড নার্স চাই। তাদের খাঁইও বেশি। অ্যান্টিবায়োটিকগুলো, প্রথম দিকের ওষুধে কাজ না হওয়ায়, এখন যা দিতে হচ্ছে, যথেষ্ট এক্সপেনসিভ। প্রথম দিন ডক্টর পাল টাকা নিতে চাননি। কিন্তু বারবার যাওয়া, অথচ কিছুই অফার না করা, চক্ষুলজ্জায় বাধে। তাই এখন উঠে আসার সময় একটা খামে টাকা ভরে পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে আসে।
যখন দিন-দিন খরচের পাল্লা ভারী হচ্ছে, তখনই রোজগার ক্রমশ কমতির দিকে যেতে থাকল ঝিলমের। প্রতি মাসেই দু'-তিন দিন করে অ্যাবসেন্ট। ফলে মাইনে কাটা চলতে থাকল। একসময় সেটাও অভ্যেসের মধ্যে এসে গেল।
শেষে বাধ্য হয়েই কথাটা সোমনাথের কাছে পাড়ল।
ঋকের খরচ-বাবদ কখনওই সোমনাথের কাছে হাত পাতেনি ঝিলম। যেন পুরোটা তারই দায়, এইভাবে ঋকের চিকিৎসা চালিয়ে

এসেছে। নেহাত অপারগ হয়েই প্রসঙ্গটা তুলল।

ল্যাপটপে কাজ করছিল সোমনাথ। এমনভাবে চোখ কপালে তুলল, যেন এমন কথা প্রথম শুনছে, "ঋকের খরচ? তার জন্য আমাকে কন্ট্রিবিউট করতে হবে? হঠাৎ?"

ঝিলম একবার ভাবল বলে, ঋক তো একা তার সন্তান নয়। সেখানে সোমনাথেরও কন্ট্রিবিউশন আছে। কিন্তু কথায় কথা বাড়বে। তাই সে-প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল, "ওর শরীরটা আজকাল ভাল যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝেই ডাক্তার দেখাতে হচ্ছে। দামি-দামি ওষুধ। ট্রেন্ড নার্স।"

চোখমুখ কুঁচকে, যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে এমন ভাব করে, আলমারি খুলে দু'হাজার টাকা টেবিলে রাখল সোমনাথ, "আপাতত এর বেশি দিতে পারব না।"

চোখে জল এসে গিয়েছিল ঝিলমের। খুব অপমানিতও হয়েছে মনে হয়েছিল। ছোট মনে হয়েছিল নিজেকে।

"থাক, লাগবে না," বলে ফিরে এসেছিল।

মনটা বিক্ষিপ্ত ছিলই। নতুন উপদ্রব শুরু হল, বিপিন। অবশ্য নামটা জেনেছে পরে, ঘটনা যখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

বিপিন পড়ে নাইনে, কিন্তু ক্লাসের অন্য ছেলেদের তুলনায় বয়স বেশি। রেগুলার দাড়ি-গোঁফ শেভ করে, বোঝা যায়। অন্যদের মতো স্কুল-বাসেও যাওয়া-আসা করে না। একটা রেসিং সাইকেল আছে, সেটা নিয়েই ঘুরে বেড়ায়।

বিপিন যে ঝিলমদের পাড়াতেই থাকে সেটা ঝিলম জানতে পারল, যেদিন স্কুলে যাবে বলে বেরিয়েছে, খ্যাঁচ করে পথ আটকে সাইকেলে ভর দিয়ে বিপিন এসে দাঁড়াল।

বিপিনদের রেগুলার ক্লাস নেয় না ঝিলম, অন্য টিচাররা না এলে সাবস্টিটিউশনে যায়। মুখ চেনা। তাই সামনে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই এদিকেই থাকিস?"

জবাব না দিয়ে মাটি থেকে কিছু একটা কুড়নোর ভঙ্গি করে ঝিলমের দিকে একটা খাম বাড়িয়ে দিয়েছিল বিপিন, "এটা আপনার ব্যাগ থেকে পড়ে গিয়েছে।"

গাড়ি ছিল না সেদিন। অটো পালটে স্কুলে পৌঁছতে মিনিটপনেরো লাগল। শুরুর বেল পড়তে তখনও বাকি দেখে খামটা খুলল।

যা ভেবেছিল তা-ই। এই খাম কস্মিনকালেও তার ব্যাগে ছিল না। খামের ভিতর একটা চিঠি, 'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই'। অবাক হয়ে গেল ঝিলম। এই জাতীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি ঝিলম যে আগে হয়নি তা নয়। হাঁ করে তাকিয়ে থাকা, পিছন-পিছন আসা, বয়ঃসন্ধিতে ছেলেদের এমনটা হয়েই থাকে। কিন্তু সেটা ঘটে আর-একটু কম বয়সে, ছেলেরা যখন সেভেন কি এইটে ওঠে, তখন।

বিপিনের বয়স তার চেয়ে বেশি। ষোলো-সতেরো তো বটেই, আঠারো হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

আরও লক্ষ করল, বিপিন কোথাও তাকে 'ম্যাম' বলে সম্বোধন করেনি। বাঁকা-বাঁকা হাতের লেখায় যে একটা লাইন লিখেছে, সেখানে কোনও সম্বোধনই নেই।

কী করবে? এটাকে ইস্যু করবে? অথরিটির নজরে আনবে? পেরেন্টকে ডেকে পাঠাবে?

কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর চিঠিটা ছিঁড়ে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিল।

ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু বিপিন ঘটনাটা মিটতে দিল না।

অফ-পিরিয়ডে মাঠের মধ্যে পায়চারি করা অভ্যেস ঝিলমের। শৈশব যেন সবুজ ঘাসে জীবন্ত হয়ে ওঠে, কথা বলে ঝিলমের সঙ্গে। সেইরকমই, আনমনে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, পাশে ছায়া পড়ল।

বিপিন।

"চিঠিটা পড়েছেন?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল ঝিলম। কী বলবে মনে-মনে সাজিয়ে নিল। তারপর বলল, "পড়েছি। বল, কী বলার আছে?"

"এখানে নয়, আলাদা করে বলতে চাই।"

সতর্ক হল ঝিলম। কথাগুলো ঠিক কিশোরসুলভ নয়।

"এখানে তো আর কেউ নেই। বল না, আমি শুনছি।"

"সময় লাগবে। তা ছাড়া এখনই ঘণ্টা পড়ে যাবে। কেউ এসেও যেতে পারে!"

"ঠিক আছে। ক্লাসের পর আসিস। স্টাফরুমে।"

"না। আমি আপনার বাড়িতে যেতে চাই। যখন কেউ থাকবে না, তখন।"

স্তম্ভিত হয়ে গেল ঝিলম। কী মিন করতে চাইছে ছেলেটা? একে বে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।

"তোর কথাগুলো আমি কিন্তু মোবাইলে রেকর্ড করছি।"

মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেল বিপিনের হাবভাব। একটাও কথা না বাড়িয়ে স্কুলবিল্ডিংয়ের দিকে ছুট লাগাল। কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঝিলম। তারপর ফিরে এল স্টাফরুমে।

তখনই খোঁজখবর নিয়ে নামটা জানতে পারল। নাইন ডি। পুরো না বিপিন দাস। ব্যাকডোর এন্ট্রি। মালিকানা বদল হওয়ার পর প্রতিটি সেকশনে যেমন ছাত্রসংখ্যা এখন যাট ছুঁই-ছুঁই, ক্লাসে-ক্লাসে সেকশনও বেড়ে গিয়েছে মা ষষ্ঠীর কৃপায়। 'ডি' আর 'ই' সেকশন নতুন সংযোজন। এরা প্রায় সকলেই স্কুলে ঢুকেছে ডোনেশন দিয়ে প্রথম ভুলটা করেছিল বিপিনের দেওয়া চিঠি ছিঁড়ে ফেলে। দ্বিতীয় ভুল করল, বিপিনের সঙ্গে তার কথোপকথন কারও সঙ্গে শেয়ার ন করে। অবশ্য এগুলো যে ভুল, তখন বোঝেনি। বুঝতে পারল পরে যখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

এর মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছে। স্মৃতিও আস্তে-আস্তে ফিকে হতে শুরু করেছে। তাই তাকে যখন সাবস্টিটিউশন ক্লাসে যেতে বলা হল, নাইন ডি, কিছু না-ভেবেই ক্লাসটা নিতে চলে গিয়েছিল ঝিলম।

গিয়ে দেখল, সামনের দুটো রো বাদ দিয়ে তার মুখোমুখি বসে আছে বিপিন। আর সোজা তাকিয়ে রয়েছে তারই দিকে। কেমন যেন অস্বস্তি হল। তারপর নিজেকে বোঝাল, একটা ক্লাস নাইনের ছেলেকে কি ঝিলম ভয় পাচ্ছে? এতদিন শিক্ষকতার পরেও।

ইতিহাস ক্লাস। মন দিয়ে পড়িয়ে যাচ্ছিল ঝিলম। বাংলার পরেই তার প্রিয় বিষয় ইতিহাস। ইতিহাসের পাতায়-পাতায় ছড়ানো কত গল্পকাহিনি, কত মিথ। পড়াতে-পড়াতে বিপিনের অস্তিত্ব তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা শব্দ হল। হেঁচকি আর ঢেকুর দুটো মেশালে যেমন আওয়াজ হয় তেমনই। অবাক হয়ে তাকাল। কিছু দেখতে পেল না।

আবার পড়ানোয় মন দিল।

শব্দটা আবার হল। এবারে শব্দের উৎস চিনতে ভুল হল না। বিপিন।

পাশাপাশি অন্য ছেলেরা চুপ। কারও কারও মাথা নিচু। ঝিলমের মনে হল, অন্যরা হাসি আড়াল করার চেষ্টা করছে।

"কী হল বিপিন?"

"সৌম্য।"

"কী করেছে সৌম্য?"

"সৌম্য আমার মেন পয়েন্টে হাত দিয়েছে," বলতে-বলতে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ প্যান্টের যেখানে ঢাকা থাকে, সেই জায়গাটা বারবার দেখাতে থাকল বিপিন।

যে হাসিটা এতক্ষণ চাপা ছিল, সেটাই ফেটে বেরিয়ে এল।

মাথায় আগুন চড়ে গেল ঝিলমের।

বিপিন এমন কোনও শিশু নয় যে, নিষ্পাপ সারল্যে কথাগুলো

বলছে। বিপিনের কথার মধ্যে তাকে হেয় করার চেষ্টা তো ছিলই, একটি নারীকে নারী বলেই অপমান করার ইচ্ছেও ছিল প্রবল। ঝিলমের মনে হল, এনাফ ইজ় এনাফ। নিজের জায়গা থেকে নেমে সে সোজা এগিয়ে গেল বিপিনের দিকে। তারপর ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই সপাটে একটা থাপ্পড় মারল গালে।

ঝুমা মিত্র কি তখন করিডর দিয়ে যাচ্ছিলেন? ঝুমা কি ঘটনাটা ঘটতে দেখেছিলেন?

প্রশ্নটা পরে নিজেকেই করেছে ঝিলম। সঠিক উত্তর পায়নি। সে ঝুমা মিত্রকে যেতে দেখেনি ঠিকই, কিন্তু সেই সময় সে যে দেখার মতো অবস্থায় ছিল না তা-ও তো ঠিক।

স্টাফরুমে গিয়ে দু'গ্লাস জল খেল। ঘামছিল, ঝিলমকে দেখে কুমকুম জানতে চাইল, "কী হয়েছে ঝিলমদি? তোমার কি শরীর খারাপ?"

"না। কেন রে?"

"কেমন যেন দেখাচ্ছে। টেক কেয়ার। সিজ়ন চেঞ্জের সময় তো, হঠাৎ ঠান্ডা লেগে যায়।"

এর পরে-পরেই ঋকের কন্ডিশন খানিকটা ডিটেরিয়রেট করল। ডক্টর পাল দেখে বললেন, "ওষুধ দিচ্ছি। এতে কাজ না হলে বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। দরকারে ভেন্টিলেশনে দিতে হবে।"

"ভেন্টিলেশন?" এবারে সত্যিই ভেঙে পড়ল ঝিলম।

অন্বয় পাল মাথা নিচু করে বললেন, "ভেন্টিলেশনে দিলেই যে সেরে উঠবে, তার অবশ্য কোনও গ্যারান্টি নেই। তবু চেষ্টাটা তো সবাই করে।"

টানা এক সপ্তাহ স্কুল কামাই হল ঝিলমের।

ঋক একটু ভালর দিকে গেলে যেদিন জয়েন করল, সেদিনই অ্যাটেন্ডেন্স খাতায় সই করার সময় একটা সিল করা খাম হাতে দিল শিরিন।

"কী এটা?"

"রিসিভ করো। তারপর ঘরে গিয়ে পড়ে দেখো।"

অফ পিরিয়ডে খাম থেকে চিঠিটা বের করল ঝিলম।

চার্জশিট। তাকে ডোমেস্টিক এনকোয়ারিতে অ্যাপিয়ার হতে বলা হয়েছে।

চার্জশিটের সঙ্গে অ্যাটাচ করা দীর্ঘ অভিযোগ। ছাত্রের বাবা অভিযোগ জানিয়েছেন, শিক্ষিকা ঝিলম রায় তাঁর ছেলে বিপিন দাসের উপর এমন অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছেন যে, ছেলে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশনও সঙ্গে অ্যাটাচ করা আছে। চিঠিটা খামে ঢোকাচ্ছে, শুভদীপ স্টাফরুমে ঢুকল, "কিসের চিঠি ঝিলমদি? মুখ শুকনো কেন?"

"চার্জশিট। ডোমেস্টিক এনকোয়ারি।"

হাসল শুভদীপ, "চিন্তা কোরো না। এই নিয়ে চারজন হল।"

১৩

পুরনো আমলের হাতাওয়ালা বাড়ি। গাড়িবারান্দা। বাগানে মার্বেলের ভাঙাচোরা মূর্তি। দিন ছিল যখন, সন্ধে নামলে সেজেগুজে তৈরি হতে হত পাথরের নর্তকীদের। পাথরের গায়ে শ্যাওলা জমেছে। ভাঙা হাত, বোঁচা নাক নিয়ে মর্মর মূর্তিরাও এখন আনএমপ্লয়েড।

ভিড়। বসার জায়গা পাওয়াই মুশকিল। ভাগ্যিস অশোক সঙ্গে এসেছিল। ওর অনারে একটা চেয়ার অন্তত মিলেছে। বসে থাকতে-থাকতে কোমর ব্যথা হয়ে গেল। একবার ভাবল, উঠে একটু পায়চারি করে এলে হত। কিন্তু উঠলে যদি জায়গা বেদখল হয়ে যায়? কুরসি ছাড়লে কে-ই বা কবে তা ফিরে পেয়েছে? এত লোক উকিলের কাছে আসে?

আগে কিছু লোকের পাসটাইমই ছিল কেস করা। বিপক্ষকে আদালতের দরজায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে সর্বস্বান্ত করে তবে তাদের শান্তি হত। আজকাল মনে হয় না, তেমন মানুষ পাওয়া যাবে। তবে কাগজে যে থাকে লক্ষ-লক্ষ কেস আদালতের গুহায় বন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে, এসব জায়গায় এলে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

আবার এটাও ঠিক, আসল জায়গায় না গেলে সত্যি কথাটা জানা যায় না। বাসে-ট্রামে-রেল স্টেশনে যে হাজার-হাজার মানুষ ঘুরে বেড়ায়, দেখলে বোঝা যায় তারা অসুস্থ? হাসপাতালে যাও, গিজগিজ করছে মানুষ। তার মানে অসুখ আছে। তাদের পেতে গেলে তোমায় হাসপাতালে ঢুঁ মারতে হবে।

অ্যাডভোকেট সুনীলবরণ বোনার্জির চেম্বারে এসে ঝিলমের উপলব্ধি হল, আদালতের কামড়-খাওয়া মানুষও সংখ্যায় কিছু কম নয়।

এই উকিলের সন্ধান অশোকের দেওয়া। অশোকরা একসময় ছিল একান্নবর্তী পরিবার। উত্তর কলকাতার বনেদি ফ্যামিলি। তারপর যা হয়, ভাগ হতে-হতে পরিচয়ের তকমাটুকু বাদে সমস্ত জলুস খসে পড়ে। অশোকরাও, অশোকের বাবার মৃত্যুর পর, নিজেদের প্রাপ্যটুকু বুঝে নিয়ে, আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

"আমার ঠাকুরদা ছিলেন ডাকসাইটে উকিল। তাঁর দাপটে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। বাবা আইনি পেশাতে যায়নি। ঠাকুরদার ছোট ছেলে, মানে সুনীলকাকাই পেশাটা জিইয়ে রেখেছে। কাকার সঙ্গে বাবার বয়সের তফাত প্রায় বিশ বছরের। কাকাকে ছেলের মতোই মানুষ করেছিল বাবা। তাই আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা এখনও রয়ে গিয়েছে," অশোক বলেছিল।

আসল নাম সুনীলবরণ ব্যানার্জি। ঝিলমের ইচ্ছে হল, মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটটা দেখে। সেখানে ব্যানার্জি না বোনার্জি? হঠাৎ স্ট্রাইক করল, মাধ্যমিক? মানুষটার বয়স কত? মাধ্যমিক চালু হয় ছিয়াত্তরে। তারও আগে পাশ করে থাকলে তো মাধ্যমিক হবে না। হায়ার সেকেন্ডারি? ম্যাট্রিকুলেশন? স্কুল ফাইনাল?

আসলে এলোমেলো চিন্তা করে সময়টা কাটানোর চেষ্টা করছিল ঝিলম। এত কম নোটিসে উকিলমশাইয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্টই নাকি পাওয়া যায় না। ভাগ্যে অশোক ছিল।

চার্জশিটটা পাওয়ার পর ক'টা দিন হতভম্ব ভাবের মধ্য দিয়ে কেটেছে। ইতিকর্তব্য ঠিক করতে পারছিল না। চিঠিতে একটা তারিখ দেওয়া আছে। তার মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে।

একবার ভেবেছিল সোমনাথকে বলে। চিন্তাটা মাথায় উদয় হয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, সোমনাথ গুরুত্ব দেবে না। খুব বেশি হলে কোনও একজন উকিলের নাম করে বলবে, যাও, কথা বলে এসো। সোমনাথের নিজস্ব পরিধি, তার চাকরি, এসবের বাইরে আর কারও যে কোনও সমস্যা থাকতে পারে, সে বোধই সোমনাথের নেই। অপর্ণার কথাগুলোও মনে পড়ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্ররা বোধ হয় এই রকমই হয়। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, উদাসীন।

নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছিল অশোক। ততদিনে তার শো-কজ় খাওয়ার কাহিনিটা স্টাফরুমে সারকুলেটেড হয়ে গিয়েছে।

"কী ভাবছ ঝিলমদি?"

"কিসের কথা বলছিস?"

"ওই শো-কজ়?"

"ভাবাভাবির কী আছে?"

"জবাব দেবে না?"

"দিতে তো হবেই।"

"কী জবাব দেবে ঠিক করেছ?"

"দেখি, কী জবাব দেওয়া যায়?"

"তার মানে? নিজেই জবাব লিখবে?"
"কে আর লিখে দেবে বল?"
"লিগাল অ্যাডভাইস নেবে না?"
"লিগাল অ্যাডভাইস? নেওয়া দরকার?"
"অফ কোর্স নেওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি লিগাল অ্যাডভাইস নাও।"
অসহায় হয়ে ঘাড় নেড়েছিল ঝিলম, "কার অ্যাডভাইস নেওয়া যায় বল তো? তোর চেনা কেউ আছে?"
তখনই অশোক ওর কাকার কথা বলেছিল। বলেছিল, বয়স বেশি না হলে কী হয়, এখনই কোর্টচত্বরে নাম করেছে। সিভিল ম্যাটারে জুড়ি মেলা ভার। অশোক বলে গিয়েছিল, কাছাকাছি কোথাও যাচ্ছে। ডাক পড়লেই যেন মিসড কল দেওয়া হয়। ডাক এসেছে। মিসড কল দিয়ে উকিলবাবুর চেম্বারে ঢুকল ঝিলম।
ডাক্তার পালকে দেখেছে। অ্যাডভোকেট ব্যানার্জিকে দেখল। দু'জনেই লম্বা, চোখে চশমা, দু'জনেরই মেদবিহীন টানটান চেহারা। ডাক্তার বললেই ছবি ভেসে ওঠে ফরসা গোলগাল চেহারা, গলায় অ্যালকোহলিক ফ্যাট, অম্বর পালের তা নেই। ইনিও যেন অম্বর পালেরই যমজ ভাই।
বসতে বললেন সুনীলবরণ।
"কী খাবেন, চা না কফি? ঠান্ডা কিছু?"
বিব্রতবোধ করল ঝিলম, "না-না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।"
"তা হলে এক গ্লাস ঠান্ডা জল দিতে বলি, বসে-বসে নিশ্চয়ই গলা শুকিয়ে গেছে!"
বেল বাজালেন, আর্দালি এলে তাকে জল দিতে বলে ঝিলমের দিকে ঘুরে বসলেন ব্যানার্জি।
"আপনার কথা বলেছে অশোক।"
"ও এখনই এসে পড়বে। আমি কি ও না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব?"
"না-না, বসুন। বলুন, আপনার প্রবলেমটা ঠিক কী?'
'আমাকে একটা শো-কজ় লেটার দেওয়া হয়েছে। সেটা কি আগে দেব? পড়ে দেখবেন? নাকি ঘটনাটা আগে বলে, তারপর..."
"ঠিক আছে, শো-কজ়টাই আগে দিন।"
খাম থেকে বের করে চিঠিটা এগিয়ে দিচ্ছিল। অ্যাডভোকেট ব্যানার্জি বললেন, "খামটা দিন। ওটাও কাজে লাগবে।"
চিঠিটা মন দিয়ে পড়লেন ব্যানার্জি। বিপিনের বাবার অভিযোগপত্রের বয়ানটাও। পড়া হলে আর-একবার শো-কজ়টা পড়ায় মন দিলেন উকিলবাবু। সেই সুযোগে ঘরটা ভাল করে দেখল ঝিলম।
উঁচু ছাদ, দেওয়ালের কোনও-কোনও জায়গায় জল সোক করেছে। পিছনেই মস্ত বড় অয়েলপেন্টিং। স্যার আশুতোষমার্কা গোঁফ ভদ্রলোকের। মনে হয় উকিলবাবুর পিতৃদেব। অন্য দেওয়ালগুলোয় ঠাসা আইনের বই। ঝিলমের যথেষ্ট সন্দেহ, বের করে পাতা ওলটালে উইয়ে খাওয়া ধুলোবালি ছাড়া কিছুই মিলবে না।
উকিলবাবুর দেখা শেষ হওয়ার আগেই অশোক ঢুকল। চোখ তুলে অশোককে দেখে হাসলেন সুনীলবরণ। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন।
"চা খাবি?"
"তুমি খেলে খেতে পারি।"
"তা হলে আনাই।"
পড়া হয়ে গিয়েছিল। বাইরে বসে যে-ভদ্রলোক টাইপ করছিলেন, তাঁর হাতে চিঠিটা দিয়ে ফোটোকপি করে আনতে বললেন।
"বলুন, কী জানতে চান?" পা টান করে সোফায় এলিয়ে বসলেন সুনীলবরণ।
"আমার কী করা উচিত?"
"অবশ্যই কনটেস্ট করবেন। তবে সবার আগে একটা স্টে নেওয়া দরকার। যাতে এনকোয়ারির হিউমিলিয়েশনটা অ্যাভয়েড করা যায়।"
"কী মনে হয় তোমার? কনটেস্ট করলে ভার্ডিক্ট ফেভারেবল হবে?" অশোক জানতে চাইল।
"অবশ্যই। চার্জশিটে এতগুলো গলদ আছে যে, একটা হিয়ারিংয়ে চুকে যাবে।"
ঝিলমের দিকে তাকাল অশোক। চোখের ভাষা বলছে, বলেছিলাম না? এটা কাকার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়!
ঝিলম জানতে চাইল, "কী-কী গলদ?"
"বলছি। তার আগে জানতে চাইব, আপনাদের স্কুল কি এডেড স্কুল?"
"মানে?"
"মানে, আপনাদের মাইনে স্কুল দেয়, না সরকার?"
"যত দূর জানি, এডেড স্কুল," অশোক জবাব দিল।
"ঠিক আছে, জেনে নেওয়া যাবে। আমার লোক আছে। আচ্ছা, বলুন তো, আপনি স্কেলে মাইনে পান? জয়েন করার পর ডি আই অফিস থেকে কনফারমেশনের চিঠি পেয়েছিলেন?"
"হ্যাঁ। সে চিঠি আমার ফাইলে আছে।"
"ফাইল মানে, স্কুলে আছে? না আপনার পোজ়েশনে?"
"আমার কাছে তো আছেই। ধরে নিচ্ছি স্কুলেও আছে।"
"তা হলে, ডি আই-এর অনুমতি ছাড়া আপনাকে চার্জশিট দিতেই পারে না। ডোমেস্টিক এনকোয়ারি করতে গেলেও ডি আই-এর অনুমতি লাগে।"
"ধরে নিন সে অনুমতি ওরা পেয়েছে।"
"ইমপসিব্‌ল। সরকারি কাজে আঠারো মাসে বছর। ঘটনা ঘটল, আর তার দু'সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট, আমরা যদি ভারতবর্ষে বাস করে থাকি, তা হলে এটা অসম্ভব।"
"তার মানে, এই চিঠিটা ইরেগুলার?"
"শুধু ইরেগুলার নয়, ইললিগাল। গলদ আরও আছে। ম্যানেজিং কমিটির রেজ়োলিউশন ছাড়া আপনাকে চার্জশিট দিতে পারে না স্কুল। ম্যানেজিং কমিটির রেজ়োলিউশনের কপি কোথায়?"
অশোকের মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।
"তার মানে ঝিলমদিকে শুধু হ্যারাস করার জন্যই এই চিঠি?"
"মে বি, তা ছাড়া টেকনিকালি স্পিকিং, চার্জশিট দেওয়ার আগে শো-কজ় করতে হয়। শো-কজ়ের জবাবে সন্তুষ্ট না হলে তখন চার্জশিট। এরা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছে।"
চা এসে গিয়েছিল। অশোকের দিকে তাকালেন, "বিস্কিট খাবি? কুকিজ়?"
"না, চা-ই ভাল।... কী মনে হয়, ওদের কী উদ্দেশ্য? কেন সাত তাড়াতাড়ি চার্জশিট ধরাল ঝিলমদিকে?"
চায়ে শব্দ করে চুমুক দিলেন সুনীলবরণ। বোনার্জিটা তৎক্ষণাৎ খ
পড়ে বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে এল।
"ছ'মাসে তিনটে কেস দেখলুম। বড় স্কুলগুলো এখন কর্পোরেট হাউসের মতো চলছে। স্কেলে মাইনে দিতে যে খরচা হয়, সেই পয়সায় পাঁচটা কন্ট্র্যাক্ট-বেসিস টিচার নিতে পারবে। সরাসরি টারমিনেট করা ডিফিকাল্ট। তাই এমন পরিস্থিতি তৈরি করে, যাতে পার্মানেন্ট টিচাররা নিজেরাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এটাই গেমপ্ল্যান।"
চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আর্দালি এসে প্লেট তুলে নিয়ে গেল। এবারে ঝিলমের দিকে ঘুরলেন অ্যাডভোকেট, "আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন করার ছিল। কাইন্ডলি যতটুকু মনে আছে রিকল করার চেষ্টা করবেন।"
"বলুন।"
"ঠিক কী ঘটেছিল ক্লাসে?"



যেমন-যেমন মনে আছে, ক্লাসের ঘটনা পুরোটাই বলল ঝিলম।
"ম্যানিয়াক," সব শুনে কমেন্ট করলেন ব্যানার্জি, "আচ্ছা, এই ক্লাসের কি আপনি ক্লাসটিচার?"
"না। ক্লাসটিচার তো নই-ই, রেগুলার ক্লাসও নিই না ওই সেকশনে। সেদিন গিয়েছিলাম সাবস্টিটিউশনে। একজন টিচার, যে হিস্ট্রি পড়ায়, আসেনি, তার জায়গায়।"
"স্ট্রেঞ্জ। তা হলে ছেলেটা আপনাকে বুলি করার মতলব করল কীভাবে? ও তো জানত না, আপনি সেদিন ওদের ক্লাস নিতে যাবেন!"
একটু ইতস্তত করে আগের ঘটনাগুলো বলল ঝিলম। চিঠির কথাটা বলতেই লাফিয়ে উঠলেন অ্যাডভোকেট, "চিঠি? আছে? শিগগির বের করুন। একটা হিয়ারিংয়েই ফিনিশ করে দেব।"
ম্লান হাসল ঝিলম, "নেই। পড়ে সঙ্গে-সঙ্গেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।"
ধপাস করে বসে পড়লেন সুনীল। ঝিলম মিনমিন করে বলল, "তখন তো বুঝিনি, এতবড় ঘটনা ঘটতে চলেছে।"
"ঠিক আছে, প্রসিড।"
মাঠের ঘটনাটা যখন বলল, আর-একবার উৎসাহিত দেখাল উকিলবাবুকে, "করেছিলেন রেকর্ডিং?"
"না। ওকে ভয় দেখানোর জন্য বলেছিলাম।"
অশোক চুপচাপ শুনছিল। এবারে মুখ খুলল, "এত ঘটনা ঘটে গিয়েছে, আমাদের সঙ্গেও তো শেয়ার করোনি ঝিলমদি। আগে জানলে আমরাও কিছু স্টেপ নিতে পারতাম।"
"তার চেয়েও বড় কথা, এই কথাগুলো আগে অন্যদের সঙ্গে ডিসকাস করলে সাক্ষী হিসাবে তাদের ডাকা যেত। এখন বলতে গেলে অভিযোগকারীদের পক্ষ থেকে বলা হবে, সেল্ফ-ডিফেন্সে এই সব স্টোরি কুকআপ করছেন মিসেস রায়।"
ভুল যে করে ফেলেছে সেটা ঝিলমও বুঝতে পারছিল। কিন্তু এখন কি আর শোধরানোর কোনও উপায় আছে?
উকিলবাবু জানতে চাইলেন, "আচ্ছা, ছেলেটার বয়স কেমন হবে বলে আপনার ধারণা?"
"ঠিক বলতে পারব না। তবে ক্লাসের অন্য ছেলেদের চেয়ে যথেষ্ট বড়। সতেরো-আঠারোও হতে পারে।"
"খোঁজ নিন। পারলে ডকুমেন্ট জোগাড় করুন। শিশুনিগ্রহের গোড়ার কথা আদৌ সে শিশু কি না। সেটা জানতে পারলেও কাজ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।"
ফিজ় দিতে গেল ঝিলম।
সুনীলবরণ হেসে বললেন, "ওটা তোলা থাক। যখন ফাইল করব, একসঙ্গে চেয়ে নেব। আর মাঝখানে অশোক তো রইলই।"
বাইরে বেরিয়ে অশোক বলল, "কেমন লাগল?"
"রি-অ্যাশিওরিং। বেশ কনফিডেন্স পাওয়া গেল। মনে হল, অথৈ জলে পড়িনি।"
"না-না। কাকা তো বলেই দিল। একটা হিয়ারিংয়েই সব ফুস হয়ে যাবে। শুধু তোমাকে একটু বুঝে-সমঝে পা ফেলতে হবে ... আচ্ছা, তুমি কী গো? অত কিছু ঘটে গিয়েছে, কাউকে জানতে অবধি দাওনি? দ্যাখো তো, আগে বললে কত ভাল হত!"
হাঁটতে-হাঁটতে বড়রাস্তার দিকে এগোচ্ছিল দু'জনে। অশোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি তাড়া আছে?"
"না, কেন বল?"
"তা হলে চলো, কোথাও একটু বসি। কাছাকাছি, আমার পরিচিত একটা দোকান আছে। ভাল চিকেন পকোড়া বানায়। খেতে-খেতে কথা বলা যাবে।"
ঘড়ি দেখল ঝিলম। আজ দেরি হবে ভেবেই সব অ্যারেঞ্জ করে রাখা

আছে। পনেরো-কুড়ি মিনিট বসাই যায়।
"চল," ওর মনে পড়ল, আগেও অশোক বলেছিল বসার কথা। কিছু কথা আছে ওর বলার। আজ হয়তো বলতে চায়।
জায়গাটা ছিমছাম। কয়েকটা কেবিনও আছে। পরদা টেনে দিয়ে ঘনিষ্ঠও হতে পারে খরিদ্দার।
অশোক, দেখে মনে হচ্ছিল, দ্বিধাগ্রস্ত। কীভাবে শুরু করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না।
চিকেন পকোড়া এসে গিয়েছিল। প্লেটের উপর কী যেন দেখার চেষ্টা করল অশোক। তারপর দ্বিধা ঝেড়ে ঝিলমের দিকে তাকাল, "ঝিলমদি, তোমাকে আমি নিজের দিদির মতোই দেখি। একটা কথা বলব? অন্যভাবে নেবে না?"
"না-না। বল কী কথা?"
"আমার... কী বলব... মেয়েদের দেখলে কিছুই হয় না। কোনও এক্সাইটমেন্টই আসে না। অনেকভাবে চেষ্টা করেছি। ছবি দেখেছি, ব্লু ফিল্ম। কিছু না। কোনওটাই কাজ করেনি।"
চুপ করে রইল ঝিলম। তারপর বলল, "ভাল করেছিস অশোক। কত ছেলেই তো নিজের অক্ষমতা লুকিয়ে বিয়ে করে, তারপরে মেয়েটার জীবন তছনছ হয়ে যায়। সেখানে তুই যদি ডিসিশন নিয়ে থাকিস বিয়ে করবি না, এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।"
কী যেন ভাবল অশোক, তারপর মাথা তুলে ঝিলমের চোখে চোখ রেখে বলল, "প্রিয়তোষ আমার ক্লাসমেট ছিল স্কুলে, পরে আর্ট কলেজে পড়তে চলে যায়। এখন একটা স্কুলের আর্ট-টিচার।"
পকোড়াগুলো যে তেলে ভাজা হয়েছে, সেটা বোধ হয় ভাল নয়। ঝাঁঝালো গন্ধ। সরিয়ে রাখল ঝিলম।
"হ্যাঁ, বল, কী বলছিলি? প্রিয়তোষ, তোর স্কুলের বন্ধু, আর্ট-টিচার..."
"হ্যাঁ," চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল অশোক, "প্রিয়তোষের সঙ্গে আমার একটা রিলেশন আছে। লিভ-ইন রিলেশন। মা জানে না। চাইও না মা জানুক। মা যতদিন বেঁচে, এই রকমই চলুক। মা যখন থাকবে না..."
ঘড়ির দিকে তাকাল ঝিলম, "চল, ওটা থাক।"
"পকোড়া খেলে না?"
"তেলের গন্ধটা ভাল না।"
বাইরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে দিল অশোক।
ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে কাচ নামিয়ে দিল ঝিলম।

১৪

"ওই যে সাতটা তারা, জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো, দেখতে পাচ্ছিস?"
ঘাড় নেড়েছিল ঝিলম।
"এবারে শেষ দুটো তারা একটা সরলরেখা দিয়ে যোগ কর।"
"করেছি।"
"সরলরেখাটা সোজা উত্তরদিকে বাড়িয়ে দে।"
উত্তরদিক কোনটা খোঁজখবরের জন্য যখন এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাচ্ছে ঝিলম, ওর হাতটা টেনে উত্তরদিকে স্থাপন করেছিলেন মহেন্দ্র, "ওইটা হচ্ছে উত্তরদিক। আর সরলরেখাটা যে নক্ষত্রের খুব কাছ দিয়ে গেছে, সেটাই হচ্ছে ধ্রুবতারা। আগেকার দিনে পথ হারিয়ে গেলে ধ্রুবতারা দেখে উত্তরদিক চিনত মানুষ।"
বাবার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত ঝিলম। মাকে মনেই পড়ে না ঝিলমের। আকাশের তারা এবং পৃথিবীর মানুষ, সমস্ত চেনাই ঝিলমের বাবার হাত ধরে।
"আর ওইটা হচ্ছে কালপুরুষ। কালপুরুষের পায়ের কাছে যে তারাটা জ্বলজ্বল করছে, তার নাম লুব্ধক। কালপুরুষকে তির-ধনুক হাতে একজন শিকারি হিসাবে কল্পনা করলে, লুব্ধক হচ্ছে কালপুরুষের কুকুর," এই অবধি বলে ঝিলমকে কোলে তুলে নিতেন মহেন্দ্র। ঝিলমের গালে তাঁর খরখরে গাল ঘষতে ঘষতে বলতেন, "যখন আমি থাকব না, তখন একা একা আকাশের নীচে এসে দাঁড়াস। ওই তারার ভিড়ে মিশে থাকব আমি, ঠিক খুঁজে নেব।"
সেই বাবাও যখন না-বলে-কয়ে হঠাৎ তারার দেশে চলে গেল, ঝিলমের তখন বিয়ে হয়েছে সদ্য, আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে অনেক খুঁজেছে। খুঁজতে-খুঁজতে মনে হয়েছে, আকাশে বড্ড ভিড়। সেখানে বাবাকে খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। বরং বাবাই যদি কষ্ট করে তাকে খুঁজে নেয়!
কাল রাতে একা-একা আবার ছাদে উঠেছিল ঝিলম। অনেকদিন পরে। এখন আকাশ আরও কনজেস্টেড। তখন ছিল আকাশ, 'তারায়-তারায় খচিত'। এখন আকাশ স্যাটেলাইটের ভিড়ে জর্জরিত। কোনটা গ্রহ-নক্ষত্র আর কোনটা স্যাটেলাইট, তফাত করতে গেলে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হতে হয়।
কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্র চিনতে কবেই-বা মানুষ আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? অন্তহীন সমুদ্র, চরাচরব্যাপী আকাশ, কিংবা বরফ-ঢা পাহাড়ের মহান বিশালতার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ তার প্রশ্নের উত্ত খুঁজেছে। ছাপোষা গৃহস্থ মানুষের ছোটখাট ঘরোয়া প্রশ্ন।
ঝিলমও কিছু প্রশ্ন নিয়েই আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আকাশ কোনও জবাব দেয়নি।
আজ বিকেলে গড়িয়াহাটে হাঁটতে-হাঁটতেও ঝিলম সেই প্রশ্নগুলিই করছিল। নিজেকে অথবা সেই সব মানুষকে, যারা ঝিলমের পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিল।
ওই যে অল্পবয়সি মেয়েটি চুড়িদার কিনছে, কোনওটাই পছন্দ হচ্ছে না, একটার পর-একটা চুড়িদারের সেট দেখিয়ে দোকানদারও বিরক্ত, ও কি ভাল আছে? অথবা স্বামীর গায়ে লেপটে যে মেয়েটি ঝলমল করতে-করতে গয়নার দোকানে ঢুকল, ও কি সুখী?
ভাল থাকা ঠিক কাকে বলে? ঝিলম কি কখনও ভাল ছিল? সুখ কি ছিল ঝিলমের জীবনে, কোনওদিন? দুঃখকে অন্যদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখার নামই কি সুখ? সুখ কি শুধু পাওয়ার নয়, দেখানোরও?
আলোকিত গড়িয়াহাট, তার সমস্ত আকর্ষণ নিয়ে প্রলুব্ধ করছিল। হাঁটতে-হাঁটতে উত্তর খুঁজছিল ঝিলম। উত্তর মেলেনি।
ঋক সময় দিয়েছিল। এমন নয় যে, খেলতে গিয়েছে, রাস্তায় রান-ওভার, পাড়ার লোকেরা বাড়ির উঠোনে মৃতদেহ নামিয়ে বলেছে, "এই নিন, আপনার ছেলে, ঋক।"
ওয়ার‍্যান্টি ফুরিয়ে যাওয়া ঘড়ির মতো টিকটিক করছিল ঋকের প্রাণ। ইনফেকশন লেগেই থাকছিল। ডাক্তারবাবু আগেই বলেছিলেন। তবু হাসপাতাল, ভেন্টিলেশন এসবের প্রশ্ন যখন উঠল, ভিতর থেকে সায় পায়নি। কী হবে কষ্ট বাড়িয়ে?
অবশেষে সত্যিই যখন সেই মুহূর্তটা এল, তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছোঁয়ায় ঋকের চোখের পাতা বন্ধ করে দিল কেউ। দুঃখ নয়, হাহাকার নয়, বুকফাটা কান্নাও নয়, ঝিলমকে গ্রাস করে নিল একটাই প্রশ্ন, মৃত্যু তা হলে এ-ই?
খবর পেয়েই অফিস থেকে ছুটে এসেছিল সোমনাথ। ঝিলমকে জড়িয়ে ধরে ঋকের পাশ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ঝিলমের ইচ্ছে মেনে আচার-অনুষ্ঠান থেকে বিরত থেকেছিল। সোমনাথের পারিবারিক রীতি মেনে একদিন গৌড়ীয় মঠ থেকে সন্ন্যাসীরা এসেছিলেন। কিছু পুজোপাঠ, মন্ত্রোচ্চারণ, ব্যস, ওইটুকু।
তারপর পড়ে রইল শূন্য একটি বিছানা। থেকে গেল দেওয়ালে ম্লা হতে থাকা একটা ছবি। আর একুশ বছরের স্মৃতি।
একটা মানুষের থাকা এবং না-থাকার মধ্যে তফাত এটুকুই। আসল মৃত্যু এক শূন্যতা। সেই শূন্যতা টের পেতে কিছুটা সময় লাগে।

মৃত্যুর ঠিক পরে-পরেই আত্মীয়স্বজন লোকাচার মানুষকে ঘিরে রাখে। সেই আচ্ছন্নতা একটু-একটু করে যখন কেটে যায়, নিঃসঙ্গতা আস্তে-আস্তে গ্রাস করে মানুষকে।
যে ছিল, সে যে একটি ব্যক্তি শুধু নয়, একটি অভ্যেসও, তা বুঝে নিতে মানুষ সময় নেয়। আর যখন বুঝতে পারে, হয় বিষাদ-বিষণ্ণতা তাকে আক্রমণ করে, নতুবা অন্য কোনও অভ্যেসের দ্বারে সে উপনীত হয়। একটি সহজলভ্য অভ্যেস ঈশ্বর, তাঁর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করা। বিশ্বাসী মানুষকে ঈশ্বর আশ্রয় দেন।
কখনওই সেই ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেনি ঝিলম। এখন, এই অসময়ে তাঁকে বিরক্ত করতে মন সায় দিল না। অতএব তাঁর কাছেই আবার ফিরে গেল, যে-মানুষটিকে ঈশ্বর ভাবতে শিখিয়েছিলেন মহেন্দ্র।
একের পর এক সন্তানের মৃত্যু, ভাই দুটির তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়া, কিছুই যাঁর কাছ থেকে সৃষ্টিকে কেড়ে নিতে পারেনি, সেই রবীন্দ্রনাথের পায়েই নিজেকে সমর্পণ করল।
গত ক'টা দিন গীতবিতানের পাতা উলটেছে। একটার পর-একটা গান মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেছে। ভিতরের তরঙ্গ ক্রমশ শান্ত হয়ে এসেছে। আজও ঝিলমের মনে হল, রবীন্দ্রনাথই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন।
পার্স খুলে কার্ডটা দেখে নিল। হ্যাঁ, আছে। ননটিচিং স্টাফ রমেন ভাল তবলা বাজায়। স্কুলের প্রোগ্রামগুলো যখন ঝিলমকে ইনভল্ভ করে হত, রমেনের হ্যান্ড কাজে লাগত। তবলা ছাড়াও ড্রাম, অন্যান্য তালের যন্ত্রেও রমেন সমান পারদর্শী।
রমেন কার্ডটা যখন দিয়ে বলেছিল, "আসবেন দিদি, ভাল লাগবে," তখন কিছু না ভেবেই কার্ডটা পার্সে রেখে দিয়েছিল। ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে কালই কার্ডটা চোখে পড়ল। ফেলে দিতে গিয়েও রেখে দিল।
আসলে শুক থাকতে সন্ধেগুলো শুককে নিয়েই কেটে যেত। দিনের অ্যাটেন্ডেন্টকে টাকাপয়সা দিয়ে বিদায় করা। ওষুধ বুঝে নেওয়া। কোনও সমস্যা থাকলে জেনে নেওয়া। ফিডিং, ডায়াপার পালটানো।
হ্যাঁচকা-টানে কেউ যেন ঝিলমের সন্ধেগুলোকে খালি করে দিল। কিছুই করার নেই। সময় আর কাটিতেই চায় না।
কার্ডটা পেয়ে ঝিলমের মনে হল, যাক, একটা দিন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে সময়টা ভালই কাটবে।
বেলের আওয়াজ শুনতে-শুনতে হলে ঢুকল ঝিলম। অন্ধকার, গেটকিপার বলে দিয়েছিলেন, সামনের দুটো রো বাদ দিয়ে যেখানে খুশি বসতে পারেন। হাতড়ে-হাতড়ে যেখানে খালি পেল, বসে পড়ল। চোখ সয়ে এলে দেখল, পরিশ্রম বৃথা। বেশির ভাগ সিটই খালি। গান শোনার লোকও আর হয় না। তার উপর রবীন্দ্রসঙ্গীত! পরদা সরার আগেই এলেন সঞ্চালক।
হোঁচট খেল ঝিলম। শাড়ি নয়। স্কার্ট-টপ। খোঁপায় জড়ানো রজনীগন্ধা নয়। টপ-নট। হাই হিল।
মনটাকে নিজেই বোঝাল ঝিলম। যে সময়ের যেমন। রক্ষণশীলতার মোড়কে মুড়ে রেখেই তো এতকাল রবীন্দ্রনাথকে আটকে রাখা হয়েছে। এলই না কিছুটা খোলা হাওয়া! রবীন্দ্রনাথ নিজেও তো আধুনিকতায় বিশ্বাস করতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সে-কালের তুলনায় সাজে-ঠাটে-স্টাইলে তো অনেকখানিই এগিয়েছিলেন।
সঞ্চালক নিজের পরিচয় দিলেন, "হাই! আমি ঈপ-সিতা বলছি।"
তাই তো! বাংলার ছাত্রী হয়েও কেন যে খেয়াল করেনি, ঈপ্সিতায় একজন সীতা প্রচ্ছন্ন রয়েছেন!
"আমি যে আর্টিস্টের ইন্ট্রো দিতে এসেছি, ট্রুলি স্পিকিং তাঁর কোনও ইন্ট্রো লাগে না। শি হারসেল্ফ ইজ় অ্যান ইনস্টিটিউশন। টেগোর'স সংয়ে তিনি একজন অথরিটি। সো, মে আই কল হার? মিসেস কর্নীনিকা বড়ুয়া! ওয়েলকাম টু দ্য স্টেজ। গিভ হার আ বিগ হ্যান্ড!"
রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত প্রেক্ষাগৃহ করতালিতে মুখর হয়ে উঠল। পরদা সরে গেল। মঞ্চের মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালেন শিল্পী। আবার ধাক্কা! শিল্পী শ্রীমতী বড়ুয়া একটি হলুদ মেখলা পরেছেন। ভঙ্গিটিও বিনম্র। দু'হাত জড়ো করে নত হয়ে অভ্যাগতদের প্রণাম জানালেন।
কিন্তু আসন গ্রহণ করলেন না তো! বদলে গলার কাছে লটকে দেওয়া হল কলার মাইক। পিছনেই বসে রয়েছেন যন্ত্রীরা। রমেনকেও দেখতে পেল তাদের মধ্যে।
কিন্তু তবলা কোথায়? তানপুরা? এসরাজ? বদলে জানা-অজানা যন্ত্রে যন্ত্রে মঞ্চ ছয়লাপ। কী নেই সেখানে? বেশির ভাগ যন্ত্র চেনেই না ঝিলম।
রমেনের সামনেও তবলার বদলে ড্রাম।
দেবব্রত বিশ্বাসের কথা মনে পড়ল। এখন হলে আর লেখা হত না 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'।
"আমি রবিঠাকুরের প্রেমপর্যায়ের গান দিয়ে শুরু করব।"
কল্পনার আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল ঝিলম। 'রবিঠাকুর!' অধ্যাপক অরুণ বসু বলতেন, 'রবীন্দ্রনাথের গানকে পর্যায়ে ভাগ করা কিছুটা আরোপিত। মন দিয়ে শুনলে বুঝবে, প্রেমপর্যায়ের গানেও কবির নিবেদন আসলে ঈশ্বরের কাছে।'
প্রথম গান:
"কেটেছে একেলা, বিরহের বেলা
আকাশকুসুম-চয়নে।"
খটকা লাগল। 'চয়নের', নে-র পর একটা সূক্ষ্ম কাজ আছে। শিল্পী সেটা পাশ কাটিয়ে গেলেন। ঝিলমকে অবাক করে পরবর্তী লাইনে, 'সব পথ এসে মিলে গেল শেষে/ তোমার দুখানি নয়নে'-র 'নয়নে' একবারমাত্র উচ্চারণ করলেন।
ঝিলমই কি ভুল করছে? মনে-মনে গানের লাইন দুটো নিজেই গাইল। না, ভুল তো তার নয়! ছোট থেকে যা শুনে এসেছে, তার সঙ্গে শিল্পীর গাওয়া গান তো মিলছে না!
পরের গান:
"আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।"
আবার সংঘাত।
এখানে 'সকল' শব্দটির মধ্যে যে উজাড় করা আকুলতা, তা তো পাওয়া গেল না! তেমনই, 'আশায়' শব্দটি হঠাৎ শেষ হয়ে যে সুরের কুহক তৈরি করে, তাও যেন রয়ে গেল অনুপস্থিত।
অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।
টানটান হয়ে বসল।
তার অতি প্রিয় একটি গান ধরেছেন শিল্পী:
"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।"
এখানে প্রথম অংশে 'তোমায়'-এর উপর ঝোঁক, দ্বিতীয় অংশে জোর 'ভোলাব'-তে। উদ্দেশ্য নিয়েই নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ সেটা করেছিলেন। শিল্পী তার ধার দিয়েও গেলেন না।
কথা হল, সুরও হল। প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল না।
বাইরে বেরিয়ে এল ঝিলম।
হঠাৎ কানের কাছ থেকে, "কী হল উঠে এলেন যে? ভাল লাগল না?"
বিদ্রোহ বসু। উনি কি এখানেই ঘুরে বেড়ান?
"আপনার কেমন লাগল?'
"আপনার যেমন লেগেছে।"
তা হলে ঝিলম একা নয়? এই গান, যা রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে গাওয়া হচ্ছে, আর কারও যে তা ভাল লাগেনি, ভাবতে গিয়েই মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল ঝিলমের।
"আজ নিশ্চয়ই তাড়া নেই। চলুন, কোথাও বসা যাক।"

খুব কাছে পাশাপাশি হাঁটছিলেন বিদ্রোহ। একটা গন্ধ, যা সোমনাথ পার্টি থেকে ফিরলে ওর নিশ্বাসে মিশে থাকে, সেটাই পাচ্ছিল ঝিলম।
ও সতর্ক হল, "না, মানে আটটার সময় একজনের আসার কথা।"
"তিনি ভাগ্যবান," রাস্তা পার হতে-হতে বিদ্রোহ বললেন।
ঝিলম কথা বলছিল না। বিদ্রোহই আবার মুখ খুললেন, "সেদিন তো ফোন নম্বরটাও দিলেন না।"
"কী করবেন ফোন নম্বর দিয়ে?"
"নতুন একটা লেখা, শেষ হলে খুব ইচ্ছা হয় কাউকে পড়ে শোনাই। বিশেষ কেউ। যে বুঝবে। তখন ফোন করতাম। অথবা অনুরোধ করতাম, প্রিয় কোনও কবিতা পড়ে শোনাবার।"
মেট্রোর গেট সামনেই, কিন্তু রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিদ্রোহ। "সাহস দিলে আরও কিছু আবদার করতাম।"
"যেমন?"
"যেমন ধরুন, উইকএন্ডে দু'জনে কোথাও উধাও হয়ে যাওয়ার। দিঘা কিংবা বকখালি। ...আপনার ইচ্ছে করে না?"
কী অনায়াসে প্রস্তাবটা দিলেন বিদ্রোহ। যেন, চলুন না, ভিক্টোরিয়ার সামনে দু'জনে ভেলপুরি খাই!
ঝিলম বলল, "নাইন সেভেন ডাবল থ্রি এইট জ়িরো সেভেন ওয়ান থ্রি ওয়ান।"
"আপনার ফোন নম্বর?" পকেট থেকে মোবাইলটা বের করলেন বিদ্রোহ। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে। শিকার ধরার ঠিক আগে বাঘের চোখে যে-দীপ্তি দেখা যায়।
"আর-একবার বলুন?" বিদ্রোহ জিজ্ঞেস করলেন।
নম্বরটা আর-একবার উচ্চারণ করল ঝিলম। তারপর বিদ্রোহের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বলল, "আমার হাজ়ব্যান্ডের নম্বর। সোমনাথ রায়। উনিও বেড়াতে ভালবাসেন। আর হ্যাঁ, ভুলবেন না, আপনার স্ত্রীকেও সঙ্গে নেবেন।"
বিদ্রোহকে মেট্রোর গেটে দাঁড় করিয়ে রেখে সিঁড়ি বেয়ে হনহন করে নেমে গেল ঝিলম।

১৫

দ্রুত বদলে যেতে লাগল স্কুলের পরিস্থিতি। ক্লাসটিচারের লিস্ট থেকে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ঝিলমের নাম বাদ গিয়েছিল। প্রতি বছর ঘটা করে বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছেলেরাই অংশ নেয়। ওটার দায়িত্ব ঝিলমকেই নিতে হয়। পাগলা দাশু করিয়েছিল। করিয়েছিল বুড়ো আংলা। একবার ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে চিত্রাঙ্গদা পর্যন্ত করিয়ে ছেড়েছিল। ক'টা সপ্তাহ বাচ্চাগুলোর সঙ্গে হইহই করা, তার আবেশ, আর প্রোগ্রাম শেষে গার্জিয়ানদের করা মন্তব্য, এই দুটোর জন্যই সারাটা বছর অপেক্ষা করে থাকত ঝিলম।
এবারে সেখান থেকেও ঝিলমকে বাদ দেওয়া হল। পরিবর্তে যে পদার্থটা নামানো হল, তা দেখে যা মুখে আসে তাই বলে গেলেন অভিভাবকরা।
কর্তৃপক্ষ সব শুনেও চুপ করে বসে রইলেন।
ঝিলম একা নয়। যে-যে টিচারের বিরুদ্ধে তদন্তপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বা হবে, সকলকেই সাইডলাইন করা শুরু হয়ে গেল। বোঝা গেল এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পিত চক্রান্তের মুখপাত।
এতকালের রেওয়াজ, টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়া। সেই খাওয়ার জায়গা, টিচার্সরুম সর্বত্র সিসিটিভিতে ছয়লাপ। ঝিলম লক্ষ করল অন্যরা, মানে যারা এখনও 'কেস' খায়নি, ঝিলমের সঙ্গে খেতে-খেতে বারবার টিভির ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছে।
ঝিলম নিজে থেকেই একদিন বলল, "তোদেরও তো ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। আমাদের মনে হয় এখন থেকে একসঙ্গে না খাওয়াই ভাল।"
সবাই একসঙ্গে হইহই করে উঠল, "কী যে বলো ঝিলমদি, তাই কখনও হয়?"
কিন্তু পরদিন ঝিলম যখন একাই এক কোনায় বসে টিফিনকৌটোর ঢাকনা খুলল, কেউই এগিয়ে এসে তার খাবারে ভাগ বসাল না। দেওয়ালের লিখন পড়তে দেরি হল না। ঝিলম বুঝে গেল, এখন থেকে তার টিফিন তাকে একাই খেতে হবে।
চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন দেখা গেল ঝুমা মিত্রর আচরণে। যে ঝুমা মিত্র সুযোগ পেলেই খাবারে ভাগ বসাতেন, তিনিই যেন ঝিলমকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। তখনই ঝিলমের একটা কথা মনে পড়ে গেল, যেটা উকিলবাবুকে বলতে একদম ভুলে গিয়েছে।
এর মধ্যে উকিলবাবুর চেম্বারে গিয়েছিল। কিছু সইসাবুদ করবার ছিল। খামে ভরে টাকাও নিয়েছিল সঙ্গে। সেদিন আর আপত্তি করেননি বোনার্জি।
আজ সন্ধেবেলা চেম্বারে পৌঁছে যখন বাইরে থেকে স্লিপ পাঠাল, তাড়াতাড়িই ডেকে নিলেন উকিলবাবু।
"আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। আপনি না এলে আমিই ফোন করতাম।"
"জরুরি কিছু?"
"হ্যাঁ। একটা খারাপ খবর আছে। মাঝে-মাঝে জজসাহেবদের চেম্বার অদলবদল হয়। আপনার কেসটা সেইরকম, ঘর বদলের ধাক্কায় অন্য জজসাহেবের এক্তিয়ারে চলে গেছে।"
"তাতে ভাল না মন্দ?"
"মন্দ। কারণ, এই ঘরে কেসটা উপরে উঠে এসেছিল। অন্য ঘরে সেটা তলায় চলে গেছে। উপরে আসতে সময় লাগবে।"
"তার ফল?"
"ফল এই, এখনই আপনি স্টে-অর্ডার পাচ্ছেন না। একটা-দুটো দি আপনাকে ডোমেস্টিক এনকোয়ারি ফেস করতে হবে। ...কবে যেন আপনার ডেট?"
"সামনের শনিবার।"
"ঠিক আছে। কয়েকটা প্রশ্ন রেডি করে দেব, যেগুলো সেদিন করতে পারবেন।"
ঝিলম বলল, "একটা পয়েন্ট বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। জানি না রেলিভেন্ট কি না। আজ সেটাই জানাতে এসেছিলাম।"
"বলুন।"
"সাক্ষীদের তালিকায় ঝুমা মিত্রর নাম আছে।"
"তিনি তো বোধ হয় আপনার সহকর্মী।"
"হ্যাঁ। কিন্তু ঘটনা যখন ঘটে, তিনি আশপাশে কোথাও ছিলেন না।"
"বলেন কী? এটা তো ভাইটাল পয়েন্ট। প্রমাণ করতে পারবেন, উনি সেই সময় ওখানে ছিলেন না?"
একটু ভাবল ঝিলম। তারপর বলল, "বোধ হয় পারব। কারণ, করিডরের পুরোটাই ক্লোজ়ড সার্কিট টিভির আওতায়। ঝুমাদি করিডরে থাকলে, এমনকী হেঁটে গেলেও সি সি টিভির ক্যামেরায় ধরা পড়বে।"
অ্যাডভোকেট বোনার্জি বললেন, "কালকেই গিয়ে খোঁজ নিন। কোনও-কোনও সি সি টিভির রেকর্ডিং দু'দিন পর-পরই মুছে যায়। কোনওটা সেভ করা থাকে। আপনাদেরটার কী সিস্টেম জানতে হবে। তবে খুব গোপনে করতে হবে। কেউ জানতে না পারে।"
আজ শনিবার।
রমেন বলেছিল, খোঁজ নিয়ে জানাবে সি সি টিভির ব্যাপারটা।

হেডমাস্টারের ঘরে ডোমেস্টিক এনকোয়ারির প্রথম মিটিং। বিকেল পাঁচটায়। স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছে। স্কুল প্রেমিসেস ফাঁকা। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে রমেনকে খুঁজল। নেই। ঘড়ি দেখল। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর ওয়েট করা যাবে না।
হেডমাস্টার নেই। মধ্যবয়সি এক ভদ্রমহিলা উকিলের চোগা-চাপকান চাপিয়ে বসে বসে ঘামছেন। ডেকে বসালেন ঝিলমকে। বললেন, "আমার নাম অণিমা বিশ্বাস। আমি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। আমাকেই স্কুল কর্তৃপক্ষ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার অ্যাপয়েন্ট করেছেন।"
তারপর পাশের চেয়ারে বসা ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, "ইনি মিস্টার বিকাশ সান্যাল। প্রেজেন্টিং অফিসার। ওঁকেও স্কুল কর্তৃপক্ষই অ্যাপয়েন্ট করেছেন।"
তৃতীয় যে ভদ্রলোক, ঝিলমের মুখোমুখি বসে এতক্ষণ ঝিলমকে জরিপ করছিলেন, তাঁকে ইন্ট্রোডিউস করানোর আগেই ঝিলম প্রশ্ন করল, "মাফ করবেন। আপনি ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, ইনি প্রেজেন্টিং অফিসার, আপনি বলছেন, আপনাদের নিয়োগ করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ বলতে কী মিন করছেন? ম্যানেজিং কমিটি? তা হলে তো ম্যানেজিং কমিটির রেজোলিউশন আছে, সেটা একবার দেখাবেন?"
মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন বিশ্বাস এবং সান্যাল। সান্যাল জবাব দিলেন, "পরের দিন রেজোলিউশনের কপি প্রোভাইড করা হবে।"
"তা হলে আমিও পরের দিনই আসব। ম্যানেজিং কমিটির রেজোলিউশন দেখব, তারপর এনকোয়ারি অ্যাটেন্ড করব।"
হাঁ-হাঁ করে উঠলেন অ্যাডভোকেট বিশ্বাস, "না-না, পরের দিন মিটিং শুরু করার আগে আপনাকে রেজোলিউশনের কপি দেওয়া হবে, আমি অ্যাশিওরেন্স দিচ্ছি।"
"ঠিক আছে। আজকের মিটিংয়ের মিনিট্‌সে যেন লেখা হয়, রেজোলিউশনের কপি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে দেখানো হয়নি।"
"পরের দিন দেখানো হবে, বলা হয়েছে," সান্যাল বললেন।
"বেশ," এবার ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের দিকে তাকাল ঝিলম, "আমাদের তো ডিএ গেটিং স্কুল। যে-কোনও পার্মানেন্ট টিচারের বিরুদ্ধে এনকোয়ারি করতে গেলে ডি আইয়ের পারমিশন লাগে। কাইন্ডলি পারমিশন লেটারটা আমাকে দেখানো হোক।"
এবারে দৃশ্যতই রেগে উঠলেন সান্যাল, "আপনি কি একটার পর একটা লিগাল ট্যাঙ্গল তুলে মিটিংটা বানচাল করতে চাইছেন?"
গলা একদম খাদে নামিয়ে ঝিলম জবাব দিল, "একেবারেই না। আপনাকে যিনি অ্যাপয়েন্ট করেছেন, সেই স্কুল কর্তৃপক্ষ, তাঁর সেই অথরিটি আছে কি না দেখব না? যে-কোনও এডেড স্কুল সরকারি নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। আমাদের স্কুলও তার ব্যতিক্রম নয়। অথচ আপনি বলছেন, আমি লিগাল ট্যাঙ্গল তুলছি। আমি যদি বলি, আইনকানুনকে ফ্লাউট করছেন আপনারাই, সেটা কি খুব অন্যায় হবে?"
সান্যাল চুপ করে গেলেন। সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে অণিমা বিশ্বাস বললেন, "রাগ করবেন না, মিসেস রায়। আমরা এনকোয়ারিটা শুরু করব বলেই আজ এসেছি। কথা দিচ্ছি, যা-যা ডকুমেন্ট আপনি চাইছেন, পরদিন মিটিং শুরুর আগেই সেগুলো প্রোভাইড করা হবে।"

কারণ কি সৈকত? সৈকতের অসময়ে চলে যাওয়া? ঝিলমকে ডেকে আনার উদ্দেশ্য কি তাই? দেখানো? এই অবস্থার জন্য তুমিই দায়ী?



"আর-একটা কথা।"
"আবার কথা?" এবারে হেসে ফেললেন অণিমা। চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে বসে বললেন, "বলুন।"
"আপনি ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, স্কুল আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে। মিস্টার সান্যাল প্রেজেন্টিং অফিসার, ওঁকেও অ্যাপয়েন্ট করেছে স্কুল। আর-একজন যিনি রয়েছেন, তিনিও আমার পক্ষের কেউ নন। আমি একা। আমাকেও একজন ল ইয়ার নিতে দেওয়া হোক।"
অণিমা বিশ্বাস ইতস্তত করলেন, "ডোমেস্টিক এনকোয়ারিতে অভিযুক্তকে ল ইয়ার নিতে দেওয়া হয় না। নিজেকেই নিজের ডিফেন্স করতে হয়।"
"আইন কি তাই বলে?"
অণিমা বিশ্বাসের মুখের কথা ছিনিয়ে নিলেন বিকাশ সান্যাল, "হ্যাঁ, তা-ই বলে।"
ঝিলম অণিমা বিশ্বাসের চোখ থেকে চোখ সরাল না, "ঠিক আছে। আইনের যে ধারায় আমাকে ল ইয়ার নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হল, সেটাও যেন মিনিট্‌সে উল্লেখ করা থাকে।"
এবারে উলটোদিকে বসা ভদ্রলোককে ইন্ট্রোডিউস করলেন অ্যাডভোকেট বিশ্বাস, "ইনি মিস্টার সাধন দাস, বিপিন দাসের বাবা। উনিই অভিযোগ করেছেন। অভিযোগটা কি একবার পড়ে শোনাব?"
"পড়ুন।"
অণিমা বিশ্বাস যতক্ষণ কমপ্লেন্ট লেটারটা পড়ছেন, ততক্ষণ বিপিনের বাবাকে একমনে দেখতে থাকল ঝিলম। নির্ঘাৎ ফলওয়ালা কিংবা হার্ডওয়্যারের দোকানের মালিক। অ্যাডভোকেট বোনার্জি বলছিলেন, "এই কমপ্লেন্ট লেটারটাও ভদ্রলোকের নিজের লেখা নয়। ওঁকে ডেকে বলা হয়েছে সাইন করতে।"
চিঠিটা আগেই বার-তিরিশ পড়া হয়ে গিয়েছে ঝিলমের। প্রতিটা শব্দই মুখস্থ। তাই মন না দিলেও চলবে।
মন দিল, যখন অভিযোগের বয়ানটাই আবার প্রশ্নের আকারে সাধন দাসের কাছে রাখা হল। বোঝা যাচ্ছিল, তালিম দিয়ে আনা হয়েছে। তাই তোতাপাখির মতো উত্তরগুলো আউড়ে গেলেন দাস। এমনকী, মাঝে-মাঝে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলে পরের প্রশ্নের উত্তরে চলে যাচ্ছিলেন। তখন রাস্তা দেখিয়ে ফেরত আনার কাজটা বিকাশ সান্যালকেই করতে হচ্ছিল।
এবারে ক্রস-এগজামিনেশন।
ঝিলম সোজা তাকাল সাধন দাসের দিকে, "মিস্টার দাস, কাইন্ডলি বলবেন, আপনার পেশা কী? কী করেন আপনি?"
"আমার একটা রেশন দোকান আছে। পাশাপাশি আটাচাকিও চালাই। বাসের পারমিট পেয়েছি। আশা করি দু'-তিন মাসের মধ্যে বাসটাও নামাতে পারব।"
"দারুণ! বাঙালি ব্যবসায় উন্নতি করছে, এমন তো দেখাই যায় না!"
বিগলিত হাসলেন সাধন।
"লেখাপড়া কতদূর করেছেন?"
"মাধ্যমিক অবধি। মানে, বাবা মারা গেলেন, মাধ্যমিকটা আর দিয়ে উঠতে পারিনি।"
"বেশ-বেশ। তা, যে চিঠিটা আপনি পড়লেন, এটা আপনার নিজেরই লেখা তো?"

সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সান্যাল, "এ আবার কী প্রশ্ন? এ তো সরাসরি অভিযোগকারীকে অপমান করা। এই প্রশ্ন করা চলবে না।"
প্রশ্ন বাদ দিলেন অ্যাডভোকেট বিশ্বাস।
"ঠিক আছে। অন্যভাবে প্রশ্নটা করছি। চিঠিটা টাইপ করা, নীচে আপনার সই। টাইপ আপনি নিজে করেছিলেন? না অন্য কেউ টাইপ করা চিঠির নীচে আপনাকে সই করতে বলেছিলেন?"
আবার অবজেক্ট করলেন সান্যাল। আবার বাদ গেল প্রশ্ন।
"আচ্ছা মিস্টার দাস, চিঠিটা কোথা থেকে টাইপ করেছিলেন?"
উত্তর দেওয়ার আগে সান্যালের দিকে তাকালেন দাস। তারপর জবাব দিলেন, "পাড়ার দোকান থেকে।"
"এমনি টাইপ, না কম্পিউটার টাইপ?"
দৃশ্যতই নার্ভাস দেখাল দাসকে, "ঠিক মনে পড়ছে না।"
"সে কী কথা? আপনি টাইপ করালেন, অথচ কী যন্ত্রে টাইপ করা হল মনে করতে পারছেন না?"
জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন দাস। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বললেন, "পরের প্রশ্ন করুন।"
"যে দোকান থেকে টাইপ করালেন তার নাম কী?"
"মনে পড়ছে না।"
"পাড়ার দোকান, তার নামও মনে নেই?"
"পরের দিন দেখে এসে বলব।"
হাসল ঝিলম।
পরের প্রশ্ন, "আচ্ছা সাধনবাবু, আপনি চিঠিতে লিখেছেন, আপনার ছেলে বিপিন, স্কুল থেকে ফিরেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে।"
"হ্যাঁ। তিনদিন খায়নি, ওঠেনি, শুধু কান্নাকাটি করেছে।"
"আপনি নিজের হাতে অভিযোগটা লিখেছেন, তারপর নিয়ে গিয়েছেন টাইপ করাতে, এমনটাই তো বললেন?"
"হ্যাঁ।"
"বেশ। এই কাগজ-কলম দিচ্ছি। শয্যাশায়ী বানানটা লিখে দেখান তো।"
কলম নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন সাধন দাস। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজ-কলম ফিরিয়ে দিলেন ঝিলমকে।
ঝিলম আবার প্রশ্ন করল, "ঘটনা ঘটার ঠিক কতদিন পর স্কুল থেকে আপনাকে ডেকে পাঠানো হয়?"
সান্যাল অবজেকশন দেওয়ার আগেই সাধন দাস বলে ফেললেন, "দিনতিনেক হবে।"
"আর সেদিনই আপনি এই চিঠিটায় সই করেন, তাই তো?"
"হ্যাঁ।"
এবারে হইহই করে উঠলেন সান্যাল। "লিডিং কোয়েশ্চেন, বাদ দেওয়া হোক," বলে অনেক চেঁচামেচি করলেন। কিন্তু ঝিলম লক্ষ করল, এই প্রশ্ন এবং তার উত্তর বাদ দিলেন না ইনভেস্টিগেটিং অফিসার।
"আচ্ছা মিস্টার দাস, বিপিন তো ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল?"
"হ্যাঁ।"
"কী ওষুধ? নাম মনে আছে?"
"বলতে পারব না। আমি তো ডাক্তার নই।"
"তা হলে ঘুমের ওষুধ বুঝলেন কী করে?"
"ডাক্তারবাবু বলেছিলেন।"
"ডাক্তারবাবুকে কবে দেখানো হয়েছিল?"
"বিপিন যেদিন ঘুমের ওষুধ খায়, তারপর।"
"তার মানে আপনি জমা দেওয়ার পর, তাই তো?"
"হ্যাঁ।"
"ডাক্তারবাবুর নাম মনে আছে?"
"না।"
'ডাক্তারবাবুর কোনও প্রেসক্রিপশন আছে?'
"বাড়িতে আছে।"
"পরদিন দেখাতে পারবেন?"
"খুঁজে দেখব। পেলে দেখিয়ে যাব।"

বাইরে বেরিয়ে দেখল রমেন দাঁড়িয়ে আছে। রমেনকে নিয়ে একটা খালি ক্লাসরুমে ঢুকল ঝিলম। সব জায়গায় সি সি টিভি, ক্লাসরুমগুলো ছাড়া।
"জানা গেল কিছু?"
"সি সি টিভি-র ছবি রাখা হয় না। খোঁজ নিয়েছি।"
তার মানে লাভ হল না। ঝুমা মিত্র কীভাবে উইটনেস হলেন, তার প্রমাণ না স্কুল কর্তৃপক্ষ দাখিল করতে পারবে, না ঝিলম চ্যালেঞ্জ করতে পারবে।
হাঁটতে-হাঁটতে করিডর পার হয়ে মাঠের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ঝিলম।
"আন্টি!"
ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকাল।
এই স্কুলে ম্যাম বলা দস্তুর। 'আন্টি' বলে কে ডাকল?
কে যেন মনে করিয়ে দিল, এই নামে একজনই ডাকে ঝিলমকে।
ঝিলম ঘুরল। আস্তিক।
সেই বড়-বড় নিষ্পাপ চোখ। রোদে খেলছিল বোধ হয়। টকটকে লাল ফরসা দু'খানা গাল।
"কীরে আস্তিক? কিছু বলবি?"
ঘাড় নাড়ল আস্তিক। কিন্তু বলল না। ঝিলমের সঙ্গে-সঙ্গে গেট অবধি গেল।
গেটের কাছে গিয়ে ঝিলম দাঁড়াল।
"বাড়ি যাবি কী করে?"
"বাবা আসবে। ওয়েট করতে বলেছে। ফেরার পথে নিয়ে যাবে।"
"কীসে আসবে বাবা?"
"স্কুটারে।"
"হেলমেট আছে?"
"হ্যাঁ।"
ঝিলম খবর পেয়েছিল, আস্তিকের মা আর নেই। ক'দিন স্কুলে আসেনি আস্তিক। ওর বন্ধুরা দিয়েছিল খবরটা।
হঠাৎ ঝিলমকে চমকে দিয়ে আস্তিক বলে উঠল, "তুমি আমার মা হবে আন্টি?"
কেঁপে উঠল ঝিলম।
ঋক কখনও ঝিলমকে 'মা' বলে ডাকেনি। ঝিলমকে ঋকের জন্য স্কুলগেটের বাইরে হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। ছুটি হলে অন্য বাচ্চাদের মতো ছুটতে-ছুটতে এসে ঝিলমের বুকে আছড়ে পড়েনি ঋক। ঋককে সঙ্গে নিয়ে পুজোর জামা কিনতে বেরোতে হয়নি ঝিলমকে। ঋকের আঁকা ছবিতে আঙুল বুলিয়ে গর্বে কোনওদিন বুক ভরে ওঠেনি ঝিলমের।
ঋক ছিল একটা অভ্যেস এবং প্রমাণ যে, ঝিলম মা হতে পারে। বায়োলজিকাল মাদার। ওই পর্যন্ত। সত্যিকারের মা কি কোনওদিন হয়ে উঠতে পেরেছে ঝিলম? সেই ব্যর্থতা, সেই অতৃপ্তি কি ঝিলমকে দগ্ধ করে না? আর এখন একটি শিশু, সদ্য মাতৃহারা বালক, তার কাছে মাতৃত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত। কী করবে ঝিলম?
ধরা যাক, ঝিলম সেই আহ্বানে সাড়া দিল। কিন্তু কীরকম সাড়া? আস্তিকের মায়ের জায়গায় নিজেকে স্থাপন করার অর্থ কি আরও একটি সম্পর্ককেও স্বীকার করে নেওয়া নয়? তা কি পারে ঝিলম? তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়, কেবলমাত্র মাতৃত্বের শূন্যতা পূরণেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে, সেই দায়িত্বেও যদি খামতি থেকে যায়? একবার মাতৃহারা বালক যদি দ্বিতীয়বার মাতৃহারা

হয়? আরও খারাপ সম্ভাবনা, চাইল্ড সাইকায়াট্রিস্ট যদি তার দিকেই আঙুল তুলে বলেন, আস্তিকের জীবনে যা-যা ঘটে গিয়েছে তার জন্য যদি একজনও দায়ী থাকেন, তিনি ওর শিক্ষিকা, ঝিলম রায়, কী উত্তর দেবে ঝিলম?
একটা তৃতীয় শ্রেণির সিরিয়ালে যা-যা ঘটতে পারত, তার কিছুই ঘটল না।
নিচু হল ঝিলম। আস্তিকের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, "যখন যেটা বুঝতে পারবে না, ছুটির পর আমার কাছে এসে বুঝে নেবে। মনে থাকবে?"
ঘাড় নেড়ে ছুটে চলে গেল আস্তিক।
ওর চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে মনে করার চেষ্টা করল, কতদিন পর কোনও ছাত্রকে 'তুই' না বলে 'তুমি' সম্বোধন করল ঝিলম।

১৬

জ্ঞান এবং অজ্ঞান, কনশাস এবং আনকনশাস, এর মধ্যেও আর একটা স্তর আছে, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় সাবকনশাস। সাবকনশাস-এর কি কোনও বাংলা প্রতিশব্দ আছে? মনে করতে পারল না ঝিলম।
প্রতিশব্দ না থাক, সাবকনশাস বলে সত্যিই যে একটা মানসিক অবস্থা আছে, সেটা মাঝে-মাঝে টের পাওয়া যায়।
আজকাল স্কুল ছুটির পর একটা অস্থিরতা ঘিরে ধরে ঝিলমকে। কোথায় যাবে? কী করবে? ঋক থাকতে, ছুটির আওয়াজ হয়েছে কী হয়নি, ঝিলম রাস্তায়। ঋক চলে যাওয়ার পর ছুটি শব্দটাই যেন দৈনন্দিনতা থেকে কেউ ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল।
সিনেমা-থিয়েটার-শপিং কোনওদিনই সেইভাবে আর টানে না ঝিলমকে। থিয়েটার একসময় টানত। না দেখে দেখে সেটাতেও চড়া পড়ে গিয়েছে। শ্রুতিনাটক-আবৃত্তি-গান! আবার হয়তো নতুন করে শুরু করতে হবে।
আজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। পড়ে থাকা দিনটা যেন আরও লম্বা হয়ে গ্রাস করে নিল ঝিলমকে। কী করবে? ভাবতে-ভাবতেই হঠাৎ খেয়াল করল, সে এসে পড়েছে রেললাইনের ধারে ঝুপড়িগুলোর কাছে। এখানে আসবে, এমন উদ্দেশ্য কিন্তু ঝিলমের ছিল না। ছিল না মানে, জানত ছিল না। কিংবা হয়তো ছিল, সাবকনশাসে। এবার মনে পড়েছে, অবচেতনে। নইলে পায়ে-পায়ে এত দূর এসে পৌঁছল কী করে?
স্বাগতাদির কথাগুলো মনে পড়ল, "একদিন আসিস। ভাল লাগবে।"
ছেলে বিদেশে। সেখানেই সেট্‌ল করেছে। আর ফিরবে না। স্বামী মারা যাওয়ার পর এই একটা জায়গাতেই নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন স্বাগতাদি।
স্বাগতাদি ঝিলমদের পড়াতেন, কিন্তু পড়ানো মানে যে কতগুলো বইয়ের শব্দ আউড়ে যাওয়া নয়, স্বাগতাদিকে দেখে সে বুঝতে শিখেছিল। বলা উচিত, শিক্ষকতাতেই যে থেকে যাওয়া, তার রসদও স্বাগতাদির কাছ থেকেই পাওয়া।
ঠিকানাটা ছিল। স্বাগতাদির হাতের লেখায় পথনির্দেশও ছিল। খুঁজতে হল। খেলার মাঠ পার হয়ে স্বাগতাদি কোথায় বসেন জেনে ঘরে ঢোকামাত্র স্বাগতাদি যখন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসেছিস? আয়। একটু বোস। এঁদের ছেড়ে দিয়েই আসছি," তখন মাঝখানের অনেকগুলো বছর কোথা দিয়ে উড়ে গেল টেরই পেল না ঝিলম। যেন ঝিলমের আসার কথা ছিল। যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন স্বাগতাদি।
একটা ঘরই পাকা। বাকি ঘরগুলো হয় কাঁচা, নইলে সিমেন্টের দেওয়াল টিনের চাল। গ্রীষ্মকালে নিশ্চয়ই গরমে সেদ্ধ হয় বাচ্চাগুলো। ক্লাস চলছে। নামতার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এখনও নামতা শেখানো হয়? পৃথিবী কি এখানেই থেমে গিয়েছে?
কয়েকজন এসেছিলেন স্বাগতাদির সঙ্গে কথা বলতে। কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। স্বাগতাদিও চেয়ার ছেড়ে উঠে ঝিলমের পাশে এসে বসলেন।
"কতদিন পর তোকে দেখলাম! রোগা হয়ে গিয়েছিস।"
"আপনিও। কত চুল পেকে গিয়েছে।"
"হবে না? বয়স কম হল? তোর কথা বল। ছেলে কেমন আছে? কী যেন নাম? মনে পড়েছে, ঋক। কত বয়স হল ঋকের?"
যে কান্না এতদিন বুকের মধ্যে দলা পাকিয়েছিল, হঠাৎই সেটা বেরিয়ে এল।
স্বাগতাদি তাঁর হাতখানা ঝিলমের পিঠের উপর রাখলেন, "সরি। বুঝতে পারিনি রে! জানতাম না তো!"
ঘাড় নাড়ল ঝিলম। স্বাগতাদির হাতখানা টেনে নিল।
স্বাগতাদি একটু পরে বললেন, "জানতাম, তুই আসবি।"
হাতের পিঠে চোখের জল মুছে ঝিলম তাকাল স্বাগতাদির দিকে, "কী করে?"
"এত সাধের এই স্কুল। আমি চলে গেলে কে হাল ধরবে? কার হাতে দিয়ে যাব? তুই না এলে হয়?"
হাসল ঝিলম, যেন বৃষ্টিভেজা একমুঠো রোদ, "আমার উপর এত বিশ্বাস?"
"তোর উপর এত্তটাই বিশ্বাস।"
চেয়ার ছেড়ে উঠলেন স্বাগতাদি, "চল, তোকে ঘুরে দেখাই। তারপর আবার এসে বসব। চা খাবি? তুই তো আবার চা খেতে পছন্দ করিস না। রসগোল্লা খাবি?"
মনে পড়ে যাচ্ছিল বাবার কথা। একসঙ্গে বেরোলেই গুড়ের রসগোল্লা খাওয়ার বায়না করত ঝিলম। স্বাগতাদির মুখের দিকে তাকাল। মনে হল, ঝিলম 'হ্যাঁ' বললে স্বাগতাদি খুশি হন।
ঘুরে-ঘুরে দেখাচ্ছিলেন স্বাগতাদি। আর রানিং কমেন্ট্রি দিয়ে যাচ্ছিলেন, "এই ঘরটা দিয়ে স্কুল শুরু। মাত্র ছ'টা বাচ্চাকে নিয়ে শুরু করেছিলাম। এখন প্রতি ক্লাসে অ্যাভারেজে তিরিশজন ছাত্রছাত্রী। কোনও ড্রপআউট নেই।"
"কী করে সম্ভব স্বাগতাদি? কাগজে যে পড়ি এডেড স্কুলগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে ডেস্টিটিউট বাচ্চাদের নিয়ে স্কুল চলছে কী করে?"
"পিতৃমাতৃহীন অনাথ বাচ্চা বলেই তো চলছে। বাবা-মায়েরা টানাটানি করছে না। কাজে নামিয়ে দিতে চাইছে না। রোজগারের ধান্দায় বেরোতে হচ্ছে না।"
আবার অফিসঘর। এবারে নিজের চেয়ারেই বসলেন স্বাগতাদি। রসগোল্লা এসে গিয়েছিল। ঢাকা দেওয়া গ্লাসে জল।
স্বাগতাদি বললেন, "খা। খেতে-খেতে কথা বল। দেখিস, বিষম খাসনি যেন।"
ফাইলপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, ঝিলমের খাওয়া হয়ে গিয়েছে দেখে বললেন, "জ্বালাতন কাদের নিয়ে জানিস? যাদের ভাল নাম এন জি ও। প্রতি সপ্তাহে কোনও না-কোনও এন জি ও এসে উদয় হয়। সাহায্যের ডালি উপুড় করে দিতে চায়।"
"নেন না?"
"পাগল! এন জি ওগুলোর বেশির ভাগ কী করে জানিস? একগাদা প্রতিষ্ঠানকে নথিভুক্ত করে। তারপর সেগুলোর নামে বিদেশ থেকে টাকা আদায় করে। টাকা নয়, ডলার। যে টাকা আসে তার ছিটেফোঁটা দেয়। বাকি টাকা আত্মসাৎ করে। প্রথমে বুঝতে পারিনি। ফাঁদে পা দিয়েও ফেলেছিলুম প্রায়। শেষমুহূর্তে সরে আসি।"
"আজ যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও কি এন জি ও?"
"না। তার চেয়ে ভাল। বিদেশি অর্গানাইজেশনের সঙ্গে এঁরা

যোগাযোগ করিয়ে দেন। দেখা যাক, কী হয়!"
ঝিলম লক্ষ করছিল, কাগজপত্র গোছানো হয়ে গিয়েছে স্বাগতাদির। মনে হল, কোথাও যাওয়ার আছে। সবাই তো ঝিলম নয় যে, গন্তব্যের ভাঁড়ার ফুরিয়ে গিয়েছে। স্বাগতাদি ব্যস্ত মানুষ, নিশ্চয়ই কোনও কাজে বেরোতে হবে।
ওঠার ভঙ্গি করল ঝিলম, "আজ তা হলে আসি?"
"আসবি?" উঠে দাঁড়ালেন স্বাগতা, "আবার কবে আসা হবে তা তো বললি না?"
"দেখি।"
"তাড়াতাড়ি আয়। এসে সব বুঝে নে।"
"সত্যি বলছেন?"
"না তো কী? আমার বয়স কত হল খেয়াল আছে? আজ আছি কাল নেই। যোগ্য লোকের হাতে এই কর্মকাণ্ড তুলে না দিলে মরেও শান্তি পাব না। ভূত হয়ে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াব।"
"ভূত নয়, পেতনি," হাসতে-হাসতে বলল ঝিলম।
দেখা গেল, সত্যিই স্বাগতাদির কাজ আছে, "কাউন্সিলরের সঙ্গে মিটিং আছে। লেট হয়ে গেল রে! একা-একা চিনে যেতে পারবি?"
"এলাম কী করে? আমার খারাপ লাগছে। আমার জন্যে আপনার লেট হয়ে গেল।"
"দুর পাগলি। গিয়ে হয়তো দেখব, কাউন্সিলর এখনও এসে পৌঁছননি। তিনি তো আমার চেয়েও ব্যস্ত মানুষ।"
স্বাগতাদিকে রাস্তার মোড়ে ছেড়ে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে ডান দিকে ঘুরতে যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মূর্তি, সেখানে যাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভাবেনি যে, এই পরিস্থিতিতে তাঁকে দেখতে হবে।
ঝিলম নয়, ডাকটা ওদিক থেকেই এল, "দিদি, এদিকে?"
"এসেছিলাম একটা কাজে। আপনি?"
"আমি তো এখানেই থাকি।"
পাশ কাটিয়ে চলে যাবে কি না ভাবছে, সৈকতের মা বললেন, "তাড়া না থাকলে আসুন না আমাদের বাড়ি। কাছেই।"
সামান্য ইতস্তত করে ঝিলম জবাব দিল, "চলুন।"
সৈকতের মা সামনে, পিছন-পিছন ঝিলম, অটো-সাইকেল-স্কুটার-রিকশার দঙ্গল পেরিয়ে যে বাড়িটার সামনে এসে পৌঁছল, দেখলে বোঝা যায়, একদিন যত্ন করেই তৈরি করা হয়েছিল। অযত্নে-অবহেলায় এবং সামর্থ্যের অভাবে সেটায় মালিন্য জমতে শুরু করেছে।
ঢোকার মুখে জুতো খুলতে যাচ্ছিল, সৈকতের মা বললেন, "জুতো খুলতে হবে না, ভিতরে চলে আসুন।"
চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকতেই ধাক্কা খেল ঝিলম। দেওয়াল-জোড়া সৈকতের ছবি। ক্রিকেট ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে।
"বসুন। আসছি।"
ধপ করে বসে পড়ল ঝিলম। সৈকতের মা ডেকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু কেন? আড়চোখে দেওয়ালে সৈকতের দিকে তাকাল। ঝিলমকে অস্বস্তিতে ফেলাই কি ওঁর উদ্দেশ্য? কিছু জানতে চান সৈকতের মা? নাকি ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং?
সৈকতের দিক থেকে চোখ সরানোর জন্যই ঘরের অন্য দ্রষ্টব্যগুলোর দিকে চোখ ফেরাল ঝিলম।
চটা-ওঠা দেওয়াল। ফ্যানের গায়ে কালো ঝুল। আলমারিতে দু'-একটা কাপ-মেডেল। আলমারির কাচে চিড় ধরেছে। কুশন লাগানো যে চেয়ারটায় বসে আছে, সেটাও পুরনো, পাশ ফিরলেই মটমট আওয়াজ করছে। যেন যত্ন করেই তৈরি করা হয়েছিল, মাঝপথে দেখভালের অভাব ঘটেছে।
কারণ কি সৈকত? সৈকতের অসময়ে চলে যাওয়া? ঝিলমকে ডেকে আনার উদ্দেশ্য কি তাই? দেখানো? এই অবস্থার জন্য তুমিই দায়ী? যখন অপেক্ষা করে করে উঠবে কি না ভাবছে, তখনই সৈকতের মা ঢুকলেন। হাতে ট্রে। ট্রের উপর চায়ের কাপ, পাশে গরম ওমলেট।
"ঘরে আর কিছু নেই।"
"না-না, কী বলছেন? আমার খিদে নেই। এখনই..."
"না খেলে কিন্তু দুঃখ পাব। সৈকত থাকলে কিছুতেই আপনাকে না খেয়ে উঠতে দিত না।"
চামচ দিয়ে কেটে ওমলেট খেল ঝিলম। চায়ে চুমুক দিল।
খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর কাপটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, "আজ তা হলে আসি।"
"একবার সৈকতের ঘরটা ঘুরে যাবেন না?"
ঠিক কী চাইছেন সৈকতের মা?
বুঝে উঠতে পারল না ঝিলম। তবু উঠল, জুতো খুলল। এবার আর 'না' বললেন না সৈকতের মা।
তেমনই পড়ে আছে সৈকতের বিছানা। ফেলে যাওয়া জামাকাপড়, বইখাতা। সমস্ত জায়গায় সৈকত। মানুষটাই নেই।
ঋক! এইভাবেই তো সমস্ত স্মৃতি ছড়িয়ে রেখে চলে গিয়েছে সেও। ঋকের কথা কি সৈকতের মাকে বলা যায়?
আবার বাইরের ঘরে এল দু'জনে। মুখোমুখি বসল।
ঝিলম বলল, জবাবদিহির মতো, "সেদিন কিন্তু আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি। একমুহূর্তও দেরি হয়নি সৈকতকে নিয়ে যেতে। হাসপাতালেও পৌঁছে গিয়েছিলাম..."
"জানি। শুনেছি। ওর মৃগী ছিল। ওষুধ খেত নিয়মিত। আমিই খাওয়াতাম। তবু কেন যে হল। তাও হল সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর। আগে হলে চোখে পড়ত। সবই কপাল। অদৃষ্টে ছিল। খণ্ডাবে কার সাধ্য?"
ঝিলম করবে না, করবে না করেও জিজ্ঞেস করে ফেলল, "একটা কেস হয়েছিল শুনেছি। পুলিশও এসেছিল।"
দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সৈকতের মা, "ঠিকই শুনেছেন। সৈকতের বাবা কেস করেছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অবহেলা। দায়িত্ব পালন না করা।"
"কেসটা..."
"তখন সৈকতের বাবার চাকরি ছিল। ওষুধ কোম্পানিতে ভালই চাকরি করত। হঠাৎ চাকরি চলে গেল। কোম্পানিটাই উঠে গেল। কেস লড়বে? কোথা থেকে আসবে টাকা?"
নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল ঝিলম। সৈকতের মা বলছিলেন। যেন নিজেকেই উদ্দেশ্য করে স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করছিলেন।
"চ্যাটার্জিবাবু, থানার অফিসার, এসেছিলেন। বোঝালেন। স্কুলের অনেক টাকা। বাঘা-বাঘা উকিল। লোয়ার কোর্টে না জিতলে হাই কোর্ট, সেখান থেকে সুপ্রিম কোর্ট। পারবেন অত দূর টানতে? তার বদলে কোর্টের বাইরে মিটিয়ে নিন। সৈকতকে তো ফিরে পাবেন না, বদলে যতটুকু পান।"
কাঁদছিলেন মিসেস সাধু। আঁচলে চোখ মুছলেন।
"সৈকতের বাবার তখন চাকরি নেই। ধার করেও দাঁতে দাঁত চেপে কেস লড়ছিল। একদিন ভেঙে পড়ল। তখনই স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে লোক এল। সৈকতের ভাই সৌরভকে ভর্তি করে নিল স্কুল। কিছু টাকাও দিল," ভিজে চোখে ঝিলমের দিকে তাকালেন সৈকতের মা।
"বিশ্বাস করুন, আপনার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই আমার। শুধু যদি আর-একটু আগে ওকে দেখতে পাওয়া যেত। কাছের হাসপাতালে ভর্তি করা হত। হয়তো বাঁচত না। তবু..."
উঠে গিয়ে সৈকতের মা'র পিঠে হাত রাখল ঝিলম। যেমন রেখেছিলেন স্বাগতাদি একটু আগে। ঝিলমের হাতের উপর গা ছেড়ে দিলেন মিসেস সাধু।
"পারিনি দিদি। হঠাৎ গরিব হয়ে গেলাম। লড়ার শক্তিটাই চলে গেল। একটা চাকরি আবার পেয়েছে সৈকতের বাবা। সামান্য

চাকরি। কিন্তু আর তো ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। কেস আমরা তুলে নিয়েছি।"
একটা বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস হঠাৎ যেন মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এল। তবুও ঝিলম যে খুশি হতে পারছে না! আরও তীব্র কোনও দুঃখ যে আচ্ছন্ন করছে ঝিলমকে!

১৭

ঋক চলে যাওয়ার পর ঝিলমের ধারণা হয়েছিল, সোমনাথ বাড়িতে আগের চেয়ে বেশি সময় দেবে। হল ঠিক উলটো। আগে মাসে একবার কি দু'বার কলকাতার বাইরে যেত। এখন প্রতি সপ্তাহে যেতে শুরু করল। আগে উইকএন্ডে পার্টি হত। এখন পার্টি যেন লেগেই থাকে।



জয়মামা অবাক হয়ে ঝিলমের দিকে তাকালেন। তারপর তার হাতের উপর একটা হাত রেখে বললেন, "সরি! কিছু হয়েছে?"

জিজ্ঞেস করলে জবাব পাওয়া যায়, "দায়িত্ব বাড়ছে বোঝো না কেন? দায়িত্ব বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওগুলোও বাড়বে।"
দায়িত্ব বাড়লে ক্লাব-পার্টি-মদ্যপান কেন বাড়বে বুঝতে না পেরে তর্ক করত ঝিলম। সোমনাথ বলত, "আজকাল বড় ডিসিশন কোনওটাই অফিসের চার-দেওয়ালের মধ্যে নেওয়া হয় না। একগ্লাস হুইস্কির সামনে একটু-একটু করে নিজেকে ওপেন করে মানুষ। তখনই ডিলগুলো ফাইনালাইজ়ড হয়।... ও কোম্পানি পলিটিক্স, তুমি বুঝবে না।"
বুঝতে পারত না ঝিলম। না পেরে চুপ করে যেত।
এবারে হঠাৎ তিন-চারদিনের জন্য বাইরে গেল সোমনাথ। ফিরে পরদিনই পার্টি। ফিরল বেহেড হয়ে। ড্রাইভার ধরে ধরে উপরে নিয়ে এল। ঝিলমের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে-টলতে কোনওরকমে বেডরুম অবধি গিয়েই ধড়াম করে শুয়ে পড়ল। একটু হলেই খাটের ধারে লেগে মাথাটা ফাটত। ফাটেনি সেটাই রক্ষা।
গাড়ির চাবি ড্রাইভারের কাছ থেকে নিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করল ঝিলম। শোওয়ার ঘরে ঢুকে জুতো-জামা ছাড়িয়ে বিছানায় ভাল করে শুইয়ে দিল সোমনাথকে। সারা রাত এসি চললে যদি ঠান্ডা লেগে যায়, তাই ফ্যানটা দু'পয়েন্টে চালিয়ে আলো নিভিয়ে পাশের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।
ঘুম আসছিল না। এপাশ-ওপাশ করতে করতে ভোরের দিকে চোখের পাতা বোধ হয় লেগে এসেছিল, ঘুম ভাঙল লক্ষ্মীর ডাকে। লক্ষ্মীর কাছে বাইরের দরজার ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। নিজেই খুলে, ঢুকে কাজকর্ম শুরু করে দেয়। ভীষণ বিশ্বাসী। ওর উপর পুরো বাড়ি ছেড়ে নিশ্চিন্তে থাকা যায়।
"কিছু বলছ লক্ষ্মী?"
"হ্যাঁ বউদি। দাদাবাবুর জামাটা কি কাচার জন্য রেখেছ?"
"হ্যাঁ। ওয়াশিং মেশিন চালিয়ে দিয়ে দাও।"
"পকেটে এগুলো ছিল। জানি না দরকারি কি না! দাদাবাবু তো ঘুমোচ্ছে। তুমিই রাখো।"
হাত বাড়িয়ে কাগজগুলো নিল ঝিলম। হোটেলের বিল। থাকা এবং খাওয়ার আলাদা-আলাদা কাগজ। সোমনাথ কবে যেন বলেছিল, ওগুলো রাখতে হয়। পরে সাবমিট করলে রিইমবার্সমেন্ট মেলে। তার মানে জরুরি।
টেবিলের উপর রাখতেই যাচ্ছিল। হঠাৎ কাস্টমারের নামের জায়গাটায় চোখ পড়ে গেল, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রায়।
চোখ কচলে তাকাল। ভুল দেখছে না তো?
আবার দেখল। না, ঠিকই দেখেছে। একটা ডাবল বেডেড রুমে তিনদিন থেকেছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সোমনাথ রায়।
উঠে পড়ল ঝিলম। বাথরুমে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। সোমনাথ ঘুমে অচেতন। একটা হাত ডান পাশে খাট থেকে ঝুলছে। পা দুটো ছড়ানো। রাতের ট্রাউজ়ার্স এখনও পরনে।
আগে হলে হাতটা তুলে পাশ ফিরিয়ে দিত সোমনাথকে। আজ ইচ্ছে করল না। বাইরের ঘরে সোফায় বসে লক্ষ্মীকে বলল এক কাপ চা দিতে।
কতক্ষণ বসেছিল বলতে পারবে না। আসলে সময় কখনও-কখনও একটা থেকে অন্য ঢেউয়ের মাথায় ভেসে এগিয়ে চলে। মানুষ তার হিসেব রাখে না। রাখে না, কারণ ঢেউগুলো, ঢেউয়ের তরঙ্গগুলো স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।
ও-ঘরে শব্দ হল... সোমনাথ। উঠেছে। বাথরুমে গেল। শেভ করে স্নান সেরে পাজামা-পাঞ্জাবি চাপিয়ে বাইরের ঘরে এসে বসল।
"লক্ষ্মী! দেরি হয়ে গেছে। ব্রেকফাস্ট! শিগগিরি।"
বসে রইল ঝিলম। উঠতে ইচ্ছে করল না।
"কী হল?" ঝিলমের দিকে তাকাল সোমনাথ, "ওভাবে বসে আছ কেন? শরীর খারাপ? এনি ব্যাড নিউজ়?"
জবাব দিল না ঝিলম। শুধু হাত বাড়িয়ে হোটেলের কাগজগুলো টেবিলের উপর রাখল।
একঝলক চোখ বুলিয়েই ছিটকে উঠে দাঁড়াল সোমনাথ, "এগুলো কোথা থেকে এল?"
"তোমার শার্টটা ওয়াশিং মেশিনে ঢোকাতে গিয়ে পকেট থেকে এগুলো বেরিয়েছে। লক্ষ্মীই পেয়েছে। দরকারি ভেবে আমাকে দিয়ে গিয়েছে। তোমার হয়তো কাজে লাগবে।"
কোনও কথা না বলে ভিতরের ঘরে চলে গেল সোমনাথ। রেডি হয়ে বেরিয়ে এল। তারপর সোফায় মুখোমুখি বসে সোজা তাকাল, "বলো, কী জানতে চাও?"
"এই মিসেস সোমনাথ রায় কে?"
"জানাটা খুব জরুরি?"
ভেবে দেখল ঝিলম। সোমনাথ ঠিকই বলেছে। ঝিলমের জায়গা

পূরণ করার জন্য যে-কাউকেই নিয়ে যেতে পারে সোমনাথ। কয়েকটা রাত ছোটখাটো হোটেলে, যারা সঠিক পরিচয় নিয়ে ফোর্স করে না, সেখানে কাটিয়ে আসতে পারে। কে সেই মিসেস রায়, তা জেনে ঝিলমের কিছু যায় আসে না।
"কতদিন চলছে এসব?"
"ধরো, বেশ কিছুদিন। কয়েক বছর।"
এত ঠান্ডা মাথায় এত শান্ত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল সোমনাথ যে, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না ঝিলম। ভেঙে পড়ল, "কী করে পারলে? এতখানি নিষ্ঠুর তুমি হতে পারো কখনও তো ভাবিনি!"
সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল সোমনাথ। রান্নাঘরের দরজার কাছে গেল। তারপর লক্ষ্মীকে বলল, "তুমি ঘুরে এসো। অন্য কোনও বাড়িতে কাজ থাকলে সেরে ঘণ্টাখানেক পরে এসো।"
গ্যাস অফ করে লক্ষ্মী বেরিয়ে যাওয়ার পর সোমনাথ আবার এসে বসল।
"একুশ বছর। একুশটা বছর তুমি কী দিয়েছ আমায়, বলতে পার?"
"কম্পানি দিয়েছি তোমাকে। তোমার সংসার সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি। কোনও অভাব টের পেতে দিইনি। যা চেয়েছ হাতের কাছে সাজিয়ে দিয়েছি। টিফিন-কৌটো থেকে চশমার খাপ, না চাইতেই পেয়ে গিয়েছ। সেগুলোর কোনও মূল্য নেই?"
"কী বললে? কম্পানি? কতটুকু কম্পানি দিয়েছ আমাকে ঝিল? বারবার বলা সত্ত্বেও পার্টিতে আমাকে অ্যাকম্পানি করোনি। তোমার জন্য আমাকে কথা শুনতে হয়েছে। আমি নাকি আনসোশ্যাল। আমি নাকি ফ্যামিলি গেটটুগেদারে পার্টিসিপেট করি না।"
"একেবারেই যাইনি তা তো নয়?"
"হাতে গোনা, একুশ বছরে একুশ দিনও হবে কি না সন্দেহ!"
"সেটা কি খুব বড় অপরাধ? এতখানিই যে, তোমাকে অন্য কোনও কম্পানি খুঁজতে হল? আমি তো শ্রুতিনাটক করতে ভালবাসি। ভালবাসি আবৃত্তি করতে। আমার ক'টা প্রোগ্রাম তুমি অ্যাটেন্ড করেছ?"
"তোমার ওই ন্যাকান্যাকা শ্রুতিনাটক? আবৃত্তি? গিয়েছিলাম তো একটা-দুটোয়। এত ঘুম পেতে লাগল... যাদের কাজ নেই, তারাই যায় ওসব ফালতু প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে।"
"আবৃত্তির অনুষ্ঠান ফালতু? ন্যাকান্যাকা?"
"নয়তো কী? আবৃত্তি শুনলে পেট ভরবে? আমার সন্ধের পার্টি আসলে অফিসের এক্সটেনশন। অফিসে যা করা সম্ভব নয়, সেগুলোই পার্টিতে হয়। অনেক মেজর ডিসিশন..."
"দেখতেই তো পাচ্ছি। অফিসে যা করা যায় না, সে সবই হয় পার্টিতে। নাম ভাঁড়িয়ে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। একসঙ্গে রাত কাটানো হয় ...আমার ঘেন্না হচ্ছে তোমার দিকে তাকাতে।"
"আরে রাখো তোমার ঘেন্না," সোফা থেকে উঠে পড়ল সোমনাথ, ডাইনিং টেবিল থেকে একটা চেয়ার টেনে খুব কাছে এসে বসল ঝিলমের, "এটা তো তোমার আগে ভাবা উচিত ছিল শ্রীমতী ঝিলম রায়। একুশ বছর ধরে যখন পুতুল খেলেছ ছেলেকে নিয়ে, একবারও ভেবেছ আমার কথা?"
"আমার ছেলে? ছেলে তোমার নয়?" আবার কান্না এসে ঢেকে দিল ঝিলমের স্বর।
"বায়োলজিক্যালি ইয়েস। কিন্তু যে ছেলে একুশটা বছর বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দিল, তাকে ছেলে বলে মেনে নিতেও তো কষ্ট হয়। আর ছেলে-ছেলে করে আমার দিকে যে ফিরেও তাকালে না, তার বেলা?"
"তোমার দিকে ফিরেও তাকাইনি? বলতে পারলে এই কথা?"
"শেষ কবে আমরা ইন্টিমেট হয়েছি মনে করতে পার? রাতের পর রাত ছেলের পাশে শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছ। আর অন্য ঘরে আমি এপাশ-ওপাশ করে রাত পার করেছি। ভেবেও দ্যাখোনি, আমিও একটা মানুষ, আমারও ফিজিক্যাল নিডস আছে। শরীরকে কি অস্বীকার করতে পারে মানুষ?"
"সে তো জন্তুজানোয়াররা করে। একটা মানুষের মতো বিহেভ কর সোমনাথ রায়।"
"তোমার কাছে বিহেভিয়ার শিখব?" এই অবধি বলে একটা থাপ্পড় কষিয়েছিল সোমনাথ। সোফায় কাত হয়ে পড়েছিল ঝিলম। আজ সোমনাথের কথাগুলোই আবার মনে পড়ছিল। সোমনাথের কথায় যেন কুমকুমের প্রতিধ্বনি ছিল কোথাও। এরকম করেই সন্দীপের অক্ষমতার কথা কুমকুম জানিয়েছিল ঝিলমকে। তা হলে কি শেষ পর্যন্ত শরীরই জিতে যায়? মানুষ কি তার সমস্ত সুপিরিয়রিটির পরেও একটা পশুই থেকে যায়?
একটা প্রশ্নের ঝিলম উত্তর পায়নি। ঋক চলে যাওয়ার পর সোমনাথ কেন ঝিলমের পাশে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের বাবার মতো দায়িত্ব পালন করেছিল! আজ মনে হল, তার জবাব আবছা হলেও ঝিলম বুঝতে পারছে।
প্রথম সম্ভাবনা, সামান্য যে ক'জন আত্মীয়স্বজন এসেছিল তাদের সামনে, তার চেয়েও বেশি কোলিগদের সামনে সোমনাথের প্রমাণ করার ছিল যে, বাবা হিসাবে তার কর্তব্যে সে কোনও ফাঁক রাখেনি। দ্বিতীয় সম্ভাবনা, একুশ বছরের সম্পর্কের অবসানে ঋক সোমনাথকে মুক্তি দিয়ে গিয়েছিল। সেই ঘটনাটিকে সোমনাথ গুরু দিয়েছিল। হয়তো ঋকের প্রতি কৃতজ্ঞতা। হয়তো বন্ধন-ছেদের খোলা হাওয়া। এমন হওয়াও অসম্ভব নয়, ঝিলমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তুতিও সেদিন থেকেই নিয়েছিল সোমনাথ।
ঢেউ শান্ত হয়ে আসছিল। ঝিলমও পৌঁছে যাচ্ছিল মোহনায়। সেই মোহনা এক উপলব্ধি। ঝিলম এবং সোমনাথ, সোমনাথ এবং ঝিলম দু'জনের মাঝখানে হাইফেনের মতো একুশ বছর ধরে ঋক নামে যে অস্তিত্ব টলটল করছিল, তা খসে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই সম্পর্কও ভেঙে গিয়েছে। কোনওদিনই তা আর জোড়া লাগবে না।

১৮

ভোরবেলে আঙুল ছোঁয়ানোর আগেই সেলফোনে আওয়াজ হল। মেসেজ, শুভদীপের।
'প্রসূনদা চাকরি ছেড়ে দিলেন।'
'ছেড়ে দিলেন?'
প্রসূনদা তো আগেই ওদের স্কুল থেকে রিজাইন করেছিলেন। নিশ্চয়ই সেটা মিন করছে না শুভদীপ। তার মানে নতুন যেখানে জয়েন করেছিলেন, সে চাকরিও ছেড়ে দিলেন।
কিন্তু প্রসূন চট্টরাজকে নেওয়ার জন্য তো হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে স্কুলগুলো। এক জায়গায় ছাড়লে অন্য জায়গায় জয়েন করতেন প্রসূনদা। তা যখন নয়, শুভদীপের টেক্সট মেসেজের অর্থ, প্রসূন চট্টরাজ সবরকম চাকরি থেকেই অবসর নিলেন।
কিন্তু কেন?
পড়ানোয় কি আর ইন্টারেস্ট পাচ্ছিলেন না অঙ্কের জাদুকর প্রসূন চট্টরাজ? জটিল সূত্রগুলো ধরিয়ে দেওয়ার কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলেন?
প্রসূনদা না পড়ালে ছাত্রদেরই ক্ষতি। পরবর্তী প্রজন্ম এক সত্যিকারের শিক্ষকের সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হল। আচ্ছা, প্রসূনদা যে বাড়িতে পড়াতেন সেটাও কি বন্ধ হয়ে যাবে? চললেও, স্কুলের মতো অত ছাত্র তো কখনওই পাবেন না!
এলোমেলো ভাবনাগুলো মাথায় ঘুরতে থাকায় বেল বাজাতেও দেরি হয়ে গেল ঝিলমের।

দরজা খুলে ঝিলমকে দেখেই একগাল হাসলেন জয়মামা, "তোর কথাই ভাবছিলাম।"
"বাজে কথা বোলো না। একটা ফোন করেও তো খোঁজ নাও না।"
"সত্যি বলছি। প্রমিস। আজ তেল-কই রান্না করেছি। ভাবলাম কষ্ট করে রাঁধলাম, আমার ঝিলিমিলি একটু চেখে না দেখলে বুঝব কী করে পাশ না ফেল!"
ড্রয়িংরুমে ঝিলমকে বসিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিলেন জয়মামা। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।
গরম কড়াইয়ে তেল ছাড়ার যে ছ্যাঁক করে শব্দ হয়, সেটা পাওয়া গেল। খুন্তি নাড়ার খটাখট শব্দ হল তারপর। একটার পর একটা রান্নার স্টেপ মনে-মনে কল্পনা করে নিতে লাগল ঝিলম। তারই মধ্যে ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, আগে যা দেখে গিয়েছে তার থেকে কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না!
সোফাগুলো যেমন ছিল তেমনই আছে। ঢুকেই ডানপাশে জুতো রাখার র‍্যাক, সেটাও বদলায়নি। দেওয়ালজোড়া বইয়ের আলমারি। উকিলরা বইয়ের পর বই সাজিয়ে রাখে। দুর্জনে বলে, সেগুলোর সবগুলো নাকি বই নয়, বইয়ের ডামি। ডাক্তাররাও সেরকমই করে নিশ্চয়ই। জয়মামার বইগুলোর মধ্যে ডাক্তারি বই নেই বললেই চলে। সাহিত্য থেকে দর্শন, এমন কোনও বিষয় নেই যাতে মামার ইন্টারেস্ট নেই। স্বভাবতই বিভিন্ন বিষয়ের বই বুক-কেসে শোভা পাচ্ছে। ঝিলম জানে, বইগুলো পড়া হয়। তাই পেড়ে দেখতে গেলে ধুলোর আক্রমণে কাশতে হবে এমন সম্ভাবনা কম।
আলমারিগুলোতেও তেমন কোনও অদলবদল চোখে পড়ল না। খুঁটিয়ে দেখল। ধর্মগ্রন্থ আগেও ছিল না। আজও মামার কালেকশনে জায়গা পায়নি। একটা শুধু বড় ছবি, সোফাগুলো যেদিকে, সেদিকের দেওয়ালে টাঙানো। জয়মামার মায়ের ছবি। এটাই নতুন। বাকি যা কিছু, সবটাই হুবহু এক, কোনও পরিবর্তন হয়নি।
কাঁধের গামছায় হাত মুছতে-মুছতে জয়মামা বেরোলেন, "আজ কিন্তু খেয়ে যাবি।"
কথা ঘোরানোর জন্য ঝিলম বলল, "তুমি যে আজ তেল-কই রাঁধছ! তোমার সেই এক্সপেরিমেন্ট কোথায় গেল? আমি তো ভেবেছিলাম কাপড়কাচা সাবান দিয়ে কইমাছ রান্না করে হুলস্থুল ফেলে দেবে।"
"যা বলেছিস," উঠে ফ্যানটা এক পয়েন্ট বাড়িয়ে দিয়ে এলেন। জয়মামা এসি লাগানোর ঘোর বিরোধী। বললেন, "অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বুঝলাম, আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা যা নিদান দিয়ে গেছে, সেটা ফ্যালনা নয়। ওরাও নিশ্চয়ই অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছে। সারা জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল এই তেল-কই। যা-ই বানাই না কেন, এসবের ধারেকাছে আসার যোগ্যতা কারও নেই। তাই ঘুরেফিরে সেই কনভেনশনাল প্রিপারেশনগুলোর কাছেই আসতে হল।"
মুসুরডাল, পেঁয়াজ-কাঁচালঙ্কা মেশানো আলুসেদ্ধ আর তেল-কই। আয়োজন বেশি নয়। কিন্তু প্রতিটা রান্নাই পারফেক্ট।
"দারুণ হয়েছে রান্না।"
"বলছিস?"
"আমি কেন, যে খাবে সে-ই বলবে।"
"তা হলে ভোজবাড়িতে রাঁধুনির কাজটাও চালিয়ে নিতে পারব, কী বলিস?"
"রাঁধুনি কেন, তুমি যাতে হাত দাও সেটাই এক্সেলেন্ট হয়। ডাক্তার হিসেবেও তো ছিলে একনম্বর। কেন যে ছেড়ে দিলে..."
কইমাছের মাথা চুষছিলেন মামা। বিষম খেলেন। উঠে গিয়ে মাথা থাবড়াল ঝিলম।
"বুঝলি, আসলে রেসিপি নয়, অন্য কিছু। ছোটবেলায় দেখতাম, কড়ায় মাছ কিংবা আনাজ ছেড়ে মশলাপাতি মিশিয়ে একদম শেষে কড়াইতেই হাত ধুত মা। ওই হাত ধোয়া জল! ওটাই আসল রেসিপি। এক-একজনের হাত ধোয়া জলে এক-একরকম স্বাদ। সারা জীবন সাধনা করেও ওটা আসে না।"
খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। প্লেট গোছাতে গিয়েছিল ঝিলম, হাঁ হাঁ করে উঠলেন মামা, "বারণ করেছি না। কাজের মাসি আসবে। একদম হাত দিবি না।"
আবার সোফায় এসে বসল দু'জনে। এবার মুখোমুখি।
ঝিলম খেয়াল করেছে, একবারও ঋকের কথা তোলেননি মামা। জানেন তো নিশ্চয়ই। ডক্টর পাল নিশ্চয়ই জানিয়েছেন। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে সহানুভূতির বন্যা ছুটিয়ে দিত। এই জন্যেই জয়মামা, জয়মামা।
"আমরা যে ভেন্টিলেশনে দিলাম না, ডিসিশনটা কি ঠিক ছিল? " ঝিলম নিজেই প্রসঙ্গটা তুলল।
"একদম। শুধু-শুধু লিঙ্গার করার মানে হয় না। মুশকিল হচ্ছে, বেশির ভাগ মানুষ বুঝতে চায় না। বলে, বাঁচিয়ে রাখুন ডাক্তারবাবু। দেখতে তো পাচ্ছি। চলে গেলে তো হয়েই গেল।"
হয়তো এইরকমই কিছু ভেবেছিল ঝিলম। সেই সময়। এখন আর মনে করতে পারছে না। যেটাই হোক, মামার কথায় ভিতরে স্বস্তির প্রলেপ পড়ল।
ড্রয়িংরুমে বসেই কথা বলছিল ওরা। লাগোয়া ব্যালকনিতে সকাল থেকে রোদ্দুর বিছানো থাকে। সূর্য যেই পশ্চিমে ঢলে, একটা বড় তেঁতুল গাছ রোদ আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন গাছের ছায়া ব্যালকনির অধিকার নিয়ে নেয়।
ঝিলম নজর রাখছিল। যেই রোদ সরে গেল ঝিলম বলল, "বাইরে গিয়ে বসলে হয় না?"
"আমি তো দুপুরের পর ওখানেই সময় কাটাই। তোরা আবার রোদ-কাতুরে। কষ্ট পাবি ভেবে বাইরে যাওয়ার কথা বলিনি।"
ব্যালকনিতে একটা চেয়ার আগে থেকেই ছিল। ডাইনিং টেবিলের পাশ থেকে একখানা চেয়ার এনে পাশে রাখল ঝিলম। বসে বলল, "বাঃ, কেমন ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে দ্যাখো। ঘরে থাকলে কি এই হাওয়া পেতাম?"
"নিমের হাওয়া স্বাস্থ্যকর জানিস তো? আগেকার দিনে লোকে বাড়ির চৌহদ্দিতে নিমগাছ পুঁতত।"
"তুমি বিশ্বাস করো এই সব?"
"একটু-একটু করি। যত বয়স বাড়ছে, বিশ্বাসটাও গজিয়ে উঠছে। পুরনো ধারণা, পুরনো কাস্টম, একেবারেই ফেলে দেওয়ার নয় বোধ হয়।"
এদিকটা এখনও মাল্টিস্টোরিড গ্রাস করে নেয়নি। কান পাতলে গাছের ডালে পাখির ডানা ঝাপটানি শুনতে পাওয়া যায়। আকাশে চিলের অলস চক্কর।
"আজ তো রবিবার। সোমনাথ বাড়িতে নেই?" জয়মামা খুব নিচুস্বরে, প্রায় আনমনে কথাগুলো বললেন।
কী যে হয়ে গেল ঝিলমের। জবাব দিতে গিয়ে গলা আটকে এল। অশ্রুবিন্দু চোখ উপচে ঝরে পড়ল গালে।
জয়মামা অবাক হয়ে ঝিলমের দিকে তাকালেন। তারপর তার হাতের উপর একটা হাত রেখে বললেন, "সরি! কিছু হয়েছে?"
এমনভাবে কতদিন কেউ তাকে স্পর্শ করেনি, ছুঁয়ে দেখেনি হৃদয়। প্রশ্ন করেনি, কিছু হয়েছে? আপাতসাধারণ এই প্রশ্ন যে কতখানি অসামান্য হতে পারে, ঝিলম ছাড়া আর কে-ই বা বুঝবে?
ঝিলমের ভিতরের প্রতিটি প্রলয় বাঁধভাঙা বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঝিলমকে।
অনেকক্ষণ পর শান্ত হল ঝিলম। ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ মামা, আমাদের আর সম্পর্ক নেই।"
জয়মামা চুপ করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর গলা নামিয়ে

বললেন, "তোরা আর একসঙ্গে থাকিস না?"
"থাকছি। এখনও। কিন্তু বাড়ি তো ওর। ওর নামেই সব কিছু। সম্পর্কটাই যদি না থাকল, কী হবে ঘর আঁকড়ে পড়ে থেকে?"
"লিগাল সেপারেশন হয়ে গিয়েছে?"
"এখনও কিছুই হয়নি। তবে মনে হয় না ও দেরি করবে। অন্য কোনও রিলেশনে আছে সোমনাথ। ওদিক থেকে চাপ আসবে।"
একটা আনমনা হাওয়া ব্যালকনিতে এসে বসল, আবার চলেও গেল।
"বলিস, যদি কোনও দরকারে লাগতে পারি। ফ্ল্যাটটা তো খালিই পড়ে থাকে। চাইলে থাকতেও পারিস। এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াই। ফ্ল্যাট দিয়ে আর কী হবে? তোকে লিখে দিয়ে, যেদিক দু'চোখ যায় চলে যাব। কোনও বৃদ্ধাশ্রমেও গিয়ে উঠতে পারি।"
ঝিলমের কী মনে হল, যে প্রশ্নটা বহুবার ভেবেও করে ওঠা হয়নি, করে ফেলল এই সুযোগে, "এই যে তুমি, হঠাৎ করে রিজ়াইন করলে, ডাক্তারিই ছেড়ে দিলে চিরকালের মতো, তোমারও কি... মানে, কোনও কারণ ছাড়াই?"
চুপ করে রইলেন জয়মামা। একবার উঠে ভিতরে গেলেন, জল খেলেন। বাথরুমে জলের শব্দ হল। আবার এসে ব্যালকনিতে বসলেন।
"একটা বাচ্চা, নামটা এখনও মনে আছে, দীপ্ত। দীপ্ত হালদার। লিউকিমিয়ার পেশেন্ট। আমারই হাতে ডায়াগনোসিস হয়। তখন ওর চার বছর বয়স। ফরচুনেটলি থেরাপিতে অসম্ভব ভাল রেসপন্ড করে। রেগুলার ফলো-আপ করত। ওর মা-ই নিয়ে আসতেন। দেখা হলে নমস্কার করতেন। আমিও বাচ্চাটির মাথায় হাত বুলিয়ে ওষুধপত্র ঠিক করে দিতাম।"
এই অবধি বলে হঠাৎ থেমে গেলেন জয়মামা। মামার দিকে তাকাল ঝিলম। দেখল, মামা তাকিয়ে আছেন দূরে। হয়তো অতীত ওইখানেই কোথাও... মামা চেষ্টা করছেন স্মৃতি থেকে ফিরিয়ে আনতে।
"হঠাৎ একদিন অন ডিউটি আর এম ও খবর দিল, দীপ্ত ইমার্জেন্সিতে এসেছে, ক্রিটিকাল কন্ডিশনে। এসব ক্ষেত্রে আমি দেরি করি না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা পৌঁছে গেলাম হাসপাতাল। দেখলাম, গত ছ'মাস দীপ্ত ফলো-আপ মিস করেছে। অসুখটা ফিরে এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে অ্যালার্মিং, হু হু করে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, থামানো যাচ্ছে না।"
"বেরিয়ে যাচ্ছে? কোথা দিয়ে?"
"এসব ক্ষেত্রে রক্তপাত যে-কোনও জায়গা দিয়েই হতে পারে। দীপের ক্ষেত্রে ব্লিডিং হচ্ছিল স্টুলের সঙ্গে।"
"তারপর?" নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল ঝিলম।
"আগে ওর মা আসতেন। এবারে মাকে দেখতে পেলাম না। সঙ্গে এসেছেন বাবা। কিন্তু বাবার হাবভাব খুব-একটা ভাল ঠেকল না। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। রক্ত দিতে হবে বলায় এমন ভাব করলেন, যেন 'হাসপাতালে এনেছেন। হাসপাতালই রক্তের ব্যবস্থা করবে'।"
"একাই এসেছিলেন বাবা?" ঝিলম জানতে চাইল।
"না। সঙ্গে যারা ছিল, তারাও তেমন সুবিধের নয়। যাই হোক, আমি শান্তভাবেই বললাম, রিকুইজ়িশন নিয়ে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কে চলে যান। যেভাবে পারেন অন্তত চার ইউনিট রক্ত নিয়ে আসুন। আমরাও চেষ্টা করছি। খানিকটা বিরক্ত হয়েই কাগজটা নিয়ে দীপ্তর বাবা চলে গেলেন। আর এম ও ফোন নম্বর চেয়েছিল। যেন বাধ্য হয়েই নম্বরটা দিলেন।"
"রক্ত পাওয়া গেল?"
ঝিলমের প্রশ্ন যেন জয়মামা শুনতেই পেলেন না। বড়রাস্তায় গাড়ি চলাচল করছে। আজকের মতো দুপুরের পালা শেষ। বিকেল জায়গা নিচ্ছে। স্কুল-ফেরত ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে বাড়ি ফিরছে।
প্রশ্নটা আবার করল ঝিলম, "রক্ত পাওয়া গেল?"
বর্তমানে ফিরতে সময় নিলেন জয়মামা।
"রক্ত? হ্যাঁ পাওয়া গিয়েছিল দু'ইউনিট। দেওয়া হল। কিন্তু দু'ইউনিটে কী হবে? মুখখোলা ট্যাপের মতো গলগল করে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল হাসপাতালের ব্লাডব্যাঙ্কে ফোন করলাম। জানাল, ব্যাঙ্ক ড্রাই। আর রক্ত নেই। যে নম্বরটা ওর বাবা রেখে গিয়েছিলেন, সেখানে বারবার ফোন করা হল, কেউ ধরল না। সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কে ফোন করে জানতে চাইলাম, ওই নামের কারও জন্য রিকুইজ়িশন জমা পড়েছে কি না। উত্তর এল, না। হাসপাতালের ব্যাঙ্কে জিজ্ঞেস করলাম, সেম গ্রুপ না হলেও চলবে, 'ও' গ্রুপের রক্ত আছে কি না! বলল, এক ইউনিট আছে। বাড়ির লোক বন্ড-এ সই করলে দিতে পারে। আমি নিজে বন্ড সই করে সেই রক্ত আনালাম। সেটাও চালানো হল।"
"তারপর?"
"ভোররাতের দিকে চলে গেল দীপ্ত," মামার কথাগুলো হাহাকারের মতো শোনাল।
পাখিরা ফিরে আসছে। গাছভর্তি কিচিরমিচির, তার আড়ালে এক পরাজিত চিকিৎসকের দীর্ঘশ্বাস চাপা পড়ে গেল।
"সেই জন্যেই ছেড়ে দিলে চাকরি?"
হাসলেন ডক্টর জয়ন্ত ঘোষ, "না রে, মৃত্যু আমাদের নিত্যসঙ্গী। মৃত্যুকে মেনে নিতে না পারলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব কী করে? কষ্ট হয়। দুঃখ হয়। ভেঙে পড়ি। আবার সামলে নিয়ে অন্য কোনও রোগীর চিকিৎসায় ডুবে যাই। মৃত্যু নয়। দীপ্তর মৃত্যুর পর যা-যা ঘটল, তা আমাকে নতুন করে সবকিছু ভাবতে শেখাল।"
চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে মামার দিকে তাকাল ঝিলম।
"হাসপাতাল থেকে তখনও বাড়ি ফিরিনি। নিজের চেম্বারে বসে এককাপ কফিতে চুমুক দিচ্ছি, হঠাৎ বাইরে শোরগোল। বেরোতে যাচ্ছি, ছাত্ররা আটকাল, 'যাবেন না স্যার। প্রবলেম হতে পারে।' ভিড়ের উপর দিয়ে যেটুকু দেখলাম, দীপ্তর বাবাকে দু'পাশ থেকে দু'জন আটকে রেখেছে আর ভদ্রলোক চেষ্টা করছেন আমার কাছে আসার। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। একটাই কথা, 'আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলল। ডাক্তারকে আমি ছাড়ব না।'"
"অত কিছু করার পরেও?" অবাক হয়ে গেল ঝিলম।
"থানা থেকে অফিসার এলেন। আমাকে চেনেন। বললেন, 'অ্যান্টিসিপেটরি বেল নিয়ে নিন। আর, ক'টা দিন হাসপাতালে না আসাই ভাল।'"
"কী সাংঘাতিক!"
"আরও বাকি ছিল। যেদিন জয়েন করলাম, সেদিনই এক ভদ্রলোক দেখা করলেন। পাজামার ওপর হাতাগুটনো শার্ট, মানুষটাকে আগেও হাসপাতালে দেখেছি। কোনও ভণিতা না করেই বললেন, 'আমি দীপ্তর বাবার হয়ে কথা বলতে এসেছি। যদি একটু সময় দেন।' রাজি হলাম।"
"রাজি হলে?"
"হ্যাঁ, দেখতে চাইছিলাম ওদের বক্তব্যটা কী! ভদ্রলোকের সঙ্গে দীপ্তর বাবা। এদিন অবশ্য হম্বিতম্বি নেই। কথা ওই ভদ্রলোকই বলছিলেন। দীপ্তর বাবা ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছিলেন।"
"কী বললেন ওঁরা?"
"বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনার এত নামডাক, পসার। সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে। কী হবে থানা-পুলিশ, কেস-কারবারে গিয়ে? আমরা চাই কেসটা মিটিয়ে নিতে।' আমি জবাব দিলাম, ভাল তো! তা, আমাকে কী করতে হবে? ওই ভদ্রলোকই জবাব দিলেন, 'লাখতিরিশ টাকা দিলে দীপ্তর বাবা কেসটা তুলে নেবে কথা দিয়েছে।'"
"তিরিশ লাখ?" হাঁ হয়ে গেল ঝিলম, "দিলে?"
"কোথা থেকে দেব? জীবনে কখনও প্র্যাকটিস করিনি। অত টাকা আমার ব্যাঙ্কেও নেই। সেটাই বললাম। তখন ভদ্রলোক সঙ্গের ফোলিও ব্যাগ থেকে একটা ফোটো বের করলেন। দীপ্তর ফোটো।

ফোটোর দীপ্ত আমার দিকেই তাকিয়ে যেন হাসছে। ছবিটা টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক আছে, কত দিতে পারবেন?'"

"তারপর?"

"আমার মনে হল, ফোটো নয়, দীপ্তর লাশ সামনে ফেলে দরদাম করছে দুটো মানুষ। মনে হল, চিকিৎসা নামক পেশাটাকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। অ্যাপ্লাই করলাম। ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট। মঞ্জুর হল। চাকরি ছেড়ে এলাম।"

পাখির ডাক স্তিমিত হয়ে আসছে। অন্ধকার ঢেকে দিচ্ছে দিনের আলো। একটু আগেই প্রসুন চট্টরাজের খবরটা পেয়েছে। এখন ডক্টর জয়ন্ত ঘোষ। মিল আছে কোথাও?

১৯

'যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, আর মনিবসাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান তিনিই বাবু।'

বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্যসম্রাট। হয়তো পুরোপুরি এই শব্দগুলোই নয়। ছোটবেলায় পড়েছিল ঝিলম, যেমন যেমন মনে পড়ছে। এখন আর সিলেবাসে বঙ্কিম নেই। বাংলা সাহিত্য যে পরবর্তী প্রজন্মকে আর টানে না, সে জন্য পুরোটাই ওদের দোষ?

চিঠি। তবে স্কুল-কর্তৃপক্ষের দেওয়া সিল করা খাম নয়। বিদেশ থাকা আসা সুন্দর ডাকটিকিট লাগানো খাম। বিদেশ থেকে কে লিখল চিঠি ঝিলমকে?

আজ স্কুলে ঢুকতেই শুভদীপ, "ঝিলমদি, আর-একটা উইকেট পড়ল।"

চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়েছিল ঝিলম।

"অন্তরাদি রিজাইন করল," বলতে-বলতে ক্লাসের দিকে পা বাড়িয়েছিল শুভদীপ।

স্টাফরুমে বসে ওই কথাগুলোই ভাবছিল। অন্তরা সিংহ বায়োলজি পড়ান। ভিএ গেটিং পোস্ট। ওঁর পিছনেও ডোমেস্টিক এনকোয়ারি লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ছেলে বিদেশে থাকে। স্বামী ভাল চাকরি করেন। অন্তরাদি আর ঝামেলায় না থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন।



সরিয়ে নিলেন? না সরানো হল? গলাধাক্কা দিয়ে! বঙ্কিমের যুগেও মনিবসাহেবের গৃহে গলাধাক্কাই পাওনা ছিল বাবুর। যুগ পালটেছে। গলাধাক্কার চরিত্র বদলেছে।

ক্লাসটিচারগিরি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর থেকে ফার্স্ট পিরিয়ডটা অফই থাকে ঝিলমের। স্টাফরুমে দু'খানা কাগজ আসে, একটা বাংলা। একটা ইংরেজি। বাড়িতে বাংলা কাগজের জায়গা নেই। এখানেই বাংলা কাগজখানা খুলে বসে।

প্রথম পাতায় সবে মন দিয়েছে, একটা খাম দিয়ে গেল শিরিন। চিঠি। তবে স্কুল-কর্তৃপক্ষের দেওয়া সিল করা খাম নয়। বিদেশ থাকা আসা সুন্দর ডাকটিকিট লাগানো খাম।

বিদেশ থেকে কে লিখল চিঠি ঝিলমকে?

খাম খুলতে-খুলতে ঝিলমের মনে পড়ল, সেও আজ সঙ্গে করে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। চিঠিটা হাতে-হাতে হেডমাস্টারকে দিতে হবে।

কাল সন্ধেবেলা উকিলবাবুর কাছে গিয়েছিল। উকিলবাবুই ফোন করেছিলেন।

"চলে আসুন। সামনাসামনি বলব।"

স্লিপ পাঠাতে অ্যাডভোকেট ব্যানার্জি সঙ্গে-সঙ্গেই ভিতরে ডেকে নিয়েছিলেন।

"এই নিন আপনার স্টে অর্ডার," বলে একটা খাম এগিয়ে দিয়েছিলেন ঝিলমের দিকে।

"তার মানে?"

"মানে এই, যথাযথ পদ্ধতি না মেনে কেন আপনাকে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে, মহামান্য হাইকোর্টকে সে বিষয়ে কনভিন্স না করা অবধি আপনাকে আর এনকোয়ারির মুখোমুখি হতে হবে না।"

খামটা ঝোলায় ঢোকাতে-ঢোকাতে ঝিলম জানতে চেয়েছিল, "এই চিঠিটা নিয়ে আমাকে কী করতে হবে?"

"এই কপিটা আপনার। একটা ফোটোকপি কালই স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে পৌঁছে দেবেন। অফিশিয়াল অর্ডার রেজিস্টার্ড পোস্টে ওঁর কাছে যাবে। কিন্তু পোস্টাল ডিলের জন্য যদি হাতে না পৌঁছয় আর তার আগেই যদি আবার ডেট পড়ে যায় এবং যাতে আপনাকে আর এনকোয়ারি ফেস করতে না হয়, সে জন্যই অ্যাডভান্স এই কপিটা আপনি সার্ভ করে দেবেন।"

কী বলবে বুঝতে না পেরে ঝিলম যখন বসে ছিল, উকিলবাবু নিজে থেকেই আবার বলেছিলেন, "তা ছাড়া আপনার প্রথম দিনের মিটিংয়ের প্রসিডিংস তো পড়লাম। ওই যে ছেলেটি... কী নাম যেন... বিপিন, ...হ্যাঁ, বিপিন দাসের বাবা যে রেটে উলটোপালটা জবাব দিয়েছেন, তাতে একটা হিয়ারিংয়ের বেশি এ কেস দাঁড়াবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিসেস রায়। গুড লাক অ্যান্ড কনগ্র্যাচুলেশনস।"

চিঠিটা নিয়ে এসেছে আজ। শিরিনকে বলে সময় চেয়ে রেখেছে। থার্ড পিরিয়ডের পর হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে অর্ডারের কপিটা হ্যান্ডওভার করতে হবে।

শিরিনের দেওয়া খাম খুলে ভিতরের চিঠিতে চোখ রাখল ঝিলম।

'ম্যাম,

একটু আগেই আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা মেলে পেলাম। অ্যামাজন। সামনের সপ্তাহে জয়েনিং। খবরটা প্রথমে বাবা-মা'র সঙ্গে শেয়ার করলাম। তার পরেই আপনি।

কিন্তু আপনার ই-মেল আই ডি আমার জানা নেই। আছে বলে মনেও হয় না। ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপেও আপনি নেই। তা হলে কীভাবে খবরটা জানাব?

মনে হল চিঠি লিখি। কিন্তু কোন ঠিকানায় পাঠাব? আপনার বাড়ির ঠিকানা তো জানি না। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, স্কুলের ঠিকানাতেই পাঠাই। একদিন না-একদিন ঠিকই পৌঁছবে। এবারে বলি, বাবা-মায়ের পরেই কেন আপনাকে চিঠি লিখছি।

আপনি যখন জয়েন করলেন আমাদের ক্লাসটিচার হয়ে, আমরা তখন ক্লাস সেভেন। ওই বয়সটা বুঝতেই পারছেন, সব কিছুই তখন অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছি। আপনি... কী বলব... আমি একা নই, আমরা সবাই আপনার ফ্যানক্লাবের মেম্বার হয়ে গেলাম। আপনার দাঁড়ানো, কথা-বলা, পড়াতে-পড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে গালে হাত দেওয়া, পেনের পিছনটা থুতনিতে ঠেকিয়ে খাতা কারেকশন করা... চোখ বন্ধ করলেই, জেগে অথবা ঘুমিয়ে, শুধু আপনাকেই দেখতে পাই।

সেই সময় আমার জীবনে একটা ঘটনা ঘটল। আমার রিউম্যাটিক হার্ট ধরা পড়ল। ডাক্তার ওষুধ-ইনজেকশন শুরু করলেন। আর কিছু-কিছু সাবধানতার কথা শোনালেন। তার মধ্যে একটা ছিল ফুটবল না-খেলা। এদিকে আমি ক্লাসটিমের ক্যাপ্টেন। ফুটবল আমার প্রাণ। আমারই খেলা বারণ? সে যে কী যন্ত্রণা!

দু'বছর ওইভাবেই কাটল। তারপরেই এল সেই দিনটা, যা আমি

কখনওই ভুলতে পারব না।

ইন্টারক্লাস টুর্নামেন্ট। ফাইনাল, ক্লাস টেন ভার্সাস আমরা। হাফটাইম। তখনও অবধি রেজাল্ট... টু নিল। আমরা হারছি।

আমার ক্লাসের বন্ধুরা স্টাফরুম থেকে জোর করে আপনাকে নিয়ে এল। ওদের কথা আমার কানে আসছিল, "ওকে একটু বলুন ম্যাম। ও খেললেই আমরা জিতব।"

আপনি আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ভয় পাচ্ছিস?"

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। আপনি কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "যা, মাঠে নাম। আমি দাঁড়িয়ে থাকছি। তোর কিছু হবে না।"

জবাব দিলাম, ডাক্তারের বারণ। যদি কিছু হয়ে যায়? আপনি বললেন, "বললাম না, আমি আছি। আমি থাকতে তোর কিছু হতে পারে?"

মাঠে নামলাম। তিন গোল দিলাম ক্লাস টেনকে। আমাকে কাঁধে চাপিয়ে বন্ধুরা যখন মাঠে চক্কর কাটছে, আমি ঘাড় ঘুরিয়ে আপনাকেই দেখতে চেয়েছিলাম। ভিড়ের আড়াল থেকে আপনার ডান হাতের দু'আঙুলে 'ভি'টুকুই শুধু দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু ডাক্তারবাবু নন, আপনিই আমাকে সেদিন হেরে যাওয়া থেকে, পিছিয়ে যাওয়া থেকে টেনে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ছোটখাটো অক্ষমতাকে কীভাবে ওভারকাম করতে হয়। শরীর নয়, মনটাই যে আসল, আপনার কাছ থেকেই জেনেছিলাম। আসলে, ফুটবল খেলতে যে আমি কতখানি ভালবাসতাম, আর খেলতে না-পারার যে কী যন্ত্রণা, আমার চোখের দিকে তাকিয়েই আপনি বুঝতে পেরেছিলেন। কতজন তা পারে বলুন? আর যে পারে তাকেই তো মানুষ সত্যিকার শিক্ষকের আসনে বসায়। সেই দিনের পর থেকে আর আমাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি ম্যাম। কানপুর আই আই টি। এম এস করতে আমেরিকা... ম্যানেজমেন্টের একটা কোর্স। ক্যাম্পাসিং। সেখান থেকেই অ্যামাজন। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর পিছনে যে আপনি, আমাকে সাহস দেওয়া, আমাকে এগিয়ে দেওয়া, আমি ছাড়া আর কে জানে বলুন? তাই এই খবর, যার জন্য একজন সারাটা জীবন অপেক্ষা করে থাকে, পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, আপনাকে খবরটা জানাই। সেই দিনের ঘটনা আপনার হয়তো মনে নেই, থাকার কথাও নয়, কিন্তু আমার তো বলতে ইচ্ছে করতেই পারে।

জানি আপনি পড়তে-পড়তে হাসছেন। আর গুনে দেখছেন, কতগুলো বানান ভুল আছে চিঠিটায়। ইংরেজি শব্দও অনেক বেশি ব্যবহার করে ফেলেছি, তাই না ম্যাম?

আজ এই পর্যন্ত। ফিরে গিয়েই লেখা করব।

ইতি

বলুন তো কে?'

অক্ষিত।

'একটা আস্ত পাগল! মনে আবার নেই? তোদের অত সহজে ভুলে যাব?'

চিঠিটা ব্যাগে ঢোকাচ্ছে, স্বাতী ঢুকল, ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ হয়েছে, ঘন্টার শব্দ শুনতে পায়নি ঝিলম।

"হাসছ যে? কোনও ভাল খবর?" স্বাতী জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, পরে বলব," বলে ক্লাসে চলে গেল ঝিলম।

হেডমাস্টারের ঘরের বাইরে যখন পৌঁছল, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়াই ছিল, দেখল শিরিন একা বসে আছে।

তাকে দেখে হাসল, "যাও, তোমার জন্যেই স্যার অপেক্ষা করছেন।"

উইশ করে ভিতরে ঢুকল ঝিলম। ঢোকার আগে ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে দেখে নিয়েছে, কোর্টের অর্ডারটা ঠিকঠাক আছে কি না। মনে মনে রিহার্সাল দিয়েছে বেশ কয়েকবার, ঠিক কী বলে অর্ডারটা হ্যান্ড-ওভার করবে। তবু, নার্ভাসনেসটা কাটাতে পারছিল না।

"আইয়ে। বইঠিয়ে। আপনার জন্যেই ওয়েট করছিলাম," একগাল হেসে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন শর্মাজি।

অবাক হল ঝিলম। তা হলে হেডমাস্টার কি আগে থেকেই জানেন কোর্ট অর্ডারের কথা? ওঁর কপিটা আগেই চলে এসেছে?

"চা খাবেন?"

"না," ঘাড় নাড়ল ঝিলম।

"জল? জল দিতে বলি একগ্লাস?"

"না, থ্যাঙ্ক ইউ।"

চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে বসলেন শর্মাজি, পা ছড়িয়ে দিলেন সামনে, "যে কথাটা আপনাকে ক'দিন ধরেই বলবার কথা ভাবছি, আপনি শুনেছেন কি না জানি না, আমাদের স্কুলে নতুন যারা অ্যাডমিশন নিতে আসছে, তারা আর ভার্নাকুলার বাংলা নিতে চাইছে না।"

কানাঘুষোয় এমন একটা কথা স্টাফরুমে শুনেছিল বটে, গা করেনি। এখন মনে হচ্ছে কথাটায় সত্যতা আছে।

শর্মাজি আবার শুরু করলেন, "ইন দ্য চেঞ্জিং সারকামস্টান্সেস স্কুল অথরিটি ডিসাইড করেছে, বেঙ্গলি অ্যাজ় আ সাবজেক্ট, অ্যাজ় আ মিডিয়াম আর রাখা হবে না। তিনটে সেকশন ইংলিশ আর দুটো হিন্দি। ব্যস। এনাফ।"

ঝিলম ঠিক বুঝতে পারছিল না শর্মাজি কী বলতে চাইছেন।

"মিসেস রায়! আমরা বেঙ্গলি মিডিয়ামই যখন তুলে দিচ্ছি, বেঙ্গলি টিচারের তো আর প্রয়োজন থাকছে না।"

টেবিল থেকে একটা লবঙ্গ তুলে মুখে দিলেন হেডমাস্টার, "তাই আপনাদের মতো সারপ্লাস টিচারদের আমরা দুটো অপশন দিচ্ছি। হয় অন্য কোনও সাবজেক্টে আপনারা অনার্স বা মাস্টার্স করে আসুন। অথবা চাকরি ছেড়ে দিন। একটা গোল্ডেন হ্যান্ডশেক অফার আনা হয়েছে। পড়ে দেখতে পারেন, খারাপ নয়।"

হাতের কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে শর্মাজি শেষ করলেন, "অবশ্য থার্ড একটা অপশনও আছে। অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে আমরা একটা ব্রাঞ্চ শুরু করছি। গরিব ছেলেমেয়ে, যারা শহরে আসতে পারে না, তাদের জন্য। সেখানে বেঙ্গলি মিডিয়াম থাকছে। ইচ্ছে করলে সেখানেও জয়েন করতে পারেন। একটা অপরচুনিটি। তার সঙ্গে সিনিক বিউটি, ডাইভার্শন। নট আ ব্যাড অপশন।"

বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল ঝিলম।

ঘাস মাড়িয়ে একটু-একটু করে হেঁটে গিয়েছিল স্কুলের গেটের দিকে। সঙ্গে দুটো চিঠি। একটাতে কোর্ট অর্ডার। যে অর্ডার তাকে ডোমেস্টিক এনকোয়ারির হিউমিলিয়েশন থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

দ্বিতীয় চিঠিটা মুক্তির।

এই স্কুলের চৌহদ্দিতে আর পা রাখবে না ঝিলম। আর কোনও আস্তিক তার পথ আগলে দাঁড়াবে না। কোনও অক্ষিতই চিঠি লিখবে না ঝিলমকে।

কিন্তু ঝিলমের ভিতর মুচড়ে কোনও কান্না তো উঠে আসছে না! মনে হচ্ছে না এই স্কুলের গেটই তার জীবনের সীমানা! মনে হচ্ছে, ঝিলমের জন্য অপেক্ষা করে আছেন স্বাগতাদি, অপেক্ষা করে আছে স্বাগতাদির হাতে তৈরি সেই অনাথ ছেলেমেয়েদের স্কুল। কিংবা অযোধ্যা পাহাড় তার কোলে কিছু প্রান্তিক খেটেখাওয়া মানুষের বাড়ি থেকে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রী।

কী করবে, কোনটা বেছে নেবে, তা ঝিলমকেই ঠিক করতে হবে। অবশ্য তার জন্য সময় তো পড়েই রয়েছে।

এই উপন্যাসের সব চরিত্রই কাল্পনিক। তা সত্ত্বেও কেউ যদি কোনও চরিত্রের সঙ্গে কারও মিল খুঁজে পান, তা অনিচ্ছাপ্রসূত বলেই ধরতে হবে।

অলঙ্করণ: শুভম দে সরকার

ডিজ়াইনার মাসাবা গুপ্তা পরিচিতি তৈরি করেছেন উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে।

Majestic

আফ্রিকান ভাষায় ‘মাসাবা’-র অর্থ ‘ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার’। নানাধরনের মোটিফ

মা সা বা

ও রঙে তাঁর এক্সক্লুসিভ কালেকশনে সাজলেন অভিনেত্রী ইশা সাহা।

The Runaway Bride

সবুজের উপর হলুদ ও ম্যাজেন্টা ফ্লোরাল মোটিফের লহেঙ্গা। সঙ্গে ম্যাজেন্টার উপর সোনালি জরি দিয়ে এমব্রয়ডারি করা টপ। পুজোর সাজে এইরকম একটি লহেঙ্গাই তো চাই!

ইয়ারিং ও আংটি: প্রিটিওজ় বাই দিতি ঝুওয়ালকা





Radio Star

'মাসাবা' কালেকশনের বিশেষত্বই হল উজ্জ্বল রঙের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার। ম্যাজেন্টার উপর কালো মোটিফ ওয়র্কে লং স্কার্ট ও টপ। বেল স্লিভ প্যাটার্নের টপ, ডিপ নেকলাইন ও বো করা।

ইয়ারিং ও আংটি: সাক্ষী ঝুনঝুনওয়ালা
ইমেল: jhunjhunwala.sakshi@gmail.com
ব্যাগ: ইমেজ এন স্টাইল
ফোন: ৯০৫১০৯৮৭৪৪



life on colour

ডিজ়াইনার মাসাবা গুপ্তার প্রতিটি পোশাকে থাকে প্রকৃতির ছোঁয়া। কাট ও স্টাইলেও আছে নতুন ট্রেন্ড। কমলা রঙের উপর নানারকম প্রাণীর মোটিফ করা পালাজ়ো প্যান্টস। সঙ্গে স্টাইলিশ কাটের ক্রপ টপ।

ব্যাঙ্গল: প্রিটিওজ় বাই দিতি ভুওয়ালকা
ফোন: ৯৮৩০০৮৭১৩৪
ই মেল: pretiosjewellery@gmail.com



Retro revisited

প্যাস্টেল ব্লু-এর উপর উজ্জ্বল হলুদ রঙের ঘট মোটিফের ড্রেস। ড্রেসটি অ্যাসিমেট্রিক্যাল কাটের। স্লিভে লং ফ্রিলের কাজ। ফ্যাশন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইলে এইরকম ড্রেসের সঙ্গে মাথায় একটা বান্দানা পরে নিতে পারেন।



Dazzling Diva

পুজোর সাজে শাড়ি মাস্ট! উজ্জ্বল হলুদ রঙের শাড়িতে ছোট-বড় পদ্মফুলের মোটিফ। এইরকম একটি শাড়ির সঙ্গে উপযুক্ত গয়নার সাজে আপনি অপরূপা।

গয়না: সাক্ষী
ঝুনঝুনওয়ালা
ফোন: ৯৮৩০৭১৮৭৯৯

মডেল: ইশা
পোশাক: মাসাবা,
উডবার্ন পার্ক রোড
ফোন: ৬২৮৯৭৮৪০৭২
মেক-আপ: অভিজিৎ পাল
ফোন: ৯৮৩৬৭০২৭১৯
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
ফোন: ৭২৭৮৫৪৩৯৪০
লোকেশন ও ফুড পার্টনার:
অন্টএয়ার বুটিক হোটেল,
ইকো সেন্টার, ব্লক ইএম-৪,
সেক্টর ফাইভ, কলকাতা
ফোন: (০৩৩) ৭১০১৭১০১
ছবি: সোমনাথ রায়
শুটিং কো-অর্ডিনেশন:
মৌমিতা সরকার



lip ফ্যান্টাসি

ঠোঁটের ক্যানভাস জুড়ে শুধুই রঙের খেলা। কখনও উজ্জ্বল সোনালি, কখনও ঘন নীল, কখনও আবার নিকষ কালো। রহস্য আর স্বপ্নের বুননে ঠোঁটের অনন্য এক রূপকথা শোনালেন সায়নী দাশশর্মা।



ঠোঁট জুড়ে পিচ
ব্ল্যাক লিপস্টিক।
সাহসী, স্বতন্ত্র,
আবার সাবলীলও।
(বাঁদিকের ছবি)

ঠোঁটের ঘন নীল
আভায় স্বপ্নের রেশ।
সপ্রতিভ চাহনিতে
মায়াবি দৃঢ়তা।
(ডানদিকের ছবি)

সাদা শার্ট: সায়ন্তন
সরকার ডিজ়াইন স্টুডিও
ফোন: ৯৮৩১৬৭২৬৭৩
ইয়ারকাফ: ইশরিয়া,
কোয়েস্ট মল
ফোন: ৯১৩৬৪৫৭৬৬৪





ঠিক যেন স্বর্গ
থেকে নেমে আসা
কোনও অপ্সরা।
ঠোঁটের তামা রঙে
নির্ভেজাল স্নিগ্ধতা।
(বাঁদিকের ছবি)

সম্মোহনী পার্পল।
পরিচিত রং, তবু চোখ
সরানো দায়! এমনই
তার আকর্ষণ।
(ডানদিকের ছবি)

সোনালি ড্রেস: ফনেত্তা,
যোধপুর পার্ক
ফোন: ৯১৬৭৪১৯৭৫৬
ব্রেজ়ার ও ইয়ারটপ: ভেরো
মোদা, সাউথ সিটি মল
ফোন: ৪০৬৪ ৩৫০৮
হেডব্যান্ড: ইশরিয়া



চেনা রঙে
চিরন্তন সাজ।
গাঢ় মেরুন
লিপস্টিকে
আত্মবিশ্বাসের
বহিঃপ্রকাশ।



ঠোঁটের ক্যানভাস
জুড়ে সবুজের
স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব।
অচেনা হলেও
বেমানান নয়।

পোশাক: ভেরো মোদা
সোনালি আংটি:
উইভার্স স্টুডিও
ফোন: ২৪৪০ ৮৯২৬
কালো আংটি:
ইশরিয়া

মডেল: ডিম্পল, অনন্যা, শুচিস্মি
মেক-আপ: অভিজিৎ পাল
যোগাযোগ: ৯৮৩৬৭০২৭১৯
ছবি: সোমনাথ রায়
শুটিং কো-অর্ডিনেশন: টিনা পাল



আশ্বিনের শারদ পাতে

বাঙালি পাতের শুরুতে কী খেতে ভালবাসে? স্টার্টার বা অ্যাপেটাইজ়ার শব্দগুলো যখন বাঙালি মেনুর সঙ্গে জুড়েই গিয়েছে, তখন আসুন জেনে নিই এপার-ওপার বাংলার কয়েকটা আদ্যন্ত ‘বাঙালি’ অ্যাপেটাইজ়ারের রেসিপি। লিখছেন সায়নী ঘটক।

অ্যাপেটাইজ়ার বা স্টার্টার বিষয়টা ঠিক 'বাঙালি' নয়। তবে পাতের প্রথমে তেতো খেয়ে বাঙালিদের পঞ্চব্যঞ্জনের শুরুয়াতের চল তো কবেকার! মেনকোর্সের ঠিক আগেই কী খেতে হবে, কোন পানীয়টা আপনার খিদেকে আরও চাঙ্গা করে তুলবে, বাংলার ভোজনবিলাসীরা কিন্তু সেই ব্যাপারটা নিজেদের মতো করে বুঝে নিয়েছে এখন। খাস বাংলার চেনা উপকরণ দিয়ে তৈরি করতে পারেন কয়েকটি আমিষ-নিরামিষ অ্যাপেটাইজ়ার। সঙ্গে রইল খাঁটি বাঙালি ককটেল আর মকটেলের রেসিপিও।

ইলিশ কচুরি

উপকরণ: কচুরির জন্য— ময়দা ৩ কাপ (১ কাপ আলাদা করে রাখুন), নুন ১ চা-চামচ, বেকিং পাউডার ২ চা-চামচ, সাদা তেল ১ চা-চামচ, জল প্রয়োজন অনুযায়ী

পুরের জন্য— ইলিশ ফিলে (বোনলেস) ৩০০ গ্রাম, ১টা মাঝারি মাপের পেঁয়াজকুচি, ২টো আলু সেদ্ধ করা, ধনেপাতাকুচি ১০ গ্রাম, ২-৩টে কাঁচালঙ্কাকুচি, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ভাজা মশলা ১ চা-চামচ (শুকনো খোলায় ভাজা জিরে, ধনে, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো করা), গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, রান্নার তেল ৫ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো

প্রণালী: একটা পাত্রে অল্প তেল দিয়ে নুন-হলুদ মাখানো ইলিশ মাছগুলো ভেজে নিন। এবার প্যানে সেদ্ধ করা আলু দিয়ে একটু নুন ছড়িয়ে দিন। একে একে লাল লঙ্কার গুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, গরমমশলাগুঁড়ো মিশিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কাকুচি, ধনেপাতাকুচি আর ভাজা মশলা দিয়ে রান্না করে নিলেই পুর তৈরি। আলাদা একটা পাত্র নিয়ে তাতে ময়দা, বেকিং পাউডার, নুন আর সাদা তেল মিশিয়ে নিয়ে প্রয়োজনমতো জল দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। ছোট ছোট লেচি কেটে রাখুন। একেকটা লেচির মধ্যে এক টেবলচামচ করে পুর ভরে কচুরির আকারে বেলে নিন। দু'দিক সোনালি করে ভেজে তুলে নিয়ে টিস্যু পেপারের উপরে রেখে অতিরিক্ত তেল ঝরিয়ে নিন। মশলাদার ঝাল ঝাল আলুর দমের সঙ্গে পরিবেশন করুন গরম ইলিশের কচুরি।

আম কাঁকড়া

উপকরণ: কাঁকড়া ৪টে (সি ক্র্যাব/মাড ক্র্যাব), পেঁয়াজবাটা ২ চা-চামচ, টোম্যাটোবাটা ২ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, কাঁচাআমবাটা ২ টেবলচামচ, কাঁচা আমের ফালি, সর্ষেবাটা ২ টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, স্বাদমতো নুন আর চিনি, কালোজিরে আধ চা-চামচ, সরষের তেল ৩-৪ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি

প্রণালী: প্রথমে কাঁকড়া পরিষ্কার করে নিয়ে চার টুকরো করে নিন। নুন-হলুদ দিয়ে ফুটন্ত জলে কাঁকড়ার টুকরোগুলো ভাপিয়ে তুলে রাখুন আলাদা করে। এবার একটা কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করে কালোজিরে আর কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে আদা-রসুনবাটা দিয়ে ভাল করে কষুন। এবার পেঁয়াজবাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা, হলুদগুঁড়ো, কাঁচাআমবাটা, আমের ফালি মিশিয়ে দিন একে একে। একটু জল দিয়ে খানিকক্ষণ রান্না করুন। এবার সেদ্ধ করে রাখা কাঁকড়ার টুকরোগুলো মিশিয়ে নিন। স্টকটাও মিশিয়ে দিন। সরষেবাটাও দিয়ে দিন। প্রয়োজনমতো নুন আর চিনি যোগ করুন। রান্না শেষ হয়ে এলে অল্প কাঁচা তেল ছড়িয়ে দিন উপর থেকে।



ইলিশ কচুরি



আম কাঁকড়া



এঁচোড়ের কাটলেট



মেটের রসোল্লা

গরম ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতেই পরিবেশন করুন আম কাঁকড়া।

এঁচোড়ের কাটলেট

উপকরণ: এঁচোড় ২০০ গ্রাম (গ্রেট করা), ১টা বড় আলু সেদ্ধ করা, আমাদা ২৫ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ৭০ গ্রাম, রসুনবাটা ৪০ গ্রাম, আদাবাটা ৩০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কাবাটা ২৫ গ্রাম, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো ২ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ২০ গ্রাম, জিরেগুঁড়ো ২০ গ্রাম, ধনেপাতাকুচি ১৫ গ্রাম, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ২টো তেজপাতা, স্বাদমতো নুন ও চিনি, কর্নফ্লাওয়ার ১৫ গ্রাম, ব্রেড ক্রাম্ব ২০০ গ্রাম, সাদাতেল ৩০০ মিলি

প্রণালী: হাতে কিছুটা তেল মেখে নিন। একটা বড় পাত্রে অল্প তেল আর জল নিয়ে এঁচোড়ের টুকরোগুলো তাতে ফেলুন। এঁচোড়ের বিচির ধারের শক্ত খোলা ছাড়িয়ে ফেলে দিন। অল্প নুন আর হলুদ দিয়ে টুকরোগুলো গরম জলে ভাপিয়ে নিন। জল ঝরিয়ে রেখে দিন। এবার প্যানে তেল গরম করে



মাছের ঝুরি

পেঁয়াজকুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন, যতক্ষণ না নরম হয়ে আসছে। একে একে আদা, রসুন, কাঁচালঙ্কাবাটা দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে কষতে থাকুন যতক্ষণ না কাঁচা মশলার গন্ধ চলে যাচ্ছে। এবার হলুদগুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো আর নুন দিয়ে আরও মিনিটতিনেক নাড়ুন। সেদ্ধ করে রাখা এঁচোড় আর আলু সেদ্ধ দিয়ে দিন এবার। গরমমশলাগুঁড়ো দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ধনেপাতাকুচি আর লেবুর রস দিয়ে মাখিয়ে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। মিশ্রণটা ঠান্ডা হলে গ্রেট করা আম আর আমাদা পেস্ট মিশিয়ে দিন। কাটলেটের আকারে গড়ে কর্নফ্লাওয়ার আর ব্রেড ক্রাম্বে ডুবিয়ে ডিপ ফ্রাই করে নিলেই তৈরি এঁচোড়ের কাটলেট।

মেটের রসোল্লা

উপকরণ: মটন/চিকেন লিভার (মেটে) ৩৫০ গ্রাম, দই ২০০ গ্রাম, রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা ১ টেবলচামচ, ৫-৬টা কাঁচালঙ্কা চেরা, পেঁয়াজকুচি ২০০ গ্রাম, কয়েকটা তেজপাতা, ঘি ৫০ গ্রাম, স্বাদমতো নুন

প্রণালী: মেটেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। জল ঝরিয়ে আলাদা করে রাখুন। একটা পাত্রে দই, রসুনবাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা, চেরা কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজকুচি, তেজপাতা, ঘি নিয়ে মেশান ভাল করে। এবার এই মিশ্রণটা মেটেগুলোয় মাখিয়ে, একটু নুন মিশিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন আলাদা করে ম্যারিনেশনের জন্য। ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে ম্যারিনেটেড মেটেগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দিন প্যানে। ভাল করে কষিয়ে আঁচ কমিয়ে রান্না করুন। ভাল করে সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। সরু চালের ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মেটের রসোল্লা। ঠাকুরবাড়িতে এই রান্নার চল ছিল একসময়।

মাছের ঝুরি

উপকরণ: ইলিশ ৬০ গ্রাম, মৌরলা ৭৫ গ্রাম, চিংড়ি ১০০ গ্রাম (২৫-৩০টা), ভেটকি ৫০ গ্রাম, তোপসে ৫০ গ্রাম, লেবুর রস ২ চা-চামচ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, তাজা ধনেপাতা ১০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ১০ গ্রাম, সাদাতেল ৫০০ মিলি, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, বেসন ২০০ গ্রাম, কালোজিরে ৫ গ্রাম, আদা ৩০ গ্রাম, নুন স্বাদমতো, চাটমশলা ১০০ গ্রাম, বিক্রমপুরের কাসুন্দি

প্রণালী: একটা মাঝারি ঘনত্বের ব্যাটার তৈরি করুন বেসন, আদাবাটা, নুন, কালোজিরে, লাল লঙ্কাগুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, জিরে আর ধনেগুঁড়ো, ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা সব মিশিয়ে। আগে থেকে মাছ ধুয়ে ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে লেবুর রস আর নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে কিছুক্ষণ। এবার ব্যাটারে চুবিয়ে ডিপ ফ্রাই করলেই তৈরি বিভিন্ন ধরনের মাছের ঝুরি। বিক্রমপুরের



পুরভরা ভেটকি



কাঁঠালবীজ দিয়ে চিংড়ির ভর্তা

কাঁঠালবীজ দিয়ে চিংড়ির ভর্তা

উপকরণ: কাঁঠালবীজ ২৫০ গ্রাম, চিংড়ি ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১৫০ গ্রাম, রসুন ৪০ গ্রাম, গোটা শুকনো লঙ্কা ৫-৬টা, সরষের তেল ৭৫ মিলি, স্বাদমতো নুন

প্রণালী: প্রথমেই কাঁঠালবীজগুলো সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিন। চিংড়িও ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে তৈরি করে রাখুন। এবার সরষের তেলে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজকুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। কিছুক্ষণ পর রসুনও দিয়ে দিন। কাঁঠালবীজ আর চিংড়ি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। স্বাদমতো নুন দিন। কষতে কষতেই দানাদার ভর্তা তৈরি হয়ে যাবে। গোটা চিংড়ির সঙ্গে পরিবেশন করুন কাঁঠালবীজ দিয়ে চিংড়ির ভর্তা।

আম কাসুন্দি মুরগি ভাপা

উপকরণ: বোনলেস চিকেন (ছোট টুকরো করা) ২৫০ গ্রাম, আমের কাসুন্দি ১৫ গ্রাম, নারকেলকোরা ১/২ কাপ, কাঁচালঙ্কাবাটা ১ টেবলচামচ, সরষেবাটা ১/২ কাপ, সরষের তেল ৫০ মিলি, হলুদ ১/২ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, চৌকো করে কাটা কলাপাতা/লাউপাতা ৪ টুকরো, সাজানোর জন্য কয়েক টুকরো কাঁচা আম আর কাসুন্দি

প্রণালী : কলাপাতা/লাউপাতা ভাল করে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে আলাদা করে রাখুন। এবার বাকি সবক'টা উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন ভাল করে। মিশ্রণটা পাতায় মুড়ে প্রেশার কুকার বা স্টিমারে ভাপিয়ে নিন ৮-১০ মিনিট। কাসুন্দি আর কাঁচা আমের টুকরো দিয়ে পরিবেশন করুন আম কাসুন্দি মুরগি ভাপা। প্রথম পাত একেবারে জমে যাবে!

কাসুন্দি আর চাটমশলা সহযোগে মুখে চালান করুন!

পুর ভরা ভেটকি

উপকরণ: কলকাতা ভেটকি ফিলে ২৫০ গ্রাম, রসুন ৫০ গ্রাম, আদা ৩০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ২০ গ্রাম, ধনেপাতা ১০ গ্রাম, লেবুর রস ১০ গ্রাম, ১টা বড় আলু সেদ্ধ করা (ম্যাশড), গরমমশলাগুঁড়ো ১৫ গ্রাম, গন্ধরাজ লেবু ১ টুকরো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১০ গ্রাম, ১টা বড় পেঁয়াজকুচি, ১টা ডিম, ময়দা ২০ গ্রাম, সাদাতেল ২০০ মিলি, নুন স্বাদমতো, কাসুন্দি ৫০ গ্রাম, কালোমরিচগুঁড়ো ৫ গ্রাম, ব্রেডক্রাম্ব ২০০ গ্রাম

প্রণালী: ভেটকির ফিলে নিয়ে সরু ফালি করে কেটে নিন। আদা-রসুনবাটা, নুন আর লেবুর রস মাখিয়ে মাছের টুকরোগুলো ম্যারিনেট করে রাখুন ফ্রিজে রেখে দিন অন্তত আধঘণ্টা। ফিলে কেটে নেওয়ার পর বেঁচে যাওয়া মাছটা একটা পাত্রে ভাপিয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে আলাদা করে রাখুন। তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজকুচি দিন। হালকা বাদামি রং ধরলে আদা-রসুনবাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিন ভাল করে। এবার সেদ্ধ করে রাখা মাছ দিয়ে দিন মশলার মধ্যে। ভাল করে কষান। একে একে সেদ্ধ করা আলু, কালোমরিচগুঁড়ো, ধনেপাতাকুচি মেশান। শেষে গরমমশলাগুঁড়ো দিন। এবার ম্যারিনেট করে রাখা ফিলেগুলোর মধ্যে এই মশলাটা পুর হিসেবে ভরে রোল করে নিন। ডিম আর ময়দা গোলার ব্যাটারে ডুবিয়ে, ব্রেড ক্রাম্ব মাখিয়ে ডিপ ফ্রাই করে নিন। কাসুন্দি আর গন্ধরাজ লেবু দিয়ে খান পুর ভরা ভেটকি।



আম কাসুন্দি মুরগি

পান মিষ্টি মৌরি মার্টিনি

উপকরণ: ভদকা ৪৫ মিলি, লন্ডন ড্রাই জিন ১৫ মিলি, একটা মিঠে পান (লেবু ছাড়া) অথবা বাড়িতে তৈরি মিঠে পানের সিরাপ ১৫ মিলি, মৌরি কিংবা মৌরির সিরাপ ১০ মিলি, ক্র্যানবেরি জুস ৬০ মিলি, ফ্রেশ লাইম জুস ১০ মিলি, আইস কিউব ৬টা

প্রণালী: সবক'টা উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন প্রথমে। এবার ছেঁকে তুলে শেকারে দিয়ে বরফকুচি মিশিয়ে ঝাঁকিয়ে নিন ভাল করে। মার্গারিটা গ্লাসে ঢেলে দিন। সবশেষে মিঠে পান আর মৌরি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন এই বাংলা মার্টিনি।


পান মিষ্টি মৌরি মার্টিনি


গুড় আদা কমলালেবু মোহি

গুড়-আদা-কমলালেবু মোহিতো

উপকরণ: বেকড জিঞ্জার গুড় এবং অরেঞ্জ কমপট ২ টেবলচামচ, জিঞ্জার এল ৬০ মিলি, ফ্রেশ পুদিনা পাতা ১০টা, অর্ধেক লেবুর টুকরো, ফ্রেশ লাইম জুস ১৫ মিলি, আদার সিরাপ ১০ মিলি, অল্প সোডা, অ্যাঙ্গোসতুরা বিটারস, ক্রাশড আইস

প্রণালী: বস্টন শেকারে সবগুলো উপকরণ দিয়ে ঝাঁকিয়ে নিয়ে একটা হারিকেন গ্লাসের অর্ধেকটা ভর্তি করুন। বাকিটা ভরুন ক্রাশড আইস দিয়ে। পুদিনাপাতা, লেবুর টুকরো আর আদার কুচি দিয়ে গার্নিশ করুন।


চায়ের আপেল মার্টিনি

চায়ের আপেল মার্টিনি

উপকরণ: ভদকা ৪৫ মিলি, লন্ডন ড্রাই জিন ১৫ মিলি, ফ্রেশ লাইম জুস ১০ মিলি, অ্যাপেল জুস ৬০ মিলি, আর্ল গ্রে চায়ের লিকার ৬০ মিলি, ট্রিপল সেক সিরাপ ১৫ মিলি, আইস কিউব ৬টা

প্রণালী: সবক'টা উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে দশ সেকেন্ড ধরে বরফকুচির সঙ্গে ঝাঁকিয়ে নিন। এবার ভাল করে ছেঁকে একটা ফ্যান্সি ক্লে-কাপে ঢেলে দিন ককটেলটা। ড্রাই আইস, গ্রিন অ্যাপেল আর ফুল দিয়ে সাজান।

রেসিপি সৌজন্য:
ইলিশের কচুরি, আম কাঁকড়া, মেটের রসোল্লা: শেফ দীপ মিত্র ঠাকুর, এগজিকিউটিভ শেফ, মি
হোটেল ভিভান্তা কলকাতা
ফোন: (০৩৩) ৬৬৬৬০০০০

কাঁঠালবিচি দিয়ে চিংড়ির ভর্তা, আম-কাসুন্দি মুরগি ভাপা:
শেফ মিহির কিরণ মুখোপাধ্যায়, কর্পোরেট শেফ, ৬, বালিগঞ্জ প্লে
ফোন: (০৩৩) ২৪৬০৩৯২২

এঁচোড়ের কাটলেট, পুরভরা ভেটকি, মাছের ঝুরি:
শেফ ভাস্কর দাশগুপ্ত, সিনিয়র সু-শেফ, সোনার তরী

গুড়-আদা-কমলালেবু মোহিতো, চায়ের আপেল মার্টিনি, পান মিষ্টি মৌরি মার্টিনি: বারটেন্ডার দেবাশিস জোসেফ, সোনার তরী, ফোন: ৯০৭৩৩৯৪৫৯১

মডেল: পার্নো মিত্র
পোশাক ও স্টাইলিং: অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোন: ৯৬৭৪৮১১৯৩২
মেকআপ: মৈনাক দাস, ফোন: ৮২৭৪৯০২৫২৭

ছবি: সুপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, শুভদীপ ধর



বাংলাদেশের হৃদয় হতে...

মূর্তি থেকে শারদোৎসব, বাংলায় দুর্গাপূজা যেন এক অদ্ভুত রূপকথার মতো যাত্রা। ইতিহাস থেকে সেন্টিমেন্ট কীভাবে মিশেছে একসঙ্গে, দেখার চেষ্টা করলেন পায়েল সেনগুপ্ত।

সম্প্রদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং শঙ্খ স্বনানন্তর পুষ্পবৃষ্টিঃ।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব।।

তাঁর সেই জন্মদিন সকলের পক্ষেই পরম সুখকর হয়ে উঠেছিল। দশদিক আনন্দে প্রসন্নতা লাভ করল। সর্বত্র ধ্বনিপ্লুত নির্মল সমীরণে ছেয়ে গেল। দেবগণের শঙ্খধ্বনিতে পূর্ণ হল আকাশ, অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। স্থাবর-জঙ্গম সকলের পক্ষেই সেই দিন ছিল আনন্দদায়ক! (কুমারসম্ভব, কবি কালিদাস, প্রথম সর্গ, শ্লোক নং ২৩)।

কবি বর্ণনা করছেন হিমালয়নন্দিনী উমার জন্মদিন। এই পার্বত্যকন্যা উমাকেই কি তা হলে আমরা 'মা' বলে ডাকি? কোনও এক মনোরম



পুরনো কলকাতা

শারদসকালে 'দনুজদলনী দুর্গা' বলে কি এঁরই পুজো শুরু হয়? মহিষের ছদ্মবেশধারী এক প্রবল পরাক্রমশালী অসুর নিধনের জন্য দেবতাদের পুঞ্জীভূত তেজ থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল, তিনি বাংলার এত আপন হয়ে উঠলেন কবে থেকে? কৌতূহল নিরসনের জন্য আমাদের ইতিহাসের দ্বারস্থ হতেই হয়। বৈদিক যুগে যজ্ঞাগ্নিতে দেবীকে পুজা করা হত। তখন যজ্ঞবেদীর বা যজ্ঞকুণ্ডের নাম ছিল 'দক্ষ-তনা', যা থেকে দেবীর নাম হয়েছে 'দক্ষ তনয়া'। সিংহবাহিনী মহিষাসুরদলনী দুর্গার অস্তিত্ব কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষিতে অনেকাংশেই আন্তর্জাতিক। Buffalo Demon বধ করার কথা অনেক প্রাচীন জাতির গল্পকথাতেই রয়েছে। ভূমধ্যসাগরে প্রাচীন মনখ্‌খুম নামক এক উপজাতির বাইর্গো দেবী মহিষরূপী দৈত্যকে বধ করেছিলেন, জানা যায়। এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকায় মহিষের খুব উৎপাত ছিল, আমেরিকায় আবার বাইসন। দেবী উপাসনার সুদূর অতীতে অর্থাৎ প্রায় প্রাক খ্রিষ্টীয় শতকে কৌম সমাজে পূজিতা আদিমাতাধর্মী পোড়ামাটির মূর্তিতে ধরা আছে দেবীরূপের প্রাক ইতিহাস। বাংলায় ব্যাপকভাবে উপাসিতা আজকের এই দুর্গামূর্তির উদ্ভব এবং বিকাশের কাহিনি বহুমাত্রিক। দেবীরূপের ক্রমবিবর্তনের আখ্যান আসলে তৃতীয়-দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব শতক থেকে সমাজ, ধর্ম ও রূপভাবনার জটিল ইতিহাসকে বহন করে। বাঙালির প্রচলিত দুর্গামূর্তি সিংহবাহিনী ও মহিষমর্দিনী। সম্ভবত মহিষমর্দিনী রূপটিই ঈষৎ প্রাচীন দেবীরূপ। এবং এই রূপ শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়, বহুলাংশেই আন্তর্জাতিক। রাজস্থানের 'নাগার'-এ পাওয়া গিয়েছিল আনুমানিক প্রথম খ্রিষ্টপূর্ব শতকের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ফলক। সম্ভবত মহিষমর্দিনীর প্রাচীনতম নিদর্শন এটি। ঐতিহাসিকদের অনুমান, একাধিক অভারতীয় সিংহরূপা দেবীরূপ থেকে প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকের আশপাশে ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে সিংহবাহিনী দেবীর বিকাশ ঘটে। ঐতিহাসিক প্রমাণ বা নিদর্শন অনুযায়ী খ্রিষ্টীয় ধর্ম বা পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে মধ্যভারতে বা মধ্যগাঙ্গেয়-অববাহিকা অঞ্চলে মহিষমর্দিনী এবং সিংহসহিতা দু'ধরনের দেবীরূপই পূজিত হত। বারাণসীর কাছে রাজঘাটে প্রাপ্ত একটি সীলে দেবীমূর্তির নীচে 'দুর্গা' নামটি উৎকীর্ণ আছে। উত্তর প্রদেশের ভিটা এবং বিহারের বৈশালীতে পাওয়া কয়েকটি সীলে সিংহের মুখোমুখি দণ্ডায়মান এক দেবীকে দেখা যায়। চতুর্থ ও পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দের পাথরের মূর্তিতে দেবী মহিষরূপী-অসুর সংহাররতা, তিনি চতুর্ভুজা, কোথাও কোথাও ষড়ভুজা, অষ্টভুজা, কিন্তু সিংহ এই মূর্তিগুলিতে দেখা যায় না। দেবীর প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল। অন্য হা দিয়ে তিনি মহিষের গ্রীবা কিংবা পিছনের প ধরে আছেন। মধ্যপ্রদেশের রামগড়ে এরকম দু'টি মূর্তি খোদিত আছে পাহাড়ের গায়ে। সপ্তম খ্রিষ্টশতকে মহাবলীপুরমে সিংহরূপা দেবী মহিষাসুরের সঙ্গে প্রবলভাবে যুদ্ধরতা ওই একই সময় আর-একটি মূর্তিতে যুদ্ধ শেষ করে দেবী মহিষের বিমর্দিত মুণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে। একইসঙ্গে সিংহ এবং মহিষাসুরকে বোধ হয় সপ্তম শতাব্দীর আগে দেখা যায়নি। পশুরূপী মহিষ থেকে পশু ও মানুষের মিলিত রূপ এবং স্বতন্ত্রভাবে মানবদেহী মহিষের কল্পনার বিস্তার চলেছে প্রায় কয়েক শতাব্দী জুড়ে। বিন্ধ্যাচলে পাও গিয়েছে অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি। নবম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় দেবীমূর্তির নানারকম ভাঙাগড়া হয়েছে। পাল-সেন আমলের কিছু ভাস্কর্য থেকে পদ্মের উপর অধিষ্ঠিত দেবীমূর্তির হাতে ত্রিশূল, শিবলিঙ্গ এবং আশপাশে কিছু নারী ও পুরুষমূর্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, যাঁদের কার্তিক গণেশ বলে অনুমান করা যেতেই পারে। ঐতিহাসিকদের মতে, দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাপ্ত ভাস্কর্যগুলির মধ্যে দেবী দুর্গার আজকের পূজিত মূর্তির আভাস পাওয়া যায়। এরপর অনেক গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে সিংহবাহিনী সপরিবার ও পদপ্রান্তে মহিষরূপী অসুরবধ মূর্তি সম্ভবত গ্রাহ্য হয়েছে।



বাংলার বাড়ির পুজো



বাংলায় দুর্গাপূজার উদ্ভব হিসেবে দেখা যায় মুঘল যুগের শেষ ভাগকে। অবিভক্ত বাংলার রাজশাহি জেলার তাহিরপুরের রাজা উদয়নারায়ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের মতোই শক্তিপ্রদ কোনও অনুষ্ঠান হিসেবে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ছেলে কংসনারায়ণ বাবার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন। শোনা যায়, তখনই এই পুজোর খরচ হয়েছিল আনুমানিক আট লক্ষ টাকা। ১৬০০ সালে নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার প্রথম পুজো করেছিলেন। কলকাতার বুকে ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম পুজো করেছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, বর্তমান সাবর্ণ রায়চৌধুরী বাড়ির পূর্বপুরুষ। ভবানন্দ ও লক্ষ্মীকান্ত দু'জনেই প্রাধান্য পেলেন আকবরের প্রধান সেনাপতি ও পরে অম্বরের রাজা মানসিংহের দৌলতে। এরপর থেকেই গৌড়, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ এবং কৃষ্ণনগরে দুর্গাপুজো ক্রমশ হয়ে উঠল বাঙালির বাৎসরিক উৎসব। অনেকটাই শুরু হয় অর্থনৈতিক শক্তিপ্রদর্শনের একটি মাধ্যম হিসেবে দুর্গাপুজোকে দেখা। অনেক প্রামাণ্য তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২) সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ পুজার আয়োজন করেছিলেন বাংলার বুকে। উলটোরথের দিন কামান দেগে শুরু হত খুঁটিপুজো বা প্রতিমা নির্মাণের কাজ। দুর্গাকে সাজানো হত যোদ্ধার বেশে। ১০৮ সংখ্যাটার খুব গুরুত্ব ছিল তাঁর পুজোয়। ১০৮ মণ কাদামাটির জোগান থেকে শুরু করে ১০৮টি ঢাক বাজা। সেই সঙ্গে ১০৮টা পদ্ম তো আছেই। বিসর্জনের সময়ও ১০৮টি পালকি যেত জলঙ্গিতে। ১৮২৯ সালের ১৯ অক্টোবরের সমাচার দর্পণে লেখা হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্রই বাংলার দুর্গাপুজোকে একটি বিলাসবহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ ব্যাপার হিসেবে তৈরি করলেন, শুধু তাই নয়, অধীনস্থ জমিদারদেরও উৎসাহ দিতেন পুজো করার জন্য। কৃষ্ণচন্দ্রই কিন্তু প্রথম 'নচ পারফরম্যান্স'-এর আয়োজন করেছিলেন পুজোর সময়। কৃষ্ণচন্দ্রের পথ অনুসরণ করে শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব-এর বাড়িতেও শুরু হল দুর্গাপুজার ব্যাপক আয়োজন। তখনও পর্যন্ত কিন্তু আয়োজনের আতিশয্যে ভক্তিভাবের কোনও লঘুতা আসেনি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এরপর ব্রিটিশরা এল, বদলে গেল প্রতিমার মুখ রানি এলিজাবেথের আদলে। ভক্তিভাবের পরিবর্তে প্রধান হয়ে উঠল পদলেহনের ভাব। সংস্কৃতির নামে মদের ফোয়ারা গ্রাস করে নিল ক্রমবর্ধমান জমিদারবাড়ি ও উঠতি বাবুদের বাড়ির পুজো। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় তুলে ধরলেন নব্য বাবু কালচারের পুজোর ব্যঙ্গাত্মক রূপ। সময় শেষ হয়ে আসে সকলেরই। বাবুরা বিদায় নিয়েছে, ব্রিটিশরাও। স্বাধীনভারতে পুরনো বাড়ির প্রসিদ্ধ পুজো ছাড়াও কীভাবে বারোয়ারি পুজোয় ছেয়ে গেল কলকাতা, সে এক অন্য ইতিহাস, সেখানে কুমারসম্ভব নেই, উমার জন্মদিন নেই, কোনও বাঙালি গল্পকথাও নেই। বঙ্কিমচন্দ্র এসে দুর্গাপ্রতিমায় আবার নতুন করে প্রাণসঞ্চার করলেন, 'আনন্দমঠ'-এ, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ। রবীন্দ্রনাথঠাকুর লিখলেন, ''এই শক্তির প্রসন্নমুখ মাতা। এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী।'' আমরা এত কিছু মনে না রাখলেও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কথিত 'মহিষমর্দিনীরূপ ধরেন চণ্ডিকা'-র পুজোয় কিন্তু কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি।

তথ্যসূত্র: *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, মহেন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ), মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, দুর্গা বাংলার ঐতিহ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বনেদি কলকাতার ঘরবাড়ি, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়*

অলংকরণ: রৌদ্র মিত্র



সাইক্লোন

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

"হ্যালো দীপেন?"

"ইয়েস স্যার।" মোবাইলে বড়বাবুর কথাটা খুব একটা স্পষ্ট নয়। তার ওপর সোঁ সোঁ করে বাইরে থেকে একটা আওয়াজ আসছে। সাব ইন্সপেক্টর দীপেন সামন্ত চোখ কুঁচকে বন্ধ করে বড়বাবুর বলা প্রতিটা শব্দ বোঝার চেষ্টা করতে শুরু করল।

"শোনো, অবস্থা খুব খারাপ চারদিকে। আরও খারাপ হবে। টিভিতে দেখাচ্ছে সাইক্লোনে চতুর্দিক ছারখার হয়ে যাচ্ছে। হাইওয়ে বন্ধ। কন্টাই থেকে শীতলপুরের দিকে আসার রাস্তাতেও দু'টো বড় গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ। হ্যালো... হ্যালো... শুনতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ স্যার, শুনছি।"

"আঃ! শুনছ তো মাঝেমাঝে হ্যাঁ-হুঁ করছ না কেন? তুমি আর শুধরোনোর নও। শোনো, এই গুটিকয়েক ফোর্স নিয়ে চারদিকে ঝামেলা সামাল দিতে হচ্ছে। আমি সবাইকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছি। থানাটা আপাতত তোমাকে একাই সামলাতে হবে।"

"স্যার।"

"ধ্যাত! পুরোটা আগে মন দিয়ে না শুনে স্যার স্যার কোরো না তো। একটা কেস আছে। হাসপাতালে অবশেষে শালা চোরটাকে ধরেছি। অবশ্য আমার হাতে আসার আগেই গণপিটুনি হয়েছে। পাবলিকই পিটিয়ে আধমরা করে দিয়েছে। প্রচণ্ড বিক্ষোভ। সাইক্লোনটাই যা বিক্ষোভটাকে বড় করে দানা বাঁধতে দিচ্ছে না বলে রক্ষা। যাক গে শোনো, লোকটাকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো যাচ্ছে না।"

বড়বাবুর কথাটা কেটে কেটে যাচ্ছে। দীপেন অন্য কানে একটা আঙুলে চেপে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল, "কোন

লোকটা স্যার?”
বড়বাবু চিরবিড়িয়ে উঠলেন, “যে লোকটা শালা তোমার মতো অকর্মণ্যর হাত থেকে দু'বার পালিয়েছিল।”
নীপেন ঢোঁক গিলল। লোকটার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। লোকটা থানার রাতের ঘুম কেড়েছে। গত চার মাস ধরে হাসপাতাল থেকে ক্রমাগত ওষুধ চুরি হচ্ছে। হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে লোকটাকে শনাক্ত করা গেলেও লোকটা এলাকার নয়। তবে লোকটাকে দু'বার ধরা গিয়েছিল। এমনই কপাল, দু'বারই লোকটা নীপেনকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়েছিল। আর এর মধ্যেই পরশু একটা সদ্যোজাত শিশু চুরি হয়েছে। তার কিনারা এখনও হয়নি। এলাকায় একটা উত্তেজনা রয়েছে। সবার ধারণা এই লোকটাই আছে ওর পিছনে। তবে লোকটা একা নয়, নিশ্চয়ই হাসপাতালের একটা চক্র আছে ওর পিছনে। সেটা লোকটাকে থার্ড ডিগ্রির জেরা না করলে বোঝা যাবে না।
“হ্যালো... হ্যালো...” বড়বাবুর গলাটা চড়ল।
“স্যার।”
“ধুর শালা স্যার। হাঁ-হুঁ করছ না কেন?”
“স্যার। লাইনটা খুব ডিস্টার্ব করছে।”
“আঃ! মোবাইলটা এবার বদলাও তো তোমার। যা শোনার তাড়াতাড়ি শুনে নাও। থানাটা তোমাকে একাই সামলাতে হবে। লোকটাকে রাত্রে লকআপে রেখো। এবার যেন কোনও ঢ্যামনামি না হয়। লোকটা যেন আবার পালিয়ে না যায়। লোকে এমনিই বলছে তোমার শালা ওই চক্রের সঙ্গে সাঁট আছে। লালাকে বলেছি, জিপে করে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। লালাকে কিন্তু আটকে রেখো না। হ্যালো... হ্যালো...”
“স্যার।”
“উফ! কোথাও একটুও শান্তি নেই। এসপি সাহেবকে বলে বলে বোঝাতে পারছি না, এই তোমাদের মতো অপদার্থ ফোর্স নিয়ে পারফরম্যান্স ঠিক রাখা যায় না।”

এত অ্যাটিটিউড দেখাবেন না আমাকে, বুঝেছেন? আমি মোবাইলে ছবি তুলে রেখেছি আর নিজের কানে শুনেছি বড়বাবু আপনাকে কী ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন।



বড়বাবু দুম করে ফোনটা ছেড়ে দিলেন। তবে জরুরি নির্দেশ যা দেওয়ার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এক, এই দুর্যোগের রাত্রে থানাটা একা সামলাতে হবে। আর দুই, লোকটাকে থানায় লকআপে বন্ধ করে রাখতে হবে। হারামির হাতবাক্সটা এবার যেন কিছুতেই ধোঁকা দিয়ে পালাতে না পারে। বাইরে সাইক্লোন ফণা তুলেছে। সকাল থেকে বৃষ্টি, দুর্যোগ। ঘণ্টাখানেক আগে পর্যন্ত যতক্ষণ টিভিটা চলছিল, সব খবরের চ্যানেলে একটাই কথা বলছিল, সাইক্লোনের গতিবেগ এখন ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার। দিঘার দিক থেকে এদিকে ধেয়ে আসছে। রাজা যখন কোনও দেশ ছারখার করতে আসে, তার আগে থাকে রে-রে করা সৈন্যদল। সেই সৈন্যদলই এখন প্রচণ্ড গতির ভেজা হাওয়া হয়ে জানলা দিয়ে কোতোয়ালি থানাটায় অবাধে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। থানার ল্যান্ডলাইনটা গিয়েছে। সাইক্লোনে তার-ফার সব উপরে গিয়েছে বোধহয়। টিউবলাইটগুলো অনেকক্ষণ ধরে মিটমিট করছিল। এবার ভোল্টেজ কমে নিভে গেল। আলো বলতে থাকল সিলিং থেকে ঝোলানো শেড দেওয়া বাল্বটা। সেই হলদেটে আলোটাও ভোল্টেজের অভাবে টিমটিম করে জ্বলছে আর থেকে থেকে দপদপ করছে। যে কোনও সময় সেটাও চলে যাবে। পশ্চিমের জানলাটা দিয়ে সোঁ সোঁ করে শিসের মত আওয়াজটা কমছে বাড়ছে। থানার এই জানলাটা পুরো টেনে বন্ধ করে ছিটকিনি লাগানো যায় না। জানলার ফ্রেমে যে আংটাদু'টো আছে, সেগুলোয় যতটা পারে কষে দড়ি বেঁধেছে নীপেন। কিন্তু আড়াআড়ি একটা ফাঁক রয়েই গিয়েছে। সাইক্লোনের হাওয়া ওইখান দিয়ে তীব্র শিস দিতে দিতে ঢুকছে।
মোবাইলের টাওয়ার-ফাওয়ার আর কতক্ষণ থাকবে জানা নেই। নীপেন তাড়াতাড়ি বাড়িতে নীলিমাকে ফোন করল, “শুনছ, আর বাড়ি ফিরতে পারব না।”
নীপেন রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারবে কি পারবে না, সে ব্যাপারে নীলিমার কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। নীপেন যে সারারাত্রি থানায় থাকবে এই ভয়ংকর দুর্যোগের দিনে, রাতে খাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে তা নিয়েও কোনও চিন্তা নেই। প্রেশার সুগারের ট্যাবলেটগুলো নেই। সেটার ব্যাপারেও কোনও চিন্তা নেই। উলটে উদ্বিগ্ন গলায় নীপেনের দুশ্চিন্তাটা আরও বাড়িয়ে দিল, “পপি এখনও টিউশন থেকে ফেরেনি। একটু থানার গাড়িটা নিয়ে গিয়ে দ্যাখো না। ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। মোবাইলেও পাচ্ছি না মেয়েটাকে।”
“মানে?”
“আঃ! আজকে মলয় মাস্টারের কাছে টিউশন ছিল। ওখানেই হয়তো আটকে আছে। যাও না, লালাকে নিয়ে তোমাদের থানার গাড়িটা করে মেয়েটাকে একটু বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাও।”
নীপেনের বলতে ইচ্ছে করল, “থানার গাড়িটা কি আমার বাবার সম্পত্তি? নাকি লালা আমার চাকর?” কিন্তু কথাগুলো বলতে না পেরে বলল, “মলয়ের বাড়িতে আটকে থাকলে ভালই আছে। রাস্তায় তো পড়ে নেই।”
নীলিমা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, “কী বুদ্ধি তোমার? জানো না, মলয় মাস্টারের বউ এখন বাচ্চা হতে বাপের বাড়ি গিয়েছে। মাস্টারটা বাড়িতে একা। আর মেয়েটা থেকে যাবে বাড়িতে? নেহাত ঝড়ের দাপটে বাড়ির বাইরে বেরতে পারছি না। না হলে তোমার মত অপদার্থর উপর ভরসা করি?”
মোবাইলের মধ্যে কিঁক করে একটা আওয়াজ হল। এই আওয়াজটা নীপেনের চেনা। মোবাইলের চার্জ ১৫% এ নেমে এলে এরকম আওয়াজ হয়। মোবাইলটা পুরনো হয়েছে। ব্যাটারিটা বেশিক্ষণ চার্জ ধরে রাখতে পারে না। এরপর বিদ্যুৎ চলে গেলে আর চার্জ করা যাবে না। যতক্ষণ বিদ্যুৎ আছে তারমধ্যে পুরো চার্জ করে নিতে হবে। বাড়ির চেয়েও বেশি চিন্তা বড়বাবুকে নিয়ে। শরীরটা আজ এমনিতেই তেমন জুতের নেই। সারারাত থানাটা সামলাতে হবে। তার উপর একটু পরেই লালা ওই চোরটাকে ধরে নিয়ে আসবে। লক-আপে রাখতে হবে লোকটাকে। জেরা করতে হবে। রাত্রে বড়বাবু যে কতবার ফোন করবেন ঠিক নেই। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বাথরুম থেকে ফেরার সময়ও একবার ফোন করবেনই করবেন। তখন যদি চার্জ শেষ হয়ে গিয়ে মোবাইল সুইচড অফ পান, কাল এসে অনর্থ করবেন। নীপেন ব্যস্ত হয়ে নিজের ড্রয়ার খুলে চার্জার খুঁজতে আরম্ভ করল।
নাঃ! চার্জারটা ড্রয়ারে নেই। অনেকক্ষণ অস্থির হয়ে ভেবে মনে পড়ল বড়বাবু আজকে একবার চার্জারটা নিয়েছিলেন। তারপর ফেরত দিয়েছিলেন কি? অবশ্য বড়বাবু চার্জারটা চেয়ে নিলেও কোনওদিন ফেরত দেন না। প্লাগ-পয়েন্টেই লাগানো থাকে। নীপেনকে খুলে নিয়ে আসতে হয়। বড়বাবুর টেবিলের কাছে গিয়ে দেখল, ঠিক তাই। তবে চার্জারটা লাগানোর আগেই মোবাইলটা আবার বেজে উঠল। আবার নীলিমা। মেয়েটা বাড়ি ফিরে এল কি? ফোনটা ধরতেই নীলিমা উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, “ফোন

করেছিলে?"
"কাকে?"
"মলয় মাস্টারকে? মেয়েটার কোনও খোঁজ নিলে?"
"দাঁড়াও এক্ষুণি তো বললে। কেন তুমি করোনি?"
উলটোদিকে নীলিমা ফেটে পড়ল, "আমি করলে কি আর তোমায় জিজ্ঞেস করি? কেমন বাবা তুমি? এদিকে ঝড়টা বেড়েই চলেছে, মেয়েটা এখনও বাড়ি ফেরেনি। কোনও খবর নেই। আর তুমি থানায় বসে ধ্যান করছ? মেয়েকে আনতে যাওয়া তো দূরের কথা, মাস্টারটাকে ফোন করে একটা খবর পর্যন্ত নাওনি।"
নীলিমার কাছে স্বীকার না করলেও মনে মনে নিজেকেই একটু দুষল দীপেন। জীবনে কোনও শান্তি নেই। রোজনামচায় সাইক্লোন বয়েই চলে। কোনও কিছুই গুছিয়ে করা হয়ে ওঠে না। দিনের শেষে ওই অপদার্থ তকমাটাই গায়ে লেগে থাকে। সত্যিই তো, কর্তব্য কি শুধু এই গায়ের সরকারি উর্দিটার জন্য? বাপ হিসেবে কোনও কর্তব্য নেই? ফোনটায় তো ১৫%-এর উপর চার্জ ছিল। প্রথমেই মলয় মাস্টারকে ফোন করা উচিত ছিল।
"কী গো, চুপ করে আছ কেন? কথা কানে ঢুকছে? মেয়েটা কিন্তু সোমত্ত।"
"আঃ! বলছি না থানায় একা ডিউটিতে আছি।"
"ডিউটি দেখিও না তুমি। তোমার ডিউটি করার যা ছিরি, লোকের মুখে মুখে সেসব কথা যখন ফেরে লজ্জায় মাথা তোলা যায় না।"
দীপেনের মেজাজটা তেতো হতে শুরু করল। ফোনের মধ্যে কিঁক কিঁক করে একটা আওয়াজ আসছে। কেউ ফোন করার চেষ্টা করছে। দীপেন কান থেকে ফোনটা নামিয়ে আর কলার আইডি দেখল না। চোয়াল শক্ত করে নীলিমাকে বলল, "দেখছি।"
কিঁক কিঁক আওয়াজটা হয়েই যাচ্ছে। নীলিমার কথার উপর ফোনটা কেটে দিল দীপেন। তারপর মিসড কলটা দেখে বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বড়বাবু। তাড়াতাড়ি রিং-ব্যাক করল। গোটা চারেক রিং হওয়ার পর বড়বাবু ফোনটা ধরেই তীব্র ভর্ৎসনা করতে শুরু করে দিলেন, "কী ব্যাপার বলো তো? কার সঙ্গে এত কথা বলছ? যতবার ফোন করছি শুধু বিজি আর বিজি। তোমাদের মত অর্ধশিক্ষিতের দেশে শালা আনলিমিটেড টক-টাইম করাটাই উচিত হয়নি। ফোন কোম্পানিগুলো শালা সময়ের দামটাকেই কিনা পয়সা করে দিল। হ্যালো, শুনছ?"
"স্যার।"
দীপেন চুপ করেই আছে। এরকম ভর্ৎসনার মধ্যে আর কী বলবে। বড়বাবু যথারীতি বললেন, "আবার স্যার। আরে বাবা, শুনছ যদি হ্যাঁ-হুঁ করছ না কেন? লালা লোকটাকে নিয়ে পৌঁছিয়েছে?"
"এখনও আসেনি স্যার।"
"এখনও পৌঁছয়নি? কী আশ্চর্য! লালাকে ফোন করে খোঁজ নিয়েছ?"
"না স্যার।"
বড়বাবু আবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, "কী আশ্চর্য এতক্ষণ হয়ে গেল লালা লোকটাকে নিয়ে পৌঁছয়নি আর তুমি খোঁজ পর্যন্ত নিলে না। সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে? ভগবান কী পদার্থ দিয়ে তৈরি করেছে তোমাকে?"
বড়বাবু যথারীতি দুম করে ফোনটা ছেড়ে দিলেন। নিজের উপরেই একটা রাগ হল দীপেনের। সবকিছু এত গুলিয়ে যায় কেন? শীতলপুর জায়গাটা তো আর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জের মত বড় নয়। ফাঁকা রাস্তায় পুলিশের জিপে ১৫ মিনিটেই এফোঁড় ওফোঁড় করা যায়। ফোনটায় যখন ১৫% চার্জ ছিল, তখন আগে চার্জার না খুঁজে প্রথমেই লালাকে একটা ফোন করে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, কোথায় আছে। ছেলেটা একা জিপ চালিয়ে ওই ধুরন্ধর চোরটাকে নিয়ে আসছে। আগেরবার লোকটা চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছুড়ে দিয়ে পালিয়েছিল। এবার তো সুযোগ আরও মোক্ষম। তাড়াতাড়ি লালাকে ফোনটা করতে যেতেই মোবাইলে আর একটা কল ঢুকে গেল। অচেনা নম্বর। দোনামনা করে ফোনটা ধরেই ফেলল দীপেন।
"মেজবাবু বলছেন?" একটা মেয়ের গলা। দীপেনের রাগ হল। মেয়েটার কাছে যখন মোবাইল নম্বরটা রয়েছে, তখন এটা শীতলপুর থানার মেজবাবু ছাড়া আর কে হবে? গলায় একরাশ বিরক্তি ঢেলে খ্যারখ্যারে গলায় বলল, "কে বলছেন?"
"জয়িতা চক্রবর্তী। চিনতে পারছেন?"
নাম শোনামাত্রই চিনতে পারল দীপেন। মেয়েটা কলকাতায় কোথায় যেন একটা থাকে। নয়নতারা স্কুলে মাস্টারি করতে এসেছে। তবে শুধু মাস্টারিই নয়, সেইসঙ্গে ঘরের খেয়ে মানবাধিকার করতে এসেছে। যতসব চোর-ছ্যাঁচোড়দের জন্য মানবাধিকার। কিছু একজনের পান থেকে চুন খসলে হল। থানায় এসে চিল চিৎকার করবে। কোথা থেকে দলবল জুটিয়ে এনে প্ল্যাকার্ড হাতে থানার সামনে ধর্নায় বসে যাবে। বড়বাবু পর্যন্ত সমঝে চলেন মেয়েটাকে। একবার মোবাইলে ছবি-টবি তুলে দিল্লিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর কী ঝামেলা। এসপি সাহেবকে অবস্থা সামাল দিতে হয়েছিল।
"হ্যালো, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?"
"হ্যাঁ বলুন।"
"আশ্চর্য! একটু রেসপন্ড করবেন তো। শুনুন বিশু দাসের সঙ্গে যে কোনও অমানবিক ব্যবহার করা না হয়, বুঝেছেন?"
বিশু দাস কে ওটা আর জিজ্ঞেস করল না দীপেন। ওই হারামির নামটা ভোলে কী করে? গলাটা একটু গম্ভীর করে নিয়ে বলল, "ম্যাডাম এ ব্যাপারে যা বলার বড়বাবু বলবেন।"
"কোন বড়বাবু? যে বড়বাবু জিপের রডের সঙ্গে বিশু দাসকে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে দিয়েছে? জানেন না, ব্যাপারটা কতটা অমানবিক আর বে-আইনি? সুপ্রিম কোর্টের রুলিং অনুযায়ী জুডিশিয়াল কনসেন্ট ছাড়া হাতকড়া দিয়ে কাউকে বাঁধা যায়না এখন। সে আপনার আমার মত একজন মানুষ। সম্মানের সঙ্গে তার বাঁচার অধিকার ভারতের সংবিধান দিয়েছে। হ্যালো, হ্যালো, আমার কথা শুনছেন?"
লোকটাকে হাতকড়া পরিয়ে জিপের রডে বেঁধে দিয়েছেন বড়বাবু। দীপেন একটু নিশ্চিন্ত হল। হাতকড়া এখন ব্যবহার করা যায় না ঠিকই। তবে পুরনো একটা হাতকড়া বড়বাবু জিপের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। সেটার সদ্ব্যবহার হয়েছে। "বলুন, বলে যান। শুনছি তো।" বিরক্ত গলায় বলল দীপেন।
"শুনুন এত অ্যাটিটিউড দেখাবেন না আমাকে, বুঝেছেন? আমি মোবাইলে ছবি তুলে রেখেছি আর নিজের কানে শুনেছি বড়বাবু আপনাকে কী ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন। বিশু দাস যখন জনরোষের মধ্যে পড়েছিল ওকে উদ্ধার করতে আপনারা অনর্থক দেরি করেছেন। ও সাংঘাতিক আহত। আপনারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেননি। ওকে হাসপাতালের ভর্তির কোনও চেষ্টা করেননি। মোবাইলে সব ছবি তোলা আছে আমার। এক মিনিট লাগবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দিতে। দাঁড়ান ঝড়টা একটু কমলেই আমি থানায় আসছি।"
ফোনটা ছেড়ে খানিকক্ষণ গুম মেরে থাকল দীপেন। ফোনের চার্জটা কমে আট পারসেন্টে নেমে এসেছে। ঠান্ডা মাথায় কর্তব্যের অগ্রাধিকার ঠিক করল। হাতকড়া লাগানো জেনে লোকটাকে নিয়ে চিন্তাটা একটু কমেছে। মলয়কে আগে ফোনটা করতে হবে। কিন্তু মলয়কে ফোনটা করতে গিয়ে এনগেজড পেল দীপেন। এক মিনিট পর আবার। ফের এনগেজড। মলয়ের ওপর রাগ আর জে
দু'টোই বাড়তে আরম্ভ করল দীপেনের। এতবার করে চেষ্টা করে

যাচ্ছে মলয় একবারও দেখছে না। ওই দু-পয়সার মাস্টারটাও কি দীপেনকে পুলিশ বলে একটু গুরুত্ব দেয় না। মাথার ভিতরটা দপদপ করতে শুরু করল। শেষপর্যন্ত অবশ্য মলয়ই ফোনটা করল। ঠিক এমন সময়ে যখন থানার সামনে লালা জিপটা নিয়ে এসে থামল।
"হ্যালো দীপেনদা, সরি আপনি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছিলেন। আসলে সবাইকে একটার পর একটা ফোন করতে হচ্ছে তো।"
কড়া গলায় অনেক কিছু বলার ছিল মলয়কে। কিন্তু ওই সময়টাই বাধ সাধল। লালা ঝিমিয়ে থাকা লিকলিকে চেহারার চোরটাকে কলার ধরে প্রায় ঘষটাতে ঘষটাতে থানার মধ্যে ঢোকাল। দরজাটা খুলতেই সোঁ সোঁ করে সাইক্লোনের হাওয়া ঢুকে টেবিলের ওপর



লোকটাকে যত দেখছে মাথার ভিতর রাগের দপদপানি বাড়ছে। কষিয়ে একটা লাথি মারতে গিয়ে পা-টা কীরকম ভারী লাগল। বুটটা লোকটার গা পর্যন্ত পৌঁছল না।

থাকা কিছু কাগজপত্তর এলোমেলো করে ঘরময় ছড়িয়ে দিল। ভয়ংকর ভাবে দুলতে থাকল শেড থেকে ঝোলা আলোটা। কানে ফোন নিয়েই দীপেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল দরকারি কাগজপত্তরকে রক্ষা করতে।
"হ্যালো দীপেনদা। শুনতে পাচ্ছেন?"
"আঃ! বলো পপিকে কি বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়েছ?"
"সেটার জন্যই তো দাদা এত ফোনাফুনি। আরে শুনুন না মেয়েগুলো সব একসঙ্গে ধরেছে এই ঝড়ের মধ্যে কেউ আর বাড়ি ফিরবে না। সব রাত্রে এখানে খিচুড়ি ডিমভাজা দিয়ে পিকনিক করবে। কিন্তু তার জন্যে তো সব গার্জেনদের পারমিশন চাই। মোটামুটি এখনও পর্যন্ত যাদের ফোন করেছি, সবাই রাজি। আর রাজি না হয়ে উপায় কী? রাস্তায় বেরনোই তো এখন ভীষণ রিস্কি। ঝপাঝপ গাছ পড়ছে। এদিকে তো দাদা আপনি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন যে কন্টাই থেকে শীতলপুরের দিকে আসার রাস্তাটাতে গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে। নাহলে তো ভেবেছিলাম তন্ময়কে বলে ওর মোটরগাড়িটা নিয়ে মেয়েগুলোকে বাড়িতে বাড়িতে..."

দীপেন ফোনটা ছাড়তে পারছে না। তবে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে লালা আর লোকটার ওপর। লালা লোকটাকে সোজা লক-আপে ঢোকাল। তারপর হ্যাচবোল্টটা টেনে তালা লাগিয়ে দিল। লোকটা নেতিয়ে পড়ে গেল। আর ঠিক এই সময়েই মোবাইলটা বন্ধ হয়ে গেল। দীপেন দেখল চার্জ শেষ।
লালা বলল, "ঢুকিয়ে দিলাম। বড়বাবু আপনাকে একটা ফোন করতে বলেছেন।"
দীপেন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলল, "এইমাত্র চার্জ শেষ হয়ে গেল। চার্জ করে ফোন করতে একটু সময় লাগবে। তোর ফোনটা একটু দে তো ভাই।"
দীপেন লালার দিকে হাত বাড়াল। লালা তির্যক হেসে বলল, "এই ঝড় ঠেলে ব্যাটাকে নিয়ে এসে আমিই যখন লকআপে ঢোকালাম তখন বড়বাবুকে আমিই ফোনটা করে দিচ্ছি। আপনি বরং চার্জ করে নিয়ে ফোনটা করবেন। আসলে বড়বাবু খুব চিন্তায় আছেন। আপনার হাত থেকে দু'বার পালিয়েছিল তো ব্যাটা। চলি, বড়বাবু তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন।"
দীপেন একটা ঢোঁক গিলে চুপ করে গেল। শরীরটা খুব অবসন্ন লাগছে। সাইক্লোনের দাপটের আওয়াজটা বেড়েই চলেছে। লকআপের মধ্যে চোরটা একইভাবে নেতিয়ে পড়ে রয়েছে। যেন মরে গিয়েছে। দীপেন জানে চোরটা পাকা অভিনেতা। আগেরবারও জিপের মধ্যে ওরকম নেতিয়ে বসেছিল। তারপর আচমকা চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে পালিয়েছিল। কিন্তু যত বড়ই অভিনেতা হোক না কেন আজ দীপেন নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দেবে লোকটাকে।
মোবাইলটাকে চার্জে বসিয়ে লকআপের তালাটা খুলে ভিতরে ঢুকল দীপেন। লোকটাকে যত দেখছে মাথার ভিতর সমস্ত রাগের দপদপানি তত বাড়ছে। কষিয়ে একটা লাথি মারতে গিয়ে পা-টা কীরকম ভারী লাগল। বুটটা লোকটার গা পর্যন্ত পৌঁছল না। দীপেন আবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তারপর নিচু হয়ে চোরটার শতচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জামার অবশিষ্ট কলারটা ধরে লোকটাকে টেনে ওঠানোর চেষ্টা করতেই জামাটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল। লোকটাকে যে পাবলিক আচ্ছা করে পিটিয়েছে সেটা এই আলো-আঁধারিতেও স্পষ্ট। সত্যিই অধমরা হয়ে আছে চোরটা। তবে এসব লোক আরশোলার প্রাণ নিয়ে জন্মানো। শরীরে যেন স্নায়ু বলে কোনও বস্তু নেই। লোকটা যেন জন্ম নিয়েছে দীপেনকে পদে পদে অপদস্থ করার জন্য। এই একটা চোরের জন্য কত হেনস্থাই না হতে হয়েছে। বড়বাবু বা নীলিমার কথা বাদই দিল। দু'বেলা উঠতে বসতে দীপেনকে অপদার্থ বলে। পঞ্চায়েত প্রধান পর্যন্ত গতবার বলেছিল, "যমের অরুচি কথাটা শুনেছি, কিন্তু থানার অরুচি আাই তোমাকে দেখে বুঝছি। তুমি থানারও অরুচি। তোমার শালা কোথাও ট্রান্সফারও হয়না। হলে এলাকাটা একটু বাঁচত।"
দড়াম্ করে একটা আওয়াজ হল। সাইক্লোনের গতিটা আরও বেড়েছে। জানলার আংটায় বেঁধে রাখা দড়িটা ছিঁড়ে গিয়ে জানলাটা হাট করে খুলে গেল। একরাশ ঝোড়ো হাওয়া হুড়মুড়িয়ে ঢুকে সামনের টেবিলের ওপর কাগজপত্তর, ফাইল ছত্রাকার করে দিল। সেইসঙ্গে জলের বোতলটাও গেল উলটে। জলের বোতলের ছিপিটা ঠিকমতো লাগানো ছিল না। বোতলের মুখ দিয়ে জল গড়িয়ে ফাইলে ঢুকছে। সরকারি নথি নষ্ট হয়ে গেলে বড়বাবু অনর্থ করবেন। দীপেন তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মাথাটা অল্প ঘুরে গেল। নিজেকে সামলাতে চেয়ারে বসতেই লকআপ থেকে খসখস করে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। মাথাটা অসম্ভব ভার লাগছে। এমনসময় একটা চোখ ঝলসে দেওয়া আলোর ঝলকানি দেখল আর ভীষণ জোরে বাজ পড়ার মত একটা আওয়াজ হল। থানার দরজা জানলাগুলো সব এক ধাক্কায় একসঙ্গে খুলে গেল। সাইক্লোন

অদ্ভুত সব বর্শাছটা নিয়ে অবাধে থানার মধ্যে তাণ্ডব চালাতে ঢুকে পড়ল। গোটা থানার মধ্যে একশো সাদা পায়রার মত পতপত করে উড়ে বেড়াচ্ছে রাশি রাশি কাগজ। তারমধ্যেই লকআপের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল দীপেন। যে চোরটা নেতিয়ে মরার মতো পড়েছিল সে উঠে দাঁড়িয়েছে। লোকটার মুখে একটা তির্যক হাসি। অভিনেতা, অভিনেতা। চোরটা যে পাক্কা অভিনেতা দীপেন জানে। আর-একবার প্রমাণ পেল। লকআপটা খোলা। নাঃ! আরেকবার কিছুতেই লোকটাকে পালাতে দেবে না।
চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই জোরালো হাওয়া দীপেনকেও প্রায় উড়িয়ে নিয়ে এল লকআপের সামনে। এই লোকটাকে আর বাঁচতে দেওয়া চলে না। দীপেন টুঁটি চিপে ধরল লোকটার। তবুও লোকটার কোনও বিকার নেই। ঠোঁটের কোণায় হাসিটা লেগেই আছে। দীপেনের হাতের দশটা আঙুল আরও শক্ত হতে থাকল। একটা সময়ে আঙুলগুলো যখন আলগা করল, লোকটা ধপ্ করে পড়ে গেল কিন্তু মুখের ওই তির্যক হাসিটা মেলালো না।
দীপেন ধীরেসুস্থে চেয়ারে এসে বসে চার্জে বসানো মোবাইলটা দেখল। বাঃ! এরমধ্যেই মোবাইলটা ৮৩% চার্জ হয়ে গিয়েছে। শান্ত হয়ে দীপেন বড়বাবুকে ফোন করল।
"কি হল কী? একটা রাত্রি থানাটা সামলাতে পারছ না?" ঘুম জড়ানো গলায় বড়বাবু বললেন।
"মরে গিয়েছে।"
"কী বলছ? কে মরে গিয়েছে?"
"যাকে আপনি বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু বাঁচানোর কোনও চেষ্টা করেননি।"
"মানে?"
"লোকটার গলায় দশ আঙুলের দাগ। হাতে হাতকড়ার দাগ। গোটা শরীরে আঘাতের চিহ্ন... হ্যালো, হ্যালো শুনছেন?"
"শুনছি, কিন্তু কিছুই মাথাতে..."
"শুনছেন যদি হাঁ-হুঁ করছেন না কেন? যাকগে, তাড়াতাড়ি লালাকে নিয়ে থানায় আসুন। রিপোর্ট লিখে লাশ চালান করতে হবে।"
ফোনটা ছেড়ে লোকটার দিকে আরেকবার তাকাল দীপেন। থানার মধ্যে সাইক্লোনের তাণ্ডব বইছে। লোকটার মুখে সেই তির্যক হাসিটা একইরকম আছে। কোনও মরার মুখে এরকম হাসি দেখেনি দীপেন। মাথার মধ্যে পোষা রাগটা তীব্র হয়ে দপদপ করতে শুরু করল। ওই তির্যক হাসিটা কেড়ে নিতে লকআপের মধ্যে ঢুকে আবার পাগলের মত এলোপাথাড়ি লাথি চালাতে লাগল দীপেন। লোকটা মরে একেবারে জগদ্দল পাথরের মতো হয়ে গিয়েছে। এতগুলো লাথি খেয়েও শরীরটা একচুল নড়ল না, হাসিটাও মেলালো না।
হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে ফিরে এসে বসল দীপেন। হঠাৎ মেয়ের কথা মনে পড়ল। কোনওদিন এরকম হয় না, আজ মনটা খুব খারাপ হতে শুরু করল। মোবাইলটা তুলে মলয়কে ফোন করল। ঘুম জড়ানো গলায় মলয় বলল, "বলুন দাদা।"
"পপিকে দাও।"
"ও তো দাদা বাড়ি চলে গিয়েছে। বউদি নিজে নিতে এসেছিলেন।"
দীপেন চিৎকার করে উঠল, "বাড়ি চলে গিয়েছে! এই ঝড়ের মধ্যে নীলিমা ওকে নিতে এসেছিল? খোঁজ নিয়েছ বাড়িতে ঠিকঠাক পৌঁছেছে কিনা?"
"না, মানে আমি ভেবেছিলাম বউদি..."
"চোওপ! এক্ষুণি থানায় এসো তুমি। গুরুতর অভিযোগ আছে। তুমি না এলে আমি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট নিয়ে যাব।"
মলয়কে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইনটা কেটে দিল দীপেন। পপি বাড়ি ফিরেছে শুনে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে মনটা হালকা হল। শরীরের অবসন্ন ভাবটা কমছে। বরং অল্প ফুরফুরেই লাগছে। দীপেন আবার লোকটার দিকে তাকাল। যে লোকটার ওপর এত রাগ ছিল সেটা যেন কমছে। লোকটার মুখে সেই তির্যক হাসিটা আর নেই। বরং মুখে যেন একটা করুণার স্মিত হাসি।
দীপেন আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। এরপর বাকিটা বড়বাবু এসে যা করার করবেন। আরও একটা ফোন করার দরকার। এই তো লোকটাকে মেরে ফেলে ঠান্ডা মাথায় দিব্যি একটার পর একট ফোন করতে পারছে। মোবাইলটা তুলে দেখল ব্যাটারির চার্জটা আবার কমতে শুরু করেছে। নাঃ! মোবাইলটা কালকেই বদলাতে হবে।
সাইক্লোনটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। দীপেন ফোনটা করল জয়িতা চক্রবর্তীকে।
"হ্যালো।"
"কী হল আপনি এলেন না?"
"মানে, এই মাঝরাত্রে আপনি রসিকতা করছেন নাকি?"
"মোটেই না। আপনিই তো বলেছিলেন 'দাঁড়ান ঝড়টা একটু কমলেই আমি থানায় আসছি।' ঝড়টা কমেছে ম্যাডাম। থানায় আসুন। আসলে কী জানেন জনরোষ নিয়ে আপনারা তেমন প্রতিবাদ করেন না। অথচ কাছাকাছি থেকে আপনি সবই দেখেছে তাই তো ম্যাডাম? হ্যালো, হ্যালো, শুনছেন ম্যাডাম?"
"হ্যাঁ..."
"লাইনে থাকলে একটু হাঁ-হুঁ করুন ম্যাডাম। নাহলে আপনার মতে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন কিনা কীভাবে বুঝব। আপনার মোবাইলে ভাইরাল হওয়ার অপেক্ষায় থাকা ছবিগুলো আদালতে খুব জরুরি নথি হবে। আসুন না ম্যাডাম সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি।"
মোবাইলের মধ্যে ১৫%-এ চার্জ নেমে যাওয়ার কিঁক করে আওয়াজটা হল। দীপেন ফোনটা কেটে দিল। মনটা খুব শান্ত লাগছে। থানাটা গোছাতে হবে। ঘরময় লন্ডভন্ড হয়ে থাকা কাগজগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। কিন্তু তার আগে মেয়ের গলাটা শুনতে আবার খুব ইচ্ছে করল।
মেয়ের মোবাইলটা বাজছে, বাজছে। নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে নিশ্চয়ই একবার ধরে 'হ্যালো' বলবে। দীপেন অপেক্ষা করতে থাকল। একটা সময়ে সাইক্লোন শীতলপুর ছেড়ে চলে গিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গেল।
ভোর হব হব করছে। ক্লান্ত বড়বাবুকে নিয়ে লালা ফিরে এল থানায়।
"বেআক্কেলে মেজবাবুর কাণ্ড দেখেছ? সারা রাত একটা ফোন পর্যন্ত করল না। সুইচ অফ করে রেখে দিয়েছে।" জিপ থেকে গজগজ করে নামতে নামতে বড়বাবু বললেন। লালা উত্তর দিল না মেজবাবুর ফোনে চার্জ ছিল না বড়বাবুকে একবারও বলেনি। থানায় পা দিয়েই বড়বাবু আঁতকে উঠলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল লকআপটা খোলা। ভিতরে লোকটা পড়ে রয়েছে। আর মেজবাবু নিজের চেয়ারে মাথা কাত করে ঘুমচ্ছে। লকআপের মধ্যে লোকটা কাছে দ্রুত এগিয়ে গেলেন বড়বাবু। লোকটা অস্ফুট স্বরে বলে উঠল
"জল। জল। একটু জল।"
"স্যার!" লালা চিৎকার করে উঠল। বড়বাবু এসেছেন এটা মেজবাবুর গায়ে হালকা করে হাত দিয়ে বলতে যেতেই মেজবাবুর ঠান্ডা শরীরটা গড়িয়ে পড়ল। শীতলপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর দীপেন সামন্ত এক ভয়ানক হার্ট অ্যাটাকে রোজকার বুকের মধ্যে পাক খেতে থাকা অপমানগুলো থানাময় সরকারি নথিপত্তরের সঙ্গে ছড়িয়ে রেখে দিয়ে সাইক্লোনের হাত ধরে চিরদিনের জন্য শীতলপুর ছেড়ে চলে গিয়েছেন। শুধু যাওয়ার আগে যাকে যা বল ছিল, সেই না বলা কথাগুলো মৃত মোবাইলে বয়ে সবাইকে বলে দিয়ে গিয়েছেন।
অলঙ্করণ: কুনাল বর্মণ



ট্র্যাডিশনাল গয়নায় কনটেম্পোরারি টুইস্ট, নিজের কালেকশনকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেন জুয়েলরি ডিজ়াইনার রাজ মহতানি। পোশাক নয়, গয়নাই হয়ে উঠবে স্টাইল স্টেটমেন্ট... আধুনিক নারীর মনকে এভাবেই পড়তে পারেন রাজ। ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় নিজের সৃষ্টিকে তিনি করে তুলেছেন আন্তর্জাতিক। বিশ্বের সমস্ত বড় শহরে চলছে তাঁর কালেকশনের প্রদর্শনী, দেশ ও বিদেশে ক্রমশ বাড়ছে ক্রেতার সংখ্যা। পুজোয় তাঁর জুয়েলরি কালেকশনে সাজলেন অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র। সাক্ষী রইলেন মৌমিতা সরকার।

‘গ্লিটারিং’ *Heights*



Signature in Styl

ডিজাইনার রাজ
মহতানিকে রং দিয়ে
চেনেন তাঁর অনুরাগীরা
আধুনিক মেয়েরা
'কালারফুল' হতে চায়!
রুবি ও পান্নার কারুকা
তৈরি ফুলের আকার।
সঙ্গে টেবল-কাট হিরের
তৈরি স্ট্রিং। সাজকে সম্
করতে রুবির একটি
আংটিই যথেষ্ট।



Beautifully Bold

গয়না আসলে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বলে মনে করেন রাজ। যিনি বোল্ড, গয়নায় তাঁর লুকে সেই সাহসিকতার প্রকাশ থাকা উচিত। ওয়েস্টার্ন টপের সঙ্গে চাঁদবালি ইয়ারিং, সোনার উপর বসরাই মুক্তো ও পলকি হিরে দিয়ে সাজানো। হাতে লেয়ারিং করে পরানো তিনটি ব্রেসলেটে পারফেক্ট ইভনিং লুক।



Rhapsody in Emerald and Diamond

মুঘল স্টাইলকে মডার্নিটির স্পিন দিয়ে প্রেজেন্ট করা রাজের আর-এক সিগনেচার। 'নিজাম' নেকলেসটি টেব্‌ল-কাট হিরে ও কলাম্বিয়ান পান্নার অপূর্ব বিন্যাসে তৈরি, যেন এক ফেলে আসা যুগের গল্প। নেকলেসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হিরে ও পান্নার তৈরি ইয়ারিং এবং ব্রেসলেট।



Shine like a Diamond

স্টোনের সঙ্গে কোনও কম্প্রোমাইজ় করেন না রাজ। বেস্ট কোয়ালিটির স্টোন কীভাবে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন হয়ে উঠবে, ডিজ়াইনিংয়ের সময় সেকথা মাথায় রাখেন রাজ মহতানি প্ল্যাটিনামের উপর হিরের চোকার, ইয়ারিং এবং হাতে হিরের ব্রেসলেটে এলিগ্যান্ট লুক।



Meeting With Modernity

হিরে, রুবি, মুক্তোর সম্ভারে তৈরি নবরতন চোকার এবং টেবল-কাট পান্নার তৈরি লং নেকপিস। সঙ্গে হিরে ও মুক্তোর তৈরি ব্রেসলেট ও আংটি। ট্র্যাডিশনাল গয়নায় 'র অ্যান্ড রোল' ফিলিং আনাই রাজের গয়নার ইউএসপি।

গয়না: সতরামদাস
ধালমল জুয়েলার্স,
কুইনস ম্যানসন, পার্ক স্ট্রি
ফোন: (০৩৩)২২২৯৮১৩
মেক-আপ:
প্রসেনজিৎ বিশ্বাস
ফোন: ৯০০২২৫৯৪১২
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
ফোন: ৭২৭৮৫৪৫৯৪০
পোশাক: দেব আর নীল
ফোন: ৮৮২০৬৭৭০৭৭
(শেষ পাতার ছবির
পোশাক): ঋতু কুমার,
কোয়েস্ট মল
ফোন: ৪০৬৪১০০৪
লোকেশন ও ফুড পার্টনার
কেনিলওয়ার্থ হোটেল, লি
রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা,
ফোন: ২২৮২৩৯৩৯
ছবি: সোমনাথ রায়



পুজোয় এবার নতুন করে সাজুন কালার প্যালেটের এক্সপেরিমেন্টাল আইস্কেপে। লিখছেন তিতাস চট্টোপাধ্যায়।

Experimental Eyes

গ্লিটার উইথ স্টারস অ্যান্ড সিলভার শেডস। আইলিডের মিড পার্ট থেকে কর্নার পর্যন্ত একটা বোল্ড গ্লোয়িং লুক। ওয়েস্টার্ন অ্যাটায়ারের সঙ্গে দারুণ মানানসই।



থ্রি-ডাইমেনশন কালার প্যালেট। ভায়োলেট, পিঙ্ক আর লাইট ব্লু শেড দিয়ে ফেস্টিভ নাইট আই লুক। এর সঙ্গে পরতে পারেন এথনিক বা ওয়েস্টার্ন উজ্জ্বল একরঙা পোশাক।



আই মেক-আপে এবার পেন্টিংয়ের ছোঁয়া। সবুজ আর সাদা রং দিয়ে একটি অভিনব ফ্লোরাল মোটিফ। সঙ্গে পরুন একরঙা বা ফ্লোরাল মোটিফের ড্রেস।



নীল রঙে এখনও
মজে আছে ফ্যাশ
ওয়র্ল্ড। আপার
আই লিডে ডার্ক ব্ল
শেড শ্যাডো দিয়ে
ভাইব্র্যান্ট লুক। এ
আই মেক-আপের
সঙ্গে হালকা রঙে
ওয়েস্টার্ন পোশাক
পরলে আই
মেক-আপ আরও
প্রমিনেন্ট হবে।



এথনিক পোশাকের সঙ্গে গ্লিটার শেড আই মেক-আপ। আন্ডার আইটোনে মভ শেডসের লাইন, গ্লিটার শেডকে প্রমিনেন্ট করেছে। সঙ্গে উইংগ্‌ড ব্ল্যাক আই লাইনার।

মডেল: শ্রীময়ী, হিয়া
মেক-আপ: অভিজিৎ চন্দ
ফোন: ৯৮৩০৬৮৮৮৯০
পোশাক: (শেষ পাতার ছবি) বহুরূপী,
ফোন: ৯৮৩১৯৪৫৭৫৮, (দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাতার ছবির পোশাক) অ্যান্ড, ফোরাম কোর্টইয়ার্ড, ফোন: ৮৩৩৬৯০১৪৮৫
গয়না: স্টোর নং ৬ বাই স্রোতস্বিনী,
ফোন: ৮৩৩৭০৩৭৯৪৭, (দ্বিতীয় পাতার ছবির ইয়ারিং) ইমেজ এন স্টাইল, গড়িয়াহাট
ফোন: ৯০৫১০৯৮৭৪৪
লোকেশন: দ্য ললিত গ্রেট ইস্টার্ন কলকাতা
ফোন: (০৩৩)৪৪৪৪-৭৭৭৭
ছবি: নীলোৎপল দাস
শুটিং কো-অর্ডিনেশন: মৌমিতা সরকার



কিক

ফিট থাকতে মিক্সড মার্শাল আর্টস

শারীরিক-মানসিক ফিটনেস তো বটেই, আত্মরক্ষার উপায় হিসেবেও লোকে ঝুঁকছেন মিক্সড মার্শাল আর্টসের দিকে। কুস্তি, মুয়ে তাই, বক্সিং, কিকবক্সিং...আরও কত কী আছে এর আওতায়। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।

মন দিয়ে কোনও অ্যাকশন সিনেমা দেখতে দেখতে মাঝেমাঝে নিশ্চয়ই ভাবেন, 'ইস! প্রয়োজনে যদি আমিও পরদার নায়কের মতো দু'-চারটে ঘুষি মারতে পারতাম!' বা রাস্তায় কেউ কটূ মন্তব্য করলে সপাটে তাঁর শরীর লক্ষ করে চালিয়ে দিতে পারতাম রাউন্ড কিক! অসম্ভব কিন্তু নয়। সৌজন্যে মিক্সড মার্শাল আর্টস। তবে শুধু আত্মরক্ষা নয়, ফিট থাকতেও আজকাল এ দেশের মানুষরা শিখতে চাইছেন এই খেলা। যে খেলায় এতধরনের কিক, পাঞ্চ, গ্র্যাপলিংয়ের মতো টেকনিক আছে, সে খেলা যে আপনার শরীরের প্রত্যেকটা হাড়-মাংসপেশিকে ফিট রাখবে, তা বলাই বাহুল্য! তাই, সেলেব থেকে সাধারণ মানুষ সকলের কাছেই জনপ্রিয়তা বাড়ছে মিক্সড মার্শাল আর্টস বা এমএমএ-র।

মিক্সড মার্শাল আর্টস কী

এমএমএ হল একধরনের ফুল কন্ট্যাক্ট কমব্যাট স্পোর্টস। বিভিন্ন কমব্যাট স্পোর্টসের টেকনিকের সমাহারে সৃষ্ট এক অনবদ্য টেকনিক বলা যেতে পারে এমএমএ-কে। কী নেই বলুন তো! কুস্তির মারপ্যাঁচ যেমন আছে, তেমনই কিকবক্সিংয়ের কিক আর পাঞ্চ। এতেই শেষ নয়! জুডো, জুজুৎসু, ক্যারাটে, মুয়ে তাই...সব রয়েছে এই একটি ছাতার তলা সর্বাঙ্গীন ফিটনেসের জন্য এর চেয়ে ভাল উপায় আর কী ই বা হতে পারে! মূলত দু'ভাগে মার্শাল আর্টসকে ভাগ করা যেতে পারে: স্ট্যান্ড-আপ পজিশন (কুংফু, ক্যারাটে ইত্যাদি) ও গ্রাউন্ড বেসড (জুডো কুস্তি ইত্যাদি)। এসব খেলার কোনওটায় কিক, কোনওটায় পাঞ্চ, কোনওটায় আবা দু'টোই ব্যবহৃত হয়। টেকনিকের দিক থেকেও আলাদা হতে পারে। এসবকিছু মিলিয়েই মিক্সড মার্শাল আর্টস। স্ট্রাইকিং,



প্রিয়ঙ্কা জিং তোশি

এমএমএ ফাইটার

আমি প্রথমে কিকবক্সিং করতাম। মিক্সড মার্শাল আর্টসের ব্যাপারে কোনও ধারণাই ছিল না। কিন্তু এরপরে আমি ফুল কনট্যাক্ট চ্যাম্পিয়নশিপে (এমএমএ-র স্পোর্টস লিগ) অংশ নেওয়ার অফার পাই। তারপর থেকেই এই খেলার প্রতি ভালবাসা জন্মায়। তবে খেলা হিসেবে এমএমএ এখনও অসম্ভব জনপ্রিয়তা পায়নি। কিন্তু আমি যেটা ভালবেসেছি, বরাবর তাই করে এসেছি। ট্রেনিং করতে করতে খেলাটার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়তে লাগল। ছোট থেকে কিকবক্সিং করতাম বলেই, এমএমএ-তে বাড়তি সুবিধে পেয়েছি। এমএমএ রিয়্যালিটি টিভি-তে আত্মপ্রকাশ করার পরে মিডিয়াতে পরিচিতি বাড়ে। 'ওয়ান: চ্যাম্পিয়নশিপ'-এ থ্যারট স্যামকে হারানোর অভিজ্ঞতাও দারুণ ছিল। যাঁরা কোর স্ট্রেংথেনিং চান, তাঁরা অবশ্যই এমএমএ শিখতে পারেন।

রেসলিং, গ্র্যাপলিং ও জুডো—মূলত এগুলো শিখে রাখা জরুরি। জুডো-র থ্রো, রেসলিংয়ের টেক ডাউন, ব্রাজিলিয়ান জুজুৎসু-র সাবমিশন টেকনিক, মুয়ে তাইয়ের নি অ্যান্ড এলবো টেকনিক, কিকবক্সিংয়ের স্ট্রাইকিং (পাঞ্চ ও কিক)...সবই আছে মিক্সড মার্শাল আর্টসে। এতধরনের টেকনিক শেখা যায় বলেই বোধহয় লোকে মার্শাল আর্টসের সঙ্গে সঙ্গে এমএমএ-র দিকেও ঝুঁকছে।

আত্মরক্ষায় এমএমএ

আত্মরক্ষার জন্যও এমএমএ জরুরি। যেমন ধরুন, হঠাৎ রাস্তায় আপনি আক্রান্ত হলে, ক্যারাটের টেকনিক দিয়ে কিন্তু অপরাধীকে 'হিট' করতে পারবেন না। এমএমএ যেহেতু 'টাচ'-বেসড গেম, তাই গ্লাভস পরে রোজ অভ্যেস করতে করতে হাতের গাঁট এতই শক্ত হয়ে যায় যে খুব সহজেই অপরাধীকে কাবু করে ফেলা সম্ভব। আবার ধরুন, কেউ আপনাকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিল! তখন আপনি মাটিতে শুয়ে (জুডোর গ্রাউন্ড টেকনিক) অপরাধীর বিরুদ্ধে লড়তে পারবেন। আবার কেউ দাঁড়িয়ে আক্রমণ করলেও আপনি পাঞ্চ ও কিক-এর সাহায্যে অপরাধীকে ঘায়েল করতে পারবেন।

এমএমএ যখন ফিট থাকার অস্ত্র

যাঁরা ফিটনেসের জন্য মিক্সড মার্শাল আর্টস শিখতে চান, তাঁরা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ড্রিলিং, স্ট্রাইকিং, রেসলিং, গ্র্যাপলিং—এই চারভাগে ভেঙে নিতে পারেন। অনেকেই ভাবেন, এত কঠিন কঠিন টেকনিক কীভাবে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে রপ্ত করা সম্ভব! কিন্তু, এমএমএ যে কেউ করতে পারেন! যাঁরা শুধুমাত্র ফিট থাকতে এমএমএ করতে চাইছেন, তাঁরা না হয় প্রথমেই বিগিনারস ক্লাসই করবেন! ৪০ বছর বয়সি ব্যাঙ্কের চাকুরিজীবীও এমএমএ শিখতে পারেন। তবে, পেশাদার এমএমএ আর্টিস্ট হতে গেলে নিশ্চয়ই আরও অ্যাডভান্সড প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে। শিখতে গেলে প্রথম প্রথম শারীরিক ধকল হবে বটে! কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে খেলাটার প্রতি অগাধ ভালবাসা জন্মাবে।

সাধারণত পাঁচ বছরের কমে কেউ ভর্তি হলে, তাঁকে শুধু কিকবক্সিং করানো হয়। সাধারণত এমএমএ-র একটা দেড় ঘণ্টার ক্লাসে অন্তত ৮০০-১২০০ ক্যালরি বার্ন করা সম্ভব! তাই, ওজন কমাতেও আজকাল অনেকেই এমএমএ ক্লাস করছেন। প্র্যাকটিস শুরু করার আগে ওয়র্ম আপ করতে হয়। লাঞ্জেস, স্কোয়াট, ফ্রন্ট কিক, সাইড কিক, রানিং, স্কিপিং ইত্যাদি চলে ওয়র্ম আপের অঙ্গ হিসেবে। প্রায় আধঘণ্টা মতো গা ঘামানোর পর শুরু হয় মার্শাল আর্টসের টেকনিক শেখার পালা।

স্ট্রাইকিং: হাত, কনুই, হাঁটুর সাহায্যে প্রতিপক্ষকে 'স্ট্রাইক' করতে পারেন।

জ্যাব: সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পা দু'টো ফাঁক করে পজিশন নিন। প্রতিদ্বন্দ্বীর থুতনি লক্ষ করে দ্রুত ঘুঁষি মারুন। হাত সোজা থাকবে।

ক্রস: শরীরের উপরিভাগ ঘুরিয়ে হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের মুখ লক্ষ করে ঘুষি মারুন।

নি স্ট্রাইক: হাঁটু দিয়ে প্রতিপক্ষের শরীর লক্ষ করে মারুন। একইভাবে কনুই দিয়ে একই কাজ করতে পারেন (এলবো স্ট্রাইক)।

ক্লিঞ্চিং: বিপক্ষের স্ট্রাইকের বদলা নিতে এই টেকনিক ব্যবহার করা হয়। থ্রো, গ্রাউন্ড



পায়েল সরকার

অভিনেত্রী

মিক্সড মার্শাল আর্টস মোটেও শুধু শারীরিক ফিটনেসের জন্য নয়। বরং, এতে আপনার রিফ্লেক্স আরও উন্নত হয়। নমনীয়তা বাড়ে। শুধু সেলেব্রিটিদের ফিটনেস রুটিনে বলে নয়, প্রত্যেকটা মেয়েরই আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে এমএমএ শেখা জরুরি। যেহেতু তথাকথিত মার্শাল আর্টসের মতো অতটাও কঠিন নয়, তাই একটু মনোযোগ দিলেই এমএমএ শিখে নিতে পারবেন। মিক্সড মার্শাল আর্টস আপনাকে আরও সতর্ক করে তোলে। তবে একদিন শিখে ছেড়ে দিলে হবে না! এমএমএ-কে নিজের জীবনযাত্রার সঙ্গে একাত্ম করে নিলে দেখবেন জীবনটা অনেক পালটে গিয়েছে। আমি মোটামুটি চার-পাঁচ বছর আগে এমএমএ ট্রেনিং শুরু করি। তবে, শুটিংয়ের চাপে হয়তো আমি নিয়মিত করে উঠতে পারি না। তবে কেউ যদি নিয়মিত এমএমএ করতে পারে, তাহলে শারীরিক ও মানসিক, দু'ধরনের ফিটনেসেই তা কাজে দেবে।



গ্রাউন্ড টেকনিক


থ্রো টেকনিক

সাধারণত এমএমএ-র দেড় ঘণ্টার ক্লাসে ৮০০-১২০০ ক্যালরি বার্ন করা সম্ভব! তাই, ওজন কমাতেও আজকাল অনেকেই এমএমএ ক্লাস করছেন। সঙ্গে শরীরের প্রতিটি অঙ্গের ওয়র্কআউটও হয়ে যায়।

টেকনিক বা টেকডাউনও করতে পারেন। মুয়ে তাই প্লাম, রেসলারস টাই-আপ এর জনপ্রিয় টেকনিক।

টেকডাউন: বিপক্ষের শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট করে তাকে ভূপতিত করার টেকনিক হল টেকডাউন। হাত ও পায়ের প্যাঁচে প্রতিপক্ষকে মাটিতে ফেলে তার উপর সাবমিশন টেকনিক ব্যবহার করা হয়।

গ্র্যাপলিং: একবার প্রতিপক্ষ মাটিতে কুপোকাত হলে, তার মাথা লক্ষ করে মারতে হবে। বিপক্ষ সেসময়ে যে কোনও উপায়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, গার্ড টেকনিকের মাধ্যমে। কনুই বা মুঠোর সাহায্যে এই টেকনিক করতে পারেন।


চোক

সাবমিশন হোল্ড: ট্রায়াঙ্গল চোক বা রিয়ার নেকড চোক-এর মাধ্যমে বিপক্ষকে অজ্ঞান করে দেওয়া যায়।

তথ্য সৌজন্যে: শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীলক্ষ্মী গুপ্ত (আলফা ওমেগা কমব্যাট স্পোর্টস)

ফোন: ৯৮০৪৩৮৭৫৫১, ৯১৬৩৭৮৬২৫২

ছবি: শুভেন্দু চাকী

ঋতু ফোগত

কুস্তিগির



সাত-আট বছর বয়স থেকে কুস্তি করছি। তাই, কুস্তি সবসময়ই আমার প্রথম প্রেম। যেহেতু আমি কুস্তির পরিবার থেকে এসেছি, তাই ছোট থেকেই বাবা (মহাবীর সিংহ ফোগত) ও বোনদের (গীতা-ববিতা, ভিনেশ ফোগত) সান্নিধ্যে কুস্তি শিখেছি। কয়েকবছর আগে এমএমএ দেখতে শুরু করি। ভাবতে শুরু করলাম, যদি একজন কুস্তিগির বক্সারের সঙ্গে লড়ে বা একজন বক্সার ক্যারাটে খেলোয়াড়ের সঙ্গে রিংয়ে নামে, তাহলে কে জিতবে! বক্সিং, মুয়ে তাই, ব্রাজিলিয়ান জুজুৎসুর মতো কুস্তিও একধরনের মার্শাল আর্ট। আর মিক্সড মার্শাল আর্টস এসবকিছুরই মিশ্রণ। ২০১৮ সালে আমার কাছে সুযোগ এল এমএমএ-তে শিফট করার। একটু ভেবে, ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললাম! কুস্তির মতোই এমএমএ-তেও আমি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। আর প্রথম মহিলা হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বেল্টও জিততে চাই। ট্রেনিং রুটিনের ক্ষেত্রে বলব, এক একটা সেশনে এক একরকমের খেলার ট্রেনিং করি আমি। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে বিশ্বের অন্যতম সেরা এমএমএ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্র্যাকটিস করছি আমি। ভারতে এধরনের প্রতিষ্ঠান এখনও নেই। তবে সারা বিশ্বেই দ্রুত এই খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ফলে, আশা করাই যায়, ভারতেও লোকে এ বিষয়ে আগ্রহী হবেন। কমব্যাট স্পোর্টসে যাঁরা আসতে চান, তাঁদের জন্য খুব ভাল কেরিয়ার অপশনও এটা। ২০২৪ অলিম্পিকসে এমএমএ-কে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে কোনও সুখবর শুনতে পাব আমরা। আমার ইচ্ছে আছে, ভবিষ্যতে ভারতে এমএমএ-র প্রসারে ভূমিকা নেওয়ার। আমার বোনেরা এমএমএ নিয়ে দারুণ উৎসাহী! কুস্তি থেকে পেশাদার এমএমএ-তে আসায় ওঁরা খুশিই হয়েছেন। আপাতত আমার একমাত্র স্বপ্ন এমএমএ-তে ভারতকে পদক এনে দেওয়ার।



দুর্গাপুজোর পেটপুজোতে ভাত উপস্থিত থাকবে না, তা কি হয়! বাংলাদেশের কয়েকটি রাইস-রেসিপির সন্ধান দিলেন সেখানকার প্রখ্যাত হোম শেফ তথা ফুড কনসালট্যান্ট নয়না আফরোজ়। রেসিপি সংকলনে দোলনা রায় এবং সংবেত্তা চক্রবর্তী।



ইলিশ খিচুড়ি

বাংলাদেশি
ভাতে বাজিমাত-

ফিরে এসেছে পুজোর মরশুম। এই ক'টা দিন খাদ্যরসিক বাঙালির সারা বছরের স্বাস্থ্যসচেতন ভুলে চর্ব্য-চোষ্যতে মেতে ওঠার পালা। আর ভাত ছাড়া বাঙালি ভোজ ভাবাই যায় না! পোলাও, বিরিয়া বা খিচুড়ি, ভাত নিয়ে নানাবিধ বাহারি খানার কমতি নেই বাংলাদেশেও। মোরগ পোলাওয়ের সরু চালের মাঝে মাংসে টুকরোর উঁকিঝুঁকি মারার দৃশ্যের আবেদন ভুবনভোলানো। আবার পেঁয়াজ ভাজা বা বেরেস্তা দিয়ে সতে করে, সুগন্ধি লেবুপাতা সহযোগে পরিবেশন করা বরিশালের কাজি'র ভা আপাতদৃষ্টিতে সাদাসিধা হলেও, স্বাদে অতুলনীয়। কুষ্টিয়া জেলার জনপ্রিয় মাসকলাই ডালের খিচুড়ি বা সিলেটের ভুন মুগ ডালের খিচুড়িতে ভাতের সঙ্গে ডালের নিবিড় ভাবভাল ভোলার নয়। ঘি-মশলার স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখানো মাংসের টুক এবং ভাতের সহযোগে তৈরি তেহারি যখন পাতে এসে হাজি হয়, তখন নিজেকে সামলে রাখাই দায়! ওপার বাংলার এমন কয়েকটি জানা-অজানা ভাতের পদের সন্ধান রইল।

ইলিশ খিচুড়ি

উপকরণ: ইলিশ ৬ টুকরো, চাল ১ কাপ, ডাল ১/৪ কাপ, সরষের তেল ৩ টেবল-চামচ, ইলিশের স্টক আড়াই কাপ, কাঁচালঙ্কা ৭-৮টা, আদাবাটা ১/৪ চা-চামচ, রসুনবাটা ১/২ চা-চামচ।

প্রণালী: ইলিশমাছে নুন, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো মাখিয়ে সরষের তেলে ভেজে নিতে হবে। ওই তেলেই পেঁয়াজকুচি ভেজে, চাল-ডাল ভেজে নিন। ভাল করে কষিয়ে নিয়ে ইলিশের স্ট দিয়ে দিন। ১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। ঢাকনা খুলে চাল সরিয়ে, খানিকটা চাল বিছিয়ে দিন। উপরে দিন মাছগুলো। কাঁচালঙ্কাও দিয়ে দিন। বাকি চালটা দিয়ে ঢেকে, মিনিটদশেক দমে বসালেই ইলিশ খিচুড়ি তৈরি! উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন ১ চা-চামচ সরষের তেল আর বেরেস্তা। পাঁচ মিনিট রেখে পরিবেশন করুন।

মোরগ পোলাও

উপকরণ: পোলাওয়ের চাল ১ কেজি, মুরগি ২টো, ৪ টুকরে করে কাটা (৮০০-৯০০ গ্রাম ওজনের), ভাজা পেঁয়াজ ১ ক আদাবাটা ১/৪ কাপ, রসুনবাটা ১/৪ কাপের চেয়ে ২ চামচ টক দই ১/৪ কাপ, বাদামবাটা ১/৪ কাপ (চিনেবাদাম ২ ভা পেস্তা ২ ভাগ আর কাঠবাদাম ২ ভাগ, একসঙ্গে বেটে নিতে হবে), শুকনোলঙ্কার গুঁড়ো দেড় চা-চামচ, পোস্তদানা বাটা চা-চামচ, জায়ফল-জয়ত্রি গুঁড়ো ২ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১



মোরগ পোলাও

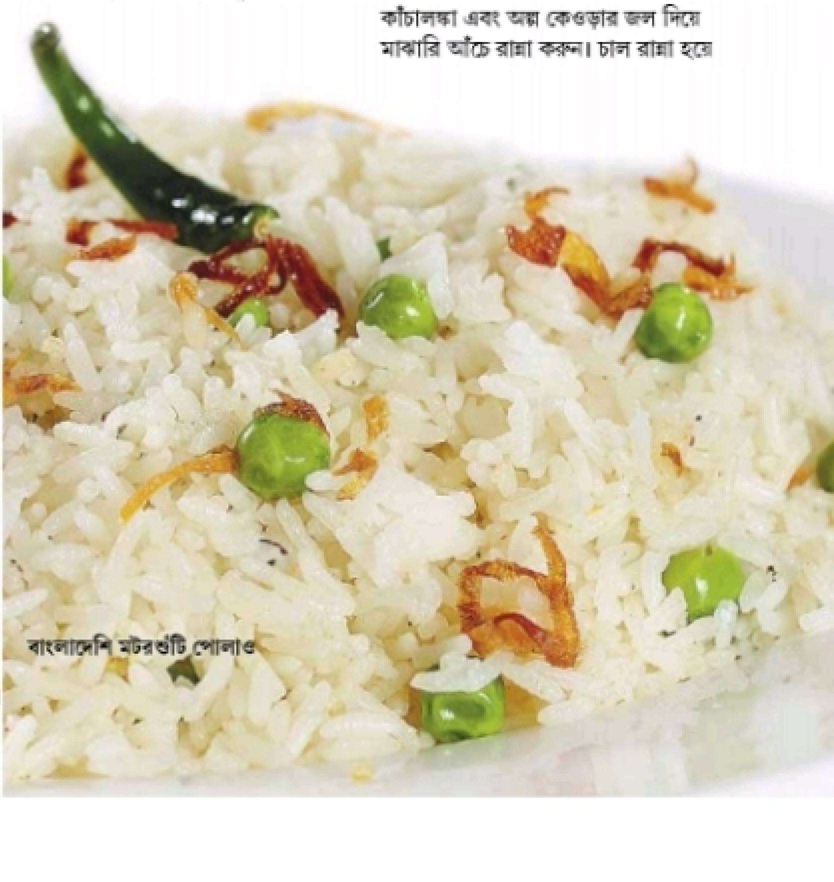
চা-চামচ, ছোট এলাচ ২টো, দারচিনি ৩ টুকরো, লবঙ্গ ৫-৬টা, তেজপাতা ৪টে, গরমমশলার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, আলুবখরা ১০-১২টা, টমেটো সস বা কেচাপ ৪ টেবল-চামচ, গোলাপজল ১ টেবল-চামচ, মেওয়া ২ টেবল-চামচ, কাঁচালঙ্কা স্বাদমতো, নুন স্বাদমতো, ঘি ও সাদা তেল পরিমাণমতো, সামান্য গুঁড়ো দুধ।

প্রণালী: চাল ভিজিয়ে, ছেঁকে নিন। বাটামশলাগুলো টক দইয়ে মিশিয়ে রাখুন। তেল-ঘি মিশিয়ে পেঁয়াজ ভেজে ১ কাপ বেরেস্তা বানিয়ে নিন। সেই বেরেস্তা-ভাজা তেলের মধ্যেই টক দই-বাটামশলার মিশ্রণ, কাঁচালঙ্কা, গরমমশলা, জিরেগুঁড়ো, আলুবখরা, জায়ফল-জয়ত্রিগুঁড়ো, পোস্তবাটা দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। তেল উঠে আসতে শুরু করলে টমেটো সস বা কেচাপটা মিশিয়ে দিন। এই মিশ্রণটা অন্তত ১০ মিনিট কষিয়ে নিন। এবার মুরগির টুকরোগুলো ছাড়ুন। অল্প আঁচে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। কিছুটা বেরেস্তায় গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে এর উপর ছড়িয়ে দিন। মুরগিটা রান্না হয়ে গেলে তুলে নিন। চালটা ভাল করে ভাজুন এবার। ভাজা হয়ে গেলে চালের দেড়গুণ গরম জল এবং আরও কয়েকটা আলুবখরা ছেড়ে দিন। ভাল করে রান্না করতে হবে, যতক্ষণ না জল শুকিয়ে চাল দেখা যায়। এবার অর্ধেকটা চাল তুলে নিন। মুরগির টুকরোগুলো এতে মিশিয়ে দিন। বাকি চালটা ঢেকে দিন এর উপর। ঘি, কিছুটা মেওয়া, বেরেস্তা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঢাকা দিন। দমে বসান ১০-১৫ মিনিটের জন্য। নামিয়ে নিয়ে পরিবেশন করুন।

বাংলাদেশি মটরশুঁটি পোলাও

উপকরণ: পোলাওয়ের চাল ১ কেজি, পেঁয়াজকুচি ১/২ কাপ, আদাবাটা ১ টেবল-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, তেল ১/২ কাপ, ঘি ৪ টেবল-চামচ, দুধ ১ কাপ, তেজপাতা ৪টে, ছোট এলাচ ৮টা, দারচিনি ৪টে, গরম জল ৭ কাপ, কিশমিশ ২ টেবল-চামচ, আলুবখরা ৬টা, কাঁচালঙ্কা ১২টা, মটরশুঁটি ১ মুঠো, কেওড়ার জল ১ চা-চামচ, নুন।

প্রণালী: প্যানে তেল গরম করে এলাচ, দারচিনি আর তেজপাতা দিন। সুগন্ধ বেরোলে পেঁয়াজকুচি দিন। পেঁয়াজ হালকা ভাজা হলে আদা-রসুনবাটা দিন। চাল আর নুন দিয়ে ভাল করে ভাজুন। যখন চালটা চকচক করবে, দেখে নিন আঙুলের চাপে ভেঙে যাচ্ছে কি না। ভেঙে যাচ্ছে দেখলে ৭ কাপ গরম জলে ১ কাপ দুধ মিশিয়ে প্যানে ঢেলে দিন। কাঁচালঙ্কা, মটরশুঁটি আর আলুবখরা দিন। ১০ মিনিট ঢেকে রান্না করে অল্প আঁচে দমে বসান। হয়ে এলে নেড়ে নিন। উপর থেকে ঘি আর কেওড়ার জল দিন। ভাজা পেঁয়াজ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।



বাংলাদেশি মটরশুঁটি পোলাও

ঢাকাই মটন তেহারি

উপকরণ: পাঁঠার মাংস ১ কেজি, সরষের দানা ১ চা-চামচ, এলাচ ১০টা, জায়ফল ১টা, জয়িত্রী ৩টে, দারচিনি (দুই ইঞ্চি) ৩টি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদাবাটা ৩ টেবল-চামচ, রসুনবাটা ২ টেবল-চামচ, কাঁচালঙ্কা ১০-১২টা, টকদই পরিমাণমতো, চাল ৩০০ গ্রাম, ভাজবার জন্য সরষের তেল ৩০০ গ্রাম।

প্রণালী: মাংসে দই মাখিয়ে ঘণ্টাদুয়েক ম্যারিনেট করতে দিন। সব মশলা কাঁচা অবস্থায় গুঁড়ো করে নিন। তৈরি তেহারি মশলা। প্যান গরম করে সরষের তেল দিন। পেঁয়াজকুচি লাল করে ভেজে নিয়ে আদা-রসুনবাটা দিন। সুবাস বেরলে দুই থেকে তিন টেবলচামচ তেহারি মশলার গুঁড়ো এবং গোটা কাঁচালঙ্কা চিরে দিন। এরপর আধ কাপ গরম জল ও নুন দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিন। ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করুন। মাংস নরম হয়ে তেল ছাড়লে, তেলটা অন্য একটি পাত্রে ঢালুন। এই পাত্র গরম করে তাতে চাল ছেড়ে ভাল করে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে গরম জল, অল্প গুঁড়ো দুধ, কাঁচালঙ্কা এবং অল্প কেওড়ার জল দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। চাল রান্না হয়ে



ঢাকাই মাটন তেহারি



মাসকলাই ডালের খিচুড়ি

এলে, রান্না করা মাংস এর মধ্যে ভাল করে মিশিয়ে নিন। কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে নিন। অল্প ঘি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মাসকলাই ডালের খিচুড়ি

উপকরণ: ফাইন রাইস ৫০০ গ্রাম, মাসকলাই ডাল ৫০০ গ্রাম, তেল ৪ টেবিল-চামচ, ঘি ৩ টেবিল-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, কাঁচালঙ্কা ১০-১২টা, দারচিনি ৫-৬টা, এলাচ ৭-৮টা, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ২ চা-চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, জল ৮ কাপ।

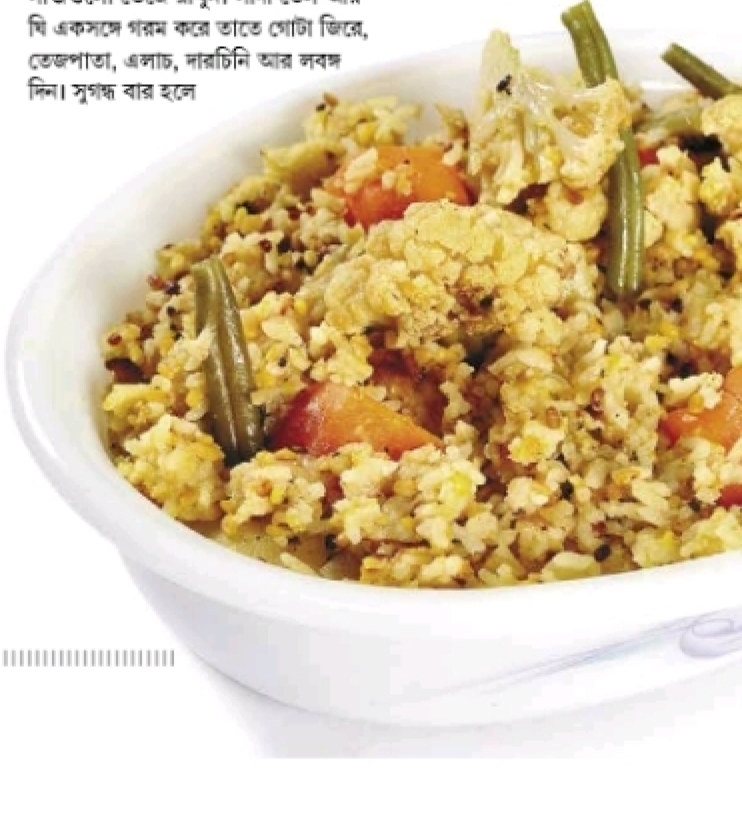
প্রণালী: চাল এবং ডাল ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিন। চাল এবং ডালের দ্বিগুণ পরিমাণ জল গরম করে সরিয়ে রাখুন। তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। আদাবাটা, নুন, এলাচ, দারচিনি, কাঁচালঙ্কা ও হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। সুবাস বেরলে চাল এবং ডাল দিয়ে ভেজে নিন। ঝরঝরে হয়ে গেলে মিশ্রণে গরম জল দিয়ে ঢেকে দিন। রান্না হয়ে এলে সামান্য ঘি, ভাজা জিরে এবং কাঁচালঙ্কা দিয়ে অল্প আঁচে পাঁচ থেকে সাত মিনিট নেড়ে নিন।

সবজি খিচুড়ি

উপকরণ: সরু দানার আতপচাল ১ কাপ, মুগডাল ১/২ কাপ, গাজর ১৬ টুকরো, ফুলকপি ৮ টুকরো, বরবটি ১৬ টুকরো, তেজপাতা ২টো, ছোট এলাচ ৮টা, জিরে ১/২ চা-চামচ, লবঙ্গ ৪টে, পেঁয়াজকুচি ১/২ কাপ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, সাদা তেল আর ঘি ৪ টেবিল-চামচ, আদাবাটা ২ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ।

প্রণালী: চাল ভিজিয়ে, জল ঝরিয়ে নিন। শুকনো খোলায় মুগডাল ভেজে রাখুন। সব্জিগুলো ভেজে রাখুন। সাদা তেল আর ঘি একসঙ্গে গরম করে তাতে গোটা জিরে, তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি আর লবঙ্গ দিন। সুগন্ধ বার হলে পেঁয়াজকুচিটাও দিন। একটু লাল হলে এ
চাল আর ডাল দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। এব
মেশান আদাবাটা, রসুনবাটা, হলুদগুঁড়ো,
লঙ্কাগুঁড়ো আর নুন। যখন চাল, ডাল আর
সব মশলা মিশে গিয়ে সুগন্ধ বার হবে, ত
বুঝবেন যে চাল-ডাল ভাজা হয়ে গিয়েছে
এবার চাল-ডালের পরিমাণের দ্বিগুণ ফুট
জল দিয়ে, আগে থেকে ভেজে রাখা সব্জিগু
মিশিয়ে দিন। ঢাকা দিয়ে মাঝারি আঁচে রা
করুন। চাল ও জলের পরিমাণ সমান হয়ে
এলে ৪-৫টা কাঁচালঙ্কা দিন। মিনিটদশেক
রেখে ঢাকা খুলে একবার নেড়ে নিন। আব
৪-৫ মিনিট দমে রাখলেই হয়ে যাবে।

লোকেশন: দি অ্যাস্টর হোটেল
ফোন: (০৩৩) ২২৮২৯৯৫৭
ছবি: শুভেন্দু চাকী





ঔরস

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনারা সকলে নিশ্চয়ই আমার মতোই, কিংবা আমার চাইতেও বেশি, গান ভালবাসেন। আচ্ছা একটা প্রশ্ন যদি করি, এমন কোন গান আছে যেটা শুনলেই আপনার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে? আপনারা কোন গানের কথা বলবেন জানি না, আমি যে-গানটার কথা বলব, সেটা হল, 'হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দিব না।' যে-ট্রেনে উঠি, যে-স্টেশনে নামি, বীরভূমের দিকে গেলে তো কথাই নেই, ওই এক গান সারাক্ষণ... কে যে কাকে, কেন, মাঝখানে রাখছে, হৃদয় যে কার কোথায়, তাই বোঝা যাচ্ছে না। শুনলে, মাইরি বলছি, মরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মরা তো আর সত্যি-সত্যি যায় না, তাই যাবতীয় জঞ্জাল মাথার এককোণে সরিয়ে, ঘরে ফিরে আসি।

আমি মশাই খুব রোম্যান্টিক মানুষ নই। প্রেমের জোয়ারে ভেসে গিয়ে অজানা উপকূলে মুখ তুলব, সেরকম সুযোগ জীবন আমাকে দেয়নি। তার জন্য আমার কোনও অভিযোগও নেই। কিন্তু হৃদয় বলুন, মন বলুন, আর পাঁচজনের মতো আমারও ছিল, আমারও আছে। সেই জায়গা থেকে কখনও কাউকে ভাল লাগেনি তা তো হতে পারে না। লেগেছে ভাল; আগেও যেমন, পরেও তেমন।

তবে সিরিয়াস প্রেমের কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে শুভাঞ্জনার কথা বলতে হবে। জীবনের প্রথম সরকারি চাকরি পাওয়ার পরপরই ওর সঙ্গে আলাপ আমার। মরিয়া হয়ে চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, তাই হয়তো ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। কেন্দ্রীয় সরকারি আন্ডারটেকিংয়ে প্রোবেশনারি অফিসার হিসেবে জয়েন করার চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ আমার বিশ্বাস হয়নি অন্ধকারে এতটা আলো জ্বলাও সম্ভব! কিন্তু অন্ধকারে অভ্যস্ত হতে যতটা সময় লাগে, আলোতে ততটা লাগে না বলেই, ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে



গিয়েছিল তাড়াতাড়ি।

আমাদের অফিসেই নিজের কোম্পানির নানা প্রডাক্ট সাপ্লাই করতেন শুভাঞ্জনার জামাইবাবু অগ্রীশ রায়। নিজ ব্যবসার স্বার্থেই অফিসারদের সঙ্গে খাতির বজায় রাখতেন ভদ্রলোক। আমি যদিও পারচেজে ছিলাম না, তবু অগ্রীশবাবুর নজর আমার উপরেও পড়েছিল। বলতে গেলে, একরকম যেচেই আলাপ করেছিলেন। অফিসের সোশ্যালে যে মেয়েটি গান গাইছে সে যে ওঁর শালি, সেটাও অগ্রীশদার মুখ থেকেই শুনলাম।

"ভেবো না আমি এখানে কারবার করি বলে আমার রেফারেন্সে নাম পাস করিয়ে নিয়েছি। একবার গলাটা শুনলেই বুঝতে পারবে, কী জিনিস।" অগ্রীশদা আমার থেকে একটা সিগারেট নিয়ে টান দিতে দিতে বলেছিলেন।

'জিনিস' কেমন তা অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি। বুঝতে যাইওনি। দেখছিলাম, চশমা পরা, একটু লম্বার দিকে একটা মেয়ে গান গাইছে। কিন্তু 'কী' গাইছে রে বাবা! শব্দগুলো বুকে এসে বিঁধছে না, উলটে কসাইয়ের ছুরির মতো হৃৎপিণ্ডটাকে ফালাফালা করছে। গানের সমঝদার না হলেও, গান যে খুব ভালবাসি সে তো জানেনই আর তাই হয়তো টালমাটাল হয়ে গেলাম একদম। আমার মন থেকে আমার অতীত, আমার স্ট্রাগল, সব কীরকম মুছে যাচ্ছিল। লঞ্চ যেরকম জল কেটে কেটে যায়, সুরটা সেরকম বাতাসটাকে কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল। শীতের আমেজ ছিল। কিন্তু আমার শুধু শরীর নয়, মনটাও কাঁপছিল। ব্যাপারটা এখানেই থেমে যেতে পারত। কারণ ভাল-মন্দ যাই লাগুক, মেয়েদের সঙ্গে নিজে থেকে গিয়ে আলাপ করার ধক আমার ছিল না। শুভাঞ্জনার সঙ্গেও কথা বলতে যাইনি, কেবল ক্যান্টিনের রঘুদার হিসেবের খাতার একটা পাতার অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিয়ে, অটোগ্রাফ নেব বলে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। অটোগ্রাফ দেবার সময় শুভাঞ্জনা একটু অবাক চোখে

তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমি সেই তাকানোর কোনও অর্থ খুঁজে পাইনি। পরে জেনেছিলাম, অফিস সোশ্যালে গান শুনে কেউ ওর অটোগ্রাফ চাইছে, এটা খুব আপ্লুত করেছিল ওকে। ওর জামাইবাবুর মুখে কথাটা শুনে আমি অবশ্য বলতে পারিনি যে, ঘরে ফিরে আমি ওই অটোগ্রাফের কাগজটায় বেশ কয়েকটা চুমু খেয়েছি। কী করব? গলাটা মাথায় ধাক্কা মারছিল যে।

তখনও মোবাইল ব্যাপারটা বাজারে আসেনি ঠিকঠাক। দু-একজনের কাছে আছে, কিন্তু সে ওই দু-একজনই। কেউ কেউ 'পেজার' বলে একটা জিনিস ব্যবহার করছে যেটা কোমরে থাকে আর সময়ে-অসময়ে বেজে উঠে মেসেজ দেয়। কিন্তু শুভাঞ্জনার জামাইবাবু যখন আমার থেকে একশো টাকা নিয়ে আমায় শিশির মঞ্চে শালির রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার একটা কার্ড দিয়ে বললেন পাঞ্জাবি-পাজামা পরে যেতে, আমার মাথার ভিতরে যেন পেজারই বেজে উঠল। জলতরঙ্গের মতো।

"এমনি, প্যান্ট-শার্ট পরে যাওয়া যাবে না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"যাবে না কেন? যাবে। কিন্তু কালচারাল প্রোগ্রাম তো। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এলেই ভাল," অভ্রীশদা বললেন।

যেভাবে বড় হয়েছি, যেসব ঘটনার ভেতর দিয়ে গেছি তাতে 'কালচার' শব্দটা অনেক দূরের একটা গ্রহ, যাকে রাত্রিবেলা ছাদে উঠে আকাশের দিকে তাকালে মাঝে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু তার বাইরে কালচার ঠিক কী?

গান শেষ হয়ে যাওয়ার পর শিশির মঞ্চের বাইরে বেরিয়ে লেবু চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমি সেই কথাটাই ভাবছিলাম, আর শুভাঞ্জনার গান শুনতে আসব বলে কেনা পাজামা-পাঞ্জাবিতে হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কালচারের জন্য আমি ঠিক কতদূর যেতে পারি?

"আরে এখানে দাঁড়িয়ে কেন, গ্রিনরুমে গিয়ে গায়িকার সঙ্গে দেখা করে এসো," আমার পাশ দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় অভ্রীশদা বললেন।

"আপনি নিয়ে চলুন।"

"আরে, আমি এখন দুটো ট্যাক্সির সন্ধানে বেরিয়েছি রে ভাই। তুমি যাও, দেখা করে এসো।"

পাসপোর্টে ভিসার ছাপ পড়ে গেছে ভেবে আমি গেলাম গ্রিনরুমে আর আমাকে দেখেই মিষ্টি করে হেসে শুভাঞ্জনা বলল, "খুব ভাল লাগল আপনি এসেছেন দেখে।"

"আপনার গান, আর আমি আসব না?" বোকার মতোই বলে ফেললাম।

শুভাঞ্জনা একবারও আমায় ফাঁপরে ফেলে জিজ্ঞেস করল না যে, ওর গান হলে আমায় কেন যেতেই হবে। উলটে হাসল, "ফোন করবেন।" ফোন করব? কোথায় ফোন করব? জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, ফোনটা করব কোথায়? মেট্রোয় উঠে, মেট্রো থেকে নেমে অটোয় উঠতে উঠতে সারাক্ষণ শুধু ভাবতে লাগলাম একটাই কথা, ফোন করতে হবে। তখন পৃথিবী এত স্পিডে চলত না। না ছিল ফেসবুক, না হোয়াটসঅ্যাপ। আর ফোন বলতেও সেই ল্যান্ডলাইনে করতে হবে। মনে পড়ছিল, হায়ার সেকেন্ডারির আগে চিত্রাকে ফোন করতে গিয়ে কী কেস খেয়েছিল পুলকেশ। চিত্রার বাবা স্কুলে এসে চেঁচাচ্ছিলেন, "তুমি যখন ফোন করেছিলে, তখন রাত্রি ক'টা বাজে?"

আমার ক্ষেত্রে অবশ্য কেউ চেঁচায়নি। বরং অভ্রীশদা হপ্তাদুয়েক পরে অফিসে দেখা করে যে-ফোন নম্বর দিয়ে গিয়েছিলেন, দিন দুয়েক শক্তি সঞ্চয়ের পর সেটায় ফোন করতে শুভাঞ্জনা নিজেই ধরল ফোনটা।

ঘড়িতে তখন রাত্রি আটটা বেজে পঁচিশ। শুভাঞ্জনা আমার প্রায় মিউট হয়ে যাওয়া গলার পিছনের লোকটাকে আবিষ্কার করতে তিরিশ সেকেন্ড মতো নিল তাই। তারপর বলল, "ওহ আপনি। বলুন কী খবর?"

"আপনার জামাইবাবুর থেকে নম্বরটা পেলাম। ব্যস্ত ছিলেন?"

"কই, না তো। গান নিয়ে ভাবছিলাম।"

"গান তো গায়। গান নিয়ে ভাবতেও হয়?"

"ভাবতে হয় বৈকি। কোন গানটা কীভাবে গাইলে ভাল লাগবে শ্রোতার, ভাবতে হবে না?"

কায়দাকানুন করে কথা বলতে শিখিনি বলে, এখানে একটা লোপ্পা বল দিয়ে ফেললাম, "আমার কথা কিছু ভাবলেন?"

"আপনার কথা? কী ভাবব বলুন তো?"

আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। সাহস করে এত বড় একটা কথা বলে ফেলেছি, এর পর আবার কোন কথা বলতে যাব রে বাবা? "ঠিক আছে, আমি আবার পরে ফোন করব," বলে চুপ করে গেলাম।

আর ফোন করার সাহস হয়নি। কিন্তু দিনসাতেক পরে আমার অফিসে একটা ফোন এল। তখন ওই জিনিসগুলো ছিল, অফিসে ফোন আসা, ডেকে দেওয়া ইত্যাদি। শুভাঞ্জনার বুদ্ধি প্রখর, ফোনটা করিয়েছিল একটা ছেলেকে দিয়ে। নইলে বুড়ো ক্যাশিয়ার আবার নাক গলাত কে ফোন করেছে তাই নিয়ে। আমি ফোনটা গিয়ে ধরতেই ওপাশের ছেলেটা বলল, "এই নিন, আপনার সঙ্গে কথা বলবে।"

"কী ব্যাপার? আপনি তো আর ফোনই করলেন না। কী সব ভাবনার কথা বলছিলেন?" শুভাঞ্জনা লাইনে এল।

আমি রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "না, মানে, হ্যাঁ। বলেছিলাম। আসলে জানতে চাইছিলাম, সামনে কোথাও কি আবার আপনার প্রোগ্রাম-ট্রোগ্রাম আছে?"

"কেন, প্রোগ্রাম না থাকলে দেখা হতে পারে না?"

"নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু আপনার তো গান নিয়ে ব্যস্ততা..."

"শুধু গান নিয়েই তো জীবন কাটে না। গানের বাইরেও অনেক কিছু আছে। আপনি সময় করতে পারলে বলুন।"

আমি সময় করব? শুভাঞ্জনার জন্য? আমার তো পুরো চব্বিশ ঘণ্টা, সাত দিন, বারো মাস, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ফাঁকা। যেদিন, যখন, যেখানে বলবে।

দু'দিন পর পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় মিট করলাম আমরা। আমি একটু বেশিই অর্ডার দিলাম শুভাঞ্জনাকে ইমপ্রেস করার জন্য। এবং আমার উলটোদিকে বসে, শুভাঞ্জনা নরম করে নিজের জীবনের কথা বলতে লাগল। গানের কথা অল্পই বলছিল, বদলাতে থাকা সমাজ আর পৃথিবীর কথাই বেশি। ফাঁকেফোকরে আমার অফিসের কথাও ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। দেখলাম যে, ভালই খবর রাখে। হয়তো জামাইবাবুর থেকেই।

আমি কথা বেশি বলছিলাম না, ওর কথাই শুনছিলাম। কারণ, কখন কী বলে ফেলব ভুলভাল। এরকম অভিজ্ঞতা তো জীবনে আগে হয়নি। পাশের টেবিলে কার একটা জন্মদিন সেলিব্রেট হচ্ছিল। কেকের ওপর মোমবাতি জ্বালিয়ে সবাই গান গাইছে, সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠল শুভাঞ্জনা।

"কী হল?" আমি চমকে গেলাম।

শুভাঞ্জনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ভাববেন না। আগুন দেখলে আমার ওরকম কান্না পায়।"

"কেন? আগুনে পুড়ে কারও..."

"না, না, সেসব কিছু নয়। আগুন দেখলে আমার অগ্নিপ্রভর কথা মনে পড়ে যায়।"

পরের একঘণ্টায় জানলাম অগ্নিপ্রভ ছিল শুভাঞ্জনার প্রথম প্রেমিক। প্রথম এবং একমাত্র প্রেম। এখনও পর্যন্ত। শুভাঞ্জনাকে এই গানের জগতে নিয়ে আসার পিছনে অগ্নিপ্রভরই সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল।

শুভাঞ্জনা বলল, "জানেন আর সব ছেলে মাথা ধরলে অমৃতাঞ্জন লাগাত, কিন্তু অগ্নিপ্রভ সেরকম নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে ওর মাথা ধরা সেরে যেত। সেখান থেকেই তো আমার গান গাওয়ার শুরু। কিন্তু আমাকে ছেড়ে অগ্নি চলে গেল।

"কোথায়? অন্য কারও কাছে?"

"না। মহাপৃথিবীতে।"

আমি তখন এমনই বলদ যে, কথাটার মানেও প্রথমে বুঝতে পারিনি। ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনও একটা জায়গা আছে যার নাম, 'মহাপৃথিবী'। বললাম, হয়তো সেখানে কোনও কাজে আছেন। আপনি চিঠি লিখুন। ফোন করুন। ফিরে আসবেন অবশ্যই।

"সেখানে কেউ বলেও যায় না, আর সেখান থেকে ফেরাও যায় না।"

"আই অ্যাম সরি। উনি মারা গেছেন?"

"প্লিজ, ওটা বলবেন না। আমি সহ্য করতে পারি না। আমার কাছে ও এখনও আছে, সবসময় থাকবে। চিরজাগরণে। তাই আমি বলি যে, অগ্নি মহাপৃথিবীর অংশ হয়ে গেছে।"

তারপরও আরও কী সব বলে গেল শুভাঞ্জনা, পুরোটা আমার মাথায় ঢুকল না। আমি শুধু ফেরার সময় ভাবতে লাগলাম আমি, চয়ন বসু, এই পৃথিবীর অংশ আর অগ্নিপ্রভ হচ্ছে মহাপৃথিবীর অংশ। পৃথিবী-মহাপৃথিবী, রবীন্দ্র সঙ্গীত-লারেলাপ্পা, গায়িকা শুভাঞ্জনা আর হতে পারে প্রেমিকা শুভাঞ্জনার মধ্যে একেবারে হাবুডুবু খেতে থাকলাম। হাবুডুবু খেতে খেতে ডুবেই গেলাম যেদিন শুভাঞ্জনা আমাকে ওর বাড়িতে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করল।

বাড়ি অবশ্য তেমন কিছু নয়, দীর্ঘদিন ভাড়া থাকার পর, পুরনো বাড়ির একটা অংশ কিনে নিয়ে খানিকটা কলি ফেরানো হয়েছে। সেই অংশটুকুই এখন শুভাঞ্জনাদের বাড়ি। আমি ওর জামাইবাবুর থেকেই শুনেছিলাম এসব। কিন্তু যা শুনিনি আর যার জন্য প্রস্তুতও ছিলাম না, তা হল, শুভাঞ্জনার নিজের ঘরে ঢোকার আমন্ত্রণ এবং ঢুকেই খাটের উপর খান তিনেক ছেলেদের শার্ট আর একটা জিনসের প্যান্টের সদর্প উপস্থিতি, দেখতে পাওয়া। আমি শার্ট-প্যান্ট সরিয়ে বিছানাতেই বসতে গেলাম।

"ওগুলোতে হাত দেবেন না প্লিজ। ওগুলো ওরকমভাবেই থাকে। আপনি চেয়ারে বসুন।"

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। তারপর বিছানা লাগোয়া চেয়ার খুঁজতে লাগলাম।

চেয়ারের উপর থেকে বইগুলো সরিয়ে আমার বসার জায়গা করে দিয়ে একটা লজ্জার হাসি হাসল শুভাঞ্জনা। তারপর একটু থেমে থেমে বলল, "এই শার্টগুলো আর ওই প্যান্টটা আসলে অগ্নিপ্রভ আমার পছন্দের কথা মাথায় রেখে কিনেছিল। ও চলে যাওয়ার পর এগুলো আমি নিজের কাছে এনে রেখেছি। এগুলো দেখলে মনে হয় ও আছে, আমার কাছেই আছে।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি যেন এক মহামানবীকে সামনে দেখতে পেলাম। সে তো সাধারণ মেয়ে নয়, যে এইরকমভাবে নিজের মৃত প্রেমের স্মৃতিকে জাগ্রত করে রেখেছে! চলে আসার আগে বললাম, "ওই শার্টগুলোয় একবার হাত দিতে পারি?"

"হ্যাঁ, দিন। স্পর্শ করুন অগ্নির ঔজ্জ্বল্যকে।"

হাত দিয়ে অবশ্য বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেবল খরখরে একটা ভাবই উঠে এল জামাগুলো থেকে। তবু শুভাঞ্জনাদের বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে মনে হতে থাকল, কীভাবে প্রেমিক মরে যাওয়ার পরও প্রেমিকা তার শার্ট-প্যান্টের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই প্রেমকে। না, এর তুলনীয় কিছু আমি জীবনে এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। আমার শুধু মনে হতে থাকল শুভাঞ্জনার নতুন প্রেমিক হতে গেলে পরে কথার পাশাপাশি গান, পৃথিবীর পাশাপাশি মহাপৃথিবীকে বুঝতেই হবে।

হয়তো বুঝেও ফেলতাম, একদিন। কিন্তু তার আগেই ধূমকেতুর মতো কুমা এসে আছড়ে পড়ল আমার কক্ষপথে।

২

কুমাকে প্রথম দিন দেখে অত্যন্ত আনকালচার্ড বলে মনে হয়েছিল। তখন আমি শুভাঞ্জনার সৌজন্যে একটা সংস্কৃতির মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি, তার ভিতরে কুমার আবির্ভাব ঘটল এক মূর্তিমতী রুচিহীনা হিসেবে।

আমাদের সজলদা, বিয়ে করবে না করবে না করে, তেতাল্লিশ বছরে এসে বিয়ে করল একটা ছাব্বিশ বছরের মেয়েকে। মেয়ের বাড়ি থেকে দিত না কিন্তু মেয়েটা সামান্য ট্যারা, আবার একটা পা একটু টেনে হাঁটে। অতএব তেতাল্লিশ বছরের সজলদাই সই। তখনও কলকাতার শহরতলিগুলোয় কেটারিংয়ের এমন রমরমা হয়নি। সজলদার বউভাতেও পাড়ার ছেলেরাই কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশন করছিল। আর আমি ছিলাম সুপারভাইজরির দায়িত্বে। শীতের রাত্রি, বেশ ধারালো বাতাস বয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ করে সামনের কলাবাগানের ভিতর দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে এল একটা মেয়ে আর পুরো রাস্তাটা বৃত্তাকারে ঘুরে তার পিছনে এসে থামল একটা অটো।

"অটোটাকে এখানে দাঁড় করানো যাবে তো?" মেয়েটা একটু সাইডে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে থাকা আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"কোথায় অটো দাঁড় করানো যাবে আমি তো জানি না।" একটা বড় টান মেরে বললাম। আর বলার সময় খেয়াল করলাম মেয়েটাকে দেখতে বেশ মিষ্টি।

"বিয়েবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছেন, আর এখানে অটো দাঁড় করানো যাবে কি না, জানেন না? জানেন কী তবে?"

"সে কৈফিয়ত আপনাকে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না।" বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি।

মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল মেয়েটার কথা শুনে। কথা বলাও যে শিখতে হয়, সেই বোধ এদের হয়নি।

সিগারেটটা শেষ করে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলাম। মাংসটা একটু শক্ত হয়েছে রিপোর্ট আসায়, আর একটু সেদ্ধ করার জন্য উনুনে দেওয়া হয়েছে, মেয়েটা হঠাৎ করে পরদা ঠেলে রান্নার জায়গায় ঢুকে পড়ল। আর মরবি তো মর, আমি তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

"শুনুন না, আমার খাওয়া হয়ে গেছে, এবার ফিরব। আমাকে আর একজনের খাবার প্যাকেট করে দিতে পারেন, তাড়াতাড়ি?"

"আমি তো প্যাকেট বিলি করার অধিকারী নই। যাদের অনুষ্ঠান, আপনি তাদের কারও থেকে অনুমতি নিয়ে আসুন।

"অনুমতির কী আছে? অটোওয়ালাটা শীতের মধ্যে নিয়ে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে; আবার এই ঠান্ডায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ওর জন্য এক প্যাকেট খাবার নিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে হয় না আপনার? তাহলে আপনি সেটুকুর ব্যবস্থা করে দিতে পারছেন না কেন? শুনুন, আটশো টাকার শাড়ি গিফট দিয়েছি, আর এই কেটারিংয়ের প্লেট আড়াইশো টাকার বেশি নয়।"

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কোনও মেয়ে যে এত নির্লজ্জ হতে পারে আমি ভাবতে পারিনি। কেটারিংয়ের প্লেটের দাম হিসেব করতে গিয়ে কত টাকার শাড়ি দিয়েছে, সেটাও গলা তুলে বলে দিল। আমার ইচ্ছে হল ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে ওখান থেকে বের করে দিই। কিন্তু সেটা করা যায় না বলে দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "আপনি কত টাকার শাড়ি দিয়েছেন আমার জানার দরকার নেই। দরকার হলে, যাকে দিয়েছেন তার থেকে ফেরতও নিয়ে যেতে পারেন আপনার গিফট, কিন্তু আমার পক্ষে নিয়ম ভেঙে আপনাকে এখন খাবার প্যাকেট করে দেওয়া সম্ভব নয়।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই সজলদার ভাই এসে খাবার প্যাক

করে দিতে বলল মেয়েটাকে। আমি ঘোর বিরক্তির সঙ্গে পাড়ারই জুনিয়র ছেলে অলোককে সেই দায়িত্ব দিয়ে সরে গেলাম সামনে থেকে। কিন্তু দশ মিনিট পর গেটের সামনে সেই ওর সঙ্গে আবার দেখা হয়েই গেল। একটা গা-জ্বালানি হাসি দিয়ে হাতের প্লাস্টিক দোলাতে দোলাতে আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। সজলদার অষ্টমঙ্গলায় যেতে হয়েছিল একরকম উপরোধের ঠেলায়। কিন্তু গিয়ে ওই মহাশয়াকে দেখতে হবে জানলে, যাওয়ার আগে পাঁচবার ভাবতাম।

একটা বটল গ্রিন শাড়িতে প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে আমার সামনে এসে মহিলা বলল, "ব্যাপার না বুঝে রেগে যাওয়া খুব খারাপ লক্ষণ।"

"ও তাই? তা কার বাণী এটা?" আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম।

"আমার বাণী, আমার। সুনয়না দত্ত, বাট ফেমাস অ্যাজ ঝুমা দত্ত। মনে রাখবেন নামটা। কেমন?"

থোড়াই মনে রাখতাম ওই নাম, চ্যাটাং-চ্যাটাং করে কথা বলা একটা অসভ্য মেয়ের নাম মনে রেখে হবেটা কী? কিন্তু মানুষ যা চায়, হয় তার উল্টো। শীতটা সেবছর গিয়েও ফিরে ফিরে আসছিল; ঠান্ডা ঠান্ডা করছিল বলে সন্ধে গড়াতেই আমি সঙ্গে থাকা সোয়েটারটা গায়ে গলাতে গেলাম। যেখানে গলাচ্ছিলাম, সেটা সজলদার শ্বশুরবাড়িরই আর একটা ঘর, তার মধ্যে গাদা লোক; সোয়েটারটার ভিতর মাথা ঢুকিয়ে হাতটা তুলেছি হঠাৎ একটা প্রচণ্ড চিৎকার আর আমার হাতের পাঞ্জায় একটা ধাক্কা।

আমি খানিকটা হতভম্ব হয়ে সোয়েটারটার ভিতর থেকে মাথা বের করে দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে ঝুমা হাঁপাচ্ছে।

ঝুমা নরম করেই বলল, "আঙুলটা কাটা যেত তো? সোয়েটারটা পড়ার সময় হাতটা উঁচুতে তুললেন যখন, খেয়াল করেননি ফ্যান চলছে? অন্ধ নাকি?"

আমি রাগে অন্ধ হয়েই বললাম, "শীতের সন্ধ্যায় ফ্যান চালিয়ে রেখেছিল কোন ইডিয়ট?"

"একটা ঘরের মধ্যে এতগুলো লোক, ফ্যান না চালালে সাফোকেশন হয়ে সব মরবে তো! আপনি দেখেননি কেন?"

"আমার তো দেখবার কথা নয়, তাই না?"

আমাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যেই এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুমি আর তর্ক কোরো না বাবা, বরং এই মেয়েটাকে একটা প্রণাম করো। ও যদি লাফ দিয়ে উঠে ফ্যানের সুইচটা বন্ধ না করত, তোমার আঙুলটা কাটা যেত আজকে।"

না, ঝুমাকে প্রণাম আমি করিনি কিন্তু চুপ করে গিয়েছিলাম কথাটা শুনে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছিলাম ঘরের বাইরে। তাকিয়েছিলাম নিজের তর্জনীটার দিকে। আর ঘোর বিস্ময়ে টের পেয়েছিলাম যে, তর্জনীটা আয়না হয়ে গেছে। সেখানে অন্য কারও নয়, ঝুমারই মুখ।

ওইদিন, ওখান থেকেই যে ঝুমার সঙ্গে আমার কিছু হয়েছিল তা নয়। কিন্তু ঘটনাটা ঘটার ঘণ্টাখানেক পরে আবার ঝুমার সঙ্গে দেখা হতে আমি মাথা নিচু করে ফেলেছিলাম, লজ্জায়।

ঝুমা অবশ্য আমার লজ্জা-ফজ্জার ধার ধারেনি। স্বতস্ফূর্তভাবে বলেছিল, "আরে এত কুণ্ঠিত হওয়ার কী আছে? যে-কোনও মানুষই অন্যের জন্য এটুকু করত।"

"না করতেও পারত।" আমি খুব নিচু গলায় বললাম।

"আমি মেয়েটা খারাপ নই, বুঝলেন তো? সেদিন অটোওয়ালাটা শীতের রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা খাচ্ছিল, তাই ওর জন্য খাবার চেয়েছিলাম। আর আপনি কীরকম হাঁই-মাই করে উঠলেন।"

উত্তরে আমি কিছু বলতে পারলাম না। 'সরি', 'ক্ষমা করবেন', ইত্যাদি কিছু নয়। কথা আসলে কালচার্ড লোকের সামনে বলা যায়, যে প্রাণ দিয়ে কিছু করেছে তার জন্য তো প্রাণ দিয়ে কিছু করে দেখাতে হয়। কথায় চিঁড়ে ভেজে না সেখানে।

ভেজে না বলেই, চুপ করে রইলাম। কিন্তু ঝুমা নিজেই একদিন আমার আস্তানায় চলে এল। মাকে প্রণাম করে আলাপ-টালাপ করে গেল। এর আগে কোনও মেয়ে কখনও আমার খোঁজে আসেনি বলে খানিকটা অবাকই হয়েছিল মা। তাতে অবশ্য আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হয়নি কিছু।

মা একবার বলতেই আমাদের সঙ্গে খেতে বসে গেল ঝুমা, সেই রবিবারের দুপুরে। আর যাওয়ার আগে বলল, চাকরির পরীক্ষার ব্যাপারে কিছু টিপস নিতে ও আমার কাছে আসবে মাঝেমাঝে। আমাকে, ওকে সাহায্য করতে হবে সরকারি চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে।

ঝুমার কথা শুনতে শুনতেই আমি টের পাচ্ছিলাম সজলদার বউয়ের থেকে শুনে, চাকরি পাওয়ার গাইডেন্স নিতে ও আসেনি। নিজের মুখে পাঁচবার করে বললেও, এই গল্পটা একেবারেই বানানো। সজলদার বউ হয়তো আদৌ জানেই না ওর এখানে আসার কথা। খুব যদি ভুল না হই তাহলে ঝুমা এসেছে অন্য কোনও স্বপ্ন নিয়ে, অন্য কোনও সম্পর্কের আশায়। যেটা স্থায়ী হলেও, চাকরি নয় ঠিক।

ইতিমধ্যে গানের দলের সঙ্গে দিল্লি-হরিদ্বারে প্রোগ্রাম করে, নৈনিতাল ঘুরে শুভাঞ্জনা ফিরে এসেছে। পার্ক স্ট্রিটের পশ কোনও হোটেল ছাড়া শুভাঞ্জনা ঠিক স্বস্তি বোধ করত না বলে, আবারও ওখানেই একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে। আর যাওয়ার সময় ভাবছিলাম, 'ঝুমা' নামের একটা সাধারণ মেয়ের আমার প্রতি যে-অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে বলে বুঝছি, সেই কথা শুভাঞ্জনার কাছে বলব নাকি?

কিন্তু শুভাঞ্জনা সেদিন এমন অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল যে, আমার মাথা থেকে 'ঝুমা-ফুমা' সব হাওয়া হয়ে গেল। অ্যাসপারাগাস স্যুপে চামচ ডুবিয়ে জানতে চাইল, "চয়ন, আপনার জীবনে আমি গেলে আমাকে আশ্রয় দিতে পারবেন তা জানি। কিন্তু যদি না যাই, তাহলেও আশ্রয় দিতে পারবেন?"

আমি একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। যদি খাই তাহলে খিদে মিটবে সেটা বুঝি, না খেলে খিদে কী করে মিটতে পারে?

"আসলে আপনাকে আমার জীবনে প্রয়োজন। আপনি থাকুন। কিন্তু আমি অগ্নিপ্রভর জায়গায় অন্য কাউকে বসাতে পারব না। আচ্ছা, এমন হতে পারে না, অগ্নিপ্রভ আমার জীবনে সেই মোমবাতিটা যা জ্বলছে তো জ্বলছেই; আর আপনি তার চারপাশে একটা পতঙ্গের মতো ঘুরছেন?"

"হ্যাঁ, হতেই পারে কিন্তু পতঙ্গ কি শুধু ঘোরে? সে তো আগুনে ঝাঁপও দেয়।"

"ঝাঁপ কী আপনি দেননি?" শুভাঞ্জনা আমার দিকে তাকাল।

ঝাঁপ তো দিয়েছি। ওই কণ্ঠস্বরের সামনে, ওই সা নি ধা পা মা'র চরাচরে, ওই কাজল টানা চোখ, ওই লম্বা বেণি, ওই মৃত প্রেমিকের শার্ট— সবকিছু মিলিয়ে আমাকে শুধু ঝাঁপ দেওয়ায়নি, ডুবসাঁতার দেওয়াচ্ছে। আর দেওয়াচ্ছে বলেই বুঝতে পারছি, আমি পারব। জ্বলন্ত মোমবাতিকে ঘিরে ঘুরতে পারব।

শুভাঞ্জনা যেন থট-রিডারের মতো আমার মনটাকে পড়ে ফেলে বলে উঠল, "সবাই তো নিজের কেরিয়ার, নিজের স্বপ্নের পিছনেই দৌড়য়। আপনি, শিল্প আর শিল্পীকে উৎসর্গ করতে পারবেন না জীবনটা, আপনার?"

আমি আবারও কেস খেয়ে চুপ করে গেলাম। তারপর বললাম, "কিন্তু যে নেই তাকে এভাবে কতক্ষণ..."

"নেই বলবেন না। আছে। আকাশের তারা যেমন দিনের আলোর গভীরে থাকে, সেভাবেই আছে। এটা অবসেশন মনে হতে পারে কারও কারও। কিন্তু মানুষ তো না খেতে পেয়ে পাগল হয় না। অবসেশন থেকে হয়। সেই অবসেশন থেকে শিল্পীও হয় লোকে। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দুটো লোকের মনে হয়েছিল হাওয়ার থেকে

ভারী কিছুকে হাওয়ায় ওড়ানো যায়। তাই না আমরা এরোপ্লেন পেলাম। তেমন করেই আমারও মনে হয় যে, স্মৃতিকে জীবন্ত করে রাখার মধ্যে দিয়ে আমরা 'শরীর নেই' এমন একজন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব। আমার আর আপনার মধ্যে, আমার আর আপনার উদ্দেশ্যহীন পথ চলায় ধ্রুবতারা হয়ে আলো দিতে পারবে না, অগ্নিপ্রভ?"

শুভাঞ্জনার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলেও, আমি সেই আলো, সেই টর্চ, সেই হ্যারিকেন, সেই হ্যাজাক, সেই জোনাকি মাথার ভিতর নিয়ে আধপাগল হয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

দু'সপ্তাহ পরে ঝুমা যখন আবারও একটা রোববার সকালে আমার কাছে এল, আমি একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, ও 'জিকে' জানতে আসেনি। আঙুল বাঁচানোর অধিকারে আমার হাতটা সারা জীবনের মতো ধরতে এসেছে।

আমি ওকে চা আর সুজির হালুয়া শেষ করতে দিয়ে বললাম, "ঝুমা আমার কিছু বলার আছে।"

ঝুমা ওর বড় বড় দুটো চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে।

আমি ধীরে ধীরে যতটা পারলাম, শুভাঞ্জনার কথা, গানের কথা, অগ্নিপ্রভর কথা, স্মৃতির ভিতর শুভাঞ্জনার নিজের প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার কথা, সবটাই বললাম।

আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র ঝুমা হাসতে শুরু করল। হাসতেই থাকল।

আমি সেই ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনটার মতো তিতিবিরক্ত হয়ে বললাম, "এটা কি হাসার মতো কোনও বিষয়? হোয়াই আর ইউ লাফিং?"

ঝুমা হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে নেমে সিমেন্টের মেঝেয় বসে পড়ে বলল, "আপনি চুমু-টুমু খেয়েছেন মেয়েটাকে? আদর-টাদর করেছেন?"

"অসভ্যের মতো কথা বলছ কেন? তুমি সামনে থেকে শুভাঞ্জনাকে দেখলে বুঝতে পারতে, কতটা ডিগনিফায়েড একটা মানুষ হতে পারে।" রাগের চোটে 'তুমি' বলে ফেললাম ঝুমাকে।

ঝুমা আমার কথার উত্তরে অন্য কিছু না বলে, শুভাঞ্জনার বাড়ির নম্বর চাইল।

"তুমি কী চাও বলো তো? আমি তো তোমাকে বললামই আমি অন্য একজনের কথা ভাবি। তাকে পাব কি পাব না, জীবন শেষ হয়ে যাবে না থাকবে, এসব প্র্যাকটিকাল কথা আমার মাথায় ঢুকবে না এখন। প্রত্যেকটা লোক প্র্যাকটিকাল হলে পরে কেউ বাঘাযতীন হত না, ক্ষুদিরামও হত না। আমি প্র্যাকটিকাল নই। আমি শুভাঞ্জনার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি, এবার ওর ইচ্ছেমতোই আমার জীবন চলবে।"

"বেশ করেছ। ভাল করেছ তো। আমি কনগ্র্যাচুলেট করছি। এবার আমার সঙ্গে বাইরে বেরোবে চলো। আমায় একটা কোল্ড ড্রিংক খাওয়াবে। প্লিজ়।"

ঝুমা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এমন নাছোড়বান্দা হয়ে গেল যে, ওই রোববারের দুপুরে ওকে নিয়ে বেরোতেই হল আমায়। পাড়ার মধ্যে অচেনা মেয়ে পাশে নিয়ে ইয়ার্কি চলে না, আমি তাই বেরিয়েই একটা রিকশায় উঠে পড়লাম ঝুমাকে সঙ্গে নিয়ে। রিকশাটা যখন গলিঘুঁজি পেরিয়ে খানিকটা দূরে এসেছে তখন পথের মধ্যে একটা পাবলিক ফোন বুথ দেখতে পেয়ে ঝুমা একদম আকুলিবিকুলি করে উঠল।

"প্লিজ়, নাম্বারটা দাও। আমি কথা দিচ্ছি কোনও বিড়ম্বনায় ফেলব না তোমাকে। যদি ফেলি, জুতো মেরে তাড়িয়ে দিও আমাকে।"

আমি ঝুমার সঙ্গে আর পেরে না উঠে শুভাঞ্জনার ল্যান্ডলাইন নম্বরটা দিলাম। কিন্তু বুথের ভিতর ঢুকলামও ওর সঙ্গে।

"তুমিই ডায়াল করো।" ঝুমা বলল।

আমি নম্বরটা ডায়াল করতেই, হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে কানে চেপে ধরল ঝুমা আর দশ সেকেন্ড পর বলে উঠল, "শুভাঞ্জন[a] আছেন?"

ধক করে উঠল আমার বুকটা। ঝুমার মুখে ওই নামটা শুনে।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুমা অবলীলায় বলতে লাগল, "আপনাকে ফোন করেছি কারণ, আমার দেওর আপনার গান শুনে এবং আপনাকে দেখেও, পাগল হয়ে গেছে একেবারে। ও মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ার। নিউ ইয়র্কে থাকে। কলকাতায় এসেছে কয়েকদিনের জন্য। এবার ও যেহেতু আপনাকেই বিয়ে করতে চায়, তাই আপনার আপত্তি না থাকলে, আপনার বাবা-মা'র সঙ্গে একটু কথা বলতাম আমরা।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, ঝুমার দিনে ডাকাতি দেখে। কিন্তু ঝুমা নিজের বাতেলা চালিয়েই গেল।

"কোত্থেকে ফোন নম্বর পেয়েছি সেটা বড় কথা নয়। আপনারা শিল্পী মানুষ, আপনাদের নম্বর পেতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমি বলছিলাম, আমার দেওর কিন্তু একদম দেরি করতে চাইছে না। ও আবার আমেরিকায় ফিরে যাবে তো এর মধ্যেই। যদি আপনি রাজি না থাকেন, তাহলে আর একবারও বিরক্ত করব না আপনাকে। কেবলমাত্র আপনি রাজি থাকলেই..."

কথা বলতে বলতেই দুম করে ঝুমা ফোনটা আমার কানে চেপে ধরল।

আমি জানি না হিরোশিমায় যখন অ্যাটম বোমা পড়েছিল, তখন হিরোশিমার মাটির কীরকম লেগেছিল। আমার যেন খানিকটা তেমনই হল যখন ওপাশ থেকে শুভাঞ্জনার গলা শুনলাম।

শুভাঞ্জনা জিজ্ঞেস করছিল, "উনি কি আমেরিকাতেই থাকবেন নাকি আবার ফিরে আসবেন? যদি ইউএসএ-তেই পাকাপাকিভাবে সেটল করেন, তাহলে আমাদের আপত্তি নেই। আপনি ফোন করবে[n] বাবাকে, সন্ধ্যায়।"

যখন ঝুমাকে ফোনটা ফিরিয়ে দিচ্ছি তখন আমার ভিতরের বড় একটা অংশ ছাই হয়ে গেছে, পুরো।

ঝুমা ফোনটা নিয়ে, "আচ্ছা ঠিক আছে, আমি নিশ্চয়ই ফোন করব, নমস্কার," বলে ফোনটা রেখেই একটা চার অক্ষরের গালি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "হল? স্মৃতি, ভবিষ্যৎ, মোমবাতি, শা[n] আরও আরও কী যেন?"

আমি মাটিতে বসে পড়লাম ওই টেলিফোন বুথের ভিতরেই। মাথাটা বনবন করে ঘুরছিল। বাপ রে! এত নাটক? এতটা মিথ্যা?

আমাকে চমকে দিয়ে ঝুমা বলে উঠল, "আরে বাবা কালচার জিনিসটাই তো এই। মিথ্যে দিয়ে তৈরি সবটা। আমাদের পাশের বাড়িতে এক অভিনেতা থাকত। বউকে লেঙ্গি মেরে একটা কচি অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছিল, তাকে দেখে সেই ছোটবেলাতেই বুঝে গিয়েছিলাম। স্বাভাবিক জীবনে একটা মানুষ ঘুম থেকে ওঠে, দাঁত মাজে, পায়খানা যায়, স্নান করে, অফিসে ছোটে, রোজগার করে আনে, বিয়ে করে বউয়ের সাথে শোয়; ছেলেমেয়ে হলে তাদের খাওয়ায়-দাওয়ায়, মানুষ করে। এই কাজগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি-ফংস্কৃতি কোত্থেকে আসে বলো তো? বানিয়ে যা করতে হয়, সেটাই কালচার, তাই না? সেটার মধ্যে যারা একেবারে ডুবে যায়, তারা সেটাতেই সব দেয়। কিন্তু যে-গোয়ালা দুধের সরের আলাদা বিজনে[স] করে, তার দেওয়া দুধ তো টালটালে জল মেশানো হবেই। সরটা সে আলাদা দামে, আলাদা জায়গায় বেচে। এরাও তেমন, ইমোশনট[া] কালচারে দেয়; সংসারে কী করে দেবে?"

ঝুমা এত সহজভাবে কথাগুলো বলছিল, যেন পৃথিবীর চিরসত্য উচ্চারণ করছে। কিন্তু তাই বলে কেবল 'আমেরিকা'র উচ্চারণমাত্র সমস্ত তাজমহল ধূলিসাৎ হয়ে গেল?

"আচ্ছা, আমেরিকাতেও কি ওই তিনটে শার্ট নিয়ে যাবে শুভাঞ্জনা?" আমি প্রশ্নটা করে ফেললাম ঝুমাকে।

আমাকে চমকে দিয়ে ঝুমা বলল, "শুভাঙ্গনা কোন শার্ট নিয়ে যাবে জানি না। তবে তোমার আজ এত বড় উপকার করলাম, তারপর আমায় বিয়ে করো না করো একটা শাড়ি অন্তত কিনে দিতেই হবে।"
কথাটা শুনে হেসে ফেললাম। কিন্তু সেই হাসির ভিতর অনেক কান্না, অনেকটা উপলব্ধি মিশে ছিল। যেভাবে কালীপুজোর রাতে হাওয়ায় রকেটটা উড়ে যাওয়ার পর বোতল একসময় আবিষ্কার করে তার কোথাও ওড়ার ক্ষমতা নেই, রকেটটা ভিতরে ছিল বলেই সে ভাবছিল সে নিজেও বোধহয় আকাশে উড়ে যাওয়ার শক্তি রাখে, আমারও হয়েছিল সেই দশা। আসলে যে আমি একটা বোতল মাত্র, ছাদে কিংবা সিঁড়ির কোণেই যার পড়ে থাকার কথা, সেটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ঝুমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছিল মন।



মায়ের মুখের ওই এমএসসি, পিএইচডি-র ঘোরে তলিয়ে না গিয়ে চুপচাপ পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, পার্ট ওয়ান কমপ্লিট হওয়ার পর থেকেই।

ফোনবুথের বাইরে বেরোতে বেরোতে, অতীত-বর্তমান-চাকরি-পি এফ-গ্র্যাচুইটি সব ফিরে এল মাথার মধ্যে। একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেলাম ওইসব শিল্প-ফিল্প নয়, আমার চাই, শান্তির একটা জীবন।
"তুমি কি আমার উপর রাগ করলে?" রাস্তায় পা দিয়ে খানিকটা ভয়ে-ভয়েই ঝুমা জিজ্ঞেস করল।
আমি ঝুমার হাতটা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, "শাড়ি যখন কিনে দিতেই হবে, বেনারসিটাই দিই?"

৩

না, সেদিন ঝুমাকে বেনারসি কিনে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ঝুমার সঙ্গে জীবনটা জড়িয়ে গেল সেই সন্ধ্যা থেকেই। শুভাঙ্গনাকে করা ফোনটা একটা ব্যতিক্রম, এমনিতে ঝুমা সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে পারত না মোটেই। কিন্তু ওর কথাগুলো একদম মাটির পাঁচশো ফিট গভীর থেকে উঠে আসা বিশুদ্ধ পানীয় জলের মতো মনে হত। কথাগুলোর মধ্যে কোথাও কোনও লুকোচুরি নেই, কোনও ভড়ং নেই। সেদিনের সেই ফোনের পর শুভাঙ্গনার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখিনি। রাখার সাহস পাইনি। ওই বিশ্বাসহীনতার মধ্যে যাওয়ার শক্তি ছিল না আমার। মনে হচ্ছিল, আমি যেন সেই রাজা যার অভ্যর্থনার জন্য এমন মঞ্চ শুভাঙ্গনা বেঁধেছে, উঠে দাঁড়ানোমাত্র যা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে।
সরে ছিলাম। কিন্তু আমার সরে থাকায় শুভাঙ্গনার হয়তো অস্বস্তি হচ্ছিল কোথাও। নইলে জামাইবাবুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে যখন লাভ হল না কিছু তখন নিজেই একদিন অফিসে চলে আসবে কেন?
"না বলে-কয়ে অফিসে হঠাৎ?" আমি খানিকটা বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।
"আপনি না বলে-কয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন কেন?"
"চাপ যাচ্ছে। তাছাড়া, শিল্পের আমি ঠিক সমঝদার নই। আর শিল্পকে যে বোঝে না, সে শিল্পীকে কী বুঝবে? আপনার শিল্পের অনেক সমঝদার আমেরিকায়, ইংল্যান্ডে অপেক্ষা করে আছে। আমার মতো তুচ্ছ লোকের একটু দূরে থাকাই ভাল।"
"ফোনটা তার মানে, আপনিই করিয়েছিলেন?" আমার সঙ্গে পায়ে পায়ে অফিসের বাইরে বেরিয়ে শুভাঙ্গনা জিজ্ঞেস করল।
"কোন ফোনের কথা বলছেন?"
"একদম ন্যাকামি করবেন না। সোনাগাছির একটা বেশ্যাকে দিয়ে আমায় ফোন করানো হয়েছিল কেন?"
মাথাটা আগুন হয়ে গেলেও আমি পায়ের নখ নিজের জুতোয় ঘষতে ঘষতে ঠান্ডা রাখলাম মাথা। কোনও কথা না বলে তাকিয়ে রইলাম শুভাঙ্গনার দিকে।
"কী হল, উত্তর দিচ্ছেন না কেন? ওই মাগিটা কার রক্ষিতা?"
"শিল্পীর মুখের ভাষা শুনে কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে।"
"মুখের ভাষা এখনও কিছুই শোনাইনি। আর শুধু মুখের ভাষা নয়..."
"হাত চালানোর মতো গুভাও আছে? তাহলে তো আমাকেও নান্টু আর ভজুকে খবর দিতে হয়।" আমি শুভাঙ্গনাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম।
শুভাঙ্গনা কেমন চুপসে গেল কথাটা শুনে, "কেন করলেন আমার সঙ্গে ওরকম?"
"ঠিক কী করেছি আমি, একটু বলবেন?"
"আমি মানছি যে, হঠাৎ করে আমেরিকার কথা শুনে আমি একটু এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম, তবে সিরিয়াসলি কিছুই বলিনি। সেগুলোর ভিত্তিতে এভাবে আমায় ছেড়ে..."
"আপনি ভুল করছেন শুভাঙ্গনা, আমি অগ্নিপ্রভ নই। আমার আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না কারণ, আমি আপনার জীবনে যেতেই পারিনি। আর একটু তলিয়ে ভেবে বুঝতে পেরেছি, হাজার চেষ্টাতে তা কোনওদিন পারবও না। আমি সাধারণ, খুব সাধারণ, আপনার অনুগ্রহেরও যোগ্য নই। আপনি বুঝতে পারেননি প্রথমটা।"
কথা বলতে বলতে দুটো চা নিয়েছিলাম, রাস্তার দোকানে। শুভাঙ্গনা ওভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাবে ভাবা যায় না, তবুও।
সেই চায়ের ভাঁড় মাটিতে ফেলে দিয়ে দ্রুত পায়ে আমাকে ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে শুভাঙ্গনা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আপনিও বুঝতে পারেননি আমাকে। একজন শিল্পীর জীবনের সত্যি-মিথ্যা যে আর পাঁচজনের মতো হয় না, বুঝতে পারেননি একদম।"

ঝুমাকে বোঝা খুব সহজ ছিল। প্রতিটা মুহূর্তেই ও কুড়ি বছর এগিয়ে ভাবত বলে, একটু পয়সা খরচ হবে এমন কোনও হোটেলে ঢুকতে ভীষণ আপত্তি ছিল ওর। অটোওয়ালা, বাস কন্ডাকটর, ড্রাইভাররা খায়, এরকম কোনও জায়গায় খেতে খুব স্বস্তি বোধ করত ঝুমা। সেরকমই একটা জায়গায় বসে, শুভাঙ্গনার আমার অফিসে আসার

গল্পটা করলাম ওকে।
শুনতে শুনতে খাওয়া চালিয়ে গেল ঝুমা। তারপর একটা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল, "তুমি না অনেকটা রাহুর মতো।"
"কী বলতে চাইছ, তোমার জীবনে আমি রাহু?"
"আমার জীবনের কথা বলিনি। তোমার স্বভাবটা রাহুর মতো। রাহু কী করে, বলো তো? চাঁদকে গিলে খেতে চায়। কিন্তু রাহুর তো গলার নীচে আর কিছু নেই। তাই চাঁদ আবার বেরিয়ে যায়। তুমিও ওই শিল্প-শিল্পীকে গিলে খেতে চাও। কিন্তু হজম করতে পারো না। তাই বলছিলাম যে, কাঁচকলা দিয়ে রাঁধা মাগুর মাছ খেয়ে ভাল থাকো; শাহি কোর্মার দুরাশা ত্যাগ করো।"
"কিন্তু মাগুর মাছের দাম তো শাহি কোর্মার থেকে বেশি।" আমি কেমন একটু অন্যমনস্কভাবে বললাম।
ঝুমা হো হো করে হেসে উঠল, "এই তো বুদ্ধি খুলছে। এবার একটু প্র্যাকটিক্যাল হও তো।"
"ঠিকই বলেছ, প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। একটা ফ্ল্যাট কিনতে হবে দু'বছরের মধ্যে। তা নইলে তোমার দায়িত্ব নেব কীভাবে?
"দু'বছর? একটা পিতৃহীন মেয়েকে দু'বছর বসিয়ে রাখবে, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আমি আর ছ'মাসও টিকতে পারব না ওখানে। বৌদি যাচ্ছেতাই বলেছে আমাকে।"
"কেন?"
"বাবানকে মশা কামড়েছে।"
"তোমার দাদার ছেলেকে মশা কামড়েছে তার জন্য তোমাকে যাচ্ছেতাই শুনতে হবে কেন?"
"আমি ঘর থেকে বেরোবার আগে মশার কয়েল জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিলাম। এবার বাচ্চাটাকে নাকি কামড়ে দাগড়া দাগড়া করে দিয়েছে।"
"সেটা ভাল কিছু হয়নি, কিন্তু মশার কয়েল জ্বালালে বাচ্চাটার শ্বাসকষ্ট হতে পারত। সেদিক দিয়ে ভালই করেছ।"
"তুমি এই কথাটা আমার বউদির সামনে গিয়ে বলো দেখি একবার। তোমার মুখে নুড়ো ক্যাঁটার বাড়ি মারবে। কী জিনিস চেনো না তো। জীবন দুর্বিষহ করে দিতে ওস্তাদ একদম।"
"খেতে টেতে দেয় তো?"
"তা দেয় এখনও। কিন্তু আরও দু'বছর দেবে না, আমি শিওর। তুমি যত শিগগির সম্ভব আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলো।"
"তোমার বাবার পেনশন পাও না তোমরা?"
"বাবার পেনশনের টাকা মা নেয়, মায়েরই প্রাপ্য ওটা। আর বাবা কী এমন প্রেসিডেন্টের চাকরি করত যে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পেনশন পাবে? ছ'হাজার সামথিং পায়। মায়ের ওষুধের খরচই তো আড়াই হাজার মাসে। আমি টিউশন করে নিজেরটুকু চালিয়ে নিই, কিন্তু অনন্তকাল কি এভাবে চলা সম্ভব? তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমাকে একদিন দেখেও ফেলেছে দাদার এক বন্ধু।"
আমি জানি, এগুলো পুরনো টেকনিক। মেয়েরা বিয়েতে রাজি করানোর জন্য এই গল্পগুলো বলে। কিন্তু ঝুমার মুখ থেকে শোনার সময় মিথ্যে ভাবতে ইচ্ছে করল না। আরও দু'বছর সময় পেলে নিশ্চয়ই ভাল হয় আমার, কিন্তু ঝুমার সুবিধার জন্য যদি একটু আগেই করতে হয় বিয়েটা, তাতেই বা কী এমন ক্ষতি?
আমরা একটা পার্কে ঢুকে বসেছিলাম।
ঝুমা পার্কের বাচ্চাগুলোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওই বাচ্চাদের নিয়ে মায়েরা বিকেল হতে না হতেই পার্কে কেন চলে আসে বলো তো? বাড়িতে ওদের রাখতে পারে না। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের ভেতরেও একটা বাচ্চা থাকে যে, বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়, একটা বয়সের পর। সে গিয়ে প্রত্যেকটা মেয়েকে বলে, 'মা হও। আমাকে বাইরে বের করো।' আমার খুব ইচ্ছে করে আমার বাচ্চাও খেলে বেড়াক আর সব বাচ্চার সঙ্গে। আচ্ছা, তুমি ঝুলন সাজিয়েছ কোনওদিন?"
আমি ঝুমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লাম।
"আমি খুব ভাল ঝুলন সাজাতে পারতাম জানো। আমাকে অনেকে নিয়ে যেতে চাইত নিজেদের বাড়িতে ঝুলন সাজানোর জন্য। আমাদের পাড়াটা তখন আরও বেশি গ্রাম-গ্রাম ছিল আর নিয়োগী পুকুরের ঠিক পাশেই ছিল এলাকার সবচেয়ে বড় বাড়ি, সাহাদের। তারপরের বাড়িটা মিত্রদের। ওরা আমাদের কীরকম যেন আত্মীয় হত। ওই মিত্রদের বাড়িতে ঝুলন সাজাতে দেখেই আমাকে একবার সাহাবাড়ির এক ভদ্রমহিলা টাকা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, ওদের বাড়ির ঝুলন সাজাতে। সেই আমার জীবনের প্রথম রোজগার। লোকে কতকিছু করে রোজগার করে আর আমি ইটের গুঁড়ো, সুরকি দিয়ে নদী তৈরি করে, বালি দিয়ে রাস্তা গড়ে কড়কড়ে একটা একশো টাকার নোট পেয়েছিলাম। কিন্তু টাকা পেয়ে আমার যে খুব আনন্দ হয়েছিল তা নয়। খালি মনে হচ্ছিল, কবে আমার নিজের বাড়িতে এরকম একটা বারান্দা থাকবে, যেখানে আমি নিজের খুশিমতো ঝুলন সাজাতে পারব।"
আমার মনে পড়ে গেল, কোন ছোটবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে ছ'গোলে হারছি। আমাদের পি.টি টিচার হাফ-টাইমে আমার কান মলে দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি ডিফেন্সে দাঁড়িয়ে আছ না ঝুলনের পুতুল হয়ে দুলছ? তোমাকে কাটিয়ে খালি গোল করে যাচ্ছে?" ঝুমার কথাগুলোও যেন আমাকে ঝুলনের পুতুল বানিয়ে দিল, এমন একটা পুতুল, যার কোনও ইচ্ছাশক্তি নেই, যে কেবলই এদিক থেকে ওদিক দুলছে।
"কী ভাবছ? এই মেয়েটা তারকাটা, তাই না?"
আমি কোনও উত্তর দিতে পারলাম না ঝুমাকে। কিন্তু ঝুমা যদি আমার বুকে মাথা রাখত তখনই, তাহলে শুনতে পেত আমার হৃৎস্পন্দনে কেউ একটা বলছে যে, পৃথিবীতে গান-বাজনা-কবিতা-শিল্প এসব কিছু করার জন্য অনেক লোক আছে; আমার ঝুমাকে এমন একটা বারান্দা দিতে হবে যেখানে বালি দিয়ে পাহাড়, ইট দিয়ে ট্রেন লাইন তৈরি করা যায়, যেখানে যে কোনও ছোট্ট দুটো পুতুলকে প্রেমিক-প্রেমিকার মতোই লাগে।
আমি সেই চেষ্টাতেই মন লাগিয়ে নেমে পড়লাম, বলা যায়। দিন দশেক পরে আবার যেদিন ঝুমার সঙ্গে দেখা হল, মধ্যের একটা ডেট মিস করে, সেদিন কতটা কী অগ্রগতি হয়েছে জানানোর জন্য উদগ্রীব হয়েছিলাম। ঝুমাও নির্ঘাত ছটফট করছিল।
কিন্তু সেদিনই গন্ডগোলটা হল। বিবেকানন্দ পার্ক থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে ঘুরলেই যে সস্তায় পুষ্টিকর খাবারের দোকানটা, সেখানেই আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ঝুমা। আর অর্ডার দিল রুটি ঘুগনি।
রান্না খুব ভাল এই দোকানটার। আমরা আগেও খেয়েছি। কিন্তু কোনও একটা কারণে, সেদিন রুটিগুলোয় পোড়া লেগে গিয়েছিল, ঘুগনিও ঠিক স্বাদে-গন্ধে 'এ' ক্লাস হয়নি। আমি কোথায় কোথায় ফ্ল্যাট দেখেছি, কত টাকা লোন পাওয়া যাবে, ইত্যাদি নিয়ে সিরিয়াস আলোচনার মুডে ছিলাম কিন্তু ঝুমা বারবার রুটি কেন পুড়ে গেছে, সেই প্রসঙ্গ তুলছিল। একবার গলা তুলে এমন বলতে শুরু করল যে দোকানের মালিকের ছেলেটা সামনে এসে দুঃখপ্রকাশ করে জানিয়ে গেল, রুটি করার নিয়মিত লোকটা আজকে নেই। অন্য একজনকে দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে।
"আরে ছাড়ো না, আমরা কি ফাইভ স্টারে খেতে এসেছি নাকি?" আমার বিরক্ত লাগল।
"যে-স্টারই হোক, পয়সা দিয়ে খাচ্ছি যখন বাজে জিনিস খাব কেন?" ঝুমা পালটা দিল।
তারপর টেবিল থেকে উঠে গিয়ে দরজার পাশেই গনগনে উনুনের পাশে বসে থাকা দেহাতি ভদ্রমহিলাকে কড়া কথা শোনাতে শুরু

করল।
আমার অসহ্য লাগছিল। আমি টেবিলে রুটি ঘুগনি ফেলে রেখে এগিয়ে গিয়ে ঝুমার হাতটা ধরে বললাম, "তোমাকে নিয়ে এখানে নিয়ে আসাই ভুল হয়েছে। চলো একটা ভাল জায়গায় বসব।"
"কোথাও যাব না। কেন পোড়া রুটি দিয়েছে আমাদের? নতুন করে আবার ভাল রুটি করে দিতে হবে।"
"একজন গরিব, বৃদ্ধা, নাহয় পারেইনি ঠিকমতো রুটি করতে। তুমি বাওয়াল করছ কেন তাই নিয়ে?"
"করব নাই বা কেন? ওই বুড়ি কে আমার?"
"ওই অটোওয়ালা তোমার কে ছিল?"
"অটোওয়ালা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, আমার কাজে লেগেছিল। এ কী করেছে?"
"ধরে নাও, কিছু করেনি। তবু তো তোমার মায়ের বয়সি। হয়তো চোখে ছানি পড়েছে, অপারেশন করাতে পারেনি বলে রুটিগুলো পুড়ে যাচ্ছে। আরও তো একটা কাস্টমার ছিল এতক্ষণ, কই কিছু বলেনি তো!"
"কে কার বয়সি আমার জানার দরকার নেই। নিজের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারছে না যখন, মরুক গে যাক।"
ঝুমার কথাটা কানে যাবার পর থেকে পনেরো সেকেন্ড নিশ্চয়ই কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল আমার। নয়তো একটা মেয়ের গালে চড় মারলাম কী করে? তাও একেবারে প্রকাশ্যে? ভাগ্যিস দোকানে বিশেষ খরিদ্দার ছিল না সেই সময়ে, তাও তিন-চার জোড়া চোখ আমাদের দিকে ঘুরে গেল পলকে। গুঞ্জনও শুরু হল।
অন্য কোনও মেয়ে হলে হয়তো আমার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করত সেই মুহূর্তে, কিন্তু ঝুমা আধমিনিটের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে আমাকে প্রায় ঠেলা দিয়ে বের করে আনল দোকান থেকে। বেরনোর আগে নিজের পার্স খুলে একটা একশো টাকা রেখে দিল মালিকের টেবিলে। তারপর যে-হাতটা দিয়ে ওকে চড় মেরেছি সেটা ধরেই হনহনিয়ে হাঁটল পাঁচ-সাত মিনিট। অবশেষে লেকের একটা বেঞ্চিতে আমায় নিয়েই বসে পড়ে বলল, "চাইলে আর একটা চড় মারতে পারো। মারবে?"
আমি নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। অনেকদিন পর কেঁদে উঠলাম।
"কী হয়েছে তোমার? আমি বুঝতে পেরেছি কিছু একটা হয়েছে। আমি কিছু মনে করিনি, বিশ্বাস করো। আমি তো তোমারই। তুমি মারতে ধরতে যা খুশি করতে পারো আমায়। ঘরে, ফুটপাথে, রাস্তায়, যেখানে খুশি সেখানে। কিন্তু শুধু বলো, তোমার কী হয়েছে?" ঝুমা আমার পিঠে হাত রাখল।
ওই হাতটাই বোধহয় সব মৃত্যুপথযাত্রীকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনে। আমার কান্না থেমে গেল, ওই হাতের ছোঁয়ায়। আমি ঝুমাকে বলতে শুরু থাকলাম, কেন ওর গালে চড় মেরেছি আমি। আমার মা যে লোকের বাড়িতে রুটি বেলত। রুটি গোল না হলে, ফুলে না উঠলে, আমার মাকে যে গঞ্জনা সহ্য করতে হত। আমি নিজে তার সাক্ষী বলেই তো ওই বুড়িটার অপমান সহ্য করতে পারছিলাম না।

৪

আপনারা কতজন পারেন জানি না, কিন্তু আমি খুব ভাল উনুন সাজাতে পারি। বেশিদিন আগের কথা নয়, আজ থেকে বছর তিরিশ আগের কথা। তখন হয় উনুন আর নয় স্টোভে রান্না হত সব মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বাড়িতে। আমি ভাল উনুন সাজাতে পারতাম বলে মা সকাল-সকাল আমাকে ঠেলে তুলে দিত। শীতকালে একটু কষ্ট হত, কিন্তু বাকি সময়ে ব্যাপারটা বেশ উপভোগই করতাম। কয়লাগুলো গোল করে সাজিয়ে নিয়ে ঘুঁটেগুলো একটু তেরছা করে রাখতে হত। একটা খবরের কাগজ আড়াআড়ি ছুঁয়ে থাকত দুটো প্রান্তকে। আর কেরোসিনটা ঢালতে হত খুব কায়দা করে। যাতে কয়লাগুলোর গায়ে ছিটে লাগে কিন্তু ওরা পুরোপুরি ভিজে না যায়। সাজানোর কায়দার উপর নির্ভর করত কত দ্রুত আগুন ধরবে উনুনে।
এই ব্যাপারটা আজকের শহুরে প্রজন্ম বুঝতেই পারবে না। যেমন তারা বুঝবে না যে, একটা ভাল মুদি কিংবা স্টেশনারি দোকানের কী গুরুত্ব ছিল যখন 'শপিং মল' খায় না মাথায় দেয়, জানতাম না আমরা কেউ। এখন যখন শপিং মলে যাই মনে হয় তা যেন একটা বিরাট দৈত্য যার প্রচুর ক্ষমতা, কিন্তু একটুও স্বাধীনতা নেই। পাঁচ হাজার টাকার জিনিস কিনলেও কোনও দোকান থেকে ফ্রিতে একটা লজেন্সও এগিয়ে দেওয়া হবে না। ওদিকে আমার বাবা, পঞ্চাশ টাকার সওদা করা লোকটার সঙ্গেও একটা বাচ্চা থাকলে, বাচ্চাটার হাতে তিন-চারটে টফি তুলে দিত সবসময়। বাবার দোকানে আমি যখন বসতাম, তখনই দেখতাম।
মার্কেটের ভিতর, আমাদের সেই 'বোস স্টেশনারি'তে কতরকম জিনিস যে ছিল... মিল্ক পাউডার থেকে ব্যাটারি, আটা-ময়দা থেকে তেল-সাবান, পুরনো চাল থেকে বাজারে নতুন আসা সয়াবিনের প্যাকেট। দোকানটা আয়তনে হয়তো বারো বাই চোদ্দো ফুট, কিন্তু তার ভিতরের পৃথিবীটা আমার চোখে আজও যে কোনও পুজো প্যান্ডেলের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল।
দোকানটা পুড়ে গেল একদিন। শর্টসার্কিট না কীসে বাজারের এক তৃতীয়াংশ পুড়ল, আর তার মধ্যে থাকা আমাদের দোকানটাও গেল ভস্ম হয়ে। সেই সময়টাও এমন ছিল যে, বিমা-টিমা অত করিয়ে রাখত না কেউ। বাবা বোধহয় সেরকমই কিছু একটা করিয়েছিল, সেখান থেকে বছর দেড়েক পরে হাজার দুয়েক টাকা পাওয়া গেল। আর সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণ পাওয়া গিয়েছিল হাজার পাঁচেক মতো। কিন্তু তাই দিয়ে আর দোকানটাকে নতুন করে চালু করতে পারল না বাবা। বলা ভাল, চাইল না। যে-বাবা একাই অন্তত একশোটা বাড়িতে মাসের মাল দিয়ে আসত নিজের স্কুটারে চেপে, মাসকাবারি খাতায় হিসেব রাখত তিন-চারশো পরিবারের, জিরে-হলুদ থেকে বিস্কুট-সিমুইয়ের, সেই বাবাই সন্ধ্যা থেকে রাত্রি অবধি তাস পিটে, একগলা মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতে শুরু করল, বাড়ি ফিরেই চিৎকার করতে থাকল মা আর আমাকে উদ্দেশ্য করে। দোকান পুড়ে যাওয়ার আগের বাবা আর পুড়ে যাওয়ার পরের বাবা যেন পুরো উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু। যে মানুষটা বাড়ি ফিরে আমাকে জিজ্ঞেস করত পড়াশোনা করেছি কি না, সেই মানুষটা আমার এবং মায়ের সম্বন্ধে, একেবারে উদাসীন হয়ে গেল। আর কীরকম অল্পে রেগে যেতে শুরু করল আমার ছোট্ট বোনটার উপর। যখন বাড়ি ফিরত টলতে টলতে, যখন বেরত তখন কী সব বিড়বিড় করতে করতে বেরত। শেষ অবধি ছিলাম তো আমরা একটা স্টেশনারি দোকানের মালিক। কত টাকা আর জমানো ছিল যে, অনন্তকাল রোজগার না হলে বসে খাওয়া যাবে?
বাজারের বড় অংশটাই ভেঙে ফেলা হল একদিন। নতুন করে তৈরি করা হবে বলে। কিন্তু সেসব তৈরি হয়ে হাতে পেতে পেতে প্রায় দু'বছর লেগে গেল। যখন আবার পাওয়া গেল জায়গাটা, ততদিনে বাবা জুয়া আর মদে উড়িয়ে দিয়েছে ক্ষতিপূরণের প্রায় সব টাকাই। যেটুকু বাকি ছিল তা দিয়ে মালপত্র তো দূর, শেলফ আর বয়াম কেনাও সম্ভব হত না। মা নিজের শেষ দুটো সোনার চুড়ি বিক্রি করে বেশ খানিকটা টাকা তুলে দিল বাবার হাতে। কিন্তু কোনও কিছু থেকে একবার মন উঠে গেলে, সেখানে আবার মন বসানো খুব কঠিন কাজ।
নতুন দোকানে আগের দোকানের চারভাগের একভাগ জিনিসও ছিল না। তবুও হয়তো আস্তে আস্তে দাঁড়াত ব্যবসাটা, যদি দোকানের

বাবা। বাজারেরই অন্য দোকানদারদের থেকে খবরটা পেয়ে মা রুখে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু বাবা প্রতিটা প্রশ্নের উত্তরে বলত, ভাগ্য যেভাবে সব কেড়ে নিয়েছে, ভাগ্যই হঠাৎ করে সব ফিরিয়ে দেবে না কি একদিন? শুধু নেবে? বলতে বলতে চিৎকার করে উঠত।

সেই চিৎকার এমনই যে, তার সামনে চুপ করে যেতে বাধ্য হতাম আমরা। কিন্তু চুপ করে গেলেই উল্টোদিকের অভদ্র লোকটা ভদ্র হয়ে যায় না। বাবাও গেল না। বরং মায়ের গায়ে হাত তুলতে শুরু করল। সবচেয়ে খারাপ যেটা হল, আমার বোন তুলির প্রতি বাবার প্রবল একটা বিরাগ জন্মাল। জন্মানো ইস্তক যাকে লক্ষ্মী হিসেবে দেখেছিল বাবা, সে হঠাৎ করে হয়ে গেল সব দুর্ভাগ্যের মূল।

ঘরে ঢুকেই বাবা চিৎকার করা শুরু করে দিত, "অলক্ষ্মীটা কোথায়? ঘুমিয়ে পড়েছে? তুলে দাও ওকে। রাস্তায় বের করে দাও। যবে থেকে এসেছে, অশান্তি এসেছে সংসারে।"

বাবার সব কথা বুঝতে না পারলেও বোন ভয়ে থরথর করে কাঁপত। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতাম। তুলি আমার চোখের দিকে চোখ মেলে তাকাত। তারপর চোখ নামিয়ে নিত। আমি দেখতাম, ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

"ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই কাঁদিস না বাবু।" আমি ওর গালে-কপালে চুমু খেয়ে বলতাম।

"আমি অলক্ষ্মী দাদা?" তুলি জিজ্ঞেস করত।

আমি কোনও জবাব দিতে পারতাম না কথাটার। চুপ করে ওর মাথাটা নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরতাম।

মা বাধা দিত, যতবার বাবা গালাগালি দিত বোনকে।

"তুমি কি মানুষ না রাক্ষস? নিজের মেয়েকে কেউ এই ভাবে গাল দিতে পারে, মানুষ হলে?"

"হ্যাঁ, আমি রাক্ষস। তোদের সবাইকে খাব। রক্ত খাব, মাংস খাব, পুড়িয়ে খেয়ে শেষ করব।" বাবা জবাব দিত।

সংসারে টাকার যোগান একদম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেলাই শুরু করল মা। এর-তার বাড়ি থেকে শাড়ি নিয়ে আসত, পিকো করার জন্য, ফল্ লাগানোর জন্য। মায়ের কাজের পরে আমিই গিয়ে সেগুলো বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসতাম। অনেকে ছিল যারা ধারবাকিতে খেত আমাদের থেকে মাসকাবারি হিসেবে, কিন্তু মাসের শেষে টাকা দিতে না পেরে পালিয়ে বেড়াত। এখন তারাই আমায় দেখলে, "সেই কবে তোর মাকে শাড়ি দিয়েছি, এখনও হয়নি?" বলে, দু'কথা শুনিয়ে যেত। শুনতে শুনতে আমার আর গায়ে লাগত না। পুড়তে পুড়তে কয়লা যেমন অঙ্গার হয়ে যায়, আমিও তেমন করেই পালটে যাচ্ছিলাম। মা যখন সেলাইয়ের কাজ ধরার জন্য বাড়ি বাড়ি যেত, তখন বোনকে কোলে বসিয়ে পড়াশোনা করতাম। সেই ছোট্টবেলায় আমাকে যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটায় ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে স্থানীয় একটা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল আগের বছরেই। আমি প্রাণপণ চেষ্টায় বাংলায় জীবনবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান বোঝার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এতদিন ইংরেজিতে পড়ে এসেছি বলে ক্লাস এইটে উঠে চট করে বাংলায় 'সালোকসংশ্লেষ' কিংবা 'তড়িৎ প্রবাহ' বুঝতে পারতাম না। তবু বিপদে পড়লে মানুষ কী না করে! আর এ তো সামান্য ভাষা পরিবর্তন।

"জানিস, ওই দীপনদের গ্রুপটা তোর নাম দিয়েছে ভিখিরি ইংরেজ।" স্কুল থেকে ফেরার পথে সৌম্য একদিন জানাল আমাকে। অনেকদিন আমাদের দোকান থেকে ধারে খেয়েছে বলে, সৌম্যর হয়তো কিছুটা কৃতজ্ঞতা ছিল আমার প্রতি।

স্কুলের কেউ কেউ আড়ালে আমাকে টিটকিরি দিত আমি জানতাম, কিন্তু পাত্তা দিতাম না। তাও দীপনের মুখে আমার নতুন নাম শুনে

"তোর বাবার দোকান পুড়ে গেছে, তোর মা সেলাই করে সং
চালায়, তোরা এখন খেতে পাস কি না ঠিক নেই, কিন্তু তুই ই
মিডিয়ামে পড়তি বলে ক্লাসে দুমদাম ইংরেজিতে কথা বলে
বাংলায় এখনও সড়গড় হতে পারিসনি, তাই..."

আমি হেসে ফেলেছিলাম কথাটা শুনে। প্রত্যেকটা অপমানে
সামনে হেসে ফেলাই যে সবচেয়ে বড় ওষুধ, এই বোধ ততদি
আমার হয়ে গেছে। নতুন বই কিনতে পারতাম না বলে উঁচু ক্ল
ছেলেদের বাড়ি গিয়ে বই ভিক্ষে করতাম। কারও কারও মায়
আজেবাজে কথা শোনাত অনেকেই। কিন্তু আমি তখন বিকা
মায়ের কথা ভাবতাম। বিকাশ আমার বাবার দোকানে কাজ
যখন দোকানটা দোকানের মতো চলত। বোধহয় ক্লাস থ্রি-যে
অবধি পড়ে থাকবে। কিন্তু বুদ্ধিতে চৌখস ছিল। দোকানে আ
লাগার পরদিন, ওই পোড়া ধ্বংসস্তূপের ভিতরে ঢুকে অনেক
উদ্ধার করেছিল বিকাশ। তারপর সেগুলো একটা গাঁটরিতে
চম্পট দিয়েছিল। হয়তো আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল, কী হ
চলেছে ভবিষ্যতে।

"শালার ছেলে বলল যে, বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে জিনিসগুলো।
রেগে গেলে বলত মাঝেমাঝে।

"বাড়িতেই তো নিয়ে গিয়েছে। নিজের বাড়িতে।" মা জবাব দি
বাবা চুপ করে যেত।

আমার শুধু মনে পড়ত, বাবার দোকান রমরমিয়ে চলার দিন
বিকাশ আমাদের বসার ঘরের চৌকিটা ছেড়ে আমার বিছানা
এসে শুত এক-একদিন রাতে। আমার বইগুলোর পাতা উল্টে
ইংরেজি না পড়তে পারলেও এক-একটা ছবির দিকে তাকিয়ে
অনেকক্ষণ।

বিকাশের মা প্রত্যেক মাসের প্রথমে আমাদের বাড়িতে এসে
বিকাশের মাইনে নিয়ে যেত। আর প্রতিবার একই গল্প করত
কীভাবে নৌকায় নদী পেরিয়ে, তারপর অনেকটা রাস্তা পায়ে
ঘন জঙ্গলের ভিতরে ঢোকে ওরা মধু সংগ্রহ করতে। ঢোকার
প্রত্যেকেই মাথার পিছনে একটা বাঘের মুখোশ পরে নেয়। ব
যাতে মনে করে যে, আর একটা বাঘই ওর দিকে এগিয়ে আ
পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাঘকে বিভ্রান্ত করার এই কৌশল কাজে
না সবসময়। অনেক লোককে খেয়ে নেয় বাঘ, হাত-পা হারি
থাকে কেউ কেউ। আর যারা সুস্থভাবে ফেরে তারা আবার ক
পরেই জঙ্গলে ঢোকে মধুর খোঁজে।

"ভয় করে না?" মা জিজ্ঞেস করত।

"করবে না কেন, খুব করে। মধুর নেশায় ভয়টা ভুলে থাকি।"

কথাটা মাঝেমাঝেই মনে পড়ত আমার, আমিও যে জীবনে
রেজাল্ট করে প্রতিষ্ঠিত হবার নেশায় সব ভয় ভুলে বাঁচতে চে
করছি তখন। কিন্তু ভয় ভুলে থাকা একরকম ব্যাপার, আর ভ
সত্যি হয়ে ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার
যখন বোনের জ্বর তিন-চারদিন পেরিয়ে গিয়েও কমল না, অ
বাবার কাছ থেকে ডাক্তার দেখানোর টাকা চেয়ে চেয়ে হন্দ হ
শেষ সম্বল গলার সরু সোনার চেনটা বিক্রি করে দিয়ে এল ম
জুয়েলার্সে, তখনও বিপদের চেহারাটা স্পষ্ট হয়নি আমার কা
সেলাইয়ের বাড়িগুলো থেকে বকেয়া টাকা আদায়ে বেরিয়ে ব
ফিরে মা যখন দেরাজে হাত ঢুকিয়ে টাকাটা না পেয়ে চিৎকার
উঠল, আমি বিপদের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। নামও জে
গেলাম তার। সে চপল বসু। আমার বাবা। নিজের দোকান পু
যাবার পর যে এখন লোকের দোকানে কাজ করে। কাজ করে
ছাড়ে, আবার অন্য দোকান ধরে। কিন্তু কর্মকার স্টোর্স থেকে
ভাত খেতে বাড়িতে এসে বাবা একেবারে আমাদের হৃৎপিণ্ডে
টান দিয়েছে। শিকড় সমেত উপড়ে যেতে না চাইলে লোকটা

“তুমি টাকাটা ফিরিয়ে দাও, এক্ষুনি ফিরিয়ে দাও। আমি তুলিকে হাসপাতালে ভর্তি করব।” মা চাপা গলায় বলল।
বাবা একটা হোমিওপ্যাথির শিশি মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “ভাল হলে এতেই হয়ে যাবে, অ্যালোপ্যাথি মানুষ মারার ওষুধ। ওতে কেউ বাঁচে নাকি?”
মা, বাবার হাত থেকে ওষুধের শিশিটা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, “আমার মেয়েকে আমি অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারই দেখাব। সেই কারণেই আজ ছেলেকে না পাঠিয়ে নিজে গিয়েছিলাম টাকা আনতে। যাতে পাওনা টাকার পাশাপাশি চেয়েচিন্তে আরও কিছু পেতে পারি।”
“তাহলে তো ভালই মাল কামিয়েছিস সবাইকে পটিয়ে। আবার আমার কাছে হাত পাতছিস কেন?”
“হাত পাতছি না। নিজের গয়না বেচা টাকার পাইপয়সা ফেরত চাইছি। তুমি ফেরত দাও।”
“তোর আবার টাকা কীসের? ওই হার কি তোকে তোর বাপ দিয়েছিল? দিয়েছিলাম তো আমি। এখন বিক্রির টাকাও আমি নেব। তোর টাকার দরকার থাকলে তোর মরা বাবাকে ডেকে আন। আবার ট্রেনে-ট্রেনে হকারি করে তোকে নতুন হার গড়িয়ে দিতে বল!”
“আমার বাবা কোনওদিন ট্রেনে হকারি করেনি। স্টেশনে আমার বাবার দোকান ছিল।”
“দোকান না ছাই! সে দোকান কি আমার দোকানের মতো?”
“সে দোকান টিকে তো আছে। মেজদার সংসার ওই দোকানের উপর ভর করে চলে। তোমার দোকানের মতো অবস্থা তো তার হয়নি।”
“আমার দোকান পুড়ে ছাই হয়েছে, তোদের মতো অলক্ষ্মীর জন্য। তুই আর তোর মেয়ে, দু'জনই অলক্ষ্মী। তোদের জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে সমস্ত।”
মা গলার কান্নাটাকে গলায় চেপে বলে উঠল, “মেয়েটার জ্বর, এখন ওইসব বোলো না।”
“বেশ করব, বলব। হাজারবার বলব। অলক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, অলক্ষ্মী। মর তুই, মরুক তোর মেয়ে।”
শেষ কথাটা সহ্য করতে না পেরে মা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার উপর। আঁচড়ে-কামড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চাইল একটা অমানুষকে, যে নিজের অসুস্থ মেয়ের মৃত্যুকামনা পর্যন্ত করতে পারে। সেই ধাক্কায় সাময়িকভাবে হতভম্ব হয়ে গেলেও, শিগগিরই আমার দুবলা-পাতলা মায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেল বাবা আর তারপর নির্মমভাবে মায়ের মাথাটা ঠুকে দিল ঘরের দেওয়ালে। একবার-দু'বার-তিনবার। ঘরের দেওয়াল বেয়ে একটা রক্তস্রোত কোনও শীর্ণ নদীর ধারার মতো গড়িয়ে নামতে লাগল। ভূগোল ক্লাসে অসীম স্যার চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে যেরকম ধারা সৃষ্টি করেন। শুধু এই ধারাটার রং ঘন লাল।
আমার ইচ্ছে করছিল একটা আধলা ইট তুলে ছুড়ে মারি লোকটাকে। কে বাবা? কীসের বাবা? আমি তার কয়েকদিন আগেই জেনেছি ছেলেরা কেমন করে বাবা হয়। কীভাবে মা হয় মেয়েরা। কিন্তু এখন আমার ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠছিল ওই লোকটার থেকে আমার জন্ম হয়েছে ভেবে। কেমন যেন স্থবির হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।
পরদিন পাড়ার ছেলেদের সাহায্যে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না, আমার ফুলের মতো বোনটা মারা গেল একবেলা হাসপাতালে থেকেই। আর আমি যে-মুখে বিস্কুট, চকোলেট, মাছের ডিম, মাংসের মেটে গুঁজে দিয়েছি কতবার, সেই মুখেই আগুন ছোঁয়ালাম, ছুঁইয়ে রাখলাম।
ওই আগুনের আঁচেই হয়তো আমার সব জড়তা বাতাসে বাষ্পের মতো মিশে গেল। যে-তুলি একটা ডল পুতুলের মতো আমার কোলে বসে থাকত, ঘুরে ঘুরে নেচে দেখাত, আধোআধো করে বলত, “গায়ে

চলছে,” সেই তুলি কুড়িমিনিটে ধোঁয়া হয়ে মিশে গেল বা
মানতে পারছিলাম না।
ওর চিতাভস্ম গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে দিতে আমার মনে হচ্ছি
শুধু গঙ্গা নয়, গঙ্গা দেওয়াল বেয়ে নামা একটা রক্তস্রোত,
নেবার জন্যই আমার ভিতরে এই লাভাটা জন্মাচ্ছে।
সেই লাভার উষ্ণতাসই আমাকে আর আমাদের বাড়িতে থা
না। মা প্রথমে ভয় পাচ্ছিল, সব হারিয়ে ফেলবার পরও অ
বাইরে যাওয়ার ভয়। কিন্তু যে ঘরে তুলি বিনা চিকিৎসায়
গিয়েছে, সেখানে থাকতেও মন করছিল না মায়ের। শেষে
আমার জেদের কাছেই হার মানল মা। ওই অন্ধকূপ ছেড়ে
দুপুরে বেরিয়ে এলাম আমরা। শয়তান লোকটা তুলির মৃত্যু
পেয়ে শ্মশানে গিয়েছিল, কিন্তু নিজের মেয়ের মৃতদেহের
হওয়ার সাহস পায়নি। ওইটুকু মেয়েকে না পুড়িয়ে কবর
কথা বলেছিল অনেকে, কিন্তু কবর দেওয়ার জন্য অনেক
লাগত, আর আমাদের তো কানাকড়িও ছিল না।
চপল বসুর একসময়ের বন্ধু অধীরকাকা, আমাদের পঞ্চান
বস্তির একটা ঘর দেখে দিয়েছিল। সেখানে কমন বাথরুম-
একটু বেলা বাড়লে গন্ধের চোটে যাওয়া যায় না। ঘরের উ
আর এমনই গলির ভিতরে ঘর যে, আলো ঢোকে না এক
যেন মনে হচ্ছিল মুক্তির বাতাস লাগছে গায়ে, কংসের কা
থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণের যেমন লেগেছিল।
মা লোকের বাড়ি রান্নার কাজ নিল। যে মায়ের সরষে ইলি
ইলিশ কিংবা ভেটকি পাতুরির জন্য আত্মীয়মহলে বিরাট
সেই মা মাস গেলে কটা পয়সার বিনিময়ে লোকের বাড়িতে
গেল। নিজের সংসার যার ভাঙে, সেই তো অন্যের সংসার
যায়। নিজের ঘর বলে কিছু থাকে না যার, পৃথিবীটাই তার
ওঠে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমারও তাই হল। কিন্তু ওই বস্তি
ঘরে থেকেও আমি পড়াশোনা ছাড়িনি। আমি যে পড়াশো
প্রাণ ছিলাম তা নয়, কিন্তু আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম
অক্ষরগুলোই আমার নরক থেকে মুক্তির একমাত্র রাস্তা।
আসুক, ওই রাস্তা ছাড়া চলবে না। ততদিনে বস্তির ছোট-
বাচ্চাদের পড়ানোর ব্যাপারে আমার বেশ নাম হয়েছে। স্কু
ফিরে প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা বাচ্চাকে নিয়ে বসতাম আমি।
পয়সা দিত, কেউ কেউ দিতও না। কিন্তু ওই বয়সেই, ‘মা
বেশ একটা খ্যাতি হয়েছিল আমার। সেই খ্যাতির দাপটে
নতুন ছাত্র-ছাত্রী আসতে শুরু করেছিল আমার কাছে, কি
সময়টাতেই যোধপুর পার্কে সান্যালদের বাড়িতে সবসময়ে
হিসেবে কাজের প্রস্তাব পেল মা। দু'বেলার রান্নার সঙ্গে শ
সান্যাল গিন্নির দেখাশোনা।
অতগুলো বাড়ির চাপের থেকে একটা বাড়িই ভাল। আমা
হয়েছিল। কিন্তু মা আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছিল না। এই
সান্যালবাবু একদিন মায়ের মুখ থেকে আমার কথা শুনে,
সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমি আমার ক্লাস নাইন থে
ওঠার রেজাল্টটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।
সেই রেজাল্ট দেখেই সঞ্জীব সান্যাল বললেন, “তুমিও তো
সঙ্গে আমার বাড়িতেই চলে এসো। ছেলে আমেরিকায়,
তো বছরে সাড়ে এগারোমাস ফাঁকা থাকে। ওটাই তোমার
হবে। তুমি ওই বস্তিতে থাকলে এই রেজাল্ট ধরে রাখতে
চলে এসো বাক্স-প্যাটরা নিয়ে, মায়ের সঙ্গে।”
আমি চলে যাচ্ছি জেনে বস্তির বাচ্চাগুলো যখন আমায়
কাঁদছিল, ওদেরকে নিজের থেকে ছাড়ানোর সময় মনে হ
কীই বা ধরে রাখতে পেরেছি? বস্তির ঘরের যাট ওয়াট বা
যে-বালাপোষটা গায়ে জড়িয়ে আমি পড়তাম রাত জেগে,

এলাম। যদি অন্য কারও কাজে লাগে।
সঞ্জীব সান্যালের বাড়ির বাথরুমে লাল বাতিজ্বলা গিজার দেখে প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মেশিনটা কীসের তাই তো জানতাম না। কিন্তু ওই মেশিনটা চালু থাকলে যখন শাওয়ার দিয়ে উষ্ণ জল ঝরে পড়ত, নীচে দাঁড়িয়ে আমি টের পেতাম, শীতলতা মানুষকে যতটা কুঁকড়ে দেয়, গরম জল ঠিক ততটাই উদ্দীপিত করে। আমি গা-মাথা মুছে প্রতিদিন একটা ঘরের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতাম স্রেফ এটুকু বোঝার জন্য যে, আমার পিছনে অন্তত একটা দেওয়ালের সাপোর্ট আছে। আমি মহাশূন্যে তলিয়ে যাচ্ছি না। তলিয়ে যাব না আর কখনওই।

৫

আমাদের স্কুলের ইতিহাসের মাস্টারমশাই সুধন্যবাবু মারতেন-ধরতেন না। বকাবকি করার সময় একটাই কথা বারবার বলতেন, যার যেমন বীজে ধর্ম, তার তেমন কুলধর্ম।
কথাটা শুনে তখন হাসলেও পরে ভেবেছি, বীজই কি সব? যেরকম বীজ থেকে যার জন্ম, তাকে সেরকম হতেই হবে? আমার বাবার জেরক্স হওয়াটাই আমার ভবিতব্য? পড়ে থাকা ফলের ভিতর থেকে বীজটা বার করে মাটিতে পুঁতলে যে-গাছ বেরোবে, তার ঠিক অবিকল এক ফল হবে? অদ্ভুত এই পৃথিবীর নিয়ম তো! আমি চাইলেও আমার বাবার মতো না হয়ে, আলাদা রকম হতে পারব না?
আমার এক সহপাঠী তন্ময়, সান্যালজেঠুর বাড়িতে আসত আমার কাছ থেকে বই নিতে বা আমায় বই দিতে। ততদিনে জেঠুর কৃপায় আমাকে আর বই ভিক্ষে করে পড়তে হয় না। সেই তন্ময় একদিন নানা কথার ভিড়ে, সান্যালজেঠুর সঙ্গে আমার মায়ের আসল সম্পর্কটা কী, জিজ্ঞেস করে বসল। কথাটা শুনে কান-মাথা গরম হয়ে উঠল আমার। কিন্তু কিছু জবাব দিতে পারলাম না মুখে-মুখে।
জেঠিমার জন্য একজন আয়া আসত সকালে। কিন্তু জেঠিমার দেখভাল, রান্নাবান্না, বাড়ির সবার খাওয়াদাওয়া মা নিজেই দেখত; বলতে গেলে, পুরো বাড়িটাই একা হাতে সামলাত। সান্যালজেঠু মজা করে বলতেন, 'আমার ম্যানেজার'। সেই 'ম্যানেজার' সম্বন্ধে তন্ময়ের ওই কথাটা আমি নিতে পারিনি একদম। কিন্তু ওর সঙ্গে ঝগড়া করলে কথাটা গুজবের চেহারা নিয়ে পল্লবিত হবে এই বোধ থেকে চুপ করে গিয়েছিলাম।
আশ্চর্য মানুষের মন, কথাটা শুনে ঘৃণার পাশাপাশি একটা সংশয়ও জেগে উঠেছিল আমার। যে-বাবাকে আমি ঘৃণা করতাম মনপ্রাণ দিয়ে, যার প্রতি অনন্ত বিদ্বেষ ছিল আমার, মায়ের উপর সেই বাবার অধিকার আমার মনে একটা নীল টিক পেয়ে যেত। ওই একই মন জানতে চাইত, মায়ের সঙ্গে সান্যালজেঠুর আদপেই কিছু নেই তো? অবচেতনের সেই প্রশ্ন থেকেই হয়তো আমি কিছু না বলে একটু নজর রাখতে শুরু করেছিলাম মায়ের উপর। কখন মা জেঠুর ঘরে ঢুকছে, কখন বেরোচ্ছে...
মা টের পেয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। ঠাস করে একদিন একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল আমার গালে। তারপর কেঁদে উঠেছিল নিঃশব্দে।
"তোর জন্য এখানে এসেছি। শুধু তোর জন্য। যাতে তুই ছাদের তলায় বসে, ফ্যানের হাওয়া খেয়ে পড়াশোনা করতে পারিস। নইলে লোকের বাড়ি বাড়ি ঝি খেটে বেড়ালেই বা আমার ক্ষতি কী হত? আর তুই কিনা শেষে আমাকে সন্দেহ করছিস?"
"না মা, সন্দেহ নয়। আমি তোমাকে রক্ষা করার কথা ভাবছিলাম।"
"আমাকে রক্ষা করতে হবে না তোকে। ভগবান থেকে থাকলে, তিনি আমায় রক্ষা করবেন। তাছাড়া ভগবানের দয়াতেই আমি এমন একজন মানুষের বাড়িতে এসেছি। ভাগ্য মানুষের থেকে সব কাড়ে

মানুষকে অশ্রদ্ধা করিস না, আমাকে সন্দেহ করতে গিয়ে।"
মার সঙ্গে সেদিন একটা মস্ত ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল আম
তন্ময়ের কথা বলব বলব করেও বলতে পারিনি, মা আরও
পাবে ভেবে। তাই বোঝাতেও পারিনি যে, কোথাও কেউ য
নিয়ে কোনও খারাপ কথা না বলে, মায়ের সম্মানে এতটুকু
যাতে না লাগে, সেটা ভেবেই আমি যা করার তা করছিলাম
মানুষ কী অথবা কতদূর করতে পারে? অর্ধেক সময়েই সে
নিয়তির হাতের পুতুল। কিন্তু কিছু না করেও থাকতে পারে
অন্য কাউকে বিরক্ত করবে না বলে যে-মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ত
নিজের অস্তিত্বই যখন বিরক্ত করে তাকে, তখন?
বয়স হলেও চেহারায় জোয়ান ছিল সান্যালজেঠু। দেখলে ে
না পঁয়ষট্টি পেরিয়েছে। বহুদিন যাবৎ জেঠিমা ওরকম শয্যা
আলমোড়া না হৃষীকেশ, কোথায় একটা বেড়াতে গিয়ে ঘো
পড়ে গিয়ে সেই যে বিছানা নিয়েছেন, উঠতে পারেননি আর
জেঠুর ভিতরেও তো একটা ঘোড়া থাকতে পারে। সেও হয়
চায়, লাফাতে চায়। না পেরে অসহ্য যন্ত্রণায় ভোগে। তার ক
কোনওদিন ভাবিনি তো। সেই বয়সে ভাবার বা বোঝার ম
তৈরি হয়নি। তখনকার সামাজিক পরিস্থিতিও ওই বোধ তৈ
সপক্ষে ছিল না।
কিন্তু সমাজের বাইরে একটা ঘর থাকে। আর ঘরের ভিতরে
ঘর। আমার জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার আগের দিন রাতে আ
সেই ভিতর-ঘরের সন্ধান পাই। মায়ের জ্বর বলে, জেঠু রাতে
একগ্লাস হালকা গরম দুধ খেত সেটা হাতে করে আমিই গি
ওঁর ঘরে। জেঠুর নির্দেশ ছিল, দরজায় নক করে ঢোকার, বি
দু'তিনবার ধাক্কা দিয়েও কোনও আওয়াজ না পাওয়ায় দরজ
ভিতরে ঢুকি আর দেখি ভিসিআরে একটা সিনেমা চলছে ে
একজন পুরুষ আর মহিলা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ওইসব করছে,
আমি স্কুলে শুনেছিলাম।
বিছানায় শুয়ে জেঠু সেই দৃশ্য দেখছে, কিন্তু দেখছে কি আ
চোখ দুটো গোল হয়ে বেরিয়ে আসছে যেন, আর মুখ দিয়ে
বেরোচ্ছে জেঠুর। পাজামার সেই জায়গাটাই ভেজা, যে-জা
আমারও ভিজে থাকে অনেকদিন সকালে। লোকটা মরে যা
ভেবে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে চোখ ফে
পারছিলাম না টিভি থেকে। ওই প্রবল দৃশ্যের সামনে শত
আগামী মৃত্যুও তুচ্ছ। অন্তত সেই সময়ের আমার কাছে। এ
ভাবলে অপরাধবোধে মনটা ভরে ওঠে, কিন্তু তখন নড়তে
টিভির সামনে থেকে। বহুক্ষণ আমি নীচে না নামায় মা'ই উ
এসেছিল উপরে। মাকে দেখে খানিকটা সম্বিত ফিরে পেয়ে
আমি। জেঠুর দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারায় বোঝাতে চেয়ে
জেঠু ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।
"কতক্ষণ ধরে এরকম করছে? তুই আগেই নীচে নেমে ডাক
ডাকতে যাসনি কেন?" মা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল আমার দিকে
আমি কোনও উত্তর দিতে না পেরে, আমতা আমতা করতে
লাগলাম।
মা আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই টিভিটার দিকে একবা
চোখটা সরিয়ে নিল। তারপর জেঠুর দিকে এগিয়ে গেল। জে
মাথাটা কাত হয়ে ছিল। মা একটা চাদর এনে জেঠুর গায়ে দি
টিভিটা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, "নতুন একটা পাজা
যা তুই আমায়। তারপর চেম্বারে গিয়ে পলাশ ডাক্তারকে ে
ও অনেক রাত অবধি রুগী দেখে। আর এখানে যা দেখলি
যেন সারাজীবন শুধু তোর আর আমার মধ্যেই থাকে। অন্য
না জানে। মনে রাখিস এই মানুষটার সম্মান অনেক দামি।
থাকলে..."

আমি বলে উঠলাম, "কিন্তু জেঠু..."
মা আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, "মানুষ ভগবান নয়।"
জানি না মা কীভাবে সেদিন পরিষ্কার করে দিয়েছিল সান্যালজেঠুকে। কিন্তু ডাক্তার নিয়ে এসে একদম ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা জেঠুকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম।
ডাক্তারের অবশ্য দেখাই সার হল। আধঘণ্টার ভিতর হাসপাতালে নিয়ে গেলেও জেঠু ওই সেরিব্রাল অ্যাটাকের ধাক্কা সামলাতে পারল না। পনেরো বছরের উপর বিছানায় পড়ে থাকা বউ বেঁচে রইল আর স্বামী পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল। আমার জয়েন্ট দেওয়া হল না বলাই বাহুল্য। দিলেও অবশ্য বিশেষ কিছু হত না। মাথার মধ্যে জেঠুর ভিজে পাজামা আর চুল্লির জ্বলন্ত আগুন জায়গা বদল করে খেলছিল।
তারপর অনেকদিন আমার মনে প্রবল রাগ ছিল সান্যালজেঠুর উপর। কেন ওরকম আচমকা লোকটা মারা গেল? যৌন উত্তেজনার জন্য? বেশি বয়সে ওই ক্ষরণের ধাক্কা শরীর নিতে পারল না, তাই? মা না বললেও আমি সেই রাতের কথা কাউকেই বলতাম না কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে গুমরোচ্ছিলাম, তার কী করা? কী দরকার ছিল জেঠুর ওই সিনেমা দেখার? কিংবা ওই সিনেমাটা হয়তো উপলক্ষ মাত্র। জেঠুর শরীরের সব কলকব্জা নড়ে গিয়েছিল। আচ্ছা ওরকম একটা উদার, মহানুভব লোক, সে কেন ওই ছবি দেখছিল? আমার মনের মধ্যেই উত্তরটা তৈরি হচ্ছিল। যেভাবে মানুষের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। মহানুভব মানুষ বলেই তো কাউকে বিরক্ত করেনি। কারও দিকে হাত বাড়ায়নি। নিজেকে নিয়ে নিজে থাকত। একা একা নিজের বেগ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা উপায় ভেবেছিল। তাহলে মানুষ কি এই বেগের অধীন প্রাকৃতিকভাবেই? সান্যালজেঠু আমাকে প্রায়ই বলতেন, "ভেবো না তুমি একটা খারাপ লোকের ঔরসজাত বলে তোমার মধ্যেও তার চরিত্রই থাকবে। তুমি তোমার নিজের মতো হতেই পারো।"
আচ্ছা, ঔরসজাত বলে লোকে, বীর্যজাত বলে না কেন? দুটোর মধ্যে তফাত কী? বীর্যশালী বললে তো বীরত্বের একটা ধারণা আসে, ঔরসের মধ্যে কেবলই ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে চাওয়া শুক্রাণুর তেজ। তবু বীর্যপাতই হয়, ঔরসপাত নয়। তার গায়ে কোথায় যেন একটা ওজন, একটা গাম্ভীর্য। আর বীর্য কেবলই এক তরল, যাকে উত্তেজনার মুহূর্তে ধরে রাখা যায় না, বয়ে যেতে দিতে হয়। সেখানে কোনও কর্তব্য নেই, কেবলই নিবৃত্তি।
জেঠুর শরীর সেই নিবৃত্তিতে মাখামাখি হয়ে ছিল। মা কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে, তাকে ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছিল। যেভাবে নার্স একজন রুগিকে মুক্তি দেয়, মেয়ে একজন বাবাকে দেয়, মা ছেলেকে দেয়। আমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় চোখ জলে ভরে এল।
আবার হয়তো বস্তিতে গিয়েই উঠতে হত। কিন্তু জেঠুর ছেলে আমেরিকা থেকে আসার দিন দুয়েকের মাথায় আমাদের জানাল যে, জেঠু আমাকে নিজের একটা এলআইসি পলিসির নমিনি করে গেছে। আমি প্রায় আড়াই লাখ টাকা পাব। শরীরের শুধুমাত্র ক্রিয়া। কাজ তো করে যায় মন। জেঠুর ওই একটা কাজ আমার মনে ওঁকে আবার সেই ঈশ্বরের জায়গায় তুলে দিল, যেখানে উনি ছিলেন। একটা বৃদ্ধাশ্রমে জেঠিমার বিশেষ ব্যবস্থা করে জেঠুর ছেলে ফিরে গেল আমেরিকায়। বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল প্রোমোটারের কাছে। সে আমাদের মাস ছয়েক থাকতে দিল। কিন্তু সেই বাড়ি থেকে মা'কে নিয়ে আর বস্তিতে ফিরে যাব না একথাটা ভাবার সময় ভেবে দেখিনি যে, জায়গাটা নিঃসম্বল লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। ওই একটা এলআইসি-
পেলেও নয়।
গড়িয়া আর সোনারপুরের মাঝামাঝি গড়ে ওঠা এক নতুন
একটা বাড়ির একতলার দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে এলাম
সান্যালজেঠুর বাড়ির তুলনায় নরক, আবার পঞ্চাননতলা
তুলনায় স্বর্গ জায়গাটা। দুনিয়ায় সবকিছুর সঙ্গেই দ্রুত মানি
হয়, এই শিক্ষা অল্পবয়সেই হয়ে যাচ্ছিল আমার।
সেই বাড়িতে ওঠার পরে মা আবার নতুন করে কাজ ধরল
ওই টাকায় চলবে কী করে? কাছাকাছি রেলের অফিসারদে
কলেজের অধ্যাপকদের দুটো বড় বড় আবাসন তৈরি হয়ে
কাজের অভাব হয়নি মায়ের। আর এখানে কাজ পাওয়া যা
ভরসাতেই মা আমাকে নাইট কলেজে পড়তে দিল না কিছু
আমি ডে কলেজেই ভর্তি হলাম। জয়েন্ট না দিতে পারার অ
মনের মধ্যে নিয়েই কলেজ যেতে থাকলাম। টিউশনিও শুর
করেছিলাম কয়েকটা। দু'তিনটে বছর এভাবেই কাটল। মা
ভাঙছিল। বাড়তি মুশকিল হল, জেঠুর বাড়িতে থাকার সম
আমাকে নিয়ে বিরাট সব স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল মা। হ

> যে মানুষটা বাড়ি ফিরে আমাকে জিজ্ঞেস করত পড়াশোনা করেছি কি না, সেই মানুষটা আমার এবং মায়ের সম্বন্ধে, একেবারে উদাসীন হয়ে গেল।



জেঠুর কথা শুনে শুনেই। দুর্ভাগ্য
কথা বাদই দিলাম, যার বাবার সে
দোকান আর স্বামীর ছিল বাজারে
একটা স্টেশনারি, তার এত বৃহৎ
ভেবে কোনও কূলকিনারা পেতাম
জিজ্ঞেস করলে মা জবাবও দিত
করে। খালি বলত যে, খুব ভাল ব
আমায়।
আমি চেষ্টা করছিলাম। আমার ম
সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুত হ
মায়ের মুখের ওই এমএসসি, পি
ঘোরে তলিয়ে না গিয়ে চুপচাপ
দিচ্ছিলাম, পার্ট ওয়ান কমপ্লিট হ
পর থেকেই। এমএসসি-তে ভর্তি
আগেই একটা বেশ নামী কেন্দ্রীয়
আন্ডারটেকিং যখন ইন্টারভিউয়ে
আমি গেলাম। কিন্তু ইন্টারভিউতে
হওয়ার খবর পেয়ে যখন আনন্দে
ভেসে যাওয়ার অবস্থা, তখনই ম
ওই বড় স্বপ্নগুলো তাড়া করতে শু
করল। মাথার ভিতর একটা পোকা নড়ে নড়ে বলতে লাগল
মাস্টার্স, পিএইচডি, গবেষণার কথা। চাকরিটা পাওয়ার প
পাশাপাশি যে-প্রবল দ্বিধা জন্ম নিয়েছিল, তা নিয়ে মায়ের
আলোচনাও করতে পারছিলাম না। কথা তুলতে গেলেই
এখন শুধু পড়াশোনা কর' বলে, দাবড়ে চুপ করিয়ে দেবে
জানি না কী করতাম, কিন্তু প্রায় পাঁচবছর পরে আমাদের
একসঙ্গে সিনেমা দেখার একটা পরিকল্পনাই আমাকে নিয়ে
নেওয়াল। মা কামাই করতে চাইছিল না বলে ঠিক করেছিল
বিকেলে যে-বাড়িতে রান্না করতে যায় মা সেখানেই সন্ধে
পৌঁছে যাব। সেইমতো ওই বাড়িটার সামনে গিয়ে কড়া না
একটা বাচ্চা মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। সেই মেয়েটার
বাড়ির রান্নাঘর অবধি চলে এসে আমি হতবাক হয়ে দেখল
আমার মা'কে যাচ্ছেতাই ভাষায় অপমান করছেন একটু
চেহারার এক মহিলা।
মায়ের বোধহয় হাতটা একটু কাঁপছিল। রুটিগুলো গোল হ
আর সেই মহিলা বলছিলেন, "পারো না তো নাচতে নামে

রুটি দেখে লোকে টাকা দেবে? কাজ করার মুরোদ নেই, কাজ করতে এসেছে।"

মা নীরবে শুনছিল। কিচ্ছুটি না বলে।

সেদিন আমরা সিনেমা যাব বলে, একটা ভালো শাড়ি পরে গিয়েছিল মা। তাই নিয়েও ব্যঙ্গ করছিলেন সেই মহিলা।

"আবার সেজেগুজে এসেছ, চকচকে শাড়ি পরে। তা সেজেগুজে রং মেখে রাস্তায় দাঁড়ালেই পারো। রুটি করতে আসার কী দরকার?"

মা শিউরে উঠে তাকাল মহিলার দিকে। আর তাকাতেই ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে চোখে পড়ল। মহিলা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে ওঁর চোখে পড়েনি আমি।

আমাকে দেখেই মায়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তুই'?

শব্দটা শুনেই ভদ্রমহিলা আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, "কী ব্যাপার? গৃহস্থ বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে এসেছ একেবারে?"

"আমি আমার মাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"মা কাজ করছে। তুমি রাস্তায় গিয়ে অপেক্ষা করো।"

"আপনি মাকে কী বলছিলেন এগুলো?"

"যা বলছিলাম ঠিকই বলছিলাম। এমনি তো রাখিনি, মাইনে দিয়ে রেখেছি।"

"মাইনে দিয়ে কী রেখেছেন? ক্রীতদাসী?"

"একদম বড় বড় কথা বলবে না। ঝিয়ের ছেলে ঝিয়ের ছেলের মতো থাকবে।"

"একটা ঠাটিয়ে চড় মারব, কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে।" আমি চিৎকার করে উঠলাম।

আমার নিজেকে খুব অচেনা লাগছিল। মা ছুটে এসে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে চুপ করাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু আমি মাথা ঠান্ডা রাখতে পারছিলাম না। ঘর থেকে, তারপর ওই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সামনের ক্লাবে বসে থাকা ছেলেগুলোকে বললাম, কী ভাষায় মা'কে অপমান করা হচ্ছিল।

"লোকের বাড়িতে রান্না করে বলে কি মানুষটার একদিন একটা সিনেমা দেখতে যাবার অধিকার নেই? একটা ভাল শাড়ি পরার এক্তিয়ার নেই?" আমি ছেলেগুলোর কাছে বার্স্ট করলাম।

ছেলেগুলো 'মাসিমা-মাসিমা' করে পাগল হয়ে উঠল। তারপর দল বেঁধে ওই বাড়িতে চড়াও হয়ে, বাড়ির মহিলাকে বাধ্য করল মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে।

"তুই যা করলি তারপর আমি আর ওই বাড়িতে কাজ করতে যেতে পারব কোনওদিন?" মা রাতের বেলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল।

আমি মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে বললাম, "যেতে হবে না। আর কোথাও কোনও বাড়িতে রান্না করতে যেতে হবে না কখনও। আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরিতে জয়েন করছি। অনেক মাস্টার্স, অনেক পিএইচডি হয়েছে। যার মা'কে আলতু ফালতু লোক অপমান করার সুযোগ পায়, তার এইসব মানায় না।"

সেদিন বোধহয় পূর্ণিমা। বাইরে চাঁদটা একটা গোল থালার মতো জ্বলজ্বল করছিল। রূপোর থালা। কিন্তু রূপোর রং তো সাদা। রূপো কি এরকম ঘিয়ে রঙের হয়? এ যেন পরোটার মতো অনেকটা। মা'কে কথাটা বলতেই মা বলে উঠল, "পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।" জানলা দিয়ে চাঁদটার দিকে তাকিয়ে।

"তুমি জানো এই কবিতা?"

"জানব না কেন? সুকান্তর লেখা। ছোটবেলায় স্কুলে থাকতে শুনেছি তো।" আমাকে সামান্য অবাক করে দিয়ে মা বলল।

আমি মায়ের মুখের দিকে তাকালাম। একসময় ওই চাঁদের মতোই ছিল ওই মুখটাও। কিন্তু এখন দুঃখে, কষ্টে, পরিশ্রমে লাবণ্যটা পুড়ে গিয়েছে। ওই মুখটা দেখতে দেখতেই আকাশের চাঁদটার দিকে

তুলনা হয় না। খুব গরিবের কাছেও নয়। ঝলসানো রুটি তার
জায়গায়। তাকে তৈরি করে তুলতে হয়। চাঁদটা চাঁদের জায়গা
তাকে তৈরি করে তোলা যায় না।

মনে হচ্ছিল, আমাকে এমনই একটা জোছনার পৃথিবীতে মা
গিয়ে দাঁড়াতে হবে, জোছনা আসে এমন একটা ঘরে মাকে র
হবে যেখানে রুটি পুড়ে গেলে আর কেউ দোষারোপ করতে
না। রাস্তায় রং মেখে দাঁড়াতে বলতে পারবে না। আমি পূর্ণিম
থেকে রুটিকে, অকথ্য অপমান থেকে আমার মাকে, একটা
থাকা যন্ত্রণার ইতিহাস থেকে আমাদের জীবনকে আলাদা ক
সিদ্ধান্ত নিলাম।

নিজের সবচেয়ে ভাল শার্টটা গায়ে দিয়ে, অফিসে গিয়ে দেখা
করলাম। পরদিন।

ভুলে গিয়েছিলাম সমস্ত কিছু। ঝুমার কথায় আবার পুরনো ব
মনে পড়ে গেল। যে-চড়টা ওই ভদ্রমহিলার গালে সেদিন মা
ছিল সেই চড়টা ঝুমাকে মেরে দিয়েছি। তাই পুরো গল্পটা শে
জড়িয়ে ধরলাম ওকে। কেবল প্রায়শ্চিত্ত নয়, প্রেমেও, ওর
মুখে, গালে, ঠোঁটে দশটা-কুড়িটা পঞ্চাশটা চুমু খেলাম।

ঝুমা আমার হাত দুটো ধরে বলল, "তুমি আমাকে ক্ষমা করে

"ক্ষমা তো তোমার কাছে আমায় চাইতে হবে।"

"ক্ষমা চাওয়ার মতো তুমি কিছু করোনি। আমি করেছি। আ
পারিনি তোমার হাত ধরার সময়, তুমি অনেক উঁচু দরের মা

"না ঝুমা, আমি উঁচু কিংবা মহৎ কিচ্ছু নই। আমি একটা মানু
ভিতরে অনেক ক্ষত আছে। হঠাৎ করে হাত লেগে গেলে ব্যা
কোত্থেকে যে রক্ত বেরোয়, কোত্থেকে যে কান্না, কিছুই বুঝতে
না।" বলতে বলতে গলা বুজে গেল আমার।

ঝুমা নিজের রুমালটা বের করে আমার চোখ দুটো মুছিয়ে দি
আমি রুমালটার মধ্যে একটা সেন্টের গন্ধ পেলাম। কোনও এ
সস্তা সেন্ট, ঝুমা দিয়েছে হয়তো।

ঝুমার হাত লেগেছিল বলেই ওই রুমালের মসৃণতা পৃথিবীর
নরম রুটির মসৃণতাকে ছাপিয়ে গেল। ওই সেন্টের গন্ধ আমা
থেকে খিদের গন্ধ মুছে দিয়ে ভালবাসার গন্ধকে জাগিয়ে তুল

৬

"এমন কোনও ব্যাপার আছে যেটাতে তুমি বলতে পারো যে
বউয়ের মতো আর কেউ এটা করতে পারবে না?" ঝুমা জি
করেছিল একদিন।

আমি তৎক্ষণাৎ কিছু খুঁজে না পেয়ে বলেছিলাম, "আগে তে
হও। তারপর ভেবে বলছি।"

ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা এড়িয়ে যাওয়া আছে, ঝুমা হয়তে
বুঝেছিল। বলেছিল, "তুমি বলতে চাইলে না। আসলে আমা
কোনও গুণই নেই।"

ব্যাপারটা তা নয়। অনেক গুণ ছিল ঝুমার। সবচেয়ে বড় গুণ
নিজেকে বিলীন করে দিতে পারত আমার সুখে, আমার সুবি
আমি অফিসে বেরোব, আমি ট্যুরে যাচ্ছি, আমার জামাটা দ
আমার সোয়েটারটা পাওয়া যাচ্ছে না, আমার মোজাটা কোথ
কিছুতে ঝুমাই ভরসা হয়ে উঠল। আমি ছোটবেলা থেকেই স্ব
তবু ঝুমা আমাকে সেই কমফর্টটা দেওয়ার চেষ্টা করত যে ক
যুগ যুগ ধরে পুরুষ তার নারীর কাছ থেকে পেয়ে এসেছে। ত
একসময় নারী বিদ্রোহ করেছে। সে পুরুষের সেবাদাসী হয়ে
চায়নি জীবনভর। কেনই বা থাকবে?

আমি অনেক অফিস পার্টিতে দেখেছি একজনের বউ আর এ
বউকে বলছে, "সকালে যে মাসি এসে রান্না করে, সে পার

টাকা কে দেবে?"

আমার কলিগ গৌতমদা বলত, নিজের সংসারে খাটনির জন্য টাকা দিতে হবে? তাহলে সেই মহিলার স্বামী সংসারে ফিরবে কেন? কেন সে অন্য কোথাও চলে যাবে না যেখানে টাকা দিলেই ফুর্তি করা যায়?

এখন এসব কথা বলতে গেলে 'অ্যান্টি ফেমিনিস্ট' বলে দাগিয়ে দেয় এলিটরা। কিন্তু মুশকিল হল মুখে যে বিরাট সমানাধিকারে বিশ্বাসী, বাস্তবে সেই লোকটাও চায় কেউ তাকে একটু যত্ন করুক।

আমাকে অবশ্য এসব দোটানায় পড়তে হয়নি কারণ বিয়ের পর থেকেই আমি অনুভব করতাম যে, ঝুমার জগৎ জুড়ে আমিই আছি। বিয়ের দিন সাতেকের মধ্যেই ঝুমা এমন নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে নিল সবটা, যেন ও এই বাড়িতে সাতজন্ম ধরে আছে। নতুন একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলাম। তাও যেটা নেওয়ার ইচ্ছে ছিল ঝুমা নিতে দেয়নি সেটা। ওর ওই এক যুক্তি, খরচ বাড়ানোর দরকার নেই।

আমি ইচ্ছে করে ওর কাছে তর্কে হেরে যেতাম। যে ভালবাসে তার কাছে হারতেও ভাল লাগে তো।

আমাদের বিয়ের পরপরই মায়ের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হল। পড়ে গিয়ে ফিমার বোন ভাঙল। সেই সময়টা দু'তিন মাস ঝুমা যা করল, মায়ের নিজের মেয়ে থাকলেও বোধহয় করত না। কিংবা কে জানে, মা হয়তো নিজের মেয়েকেই ফিরে পেয়েছিল ঝুমার মধ্যে। মাঝেমধ্যে আমি অবাক হয়ে যেতাম। ঝুমা আমাকে ভালবেসেছে, বিয়ে করেছে, কিন্তু আমার মায়ের উপর ওর এত কনসার্ন কোত্থেকে এল? প্রতিনিয়ত কী অপরিসীম নিষ্ঠায় মা'কে খাওয়াত, স্নান করাত, বেডপ্যান দিত ঝুমা, ভাবা যায় না। আমি অনেক বললেও আয়া রাখতে দেয়নি আমাকে। বলেছিল ওই টাকাটা জমিয়ে রাখতে, পরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাবে।

বেড়াতে আর যাব কী? তখন আমার নিজের বাড়িটাই সবচেয়ে বড় টুরিস্ট স্পট আমার কাছে। যেখানে ঝুমার মতো একজন আশ্চর্য মানুষকে আমি প্রতিদিন আবিষ্কার করছি।

একদিন রাতে শুভাঞ্জনাকে স্বপ্নে দেখলাম। দেখলাম শুভাঞ্জনা তর্জনী তুলে খুব শাসাচ্ছে। কিন্তু কেন তা বুঝলাম না। স্বপ্নটা সাইলেন্ট মোডে ছিল।

ঝুমাকে স্বপ্নটার কথা বলতেই ঝুমা মুচকি হেসে বলল, আমি তো তোমার চাষাভুষো বৌ। আমাকে কি তোমার কোনওদিনই ভাল লেগেছে? মন রাখতে আদর করো আমি জানি। আসলে ভালবাসো ওই ওদেরই। তাই স্বপ্নে আমি আসি না, ওরা আসে।

আমি আদরের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিয়ে ঝুমাকে আমার শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে লাগলাম, যেভাবে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে নামতে থাকা একটা ট্রাকের চাকা ঢেলাগুলোকে গুঁড়ো করতে করতে মাটিতে মিশিয়ে দিতে থাকে। মনে হল ঝুমা সেই চাষি যাকে ল্যাবরেটরির বিকারে চোখ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরীক্ষা করে বলতে হয় না কোথায় কী ফসল হবে। ঝুমা আমার মনের মাটিটাকে মুঠোয় তুলে নিয়ে বলে দিতে পারে, কোথায় ডাল হবে, কোথায় আলু হবে। ভালবাসার ভিতরে যে-ক্ষরণ থাকে তা শুধু শারীরিক নয়, আত্মিকও। ঝুমার আর আমার প্রবল সঙ্গমের মধ্যে কখনও কখনও আমার চোখের জল ঝুমার মুখের ওপর গিয়ে পড়ত। আশ্লেষ আর প্রেম একাকার হয়ে যেত মিলেমিশে।

৭

আমাদের বিয়ে খুব সাধারণভাবে হয়েছিল, অল্প কিছু লোককে নেমন্তন্ন করে। বউভাতের দুপুরের একটা দৃশ্য এখনও আমার মনে আছে। সব জায়গাতেই কিছু কুচুটে লোক থাকে। তাদেরই একজন

ছিল। মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেও শাঁখা-সিঁদুর পরাটা ছাড়
পারেনি। ওটা কোথাও একটা মায়ের অভ্যেস হয়ে গিয়েছি
দু'একবার ছাড়াতে চাইলেও জোর করিনি কোনও। করিনি
করিনি। নিজেদের জীবন নিজেদের মতো করে বেঁচেছি আম
যে সেজমামা ওই প্রশ্ন তুলে একটু ঘেঁটে দিতে চাইছিল পরি
যখন আমরা বস্তিতে থাকতাম সে তখন দেখাও করত না
সঙ্গে, টাকা দিতে হবে এই ভয়ে। আমি উত্তেজিত হয়ে কিছু
ফেলতাম হয়তো, কিন্তু ঝুমা কী চমৎকার হ্যান্ডল করল ব্য

ঝুমা বলল, "আমি তো বিয়ে করছি আপনাদের ছেলেটাকে
আমার শ্বশুর মশাই বিয়েতে এসেছেন নাকি হরিদ্বারে বেড়া
গিয়েছেন, তা নিয়ে আমি কী করব বলুন।"

নতুন বউয়ের মুখ থেকে ওরকম একটি সপাট জবাব পেয়ে
অনেকেরই আক্কেল গুড়ুম। যাদের সামান্য জলঘোলা করার
ছিল মনে, সব পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা ঝুমাকে আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম,
অমন চমৎকার কায়দায় থামিয়ে দিলে সেজমামাদের?"

ঝুমা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তো
কথা বলি।"

ঝুমার উত্তরটা তারপর কতদিন যে আমার কানে বেজেছে
নেই। ঝুমা যেন সেই আখগাছের মতো যে নিজের দৃঢ়তাকে
মিষ্টতাকে চেনে না। আর ওর ওই আপনভোলা ব্যাপারটাই
সবচেয়ে বেশি টানত। তাই বলে বুদ্ধি কম ছিল না ঝুমার।
বৌদি সেইসময় প্রায়ই আমাদের ফ্ল্যাটে আসত। ঝুমাদের
বাড়িটা ভেঙে ফ্ল্যাট হচ্ছিল। ঝুমার দাদা শৌভিক আর বৌদি
ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনুরোধ করত যাতে ঝুমা নিজের ভাগটা
ঝুমা একদিন আমার সামনেই ওদের বলল, "তোরা অনর্থক
করছিস। আমি আমার বাবার বাড়ির ভাগ ছাড়ব না। ফ্ল্যাট
আমাকেও সমান ভাগ দিতে হবে।"

গজগজ করতে করতে ঝুমার দাদা আর বউদি বেরিয়ে গেল
আত্মীয়স্বজন মহলে চশমখোর বলে সুনাম রটতে লাগল ঝু
"এরকমভাবে বলার কোনও দরকার ছিল? ওদের তো দুটো
বেশি জায়গা লাগতেই পারে।"

"আমাদেরও দু'টো হতে পারে।" ঝুমা খুব ক্যাজুয়ালি উত্তর

আমাদের হানিমুন সেভাবে হয়নি। বিয়ের পরেই মায়ের
অ্যাকসিডেন্টের জন্য ভাবারও সময় পাইনি ওই নিয়ে। প্রা
অ্যানিভার্সারির আগে আমরা দু'জনে একসঙ্গে বেড়াতে যা
সুযোগ পেলাম। ঝুমা নিজের এক বিধবা পিসিকে ম্যানেজ
মায়ের কাছে রেখে গেল ক'দিনের জন্য, যাতে আমাদের ম
আকাশে দুশ্চিন্তার কোনও মেঘ উড়ে আসতে না পারে।

আমরা গিয়েছিলাম ভাইজ্যাগে, যেখানে সমুদ্র পাহাড়ের গা
ধাক্কা মারে। ওখানে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল ওই পাহা
দাম্পত্য আর ভালবাসা সমুদ্র। ক্রমাগত ধাক্কায় পাহাড়টা
থাকে। কিন্তু সমুদ্র যদি চুপ হয়ে যায় তাহলে পাহাড়টার থা
কোনও মানে থাকে না। ওই নিশ্চল পাহাড়, সচল সমুদ্রের
নিজের মানে খুঁজে পায়।

একটা খুব অনাড়ম্বর ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছিল তখন ওই
শহরটায়। সম্ভবত পর্যটকদের জন্যই। আমরা ঘুরতে ঘুরতে
গিয়ে একটা জাপানি সিনেমা দেখতে ঢুকে পড়লাম একদিন
সিনেমাটায় মা অন্ধ। আর অন্ধ বলেই মা চাইছে মেয়েও বি
একটা অন্ধ ছেলেকে। কারণ চোখ আছে এরকম পুরুষকে
পারত না মা। মায়ের মন রাখতেই মেয়ে একটা অন্ধ ছেলে
করে। সেই ছেলেটা একদিন মেয়েটাকে ছেড়ে চলে যায়। তা
মাকে ভাল রাখতে গণিকাবৃত্তিতে নাম লেখায় মেয়ে। কিন্তু

কেবলমাত্র অন্ধ মানুষের থেকে নেওয়া পয়সাতেই অন্ধ মায়ের সেবা করবে মেয়ে।
অদ্ভুত সিনেমা। অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম যত দেখছিলাম। ঘরে ফেরার পথে মনে হচ্ছিল আমিও তো অন্ধ। স্মৃতিতে অন্ধ, ক্ষোভে অন্ধ, হিংসায় অন্ধ, ঝুমার প্রতি ভালবাসাতেও অন্ধ। প্রত্যেকটা মানুষই হয়তো তাই। যে যার নিজের মতো অন্ধতা ভিতরে নিয়ে চোখ খুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
কলেজের ক্লাসে টিকেসি বলতেন, আমাদের ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয় যেহেতু আমাদের জিনগুলো পুনরাবৃত্ত হয়। জিনের অভ্যন্তরেই তো সব রহস্য। যার ঠাকুরদা ডাকাত, সেও ডাকাত হয়। নিজের ইচ্ছেয় নয়, জিনের প্রতাপে।
কথাটা মনে পড়ল। তাহলে কি এই প্রবহমান জিন আমার ভিতর দিয়েও আমার বাবাকে কথা বলাবে?
কেমন একটা ঠান্ডা ভয়ের স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। ঘরে ফেরার পরও ভয়টা লেপ্টে রইল আমার সঙ্গে। ভয়টাকে সরিয়ে দেব বলেই ঝুমাকে কাছে টানলাম।
হোটেলের ঘরের ওই মায়াবী আলোয় ঝুমাকে অন্যরকম লাগছিল। ঘিঞ্জি গলির ভাড়াবাড়ির ছাদ থেকে আকাশের তারাকে যেরকম লাগে, সমুদ্রের ধারে শুয়ে তাকে তো সেরকম লাগে না!
ঝুমা একটা স্লিভলেস নাইটি পরেছিল। এতদিন তো শুধু খুলেছি, আজ মনে হল উন্মোচন করি। পুরনো ঝুমাকে নতুন করে পাই। ওই একটু লম্বাটে মুখ, টিকলো নাক, টানা টানা চোখ, একটু পাতলা ঠোঁট, ঝুমা শুধু আমার ভরসার জায়গা নয়, আমার আকর্ষণেরও কেন্দ্রবিন্দু। আমি মুখটা নামিয়ে এনে ওর বুকের বৃন্তে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। এক এক করে দুটো বৃন্ততেই আমার জিভ, আমার ঠোঁট, আমার দাঁতের স্পর্শে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলাম। ঝুমা অস্ফুটে কী একটা বলল। আমি বুঝতে না পেরে বললাম, "কী বলছ?"
"আমাকে একটা ছোট তুমি দাও।"
"এক্ষুনি? এত তাড়াতাড়ি?"
ঝুমা যেন লজ্জা পেয়ে গেল। মুখটা গুঁজে দিল আমার বুকে।
চাইছিল কি ঝুমা একা? আমিও তো চাইছিলাম, বাবা হতে। যে-বাবাকে আমি দেখেছি সেরকম বাবা নয়। যে-বাবা সন্তানকে আঁকড়ে থাকে, পথ দেখায়, মানুষ করে, তেমন কোনও বাবা হতে। যাতে 'বাবা' বললেই মনের মধ্যে খুশির বুদবুদ ওঠে।
আমি ঝুমার ভিতরে নিজের সবটা দিতে দিতে, সেই সন্তানের কল্পনা কেবল নয়, সেই বাবার কল্পনা করতে লাগলাম, যে এই পৃথিবীর আশ্রয়।
প্রাণীজগতে বাবার ভূমিকা তো খুব বেশি নয়। মা কুকুর নিজের সন্তানকে পালন করে কিন্তু বাবা ঘেউ ঘেউ করে তাকে দেখলেই। হুলো বেড়াল তার নিজের বাচ্চাকে খেতে যায়। প্রাণীজগতে মানুষ ছাড়া আর সবার শুধু মায়ের সঙ্গেই সম্পর্ক। কিন্তু প্রত্যেকেই তো পিতার ঔরসজাত। প্রত্যেকেরই তো পিতৃদত্ত প্রাণ। তবু পিতার সঙ্গে সম্পর্ক না কুকুরের, না বেড়ালের, না সিংহের, না বাঘের। পিতার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু মানুষের। পিতার হৃদয় দিয়ে কি কেবলমাত্র মানুষকেই পাঠিয়েছেন ঈশ্বর?
ঘামের সঙ্গে ঘাম, লালার সঙ্গে লালা, আকর্ষণের সঙ্গে আকর্ষণ মিশে গেলেও প্রশ্নগুলো জেগে রইল শজারুর কাঁটার মতো। আমরা সেই পৃথিবীতে থাকি যেটা কেবল প্রশ্নের মালায় ঘেরা, যেখানে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। অনেক প্রশ্ন ভিতরে নিয়েই এক একটা মুহূর্ত সমুদ্রের ফসফরাসের মতো জ্বলে ওঠে।
হানিমুন থেকে ফিরে আসার পর ঝুমা ওর বাপের বাড়িতে থাকতে গেল কয়েকদিন। মুখে যাই বলুক, শেষমেশ ফ্ল্যাটটা ওর দাদার তুলনায় ছোট নিয়েছিল বলে ওর খাতিরও বেড়েছিল সেখানে। কিন্তু নাকি শরীর ভাল লাগছে না।
কেন শরীর ভাল লাগছে না? কেন?
উত্তরহীনতার এই জগতে একটা ছোট্ট উত্তর আমার চোখ
দিল কয়েকদিন পর। ঝুমা প্রেগন্যান্ট। আমি বাবা হতে চ

৮

অনেকটা উল্লাস এসে মানুষকে স্থবির করে দেয়। সে রসে
পড়ে যাওয়া মাছির মতো হাঁকপাঁক করতে থাকে। আমার
প্রাথমিকভাবে সেই অভিজ্ঞতাই হল। আমি তো জন্মের ভি
যাইনি জীবনে। বোনের জন্ম আমার মনে পড়ে না। কিন্তু
মৃত্যু, জেঠুর মৃত্যু, এরকম অনেক মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেতে
আবারও সূর্য উঠবে এই বোধটা আমার গুলিয়ে গিয়েছিল
প্রত্যেকদিন কান পাততাম ঝুমার পেটে। বুঝতে চেষ্টা করা
কেউ আসছে, আমাদের মধ্যে আসছে। আমারই ঔরসজা
সে একটা ধারা। সে প্রথম কবে এসেছিল, জানি না। এই
কি ছিলাম আমি, নাকি হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে আমার পু
কোথাও থেকে এসেছিল? এখানে এসে নতুন একটা সভ্য
তুলেছিল। তার ভিতরে কত কত জটিলতা, কতরকম বৈপ
সব মিলিয়ে টলমল করতে করতে দেশটা চলছে। ঠিক যে
মধ্যে ওই বাচ্চাটা। মা যা খাচ্ছে তার থেকেই খাচ্ছে; নিজে
জানে না, ভবিষ্যৎ জানে না তবু এক বিপুল ভরসায় ক্রম
হয়ে উঠছে, মায়ের গর্ভে।
ঝুমা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করত, এটা ছিল
বড় দোষ। মা এই নিয়ে ওকে খুব বকাঝকা করত। শুধু ব
করেই শান্ত হত না, ঝুমাকে সকাল-বিকেল যখনই পারত
দুধ, কখনও ফল খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত।
ঝুমা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠত, "উফ খাইয়ে মেরে
আমাকে, এই রাক্ষসটার জন্য।"
আমি কখনও শুনলে বলতাম, "না খেলে পরে রাক্ষস দে
কী করে?"
ঝুমার মাসতুতো দিদি সুধা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন
সময়টা। ভদ্রমহিলা প্রায় দিন পনেরো থেকে গেলেন। প
আবার পনেরো দিন থাকবেন বলে গেলেন। অসম্ভব কষ্টে
এই সুধাদির। ঝুমার মেসোমশাইয়ের ক্যানসার হয়েছিল
মাসি একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষিকার কাজ নিয়ে, মেয়ে
করে তুলেছিলেন। সুধাদির বিয়ে হয় জামশেদপুরে। একটি
কিন্তু সেই মেয়েটি সাতদিনের জ্বরে মারা যায়। তারপর ছে
সুধাদির। কিন্তু সেই ছেলেটাকে ভ্যাক্সিনেশনের সময় হাস
কোন অপদার্থ কম্পাউন্ডার একটা ডেট পেরিয়ে যাওয়া ভ
ইনজেকশন পুশ করে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়
"মামলা করোনি? খুনের মামলা? ওর তো ফাঁসিতে ঝোল
ঝুমা উত্তেজিত হয়ে উঠত।
আমি বুঝতে পারতাম ঝুমার পক্ষে উত্তেজনাটা এই সময়ে
কিন্তু আমি নিজেই তো উত্তেজিত হয়ে যেতাম সুধাদির ক
সামনে। কেঁপে কেঁপে উঠতাম। একটা ছোট বাচ্চা, তাকে
দেওয়ার আগে ডেটটা পরীক্ষা করবে না? এই আমার দেশ
সুধাদি খুব শান্তভাবে বলেছিল, "ওই লোকটা ওখানে কা
পয়সা দিয়ে, ইংরেজি অক্ষর বা সংখ্যার সঙ্গে কোনও পরি
না তার। ভ্যাকসিনের গায়ে কবেকার তারিখ, সে দেখেও
আগে দেখতে যে হয় তাই জানত না।"
আমি চুপ করে ভাবতাম, এরকম ইতর, অশিক্ষিত বসে
ভারতবর্ষের জায়গায় জায়গায়। ডেট পেরিয়ে যাওয়া ভ্যা

ঘুষ খেয়ে, প্রত্যেকে দায়ী সুধাদির ছেলের খুনের জন্য। কিন্তু শাস্তি পাবে কে?

কেউ না। হাসি-আনন্দে যাদের জীবন চলছে, তারা পাত্তাও দেবে না ঘটনাটাকে। কিন্তু সুধাদির জীবনটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে আর সেই ধ্বংসস্তুপই থাকবে। পরপর দুই সন্তানের মৃত্যুর পর, সুধাদির বর সুধাদিকে ছেড়ে আবার একটা বিয়ে করেছে। তার একটা ছেলেও হয়েছে এই নতুন বিয়ে থেকে।

"পুরুষের ভালবাসা অনেক আলগা তো। বেদনাটা নিতে পারে না," সুধাদি বলত।

আমি ভাবতাম, কেবলমাত্র নারীই তার গর্ভস্থ ভ্রূণের যন্ত্রণা বা সুখের সঙ্গে আজীবন সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়? এ যেন এক দুর্ভেদ্য নিয়ম। কিন্তু আমাকে অন্যরকম হতেই হবে। এমন একজন বাবা হতে হবে যার সঙ্গে সন্তানের নিবিড়তম যোগাযোগ গড়ে উঠবে, যে একইসঙ্গে বাবা এবং মা দুটোই হতে পারবে। পৃথিবীতে পুরুষের বিরুদ্ধে ওঠা যত অভিযোগ, অবহেলার-স্বার্থপরতার-নিষ্ঠুরতার, সবকিছুকে কোথাও একটা মিথ্যে প্রমাণ করতে হবে।

"সবটা পারবে না, এত এত কাণ্ড করে রেখেছে পুরুষজাতি। তুমি একা যতই ভাল হও, সবটা খারাপ মোছার সাধ্য তোমার নেই," ঝুমা হেসে উঠত।

সেই হাসির ভিতর থেকে সত্যিটা এসে পিন ফোটাত আমার সর্বাঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে কুটিলতা, জটিলতা, হিংসে, পরস্পরকে সহ্য করতে না পারা, এমন কত দোষের কথা বলে থাকে লোকে। কিন্তু কখনও তো পৃথিবীর ইতিহাসে এমন হয়নি যে, একসঙ্গে এক হাজার মেয়ে বেরিয়েছে অন্য মেয়েদের বাড়িতে আগুন দেবে বলে। লাখ লাখ মানুষকে খুন করার কৃতিত্ব সবসময়ই পুরুষের, শহরের পর শহর, হাতি-ঘোড়ার পা কিংবা ট্যাঙ্কের চাকার নীচে গুঁড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব পুরুষেরই; লাইব্রেরি পোড়ানো, তলোয়ারের কোপে মানুষের মাথা নামিয়ে দেওয়ার গৌরব, পুরুষ ভিন্ন আর কেউ নিতেই পারবে না। আচ্ছা, কী করে এই নৃশংসতার উত্তরাধিকার পুরুষ একাই পেল? একই ঔরস থেকে তো জন্ম পুরুষ এবং নারীর। মায়ের পেটেও দেওয়াল তোলা থাকে না কোথাও। এক্স+এক্স কিংবা এক্স+ওয়াই কম্বিনেশন যাই হোক, 'এক্স' তো থাকছে দু'জনের মধ্যেই। গায়েগতরে খুনে তাহলে পুরুষ একাই হয়ে উঠল কেন?

"গৌতম বুদ্ধ কি পুরুষ নন? রামকৃষ্ণ পরমহংস পুরুষ নন? চৈতন্যদেব পুরুষ ছিলেন না?" ঝুমা আমার ভাবনার কথা শুনতে শুনতে বলত।

"নিশ্চয়ই পুরুষ। কিন্তু এই লক্ষ বছরের ব্যাপ্ত হিংসার যে-ইতিহাস, সেখানে তাঁদের রিচ কতটুকু, কতজন শুনেছে তাঁদের কথা? বিদ্বেষবিষ নাশ করতে কতজন এগিয়ে এসেছে? ভালবেসেছে কতজন? হিংসাই তো চালিকাশক্তি, প্রায় প্রত্যেকের।"

বলতে বলতে থেমে গেলাম আমি। 'প্রায় প্রত্যেকের' মধ্যে আমিও তো আছি। নিজের বাবার প্রতি বিদ্বেষ আমাকেও দিনের পর দিন দৌড় করিয়ে বেরিয়েছে। আজ আমি খুব গদগদ প্রেমিক হয়ে উঠলেই আমার সেই আগের ইতিহাস চাপা তো পড়ে না। জেগেই থাকে। জেগে থাকে বলেই বোধহয় হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে, মা যখন ওই লোকটা বেঁচে আছে না মরে গেছে জানতে চাইল, আমি কেঁপে গেলাম পুরো। সেই তুমুল বৃষ্টির রাতটা আমার ভিতরে কোত্থেকে যেন জাগ্রত হল আবার। আমি তাড়াতাড়ি তাকে মাথা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় মাকে অন্য কথা বলতে শুরু করলাম। মায়ের বিড়বিড়ানির মধ্যে তবু দু'তিনবার ফিরে এল সেই লোকটা, যাকে ক্লিনিক্যালি বাবা বলতে আমি বাধ্য।

৯

অফিস থেকে ফেরার পথে ঝুমার ডাক্তারের কাছে একাই গিয়েছিলাম একদিন। দু-একটা সিম্পটমের কথা বলে সতর্ক যেগুলো থেকে পরে কমপ্লিকেশন দেখা দিতে পারে। তারপ ভর্তির ডেট এবং কত কী খরচ হতে পারে তাই নিয়ে কথা হ ডাক্তারবাবুর নিজেরই নার্সিংহোম, তবু আমি এক পয়সাও অনুরোধ না করে যে-বার্তা দিয়ে এলাম তা হল, দশ-কুড়ি টাকা বেশি বিল হলে হোক কিন্তু ঝুমা যেন একেবারে রানি মা হতে পারে।

ঝুমা সঙ্গে থাকলে এই কথাগুলো বলা সম্ভব হত না। ও আ পাশে বসে পেটে চিমটি কাটত, কনুই দিয়ে ঠেলা দিত, পা দিত, চাই কি জিভ থেকে একটু থুতু বের করে আঙুল দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত আমার ঘাড়ে, গলায়, যাতে চুপ করে ঝুমার পোক্তাই মত হল, কাউকে কখনও 'টাকার কথা ভাব না' বলতে নেই। বললেই নাকি সে দিনে ডাকাতি আরম্ভ ক দেবে। ওকে কে বোঝাবে যে, নিজের সবকিছু দিয়েও এক- উদ্বেগহীন হতে চায় মানুষ।

ফিরতি পথে ট্যাক্সির জানলা দিয়েই রাস্তায় শুভাঞ্জনাকে দে চেহারা বেশ খানিকটা ভেঙে গেছে। বাসের অপেক্ষাতেই স দাঁড়িয়ে আছে।

বাসের অপেক্ষায়? শুভাঞ্জনা? বিয়ে হয়ে গেছে এমন একটা কানাঘুষো শুনেছিলাম যে অফিসে! ওর জামাইবাবু অবশ্য অনেকদিন আসেননি অফিসে, তাই শুভাঞ্জনার প্রত্যক্ষ সংব পাওয়া হয়ে ওঠেনি আর। কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা সৌজন্য সামান্য একটু অপরাধবোধ থেকে আমি ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নি শুভাঞ্জনার কাছে।

বেশি কিছু অনুরোধ-উপরোধ করতে হল না। আমি ডাক পর আমার দিকে তাকিয়ে দশ সেকেন্ড মতো চুপ করে রইল শুভাঞ্জনা। তারপর উঠে এল ট্যাক্সিতে।

"অনেকদিন আপনার জামাইবাবুর দেখা পাইনি তাই..."

"জামাইবাবুর স্ট্রোক হয়েছিল, বাঁদিকটা প্যারালাইজ়ড। জা কতদিন এভাবে পড়ে পড়ে কষ্ট পাবে।"

"কী বলছেন? অফিসে কিছু শুনিনি তো।"

"আমার জামাইবাবু আপনাদের অফিসে নিজের কোম্পানি বিক্রি করতেন। একজন মাল সাপ্লায়ার বেঁচে আছে কি মরে সেটা অফিসারদের খেয়াল রাখা সম্ভব নয়।"

'অফিসারদের' শব্দটা একটু ঠেস দিয়ে উচ্চারণ করল বলেই আমি আলটপকা বলে ফেললাম, "কিন্তু আপনার বিয়ের খ পেয়েছিলাম যে?"

"মেয়েদের ব্যাপারে একটু ইন্টারেস্ট বেশি থাকে লোকের। করে, আমি তখন গান-ফান গাইতাম।"

শুভাঞ্জনার মুখে, 'গান-ফান' শুনে আমি রীতিমতো ধাক্কা

"চুপ করে কী ভাবছেন? এখন আর গাই কি না? না, গাই ন বিয়েটাও টিকল না। টিকবে না জেনেই করেছিলাম অবশ্য, তারপর ডিভোর্স-টিভোর্সের এত ঝামেলা পোয়াতে হল যে হাওয়ার মতো উড়ে গেছে লাইফ থেকে।"

"বিয়েটা টিকল না কেন?"

"আমেরিকায় হয়নি বলে।" হেসে উঠল শুভাঞ্জনা।

আমিও সেই হাসিতে যোগ দিয়ে ফেললাম, বোকার মতোই

"আপনি বিয়ে করেছেন?"

"আজ্ঞে।"

"কাকে করলেন? সেই যাকে দিয়ে ফোন করিয়েছিলেন তা মিথ্যে বলতে ইচ্ছেই করল না, "হ্যাঁ তাকেই। তবে সে সো বেশ্যা নয়।"

আসলে কেউ আমায় ঠকাচ্ছে, এটাও মেনে নিতে পারি না একদম।"

"আমি অন্তত ঠকাইনি। আর ফোনটা আমি করাইওনি। হ্যাঁ, আমার কাছ থেকে ফোন নম্বরটা নিয়ে একরকম জোর করেই ঝুমা ফোনটা করেছিল আপনাকে..."

"আর ওই চিত্রনাট্যটা কার লেখা ছিল?"

"বাদ দিন না, এতদিন পরে দেখা হল, ওইসব আলোচনা করে লাভ আছে কিছু?"

"অবশ্যই আছে। কারণ আমার জীবনের অনেকগুলো ভুল ডিসিশনের পিছনে ওই ফোনটার একটা ভূমিকা আছে। তাই আমার জানা দরকার..."

"না, চিত্রনাট্য আমার লেখা নয়।"

"আপনার এখনকার স্ত্রী-ই মুখে মুখে তৈরি করেছিল ওটা? এত বুদ্ধি? বিশ্বাস করতে পারলাম না ঠিক।"

রাগ চড়ে গেল আমার মাথায়, "অবিশ্বাস করতেই পারেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে আপনার ভণ্ডামি এক্সপোজ় না করলে, ঝুমার পক্ষে আমার অ্যাটেনশন পাওয়া সম্ভব ছিল না কারণ, আমি একদম ডুবে ছিলাম আপনার চিন্তায়।"

"এখন আর একেবারেই ভাবেন না আমার কথা, তাই না?"

এই প্রশ্নটার জন্য তৈরি ছিলাম না বলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না।

"ভালই করেন না ভেবে। আর আমার সঙ্গে যে বিয়ে হয়নি আপনার, সেও একরকম ভালই হয়েছে। সম্ভব নয়, কারওর পক্ষেই আমার সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়।"

"কেন এইসব বলছেন?"

"আসলে কী জানেন, রূপ নয়, গুণ নয়, টাকা নয়, আমরা যারা শিল্পী তারা শিল্পটাকে খুব ভালবাসি। আপনি দেখবেন, অনেক বড় বড় শিল্পী আছে যাদের বউ বা সঙ্গিনী খুব খারাপ দেখতে একটা মেয়ে। উলটোটাও হয়, অসামান্যা অভিনেত্রী কিন্তু বিয়ে করেছে একটা কুৎসিত দেখতে লোককে। কেন করে বলুন তো?"

"শিল্পী নই তো। কীভাবে বলব?"

"আমিই বলছি। শিল্পটার প্রতি ভালবাসা মানুষের প্রতি ভালবাসার থেকে অনেক বেশি বলে, শিল্পীরা সেই লোকটাকে খোঁজে যে তার শিল্পের জন্য পাগল। সেই মানুষটাকে জীবনে পেলে শিল্পীর ভাল লাগে। একজন গায়িকা তাই তাকেই চায় যে তার গান শুনে দরদর করে কাঁদবে। যে লোকটা সেই গায়িকাকে জাপটে ধরে থেকে তিন বাচ্চার মা করে দিতে চাইবে, তাকে জীবনে নিয়ে মরবে নাকি?"

"শিল্পীর সঙ্গে থাকতে গেলে দর্শক হিসেবে থাকতে হবে তবে?"

"তা তো কিছুটা থাকতেই হবে। শিল্পের জন্য শিল্পীকে স্পেস দিতে হবে না?"

আমি আর একটু সরে বসলাম। ভাগ্যে অনেক আগে থেকেই অনেক 'স্পেস' দিয়েছি শুভাঞ্জনাকে।

"তা আপনার বউ হঠাৎ করে আমার কথা জানল কী করে?"

"আপনার ওই বিছানায় মৃত প্রেমিকের শার্ট-প্যান্ট রেখে দেওয়ার ব্যাপারটা এত হন্ট করত যে, বলে ফেলেছিলাম। তখন অবশ্য ওকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবনাও ছিল না। শুনতে শুনতে আমার স্ত্রীর মনে হয় ব্যাপারটার মধ্যে অনেক ফাঁকিবাজি আছে।"

"গোদা লোকেদের পক্ষে যে কোনও কল্পনাই একরকম ফাঁকি।"

শুভাঞ্জনা রেগে গিয়েছে বুঝতে পারলাম।

হালকা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল বলে রাস্তার পিচগুলো আরও কালো দেখাচ্ছিল। শুভাঞ্জনাকে কোথায় নামালে সুবিধে জেনে নিয়ে আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে ছিলাম।

"আপনার গোদা বউকে নিয়ে আপনি খুশি? অবশ্য আপনিও তো গোদাই।" শুভাঞ্জনা আমার দিকে না তাকিয়ে বলল।

"খুশি না হয়ে উপায় আছে? নতুন গোদা-র জন্ম হতে চলেছে তো।"

এবার শুভাঞ্জনাও যোগ দিল হাসিতে। মানুষ তো ঘৃণা বেশি
বহন করতে পারে না। ঘৃণার ভিতরেও কোথাও একটা ভাল
ফল্গুস্রোত বইতে থাকে। আমাকে আমার অফিসেরই এক দি
বলেছিল একবার, ওথেলো আর ডেসডিমোনাকে যদি স্বর্গে
নিয়ে গিয়ে পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া হত, ওথেলো আবার
করতে যেত না। ডেসডিমোনাও অভিযোগ জানাত না কোন
নিজেদের ভালবাসাটাকেই রোমন্থন করত। কারণ যেখানে ভ
নেই, সেখানে ঘৃণাই বা কতক্ষণ থাকতে পারে?

শুভাঞ্জনাকে ওর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বললাম, "গান
ছাড়বেন না। ভাল থাকবেন।"

"আপনিও ভাল থাকবেন। নতুন মানুষের জন্য আগাম শুভে
জানিয়ে গেলাম। কে জানে, আপনার স্ত্রী হতাম যদি তাহলে
ডিভোর্সের দিকে যেত না ব্যাপারটা।" বলেই আর পিছনে ন
এগিয়ে গেল।

আমার ইচ্ছে হল ওর পিছন পিছন ওই বাড়িতে গিয়ে দেখি
সেই শার্টগুলো বিছানার উপর রাখা আছে নাকি! হতে পারে
ওর ভড়ং, হতে পারে ভড়ং নয়। যে-সাধু ছাই মেখে 'মরা ম
বলতে বলতে 'রাম' বলেছিল সেও তো নিজেকে একটা উচ্চ
তুলে নিতে চাইছিল। মানুষ নিজের দৈনন্দিন চাল-ডাল-তেল
সাবানের বাইরের একটা চেহারা যদি পৃথিবীকে দেখাতে চায়
মধ্যে খুব কি অন্যায় আছে? শুভাঞ্জনা হয়তো ওর যাপনের
মাটির চার আঙুল উপর দিয়ে চালাতে চায়। পারুক, না পার
চেষ্টায় দোষ কী?

ভাবতে ভাবতে ঝুমার কাছে ফিরলাম। আর ঠিক দু'দিন পরে
হওয়ার আগে আগে অসহ্য ব্যথা শুরু হল ঝুমার। মৃত্যু যেম
ফলস অ্যালার্ম দিয়ে যায় তেমনই জীবনও। কিন্তু ঝুমার ব্যথ
দেখে মা এবং সুধাদি দু'জনই নিশ্চিত হয়ে গেল যে, এ ব্যথা
মক্কেলের পৃথিবীতে আসার নোটিস।

তখনও অ্যাম্বুল্যান্স এত হুট বলতে ছুট পাওয়া যেত না। আ
বাইরে বেরিয়ে অনেক কসরত করে একটা ট্যাক্সি যোগাড় ক
ডবল ভাড়া দিতে রাজি হয়ে গিয়ে। সুধাদি ততক্ষণে ঝুমাকে
পাঁজাকোলা করে দোতলা থেকে একতলায় নামিয়ে এনেছে
"ভাগ্যিস আপনি গতকাল এলেন।" আমি ট্যাক্সিতে ঝুমাকে
পারার পর ওর মাথাটা কোলে টেনে নেওয়া সুধাদিকে এই এ
কথাই বলতে পারলাম।

"আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল, দু-একদিনের মধ্যেই ঝুমা
পেন হবে।"

"কিন্তু ডেট তো প্রায় তিন সপ্তাহ পরে।"

"সে তো ডাক্তারের দেওয়া ডেট ভাই। বাচ্চা তো ভগবানের
ডেটে আসবে, তাই না?"

আমি চুপ করে গেলাম। নিজের দু'দুটো সদ্যোজাত বাচ্চাকে
পরও যে মানুষটা ভগবানে ভরসা করছে তার কথার উত্তরে
যায়?

একটা কিংবা অনেকগুলো আশ্চর্য কারণে বাংলার ডাক্তাররা
ছাড়া নর্মাল ডেলিভারি করানো ছেড়ে দিয়েছেন। গত পনের
বছর ধরেই হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোমে শতকরা পঁচানব
ডেলিভারি সিজারিয়ান। প্রশ্ন করলেই, হাজার 'নেই'-এর খ
বেড নেই, ব্যবস্থা নেই, সর্বোপরি, সময় নেই। কিন্তু ধরে নি
যে, সব পেশেন্টেরই প্রচুর টাকা আছে। এবার টাকার 'ফ্লো'
নিয়ন্ত্রণ করে বলে, কাঁচি ছাড়া জন্ম প্রায় নিষিদ্ধ এখানে। বি
প্রায় সবার 'নর্মাল' হয় কী করে প্রশ্ন করলে শুনতে হবে, এ
বিদেশ? এখানে বারোঘণ্টা লেবার পেনের সুপারভাইজ়রি ক
কোন ডাক্তার? ততক্ষণে আরও চারটে ডেলিভারি হয়ে যাবে

নিচুমানের কাঁচামাল দিয়ে নির্মাণ করে না ইঞ্জিনিয়াররা? বাস থামিয়ে ঘুষ নেয় না পুলিশ? ক্লাসে না দিয়ে কোচিংয়ে আসল নোটসগুলো দেয় না শিক্ষক-অধ্যাপকরা? কে কাকে সততা নিয়ে প্রশ্ন করবে? কার হিম্মত আছে?

তবু তার মধ্যেও অনেক ডাক্তার রয়েছেন যাঁরা সুযোগ পেলে নর্মাল ডেলিভারিই করাতেন, কিন্তু আমাদের 'সিস্টেম' সেই সুযোগটা দেয় না তাঁদের। আর সেই সিস্টেমের ভিতর ঢুকে বাঁচতে হলে কারই বা অন্যরকম কিছু করার থাকে?

দুপুর একটা চল্লিশ নাগাদ অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার আর আমার ছেলে হওয়ার খবরটা যেন দুটো ঠোঁট হাওয়াকে



প্রশ্নটা আমার ভিতরে একটা গহ্বর খুঁড়ে ফেলল সহসা। সেই ঘটনা-দুর্ঘটনা পেরিয়ে আদৌ কি বেঁচে রয়েছে লোকটা? কিন্তু মরার খবরও তো পাইনি।

বলল, হাওয়া জলকে বলল, জল গিয়ে বলল নৌকাকে, যে যাত্রা শুরু করার আগে থমকে ছিল।

এটা অস্বীকার করব না ঝুমা কনসিভ করার মুহূর্ত থেকেই আমি মনে মনে মেয়ে চাইতাম। ঝুমার প্রবল বাসনা ছিল, ছেলে হবে, তাই মুখে কিছু বলতাম না। কিন্তু আজ আমার সন্তান জন্ম নিয়েছে খবরটা পেয়ে, ওইসব ইচ্ছে-টিচ্ছে কোথায় তলিয়ে গেল। মনে হল, যে এসেছে সেই আমার সাত রাজার ধন এক মানিক। তা নইলে তাকে দূর থেকে দেখেই এরকম শিরশির করে উঠছে কেন সর্বশরীর?

একজন সিস্টার আর একজনকে জিজ্ঞেস করছিলেন, বাচ্চা কেঁদেছে কি না। মা নিজে তো নিজের বাচ্চাকে কাঁদাতে পারে না, চাপড় মেরে কাঁদানোর কাজটা একজন নার্সকেই করতে হয়।

সুধাদি আমার পাশেই ছিলেন। আধো অচেতন ঝুমার পাশে ওই রক্তমাংসের পুঁটুলিটাকে একদৃষ্টে বেশ খানিকক্ষণ দেখে বলে উঠলেন, "তোমার ছেলের চোখের মণি নীল। এ কোন নীলকর সাহেব এল বলো তো?"

পাশে দাঁড়িয়ে হাসছি, তিনি নিজের দুই সন্তানকে হারিয়েছে পরক্ষণেই মনে হল, সেই মৃত্যুগুলোর জন্য আমি তো দায়ী কোনওভাবে। নিজের আনন্দের মুহূর্তে অন্যের যন্ত্রণা স্মরণ গোমড়া মুখে বসে থাকতে পারে কে?

নার্সিংহোম থেকে রাস্তায় বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। মাথার ভিতর একটা ঘণ্টি বেজে উঠল যে, এবার ছেলের জ সাধের বস্তুটিকে ছাড়তে হবে। অন্তত ঘরে তো বটেই। তবু দু'টান দিয়ে সেই জাপানি সিনেমাটার কথা মনে পড়ে গেল, অন্ধ মায়ের সেবার পয়সা যোগাতে মেয়ের কাছে অন্ধ সব এসেছে। সেই মুহূর্তে ঘৃণা-ভালবাসা সব তুচ্ছ করে অন্ধ বা আমায় গ্রাস করল। আমি চোখ বুজেও কালো দেখতে পেল চোখের পরদায়। নীল। সবটাই নীল।

১০

'নীলাদ্রি' 'নীলাকাশ' 'নিলয়' ভাবতে ভাবতে শেষ অবধি ছেলের নাম হল, নীলাভ্র। আমি আর একটু খোঁজার পক্ষপা ছিলাম, কিন্তু ঝুমার এই নামটাই পছন্দ হয়ে যাওয়ায় রাজি গেলাম। অন্যরকম বাবা হওয়ার যে প্রতিশ্রুতি নিজেই নিজে দিয়েছিলাম, নাম রাখার ব্যাপারে ঝুমার মতামতকে প্রাধান্য সেটারই প্রথম ধাপ। ডাকনাম অনেকগুলো উঠে এসেছিল, মধ্যে মুখে মুখে সবচেয়ে বেশি ঘুরতে লাগল, কুটুস।

পরিবর্তন যেটা হল সেটা এই যে, ছেলেকে নিয়ে ঘরে ফেরা থেকেই ছেলে ছাড়া জগৎসংসার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেল কুটুসের জন্মের পর প্রায় দু'মাস আমাদের সঙ্গেই ছিলেন সু থাকায় বিরাট সুবিধা হয়েছিল আমাদের, কিন্তু ওঁরও তো নি ঘরবাড়ি আছে। তবু আমার অনুরোধে হয়তো আরও কিছুদি উনি থেকে যেতেন। কিন্তু সব হারানোর অভিজ্ঞতায় সুধাদি পেরেছিলেন ছেলের উপর প্রবল অধিকারবোধ থেকে ঝুমা শিগগির ওঁকেও ভুল বুঝবে। যখনই কুটুসের ব্যাপারে ঝুমা একটা সিদ্ধান্তকে মানতে পারবেন না উনি, তখনই ঝুমার ম নিজের বাচ্চারা মারা গিয়েছে বলে ঝুমাদি জ্যান্ত বাচ্চার মা প্রতি ঈর্ষাকাতর।

"বাচ্চা তো আরও অনেকেরই হয়। কিন্তু সবাই তো ঝুমার রাগী হয়ে যায় না। কুটুস জন্মানোর পর থেকেই ঝুমার ভিত রাগ এল কোত্থেকে?" একটা ছুটির দিনে আমি সুধাদিকে জি করেছিলাম।

ঝুমা ধারেকাছে নেই, নিশ্চিত হয়ে সুধাদি জবাব দিলেন, "য কাউকে ভীষণ ভালবাসতে শুরু করি আমরা, সেই সময় তা সমস্ত অ্যাটেনশনটা গিয়ে পড়ে। আর তখন তার সঙ্গে সম্প নিবিড়তার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু উৎপত্তি হলেই সেটার উপর প্রচণ্ড রাগ জন্মায়। অতএব রা সবসময় খারাপ কিছু তা নয়। ভালবাসা থেকেও রাগ হয়। আমার দেশটাকে ভালবাসি, এবার সেই দেশটাকে কেউ ধ্ব করতে চাইছে আমার তখন রাগ হবে না? সত্যিকারের প্রে প্রেমিকা অধিকাংশ সময় মিষ্টি নয়, একটু বদরাগীও বটে। অভিঘাতটাই রাগ হয়ে ফুটে বেরোয়।"

"কিন্তু আমরা তো আর কুটুসকে ধ্বংস বা নষ্ট করতে চাইছি কেউ।" আমি হতাশ গলায় বললাম।

সুধাদি উত্তরে কিছু একটা বলতেন হয়তো। কিন্তু ঝুমা ততক্ষ সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সুধাদি, ঝুমার প্রতি অসম্ভব স্নেহে চুপ করে গেলেও, সবাই

ঝুমাকে নিয়ে যে-অফিস পার্টিটায় গিয়েছিলাম, সেখানেই কাজিয়া বাধল তাই।
আমার কোলিগ কৌশিকের বউ প্রেরণা একরকম অপমানই করল ঝুমাকে, "এরকম প্যানিক করছ কেন? আমারও তো বাচ্চারা ছোট ছিল। আর আমার সময় নির্দিষ্ট করা ছিল তখন যে, দিনে ওই তিনবারই তারা খাবে। যখনই বাচ্চা চিৎকার করল তখনই ছুটে গেলাম লোকজনের মধ্যে ব্লাউজ খুলে দুধ খাওয়াতে, দেখলেই অসহ্য লাগে আমার। আমি তো আমার বাচ্চাদের একবছর হয়ে গেলেই আলাদা শোওয়ার ব্যবস্থা করেছি।"
"বাচ্চা কি কলের পুতুল যে, তার খাওয়াটা কোথাও কোনও সুপার কম্পিউটারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে?" ঝুমা আগুন চোখে তাকাল প্রেরণার দিকে।
"আরে বাবা, বাচ্চার মা নিজেই তো একটা সুপার কম্পিউটার। সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না? আমার বাচ্চারাও কেঁদেছে, কিন্তু কাঁদতে-কাঁদতে সাতদিন পরে বুঝে গেছে কেঁদেকেটে কোনও লাভ হবে না। যখন পাওয়ার তখনই পাবে। এটা আসলে নির্ভর করে মায়ের উপর। মা'কে প্রথম থেকেই শিক্ষাটা দিতে হয়। বাচ্চা যদি বুঝে যায় সে কাঁদলে পরেই তাকে কোলে নিয়ে আদর করা হবে, তাহলে মুশকিল।"
"মুশকিল হলে আমার মুশকিল। তুমি দুশ্চিন্তা করছ কেন? আমার বাচ্চাকে আমি এভাবেই মানুষ করব। আমার, ইন ফ্যাক্ট, এত যৌন খিদে নেই যে, বাচ্চা জন্মানোর ছ'মাসের মধ্যে তাকে আলাদা বিছানায় শুইয়ে রেখে কপোত আর কপোতী মিলে একসঙ্গে শুতে হবে," ঝুমা বার্স্ট করল।
কথাটা যেন আগুন ধরিয়ে দিল ঘরটায়।
প্রেরণা চিৎকার করে উঠল, "যৌন খিদে মানে? তোমার এতবড় স্পর্ধা যে, আমাকে অপমান করছ তুমি? তোমার বাচ্চাটা কীভাবে তোমার পেটে এসেছে শুনি? চয়নের সাথে কিছু করতে হয়নি তোমায়? নাকি, বাচ্চা দেওয়ার অন্য লোক ছিল?"
প্রেরণার সাথে অফিসেরই এক বসের পরকীয়া নিয়ে বাজার সরগরম ছিল কিছুদিন। সেই গল্প ঝুমাকেও করেছিলাম তখন। ভেবেছিলাম ভুলে গিয়েছে, কিন্তু প্রেরণার বাজে কথার উত্তর দিতে ঝুমা সেই প্রসঙ্গ তুলল।
কৌশিক মদ খেয়ে পুরো আউট বলে ঝগড়ার ভিতরেই ঢুকতে পারেনি; আমি ঝগড়াটা থামাব বলে ঝুমার হাত ধরে টেনে ওকে ওই ঘরটার বাইরে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রেরণা তখনই আবার বোমা ফাটাল।
"ওই বছর বছর বাচ্চা দেবে আর বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে ঝোলা বুক নিয়ে ঘুরবে-ফিরবে। এই হচ্ছে গিয়ে এদের জীবনের অ্যাম্বিশন।"
মরবি তো মর কথাটা সেই ঝুমার কানেই গেল। ঝুমা আবারও চিৎকার করে উঠল, "বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে বুক ঝুলে গেলে আমার কোনও প্রবলেম নেই। আমার বুক তো হেরিটেজ সাইট নয় যে, অনেকে টিকিট কেটে দেখতে আসবে।"
ব্যাপারটা আরও নোংরামির দিকে যাওয়ার আগে আমি একরকম জোর করেই ঝুমা আর কুটুসকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।
রাস্তায় বেরিয়ে ঝুমা কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে-কাঁদতে কুটুসের মুখটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, "বাচ্চা যখন চাইবে তখনই তাকে খাওয়ানো একজন মায়ের অপরাধ? বুক যাতে না ঝুলে যায় সেটা দেখাই কি একটা মেয়ের প্রাথমিক কর্তব্য? ওরা ওগুলো কী বলছিল?"
"বাদ দাও না, অত ধরতে নেই।" আমি ভাড়া করা গাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে বললাম।
"আমি তো ধরতে চাইনি। আমি তো আমার ছেলেকে নিয়ে দারুণ

আমি ঝুমার অভিযোগের মুখে চুপ করে গেলাম। জলপ্রপা
উচ্ছ্বাস যুক্তি দিয়ে থামানো যায় না। ঝুমার ভিতরে আবেগে
সুনামি, তার সামনে দাঁড়াবে এমন সাধ্য কার?
ঝুমার কাছে কুটুস যেন এভারেস্টের চূড়া। কিংবা মধ্যরাতে
বাকি পৃথিবীর কাছে তো নয়। যে পৃথিবীতে রাস্তায়, ফুটপা
নীচে, বস্তিতে, শরণার্থী শিবিরে প্রতিদিন অসংখ্য বাচ্চা জ
বেড়ে উঠছে, ভ্যাকসিন পাচ্ছে বা পাচ্ছে না, বেবি ফুড খাচ
মাটিতে বসে নিজের বিষ্ঠা নিজেই খুঁটছে সেই পৃথিবীতে এ
বাচ্চার জন্ম নিয়ে কেউ ভাবিত নয়। কুটুস আমাদের কোহি
পারে কিন্তু অন্যের কাছে সে কী? তারা ওকে নিয়ে ব্যস্ত হ
কিন্তু ঝুমা তো আমার কাছে স্ট্যাটিস্টিক্সের ক্লাস করতে চা
মা হওয়ার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি চাইছিল। আমি ওকে জড়িয়ে ধ
থেকে বুঝছিলাম, কীভাবে মাতৃত্ব পালটে দেয় একটা মেয়ে
হয়তো সেটাই স্বাভাবিক। বাথরুমে, বিছানায়, প্যান্টে, পাজ
যা ঝরে পড়ে, নষ্ট হয়, তাকেই ভিতরে নিয়ে নিজের শ্বাস-
রক্ত-মাংস দিয়ে লালন করে একটা মেয়ে। দিনের পর দিন
পর মাস।
জন্মের পরও সেই ছোট্ট পুতুলটা মায়ের থেকেই শুষে নেয়
জীবনধারা। সমস্ত মৃত্যুর মধ্যেও সেই ধারা কখনও শুকোয়
পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরও তৃষ্ণার সেই বন্ধন ছেঁড়ে না
বাচ্চাকে নিয়ে যায় মায়ের বুকে।
"প্রেরণা কী বলল না বলল, তাই নিয়ে সত্যিই এত ভাবার
আছে কি? ও কে যে, এত পাত্তা দিচ্ছ?"
"ওকে পাত্তা দিচ্ছি না। ভাবছি পৃথিবীটা কোথায় এসে দাঁড়ি
পাঁচ মাসের ছেলের জন্যেও জবাবদিহি করতে হবে।"
ঝুমার কথার ভিতরেই কুটুস কেঁদে উঠল। ঝুমা অসম্ভব
ক্ষিপ্রতায় কুটুসকে তুলে নিয়ে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরল,
যেভাবে রাতের আকাশ আঁকড়ে ধরে তারাকে। মা আর স
সেই দৃশ্যের সামনে বসে আমার শুভাঞ্জনার কথা মনে পড়
মনে হল, শুভাঞ্জনাকে এই ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করি,
পৃথিবী কিংবা মহাপৃথিবীতে এর চাইতে বড় শিল্প হয়?

১১

মা জবুথবু হয়ে পড়েছিল কিন্তু কুটুস আসার পরে যেন নতু
শক্তি কোত্থেকে এসে ভর করল মায়ের মধ্যে। ছেলেটা কখ
কখন স্নান করবে, কাশি হলে কী ওষুধ, পেটের ব্যথায় কো
মা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। উলটোদিকে ঝুমা, কুটু
প্রতিদিনকার খাবারে কতটা ভিটামিন, কতখানি মিনারেল
চুলচেরা হিসেবে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দু'দিক থেকে দু'জন আম
চিবিয়ে খেতে শুরু করল এমনভাবে যে, মাঝে মাঝে মনে
কী কুক্ষণে বাবা হতে গেলাম!
ঝুমার আর আমার সেক্স-লাইফ বলে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট
না। কখনও দু-চারটে চুমুর পর আর একটু ঘনিষ্ঠতার দিকে
যেতাম না তা নয়, কিন্তু মাঝপথেই কুটুস কেঁদে উঠত কিং
করত অথবা একটা সাইক্লোন-ফাইক্লোন আসত পৃথিবীতে
আমি আর ঝুমা পরস্পরের থেকে অনেকটা দূরত্বে ছিটকে
আবারও।
"আমাদের জীবন এখন আর আমরা চালাই না। আমাদের
চালায়। জানি না কতদিন এভাবে চলবে।" আমি সন্দীপদা
বলেছিলাম।
"এটা এখন থেকে চলতেই থাকবে। সময়টা আর আমরা
দেখেছিলাম, সেরকম নেই, বদলে গেছে পুরোপুরি। এখন

মডেলের গাড়ি, সব বাচ্চারাই ঠিক করে, বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত পরিবারে। সেই কারণে দেখবে এখন সব ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনে, বাচ্চাদের কত বেশি বেশি করে দেখা যায়।"

"কিন্তু তার ফল কি খুব একটা ভাল হয়?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সন্দীপদাকে।

"ফল নিয়ে কে ভাবছে ভায়া! ফুল তুলতে তুলতেই সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যাচ্ছে।" সন্দীপদা জোরে হেসে উঠেছিলেন।

আমাদেরই অফিসের একটা পিকনিকে সন্দীপদার সঙ্গে আলাপ, যদিও সন্দীপদা চাকরি করতেন অন্য একটা সংস্থায়। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যাদের সংস্থা, পদমর্যাদা কিংবা প্রোটোকল দিয়ে বাঁধা যায় না, সন্দীপদা তাদেরই দলে। আলাপ হওয়ার মাসখানেক পরে আমায় একদিন রাস্তা থেকে ডেকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন সন্দীপদা। বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দিয়েছিলেন।

"আপনি বাড়ি না ফিরে কোথায় চললেন এখন?" আমি গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"আমার কি আর বাড়ি ফেরার উপায় আছে ভাই? কল্লোলের বউ কুহু গায়ে কেরোসিন ঢেলে বসে আছে, কল্লোলের উপর রাগ করে। এখন আমাকে মহারানির মেজাজ ঠান্ডা করতে হবে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে। নইলে কখন কী দুর্ঘটনা ঘটে যায়!"

"এরকম কাণ্ড করেছেন সেই ভদ্রমহিলা আপনি জানলেন কী করে?"

"আমাকে ফোন করে জানাল তো। এখন এই নতুন যন্ত্রটি এসেছে না! যখন যাকে চাই, হাতের নাগালে।" সন্দীপদা বুকপকেট থেকে বের করে নিজের মোবাইল ফোনটা দেখালেন।

ক'দিন আগে আমিও একটা ফোন কিনেছি, ঝুমার তাড়নায়। ঝুমা নিজে একটা ফোন কেনার পাশাপাশি আমাকে দিয়েও কিনিয়েছে যাতে দিনে বারোবার আমাকে ফোন করে জানাতে পারে, কুটুস গোলাপি পায়খানা করেছে নাকি সবুজ।

"আপনার কপাল সত্যিই চৌখস সন্দীপদা। বন্ধুর বউ ভেজা গায়ে, সিক্ত বসনে আপনাকে কল করছে। উফ ভাবলেই রোমাঞ্চ হচ্ছে। বাই দ্য ওয়ে, এই ভদ্রমহিলা আপনার প্রেমিকা নাকি?"

"না রে, ভাই। প্রেমিকা হলে কি গায়ে কেরোসিন ঢেলে ডাকে? ময়েশ্চারাইজার মেখে টেখে..."

"কেন, কেরোসিনের গন্ধই বা খারাপ কী? আপনি গাড়ি ঘুরিয়ে যান তাড়াতাড়ি। বেশি দেরি হলে আবার গায়ে ডিজেল, পেট্রোল না ঢেলে নেয়।"

"সেই ভয়েই তো মহুয়াকে যেতে বললাম কুহুর কাছে। মহুয়া একটু ঠান্ডা করুক কুহুকে। আমি পৌঁছচ্ছি তারপর।"

"মহুয়াটা আবার কে? আপনার জীবনে তো দেখছি নারীর ছড়াছড়ি।"

"আরে, মহুয়া তোমার বউদি, আই মিন আমার বউয়ের নাম। ওর সঙ্গে কনসাল্ট না করে পরোপকার করতে যাই না আমি।"

"ধুস! আপনি একদম বোগাস সন্দীপদা। শেষে বউদিকে সঙ্গে নিয়ে অন্য এক অভিমানিনীকে উদ্ধার করতে যাচ্ছেন? কী হবে আপনার দ্বারা?"

"যা হয়েছে, তাই এনাফ। এখন ছেলেটা তোমাদের আশীর্বাদে ঠিকঠাক মানুষ হয়ে গেলেই আমরা বুড়ো-বুড়ি ঝাড়া হাত-পা। তোমার হয়তো মনে হবে যে, আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি কেন? ব্যাপারটা কী জানো? প্রত্যেকটা মানুষই অনেক ক্ষোভ, যন্ত্রণা, রাগ বয়ে বেড়াচ্ছে। আর এই সব সে রিলিজ় করতে চায়। কিন্তু উলটোদিকের মানুষটাকে সে দেখছে কালা হয়ে ঘুরে বেড়াতে। এমনই বদ্ধ কালা যে কোনও কান্না, কোনও আর্তনাদ শুনতে পায় না।"

"আপনি যে শুনতে পান তাতে কষ্ট বাড়ে না আপনার?"

"হয়তো বাড়ে। কিন্তু সেই বাড়াটা তাৎক্ষণিক। যে-মুহূর্তে অন্য কারও একটু কাজে আসি, এমন একটা স্বর্গীয় আনন্দ হয়, বলে বোঝাতে এমন কষ্টকর, গ্লানি ছাড়া আর কিছুই বাড়ে না তাতে।"

মহুয়া বউদি আর ওদের ছেলে বিভাবকে নিয়ে একদিন কুটুস দেখতেও এসেছিলেন সন্দীপদা। ঝুমার 'ছেলে-ছেলে', মায়ে 'নাতি-নাতি' করে আতিশয্য বুঝে নিয়েছিলেন দশ মিনিটে ডিনারের পর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে আমাকে বললেন, "বাচ্চার ছোট থেকে বড় হওয়ার সময়টা হাতের জলের মতো। কখন যে জলটা গলে পড়ে যাবে আঙুলের ফ দিয়ে, তুমি টেরটিও পাবে না। তাই যতদিন জলটা হাতে লে ততদিন এই সামান্য বাড়াবাড়িটুকু এনজয় করো।"

বাড়াবাড়ি অবশ্য প্রকৃতির নিয়মেই কমে যায় একদিন। ঝুমা ক্যানসার ধরা পড়তে যখন ওঁকে নিয়ে আমি মুম্বই গেলাম, কলকাতা থেকে মিনিটে মিনিটে ফোন করত। কিন্তু কলকাত আসার পনেরোদিনের মধ্যে যখন মারা গেলেন আমার শা ব্যাপারটা এত শান্তভাবে অ্যাকসেপ্ট করল যে, অবাক হয়ে আমি নিজে।

"মানুষ একবার 'বডি' হয়ে গেলে আর কিছু করার নেই। য বডি হচ্ছে না, লড়াই ততক্ষণ।" ঝুমা গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে ব আমাকে। ওর দাদা তখন ওদের মায়ের অস্থি ভাসিয়ে দিচ্ছে

সহজভাবে নিতে পারলেই যে একটা মৃত্যুর অভিঘাত কিছু হবে তা নয়। বরং বেশিও হতে পারে। ঝুমার সময়ে-সময়ে যাওয়া, ঘুমের ভিতরে কেঁদে ওঠা আমাকে একটা সংকেত দি আমি সেই সংকেতটাকে মান্যতা দিয়েই দার্জিলিং গেলাম ঝু কুটুসকে নিয়ে। বাড়িতে সবসময়ের কাউকে ঝুমা নিজেই রা কাজের জন্য। ওর বক্তব্য ছিল, বাড়ি হলে তাও হত, কিন্তু এ ফ্ল্যাটে পরিবারের বাইরের কেউ থাকলে প্রাইভেসি বলে কি না আর। কুটুস আসার পর কাজ অনেক বেড়ে গেলেও ঝুমা অবস্থান থেকে নড়েনি।

আমি প্রথম প্রথম খুব তর্ক করতাম ঝুমার সঙ্গে এটা নিয়ে। ঝুমা হঠাৎ একদিন কেঁদে ফেলল, "আমি কি তোমার অফি কী করবে তাই নিয়ে কিছু বলতে যাই? তুমি এই ফ্ল্যাটটুকুর আমার নিয়মই চলতে দাও না!"

লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। রাতে ওর ঘুম ভাঙিয়ে বল "আই অ্যাম সরি। এই ফ্ল্যাটের চৌহদ্দির মধ্যে তুমি যে-নিয় সেই নিয়মই চলবে।"

সকালে এসে সন্ধে অবধি থাকত যে-দু'জন, তাদের ভিতরে একজনকে ঝুমা দায়িত্ব দিয়ে গেল মায়ের দেখভালের। আর পৌঁছনো ইস্তক ফোনে খবর নিত, দিনে তিনবার-চারবার। কুয়াশার জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা যে খুব বেশি দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু ঝুমার ইচ্ছেমতো ম্যালটাকে পাক দিয়ে এ প্রান্ত থেকে হাঁটতাম। খুব হাঁটতে ভালবাসত ঝুমা। ওর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁ হত, পৃথিবীর সব অসুখ, সমস্ত কষ্ট মানুষ যেন হেঁটে হেঁটেই যেতে পারে।

অনেক হাঁটাহাঁটির ভিতরে একদিন বুদ্ধমন্দিরে ধ্যান করতে বসেছিলাম ঘণ্টাখানেক। ধ্যান মানে চোখ বন্ধ করে বসে থা সামনের দিকে তাকানো চোখদুটোকে বন্ধ করে পিছনের প কীভাবে পাড়ি দিয়েছি তার একটা খতিয়ান পাওয়া। কিন্তু ত সময়ের জন্য শান্ত হয়ে বসে থাকতে দিল না কুটুস। লাফাল চিৎকার করে পুরো নরক গুলজার করে তুলল। আশেপাশে যাঁরা ধ্যান করছিলেন, অসুবিধে হচ্ছিল তাঁদের। আমি ওকে বেরিয়ে যাব বলে, হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

"বাচ্চাকে বাচ্চার মতো যা খুশি করতে দাও না। কুটুস কী ব করছে, তাই নিয়ে তুমি এত বদারড হচ্ছ কেন?" ঝুমা জিজ্ঞে

"দ্যাখো ঝুমা, আমাদের বাচ্চার জন্য অন্য দশজনের যদি প্র

জায়গা। এখানে কেউ যদি বাঁদরের মতো নাচে আর শেয়ালের মতো চেঁচায় তাহলে সেটা অন্যায়। এবার অন্যায়টা আমার ছেলে করলেই তো আর সব দোষ স্খালন হয়ে যায় না।"

"তুমি এত ভদ্রলোক, তোমার ছেলের ভিতরে এমন বাঁদরের স্বভাব, শেয়ালের মর্জি কোত্থেকে এল, ভগবান জানে।" ঝুমা ব্যঙ্গ করল নাকি মন থেকে বলল, বুঝতে পারলাম না।

ঝুমার সেই কথাটাই যেন শতগুণ জোরে আমার কাছে ফিরে এল যখন মা একদিন বহু পুরনো একটা সাদা-কালো ছবি আমার মুখের সামনে ধরে বলল, "তোর বাবার বাচ্চা-বয়সের ছবি। ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে খুঁজে পেলাম। কুটুসের সঙ্গে মুখের কী মিল দ্যাখ!"

ষাটবছর আগেকার একেবারে ধূসর হয়ে যাওয়া একটা ছবি। পাটপাট করে চুল আঁচড়ানো একটা বাচ্চার ওই ছবির সঙ্গে সত্যিই কি কোনও মিল আছে আজকের কুটুসের? ছবিতে বাচ্চাটার যা বয়স কুটুসেরও এখন প্রায় তাই, এটা ছাড়া আর তেমন কোনও মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। জায়গায় জায়গায় ছোপ ধরা ওই ছবিটা দেখে বিশেষ কিছু বোঝাই যায় না। তবু ক্রমাগত বলে গেলে গল্পের ঠাকুরমশাইও যেমন মেনে নেন যে, তাঁর কাঁধে ছাগল নয় কুকুর রয়েছে, আমারও তেমনই মনে হতে শুরু করল সত্যিই অনেক মিল, আমাকে জন্ম দেওয়া লোকটার সঙ্গে আমার ছেলের। পিতৃহৃদয় থাকুক না থাকুক, বাবা তো বাবাই। আর আমার

বাবা, আমার ছেলের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হবে না তো কার মধ্যে দিয়ে হবে?

"কে জানে বেঁচে আছে কি না লোকটা? থাকলে কেমন আছে?" মা বিড়বিড় করল।

প্রশ্নটা আমার ভিতরে একটা গহ্বর খুঁড়ে ফেলল সহসা। সেই ঘটনা-দুর্ঘটনা পেরিয়ে আদৌ কি বেঁচে রয়েছে লোকটা? কিন্তু মরার খবরও তো পাইনি। এতদিন পর না বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই প্রবল, কিন্তু বেঁচে যদি থাকে তবে কোথায় আছে?

সেই প্রশ্নের ঠেলায় আমি বহু-বহুদিন পর আমার শৈশবের পাড়ায় ফিরে গেলাম, স্রেফ একটা খবরের জন্য। আছে?

সময় নিজে প্রবলভাবে থাকে বলেই, বাকি সব 'থাকা'গুলো 'নেই' হয়ে যায় পলকে। আমাদের বাড়িটাকেই তাই খুঁজে পেলাম না আর। কিন্তু গেল কোথায়? ওই তো সেই বটগাছটা যার নীচে আমিও ঘুমিয়েছি। একটা বেদি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এখন গাছটাকে ঘিরে। একটু এগোলেই যে জোড়া কৃষ্ণচূড়া ছিল, তারা অবশ্য উধাও। ডানদিকে বাঁক নিলেই একটা নবগ্রহ মন্দির ছিল মঞ্জুমাসিমাদের একতলায়, কিন্তু সেই বাড়িটা এখন পাঁচতলা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। চার পা এগোলে একটা হনুমান মন্দির হয়েছে, এটা নতুন। মঙ্গলবার বলেই হয়তো প্রচুর ভিড় তার সামনে। সেই ভিড়ের একজনকেই আমি আমার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম। সে কিছু বলতে না পারায়, একটু বয়স্ক একজন লোককে।

"বোসদের পুরো ফ্যামিলিটাই কীরকম কর্পূরের মতো ভ্যানিশ করে গেল।" লোকটা আমার বাবার নাম শুনে বলল।

"ফ্যামিলির সবাই? কেউ থাকত না বাড়িতে?"

"বউ আর ছেলেটা কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। মরে-ফরে গেছে বোধহয়। লোকটা আবার বিয়েও করেছিল শুনেছি। কিন্তু সেই বউকে দেখিনি। আর কেউ দেখেছে বলেও শুনিনি। যাকেই জিজ্ঞেস করতাম, সেই বলত যে শুনেছে। ঘর থেকে গভীর রাতে চপল বোসেরই আওয়াজ ভেসে আসত। তারপর একদিন বন্ধ হয়ে গেল আওয়াজটা। কোথায় যে বিবাগী হয়ে গেল চপল বোস..."

আমি ততক্ষণে জয়রাম রক্ষিতকে চিনে ফেলেছি। অনেক পেয়ারা চুরি করেছি ওর বাড়ির বাগান থেকে। একবার ধরা পড়ে কানমলাও খেয়েছিলাম। অথচ এখন আমার সামনে দাঁড়িয়েও আমাকে চিনতে

আমিও নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে দু'বার ঘুরে গেলেও বা
চিনতে পারিনি। কীভাবে পারব? আমাদের পাশের দাশগুপ্
আর আমাদেরটা মিলিয়ে বেশ একটা পেল্লাই চারতলা ফ্ল্যা
আর তার গ্রাউন্ড ফ্লোরের সামনের অংশটা নিয়ে একটা চা
হোটেল।

চাইনিজ হোটেল? এই গলির ভিতরে? ভিতরে ঢুকে স্যুপ অ
প্লেট চিলি ফিশ অর্ডার করে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম
চলে কি না।

"সন্ধে সাতটা তো এখন, আর একঘণ্টা পরে এলে বসার
পাবেন না হয়তো।" যে-ছেলেটা অর্ডার নিল, সেই সার্ভ ক
করতে বলল।

মাছটা ভাল হলেও, স্যুপটা জমাতে পারেনি। বেশি ঝাল।
লাগছিল না আমার অবশ্য। জিভে ঘোরাচ্ছিলাম, গিলে ফে
আগে। ঘোরাচ্ছিলাম বাঁধাকপির পাতা, লেটুস, লঙ্কার গুঁড়ো
আর আমার শৈশবের লাল সিমেন্টের মেঝে, রাতে খেতে
মায়ের ডাক।

হারিয়ে যা যায়, একেবারেই যায়?

১২

সরকারি অফিসের গয়ংগচ্ছ পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে
না করতে পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। আসলে সেই ছোট থে
পরিশ্রমের ভিতরেই মুক্তি খুঁজে নিয়েছি বলে নতুন নতুন ক
দিতে, তারপর সেগুলো সম্পূর্ণ করতে খুব ভাল লাগত। মু
হল, লাল ফিতের ফাঁস এমনই একটা জিনিস যে, তার ভি
গেলে নতুন রাস্তা বের করা খুব মুশকিল। কানাগলির অন্য
যেতে যেতেই জীবন কেটে যায়।

ঠিক সেইসময়ই প্রসন্ন বরদারাজনের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎ
জীবনের দিশাটাই পালটে দিল। প্রসন্নর সঙ্গে আমার পরিচ
চেন্নাইয়ে একটা সেমিনারে গিয়ে। আমাকে আমার অফিস
পাঠানো হয়েছিল, প্রসন্ন এসেছিল ওর সংস্থার হয়ে। সাধার
ভারতীয়রা সদ্য পরিচিত লোকেদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলে
যদি ভিন্ন সংস্কৃতির হয় তাহলে তো আরওই নয়, কিন্তু প্রস
থেকে ব্যতিক্রমী। হোটেলের লাউঞ্জে কেবল নয়, মেরিনা সি
হাঁটতে হাঁটতে অনেক গল্প হয়েছিল ওর সঙ্গে।

প্রসন্নর দেওয়া ঠিকানা-ফিকানা সম্বলিত কার্ড অবশ্য হারি
ফেলেছিলাম আমি। ফোন নম্বরও সেভ করে রাখতে ভুলে
গিয়েছিলাম। তাই সেদিন দুপুরে 'ভিজ়িটর' এসেছে শুনেও
গা করিনি। কোনও একটা কাজে ছিলাম বলে ভুলেই গিয়ে
একপ্রকার। আবারও ফোন আসায়, একটু বিরক্ত হয়েই নী
গিয়ে দেখি প্রসন্ন বসে আছে রিসেপশনে। মাথার সামনের
আর একটু হালকা হয়ে গেছে বলে, ওকে চিনতে এক সেবে
বেশি লাগল আমার। তারপর সমুদ্রের একটা ঢেউই যেন নি
ফেলল, সেই সি-বিচে, সেইসব বন্ধুতায়।

সেদিন রাতেই চেন্নাই ফিরে যাওয়া বলে প্রসন্নকে সঙ্গে করে
নিয়ে আসতে পারলাম না, ছিমছাম একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে
আমরা।

"সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারদাবারের সবচেয়ে ভাল দিকটা হচ্ছে
খাও বেশি পয়সা খরচ হবে না। আর দ্বিতীয় যে-জিনিসটা
পছন্দের তা হল, এই স্টিলের গ্লাসে কফি।" আয়েশ করে ব
বসতে বলেছিলাম আমি।

প্রসন্ন হাসতে হাসতে বলেছিল, "তুমি কি পয়সা কম লাগবে
আমাকে এখানে নিয়ে এলে?"

মতো কঠোর নিরামিষাশীকে তো বাঙালি হোটেলে মাছ-মাংস খাওয়াতেও নিয়ে যেতে পারি না।"

"বাঙালিদের অনেক এক্সেলেন্ট নিরামিষ পদ আছে। আমি যে-বাড়িটায় ছিলাম গত দু'দিন, তারা বৈষ্ণব। ফুললি ভেজিটেরিয়ান। অ্যান্ড ইউ নো, আই অ্যাম ইন লভ উইথ মোচার ঘণ্ট আর ছানার ডালনা।"

"পরেরবার যখন আসবে, আমি আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওইসব খাওয়াব তোমাকে। প্লাস, কাঁচকলার কোপ্তা আর ধোকা বলে দুটো প্রিপারেশন খুব ভাল রাঁধে আমার বউ। তুমি খেলে বুঝবে।"

"দুঃখের ব্যাপার এটাই যে, আমি চেন্নাইতে এসবের একটাও পাব না।"

"বাঙালি ডেলিকেসি টেস্ট করার জন্য তো বাংলায় আসতে হবে বন্ধু।"

"বাট হোয়াই? জ্যোৎস্না উপভোগ করার জন্য কি চাঁদে যেতে হয়? আমি যদি কলকাতার সর্বত্র ইডলি-দোসা-সম্বর-উপমা পাই, শুধু দোকানে নয়, রাস্তায় গাড়ি ঠেলে লোকে এগুলো বিক্রি করে দেখলাম, তাহলে কেন চেন্নাইয়ের রাস্তায় মোচার তরকারি কিংবা রসগোল্লা বিক্রি হবে না?"

"আসলে যে কোনও ব্যবসাতেই ক্যাপিটাল লাগে তো..."

প্রসন্ন আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, "পুঁজির সমস্যাটা সমস্যাই নয়। আজকের দুনিয়ায় ক্রাউড ফান্ডিং খুব পপুলার। ঝামেলাটা হচ্ছে, তোমরা বাঙালিরা 'রিচ আউট' করতে চাও না। কিন্তু এই গ্লোবালাইজ়েশনের যুগে রিচ আউট না করলে হবে কী করে? আর শুধু এখনই নয়, ইন এভরি এজ, যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, সেই সারভাইভ করেছে। ভাস্কো দা গামা আর কলম্বাস না থাকলে কোথাও কোনও কলোনি তৈরি হত না পাশ্চাত্যের।"

"ঠিকই বলেছ, এটা আমাদের বাঙালিদের একটা দোষ..."

"আজকের বাঙালিদের দোষ বলো। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ কি ছড়িয়ে দেননি নিজেদের? না দিলে নোবেল প্রাইজ আসত? মিশন হত? ইউ নো, তামিলরা সাধারণত নিজেদের বাইরে কাউকে অ্যাকসেপ্ট করে না। ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য হয়েও তামিলনাড়ু যেন একটা পৃথিবী। কিন্তু তামিল নয় এমন একজনকে তামিলরা অন্তরে গ্রহণ করেছিল। আর তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। চেন্নাইয়ের রাস্তায় যে-পোস্টারগুলো বিক্রি হয় ফুটপাথে, তার মধ্যে তামিল না হয়েও ওই একজন থাকেন, তিনি বিবেকানন্দ। কিন্তু তোমরা তারপরও কেন যে..."

আমি প্রসন্নকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "কিন্তু লাস্ট তিরিশ বছর তামিলরা আর একজন অ-তামিলকে অন্তরে গ্রহণ করেছেন। এবং তিনি এমনই এক প্রতিভা যাঁর তুলনা গত দু'হাজার বছরের ইতিহাসে নেই।"

"কার কথা বলছ?" প্রসন্ন অবাক চোখে তাকাল।

আমি একটু থেমে বললাম, "দ্য গ্রেট রজনীকান্ত।"

পরের তিরিশ সেকেন্ড, আমাদের হাসির শব্দে চমকে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ওয়েটাররাও।

প্রসন্ন কেবল আড্ডা দিতে নয়, আমাকে একটা প্রস্তাব দিতে এসেছিল। ও যে বিশ্বখ্যাত অটোমোবাইল সংস্থার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে আছে, তার সেলসে আমি জয়েন করি, প্রসন্ন চাইছিল।

"সরকারি চাকরি ছেড়ে প্রাইভেটে? কেউ যায়?"

"মাইনে প্রায় ডবল হলে যায়। বিশেষ করে তারা, যারা পচে মরতে চায় না, যাদের ভিতরে শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হওয়ার বিপুল বাসনা। আর আমি এই উদাহরণটা কেন দিলাম বলো তো? আমরা

কালারগুলো দ্যাখো।"

"অসামান্য লাগছে। এই নীল আর ওই পার্পলটা একদম চো
এসে ধাক্কা মারছে। নতুন লঞ্চ হল এই মডেলগুলো?" আমি
ল্যাপটপে ছবিগুলো দেখতে দেখতে বললাম।

"এই প্রডাক্টগুলো আগামী দশবছরের মধ্যে লঞ্চ করতে চাই
আমরা। হোপফুলি পেরে যাব।"

"ওহ! এগুলো ভবিষ্যৎ! কিন্তু রং ছাড়া স্পেশাল কী?"

"রংটাই স্পেশাল। গাড়ির গায়ে থাকলে পরের পঁচিশ বছর
রঙ করাতে হবে না গাড়ি। এই যে আমার ল্যাপিতে, প্রজাপ
ছবিগুলো দ্যাখো। প্রজাপতির ডানার রঙটা যে-মৌল দিয়ে
সেটা দিয়েই রংটা তৈরি করতে চাইছি।"

"কিন্তু রংটা পাবে কী করে? প্রজাপতির থেকে?"

"প্রজাপতির রং যে তন্তু দিয়ে তৈরি সেটাকেই আমরা আর্টি
তৈরি করব। 'মৌল'টা একই থাকবে কিন্তু মৌলের উপাদান
বদলে। দেবাশিস বলে একটি বাঙালি ছেলেও আছে আমাদে
রিসার্চ টিমে। আমরা তোমাকেও চাইছি।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কীভাবে এরা একটা গাড়িতে, এ
জড়বস্তুর মধ্যে, একটা উড়ন্ত পতঙ্গকে ধারণ করতে চাইছে
প্রসন্ন বলল যে, ওরা ব্যবসা স্প্রেড করতে চাইছে। কলকাতা
মায়ানমার, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর। প্রজাপতি যেভাবে তার পাখ
দেয়।

"আমি কলকাতা ছাড়তে পারব না, তাই..."

"তোমাকে কলকাতা ছাড়তে বলছে কে? তোমাকে তো ইস্ট
জোনের ডেপুটি হেড হিসেবেই চাইছি। অফ কোর্স ট্যুর থাক
তোমার প্লেসমেন্ট কলকাতাতেই হবে।"

ছোট্ট একটা ছুটিতে মা'কে সঙ্গে নিয়েই পুরী গেলাম। কুটুস
আসা ইস্তক জগন্নাথদেবের কাছে যেতে চাইছিল ঝুমা। কুটুসে
ধরে রাতের আধো-অন্ধকার বালির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটি
অনেকগুলো ঝিনুক কুড়িয়ে এনেছিলাম। তাদের একটার ভি
মুক্তো ছিল না কিন্তু ঝিনুক নিজেই এত সুন্দর যে, ভিতরে মু
থাকলেও কিছু যায় আসে না।

জীবনও তো তেমনই। তবুও সন্দীপদার ছেলে গলায় দড়ি দি
গেল কেন?

পুরী থেকে ফেরার পরপরই খবরটা পেয়ে একদম ধসে গিয়ে
আমি। কোনও দিশা পাচ্ছিলাম না কোথাও। এদিক-ওদিক
শুনছিলাম অনেক কথা। কেউ বলছিল ছেলেটা নাকি নেশাভ
করত। কেউ বলছিল, দোষ সন্দীপদা আর ওর বউয়ের। ওর
বাচ্চার মন বোঝার চেষ্টাই করেনি। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হয়ে
সাড়ে সতেরোর একটা ছেলে ওভাবে ঝুলে পড়বে কেন?

"ওর মা বকেছিল পিকলুকে একটু। সামনে জয়েন্ট, পড়াশো
ফাঁকি দিচ্ছিল বলে, যেরকম ক্যাজুয়ালি বকে থাকে বাবা-মা
সেটা কি এমন বিরাট কিছু যার জন্য ওকে আমাদের এভাবে
চলে যেতে হল?" সন্দীপদা কাঁদতে কাঁদতে বললেন আমায়

"একটু শক্ত হোন সন্দীপদা। বউদিকে বাঁচানোর জন্য এইটুকু
আপনাকে হতেই হবে।"

"মহুয়া বাঁচবে? কীভাবে বাঁচবে? লোকজন তো ঘুরিয়ে ওকে
অ্যাকিউজ় করে যাবে, বাকি জীবন। কেমন করে কাউন্টার ক
ভেবেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ফ্রিজ আমার ছেলের পছ
গাড়ি ওর কথামতো... ইস, ছোটবেলায় একটা ভাই কিংবা
চেয়েছিল, তখন যদি নিজেদের আরামের কথা না ভেবে আ
ইস্যু নিতাম, আজ এই সর্বনাশ দেখতে হত না। অন্তত ছোট
থেকে খবর পেতাম, বড়টা কী ভাবছে।" সন্দীপদার কথা অ
হয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

তৈরি হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ান-চাইল্ড ফ্যামিলিতে। সর্বনাশের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা, এরপর শুধু একটা বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়ার অপেক্ষা।

যে-স্বার্থপরতার বীজ আমরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভরে দিচ্ছি সন্তানের মধ্যে, সেই বীজই মহীরুহ হয়ে টলিয়ে দিচ্ছে বাবা-মার সম্পূর্ণ পৃথিবী। আমাদের একক বাচ্চারা ফ্র্যাংকেনস্টাইন হয়ে আমাদেরই আক্রমণ করতে ছুটে আসছে।

"আর একটা বাচ্চা চাইই আমাদের ঝুমা। ওই 'ওয়ান চাইল্ড'-এর বিলাসিতাই 'নো চাইল্ড'-এর সর্বনাশ নিয়ে আসে।"

ঝুমা শুধু বলল, "অফিসে তোমার এত চাপ, তোমার একার চাকরি..."

আমি ঝুমার মুখটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বললাম, "চিন্তা কোরো না ঝুমা। টাকার চিন্তা কোরো না।"

"কোত্থেকে আসবে টাকা?" ঝুমা সরলভাবে জিজ্ঞেস করল।

আমি চুমুতে চুমুতে ওকে কাহিল করে দিতে দিতে বললাম, "লাগলে পরে, টাকা প্রজাপতি দেবে।"

১৩

আমি যে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রাইভেট কোম্পানিতে যোগ দিলাম সেটা ঝুমা কিংবা আমার মা কেউই ভালভাবে নেয়নি। মা অবশ্য অতটা ভয় পেত না, ঝুমা না পাওয়ালে। আসলে ওরা দু'জনেই খুব আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। যে নিরাপত্তায় অভ্যস্ত, তা হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছিল। আচ্ছা, বিমান যখন আকাশে ওড়ে তখন কোনও নিরাপত্তা থাকে? তবু প্লেনে চড়ে এদিক-ওদিক যাওয়ার সময় আমি দেখেছি, ছত্রিশ হাজার ফুট উপরেও কম্বলটা কেন একটু ময়লা, স্যান্ডউইচ কেন তত ফ্রেশ নয় তাই নিয়ে এয়ার-হোস্টেসের সঙ্গে তর্ক করছে লোক। মানুষ হয়তো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের জন্য আরও একটু সুরক্ষিত কিছুর কল্পনা করে চলে। কিন্তু জীবনটা তো ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যেই। ঘোড়ার পিঠে বসে যে-জকি দৌড় করায়, ঘোড়াটা যখন লাফ দেয়, তখন সে ছিটকেও যেতে পারে ট্র্যাক থেকে, আবার প্রথমও হতে পারে। আমি সেই ঝুঁকিটা নিতে চাইছিলাম। কী হবে না হবে সে অনেক পরের কথা।

যে-কোম্পানিতে জয়েন করলাম সেখানে একদম টপ বস পর্যন্ত সবাইকে নাম ধরে ডাকা যায়। কোনও 'হেঁ হেঁ স্যার একটু দেখবেন, আপনার জুতোটা পালিশ করে দিতেই পারি চাইলে' সিস্টেম নেই। কাজই একমাত্র বিচার্য বিষয়, কাজের পরিণামেই বাঁচা কিংবা মরা। কাজ ভালবাসি বলে আমার এই ধরতাইটা পছন্দ হয়ে গেল। দিনরাত কাজ শুধু কাজ, পিএনপিসি-র অবকাশ নেই, ফাঁকিবাজির সুযোগ নেই, এমন একটা পরিবেশই তো চাইছিলাম আমি। হ্যাঁ, সরকারি চাকরির আরামটা নেই কিন্তু কাজ করতে এসে যারা আরাম খোঁজে, আমি তো তাদের দলে ছিলাম না কখনও।

প্রত্যেকটা জায়গায় উঁচু সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে আছে যে-লোকটা, সে নিচু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। আর তারপর মানবিকতার কথা বলে ফাটিয়ে দেয়। খুব খারাপ অবস্থা থেকে উঠে এসেছি বলেই আমি এই লোকগুলোকে ঘেন্না করি, একটু মানুষের মতো মিশতে চেষ্টা করি মানুষের সঙ্গে। কেউ সরে আছে দেখলে সরে থাকার কারণটা বুঝতে চেষ্টা করি। গোপার ক্ষেত্রেও করলাম। অফিস থেকে ফেরার পথে খেয়াল করলাম আমায় দেখেই মুখ নামিয়ে উলটোদিকের গলিতে ঢুকে যাচ্ছে মেয়েটা। একটু পা চালিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

"কী হয়েছে গোপা? অমন পালিয়ে যাচ্ছ কেন আমায় দেখে?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলবে বলে মুখ তুলেও গোপা কিছু বলতে

"আরে হয়েছেটা কী, বলবে তো?"

"বউদি আমাকে অকারণে অপমান করলেন দাদা। আমি কি
কিছু করিনি।" গোপা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল।

গোপার বাবা স্থানীয় একটা মন্দিরে পুজো করতেন। বার দু
আমার বাড়িতেও পুজো করে গেছেন ভদ্রলোক। একবার
লক্ষ্মীর আর একবার, ঝুমার মানত পূর্ণ করতে, সত্যনারায়
দ্বিতীয়বার গোপা এসেই সব সাজিয়ে-গুছিয়ে ব্যবস্থা করে
সেদিনই ভাল করে আলাপ হয় মা-মরা মেয়েটার সঙ্গে, বা
আঁকা শিখিয়ে সংসারটা সামলে রেখেছে ও। বাবা, পঙ্গু ভা
অবিবাহিত কাকা সকলের রান্না নিজের হাতে করেও পড়া
চালিয়ে যাচ্ছে।

মূলত আমার আগ্রহেই ঝুমা কুটুসকে আঁকা শিখতে পাঠিয়ে
গোপার কাছে। তারপর আমি আর সাত ঝামেলায় খবর রা
পারিনি। হঠাৎ হল কী? জানব বলেই আমি গোপাকে নিয়ে
দূরে নতুন গজিয়ে ওঠা কফিশপটায় গিয়ে বসলাম।

গোপা খুব কুণ্ঠার সঙ্গে কফিতে প্রথম চুমুক দিয়ে বলল, "অ
কীভাবে আপনাকে বোঝাব জানি না কিন্তু কুটুস রেগুলার এ
বদমাইশি করছিল। আপনাদের ছেলে বলে প্রথম-প্রথম আ
ইগনোর করছিলাম, কিন্তু তারপর দেখলাম এতে ওরই ক্ষতি

"একটু খুলে বলো।"

"আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি। ধরুন আমি সাদা পাতায় গাছ
বাড়ি হোক ড্রয়িং করে দিই। সেটা দেখে ছাত্রছাত্রীদের আঁক
এক-একজনের খাতায় এক-একটা জিনিস এঁকে দিই। বো
হয়তো খাটনি কম হত আমার, কিন্তু বাচ্চারা ওই পারসোনা
পেত না।"

"আই অ্যাপ্রিশিয়েট গোপা। তোমার মতো সিনসিয়ার একট
এভাবে ভাবতে পারে।"

"থ্যাংকস দাদা, আপনি বুঝলেন। এবার কুটুস করছিল কী,
আঁকাটা দেখে নিজে আঁকছিল না। উলটে আমার আঁকাটার
বারবার করে দাগা বোলাচ্ছিল। বোলাতে বোলাতে পরের প
ছাপ ফেলে দিচ্ছিল। তারপর সেটার উপরে পেনসিল চালি
কাছে নিয়ে আসছিল। কোনও-কোনওদিন রঙ করেও আন
ফাঁকিবাজিটা দিনের পর দিন করে গেলে, ও কী শিখবে বল

আমি কিছু বলতে না পেরে চুপ করে গেলাম। একটা পাঁচ
বাচ্চা এমন দু'নম্বরি শিখে নিয়েছে? এতটা চিটিংবাজ? আম

"আমি ওকে বকেছিলাম তাই। কুটুস চুপ করে বকাটা খেল।
বাড়ি গিয়ে কী বলেছে, আমি জানি না। কিন্তু পরদিন বউদি
যাচ্ছেতাই অপমান করলেন আমাকে। আমি নাকি শেখাতে
না বলে আজেবাজে কথা বলি। কুটুস কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ
পড়েছে, তার দায় আমার। এবার কুটুসের আরও শরীর খা
উনি আমায় জেলে দেবেন..."

"জেলে দেবে এটাও বলেছে!"

গোপা কথা বলতে না পেরে ঘাড় নাড়ল। আমি দেখলাম,
দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা।

মাথার মধ্যে একটা আগুন জ্বলে উঠল যেন। এই কি ঝুমার
নাকি? অসহায় মানুষকে অপমান করা?

"তুমি বাড়ি যাও, আমি যা করার করছি। শুধু একটাই কথা
কুটুস আবার তোমার কাছে শিখতে গেলে তুমি যেন রিফিউ
না ওকে।"

"আমার কি রিফিউজ় করার ক্ষমতা আছে দাদা? আমি তো

গোপার শেষ কথাটা যেন সহস্র পেরেকের মতো বিঁধল আম
ঘরে ঢুকে জুতো ছাড়তে ছাড়তে গলা তুললাম, "তুমি গোপ
কী বলেছ ঝুমা?"



"যা উচিত মনে করেছি, তাই বলেছি। আর তাই নিয়ে কাউকে কোনও জবাবদিহি করব না। ওর কত সাহস যে, তোমায় নালিশ করেছে? কী ভেবেছে? তোমায় বললেই তুমি ওর প্রেমে গলে যাবে? আর তোমাকেও বলিহারি! নালিশ শুনছিলে তুমি? আমার বিরুদ্ধে? এত দরদ যুবতী মেয়েদের প্রতি? তাও যদি দেখতে সুন্দর হত!"

"আমার কী ইচ্ছে করছে বলো তো ঝুমা? সেই রুটির দোকানে যেমন থাপ্পড় মেরেছিলাম, সেরকম আট-দশটা থাপ্পড় মারি, তোমাকে আর তোমার ছেলেকে। এত বছর আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তোমার, তুমি কি আমাকে অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে রসের কথা বলতে শুনেছ, নাকি দেখেছ কখনও?"

"বলবে কী করে? তুমি তো কাঠখোট্টা, রসকষবিহীন একটা লোক। ভাবছি ওই গোপা কোন মন্ত্রে তোমার..."

"কোনও মন্ত্রে নয়। মন্ত্র তো দেবীদের জন্য। কিন্তু একটা স্ট্রাগলিং মেয়েকে অকারণে অপমান করতে বাধল না তোমার?"

"মোটেই অকারণে নয়। ও কুটুসকে..."

"কুটুস কী করেছে আমরা জানি। তুমিও জানো, আমিও জানি।"

"কিন্তু ওইটুকু একটা বাচ্চাকে ও 'চোর' বলবে কেন?"

"যদি বলে থাকে, ঠিক করেছে। ভবিষ্যতে চোর হবার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বখিয়ে দিও না বাচ্চাটাকে। মানুষ করো। তুমি 'সরি' বলবে গোপাকে। কুটুসকে নিয়ে গিয়ে।"

"আমার দায় পড়েছে ওই পুরুতের মেয়ের কাছে ক্ষমা চাওয়ার।"

"আমি কিন্তু বেরিয়ে যাব এই ফ্ল্যাট ছেড়ে।"

"অন্য কোথাও কেউ জুটেছে নাকি?"

"লাগলে জুটিয়ে নেব কাউকে। যে অন্তত ভদ্র হবে তোমার চেয়ে।"

"ইচ্ছে হলে চলে যাও। আমার মতো অভদ্রর সঙ্গে থাকতে হবে না। দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো পালন কোরো, তাহলেই হবে।" ঝুমা একটা ভঙ্গি করল আঙুল দিয়ে।

ঝুমা যদি একটু নিজের ভুল বুঝত তাহলে ব্যাপারটা গড়াতই ন এতদূর। কিন্তু আমি প্রশ্ন করামাত্র ও এমন কুৎসিতভাবে জবাব থাকল যে, আগুন নেভার বদলে জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

শুধু জুতোটা ছেড়েছিলাম, মোজাটা পরা ছিল। ঝুমাকে কিচে ঢুকতে দেখে জুতোটা গলিয়ে অ্যাটাচিটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। হাত তুলে অন্যায় করেছিলাম; সেই অন্যায় জীবনে দ্বিতীয়বার করব না। তাই বলে এমন নারকীয়তা মুখ বুজে মানতেও পারব না। রাস্তায় নেমে কয়েক পা হাঁটতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলা সেটাতে উঠেই মোবাইলটা বন্ধ করে দিলাম প্রথমে। শিক্ষা পা একটু শিক্ষা পাওয়া প্রয়োজন।

সঙ্গে আইডেন্টিটি কার্ড কিছু ছিল না বলে অসুবিধে হতে পারত কিন্তু ক্যামাক স্ট্রিটের যে-হোটেলে গিয়েছিলাম সেখানে মাঝেম আমাদের অফিসের কনফারেন্স হয় বলে মালিক আমার চেনা।

"বাড়িতে একটা সমস্যা হয়েছে, দিন-দুয়েক থাকতে হবে। আইডেন্টিটি প্রুফ বলতে একটা ইলেকট্রিক বিল আর ভোটার ডি-র একটা জেরক্স পকেটে আছে। চলবে?"

হোটেলের সর্দারজি মালিক পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "ওগুলে ছাড়াও চলবে। আপনি তো পরিচিত, অপরিচিতদের ক্ষেত্রেও চেক করতে হলে, ব্যবসা লাটে উঠবে।"

চারতলার একটা ঘরে ঢুকে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাতের কলক দেখলাম দশ মিনিট ধরে। সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত। কত গাড়ি কতদিকে কী দ্রুতগতিতেই না ছুটে চলেছে। অথচ কোথা কোথাও জীবন দাঁড়িয়ে আছে থম ধরে। জামাকাপড় তো কিছু সঙ্গে ছিল না, কিন্তু অ্যাটাচিতে কীভাবে যেন একটা টি-শার্ট গিয়েছিল। হয়তো আগের ট্যুরের। স্নান করে উঠে তোয়ালে জ বসে ওটাই গায়ে চাপালাম। ওই আমার বৈরাগ্যের পোশাক। টিভিটা চালিয়ে এই চ্যানেল থেকে ওই চ্যানেল যেতে যেতে এ

প্রতি, তবে মাথাটা দপদপ করলে শান্ত হতে সাহায্য করে, সেটুকু মানি। সমস্যা হল, অভ্যেস নেই বলেই হয়তো, দু'তিন পেগ খেলেই আমার খিদে মরে যায় একেবারে। আজও গেল। নয়তো বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসছি তখন প্রচণ্ড খিদে পেটে।
পরোটা সবজি আর একপ্লেট মাংস দিতে বলেছিলাম। তাও খেতে পারলাম না পুরোটা। রুম সার্ভিসের ছেলেটা প্লেট নিয়ে যেতে, ব্যালকনিতে গিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে মোবাইলটা চালু করলাম। তিন মিনিটের মধ্যে ঝুমার মোবাইল থেকে ফোন এল। ধরলাম না যখন, বাড়ির ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন চলে এল। ফোনটা ধরে দেখি, ওপাশে মা।
"মা তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি একদম ঠিক আছি। কাল নয়তো পরশু বাড়ি চলে আসব।"
"ঝুমা না খেয়ে বসে আছে, তুই আজ এখনই ফিরে আয়।" মা কীরকম একটু জড়ানো গলায় বলল।
আমি উত্তরে কিছু বলার আগেই মায়ের কাছ থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়ে ঝুমা কাঁদতে শুরু করল, "আমার অন্যায় হয়েছে। ক্ষমা চাইছি। তুমি প্লিজ় ফিরে এসো। অন্য কারও কাছে থেকো না রাতে।"
আমি ঝুমার কথার উত্তর দিতে গিয়ে ভেবলে গেলাম। ঝুমা অপরাধবোধ থেকে কাঁদছে না ততটা, ঝুমা কাঁদছে ভয়ে। আমি অন্য কারও কাছে চলে গিয়েছি সেই ভয়ে।
"যাকে মানুষ এত বছর ধরে চেনে, যার সঙ্গে থাকে, তাকে নিয়েও এতটা ইনসিকিওরিটি?"
"তুমি বুঝবে না, তুমি তো চাকরি করো। আমি তো চাকরি করি না।" ঝুমা ধরা গলায় বলল।
খুব লজ্জা পেলাম ঝুমার কথাটা শুনে। যে-জায়গা থেকে গোপা অসহায়, সেই জায়গা থেকে ঝুমাও কি অসহায়? অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কি একটা মেয়ে স্বামীর ঝি হয়ে যায়? কথাটা তো সত্যি নয়। আর কথাটা যে মিথ্যে সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমারই।
এসেছিলাম ভীষণ রাগ করে, কিন্তু এখন একটা খারাপ লাগা তৈরি হল মনের মধ্যে। অত রাতে আবারও প্যান্ট-শার্ট পরে নীচে নেমে এলাম। ভাবছিলাম একটা ট্যাক্সি পেলে ফিরে যাব। রাত্রি বারোটার সময় ক্যামাক স্ট্রিটে ট্যাক্সি মেলে না তা নয়, কিন্তু সেদিন যেন সবদিক দিয়েই আলাদা। গেটের বাইরে একটাও ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে নেই।
ওই ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই, কলেজে আমার সহপাঠী অভিষেককে দেখলাম একটা মেয়ের গলা জড়িয়ে হোটেলের ভিতর ঢুকছে। অভিষেক পরেছে একটা বারমুডা আর মেয়েটা একটা থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট আর স্লিভলেস টি-শার্ট পরা। মুখটা এককালে মিষ্টি ছিল বোঝা যায়, এখন উগ্র লাগছে। অভিষেক তো বিয়ে করেছিল সুস্মিতাকে। সেই বিয়েটা কি আছে না গেছে? অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে টলতে টলতে হোটেলে ঢুকছে, পোশাক-আশাক দেখে মনে হচ্ছে এই হোটেলে বেশ গুছিয়ে বসেছে, কে জানে কী ব্যাপার! অবশ্য আমার জানারই বা কী দরকার। এই বিশ্ব আনন্দময়/ যার চিত্তে যা লয়। আমি চোখটা ঘুরিয়ে নিলাম অন্যদিকে।
অভিষেক নিজেই ফিরে এল পাঁচ পা এগিয়ে গিয়ে। আমাকে বেশ ভাল করে জরিপ করে বলল, "কী গুরু? তুমিও এখানে মজা লুটতে এসেছ? আমি ভাবছিলাম আমি একাই বোধহয় লাইনে আছি।"
"বাজে বকিস না। আমি অফিসের একটা সেমিনারে এসেছি।"
"অফিস থেকে মেয়েছেলে দেয়নি? রাত কাটানোর জন্য? তাই ফিরে যাচ্ছিস?"
"এই তুই ফোট তো সামনে থেকে। সবাইকে নিজের ক্যাটেগরিতে ফেলিস না।" মাথা গরম হয়ে গেল আমার।
"চটছিস কেন? আমার পার্টনার জাহ্নবীকে দেখলি তো! ভাল না?"
"খেয়াল করিনি।"

ভরাট বুক, আর সেটা কোনও ছেলে খেয়াল করবে না, এরক
পৃথিবী আর সূর্যের চারদিকে ঘুরত না। থেমে যেত।"
"সুস্মিতা কোথায়? ডিভোর্স করে দিয়েছিস?"
"ডিভোর্স কেন করব? তবে দশ বছরের পুরনো বউ, বুঝিসই
"না, আমি বুঝি না। তুই যা এখন।"
"রেগে যাচ্ছিস কেন? আমার কার্ড রাখ। আমি ইন্টিরিয়র ডে
ব্যবসা করি এখন। কোনও কাজ থাকলে বলিস।"
অভিষেক ওর একটা কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গে
মেয়েটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, অভিষেক যেতেই এ ওর কা
দিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে মেয়েটা আম
তাকাল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে।
"কোয়াইট অ্যাট্রাকটিভ।" আমি স্বগতোক্তি করলাম।
সেদিন রাতে ট্যাক্সি পাওয়াই গেল না আর। বাড়ি ফিরতে ফি
পরদিন সকালই হল। ফিরেই ঝুমার আর একদফা কান্নার সা
অসহায় হয়ে সেদিন অফিস ডুব দেওয়াই মনস্থ করলাম।
আর সেই ডুব দেওয়ার জন্যই হোক বা গতরাতের ঝগড়ার প
সেই বিয়ের পরে যেমন কয়েকবার হয়েছিল, বহুদিন পর দি
বেলায় মিলিত হলাম আমরা। মা ঘুমোচ্ছিল পাশের ঘরে, কু
আমার মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে 'মিলন' ছাড়া আর কোনও ক
ওই টেনে দেওয়া পরদার ফাঁক দিয়ে যেমন আলো এসে পড়
সমস্ত অভ্যাসের ভিতর দিয়ে তেমনই এসে পড়ছে বাসনা, ে
উঠছে প্রেম। স্পর্শ, আদরে রূপান্তরিত হল। চাল-ডাল-তেল
দৈনন্দিনতায় নগ্নতা তার রাজকীয়তা নিয়ে স্থায়ী হল, একটা
দু'জন নরনারীর আলিঙ্গনে।
দিন দুয়েক পরে গোপা আমায় ফোন করল, "দাদা, বউদি কু
নিয়ে বাড়ি বয়ে এসে আমায় 'সরি' বলে গিয়েছে। আর একট
শাড়ি গিফট করেছে আমাকে। বউদির চোখে জল দেখে আম
লজ্জা লাগছিল। আমার হয়তো আপনাকে অতকিছু বলা ঠিক
কী করব, তখন আমিও এত যন্ত্রণায় ছিলাম। আপনি যেন অ
বলবেন না বউদিকে। আমি যাব এর মধ্যেই আপনাদের বাড়ি
বউদি যেতে বলেছে।"
"শাড়িও দিয়েছে? আমি কিন্তু শাড়ি দিতে বলিনি।" হেসে উ
আমি ফোনের এই প্রান্ত থেকে।
"আমাকে খুশি করতে তুমি শাড়ি দিয়েছ গোপাকে?"
"গোপা তাই বলল?"
"না গো। ও তো আপ্লুত তোমার ব্যবহারে। খুব প্রশংসা কর
শুনতে শুনতে মনে হল, শাড়ি দেওয়ার বাড়াবাড়ি করলে কে
"দিয়েছি, দিয়েছি। তুমি একটা কাঞ্জিভরম দিয়ো আমাকে।"
"কাল কিনে আনব?"
"একদম না। আমি আবার কনসিভ করলে তখন দেবে। আর
যাব তোমার সঙ্গে কিনতে।" বলতে বলতে ঝুমা ওর হাতদুটো
আমার গলা জড়িয়ে ধরল। সেই বিয়ের পরপর যেমন ধরত।

নতুন অফিসে জয়েন করার পর বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছিল, ত
নিয়ে আমার বা ঝুমার তেমন কোনও সমস্যা হচ্ছিল না। বেস
সংস্থায় তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে চাকরি করা যায় না, টাকা
বেড়েছে চাপ বাড়বেই। কাজ করতে ভালবাসি বলে সেটা গা
লাগছিল না, বরং উপভোগই করছিলাম। অন্য একটা ব্যাপা
ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। তিনমাস, ছ'মাস, একবছরের চেষ্টাতে
কনসিভ করতে না পারায়।
পুরুষের ঔরসের কোনও দাম নেই যতক্ষণ না নারীর গর্ভ তা
ধারণ করতে পারে। ভোরের শিশিরের মতো ঝরে যায় সে,
যতক্ষণ না গর্ভের আশ্রয় তাকে প্রাণতরঙ্গের ঠিকাদার করে।

ফলের উচ্ছিষ্ট মাত্র, বীর্যও তাই। তার ভিতরের প্রাণের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে পারে কেবল একজন নারীই।
কিন্তু ঝুমা পারছিল না। অনেক চেষ্টার পরেও না। এখন 'বন্ধ্যাত্ব নিরাময়'-এর নাম নিয়ে অনেক ক্লিনিক ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে শহর জুড়ে। কিন্তু তাদের দশজনের মধ্যে আটজনেরই কাজ গাঁ-গঞ্জ কিংবা মেগাসিটি থেকে আসা পেশেন্টদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা। প্রথম দলের ক্ষেত্রে রাহাজানিটা সরাসরি হয়, দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রে একটু কায়দা করে। সেরকম দু-একটা ক্লিনিকেও যে আক্কেল সেলামি দিলাম না, তা নয়। শেষমেশ আমার আগের অফিসের এক কলিগের পরামর্শ অনুযায়ী একজন সত্যিকারের দক্ষ এবং স্নেহপ্রবণ গায়নিকলোজিস্টের খোঁজ পাওয়া গেল। ষাটের কাছাকাছি বয়স হলেও ভদ্রমহিলা ভীষণই আপ-টু-ডেট। তাই অচিরেই ধরে ফেললেন সমস্যাটা কোথায়। ওঁর পরামর্শ অনুযায়ী কিছু টেস্ট করে দেখা গেল ঝুমার ইউটেরাসের অবস্থা ভাল নয়। সে প্রায় ধারণশক্তি রহিত। কুটুস হওয়ার বছর দুয়েক পর ফাইব্রয়েডের সমস্যা দেখা দিয়েছিল ঝুমার। সেই ফাইব্রয়েডের অপারেশনের সময়ই জরায়ুর যারপরনাই ক্ষতি হয়েছে।
"তাহলে কি আমার স্ত্রী আর প্রেগন্যান্ট হতেই পারবে না কোনওদিন?" আমি মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।
"পারবেনই না বলে কোনও কথা মেডিক্যাল সায়েন্সে বলা হয় না চট করে। পারতেও পারেন। কিন্তু তা পারলেও ন'মাস ধরে টানতে পারবেন কি? সেটাই প্রশ্ন।" ডাক্তার ম্যাডাম জবাব দিয়েছিলেন।
তাহলে উপায় কী? সারোগেসি? কিন্তু আমাদের তো কোটি-কোটি টাকা নেই ফিল্মস্টারদের মতো। কে আমাদের গর্ভ ভাড়া দেবে কম পয়সায়? আর তাছাড়া সারোগেসির ক্ষেত্রে ঝুমা নিজেই সায় পাচ্ছিল না মন থেকে।
"একজন জন্ম দেবে আর বাচ্চাটা অন্যের হবে, কেমন যেন লাগে। তার চাইতে কুটুস আছে ওই থাক। কী করা যাবে, সবার কপালে তো দুটো বাচ্চা থাকে না," ঝুমা ডাক্তারের চেম্বার থেকে বাড়ি ফেরার পথে বলল একদিন।
আমি যেন কেমন দৈববাণীর মতো শুনলাম, হবে না, মেয়ে হবে না রে তোর। তোর প্রবল ইচ্ছা, প্রবলতর স্বপ্নকে এবার কবর দেবার সময় এসে গেছে। ভোল, ভুলে যা।
আমার একারই ইচ্ছা? একারই স্বপ্ন? আমি অস্ফুটে বলে উঠতাম। আর কেউ শুনতে পেত না।

১৪

জীবন দৌড়য়, থেমে থাকে না। থেমে থাকা সম্ভব নয় জীবনের পক্ষে। এমনকী যখন তার ভিতরে দুম করে মৃত্যু এসে আছড়ে পড়ে, তখনও নয়। কিন্তু দু'দণ্ড চুপ করে যায়। বিস্ময়ে, আতঙ্কে।
মাসখানেক পর অফিস থেকে ফিরে আমিও বোবা হয়ে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। টিভির পর্দায় লাগাতার 'শান্তিনিকেতনে অশান্তির খুন' দেখে নয়, অভিষেক আর হোটেলে ওর সঙ্গে থাকা মেয়েটির মুখের ক্লোজআপ দেখে। একবার, বারবার।
ঝুমা একদম সেঁটে ছিল টিভির সঙ্গে। আমি ওকে একটা ধমক দিয়ে বললাম, "করছটা কী? যাও না গিয়ে কুটুসকে পড়াও।"
"রোজই তো পড়াই। আজ একটু এটা দেখতে দাও। কীভাবে নিজের বউকে মার্ডার করেছে লোকটা, প্রেমিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে," ঝুমা টিভির সামনে থেকে উঠে কিচেনে চলে গেল, আমার জন্য চা করতে।
"আমি এই খুনিকে চিনি, জানো তো?" আমি গলা তুলে বললাম।
"মানে?" ঝুমা রান্নাঘর থেকেই জানতে চাইল।
"অভিষেক আমার ক্লাসমেট ছিল, কলেজে।"
আমি হোটেলে দেখা হওয়ার ঘটনাটা চেপে গেলাম, "তাকে
চিনব? তবে অভিষেকের বউ সুস্মিতাকে চিনি। আমাদের এক
জুনিয়র ছিল।"
"ওদের একটা মেয়েও আছে জানো।"
"কাদের? অভিষেক আর সুস্মিতার?"
"আরে না, ওই ডাইনিটার সঙ্গে তোমার বন্ধুর একটা মেয়ে অ
বাচ্চাটাকে দেখাচ্ছিল টিভিতে। কাঁদছিল বেচারি।"
"বাচ্চাটাকেও ছাড়েনি টিভি ক্যামেরা? টিআরপি বাড়ানোর জ
তাকেও টেনে এনেছে?"
"ওকে না দেখালে তো রহস্যটা ক্লিয়ার হচ্ছে না।"
আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে চুপচাপ ভাবতে থাকলাম, ে
মেয়েটার সঙ্গে অভিষেককে 'হোটেল সানশাইন'-এ দেখলাম
আসলে অভিষেকের বাচ্চার মা? তাহলে অভিষেক তার সঙ্গে
থেকে সুস্মিতার সঙ্গে থাকতই বা কেন? সেদিন যখন ওরা হে
মস্তি করছে তখন বাচ্চাটা কোথায় ছিল?
দিনতিনেক পরে আমার এক কলিগের বউভাতে গিয়ে আমা
এক ক্লাসমেট অত্রির সঙ্গে দেখা। অত্রি গ্র্যাজুয়েশন করে ল'
চলে গিয়েছিল। এখন আলিপুরে প্র্যাকটিস করে। এগিয়ে এ
আমার হাতটা ধরল। তারপর ঝুমার দিকে তাকিয়ে অনুযোগ
ওকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করা হয়নি বলে।
"তোর বিয়েতে আমায় বলেছিলি? তখন তো মোবাইল হাতে
হয়নি ভাই।" আমি জবাব দিলাম।
"আমি তো বিয়েই করিনি। আরে, উকিলের পসার জমতে জ
চল্লিশ পেরিয়ে যায়। যখন জমে তখন আর বিয়ের বয়স থাকে
"ছেলেরা চাইলেই বিয়ে করতে পারে। বয়স-ফয়স আবার কী
ঝুমা বলল।
"সে পারে, কিন্তু আমার বয়সে আপনার মতো সুন্দরী তো আ
মিলবে না ম্যাডাম। খেঁদি-পেঁচি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"
কথাটা শুনে ঝুমা বেশ খুশি হয়ে হেসে উঠল। আর ওর ওই
দেখে মাথাটা একটু গরম হল আমার।
"মারব এক থাবড়া। 'খেঁদি-পেঁচি' আবার কী রে? যে-মেয়েট
ভালবেসে বিয়ে করবে সেই উর্বশী তোর কাছে। তাকেই সম্ম
ঘর করবি।"
"বাব্বা! চয়ন তো একদম গুরুঠাকুরদের মতো লেকচার দিতে
শিখেছে। আমাদের অভিষেকও এরকম লেকচার দিত। এখন
বসে কাওয়ালি গাইছে।"
"তুই শেষে অভিষেকের সঙ্গে আমার তুলনা করলি? ছি ছি!"
"তুলনা কই করলাম, জাস্ট বললাম। আর তাছাড়া অভিষেক
ছেলেটাও খুব খারাপ নয়, কপালদোষে ফেঁসে গিয়েছে।"
"বউকে যে খুন করেছে সেই লোকটা খারাপ নয়? কী বলছে
আপনার বিয়ে না করাই ভাল।" ঝুমা রেগে গেল এবার।
"আপনারা দু'জনেই ভুল বুঝছেন আমায়। আমরা ওকালতি
আমাদের অনেক গভীরে গিয়ে দেখতে হয় ব্যাপারটা। অভি
আর খুন করতে চায়নি সুস্মিতাকে।"
"বউ থাকতেও অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে জড়াল কেন?"
"আসলে অভিষেকের মনে বাবা হওয়ার শখ ছিল খুব, আর
যেহেতু ওকে একটা বাচ্চা দিতে পারেনি..."
"বাচ্চা দিতে পারেনি মানে? মেয়েরা কি গরু যে, বাচ্চার জন্ম
হবে? কোন মান্ধাতার যুগে পড়ে আছেন আপনারা?"
অত্রি ঘাবড়ে গেল, "রাগ করবেন না ম্যাডাম। তা বলতে চাই
আইন ভাঙিয়ে খাই, এক্সট্রা-ম্যারিটাল থেকে যে কত অশান্তি
খুনোখুনি রোজ দেখছি। কিন্তু অভিষেকের ওই পার্টনার প্রেগ
হয়ে গেলে অভিষেক বাচ্চাটা অ্যাবর্ট করাতে পারেনি কারণ,

পুরুষ যা খুশি তাই করতে পারে। তার সাতখুন মাফ। সত্যি, সমাজ বটে একটা।"

"ঝুমা, তোমার এত উত্তেজিত হওয়ার মতো কিছু হয়নি। অত্রি তুই বল তো, খুনটা কেন হল? টিভিতে দেখে ঠিক ক্লিয়ার হয়নি আমার।"

"টিভিতে আলোচনা করতে আসা লোকগুলো এ ওকে হারাবে বলে এমন বাজে বকতে থাকে যে, পুরো ব্যাপারটা গুলিয়ে যায়। আসলে কিন্তু কেসটা একদমই জটিল নয়।"

"শুনি সেটা।" ঝুমাই বলল।

"ব্যাপার আর কী? অভিষেক শান্তিনিকেতনে গেছে, সুস্মিতাকে নিয়ে। ওদিক থেকে জাহ্নবীও এসেছে। অভিষেক আর জাহ্নবীর মেয়েকে নিয়ে। দোলের দিনগুলো এইভাবেই বাবা-মেয়ের দেখা হবে, এরকম একটা কিছু প্ল্যান করেছিল হয়তো। কিন্তু জাহ্নবী আর বাচ্চাটাকে নিয়ে একটা ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিল অভিষেক। বুঝতে পারেনি সুস্মিতা ওখানে চলে আসবে। আর সুস্মিতা যখন এসেছে তখন অভিষেক বাচ্চাটাকে নিজের হাতে খাওয়াচ্ছে। সুস্মিতা এগিয়ে গিয়ে চার্জ করে অভিষেককে। অভিষেক তখনকার মতো ধামাচাপা দেওয়া চেষ্টা করে, আল-ফাল বকে। কিন্তু সফল হয় না। তারপর যা জেনেছি, সুস্মিতা ফর্ক কিংবা চাকু দিয়ে অ্যাটাক করে ওদের। অভিষেক আত্মরক্ষার্থেই ওকে ঠেলা দেয় আর তিনতলা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়ে মৃত্যু হয় সুস্মিতার।"

"বাবা, আপনি তো একদম ওই খুনিটার উকিলের মতো কথা বলছেন!" ঝুমা ব্যঙ্গের গলায় বলল।

অত্রি হাসল, "আমি তো উকিলই ম্যাডাম। তবে অভিষেকের নই। যদি হতাম তাহলে অভিষেককে এতবড় অ্যাডভেঞ্চার করতে বারণ করতাম। সুস্মিতাকে লুকিয়েই যখন চালাচ্ছিল, তখন দু'জনকে একই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দরকার কী ছিল?"

"দু'জন বলছেন কেন? তিনজন বলুন। ওই জারজ বাচ্চাটাও তো গিয়েছিল।"

"ঝুমা, জারজ হলেও বাচ্চাটা বাচ্চাই। সেটা ভুলে যেও না।" আমি আর না বলে পারলাম না।

ঝুমা তখনকার মতো চুপ করে গেলেও, কথাটা ওর মনমতো হয়নি সেটা বোঝাই যাচ্ছিল।

আমাদের অভ্যন্তরীণ টেনশন অবশ্য অত্রি বুঝতে পারল না। ও বলে চলল, "এখন তো অভিষেক জেলে আর জাহ্নবীও জামিন পায়নি। সবচেয়ে ঝামেলা হয়েছে ওই তিনবছরের মেয়েটার। সমাজের চাপে কোনও আত্মীয়স্বজনও ওকে নিজের বাড়িতে রাখতে চাইছে না। কোথায় কোন অরফ্যানেজে আছে বলে শুনেছি। জানি না, কেসের ফলাফল কী দাঁড়াবে আলটিমেটলি। যাই দাঁড়াক, বেশ কয়েক বছরের ব্যাপার। ততদিন বা তারপরও, মেয়েটার যে কী হবে!"

"কী আবার হবে? জামিন পেয়ে গেলে দেবা-দেবী দু'জন মিলে সংসার করবে ওই অবৈধ বাচ্চাটাকে নিয়ে। আর আপনাদের মতো উকিলরা যখন আছেন তখন সুস্মিতার খুনটাকে অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে প্রমাণ করে দেওয়া কতক্ষণের ব্যাপার?" ঝুমা বলে উঠল।

ঝুমার কথাটা কানে লাগছিল, বিশেষ করে যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ও একটা তিন বছরের বাচ্চা সম্বন্ধে মন্তব্য করছিল। কিন্তু সুস্মিতার সঙ্গে একাত্ম বোধ করার ওর নিজস্ব কিছু কারণ আছে, সেটা না বোঝার মতো গাম্বাট আমি ছিলাম না। একবার ভাবলাম ওকে বলি যে, কুটুস আর ওকে নিয়ে আমি খুব সুখী। একটা মেয়ের ইচ্ছা ছিল কিন্তু এরকম কত ইচ্ছাই তো মানুষের থাকে, সব কি পূরণ হয় নাকি? কিন্তু বললাম না কারণ, বোঝাতে গিয়ে হয়তো বা ঝুমার একটা অপারগতাই ঝুমার কাছে নগ্ন করে দেব বলে মনে হচ্ছিল আমার। প্রলেপ দিতে গিয়ে রক্তক্ষরণ হবে আবার। কী দরকার?

সেভাবে। কিন্তু ওই তিন বছরের মেয়েটার কী হচ্ছে ভেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কেউ নয়, কিছু নয়, তবু থেকে সরাতে পারছিলাম না ওই না-দেখা মুখটাকে। পারছিলাম না বলেই অত্রির সাহায্যে, অনেক কাঠখড় পুড়ি দেখা করার অনুমতি জোগাড় করলাম, আমার সহপাঠী অ পালিতের সঙ্গে। কিন্তু আমাকে দেখেই খচে গেল অভিষেক

"কেন এসেছিস চয়ন? মজা দেখতে?"

"না। মজা দেখতে হলে অন্য অনেক জিনিস আছে দুনিয়ায় এসেছি, আমার খারাপ লাগছে বলে। কেন করলি বল তো

"করতাম না তো কী করতাম? তিন বছরের একটা বাচ্চার বসাতে আসছিল সুস্মিতা, বসাতে দিতাম? তুই আমার জায় থাকলে কী করতি? নিজের বাচ্চাকে বাঁচাতি না?"

"বাঁচাতে গিয়েই হল? নাকি তুই জেনেবুঝে ধাক্কাটা দিয়েছি

"না, দিইনি। আমি অনেক দিন ধরেই একটা মিটমাটের কথ ভাবছিলাম। মানুষ তো সাবমেরিন নয় যে, জলের তলায় স লুকিয়ে থাকবে। আমি কোথাও একটা সমঝোতায় আসতে চাইছিলাম। যাতে শান্তিতে বাঁচতে পারে সবাই।"

"এইরকম একটা কেসে সমঝোতা হয়? তুই কি পাগল?"

"কেন হবে না বল তো? নিশাকে যদি অ্যাকসেপ্ট করে নিত আমার আর জাহ্নবীর সম্পর্কটা মেনে নিত, কী এমন মহাভ অশুদ্ধ হত? নিজে মরল, আমাকেও মেরে গেল। আর ধ্বংস গেল আমার বাচ্চাটার জীবনটা। উফ! এত অসহিষ্ণু কেন ম অন্যের যা, সেটাকে কোথাও নিজের বলে মেনে নেওয়া যা

"তুই তিনশো বছর আগেকার একটা পৃথিবী থেকে কথা বল পৃথিবীটা এখন আর ওরকম নেই। তুই সাঁইত্রিশটা বিয়ে কর বামুন নোস, আর সুস্মিতাও মোগল হারেমের একশোটা বাঁ একজন নয়। এটা টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি অভিষেক।"

"থার্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি অবধি যদি পৃথিবী টেকে তাহলে সেদি সন্তান হওয়াটা বিয়ের একটা আবশ্যিক শর্তই থাকবে। তুই বাবা হয়েছিস, তুই বুঝিস না, বাবা হতে না পারলে কত লে দৃষ্টিতে নপুংসক হয়ে বেঁচে থাকতে হয়?"

"তাই বলে তুই যা করলি..."

"জ্ঞান দিস না তো। যা করেছি, বেশ করেছি। তার জন্য যদি ঝুলতে হয় ঝুলব। তুই বিদেয় হ।"

"সে আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমি আজ তোর জন্য আসিনি আমি এসেছিলাম তোর মেয়েটার জন্য। আসলে আমি নিজে মেয়ের বাবা হতে চেয়েছিলাম। পারিনি। তাই অত্রির মুখে বাচ্চাটার দুর্দশা শুনে আর থাকতে পারিনি।"

আমার কথার ভিতরেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠল অভিষেক

"একবার আমার মেয়েটাকে দেখলে তুই চোখ ফেরাতে পা সেদিন যখন হোটেলে তুই আমাকে আর জানুকে দেখলি, নি ঘরে ঘুমোচ্ছে।"

"মেয়েকেও নিয়ে গিয়েছিলি ওই হোটেলে?"

"আমরা ওভাবেই সংসার করতাম রে। সুস্মিতাকে ফাঁকি দি দুনিয়াকে লুকিয়ে ওই দু-তিনমাসে দু-চারদিন। ভাগ্যে সেটুক সইল না। কিন্তু তুই একটু দেখ না ভাই। তোর মেয়ের শখ আমার মেয়েটাকেই নিয়ে গিয়ে মানুষ কর না। আমি জেল কবে বেরোব, দশ না পনেরো কতবছর লাগবে, কোনও ঠিব বেরোলেও ফিরিয়ে আনতে যাব না। ও মানুষ হচ্ছে, সেটুকু নে না ভাই।"

"ওর মা এখন কোথায়?"

"জামিন পেয়েছে। কিন্তু যে-কোম্পানিতে চাকরি করত সেট গেছে। খাবে কী? মেয়েকে নিয়ে?"

দেখছি যদি ভদ্রমহিলার জন্য কিছু করতে পারি।"

"প্লিজ় ভাই। আমি জানি তুই অন্যরকম ছেলে। তুই সুযোগ নিবি না। প্লিজ় একটু দেখ। তাহলে জানু মেয়েটাকে নিয়ে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারবে অ্যাটলিস্ট।"

আমি অভিষেকের হাতে আমার কার্ডটা দিয়ে বললাম, "তোর সঙ্গে যেদিন দেখা করতে আসবে সেদিন জাহ্নবীকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলিস। একটা কথা শুধু বলে যাচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে তোর মেয়ে খেতে পাবে না, এটা হবে না।"

"আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব তোর কাছে। আর সব চুলোয় যাক, আমার মেয়েটাকে বাঁচা। উকিল তো বলছে, অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে আমি তিনবছরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাব। ততদিন তুই নিশাকে একটু দেখে দে। আর প্রমাণ করা যাবে না কেন? ব্যাপারটা তো অ্যাক্সিডেন্টই, বল?"

"দুনিয়ায় যেখানে যখন যা ঘটে, সবটাই অ্যাক্সিডেন্ট রে। আমরা বোকার মতো প্ল্যানিং করি।" আমি বেরিয়ে আসার আগে বললাম। বেরিয়ে এসে ভাবছিলাম, মাকে প্রসবযন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, মা আর বাচ্চার অচ্ছেদ্য বন্ধনটা বোঝা যায়। কিন্তু কী আছে এই ঔরসের মধ্যে যে, জেলে বসে থাকা লোকটাও নিজের প্রতিভূর জন্য পাগল হয়ে ওঠে? অভিষেকের মেয়ে আর তার মা যাতে মানুষের মতো বাঁচতে পারে তার জন্য আমি আমার সাধ্যের ভিতরে যা আছে সব করব। কিন্তু একইসঙ্গে আমি এই ফর্মুলাটাকেও জীবনের ধ্রুবসত্য বলে স্বীকার করব না। একজন কুমোর যদি গঙ্গার ধারের মাটি নিয়ে এসে মা দুর্গার মূর্তি গড়তে পারে আর অগণিত মানুষ যদি অঞ্জলির সময় সেই মূর্তিকেই দেবী ভাবতে পারে, তাহলে আমি কোনও অরফ্যানেজ থেকে নিয়ে আসা একটা ডলপুতুলকে নিজের মেয়ে ভাবতে পারব না কেন?

বাড়ি ফিরে দেখলাম ঝুমা ঘুমিয়ে পড়েছে। এই অসময়ে ঘুমোচ্ছে কেন ভাবতে ভাবতে আমি ওর পাশে বসে নীচু হয়ে ওর দুটো চোখে চুমু দিলাম আলতো করে।

ঝুমা ধড়ফড় করে উঠে বসল, "ও তুমি! কখন এলে?"

আমি কোনও জবাব না দিয়ে ঝুমাকে আমার অনেকটা কাছে টেনে নিয়ে বললাম, "ঝুমা আমরা একটা মেয়ে অ্যাডপ্ট করতে পারি না?"

১৫

আমার নতুন বস ব্রিজলাল সাক্সেনা রসিক মানুষ। অত্যন্ত দক্ষ আর অসম্ভব কাজেরও মানুষ, নইলে কোম্পানি ছেষট্টি বছর বয়স অবধি রাখত না ওঁকে। তবে এই সবকিছুর সঙ্গে ব্রিজলালের সেন্স অফ হিউমার এত তীব্র আর তীক্ষ্ণ যে, তার সামনে কথা বন্ধ হয়ে যায়।

"আচ্ছা তোমরা বাঙালিরা এই যে সারাক্ষণ 'খোট্টা', 'জাঠ' 'কাউ-বেল্ট' এসব বলো; কী বোঝাও কথাগুলো বলে? ইউপি, দিল্লি, রাজস্থানের লোকগুলো খুব গোদা, বুদ্ধিহীন, এটাই তো?"

সেলস প্রোগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম। এই প্রশ্নের কোনও উত্তর যোগাল না মুখে।

"আচ্ছা তোমার মনে হয়, মথুরায় জন্মানো কৃষ্ণ খুব বোকা একটা লোক ছিলেন? বা হরিয়ানভি অর্জুন একদম মাথামোটা?" ব্রিজলাল ভুরু নাচালেন।

"এসব আসলে হাজার-হাজার বছর আগেকার কথা তাই..."

"ওকে, লেটস কাম টু দ্য প্রেজ়েন্ট। রাজস্থান থেকে যে-লোকগুলো লোটা-কম্বল সঙ্গে করে কলকাতায় এসে আজ কলকাতার প্রায় আশিভাগ প্রাইম প্রপার্টির মালিক, তাদের একদম আকাট বলে মনে করো তুমি?"

"নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির যা অবদান বা

ব্রিজলাল ইলেকট্রনিক সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে নিয়ে বললে
"আই এগ্রি। কিন্তু নিজেকে যে-জাতি বাঁচাতে পারবে না, সে
ইতিহাসকে বাঁচাবে কী করে? আমার বাবা বলতেন, বাংলা
শিখলে পরে ভারতে 'এলিট' হওয়া যায় না। আমাকে তাই
মাস্টার রেখে বাংলা শেখানো হয়েছিল রীতিমতো। বঙ্কিম প
গিয়ে দাঁত ভেঙে যেত, শরৎচন্দ্র এনজয় করতাম, পরে শর
আমার ছেলে-মেয়েরা কেউ বাংলা না শিখলেও আমার না
গড়গড়িয়ে বাংলা বলতে পারে। কারণ কী জানো?"

"আপনি শিখিয়েছেন?"

"মোটেই না। আমার সঙ্গে তো দেখাই হয় ন'মাসে ছ'মাসে
আধবার। ওরা বাংলা শিখেছে বাড়ির কাজের লোকেদের
দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চলে এখন 'ডোমেস্টিক হেল্প'দের প্রায়
শতাংশ বাংলাভাষী। বঙ্গ গরিমা একেবারে ফুল সার্কল কম
ফেলেছে।" হেসে উঠতেন সাক্সেনা।

আমার সেই হাসির আওয়াজটা খারাপ লাগলেও ওঁর কথা
পিছনের যুক্তি খণ্ডাতে পারতাম না।

মাঝেমধ্যে আমাকে নিয়ে পার্ক স্ট্রিট বা চাঁদনিতে ড্রিংক করা
যেতেন ব্রিজলাল। আর দু-তিন পেগের পরই ওঁর ভিতরের
উথলে উঠত। মাঝবয়সে এক অধ্যাপিকার সঙ্গে জড়িয়ে গি
পরিবারের কাছে ব্রাত্য হয়ে যান ব্রিজলাল। সেই সম্পর্ক থে
কোনও সন্তান আসেনি পৃথিবীতে, কিন্তু বছর দুয়েক একস
সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে। এই ঘটনার অল্প কিছুদিন আগেই
মারা গিয়েছিলেন, তাই নিঃসঙ্গ ব্রিজলালের কাছে সেইসময়
ভার্মা একটা মরুদ্যান হয়ে উঠেছিলেন। দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি
সম্পর্ক, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরা সৈনিক যেমন নিজের
বুলেটটাকে অনন্তকাল ভিতরে বহন করে, ব্রিজলালও মন
স্মৃতি সেভাবে বহন করতেন।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, "নৌকাটা
একবার ভাসিয়ে দিলে সে তো ভেসেই যাবে তাই না, যতক্ষ
না ডুবে যাচ্ছে! পুরুষের জীবনও তেমনই। সে তো বাই নেচ
অ্যাডভেঞ্চারিস্ট। একটা সিংহ কি গরুর জীবন যাপন করতে
বুঝতে পারতাম, প্রেমে ব্যর্থ ব্রিজলাল ওই আগ্রাসনটাকেই
কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন।

একটা বিশেষ বারে বসে আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস কর
"তুমি তোমার সাংসারিক জীবনে সন্তুষ্ট?"

"হ্যাঁ, অসুবিধে তো কিছু নেই।"

"সুবিধে-অসুবিধের কথা জিজ্ঞেস করিনি। জিজ্ঞেস করেছি,
কি না।"

চুপ করে থাকতাম। কী উত্তর দেব? হেসে 'হ্যাঁ' বলে চলে
কুটুস হবার পর থেকেই ঝুমা ওকে নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত।
হয়তো স্বাভাবিক, বিশেষ করে আমি যখন কাজের চাপে
খোঁজখবরই রাখতে পারি না। কিন্তু আমার আর ঝুমার নৈ
বালির তলা দিয়ে বইতে থাকা নদীর মতো অদৃশ্য হয়ে গেল
তাই নিয়ে অভিযোগ জানাব কাকে? কুটুস হওয়ার পর আ
ঝুমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, ও অত ঝুলন সাজাতে ভা
কিন্তু বিয়ের পর একবারও ঝুলন সাজাল না কেন, ফ্ল্যাটের
বারান্দায়? হোক না ভাড়ার ফ্ল্যাট, তবু তো নিজেদেরই।

"আসলে জ্যান্ত পুতুল আর আসল সংসার পেয়ে গিয়েছি
ওইসব ইট-বালির নকল পৃথিবী আর প্লাস্টিকের পুতুল ঘা
করতে মন চায় না।" কুটুসকে জড়িয়ে ধরে ঝুমা জবাব দিয়ে
আমি সেই কথার উত্তরে মনে মনে বলেছিলাম, "জ্যান্ত পুত
কিন্তু কিছু চাহিদা থাকে। শুধু ছোট পুতুলদের নয়, বড় পুতু
ঝুমা শুনতে পায়নি।

সাক্সেনা সাহেবের সাহায্যেই আমি যে জাহ্নবীর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছি, মেয়েটাকে নিজের কাছে নিয়ে একজন মা যে বাঁচতে পারছে, ঘুণাক্ষরেও সেসব বলিনি ঝুমাকে। বললে পরে ও খামোখা আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ত। পদে পদে সন্দেহ করত যে, আমি এখন হয়তো অভিষেকের বিপন্ন প্রেমিকার সঙ্গে মেলামেশা করছি, অভিষেকের মেয়ের হয়তো বা বকলমে আমিই বাবা এখন। একদিন রাত্রে, যখন আমার নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ওর নিশ্বাস, আমার জিভের লালার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ওর লালা, ওর কপালের চুল এসে ঢেকে দিচ্ছে আমার চোখ, একটা গোটা পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে গিয়েই আলোতে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে, তখন ঝুমা আমায় জিজ্ঞেস করেছিল ও আবার মা হতে পারল না বলে আমি ওকেও ছেড়ে যাব কি না!

সেই রাত্রির পর থেকেই আমি অনেক মেপে কথা বলা শুরু করি ঝুমার সঙ্গে। স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে ফেলেছে যার মন, তাকে কথা দিয়ে এদিক-ওদিক টানা একরকম অত্যাচার করাই। দ্বিতীয় যে-কাজটা জোরকদমে শুরু করে দিই তা হল বাচ্চা দত্তক নেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু সেটাই কি খুব সহজ? চোদ্দোরকম কাগজপত্র জমা করে, রোজগারপাতির অকাট্য প্রমাণ দিয়ে আরও হাজারদফা, 'কী চাইছি', 'কেন চাইছি'র উত্তর দিয়েও অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হল শুধু। বোঝাতেই পারছিলাম না একটি ছেলে থাকা সত্ত্বেও, কেন আমরা আর একটি সন্তান, একটি মেয়ে নেব। প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠে আসছিল। ভারতে যেখানে লাখো বাচ্চা ফুটপাথে মরছে, শিশুশ্রমিক হয়ে কাজ করছে চায়ের দোকানে, কয়লা খাদানে, সেখানে একটা বাচ্চাকে আমরা ভালবাসায়, মমতায় বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছি, মানুষ করতে চাইছি, এইটাই কি যথেষ্ট নয়?

নিজের সন্তানের মতো করে নয়, নিজের সন্তান ভেবেই মানুষ করব, একটু সংবেদনশীলতা থাকলেই উলটোদিকের লোকটার সেটা বোঝার কথা, কিন্তু এই দেশে একটা চেয়ারে বসলেই বোধহয় মানুষের মানুষকে হ্যারাস করার ইচ্ছা জন্মায়। সরকারি সেট-আপ হলে সেই ইচ্ছেটা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়, সেটা নিজে যখন সরকারি চাকরি করতাম তখনও বুঝেছি, এখনও বুঝছিলাম।

ওই বিশেষ বারটাতে যেদিনগুলো যেতাম আমরা, ব্রিজলাল বার-সিঙ্গারদের টাকা দিতেন। জঘন্য একটা নিয়ম ছিল বারটার। পাঁচশো টাকার নোট একবারে কেউ দিলে সে গায়িকার ব্লাউজের ভিতর হাত ঢুকিয়ে টাকাটা ভরে দিতে পারত।

"ঠিক সেই কারণেই আমি একশো টাকার দশটা নোট আলাদা আলাদা করে দিই, একসঙ্গে পাঁচশো টাকা দেওয়ার ছলে একজন শিল্পীর ব্লাউজের ভিতরে হাত ভরে তাকে অপমান করি না।"

শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে গেল, ইচ্ছে করল মানুষটাকে প্রণাম করি। মাথা নামিয়ে ফেলেছিলাম, যখন তুললাম, সাক্সেনা আমার চোখ দেখেই বুঝতে পারলেন আমার ভিতরে একটা তোলপাড় চলছে।

"আমাকে কিন্তু মহৎ ভেবো না চয়ন। আমি আমার রিলেটিভদের মধ্যে খুব নিন্দিত একটা লোক যে বউ মারা যাওয়ার পর, পঞ্চান্ন বছর বয়সে এক মধ্য চল্লিশের মহিলার সঙ্গে লিভ-টুগেদার করেছে।"

"সেটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আমি সেটা মানতে রাজি নই।"

"আসলে কী জানো চয়ন, মধ্যে-মধ্যে দিল্লি-মুম্বই করলেও জীবনের একটা বড় অংশ কলকাতায় কাটিয়েছি তো, অনেককিছুই দেখেছি সামনে থেকে, তাই অনেক বাঙালি ভণ্ডামি আর বাঙালি সূক্ষ্মতা আমার মধ্যে মিশে গিয়েছে।"

"গল্প বলুন। শুনি। আজ তো শনিবারের সন্ধ্যা, তাড়া কিছু নেই।" আমি একটা চুমুক দিলাম গ্লাসে।

ব্রিজলাল যেন আমার কথাটারই অপেক্ষায় ছিলেন। নস্টালজিয়ায় ডুব দিলেন, "চাকরিজীবনের প্রথমদিকে ক্রিক রো-র একটা বাড়ির নির্মলদা আমাকে এই বারে নিয়ে এসেছিল প্রথম। চুপিচুপি
তখন নির্মলদার বউ সুমিতাবউদি গান গাইত।"

"সেই সময়? বাঙালিবাড়ির বউ? বারে?"

"উপায় কী? দাদার কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তো। মো
ভাল পোস্টেই চাকরি করত লোকটা। হঠাৎ করে স্ট্রাইক শু
কারখানায়, মজুরি বাড়ানোর দাবিতে। মালিকরা আশি টা
রোজ দিতে চাইছিল কিন্তু শ্রমিক নেতৃত্ব একশো দশের নি
রাজি হল না কিছুতেই।"

"কিন্তু এই আন্দোলনটাকে আপনি অন্যায় বলতে পারেন
"আরে ভাই, আমি ন্যায়-অন্যায় বলার কে? নিশ্চয়ই মজু
দাবি যুক্তিসঙ্গতই ছিল। আমার অবাক লেগেছিল এটা দেখে
আন্দোলনটার নেতৃত্বে ছিলেন শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারি
করা বাবুরা। কিন্তু কারখানা তো আর রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা
নয়, তারা কী করল জানো? যেখানে আশির বদলে ষাট টা
কাজ করাতে পারবে সেই মুলুকে শিফট করিয়ে দিল যন্ত্রপা
মস্ত বড় বড় কয়েকটা তালা ঝুলে গেল কারখানার গেটে।
কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেল তার তিন-চারদিন পর থেকেই
প্রফেসর, বাবুরা সরে গেল আন্দোলন থেকে। শ্রমিকরা বে
ঘরে একবেলা একথালা ভাত পেল না; ওদের বাচ্চাগুলো
কাতরে মরলেও সোয়েটার পেল না একখানা, কেবল 'তে
মনের জোর রেখে লড়ে যেতে হবে' এর বাইরে কোনও বা
এল না বিপ্লবের বুলি আওড়ানো ব্রাউন সাহিবদের কাছ থে

"মালিকরা শোষণ করছিল সেটা যেমন সত্যি..."

ব্রিজলাল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "মালিকরা তো
করতেই এসেছে, চ্যারিটি নয়। তুমি তাদের পঞ্চাশ টাকা বে
এনে দিলে, তারা তোমাকে পাঁচ টাকা দেবে। সেটাকে যদি
বলি তবু এটা তো সত্যি যে, রক্তশোষণ করার জন্য অন্তত
খাওয়াতে হবে? এবার তুমি বলতে পারো শ্রমিকরা আজী
'পান্তাভাত' খাবেই বা কেন?"

"যাই বলি, তার উত্তর আছে তো আপনার কাছে।"

"অবশ্যই আছে, কারণ আমি স্পটেই ছিলাম, সেই সময়টা
ছিলাম। তাই 'পোলাও খাওয়াব' বলে যারা ভাতটাও বন্ধ
দিয়েছে তাদের ক্ষমা করতে পারি না কিছুতেই।"

"নির্মলদার বউয়ের গল্পটা শেষ করুন।"

"বউদির দারুণ গানের গলা ছিল। তখন তো এইসব টিভি
হয়নি, ফাংশনে চান্স পাওয়াও কঠিন ছিল, বউদি এই বারে
গাইতে আসত।আর নির্মলদা আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসত ব
পাহারা দিতে। অবাক করা কাণ্ড কী জানো, তখনও এই ব্ল
ভিতর টাকা ভরে দেওয়ার ব্যাপারটা চালু ছিল। একশো টা
সেই সময় সিঙ্গারের বুকে হাত দেওয়ার জন্য। বউদির বুকে
কেউ হাত বাড়াচ্ছে দেখলেই নির্মলদা অন্যদিকে চোখ ঘুরি
তারপর আমায় জিজ্ঞেস করত, কটা নোট জমা পড়ল।"

"আপনি কিছু বলতেন না?"

"কী বলব, বউদি ওই কাজটা না করলে দুটো বাচ্চা সমেত
না-খেয়ে মরত তো। নির্মলদা আর কোনও কাজেরই উপযু
না। খালি গবেষণা করত যে, আদর্শ কপচিয়ে মাথাটা খেয়ে
পরও মানুষের খিদে পায় কেন।"

"আচ্ছা স্যার, ওই নির্মলদার জায়গায় কোনও বিহারি বা ম
কিংবা ইউপি-র লোক হলে কী করত বলে মনে হয় আপন
"ইউপি-র কায়স্থ হলে কী করত বলতে পারি না, তবে বিহ
ছাতু বেচত, সর্দারজি হলে ট্যাক্সি চালাত, ওড়িয়া হলে প্লাম্বি
বা জল-দেওয়া ভারী হত আর মাড়োয়াড়ি শ্রমিক হয় না,
তাই এই সিচুয়েশনেই পড়ত না।"

ঠেলে দেয়?"

"মে বি, নারী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাস করে তাই। নির্মলদা যেমন বলত যে, বাচ্চাদের খাইয়ে রাখার দায়িত্ব ওর যতটা, বউদিরও ততখানি। কিন্তু আবার সেই লোকটাই গলা নামিয়ে আমাকে বলত ব্লাউজের ভিতর যতগুলো নোট যায় বউদি নাকি ততগুলোর কথা বাড়িতে ডিক্লেয়ার করে না। কম করে বলে।"

লেট সিক্সটিজ়-আর্লি সেভেন্টিজ়, নকশালবাড়ি, ভাড়াবাড়ি, ইউপি-র ব্রিজলাল, বাংলার সুমিতাবউদি, ব্লাউজের ভিতর গুঁজে দেওয়া টাকা আর তার সংখ্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব, সব কীরকম ককটেল হয়ে ধাক্কা মারছিল মাথায়। আর তার ভিতরে গমগম করছিল গান।



আমার খুব ইচ্ছে করছিল সান্ত্বনা দিই। কিন্তু সেটা দেওয়ার পর আমি আর তদন্ত করার জায়গায় থাকি না বলে, চুপচাপ রিকশায় উঠলাম।

"একটা জিনিস দেখেছ? নন-বেঙ্গলিরা কেউ হিন্দি গান শুনতে চাইছে না। সন্ধ্যা-লতা-আরতি শুনতে চাইছে। কেন বলো তো?"

"কেন?" আমি প্রতিপ্রশ্ন করলাম।

"বাংলা গানের মিঠাসটা চাইছে লাইফে। বাংলা সুর, বাংলা কথা, বাংলা ছেনালিও এত মিষ্টি যে, অল ইন্ডিয়ার লোক পাগল হয়ে যায়। এই সুইটনেস যে বুঝবে না, তাকে দিয়ে কি বাঙালির দোষ-গুণের বিচার হবে?"

"হবে না।" আমি হালকা নেশার ঘোরে বললাম।

"রাইট ইউ আর। তাই তো রুদ্রাশিসের কেসটা তোমাকেই হ্যান্ডল করতে হবে।"

"মানে?"

ব্রিজলাল শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ডোন্ট ওরি। তোমার সঙ্গে আর একজনকে দেব।"

১৬

রুদ্রাশিস আমাদের কোম্পানিতেই পারচেজ়ে ছিল। আমার
খুবই সামান্য পরিচয়। দু'চারদিন দেখা হয়েছে। অফিসের
সামান্য কথা।

"রুদ্রাশিস কী করেছে?" জিজ্ঞেস করলাম ব্রিজলালকে।

"রুদ্রাশিসের নামে কমপ্লেন আছে। ও ঘুষ তো খেয়েইছে।
অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্টের কিছু র' মেটিরিয়ালও নাকি পাচার ক
দিয়েছে। আমার উপরে দায়িত্ব পড়েছে শাস্তি দেওয়ার, কিন্তু
তদন্ত কমিটি না বসিয়ে আমি তো ওকে ছেঁটে ফেলতে পারি
ফ্যাক্ট চাইও না।"

"সেই দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে?"

"হ্যাঁ, তোমাকেই নিতে হবে। আমি চাইলে এক কলমের খে
ব্যাপারটা ডান করে দিতে পারি। কিন্তু আমরা কি শুধু সুবি
যাব, নিজেদের কোর্টে বল এলে নিজেরাও ফেয়ার হব না?
বড় কোথাও না নিয়ে গিয়ে এখানে নিয়ে এলাম কেন? আ
চাইছিলাম এই স্ট্রাগল আবার ফিল করতে। মদ খাওয়ার উ
নয় যে, সব যন্ত্রণাকে ভুলে যেতে হবে, মদ খেয়ে যেন কাঁটা
গোলাপ ভেবে হাতে নিতে পারি।"

ব্রিজলালের নেশা হয়ে গিয়েছিল, বুঝতে পারছিলাম আমি।
আর বাড়ালাম না তাই। তবে দু'দিন পর চেম্বারে ডেকে যখ
শতভিষা রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, হাল
নেশা আমারও হতে পারত। কারণ বিরাট কিছু সুন্দরী না হ
যারা অসম্ভব অ্যাপিলিং, শতভিষা তাদেরই দলে। কোম্পানি
আর-এ ভাল পোস্টে আছে এবং কথাবার্তা শুনে যেটুকু বুঝ
আরও অনেকদূর উঠবে।

শতভিষা আর আমাকে একত্রে রুদ্রাশিসের কেসটা দেখার
দিলেন ব্রিজলাল। আমি এইচ আর-এর লোক নই, শতভি
ডিপার্টমেন্টের অন্য কাউকে নিতেই পারত সঙ্গে, কিন্তু ব্রিজ
চাইছিলেন আমি জড়িত থাকি তদন্তে।

কী করব জড়িত থেকে? রুদ্রাশিস দোষী প্রমাণিত হলে ওর
সুপারিশ? আমি নিজে কি একদম পারফেক্ট যে, অন্যকে শ
সব প্রশ্ন সবসময় করা যায় না তাই মনের কথা মনে চেপেই
একদিন শতভিষার সঙ্গে বসলাম, রুদ্রাশিসের ব্যাপারটা নি

"রুদ্রাশিস যে কোম্পানির বেশ খানিকটা ক্ষতি করেছে সেট
বোঝার জন্য শার্লক হোমস হওয়ার দরকার নেই, দু'চারটে
ঘাঁটাই যথেষ্ট। সাব-স্ট্যান্ডার্ড মাল কেনা থেকে শুরু করে
কোটেশন দালালদের কাছে ফাঁস করে দেওয়া, যা যা করেছে
চাকরি থাকার কোনও সিন নেই, জেলে না যেতে হলেই অ

"কিন্তু রুদ্রাশিসের মতো লোক, যে বারো-তেরো বছর সুন
কোম্পানিতে কাজ করছে, ইতিমধ্যেই দুটো প্রোমোশন হয়ে
সে এরকমটা করতে গেল কেন? কীসের তাড়নায়?"

"সেই খোঁজ নেওয়া কি খুব জরুরি? প্রত্যেকটা চোরেরই
কিছু অ্যালিবাই থাকে।" শতভিষা বলেছিল।

সেদিন শতভিষা পরে এসেছে একটা অক্স-ব্লাড রেড সিল্কে
আর সঙ্গে একটা কালো স্লিভলেস ব্লাউজ। ঠিক স্লিভলেসও
হল্টার-নেক। যখন উঠে দাঁড়াল তখন একটা রুপোর চাকতি
নাভিটা চোখে পড়ল। ওইরকম একটা হ্রদের ভিতরেই বোধ
দুর্যোধন যুদ্ধে হেরে গিয়ে লুকিয়ে ছিল। আমি চোখ তুলে ও
তাকাতেই দেখালাম বাচ্চা সাদা হাতির শুঁড়ের মতো দুটো
হাত, ঠিক ততটা সাদা নয় বলে, আরও মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে
আমি শতভিষার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মনে মনে ব
সব কাপুরুষেরও কোনও না কোনও অজুহাত আছেই।

আমার একটু তলিয়ে দেখার ইচ্ছায় অবশ্য শেষ অবধি বাধ
না শতভিষা। হয়তো এইচ আর-এর কাজ দেখাবার জন্য এ

মেলে না, বিশেষ করে যখন চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করতে হয়। তাও শেষমেশ একটা-দুটো সোর্স কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করলাম যে, সেলসের কুশল পাল খুব ঘনিষ্ঠ রুদ্রাশিসের।

"সব জানো কোথায় কী হচ্ছে, অথচ কোম্পানিকে জানানোর প্রয়োজন মনে করোনি? কী ভেবেছিলে, আমরা কিছু জানতে পারব না? এখন এই চোরের স্যাঙাত হবার অপরাধে তোমার চাকরিটিও যদি যায়, কে খাওয়াবে তোমায়? রুদ্রাশিস বিশ্বাস?"

"আমি নিজে তো কোনও অন্যায় করিনি স্যার। তারপরও চাকরি গেলে যাবে। রাস্তায় বসে আলু বেচব।"

"অথচ যে-কোম্পানি তোমায় খাওয়ায়-পরায়, সেই কোম্পানির ক্ষতি যে করছে তার বিরুদ্ধে মুখ খুলবে না? এই তোমাদের সততা?"

কুশলের চ্যাটাং-চ্যাটাং উত্তরে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার।

"সততার চেয়ে মনুষ্যত্ব বড় স্যার। রুদ্রাশিসদা চুরি করেছে কি না জানি না, কিন্তু করে থাকলেও ওকে দোষ দিতে পারব না। বউদিকে বাঁচানোর জন্য ও শুধু সূর্যকে পশ্চিমদিকে ওঠাতে বাকি রেখেছিল।"

"কী হয়েছে রুদ্রাশিসের স্ত্রী-র?"

"আপনারা ওর বিরুদ্ধে তদন্ত করছেন আর এইটাই জানেন না? ব্রেস্ট ক্যানসার সেকেন্ড স্টেজে ধরা পড়েছে। এখনও পর্যন্ত বাইশটা কেমো নিতে হয়েছে সুজয়া বউদিকে।"

"স্ত্রীর এত বড় অসুখ, অথচ তুমি ছাড়া অফিসের কোনও কলিগকে জানায়নি কেন? কেন অথরিটির কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেনি?"

"আসলে নিজের লড়াইটা নিজেই লড়তে চাইছিল।"

"একদম মিথ্যে বলবে না কুশল। নিজের লড়াই নিজে লড়তে চেয়েছিল না হাতি! রুদ্রাশিস অফিসের কারওকে জানায়নি কারণ, অফিস রুলস মেনে যত টাকা সাহায্য ওকে করা যেত তাতে ওর পোষাত না। তাই ও সবার কাছ থেকে বিষয়টাকে লুকিয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকার দুর্নীতিতে জড়িয়েছে।

"আমি ঠিক বলতে পারব না স্যার। আমি জানি না।"

"তুমি সব জানো। আর বলতেও তোমাকে হবেই। নইলে শো-কজ় নোটিস ধরানো হবে তোমায় কালকেই। রাস্তায় বসে আলু বেচার কথা বলা যতটা সহজ, সত্যি রাস্তায় বসে বিক্রি করাটা কিন্তু তত সহজ নয়। এই যে আমি বসে আছি, আমি নিজেই মুদি দোকানির ছেলে। আমি জানি কে কী বিক্রি করতে পারে। তোমার ছেলে যে-স্কুলে পড়ে তার মাসমাইনে কত? উঠবে টাকাটা আলু বেচে?"

কুশল ভেঙে পড়ল, "সরি স্যার, আমায় ক্ষমা করে দিন। আমি তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু আপনি ঠিকই বলছেন, রুদ্রাশিসদা অন্যায় করেছে। যে-কোম্পানি আমাদের মায়ের মতো, তার সঙ্গে এরকম বেইমানি করা ঠিক নয়।"

"কথাগুলো রুদ্রাশিসকে বলোনি কেন?"

"আসলে স্যার, তখন যা অবস্থা তাতে কথাগুলো বলা যেত না। বউদিকে নিয়ে ও একবার মুম্বই, একবার চেন্নাই যাচ্ছে; জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে চারদিক দিয়ে, আমি নিজেও পঞ্চাশ হাজার ধার দিয়েছি রুদ্রাশিসদাকে। শোধ চাইনি।"

"অফিস কী করে সেটা তো একবার দেখতে পারত?"

"সেটাই ঠিক কাজ হত। মাথা কাজ করেনি তখন।"

"আবার সাফাই দিচ্ছ?"

"সাফাই নয় স্যার, তখনকার পরিস্থিতি চোখে দেখা যায় না। সুজয়া বউদি একটা কঙ্কালের মতো হয়ে গেছে। মাথাটা পুরো ন্যাড়া, ওজন হার্ডলি বেয়াল্লিশ-চুয়াল্লিশ কিলো, বিছানার সঙ্গে লেপটে মিশে আছে, ওদের ক্লাস সেভেনে পড়া মেয়েটা গ্যাসে জল গরম করতে গিয়ে বাটি উলটে হাতে-পায়ে ফোসকা নিয়ে ঘুরছে, ভয়াবহ অবস্থা স্যার। আপনি দেখলে বুঝতেন।"

"নিশ্চয়ই বুঝতাম। শুনেও বুঝছি না তা নয়। এমনটা যেন কারও না

চুরি-ডাকাতিগুলো চালিয়ে গেছে। অফিসেরই কম্পিউটার
তথ্য চুরি করে, টেন্ডারে কে কী কোট দিয়েছে সেটা জানিয়ে
শরাফের সংস্থাকে, যারা এইরকম দালালির কাজগুলো করে

"কোথাও একটা ভুল হচ্ছে স্যার। কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড
কাছে থাকার কথা নয়।"

"কোনও ভুল হচ্ছে না। পাসওয়ার্ড ওর কাছে ছিল না, কিন্তু
পারচেজ়ের একজন মাথা হিসেবে ওর অ্যাকসেস ছিল
কম্পিউটারটায়। শরাফের হয়ে কাজ করা একটা হ্যাকারকে
বসিয়ে ও কম্পিউটার থেকে ডেটা বের করে নেয়। আর রিসে
তার পরিচয় দেয় নিজের শালা হিসেবে। যেদিন ঘটনাটা ঘটে
দিনটার তারিখ জানতে চাও? ষোলো মার্চ। এই যে তার সম
প্রমাণ। তোমাকে দেখাব, না পুলিশকে?"

"যা ভাল বুঝবেন, স্যার। আমার সত্যিই আর কিছু বলার
কিন্তু ষোলো মার্চ কি রুদ্রদা কলকাতায় ছিল? বাইপাসের ধা
হাসপাতাল থেকে বউদিকে রিলিজ করিয়ে মুম্বই গেল কবে,
সতেরো তারিখ?"

কুশলের বলা কথাগুলোর সূত্র ধরে আমি একাই গেলাম, ব
ওই প্রাইভেট হাসপাতালে। এখানে ফোঁড়া কিংবা অর্শ নিয়ে
হলেও দেড়লাখ টাকা বিল ধরিয়ে দেয় হাতে। অফিস থেকে
যোগাযোগ করা হয়েছিল বলে আমার সঙ্গে অবশ্য ভালই ব
করল ওরা। সুজয়া বিশ্বাসের চিকিৎসার খরচ এবং সেই সং
আমাকে কম্পিউটারে দেখিয়ে দিল ওদের বিলিং সেকশনের
মেয়ে। চাওয়ামাত্র, প্রিন্টআউটও পেয়ে গেলাম প্রায় সঙ্গে স
না, ঠিকই বলেছিল কুশল। এই তো, প্রথম দফাতেই দশদিন
জন্য এগারো লাখ টাকার বিল দেখছি। দ্বিতীয়বার আঠেরো
থাকা এবং চোদ্দো লাখ টাকার বিল। তারপর আবার ন'দিনে
ছ'লাখ। প্রথমবার কনসেশন দেওয়া হয়েছে, ষাট হাজার টাক
দ্বিতীয়বার দেড় লাখ টাকা এবং তৃতীয়বার চল্লিশ হাজার। অ
মোট বিল একত্রিশ লাখ টাকা আর কনসেশন আড়াই লাখ।
সাড়ে আঠাশ লাখ। এর সঙ্গে মুম্বই যাওয়া-আসা, থাকা এব
সেখানকার বিপুল চিকিৎসা খরচ। তারপর আবার চেন্নাইয়ে
যেখানকার খরচ আরও বেশি। পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকার দুর্নীত
জড়ানো রুদ্রাশিসের স্ত্রীর চিকিৎসা বাবদ খরচ, সাদা চোখেই
বাষট্টি লাখের বেশি। এর কিছুটা নিশ্চয়ই মেডিক্লেম থেকে
লোকটা। কিন্তু সেটা আর কত টাকা?

"এখনও পর্যন্ত বাহাত্তর লাখ টাকা খরচ হয়েছে স্যার, দিদি
বাঁচাতে। জামাইবাবুর ফ্ল্যাট, একটা জমি ছিল সেটা, সব বিক্রি
হয়ে গিয়েছে, সব। আপনি দরকারে ওর ব্যাঙ্কের বইগুলো প
করুন।" লোকটা বাজারের মধ্যেই বলল আমাকে।

কুটুস আর ঝুমা দু'জনেই ভালবাসে বলে বড় সাইজের কই ম
দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। সাধারণত আজকালকার ছোট বাচ্চারা
খেতেই অনিচ্ছুক, বিশেষ করে কাঁটাওয়ালা মাছ, কিন্তু কুটুস
ব্যাপারে সত্যিই ব্যতিক্রম। অনেক ছোট বয়স থেকে ছেলেটা
সাহায্য ছাড়াই কাঁটা বেছে মাছ খেতে পারে। ইলিশের ক্ষেত্রে
একটু হেল্প লাগে, কিন্তু সেটাও আর বেশিদিন লাগবে না, অ
নিশ্চিত। ব্যাপারটা নিয়ে আমি রীতিমতো উচ্ছ্বসিত ছিলাম
না মা আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, আমি না পারলে কী
আমার বাবাও কাঁটা তুচ্ছ করে ছোট মাছ খাওয়ায় এক্সপার্ট

"শুনুন, আমি এই ব্যাপারে কিছু করতে পারব না, যা হবে ত
অফিসের নিয়ম অনুযায়ী। আমি জানি না আপনার কেন এই
হয়েছে যে, আমার হাতে আপনার জামাইবাবুর বাঁচা-মরা।
ধারণাটা ঠিক নয়।"

"স্যার, অলোকেন্দু সাহা খবর না নিয়ে কোনও কাজ করে ন

আমি লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনি কী জানেন না জানেন তাতে আমার কিচ্ছু এসে যায় না। আমি শুধু জানি যে, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। ক্যান ইউ প্লিজ় এক্সকিউজ়?"
সামনে থেকে সরে গেলেও লোকটা যে একটু পিছনেই কোথাও অপেক্ষা করছিল আমায় আবার ধরবার জন্য, সেটা বুঝেও অগ্রাহ্য করলাম। কই মাছ কাটাতে একটা অন্তহীন সময় লাগে, তাই চূড়ান্ত বিরক্ত হলেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া সেই সময় অন্য রাস্তা ছিল না। মাছটা নিয়ে বাজারের বাইরে বেরিয়ে ভাবছি নিষ্কৃতি পেলাম, লোকটা ফের পায়ের সামনে ঝাঁপ খেয়ে পড়ল। আমি আঁতকে উঠলাম। তিন সেকেন্ডে সামলে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "প্লিজ় সিনক্রিয়েট করবেন না। হিতে বিপরীত হবে আরও।"
"এক মিনিট স্যার। আমি কোনও সিনক্রিয়েট করতে আসিনি। আমি শুধু আপনাকে এই কাগজগুলো দিতে এসেছি যেগুলো আপনারই তদন্তের কাজে লাগবে। এত খরচের পরও দিদি বাঁচবে কি না জানি না। এবং জামাইবাবু হয়তো দোষী সাব্যস্ত হবে, কারণ ও জালিয়াতি করেছে। জেলও হতে পারে ওর। কিন্তু যদি জেলও হয়, রুদ্রাশিস বিশ্বাস চিরকাল আমাদের কাছে সুপারম্যান আর সুপারহিরোই থেকে যাবে। অনেক হাজ়ব্যান্ডকে তো দেখেছি, স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে আবার বিয়ে করে নেয়। সেখানে আমার দিদির এই সেকেন্ড স্টেজ ক্যানসারে যে-লড়াইটা ও দিয়েছে, যাতে দিদির মেটাস্টিসিস না হয়, দিদি যাতে বেঁচে থাকে, তা ভোলার নয়। দিদি যদি বেঁচে যায় স্যার, তাহলে কৃতিত্ব ভগবানের নয়, জামাইবাবুর। লোকটাকে দেখে কী মনে হয় জানেন? লোকটা যেন যম আর আমার দিদির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ও বিশ্বাস করে যে, ও বেঁচে থাকতে দিদি মরতে পারে না। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে তাও বলছি স্যার, ক্যানস্যার যেমন ছড়িয়ে পড়ে, মেটাস্টিসিস হয়ে যায় পেশেন্টের, আমাদের সমাজে ঘেন্না, অবিশ্বাস, ভালবাসতে না-পারার ক্যানসারটাও ছড়িয়ে পড়েছে তেমনই। মানুষ মানুষকে আপন ভাবতে ভুলে গেছে। কিন্তু ওই রুদ্রাশিসের মতো লোকগুলো বেঁচে আছে বলেই, সমাজটা এখনও ঘুণ ধরে শেষ হয়ে যায়নি। মেটাস্টিসিস হয়নি, ক্যানসার ব্রেস্ট থেকে ফুসফুস পর্যন্ত ছড়াতে পারেনি। থমকে গিয়েছে। কথাটা ভেবে দেখবেন স্যার, একবার।" বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলল অলকেন্দু।
আমার খুব ইচ্ছে করছিল সান্ত্বনা দিই। কিন্তু সেটা দেওয়ার পর আমি আর তদন্ত করার জায়গায় থাকি না বলে, চুপচাপ রিকশায় উঠলাম। অসহায় অলকেন্দু রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল, অসহায় আমাকে নিয়ে এগিয়ে গেল রিকশা।

১৭

"ইদানীং সবাই খুব ডায়ালগ দেয়, সকলেই দার্শনিক কথাবার্তা বলে। আপনি একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন, এই লোকটা হয়তো কবিতাও লেখে।" অলকেন্দু আমাকে রাস্তায় ধরে কী বলেছে, সেই গল্প শোনাতেই শতভিষা বলে উঠল।
ফুলহাতা মেরুন শার্ট এবং ব্লু ট্রাউজার্সে, একেবারে খাঁটি করপোরেট ওম্যান লাগছিল শতভিষাকে। খুব নিরিবিলি এবং গলাকাটা দাম নেয় এমন একটা বার কাম রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়েছিল ও আমাকে। আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল।
এমন নয় যে, একদিন অনেকটা বিল হলে দিতে পারব না কিন্তু আমার কৈশোর আর যৌবন কোথাও একটা লাগাম টেনে ধরে অতিরিক্ত খরচ করতে গেলেই। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কিপটে ঝুমার সঙ্গে এতদিন থাকার কুফল। প্রেমিকা হিসেবে ও রুটি-তড়কার খোঁজ করত। এখন বউ হয়েও তিন কিলোর বদলে সাড়ে তিন কিলো

"আরতি মাসি যে রান্না করে, বুলটি সব কাজকম্মো করে,
খেতে দাও তো ঠিক করে, নাকি প্রাণে ধরে দিতে পারো ন
"ওদেরই জিজ্ঞেস করে দেখো একদিন।" ঝুমা জবাব দিয়ে
"তোমার ঘরে, তোমার সামনে, ওরা কি সত্যি উত্তর দিতে
"তাহলে আমি দাদার কাছ থেকে ঘুরে আসি দু'দিন। উত্তর
হলে, আবার ডেকে নিও।"
"উত্তর তো আমি প্রথমদিনই পেয়ে গেছি। যেদিন অটোও
প্যাকেট চেয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছিলে তুমি।"
কুটুস সোফায় বসে কার্টুন দেখছিল, মায়ের ঘরের দরজাও
তাও ঝুমা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল আমায়। আমার বুকে
জানাল ও হাড়কেপ্পন নয়, শুধু অপচয় পছন্দ করে না। আ
গালে একটা চুমু দিয়ে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিলাম।
ঝুমা কাতর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আর এব
আমি মুখটা গম্ভীর করে বললাম, "অপচয় পছন্দ করি না।
শতভিষা একটু দ্রুতই চুমুক দিচ্ছিল গ্লাসে। আধঘণ্টার ভিত
লার্জ আর একটা স্মল পেগ গলা দিয়ে নেমে গেল ওর।
"কিছু খেতে খেতে খান।" আমি বললাম।
"খাচ্ছি তো, ওই নাগেটসগুলো।"
"শুধু নাগেটসেই হবে?"
"বেশি খেলে ড্রিংক করার মজাটা চলে যায়।"
"তবুও, কিছু না খেলে..."
"আমার হাজ়ব্যান্ড কী বলে জানেন, পাথর জলের গতি রু
কিন্তু পাথর ছাড়া জলপ্রপাতও হয় না।"
"আপনার হাজ়ব্যান্ডও তো কবি দেখছি।"
"পুরুষমাত্রই কবি, কোনও না কোনওভাবে। কবিতা না ব
মেয়েগুলোকে পটাবে কীভাবে?" হেসে উঠল শতভিষা।
আমিও হাসলাম, "আমি কবি নেই। তবে কবিতা পড়ি ম্যা
ট্যাগাজ়িনে। বুঝতে পারলে মন্দ লাগে না। অবশ্য আমার
হাইস্কুল পেরোবার পর এক লাইন কবিতাও পড়েছে কি ন
"আপনি আপনার ম্যারিটাল লাইফে সুখী চয়ন?"
ব্রিজলালের প্রশ্ন শতভিষাও করছে দেখে আমি অবাকই
আমার বিবাহিত জীবন নিয়ে সবার এত কৌতূহল কীসের
"হ্যাপি হলে, এই প্রশ্নটার উত্তরে এরকম চুপ করে থাকতে
স্বতঃস্ফূর্ত একটা উত্তর দিতেন। নিশ্চয়ই কোথাও কোনও
আছে, কোনও জ্বালায় জ্বলছেন আপনিও।"
"জ্বালা কার থাকে না? শূন্যতা কার নেই? কিন্তু হঠাৎ এই
উঠল কেন, বুঝতে পারছি না।"
"উঠল কারণ, আমি হ্যাপি নই। আমার হাজ়ব্যান্ড আমার
ছেলেকে নিয়ে দিল্লিতে থাকে। সেখানে তার একজন লিভ
পার্টনার আছে। আমি কলকাতায় একা থাকি, আমার ফ্ল্যা
"স্ট্রেঞ্জ! আপনার ছেলে মিস করে না আপনাকে? কত বয়স
"সাত বছর।"
"ওহ, আমার ছেলের থেকে বছর দুয়েকের বড়। কিন্তু এই
বাচ্চারা মাকে ছাড়া খুব কমফর্টেবল তো নয়।"
"আমার ছেলে অন্য ধাঁচের। তা ছাড়া তার বাবা দিনরাত্রি
করে তার মাথায় গুঁজে দিতে পেরেছে যে, মা ভাল নয়, ম
ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই আমার ছেলে বাবার বান্ধবীকে নিয়ে
আমার প্রতি উদাসীন। বছরে দু'তিনবার আসে, দশদিন, ব
থেকে যায়; আগেরবার সামার ভ্যাকেশনের সময় তিন স
থাকবে বলে এসেছিল, ওকে নিয়ে নর্থ সিকিম ঘুরে এলাম
কিন্তু কলকাতায় ফিরেই বাবু দিল্লির গরম মিস করতে শুর
তাই ট্রিপ ছেঁটে ছোট করে দিল্লি ফিরে গেলেন। ভাবুন এক
"ভাবার কিছু নেই। এখনকার বাচ্চাদের বোঝা আমাদের ব

ব্যয় করব কেন? আমি কারও মা, কারও বউ পরিচয়ে বেঁচে থাকতে রাজি নই আর। আই অ্যাম আ ফ্রি বার্ড!"
"আপনার হাজ়ব্যান্ড আপনাকে ছেড়ে অন্য কারও কাছে গেলেন কেন? ইউ আর ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ।"
"ইউ মিন, সেক্সি?" জোরে হেসে উঠল শতভিষা।
আমি হিসেব করতে শুরু করলাম, ওর ক'পেগ হল।
"থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট, চয়ন। আমি জানি আমি সেক্সি, ডিজ়ায়েরেবল। ছোট থেকে কত পুরুষ পিছনে পড়ে থাকত আমার, কিন্তু একবার সামনে এসে বললেই তারা খেলো হয়ে যেত আমার চোখে। আমি পুরুষকে প্রায় হামাগুড়ি দিতে দেখেছি, আই হ্যাভ সিন দেম, ক্রলিং ফর মি।" শতভিষা উঠে দাঁড়াল টয়লেটে যাবে বলে।
আমি ওর যাওয়ার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ঝুমাকে টুক করে একটা এসএমএস পাঠালাম, 'অনেক আদর আমার বউটাকে'।
ঝুমা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'হঠাৎ এত প্রেমের কারণ?'
আমি লিখলাম, 'তুমি সুপার সেক্সি নও, আমার ঘরোয়া বউ, তাই।'
ঝুমা লিখল, 'অপমান, অপমান।'
আমি লিখলাম, 'ভালবাসা, ভালবাসা।'
শতভিষা ফিরে এসে আগের জায়গা থেকেই শুরু করল, "আমার হাজ়ব্যান্ডকে যদি দেখেন তাহলে আপনিও মানবেন হি ইজ় রিয়্যালি হ্যান্ডসাম। কিন্তু পল্লবও তো আমায় দেখে আট্র্যাক্টেড হয়েছিল, জাস্ট অ্যাজ় আই ওয়জ় অ্যাট্রাকটেড টু হিম। এবার যখন আমার শরীরটা চেনা হয়ে গেল, অভ্যস্ত হয়ে গেল আমাতে, হি লস্ট ইন্টারেস্ট।"
"তবে তো এই নতুন মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্কের আয়ুও বেশিদিন নয়।"
"সে আমি জানি না। রাধিকা দিল্লির মেয়ে তো, কড়োয়া চৌথ-ফৌথ করে পল্লবের জন্য। আরে লিগ্যালি ম্যারেড হ, তারপর ওসব ন্যাকামি করবি। আর পল্লবেরও তো ওইসব যাত্রা পছন্দ! আমায় ভাল লাগবে কেন? আমি তো ফ্রি অ্যান্ড ফ্র্যাংক, তাই না? একটা সিগারেট হবে আপনার কাছে?"
"হবে, কিন্তু দেব না। মদের সঙ্গে সিগারেট খাওয়া খুব খারাপ শরীরের পক্ষে। পার্টিকুলারলি মেয়েদের জন্য। একজন ডাক্তারই বলেছিলেন আমায়।"
"খারাপ তো খারাপ। ভাল থেকে কী হবে?"
"আপনার নেশা হয়েছে। কাজের কথা বোধহয় আর হল না।"
"না হোক গিয়ে। আপনার খারাপ লাগছে আমার সান্নিধ্য?"
"তা কেন লাগবে? আমি কি তাই বললাম?"
"বলতেই পারেন। আপনারা ছেলেরা কীরকম জানেন তো, একটাই মেয়ের মধ্যে জিনাত আমন আর ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল দু'জনকেই খোঁজেন। কিন্তু দুটো তো একসঙ্গে পাওয়া যায় না স্যার। আইদার ইউ গেট দ্য সেক্স অফ জিনাত আমন অর ইউ গেট দ্য সেবা অফ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। সেক্স আর সেবা দুটোই একপাত্রে, নট পসিবল। উর্বশী কি চাইলেই নিরুপা রায় হতে পারে?"
"উফ, আবার আত্মপ্রশংসা শুরু হল," আমি নিঃশব্দে বললাম।
"আমার হাজ়ব্যান্ড, আই মিন এস্ট্রেঞ্জড হাজ়ব্যান্ড পল্লবের মা নেই। পল্লবের বাবা প্যারালাইজ়ড, যদিও ভদ্রলোকের দেখভাল করার জন্য দু'জন আয়া আছে। উনি ঘরেই পটি করেন, আজ প্রায় দশ বছর। একদিন সকালের আয়া আসেনি, বিকল্প ব্যবস্থাও করা যায়নি, পল্লব জানায় আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে ওর বাবাকে। আমি মুখের উপর রিফিউজ় করে দিয়েছিলাম।
"কিন্তু আপনার নিজের বাবা হলে করতেন না?"
"প্রথমত, আমার বাবা ছিলেন আর্মি-ম্যান। বেঁচে থাকলে অন্যকে দিয়ে ওই সব করানোর আগে গুলি করতেন নিজের মাথায়। দ্বিতীয়ত, আমার নিজের মায়ের ক্ষেত্রেও আমি ওইসব করতে পারিনি বিকজ় ঘেন্না লাগে। ইটস অ্যাজ় সিম্পল অ্যাজ় দ্যাট।"
"তখন দরকার হলে, প্রফেশনাল হেল্প নেব। আমি নিশ্চয়ই না আমার ছেলে আমার জন্য বেডপ্যান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ইভন ইফ আই নিড ইট। আমি উদ্দামভাবে বাঁচতে চেয়েছি; ভালবাসা আর যৌনতা দুটোই; পাইনি সেটা আলাদা কথা। আমার না ওই প্যানপ্যানানি, ঘ্যানঘ্যানানি, পতিসেবা, পত্নী জাস্ট পোষায় না। আমি মরলে কেউ দেখতে আসবে না। করার জন্য তো কেউ নেই। তাহলে যে ওই সেবা করতে গি করেছে, কোম্পানির টাকা মেরেছে, আমি তাকে রেয়াত কর কেন? আই অ্যাম নট অন দ্য সেম প্লেন উইথ দ্যাট রুদ্রাশিস ওর জন্য রুলসের বাইরে যাব না।"
আমি রুদ্রাশিসকে কীভাবে কতটা বাঁচানো যায় তার ছকই কিন্তু শতভিষার হাবভাব দেখে বুঝলাম ডাল গলবে না। অ ও অনেকটা নেশা করেছে। দু-তিনদিন পর আবার একবার করতে হবে মেয়েটাকে। আর এবার অফিসেই।
"আমি যে ডাকলাম আর আপনি এলেন, তার জন্য কি আ হচ্ছে আপনার?"
"কী আশ্চর্য! আফশোস হবে কেন? আমার ভাল লেগেছে। আপনি টলছেন কেন?"
"আমার জীবনই আমাকে টলমল করিয়ে দিচ্ছে। আমি আর আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরিয়ে দিতে পারো, আমি আমার গা আনিনি। রাজারহাটে আমার ফ্ল্যাট।"
ডবল ভাড়া দিতে চাইলে, ট্যাক্সি যে পাওয়া যাবে না তা নয় একা একটা মাতাল মেয়েকে রাত সাড়ে ন'টায় ট্যাক্সিতে এ দিতে আমার মন চাইল না। এই পরশু না তরশুই একটা রে পড়ছিলাম। হাসপাতালে থাকা স্বামীকে দেখে চিৎপুরের 'ক স্টেশনের দিকে যাওয়ার সময় স্ত্রী ধর্ষিতা। কোন এক পিশাচ থামিয়ে গাড়িতে উঠে খালপাড়ে, বন্ধ গাড়ির ভিতরেই রেপ ভদ্রমহিলাকে। ড্রাইভারের সঙ্গে আগে থেকেই সাঁটগাঁট ছিল শতভিষাকেও যদি সেরকম কিছু করে?
না, দরকার নেই। বিশেষ করে আমার নিজেরই গাড়ি আছে আমিই পৌঁছে দিয়ে আসব ওকে। একটু নয় দেরিই হবে ঘরে ঝুমাকে শুধু বলতে পারব না, কী কারণে দেরি। খুব বুঝিয়ে ও ভুল বুঝবে, কষ্ট পাবে। সৎভাবে বাঁচার স্বাধীনতা নেই আ কারও, কোথাও। রুদ্রাশিস অসৎ হয়েই বা কোন অন্যায় ক
"আচ্ছা আমি যদি তোমাকে, 'তুমি' করে বলি তোমার আপ গাড়িতে আমার পাশে বসে জিজ্ঞেস করল শতভিষা।
"না। তবে অফিসে আপনি বলাই ভাল।"
"তুমি না খুব ভিতু চয়ন!" হেসে উঠল শতভিষা।
"যা মনে হয় তোমার।"
"আচ্ছা, এত সাবধানে বাঁচতে ভাল লাগে?"
"বাঁচতে শিখেছি। খুব গরিব ছিলাম তো। সকালে খেলে বি খাব ঠিক ছিল না।"
"ইস, সেই গরিব আবার আমার খাওয়ার পিছনে কত টাকা ফেলল আজ!"
"খেলে না তো প্রায় কিছুই। শুধু গিললে।" আমিও তুমি ক শতভিষাকে।
"রাজারহাটে প্রচুর রজনীগন্ধার চাষ হয়েছে জানো। এইদিক অনেকটাই গ্রাম এখনও। ভোরে মর্নিং ওয়াক করতে বেরোই তখন গ্রামের মেয়েদের দেখি, রজনীগন্ধার বাঞ্চ হাতে নিয়ে আছে। বিক্রি করবে বলে। আমি নিয়েছি দু-একদিন। কিন্তু রজনীগন্ধার রঙটাই আছে, ভিতরে রজনীগন্ধার গন্ধটা নেই। গন্ধ দুটো একসঙ্গে বোধহয় কোথাওই পাওয়া যায় না।"
আমি হাসলাম একটু। কিছু বললাম না।

চিংড়িহাটা থেকে ব্রিজের উপরে উঠে গিয়েছিলাম। স্পিডোমিটারের কাঁটা সত্তর ছুঁইছুঁই। শতভিষার প্রশ্নটা শুনে বললাম, "ঠিক তা নয়।"

"বলো না সত্যি করে। সেক্ষেত্রে ড্রাইভার করে রাখব তোমায়।"

"সে রাখতেই পারো। কিন্তু আমি ড্রাইভার রাখিনি কারণ আমি গাড়ি চালানোটা খুব এনজয় করি। ছোটবেলায় এক সময় আমার এক বন্ধু রিকশা চালাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। ওর বাবার রিকশা। সেই লোকটা যখন মদ খেয়ে উলটে থাকে তখন যদি আমি চালাই। ওকে পাঁচ টাকা করে দিতে হত প্রতি সন্ধ্যার জন্য। মা খুব ধাতানি না দিলে, আমি হয়তো চালাতামও। সেই অবস্থা থেকে উঠে এসেছি বলেই গাড়ির স্টিয়ারিং হাতে নিলে বেশ একটা কিক পাই।"

"তুমি না দারুণ গল্প বানাতে পারো। গল্প তৈরি করতে ইচ্ছে হয় না তোমার?"

"মানে?"

গাড়িটা রাজারহাটে ঢুকে পড়েছিল একরকম। চারপাশে দৈত্যের মতো বড় বড় সব অফিস-বিল্ডিং, ইতিউতি সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ পাঁচতলা, ছ'তলা আপ্যার্টমেন্ট। কিন্তু কোথাও একটা লোকের দেখা নেই।

"এরকম একটা ভুতুড়ে জায়গায় থাকো কী করে?"

"আমি নিজে পেত্নি বলে। আ আ আ..."

শতভিষার আর্তনাদ শুনে চমকে গিয়ে আমি একটা বাঁকের মুখে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিলাম, "কী হল?"

"আমার স্পাইনাল কর্ডে একটা যন্ত্রণা আছে। ফিরে এসেছে।"

"মাই গুডনেস। তোমাকে কি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে? তাহলে আমি গাড়ি ঘোরাচ্ছি।"

"কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। এই তো এখানেই আমার ডাক্তার।"

বলতে বলতে শতভিষা আমার মাথার পিছনের চুলগুলো ডানহাতের মুঠোর মধ্যে ধরে নিজের মুখটা নামিয়ে আনল আমার মুখে। আমার সামনের পুরো পৃথিবী ঝাপসা হয়ে গেল। শুধু উইন্ডস্ক্রিনের উপর যেভাবে তুমুল বৃষ্টি আছড়ে পড়ে সেভাবে ওর অগুনতি চুমু আছড়ে পড়তে লাগল, আমার ঠোঁটে, গালে, গলায়, চোখে, কানে। একইসঙ্গে অন্ধ, বোবা আর কালা তিনটেই হয়ে যেতে যেতে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না আমি। ভেসে গেলাম।

আমার হাতটা তখন শতভিষা নিজের শার্ট খুলে, শার্টের ভিতরে থাকা ব্রা আলগা করে একেবারে নিজের বুকে চেপে ধরেছে; চাইছে মেঘ থেকে নিংড়ে আনি বৃষ্টি, ভাসিয়ে দিই মহাবিশ্ব, যাতে নোয়ার নৌকায় আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ না থাকে।

শতভিষা বলছিল, "সবসময় শুধু একটা ছেলেই একটা মেয়েকে চাইতে পারে, নিজের খুশিমতো ব্যবহার করার জন্য, একটা মেয়ে একটা ছেলেকে চাইতে পারে না প্রবলভাবে? ওই কেসটায়, তুমি যেখানে বলবে সেখানে সই করে দেব কিন্তু আজ এখন এই গাড়ির ভিতর, এই এত এত গাছের চোখের সামনে, প্লিজ, প্লিজ মি।"

সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায়, ঢেউয়ের উপরে উঠে গেলে, মানুষটাই ঢেউয়ের চেয়ে উঁচু হয়ে যায়। রাজারহাটের ওই রাত্রিটা আমার জীবনের চেয়ে উঁচু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্যান্টের পকেটে মোবাইলটা দপদপ করেই যাচ্ছিল। ঝুমাই ফোন করছে বোধহয়।

ও কি বুঝতে পারছে না আমার দেরি হবে? অনেক দেরি?

১৮

সেদিন হয়তো শতভিষা যা চাইছিল, যতটা চাইছিল সবটাই হয়ে যেত। আমি ঠেকাতে পারতাম না কারণ আমি মানুষ এটা যেমন সত্যি, আমি একজন পুরুষ এটাও ততটাই সত্যি। আর কে না জানে, পুরুষ ভালনারেবল। নারীর চেয়ে অনেক বেশি ভঙ্গুর সে, মানসিকভাবে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটতে গিয়েও ঘটল না শতভিষার একটা আগমনী শুনতে পাচ্ছি, তখনই কথাটা বলে উঠল ও।

"ডোন্ট হেজ়িটেট ডিয়ার, প্লিজ় ডোন্ট। প্রোটেকশন সঙ্গে নেই
পিছিয়ে যেও না। কী হবে প্রোটেকশন না থাকলে? প্রেগন্যা
যাব? ডাজ়ন্ট ম্যাটার। আই উইল ড্রপ দ্য বেবি।"

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম একেবারে।

"কী হল, থেমে গেলে কেন?"

"আমি পারছি না, পারব না। সরি।"

"ইউ কান্ট লিভ মি লাইক দিস। এতটা ক্রুয়েল হয়ো না প্লিজ়
আমি বুঝতে পারছিলাম, বউ-সংসার-মর্যালিটি ইত্যাদি ক
শতভিষা আমাকে গালাগাল দিয়ে ধুইয়ে দেবে, একেবারে।
রাস্তাতেই গেলাম না। ওর ফুলে ওঠা নাকের পাটা, জ্বলতে
চোখ, মুখের উপর এসে পড়া উদ্ধত গাছের নতুন পাতার ম
গুচ্ছ, হাপরের মতো ওঠানামা করতে থাকা বুক, আরও যা
কবিতা-গান-নাটক-সিনেমা হয়, সব অগ্রাহ্য করে বললাম,
পারলে থাকতাম। কিন্তু পারব না। আমার মা মৃত্যুশয্যায়।"

"হোয়াট? হোয়েন?"

"এক্ষুনি মেসেজ পেলাম। প্লিজ় ফরগিভ মি। তোমায় কোথা
দিতে হবে বলো।"

মানুষের জন্মানোর একটা এক্সপেকটেড ডেট থাকে, তার এ
আগে কিংবা সাতদিন পরেও পৃথিবীতে আসে মানুষ; কিন্তু
মারা যাওয়ার দিনটা কেউ বলতে পারে না। আর পাঁচটা সা
দিনের মতোই সেটা ক্যালেন্ডারের পাতায় থাকে, তারপর হ
একটা বোমার মতো ফেটে পড়ে। যখন ফাটে তখন কিছু ক
না, চোখ চেয়ে দেখা ছাড়া। আমরাও তাকিয়েই রইলাম। মা
গেল।

শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল ক'দিন ধরেই। কিন্তু গত কয়েক বছ
অভিজ্ঞতায় সেই 'খারাপ'টা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। খার
শরীর, আবার ভাল হত, চলতে থাকত। সেদিন রাতে খাবার
হঠাৎ করে বমি করল।

"কী হল মা? খারাপ করছে শরীর?" বলে আমি একটু হজ
খাইয়ে দিলাম।

কিন্তু সেটাও বমি হয়ে গেল খানিকক্ষণ পর।

এখন ডাকামাত্র বাড়িতে আসার জন্য ডাক্তার পাওয়া যায় ন
চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক বেশি হাসপাতালকেন্দ্রিক। মধ্যবিত্ত
উচ্চবিত্তর জন্য প্রাইভেট, নিম্নবিত্ত আর দরিদ্রদের জন্য সর

"মনে হচ্ছে গলায় কিছু আটকে গিয়েছে। তুমি একবার এই
একটু দেখো। তারপর নাহয় অ্যাম্বুল্যান্স ডাকছি।"

ঝুমার এগিয়ে দেওয়া টর্চটা হাতে নিয়ে স্থবির হয়ে গেলাম
এইরকম, না, এইরকম নয়, একটা বড় স্টিলের টর্চ হাতে নি
তুমুল বৃষ্টির রাতে আমি লোকটাকে ফলো করেছিলাম। কেউ
না রাস্তায়, পাঁচ হাত দূরের দৃশ্যও দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু আ
দেখছিলাম, আমার বোনের খুনি, আমার মায়ের মাথা ফাটি
বের করে দেওয়া শয়তানটা শিস দিতে দিতে হেঁটে যাচ্ছে রা
তখন আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছি প্রায় একবছর, কানা
শুনতে পাই আবার বিয়েও করেছে লোকটা, তবে বউটাকে
লুকিয়ে রাখে।

এইরকম লোককে লুকিয়েই শায়েস্তা করতে হয়। আমি তাই
উপর নজর রেখেছি যতটা পেরেছি, আর আজ এতদিনে সু
মিলেছে। ভাগ্যিস রেশনে চাল মিলছে না গত দুই সপ্তাহ, ভ
আমায় এই স্টিলের টর্চটা বিক্রি করে দু-তিন কিলো চাল কি
পাঠাল, ভাগ্যে এত জোরে বৃষ্টি নামল।

ভাগ্য সেদিন আমার সঙ্গে ছিল। নয়তো লোকটার হঠাৎ পা

যাই হোক, আমার সুবিধা হয়ে গেল কারণ লোকটা হাঁটতে থাকলে পিছন থেকে ওর মাথার নাগাল পেতাম না। ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ায় আমিও ওর কাছাকাছি চলে গিয়ে টর্চ সমেত দুটো হাত আকাশে তুলতে পারলাম।

লোকটা তখনই ঘাড় ঘোরাল। কিন্তু ঘোলাটে চোখে ব্যাপারটা বুঝতে যে-কয়েক সেকেন্ড নিল, তার মধ্যেই আমি সর্বশক্তি দিয়ে টর্চটা বসিয়ে দিতে পেরেছি ওর মাথায়। মাথাটা ঘুরিয়েছিল বলে বাড়িটা বোধহয় সাইডেই পড়েছিল, পিছনে নয়। কিংবা কোথায়, এখন ঠিক মনে পড়ে না আমার। চোখ বুজে সেই মুহূর্তটায় ফিরে গেলে শুধু দেখতে পাই, রক্তের ধারা গড়িয়ে নামছে লোকটার কপাল বেয়ে। ঠিক যেমন মায়ের কপাল বেয়ে নেমেছিল।

লোকটা একটা চিৎকার করে উঠেছিল আমার মনে পড়ে। কিন্তু সেটা টর্চের বাড়ি খাবার আগে না পরে, তা আর খেয়াল নেই। একটাই শব্দ ছিল সেই চিৎকারে। 'বাবা'!

সেটা কি আমায় চিনতে পেরে? নাকি বিপদের মুখে মানুষের মুখ থেকে ছিটকে বেরনো স্বাভাবিকতম দুটো শব্দের একটা হিসেবে বেরিয়েছিল শব্দটা?

জানি না। টর্চটা বৃষ্টির জলে ধুয়ে নিয়েছিলাম। বিক্রি করে দিয়েছিলাম পরদিনই। আর লোকটার কোনও খবরই পাইনি তারপর। ভাবতে ভাবতে আমি মাকে বললাম, "মুখটা খোলো, একটু দেখতে দাও।"

মায়ের স্থির হয়ে যাওয়া চোখের মণি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল যেন।

সেদিন রাতে ওই লোকটা যত জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, আমি বোধহয় তার থেকেও বেশি জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মা' বলে!

ঝুমা পিছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরল আমায়।

কুটুস ওর ঘর থেকে বেরিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

মা সাড়া দিল না।

সবকিছু গুলিয়ে ফেলতে ফেলতে, আমি টর্চটা হাতে ধরেই ঝুমাকে বললাম, "বেরোতে হবে আমায়। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে?"

১৯

কেউ অন্যায় করলে তাকে মানুষ শাসন করে। কিন্তু আমি বোধহয় আমার বাবার পুরনো ছবির সঙ্গে কুটুসের কত মিল সেই কথা শুনে, কুটুসের রেগে গেলে কাপ-বাটি ছুড়ে ফেলা কীরকম বাবারও অভ্যাস ছিল তা জেনে, ও অন্যায় করতেও পারে এই সম্ভাবনাতেই শাসন করে বসতাম বাচ্চাটাকে। মা খুব কষ্ট পেত, ক্ষুব্ধ হত আমার আচরণে কিন্তু বুঝতে পারত না যে, আমার ভিতরের ভয়টাকে চাগিয়ে দেওয়ার পিছনে মায়ের নিজের ভূমিকাই অপরিসীম। ঝুমাও যে অসন্তুষ্ট হত না তা নয়, তবে ও খুব প্রয়োজন না বুঝলে আমার আর কুটুসের ভিতরে আসত না। এর ফলে কুটুসের কাছে ও নিজে ভাল থাকত, আর আমি হয়ে যেতাম খারাপ।

ব্যাপারটা প্রথম বুঝতে পেরেছিল সন্দীপদা। বিভাব চলে যাবার মাসছয়েক পর একদিন আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নানা কথার পর সন্দীপদা বলেছিল, "তোমার ছেলে কিন্তু একটা ব্ল্যাকবোর্ড নয় যেখানে তুমি তোমার ইচ্ছেমতো লিখবে। আমি যে আমারটাকে হারিয়েছি তার পিছনে কিন্তু আমারও কিছু দোষ আছে। আগে বুঝিনি, এখন বুঝি। আর আমি ভুল করেছি বলেই চাই না সেই একই ভুল তুমি করো।"

"কী করতে পারি? আমি কুটুসকে কোলে নিলেও ও স্টিফ হয়ে থাকে। আমি চারটে কথার পর আর কথা এগোতে পারি না।"

"আমি একটা কথা বলব? ওকে নিয়ে কোথাও একটু বেড়াতে যাও।"

"আমিও এটা ভেবেছি। অনেকদিন আমি ঝুমা আর কুটুস মিলে..."

রবীন্দ্রনাথের বাবা যেমন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেতেন, সেইরক কোনও নিরিবিলি জায়গায় যাও ছেলেটার সঙ্গে। ছ'সাতদিন

"লাভ হবে?"

"নিশ্চয়ই। ভেবে দেখো, ওখানে কুটুস চাইলেও একছুটে মা যেতে পারবে না। ওকে ওর ভালোলাগা, মন্দলাগা সবটা বা শেয়ার করতে হবেই। আর সেই শেয়ার করার ভিতর দিয়েই আর ছেলের সম্পর্কটা দানা বাঁধবে।"

সন্দীপদার কথাটা আমার মনে ধরেছিল। কিন্তু কোনও প্ল্যান ধরলেই তো আর এক্সিকিউট করা যায় না। ইতিমধ্যে সন্দীপ কলকাতার পাট চুকিয়ে উপকূলবর্তী কর্নাটকের একটা প্রত্য জায়গায় ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেল।

কারণ জিজ্ঞেস করায় বলল যে, বউদিকে বাঁচাতে এ ছাড়া প

"কিন্তু অতদূরে, একদম একা, মানুষটা তো পুরনো কথা ভে পাগল হয়ে যাবে।"

"সমুদ্র সামনেই। দরকার হলে ঢেউকে বলবে নিজের সব কথ তো পালটা জিজ্ঞেস করবে না বিভাবের আত্মহত্যার জন্য অ না মহুয়া দায়ী।"

আমি চুপ করে গেলাম। পরোপকারী সন্দীপদা, মানুষের ভা একটা দিন থাকতে না পারা সন্দীপদা কীভাবে পালিয়ে যাচ্ছে জগৎ থেকে, ভেবে কূল পেলাম না। জীবন কাকে কখন কো নিয়ে গিয়ে যে দাঁড় করায়!

সন্দীপদা কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেও ওর বলা কথাটা ভুলি আমি। শুধু অফিসের ঝামেলা নয়, মধ্যে কুটুসের ডেঙ্গি হওয় বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছি আমি আর ঝুমা, তখনও প্রবল কষ্টের ম কুটুসের 'মা মা' ডাক আমাকে ঠাকুরের কথা মনে করায়নি, দিয়েছিল। কেন একবারও 'বাবা' বলে ডাকছিল না কুটুস?

অসুখটা অ্যাকিউট হয়নি বলে হাসপাতালে দিতে হয়নি কুটুস কিন্তু ও সেরে ওঠার পর আরও বেশি করে সেই প্রাকৃতিক হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম আমি, যেখা আর ছেলের একসঙ্গে যাওয়া দরকার।

এসবের মধ্যেই মা চলে গেল। আমার অজস্র লড়াইয়ের সা শরিক আমার মা চলে গেল। কে জানে, কোন ভুবনের পারে শেষদিন অবধি শাঁখা পরত, সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁয়াত মা। আর পরছে, সেটা বোঝাতে গিয়ে বলত যে, ঘরের দক্ষিণদিকে দাঁ লোকটা ভুল করেছে মানেই উত্তরদিকে দাঁড়ানো লোকটাকে করতেই হবে, এমন কথা নেই।

আমি সেই ছোটবেলার মতো আর তর্ক করতাম না এসব নি আসার পরও কেউ যদি চিহ্নটা ধরে থাকতে চায় তাকে বারণ অর্থ হয় না।

মায়ের অস্থি গঙ্গায় ভাসিয়ে আমি কাছা নিলাম। যে মেনেছে, জন্য মানতে হয়, মানা উচিত।

বেসরকারি সংস্থায় ওরকম ঢালাও ছুটির ব্যবস্থা থাকে না। অ অনেক কাজ জমে ছিল বলে আমাকে যেতেই হচ্ছিল। যাচ্ছি একদিন অন্তর একদিন। কাছা পরেই। কোমরে আসন নিয়ে। রুদ্রাশিসের রিপোর্টের একটা খসড়া তৈরি করে শতভিষাকে পাঠিয়েছিলাম। ওর অপরাধ যতটা সম্ভব লঘু করে দেখিয়ে। অশৌচের মধ্যেই একদিন শতভিষা আমার চেম্বারে এসে বল

"আমি রিপোর্টটা তৈরি করেছি। আপনি কি একবার দেখবেন ভয় নেই, ক্রিমিনাল করে দেখাইনি রুদ্রাশিসকে। ওর চাকরি থাকলেও শাস্তি কিছু হবে না।"

"যে যা অন্যায় করবে তাকে তার শাস্তি পেতেই হবে। তুমি- চাইলেও বাঁচাতে পারব না কাউকে।"

"আমার অন্যায়ের যে-শাস্তি দেবে তুমি, আমি নিতে প্রস্তুত।

আমার এমন প্রবল ডিজ়ায়ার জেগে উঠেছিল যে, আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি।"

"যা হয়েছে দু'জনের জন্যই হয়েছে। ডিজ়ায়ার আমারও জাগেনি তা নয়।"

"না, তুমি শুধু রেসপন্ড করছিলে। ইনিশিয়েট আমিই করেছি। আর তার জন্য আমি কিন্তু লজ্জিত নই।"

কাছা পরে এইসব আলোচনা করতে একছিটেও ইচ্ছে করছিল না। তাই একটু গম্ভীর হয়েই বললাম, "এগুলো নিয়ে যত কম কথা হয়, ততই ভাল। ওগুলো এক-একটা মুহূর্ত। আসে, চলে যায়।"

"ঠিক বলেছ, জাস্ট একটা মুহূর্ত। তুমি এখন যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছ, সেটাও একটা মুহূর্ত। আই হোপ, খুব তাড়াতাড়ি সেটা কেটে যাবে। তুমি আবার নর্মাল লাইফে ফিরে আসবে।"

"হ্যাঁ, আমাদের তেরোদিনে কাজ। তারপর আবার শার্ট আর ট্রাউজার্সে ফিরে যাব। এই ক'দিনের জন্য করপোরেট যে কাছা অ্যালাও করেছে, আমি কৃতজ্ঞ।"

"আমিও কৃতজ্ঞ তোমার কাছে, চয়ন। ওই একটা সন্ধ্যার জন্য। একটা ড্রাইভ-এর জন্য। ওই গাছগুলোর ভিতরে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য। ওই কয়েকটা মিনিটের জন্য আর ওই আদরটুকুর জন্যেও। সবটাই আমার লাইফ-লং ট্রেজার হয়ে থাকবে। আর হ্যাঁ, আমি এই চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি। গুরগাঁওতে একটা ভাল অফার আছে, ছেলের কাছাকাছিও হবে; ভাবছি সেখানেই..."

"ভাল অফার পেলে নিশ্চয়ই যাবে..."

"খারাপ অফার পেলেও যেতাম। সেদিন সন্ধ্যার পর, তোমার আর আমার একই অফিসে থাকা বোধহয়..."

"কিন্তু কেন শতভিষা? কেউ তো দেখেনি। আমার প্রাণ থাকতে কেউ জানবেও না।"

"আমাদের ঘিরে রেখেছিল যে-গাছেরা, সেই গাছগুলোয় থাকা পাখিরা তো দেখেছে চয়ন। ওরা তো জানে।" শতভিষার গলাটা ধরে এল।

"আমার একটা শেষ প্রশ্ন আছে তোমার কাছে।"

"বলো।"

"সেদিন তুমি আমাকে তোমার ফ্ল্যাটে যেতে বললে না কেন? কেন রাস্তাতেই ওভাবে?"

"অন্য সময় হলে বলতাম, রাস্তাটাই বেশি রোম্যান্টিক। কিন্তু তোমার এই অবস্থায় তোমাকে মিথ্যে বলতে ইচ্ছে করছে না।"

"সত্যিটাই বলো।"

"আমার ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকারকে আমার ছেলের বাবা টাকা খাইয়ে রেখেছে। তোমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলে তৎক্ষণাৎ খবরটা দিল্লিতে পৌঁছে যেত।"

"তাতে কী হত? সেও তো অন্য একজনের সঙ্গেই থাকে..."

"সেই থাকাটা আমার ছেলে কর্তৃক অনুমোদিত চয়ন। কিন্তু আমার ছেলে মায়ের 'বয়ফ্রেন্ড' সহ্য করবে না। কিছুতেই না।"

"রিডিকুলাস। একটা চড় মেরে সাইজ করে দিতে হয়।"

"আমরা চড় মারার জায়গায় নেই, চড় খাওয়ার জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। আর সেদিন যে কথা প্রসঙ্গে তোমায় বলছিলাম, আমার ছেলে কিংবা বর কে কী করল আমার তাতে কিছু যায় আসে না, সেই কথাটা মিথ্যে। আমি আমার ছেলের ক্রীতদাস। হয়তো তুমিও তোমার ছেলের। আর সমস্যাটা কখন হয় বলো তো? ক্রীতদাস যখন মালিককে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতে শুরু করে। আমিও তো মা চয়ন, তোমার মায়ের মতো ভাল মা না হলেও, আমিও তো মা।"

কিন্তু আজ আমার সন্তান জন্ম নিয়েছে খবরটা পেয়ে, ওইসব ইচ্ছে-টিচ্ছে কোথায় তলিয়ে গেল। মনে হল, যে এসেছে সেই আমার সাত রাজার ধন এক মানিক।



থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর যাওয়া রিপোর্টটায় সই করে দিলাম। এক পাতাও না পড়ে।

কসৌলিতে পাঁচদিন ছিলাম কুটুসের সঙ্গে, আমার অবশ্য এ নিজেকে ওর ক্রীতদাস মনে হয়নি। বাবা মনে হয়েছে, বন্ধুও কোম্পানির একটা পুরনো মডেলের জিপ ছিল, পাহাড়ি রাস্ চালানোর জন্য। টপ ম্যানেজমেন্ট চাইছিল, গাড়িটা এবার স প্রোমোট করা হোক। সেই লক্ষ্য নিয়ে ভারত জুড়ে সেলস ম এবং এক্সিকিউটিভদের একটা হ্যাংআউট অর্গানাইজ় করা হ কনফারেন্স, সেমিনার, ডিসকাশন মিলিয়ে দু'দিন, আমি তা আরও তিনদিন জুড়ে নিয়েছিলাম।

"কিন্তু যে-সময়টা আমি ব্যস্ত থাকব, তখন কুটুস কী করবে ঝুমাকে রাজি করানোর চেষ্টায় বললাম।

"নিজের মতো থাকবে, টিভি দেখবে, খেলবে। তুমি কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যাবে।"

"তবু তুমি যাবে না?"

"আমি গেলে তো যে-উদ্দেশ্যে যা সেটাই মাটি হয়ে যাবে।

যাও না একবার ছেলেকে নিয়ে, ক দায়িত্ব নিয়ে দেখো না, কেমন লাগে

"আমাকে প্যাঁচে ফেলতে পারলে দ পাও তুমি, তাই না?"

"এতে প্যাঁচে পড়ার কিচ্ছু নেই। আ বাবা, কুটুস তো ছবি আঁকতে ভাল হোটেলের বারান্দায় খাতা পেনসিল বসিয়ে দেবে, সিনসিনারির ছবি অ বসে।"

"এইটা ভাল বলেছ। আচ্ছা গোপা একবার বলে দেখব যদি আমাদের যায়? কুটুসের ড্রয়িং-এরও উন্নতি

ঝুমা একটুও রাগল না, "বলে দেখ পারো। কিন্তু গোপার তো বিয়ে স মাসের গোড়াতেই। কার্ড দিয়ে গে গেছে নিজে এসে। তোমায় খুঁজছি

"কেন?"

"হয়তো কী গিফট চায়, কানে কা তোমায়।"

"বউদি শাড়ি-টাড়ি দিয়েছে, এখন বউদিই ফেভারিট। আমা লাভ হবে না।"

"ইয়ার্কি ছাড়ো। ওখানে ভাল শাল-ফাল সস্তায় পেলে নিয়ে

"সস্তার শাল নিয়ে আমি গোপার বিয়েতে যেতে পারব না তোমার পছন্দমতো একটা শাড়ি কিনো।"

"শাড়িও আমি সস্তারই কিনব। কারণ আমি জানি আমাকে তুমি ওর বাবাকে কিছু টাকা দেবেই মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে।"

"তা হয়তো দেব। কিন্তু তোমাকে লুকিয়ে কেন দেব? তোমা লুকিয়ে কবে কী করেছি সোনা?"

কথাটা বলতেই একটা কোকিল, জানি না কোন গাছের আড় ডেকে উঠল। দু'বার-তিনবার।

আমি আঁতকে উঠলাম। এই কোকিলটা কি সেই রাত্রে রাজা ছিল? ভাবতেই একটা কষ্ট দলা পাকিয়ে উঠল গলায়।

বাথরুমে গিয়ে কলটা চালু করে দিলাম জোরে।

ভাবিনি। পাখিরা শেষরাতে উঠে পড়ে আর সন্ধে হতে না হতেই ঘুমিয়ে যায়। খুব হেলদি লাইফস্টাইল পাখিদের। তবু এত কম দিন বাঁচে কেন কে জানে?

আমাদের রেখেছিল 'নাইন পাইন্স' বলে একটা বুটিক প্রপার্টিতে, কনফারেন্স হচ্ছিল একটু দূরের একটা বড় হোটেলে। আমি কুটুসকে সঙ্গে করেই নিয়ে যেতাম। সারাদিন ও ওখানে টেবিল টেনিস খেলত, টিভি দেখত, লাঞ্চ করত আমার সঙ্গেই, ঘুমিয়েও নিত খানিকটা। আমাদের এক বিগ বস ওকে আর আমাকে একদিন ডিনার করাতে নিয়ে গেলেন। সেখানেই শুনলাম ব্রিজলাল ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন আর সেক্ষেত্রে ইস্টার্ন জোনের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং-এর গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধেই চাপবে।

প্রোমোশনের কথায় কার না মন ভাল হয়, কনফারেন্স শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাই হালকা একটা খুশির ছোঁয়া লেগে থাকল আমার মনে। কুটুসও খুব আনন্দেই ছিল, বিশেষ করে নতুন তিনজন বন্ধু পেয়ে। তারা ওই নাইন পাইন্স-এর চিরস্থায়ী বাসিন্দা তিনটি পাহাড়ি কুকুর, আলু, লওকি আর ভিন্ডি নাম। মাঝে মাঝে আমার ভয় লাগত কিন্তু কুটুস অবলীলায় ওদের লেজ ধরে টানত, পিঠে চেপে বসত। নরম রোদের নিচে যখন আমরা বাপ-ব্যাটা ব্রেকফাস্ট করতে বসতাম, তখন আমাদের খাবারে যে ওদেরও অধিকার আছে সেই দাবিতে সামনে এসে দাঁড়াত তিনজনই এবং ভাগ পাওয়ার পরে আনন্দিত মনে লেজ নাড়িয়ে ধন্যবাদ জানাত।

কসৌলির রাস্তা ধরে হাঁটতে বেরিয়েও বুঝতাম পৃথিবীটা শুধু মানুষের নয়, গাছপালা, পশুপাখিদেরও। আঁকাবাকা রাস্তা ধরে, ব্রিটিশদের তৈরি করে যাওয়া পেল্লায় সব বাংলো দেখতে দেখতে 'সানরাইজ়' আর 'সানসেট পয়েন্ট'-এ যাওয়ার পাশাপাশি 'মাঙ্কি পয়েন্ট'-এও গেলাম আসার আগেরদিন। খুব খাড়াই পাহাড় আর চতুর্দিকে নাকি হিংস্র সব ক্ষুধার্ত হনুমান। কিন্তু আমি ছোলা ছিটোতে ছিটোতে উঠলাম কুটুসকে নিয়ে, নামার সময় বিস্কুট আর চার-পাঁচটা কলা ভেঙে ছুড়তে ছুড়তে নামলাম। একটা হনুমানও আক্রমণ করল না আমাদের। কোনও ট্যুরিস্টকেই নয়। পৃথিবীতে 'আক্রমণ' শব্দটা হয়তো মানুষেরই আবিষ্কার। পশুরা শিকার করে, লড়াই করে, আক্রমণ নয়। মনে হচ্ছিল আমার।

চড়াই বেয়ে মাঙ্কি পয়েন্টের উপরে ওঠা রীতিমতো কষ্টসাধ্য। অনেকেই মাঝপথে বসে হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু একবার উপরে উঠতে পারলে চোখ জুড়িয়ে যায়, ভরে যায় মন। আদিগন্ত ছড়িয়ে থাকা শিবালিক পর্বতমালা, পাইন আর দেবদারু অধ্যুষিত উপত্যকা, খরস্রোতা শতদ্রু নদী, স্বর্গের মতোই একটা দৃশ্যপট রচনা করে যেন। কথিত আছে, হিমালয় থেকে বিশল্যকরণী নিয়ে ফেরার পথে বজরংগবলী এই কসৌলিরই সর্বোচ্চ বিন্দুতে পা রেখেছিলেন। সত্যি না গল্প, কে জানে!

কুটুসের হাত ধরে নামার সময় হঠাৎ মনে হল, আমার বাবার থেকেও কি কোনওদিন আদর পাইনি আমি? কেবল কি গালাগালি, মার আর রক্তস্রোতের স্মৃতিই জড়িত বাবার সঙ্গে? কোথাও কোনও বিশল্যকরণী নেই? একসময় বাবাও তো আমার হাত ধরে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়েছে, বাবার কোলে চেপে পুরীর সমুদ্রের ধার ধরে কত ঘুরেছি। অ্যাসিড ছুড়ে খুনিরা যেমন পুড়িয়ে দেয় মুখ, নিয়তিও কি খারাপ অভিজ্ঞতা দিয়ে ভুলিয়ে দিতে পারে ভালবাসার সমস্ত স্মৃতি?

কথা রোজই দু'বার তিনবার করে হত ঝুমার সঙ্গে। বাইরে ঘুরতে আসার সুবাদে কুটুস বেশ সড়গড় হয়ে গেল মোবাইলে, যেটা একদমই চাইছিলাম না আমি। কিন্তু কী করার?

ফেরার আগেরদিন রাতে ঝুমা ফোনে জানাল, হোম থেকে ফোন এসেছিল। আমাদের নম্বর এসে গেছে। এবার একদিন গিয়ে 'মেয়ে'

"এ কি খেলার পুতুল কিনছি যে, চয়েস করব? গিয়ে যার দি
চোখ পড়বে, সেই আমাদের সন্তান হবে।"

"সে মেয়ে কি না সেটা দেখে নেবে না?"

ঝুমা মজা করেই বলল কিন্তু আমার মনে হল যেন ব্যঙ্গ।

"ওসব তুমি দেখো। তোমার ডিপার্টমেন্ট ওটা।" ফোন রেখে
আগে বললাম আমি।

মদ্যপান করার একটা সুবিধা হল, জটিল প্রশ্ন বেশিক্ষণ জটি
না। এটা কলকাতায় যেমন সত্যি, কসৌলিতেও। কিন্তু কসৌ
আসার ভোরটা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দিয়ে গেল আমাকে। দেখ
বাগানের ভিতরে একটা আরামকেদারায় আমি বসে আছি।
আমাকে ঘিরে বসে আছে অজস্র বাচ্চা। সবকটাই মেয়ে। আ
সবাই ফুল-ফুল ছাপ ফ্রক পরা। ঝুমা, শুভাঙ্গনা, শতভিষা,
চারজনই মিষ্টি আর আবীর থালায় নিয়ে ঘুরছে বাচ্চাদের ম
একটা বাচ্চারও মুখ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ওই যে প্যার
করে কে একটা নামছে। ওর জন্য সবাই হাততালি দিচ্ছে কে
নামছে, নামছে, বাচ্চাটা মাটিতে নেমে হাতজোড় করে প্রণাম
সবাইকে। স্বপ্নটা জুম-ইন করল ওর মুখে। আমি দেখলাম,
ফিরতি পথে প্লেনে বসে একটুও ভয় পেল না কুটুস। বরং নি
নিজেই বেঁধে ফেলল সিট-বেল্ট। টেক অফ-এর সময় আমা
চেপে ধরল যদিও।

প্লেন আকাশে স্থিত হতে উইন্ডো সিটে বসা কুটুস আর জান
ওপারের মেঘগুলোকে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, তুলি যদি
মেঘগুলোর ভিতরেই থেকে থাকে ও কি আমাদের দেখতে প
নাকি জন্মান্তর সত্যি? তুলি আবার জন্মেছে! সেই জন্মানোটা
কয়েকদিন আগেই হয়েছে? তুলি কি বাস্তবেও আমাকে চিনে
কাছে ফিরবে? স্বপ্নে যেমন ফিরল?

স্বপ্ন স্বপ্নই। কিন্তু বাস্তবের একটা প্রস্তুতি লাগে।

"তোমার নতুন খেলার সঙ্গী আসছে, জানো তো কুটুস।"

"আমার খেলার অনেক সঙ্গী আছে তো স্কুলে। লটস অফ
কুটুস জবাব দিল।

"সে থাক। কিন্তু তারা কেউ তোমার বোন হবে না।"

"আমার বোন আসছে?"

"ইয়েস। তোমার মা তোমাকে কিছু বলেনি?"

"বলেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি।"

"কেন?" অবাক হয়ে গেলাম আমি।

"কী করে করব? অভ্রদীপের বোন হল, দেখলাম।"

"কে অভ্রদীপ? তোমার ক্লাসমেট?"

"ইয়েস। ওর বোন হয়েছে, জাস্ট ওয়ান মান্থ ব্যাক।"

"ভাল কথা। কিন্তু তুমি মায়ের কথা বিশ্বাস করছ না কেন?"

"অভ্রদীপের বোন হওয়ার আগে ওর মায়ের পেট একদম ফু
গিয়েছিল। শি হ্যাড এ বিগ বেলি। অভ্রদীপকে স্কুল থেকে নি
আসত যখন, তখন দেখতাম। আমার মায়ের পেট তো একটু
ফোলেনি। তাহলে নতুন বেবিটা আছে কোথায়?"

আমি কুটুসের প্রশ্নের সামনে একেবারে ক্লিন বোল্ড হয়ে গে
এই জেন এক্স-ওয়াই-জেড বাচ্চাদের সঙ্গে কীভাবে 'ডিল' ক
আমরা, যারা ছোটবেলায় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতাম যে, প
বাচ্চা দিয়ে যায়?

এয়ার-হোস্টেসের দেওয়া স্যান্ডউইচ খেয়ে ফ্রুট জুসে মুখ ডু
কুটুস আরও মারাত্মক একটা কথা বলল, "তাছাড়া বোন এ
অভ্রদীপ, রিলিনারা আমায় চেপে ধরবে, আমি কোনও রিপ্ল
পারব না।"

"চেপে ধরবে কেন? তুমি কী করেছ?"

"ওদের একজনের বোন হল, আর একজনের ভাই। এবার ভ



বোন হবার আগে 'সাধ' হয় না? ওরা ওদের মায়ের সাধের মিষ্টি, চকোলেট, কেক সব স্কুলে নিয়ে এসে আমাদের গ্রুপটার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করেছে। এখন আমার বোন আসার খবর দিলে ওরা যদি আমায় চার্জ করে যে, আমি কেন কিছু খাওয়াইনি? তখন কী বলব আমি? আমার মায়ের 'সাধ'ই হয়নি বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে? তুমিই বলো?"

আমার সত্যিই বলার কিছু ছিল না। এবং একবিন্দু হাসিও পাচ্ছিল না। বরং রীতিমতো আতঙ্ক হচ্ছিল। মেয়ের বাপ হওয়ার আগেই।

২০

কলকাতা ফিরেই মেয়েকে বাড়িতে আনার প্রক্রিয়ায় বেশ খানিকটা দৌড়োদৌড়ি হল আমার। ঝুমা অবশ্য পাশে ছিল, প্রায় সারাক্ষণ। দু'-তিনটে পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল এই মেয়েকে ঘরে নেওয়ার সূত্রে। প্রত্যেকেই একটি সন্তান দত্তক নিতে চায়। এক-একটি দম্পতির একেকরকম সমস্যা। কিন্তু স্বপ্ন সবারই এক।

একজন মা এসেছে যার সন্তান মারা গেছে হৃৎপিণ্ডে ফুটো ছিল বলে। সে প্রত্যেকটি বাচ্চার কাছে গিয়ে নিজের স্বামীকে জিজ্ঞেস করছে, "এই বাচ্চাটার হার্টে ফুটো নেই তো?" এবং স্বামী নিরুত্তর থাকলে, অফিশিয়াল কাজকর্ম যারা করছে তাদের প্রশ্ন করে অতিষ্ঠ করছে। এক-দুই মাসের একটা বাচ্চাকে উপর-উপর দেখে যে আদৌ বলা সম্ভব নয় তার হার্ট একদম ঠিকঠাক কি না, সেই মাকে একথা বোঝায় কে? এক অবাঙালি দম্পতির সঙ্গেও পরিচয় হল। তারা দত্তক নেওয়া বাচ্চাটাকে লুকিয়ে রাখতে চায় এখন। যেহেতু তাদের পরিবারে নিজের সন্তান না হওয়া বিরাট লজ্জার ব্যাপার, তাই তারা বাচ্চাটাকে নিয়ে বিদেশ চলে যাবে আপাতত। এক-দেড় বছর পর ফিরে এসে ঘোষণা করবে বাচ্চার কথা। যাতে একদম এক-দু'জন ছাড়া আর কেউ জানতে না পারে বাচ্চাটাকে দত্তক নেওয়ার কথা।

আমাদের এত সব সমস্যা ছিল না। তবু অন্যের অসুবিধে, তা যত অযৌক্তিকই হোক, এক মুহূর্তের জন্য থমকে দেয়। নিজে ভাগ্যবান মনে হয়। সংস্থার নার্স যখন 'নয়নতারা'কে আমার তুলে দিল, তখনই ওর নামটাও ঘাই মারল আমার মাথায়। অ কী নামে আমি ডাকতে পারি, আমার মেয়েকে?

সমস্ত প্রসিডিওর শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে পিছনের সিটে কোলে বসে থাকা ঝুমা বলল, "ডাকনামটা কিন্তু আমিই রাখ

আমি ঘাড় না ঘুরিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "কিছু ভেবেছ?"

"হ্যাঁ। হিয়া।" ঝুমা বলল।

আমি ড্রাইভ করতে করতে গাড়ির আয়নায় দেখলাম, ছোট্ট ডলটাকে। হৃদয়ের টুকরো, হৃদয়ের অংশ। ঝুমা বহুদিন আগে কথায় কথায় জানতে চেয়েছিল, ভিতরের শূন্যতা বাইরের কি ভরে কি না। আমি সেদিন কোনও জবাব দিতে পারিনি।

আজ বললাম, ভিতরের ফুসফুস যেমন বাইরের হাওয়ায় ভরে ভিতরের শূন্যতাও বাইরের মানুষ দিয়েই ভরে।

"বাইরের মানুষ কে?" ঝুমা জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটা ছিল। উত্তরটা ভাল লাগল আমার।

পরবর্তী দু'বছরে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল আমাদের জীবনে আমার জীবনে। দুই বাচ্চাকে নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ত হয়ে গেল ঝুমা সবসময়ের সাহায্যের জন্য একটি মেয়েকে রাখতেই হল। ঝুমা বউদিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ঝুমার প্রথমে ইচ্ছা ছিল, সুধাদি আবার নিয়ে আসবে। কিন্তু খবর নিয়ে জানা গেল, সুধাদি হরি একটি সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে থাকেন এখন। আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত কারও সঙ্গেই যোগাযোগ রাখেন না আর।

"ভালই করেন। সংসার থেকে যিনি কেবলমাত্র কষ্টই পেয়েছে সংসার ছেড়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তাঁর।"

"আমার বাড়িতে থাকাকালীন সুধাদি কষ্ট পেয়েছেন বলে তো

"হয়তো পাননি। হয়তো পেয়েছেন। কে বলতে পারে? আর তাছাড়া যদি খুব ভালও থেকে থাকেন, তবু এই বাড়িতে সুধাদির পরিচয়টা কী ছিল? গ্লোরিফাইড কাজের লোক ছাড়া অন্য কিছু তো নয়?"
"বাজে বোকো না। মোটেই কাজের লোক হিসেবে আমি দেখিনি সুধাদিকে। আসলে এম এ পাশ বলে একটু অহংকার আছে সুধাদির। এটা আমি আগেও খেয়াল করেছি।"
"থাকতেই পারে। তুমি এম এ পাশ করোনি তো? ইন ফ্যাক্ট, তোমার কিংবা আমার কারওরই মাস্টার ডিগ্রি নেই। থাকলে হয়তো আমাদেরও অহংকার থাকত।"
"তোমার যত কড়া কড়া কথা!"
"সত্যি কথা, ঝুমা। একটা পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া মানুষ, সংসার থেকে ভেগে গিয়ে মঠ-মিশন-আশ্রম যে চুলোয় ইচ্ছে সেখানে মাথা গুঁজে একটু শান্তি যদি পায়, আমাদের সেই লোকটার ডিসিশনটাকে সম্মান জানানো উচিত। নিজের মেয়ের বেবিসিটার হিসেবে তাকে কেন পাচ্ছি না, তাই নিয়ে অভিযোগ করা উচিত নয়।"
"মেয়েটাও আমার নিজের নয় স্যার। তোমার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আমি মাথায় সিন্দবাদের বোঝা চাপিয়ে অচেনা-অজানা একটা বাচ্চাকে আপন করে নিয়েছি। বড় বড় সত্যি যখন বলবে তখন পুরো সত্যিটা বলার হিম্মত রাখো।"
ঝুমা যেন আমার তলপেটে একটা লাথি মেরে সরে গেল আমার সামনে থেকে। কোনও জবাব দিতে না পেরে একেবারে মূক হয়ে রইলাম আমি। অফিস যেতে যেতে শুধু ঠিক করলাম, বড় কিংবা ছোট কোনও সত্যিই আর গলা তুলে বলব না।
কিন্তু যে-'সত্যিগুলো' বলে ফেলেছি তারা যে ফেউয়ের মতো পিছনে লেগে যাবে তা তো জানা ছিল না। ব্রিজলাল সাক্সেনা চাকরি ছেড়ে দিতেই আমার বদলে হরিশ মেহতা বলে একজনকে ইস্টার্ন জোনের সেলস হেড করে আমার মাথার উপর চাপিয়ে দিল মুম্বইয়ের হেডঅফিস। লোকটা অতিশয় ধূর্ত এবং পলকে 'না'কে 'হ্যাঁ' করতে পারে। আমি অল্প কয়েকদিনেই বুঝে গেলাম, এ আমাকে টিকতে দেবে না এই অফিসে।
ইওরোপ টুরে গিয়েছিলেন ব্রিজলাল। উনি ফিরতেই আমি বেশ বিপন্ন হয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম একদিন।
"মেহতা আসলে তোমার পোটেনশিয়ালকে ভয় পায়। প্লাস ও এটাও জানে, ও যে-পোস্টে বসে আছে সেটায় তোমার বসার কথা।"
"বসার যদি কথা, আমি বসলাম না কেন?"
"হয়তো কোনও কারণে বাঙালিকে একদম টপ পজিশনগুলোয় বসাতে ভয় পায় কর্তৃপক্ষ।"
"আপনিও শেষে বাঙালির প্রিয় ষড়যন্ত্র থিওরিতে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন? শুনুন, করপোরেট যার থেকে ব্যবসা পাবে তাকেই মাথায় তুলবে। সে বাঙালি নাকি এসকিমো তাই নিয়ে এক বিন্দু মাথা ঘামাবে না।"
"তোমার ক্ষেত্রেও হয়তো ঘামাত না। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে যে কাঠি শুরু হল, এখান থেকে। কে জানে, আমিই হয়তো না বুঝে ক্ষতি করে গিয়েছি তোমার।"
"ধ্যাত! কীসব বলছেন?"
"ঠিকই বলছি। রুদ্রাশিসের কেসটা যেভাবে হ্যান্ডল করা হয়েছে তাতে ম্যানেজমেন্টের একটা অংশের মনে হয়েছে তোমরা কোম্পানির স্বার্থ না দেখে লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছ। শতভিষাকে তো রীতিমতো মেল করে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে, যার জন্য মেয়েটা চাকরিই ছেড়ে দিল; তোমার ক্ষেত্রে অতটা করা হয়নি কারণ তোমার পারফরম্যান্স ভাল, কিন্তু কোথাও তো একটা ব্ল্যাক স্পট পড়েইছে।
"শতভিষাকে শোকজ় করা হয়েছিল?"
"কিন্তু ও যে বলল, দিল্লিতে অনেক ভাল অফার পেয়েছে ব
চলে যাচ্ছে..."
"হয়তো লজ্জায় বলতে পারেনি তোমায়।"
আমি চুপ করে গেলাম। ব্রিজলালকে কীভাবে বলতাম যে, ল
নয়, আমার উপর মানসিক চাপ পড়ুক চায়নি বলেই শতভিষ
ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরে জানায়নি আমায়। কারণ ওর ওই চিঠি প
পিছনে রেসপনসিবল তো আমি। আমার ইচ্ছার মর্যাদা রাখত
নরম করে কেস সাজিয়েছিল।
"চুপ করে বসে থেকে কোনও লাভ নেই চয়ন। আমি একটা
দিচ্ছি। এখন যেহেতু তুমি অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির আগাপাশ
জানো, তুমি নিজে স্বাধীনভাবে একটা ডিলারশিপ নাও। সেখ
একটা রিপেয়ারিং ইউনিটও রাখো।
ব্যবসা জমবে।"
"ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টই প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি হ
আপনি মনে করেন যে অত টাকা..."
ব্রিজলাল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি জানি যে অ
তোমার নেই। কিন্তু আমি আছি।"
"আপনি দেবেন?"
"আমি পার্টনার হব তোমার। অবশ্যই নন-ওয়ার্কিং পার্টনার।
কাজকম্মো সব তুমি দেখবে।" ব্রিজলাল হেসে উঠলেন।
"কিন্তু..."
"কীসের কিন্তু চয়ন? আমার দ্বারা কি শুধু ক্ষতিই হবে তোমা
হতে পারে না একটুও?"
অফিসে রেজ়িগনেশন দিয়ে ব্যবসাটায় নেমে পড়লাম। যেখা
থাকা কঠিন হয়ে উঠছে সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার দ
কাজে দেয় না সবসময়। সময় ঘুরতে ঘুরতে ওভার শেষ হয়ে
আস্কিং রেট বেড়ে যায়। তখন হাতে উইকেট থাকলেও দশ ও
একশো দশ রান তোলা যায় না। তার চেয়ে এই ভাল। টেকনি
দিকটা বুঝে নিয়েছিলাম বলে জানতাম যে, গাড়ি কেনাটা এ
মুহূর্তের ব্যাপার কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ সারাজীবনের। তাই যার স
উইং যত স্ট্রং, সে ডিলার হিসেবে তত সফল। কলকাতার এক
জমজমাট লোকেশনে অফিস-শোরুম এবং গ্যারাজের জায়গ
পাওয়া প্রায় লটারি পাওয়ার শামিল। আমি একই স্পটে না হ
দু'কিলোমিটারের ডিসট্যান্সে শোরুম আর গ্যারেজ পেলাম দে
ব্রিজলালের হাতযশে। অফিসটা গ্যারেজ সংলগ্নই করলাম
কারণ গাড়ি বিক্রি হবে ব্র্যান্ডের নামে, সার্ভিসিং বাজে হলে ন
ডুববে আমার।
ঝুমাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু বলিনি, কারণ ও হাইপার হয়ে
যখন বললাম তখন একেবারে চুপ করে গেল। হিয়া আসার প
থেকেই জানি না কেন, একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল আমাদের
হয়তো আমি নিজেও দায়ী তার জন্য। আসলে তখন ব্যবসাটা
করানোর জন্য এমন উদয়াস্ত দৌড়তে হচ্ছে, এলাকার ডন থে
রাজনৈতিক নেতা এত লোকের সঙ্গে রফা করতে হচ্ছে দিনর
মাথাটা গরম হয়ে থাকত।
কাজের মেয়েটা ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল, বাড়ির রুটিন লন্ড
হয়ে গিয়েছিল একদম। একদিন বাড়িতে এসে দেখলাম, হিয়া
বিছানায় শুয়ে কাঁদছে আর ঝুমা কুটুসের হোমওয়ার্ক নিয়ে ব
"তুমি কি কালা হয়ে গিয়েছ? বাচ্চাটা কাঁদছে আর এখানে ব
বসে আছ?"
"আমি একটা কাজ করছি। কুটুসের হোমওয়ার্কটাও জরুরি।"
"চুলোয় যাক হোমওয়ার্ক।" আমি কুটুসের খাতাটা টেনে নিয়ে
ফেলে দিলাম মেঝেয়।
কুটুস অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, তারপর দৌড়ে নিজে

"এটা কী করলে তুমি?" ঝুমা খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।
"একজন বাবা হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে যা করা উচিত।"
"ছেলের হোমওয়ার্কের খাতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মানুষের মতো কাজ করলে?"
"হ্যাঁ। তুমি অমানুষ হয়ে গেছ বলে বুঝতে পারছ না।"
"আমি অমানুষ হইনি। আমি শুধু ভাবছি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ কীভাবে ধীরে ধীরে একটা অবসেশনের পাল্লায় পড়ে উন্মাদ হয়ে যায়।"
"আমি উন্মাদ?"
"না। কিন্তু তোমার জিনটা উন্মাদের জিন। সেদিন বিবিসিতে একটা প্রোগ্রাম দেখছিলাম..."
"তুমি আজকাল বিবিসি-ও দেখছ? রিমার্কেবল ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে সুনয়না দত্তর, মানতেই হবে!" বহুবছর পরে ঝুমার ভাল নাম ধরে ডাকলাম ওকে।
"তুমি যত খুশি টন্ট করতে পারো। কিন্তু আমি তোমার মতো ঘরজ্বালানি পরভোলানি নই। ছেলেকে পড়াতে গেলে বা যে-টিউটর ওকে পড়ায় তার পড়ানোটা বুঝতে গেলে আমাকে একটু ইংরেজি শিখতেই হবে। তার জন্য যতটা পারি ইংলিশ চ্যানেলগুলো দেখি, কানে শব্দগুলো নিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করি।"
"তা কী দেখলে বিবিসি-তে?"
"আফ্রিকার কোনও একটা দেশের উপর ডকুমেন্টারি। নামটা মনে করতে পারছি না। সেই দেশটা বহুবার পাশের দেশের আক্রমণে ছারখার হয়ে গেছে, তার গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। লাখো লোক মরেছে, অন্তত পাঁচ লাখ মহিলা রেপড হয়েছে।"
"এই গল্প শুনে আমি কী করব?"
"শোনার দরকার আছে বলেই বলছি। সেই যে পাঁচ লাখের বেশি ধর্ষিতা মহিলা তাদের মধ্যে অনেকেই, অ্যাবর্শনের সুযোগ বা উপায় ছিল না বলে, ধর্ষকের সন্তানের জন্ম দিয়েছে। ওভার দ্য ইয়ার্স। কেউ কেউ এক ধর্ষকের সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর ফের অন্য ধর্ষকের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে আবারও সন্তানের জন্ম দিয়েছে।"
"উফফ, হরিবল।"
"বাকি আছে এখনও। সেই যে বাচ্চাগুলো, তাদের অনেকেই যুবক এখন। এবং ওই দুই দেশের লড়াইটাও চলছে। তা সেই লড়াইতে এই সদ্য যুবকেরা বাবার দেশের হয়ে লড়তে চাইছে।"
"মানে?"
"খুব সিম্পল। ওরা নিজেদের রেপড মা নয়, রেপিস্ট বাবার পক্ষ নিচ্ছে।"
"রক্ত, রক্তই কথা বলে।"
"কীসের রক্ত চয়ন বোস? গর্ভস্থ বাচ্চা তো মায়ের রক্ত শুষেই বড় হয়। ওই রক্ত থেকেই পুষ্টি পায়। তাহলে তার আচারে-ব্যবহারে বাবার রক্তই কথা বলে কেন? কেন আমার স্কুলমাস্টার দাদা লুকিয়ে আমার বাবার মতোই জুয়া খেলে টাকা ওড়ায়? কেন তুমি নিজের বাবাকে ঘেন্না করার কথা বলতে বলতে সেই বাবার মতোই ব্যবসা করতে যাও?"
"জানি না, উত্তর নেই। শুধু জানি যে, আমার মেয়েটার খিদে পেয়েছে। আর তুমি সেটা বুঝতে পারছ না।"
"বুঝতে পারলেও আমার কিছু করার নেই। ওকে আমি পেটে ধরিনি। ও কাঁদলেই দুধ আসে না আমার বুকে। আমি কী করব?" বলতে বলতে ঝুমা পরে থাকা নাইটিটার বুকের কাছে টান দিয়ে বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেলল। এত জোর ছিল সেই টানে যে, নাইটিটার অনেকটা ছিঁড়ে গেল।
আমি ঝুমার বুকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "যাত্রা আরম্ভ করলে কেন?"

বলতে বলতে এগিয়ে এসে ঠাস করে আমার গালে একটা চড়
ঝুমা। আমি ওর হাতটা ধরতে গিয়েও ধরতে পারলাম না। হত
হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।
নয়নতারা থেমে গিয়েছিল। আবার প্রবল বেগে চিৎকার করে
শুরু করল।

আমি ঠিকই করে নিয়েছিলাম হিয়াকে আবার ওই অরফ্যানে
ফেরত দিয়ে আসব। কিংবা কোনও একটা ক্রেশে রেখে আসব
যতদিন না ও বোর্ডিং স্কুলে যাওয়ার মতো বড় হয়। আমি একা
স্বপ্ন দেখেছিলাম, তখন গুনাগারও আমি একাই দেব।
কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনা পরিস্থিতি একশো আশি ডিগ্রি পালটে
শীত শেষ হয়ে আসছে এরকম একদিন দুপুরে, ঝুমা বিকেলবে
নীচে নেমেছে। হিয়াকে নিয়ে পার্কে যাবে বলে আমাদের সবস
হেল্পিংহ্যান্ড কুসুমও নেমেছে ঝুমার পিছুপিছু। তখনই একটা সি
দেখে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকেছেন তিনতলার দেবমিতা সিনহা।
কুটুসের স্কুলবাস পাড়ার মোড়ে আসতে তখনও কিছুটা দেরি
বলে, ঝুমা আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের গ্যারেজে দাঁড়িয়ে মিসেস
সিনহার সঙ্গে গুলতানি করছিল। সেই সময়ই চিল চিৎকার দি
ওঠে হিয়া। দিতেই থাকে। বিরক্ত ঝুমা মিসেস সিনহাকে দাঁড়
গ্যারেজের অন্যদিকে কুসুমের কোলে কাঁদতে থাকা হিয়ার দি
এগিয়ে যায়। আর ঠিক তখনই বড় একটা চাঙড় ভেঙে পড়ে মি
সিনহার মাথায়।
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ভদ্রমহিলার। টিভি
বারবার দেখাতে থাকে গ্যারেজের ওই অংশটা, যেখান থেকে
ভেঙে পড়েছে। তিন-চারটে চ্যানেল থেকে ঝুমার বাইট নেওয়া
একটাতে তো রীতিমতো ইন্টারভিউ। উত্তেজিত ঝুমা, সন্ত্রস্ত ঝু
ভাগ্যের প্রতি নতুন করে বিশ্বাস ফিরে পাওয়া ঝুমা সবক্ষেত্রেই
ও নিজের মেয়ের জন্যই বেঁচে গিয়েছে। মেয়ে ওইসময় কেঁদে
উঠলে একশো শতাংশ দেবমিতার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকত ও।
কলকাতার প্রতিটা হাইরাইজ় কী অসম্ভব বিপজ্জনক তাই নিয়ে
তরজা বসে যায় চ্যানেলে-চ্যানেলে। পরদিন বিকেলেই গ্রেফত
প্রোমোটার, আবার জামিনও পেয়ে যায় কুড়িদিনের মাথায়। ব্য
থিতিয়ে যায়, চ্যানেলগুলোয় নতুন নতুন বিষয়ের আমদানি ঘ
থাকে; সান্ধ্য তরজার পারদ চড়তে থাকে ঘটনা নির্বিশেষে।
কেবল ঝুমা, হিয়াকে আমাদের দু'জনের মধ্যে শুইয়ে ঘুমিয়ে য
আগে আর ঘুম থেকে উঠেও বলতে থাকে, "মেয়ের জন্যই আ
ফিরে পেলে। নইলে 'নিজের বাড়ি নিজের বাড়ি' করে পাগল হ
যে-ফ্ল্যাট তুমি কিনেছিলে ওই ফ্রড প্রোমোটারের কাছ থেকে,
বিকেলে দেবমিতাদির সঙ্গেই আমিও পটল তুলতাম।"
"হুমম।" একই কথা বারংবার শুনতে শুনতে ক্লান্ত আমি পাশ
"তুমি মনে হয় খুশি হওনি আমি বেঁচে যাওয়ায়। তোমার নতু
টোপর পরার প্ল্যানটা ভেস্তে দিলাম বলে আমার উপর খুব রে
নাকি গো?" ঝুমা একটা ঠেলা দিল আমায়।
আমি পাশ ফিরে ঘুমন্ত হিয়াকে মাঝখানে রেখেই ঝুমাকে আদ
করতে করতে বলি, "তা হয়তো একটু রেগেছি; কিন্তু একইসে
এটাও সত্যি যে, আমি খুব খুশি হয়েছি তোমার কথা শুনে।"
"তোমার খুশি হওয়ার মতো কিছু বলেছি?"
"ওই যে বারবার বলছিলে তুমি তোমার মেয়ের জন্যই বেঁচে
আমি তো ভেবেছিলাম, হিয়াকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয়ই
তুমি। 'ওই বাচ্চাটা আমার বরের একটা খেয়াল', 'এমনি আমা
বাড়িতে থাকে, ব্লাড রিলেশন নেই', এরকম একটা কিছু বলে
কাটিয়ে দেবে।"
ঝুমা কেঁদে ফেলল আমার কথার ভিতরেই, "লজ্জা দিও না গে

আমি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে থম মেরে রইলাম একটু, তারপর ওকে আদর করতে শুরু করলাম।
সেই আদরের মাঝখানে ঝুমা অস্ফুটে বলে উঠল, "আমাকে একবার ক্ষমা করে দ্যাখো, একটা সুযোগ দাও, আমি হিয়ার মা হয়ে দেখাব।"
"তুমিই তো হিয়ার মা'ই।" বলতে বলতে গলা ধরে এল আমারও। চোখও ভিজে গেল, যখন হিয়াকে দেখাবে বলেই সে বছর আমাদের ফ্ল্যাটের বারান্দায় খুব যত্ন করে ঝুলন সাজাল ঝুমা। ইট-সুরকি-বালি-সিমেন্ট দিয়ে। বহুবছর পর, তাও ওর হাতের কাজ মুগ্ধ করল আমায়। কিংবা কে জানে, দুটো পাড় কাছাকাছি চলে আসায়, ওই নকল নদীকেই আসল বলে মনে হচ্ছিল।

২১

হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে গেল কারণ, সেলসের অভিজ্ঞতা আমায় শিখিয়েছিল ডিলাররা কোম্পানির কাছ থেকে কী চায় এবং মার্কেট সার্ভে করে আমি সম্যক জানতাম ভারতে গাড়ি যারা কেনে তাদের বেসিক চাহিদাটা ঠিক কী। গ্রামে যে-লোকটা গাড়ি কিনছে গাড়ি তার কাছে নিজের এবং আশেপাশের তিনটে গ্রামের কাছে স্টেটাস বাড়ানোর অমোঘ অস্ত্র, 'দেখনে' এবং 'দিখানে কা চিজ়'; শহরে দেড়খানা ঘরে ভাড়া থেকেও যে-দম্পতি বা লিভ-ইন পার্টনাররা গাড়ি কিনছে, তারা ধস্ত পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে একটুকরো ঝামেলাহীন পৃথিবী নির্মাণ করে নিতে চাইছে নিজেদের জন্য।
দু'জনের চাহিদা আলাদা বলে চয়েসও আলাদা হবে। একজন এমন গাড়ি চাইবে যা বহুলোকের উৎপাত সহ্য করতে পারে, আর একজন এমন গাড়ির খোঁজে থাকবে যেটা অল্প লোকের জন্যেই তৈরি হয়েছে। তারপরও যে যেরকম চাইছে সে ঠিক সেরকমটাই পাবে না কারণ, গাড়ি মাছের ঝোল নয় যে, চাররকমভাবে তৈরি করে দেওয়া যাবে চারজনের জন্য। তার উপর বাজেটের ব্যাপারটাও অনেকের অনেক স্বপ্নকে সাইজ় করে দেবে। আর সবকিছু মিলে গেলেও যা সমাধান করা দুঃসাধ্য তা হল, গাড়ি কিনলেও গাড়ি রাখার জায়গা মিলবে না। কলকাতা শহর এবং আশেপাশে দেশভাগের পর গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে অনেকেই এখন গাড়ি কেনার সামর্থ্য রাখেন। কিন্তু মুশকিল হল, যাদবপুর, বাঘাযতীন, বিজয়গড় কিংবা ওদিকে দমদম, বেলঘরিয়া, সোদপুরের বড় বড় কলোনিতে এমন অনেক গলি আছে যেখানে রিকশা অবধি ঢুকতে পারে না। একই সমস্যা বরানগর, হাতিবাগান বা বাগবাজারের অনেক বনেদি পাড়াতেও। অতএব, নিজের গাড়ি করে সেজেগুজে বিয়েবাড়িতে গেলেও, যাওয়া এবং আসার সময় গাড়ি কোনও ভাড়া করা গ্যারেজে রেখে আধ কিলোমিটার হেঁটে আসতেই হবে, শাড়ি-গয়না পরিহিতা নতুন বউটিকেও।
অন্য উপায় নেই। বড় বড় বাড়ি তৈরির সময় দু'দিকের দুটো বাড়ির মধ্যের গলিটাকে চওড়া করার কথা ভাবেনি উত্তর কলকাতা; কী দরকার, টানা রিকশা ঢুকতে পারছে তো! অন্যদিকে দরমার বেড়া আর টালির চালের ঘরগুলো তিন-চারতলা পায়রার খোপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে শিগগিরই, তাই রাস্তাটাও বড় চাই, এমনটা ভাবেনি দক্ষিণের প্রান্ত। সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা তাই। তবু তার ভিতরেই লোকে গাড়ি কেনে। গাড়ি কিনে যায়। গাড়ি তৈরির মহাতীর্থ ছিল যে-শহর, হাজার হাজার লোক যেখানে 'জেনারেল মোটরস' কিংবা 'ফোর্ড'-এর কারখানায় কাজ করত সেই ডেট্রয়েট আজ ধুঁকছে। কারখানাগুলো রুগ্ন। অথচ গাড়ি কেনার হিড়িক বেড়েছে দুনিয়া জুড়েই। কারা তৈরি করছে এত গাড়ি? কোথায় তৈরি করছে?
"জাপানিরা সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে ভাবতে পারে বলেই বুঝতে হবে যে, গাড়ি থেকেই সভ্যতার সবচেয়ে বড় সংকট
ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন শহরেও যে-পথ পাড়ি দিতে
লাগত, সেই রাস্তা যেতে দেড়ঘণ্টা লাগছে। কত ফ্লাইওভার
পারে একটা দেশের সরকার? শুধু ফ্লাইওভার তৈরি করাটাই
তার কাজ?" সাক্সেনা সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে
বললেন একদিন।
"কিন্তু গাড়ি ছাড়া চলবেই বা কী করে?"
"চালাতে হবে চয়ন। সাইকেল চড়তে হবে। পৃথিবীর সবচে
পনেরোটা শহরের মধ্যে চোদ্দটা ভারতে। এই ব্যাপারটাকে
রাজনৈতিক দল কোনওদিন নির্বাচনে ইস্যু করেছে দেখেছ?
না। কারণ ক্ষমতায় এলে প্রত্যেকেই সাতটা গাড়ির কনভয়
ঘোরার খোয়াইশ রাখে। আমার কথাগুলোর মানে এই নয়
ব্যান করতে হবে। সেটা সম্ভব নাকি? কিন্তু একই গাড়ি অনে
প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। ভোরবেলা গাড়িটা থাক গা
কলেজের অধ্যাপিকার জন্য, সকালে কোনও আমলার জন্য
হয়ে যাক সাংবাদিকের। দিস ইজ় দ্য ওয়ে। পৃথিবীর অনেক
ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে।"
"খেয়েছে! তার মধ্যে আপনি আমাকে গাড়ির ডিলারশিপে
আর নিজেও ইনভেস্ট করলেন। ডুবব তো।"
"একটুও ডুববে না। আমি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি এ
লোকের মালিকানা নিয়ে একটা অবসেশন আছে। স্টেনলেস
বাটি থেকে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে বেড়ে ওঠা পেয়ারা গাছটাকে
নিজের বলে ক্লেম করতে ভালবাসে। অতএব রেস্ট অ্যাশিও
তোমার বিক্রি কমবে না।"
আমি কথা না বলে তাকিয়ে রইলাম সাক্সেনা সাহেবের দিকে
ভিতর দুটো সিনেমার দৃশ্য ভাসছিল। একটা 'সোনার কেল্লা'
লালমোহনবাবুর বলা সেই অমর সংলাপ, 'এটা আমার'। অ
দ্বিতীয়টা একটা হলিউড মুভির সিন। সেখানে একটা সুস্থসব
পঙ্গুর জীবন যাপন করতে এতটাই বদ্ধপরিকর যে, নিজের
ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে বসে থাকে দীর্ঘক্ষণ, যাতে অ্যামপিউট ক
হয় পা-টাকে; হাঁটুর নীচ থেকে।
"কী ভাবছ?"
ভাবছিলাম, আমি নিজেও কি অবসেসড নই? কখনও বাবা
কখনও সন্তানের নিরিখে পৃথিবীটাকে মেপে চলেছি সারাক্ষণ
বললাম, "কই কিছু নয়।"
"খাজুরাহো বেড়াতে যাবে বলছিলে?"
"হ্যাঁ। প্রায় দু'বছর কোথাও যাওয়া হয়নি তো।"
"ফিরে এসে যদি পারো, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিও
"বলুন।"
"হাজার হাজার বছর ধরে কী অপূর্ব প্রেমে একটা পাথর আ
পাথরকে জড়িয়ে ধরে রাখে। কোনওদিন ফুরোয় না সেই আ
মানুষ কেন মানুষকে জড়িয়ে ধরে থাকতে পারে না ওরকম?
সব ভালবাসারই নিয়তি বিচ্ছেদ? পাথরের জন্য যা জায়েজ়,
জন্য নয়?"
খাজুরাহো থেকে ফিরে ওঁকে ওঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে যেতে
উনি তার আগেই একটা সাডেন হার্ট অ্যাটাকে চলে গেছেন।
খবরও পাইনি ঘুরতে থাকাকালীন।
অনেকটা টাকা ইনভেস্ট করলেও ভদ্রলোক খাতায়-কলমে
অংশীদার হননি আমার ব্যবসার। বলেছিলেন, "তোমার থে
ডিভিডেন্ড নেওয়ার জন্য আমার সাক্ষীসাবুদ লাগবে না।"
আর কারওকে সাক্ষী না রেখে তিনি চলে গেলেন।
"এই আমি সত্যিকার পিতৃহীন হলাম ঝুমা।" কাঁদতে কাঁদতে
বলেছিলাম ঝুমাকে তখন।

ঘড়ি আর একটি ডায়েরি দিয়ে গিয়েছিল। জানিয়েছিল, প্রায় অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে যাওয়ার সময় ব্রিজলাল এই দুটো জিনিস আমায় দেওয়ার কথা বলে গিয়েছিলেন।

"আপনি?"

"উনি যে-ফ্ল্যাটে থাকতেন, আমি সেখানকার কেয়ারটেকার।"

আমি বুরবকের মতো ছেলেটিকে একশো টাকা দিতে যাই। ছেলেটি হাতজোড় করে রিফিউজ় করে চলে যায়।

সেই ডায়েরিতে অনেক টুকরো টুকরো ইংরেজি লেখা। ব্রিজলাল যে-কথাগুলো বলতেন, আর যেগুলো বলতেন না, অনেকগুলোই ছোট ছোট করে লিখে গেছেন। আমি সেই ডায়েরিটা একজন প্রকাশককে দিয়ে প্রকাশ করাই। 'র‍্যানডম থটস' নাম নিয়ে সেই বইটা বেরোয়। একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানও করেছিলাম। অনেক খুঁজে পেতে ওঁর বাড়ির লোকের সন্ধান পেয়েছিলাম। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ওঁদেরও। কেউ আসেননি অবশ্য। সে না আসুন। বইটার তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। খাজুরাহো নিয়ে ওঁর ওই প্রশ্নটাই ছিল বইয়ের প্রথম লেখা। আমি ঝুমাকে খুব পড়ে শোনাতাম সেই সময়। আর ওঁর ব্যবহৃত ঘড়িটা রাতে শোওয়ার সময়ও পরে থাকতাম হাতে।

"ঘড়ি পরে কেউ ঘুমোয়?" ঝুমা বিরক্ত হত।

"কথা নয়। কিন্তু পাথর তো পাথরকে ছাড়ে না। ছাড়তে পারে না ঝুমা।" বলতে বলতে আমার গলা চোক করে যেত।

ব্রিজলাল সাক্সেনা চলে যাওয়ার আট বছর পরে, একদিন ঝুমা আমাকে ওঁর ওই কথাগুলো বলে বলল, "পাথর হয়ে সংসারে বাঁচা যায় না। ফ্লেক্সিবল হতে হয়। ফ্লেক্সিবল হতে শেখো।"

"ফ্লেক্সিবল না হলে কলকাতা শহরে ব্যবসা করে খেতে পারতাম না, তোমাদের খাওয়াতেও পারতাম না।"

"থেমে গেলে কেন, পরপর বলে যাও। সাইকেল না থাকা অবস্থা থেকে উঠে এসে তিনটে গাড়ির মালিক হতে পারতে না, বাইপাসের ধারে সাড়ে তিনকাঠা জমির উপর পেল্লাই দোতলা বাড়ি হাঁকাতে পারতে না, প্রতিবছর এলাহি খরচ করে ট্যুরে নিয়ে যেতে পারতে না, অ্যানিভারসারিতে হিরের দুল দিতে পারতে না। বলার কথা তো কম নেই তোমার।"

"আমি বলার চাইতে কাজে করে দেখাতে পছন্দ করি। কিন্তু যখন কেউ বুঝবে না বলে জেদ ধরে থাকে, তখন বলতেই হয়।"

"তুমি অন্যের দিকটা বোঝো?"

"চেষ্টা করি। সবসময়।"

"না, করো না। আমাদের কথা বাদ দাও, ওই যে তোমার ভগবান, সাক্সেনা সাহেব, তাঁর ফ্যামিলির সঙ্গেও কি তুমি ঠিকঠাক ব্যবহার করেছ?"

"ভুলটা কী করেছি, ধরিয়ে দাও। যখন স্যারের বইপ্রকাশ করছি, কমপ্লিটলি নিজের উদ্যোগে, তখন হাজারবার ডাকলেও ওঁর ফ্যামিলির কেউ আসেননি। আর পাঁচবছর পর ওঁর নাতি কলকাতায় পড়তে আসবে জেনেই ওদের আমার কথা মনে পড়ে গেল। সাক্সেনা আমার সম্পর্কে এই বলেছেন, ওই বলেছেন, কত মধু! অ্যাকচুয়ালি ওই ছেলেটার সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছিল।"

"দায়িত্ব যদি নিতেই, কী ক্ষতি হত? সাক্সেনা সাহেবের পয়সা ছাড়া তোমার বিজনেস দাঁড়াত? আমাকে তো কিপটে বলে কত কথা শুনিয়েছ জীবনভর, নিজে একটু দিলদরিয়া হয়ে দেখাতে!"

"দিলদরিয়া তাদের জন্যই হওয়া যায়, যাদের দিল আছে। যারা সেদিন ওই অনুষ্ঠানে আসার ভদ্রতাটুকুও দেখায়নি..."

" ফাটা রেকর্ড বাজিয়ো না তো। বই উদ্বোধন হবে বলে ফ্লাইটে দিল্লি থেকে কলকাতা আসবে?"

"ট্রেনেও আসতে পারত। ফ্লাইটে আসার মাথার দিব্যি দেয়নি কেউ।

"হিয়ার দশ বছর হচ্ছে বলে যে-সেলিব্রেশনের প্ল্যান করেছ ধরে, সেটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়?"

"গুরুত্বপূর্ণ বলেই তো ক্যানসেল করে দিতে চাইছি। এই বা ঘটে গেছে, যা আমি নিজের চোখে দেখেছি তারপর আর ও গানা-খানা-পিনা কনটিনিউ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। মন চাইলে তুমি কোনও হোটেলে পার্টি দাও। হিয়ার বন্ধুবান্ধ তোমার বন্ধুদের ডাকো। যা খরচা হয় সব দিয়ে দেব।"

"খরচা দিয়ে দিলেই দায়িত্ব পালন হয়ে যায় না চয়ন বোস। ছেলেমেয়েকে বড় করা একটা দায়িত্ব। তুমি সেটা সারাজীবন এড়িয়ে গেছ।"

"ঠিকই বলেছ। আমি এড়িয়ে গিয়েছি বলেই তো তুমি দায়িত্ব এমন চমৎকার ছেলে তৈরি করেছ। সুনয়না ম্যাডামের নয়নে অন্তরালে না জানি সে আরও কত কীর্তি করে।"

"সারাক্ষণ নিজের ছেলের নিন্দে করতে খারাপ লাগে না তো কেমন বাবা গো তুমি?"

"অপদার্থ বাবা। নইলে ওই ছেলে হয়।"

"তুমি বাড়িয়ে বলছ। অত কিছুই হয়নি। আর হলেও ও বুঝে করেনি।"

"বুঝে করেনি মানে? কুটুসের প্রায় ষোলো বছর বয়স।"

"আরে বাবা, আজকালকার বাচ্চারা ওগুলো অত সিরিয়াসি না। ওদের কাছে এসব জলভাত। তুমি এত রিঅ্যাক্ট করছ বে

"করছি কারণ, আমি আজকালকার লোক নই। আমার চোখ গলে যাচ্ছিল ওই দৃশ্য দেখে।"

"আবার বাড়াবাড়ি করছ..."

"তুমি কোরো না। তুমি সুপার-আধুনিকা হও। কে বারণ ক এরপর ছেলে বেশ্যাখানায় যেতে চাইলে তার হাতে টাকা গুঁজে দিও।"

"এই কথাটা বলতে পারলে?"

"আমি যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, তাতে আরও অনেক কিছুই ব ফেলব হয়তো। তুমি চুপ করে যাও। কথা বাড়িয়ো না প্লিজ়।"

"যে-গাড়ি বেচো সেই গাড়ির পাইপ হয়ে গেছো তুমি। সারা ধোঁয়া বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।"

ঝুমাকে যদি বোঝাতে পারতাম শুধু মুখ দিয়ে নয়, আমার স দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আমি নিজেই ধোঁয়া হয়ে গেছি।

দিনসাতেক আগে ঝুমা পার্লার থেকে ফোন করেছিল আমা ফিরতে একটু দেরি হবে জানিয়ে। আমি আধমিনিট কথা বলে রেখে দিয়েছিলাম। ডিস্টার্বড ছিলাম আমি।

গাড়ির লাইনে অনেক ফ্রড থাকে কারণ গাড়িটা মানুষের প যাওয়ার একটা হাতিয়ার। কত অপরাধী গাড়ি চুরি করে পা নিজেদের অপরাধ থেকে বাঁচতে চেয়েছে, ইয়ত্তা নেই তার। এক ফেরেব্বাজ একটা গাড়ি টেস্ট ড্রাইভ করার নাম করে প চাইছিল। ধরা পড়ে যায়। তারপর তাকে পুলিশের হাতে তুলে ইত্যাদি কাজ সেরে বাড়ি ফিরছি, ঝুমার ফোন এল।

বাড়িতে ঢুকে বেল দিতে হয়নি, গাড়ির শব্দ পেয়ে পিন্টু দরজ দিয়েছিল। আমি ঘরে ঢোকার আগে জানিয়েছিল যে, খুব ভা গোলাপ ফুটিয়েছে, কাল সকালে দেখাবে।

পিন্টুর ওই একটা কথায় মন ভাল হয়ে গেল আমার। আলিপ থেকে কলকাতায় কাজ করতে আসা ছেলেটা ভারী ভাল মা কালিঝুলি মেখে গ্যারেজে কাজ করে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলা আমার অফিসের সামনের এক চিলতে জায়গায় ওর ফোটা চেহারা দেখে আমি ওকে বাড়িতে নিয়ে আসি। সারাদিন আম বাড়িতেই থাকে, ফুল ফোটানো ছাড়া আরও হাজারটা কাজ

এখানেই থেকে যেতে বলেছিলাম, একতলায় অতগুলো ফাঁকা ঘর, কিন্তু পিন্টু মাথা নিচু করে জানিয়েছিল যে, সদ্য বিয়ে করেছে। সদ্য বিয়ে তো সদ্য ফোটা গোলাপের চাইতেও সুন্দর, আমি তাই দালাল মারফত কাছাকাছিই একটা দু'-কামরার ঘরে ওর ভাড়া থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কলকাতার সব প্রাইম লোকেশন থেকে কাছে হলেও, এই অঞ্চলে এখনও বাড়িভাড়া মারাত্মক নয়।
রান্নার মাসি চলে গিয়েছে, একতলার বৈঠকখানা আধো-অন্ধকার, আমি পিন্টুকে জিজ্ঞেস করলাম, "হিয়া আর কুটুস কোথায়?"
পিন্টু আঙুল দিয়ে দোতলা দেখিয়ে দিল।
অন্যদিন হিয়া যেখানেই থাকুক ছুটে এসে একবার জড়িয়ে ধরবেই, আজ সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কেন? পড়াশোনায় ব্যস্ত?
জুতো-মোজা ছেড়ে স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে আমি দোতলায় উঠে আমাদের ঘরে যাওয়ার আগে হিয়ার ঘরে উঁকি দিলাম। ঘরটা ফাঁকা, একটা নীল আলো জ্বলছে। গেল কোথায় মেয়েটা?
কুটুসের ঘরের দরজা বন্ধ। কিন্তু ভিতর থেকে প্রবল বেগে গানের শব্দ আসছে। ছ'মাস পরে বোর্ড এগ্‌জাম, বাবু গান চালিয়ে নাচছে নাকি? আর দরজাটাই বা বন্ধ কেন? বিরক্ত হয়ে বাইরের নবটা ঘোরাতেই অল্প একটু আওয়াজ করে খুলে গেল দরজা।
আমার নরকদর্শন শুরু হল।
একদম উদোম গায়ে, শুধু একটা বারমুডা পরা আমার ছেলে, আমার মেয়েটাকে ঘাড়ে পিঠে গলায় চুমু খাচ্ছে। আমার দশ না-হওয়া মেয়েটা কীরকম দুটো হাত তুলে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। কুটুস ঠিক সেভাবেই চুমু খাচ্ছে হিয়াকে, যেভাবে কামতাড়িত পুরুষ, নারীকে খায়। ওই আবার জাপটে ধরল, আমার একরত্তি মেয়েটাকে।
আমার মনে হচ্ছিল হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে তখনই। মনে হচ্ছিল, আমি যেন মুম্বই, দিল্লি, হায়দরাবাদে সন্ত্রাসী হামলার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। বোমা পড়ছে আমার শরীরে, অহরহ বোমা পড়ছে। ওই আমার পা, ওই আমার হাত, আমার যকৃৎ, ফুসফুস সব ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে শরীর ছেড়ে।
হিয়া হাসতে হাসতেই (কিন্তু ও হাসছিল কেন!) বলছে, "নো দাদাই নো।"
কুটুস হাসতে হাসতেই (এত অধঃপতন হয়েছে?) জবাব দিচ্ছে, "কাছে আয়, তোর মজা দেখাচ্ছি।"
আমার মনে হচ্ছিল আর একটু হলেই, প্রাণ আমার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। আমি সেই অবস্থায় নিজের সর্বশক্তি জড়ো করে চিৎকার দিলাম, "স্টপ ইট!"
কুটুস চমকে তাকাল।
হিয়াও একটা ভয় পাওয়া হাসি দিল আমার দিকে তাকিয়ে।
আমি ঘরের ভিতর ঢুকে, স্পিকারটা বন্ধ করলাম প্রথমে। তারপর আমার স্লিপারটা খুলে হাতে নিয়ে ধাঁই-ধপাস চার পাঁচটা বাড়ি বসিয়ে দিলাম কুটুসের ঘাড়ে, পিঠে, পাছায়।
হিয়া কাঁদতে শুরু করল।
তখনই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে ঝুমা চেঁচিয়ে উঠল, "হচ্ছেটা কী?"
"আমি বোনুর সঙ্গে খেলছিলাম। বাবা বিনা কারণে আমায় মারছে।"
আমার মাথা দপদপ করছিল। আমি একটা চড় চালিয়ে দিলাম কুটুসের গাল লক্ষ্য করে।
কুটুস ঝট করে সরে যাওয়ায় চড়টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।
"কী করছ কি তুমি?" ঝুমা এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরল।
"তোমার গুণধর ছেলেকে জিজ্ঞেস করো, কী করছিল ও। কী রে হারামজাদা, বোনকে জাপটে ধরে কী হচ্ছিল?"
"উই ওয়্যার জাস্ট কিসিং ইচ আদার। একটা নিউ অনলাইন গেম ডাউনলোড করেছি, সেটার রুলস ফলো করে খেলছিলাম।"
তুই ওকে আটকে রেখেছিলি।"
"আরে, তুমি চুপ করো না। আমাকে হ্যান্ডল করতে দাও। কু
কী করছিলে তুমি?"
"নাথিং মাচ, মা। তুমি বোনুকে জিজ্ঞেস করো।"
হিয়া কাঁদছিল। আমি ওকে কোলে তুলে নিয়ে বললাম, "তো
ন্যাকামিগুলো বন্ধ করো ঝুমা। 'মাসি, তুমিই আমার ফাঁসির
হয়ো না। আর কুটুস, তোকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, তুই
ধারেকাছে আসবি না একদম। আর কোনওদিন যদি তোকে
করছিলি তার দশভাগের একভাগও করতে দেখি, মেরে তক্ত
দেব।" বলতে বলতে হিয়াকে কোলে নিয়েই এগিয়ে আমি ি
এলোপাথাড়ি চড় চালালাম। মাত্র দুটোই ওর গায়ে লাগল।
ঝুমা চেঁচাতে লাগল, "বন্ধ করো, বন্ধ করো।"
কুটুস খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "অন্যায় কিছুই করিনি। হে
হার্ম ইন কিসিং? আর তাছাড়া বোনু কি আমার নিজের বোন
ওর সঙ্গে কিছু করা যাবে না?"
আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল কথাটা শুনে। নেহাত হিয়া কো
নইলে ওখানেই ধপ করে বসে পড়তাম। কুটুসের ঘরের বাই
হিয়াকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে, একতলায় নেমে এসে আবার
উঠে গিয়ে শেলফের ভিতর থেকে একটা স্কচের বোতল নিয়ে
এলাম। কিন্তু প্রায় র' দু'-তিন পেগ মেরেও পালসবিট কমল
কেবল ভাবছিলাম, কীভাবে বাঁচাব আমার মেয়েটাকে? কেম
সামলাব পাগল ঘোড়াটাকে, যে, কেউ পিঠে বসলেই উলটে
ঝুমা অনেকক্ষণ ধরে দরজা নক করছিল। খুলে দিতেই অনে
আরম্ভ করল।
তার একটাও কান দিয়ে মাথায় ঢুকল না আমার। আরও এক
গলায় নিতে নিতে আমি শুধু বললাম, "হিয়া তো কুটুসের নি
বোন নয়। তুমি আমার নিজের বউ তো ঝুমা?"

ওই ঘটনার পর মেয়ের দশ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে মেগা
ইভেন্ট করতে আমার মন তৈরি ছিল না। তবু ঝুমার জোরাজু
বাধ্য হলাম একরকম। বাড়িতে অশান্তি, কান্নাকাটির পরও কু
বাড়িতেই থাকে, আমাকে রোজ রাক্ষুসে একটা পৃথিবীর মো
করতে হয়।
আমি মেনে নিলাম বলেই অনুষ্ঠান হল, কিন্তু সেই প্রাণটা
পাওয়া গেল না। হিয়া স্টিফ হয়ে রইল, কুটুস খানিকক্ষণ থে
নীচে নিজের ঘরে চলে গেল, এক ঝুমা প্রাণপণ চেষ্টায় তাল
দিয়ে গেল যতক্ষণ পারল। আমি ঠিকঠাক সঙ্গত করতে না প
চেষ্টাও মাঠে মারা গেল।
জন্মদিনে নিমন্ত্রিতদের প্রায় ওয়ান-থার্ড অ্যাবসেন্ট। "তোমার
বলার কথা ছিল মূলত তাদের মধ্যে থেকেই আসেনি। তুমি ব
ঠিক করে?" ঝুমা খর চোখে তাকাল আমার দিকে।
"কে জানে!"
"আদৌ বলেছিলে?"
"তাও গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারব না।"
"একেবারে বরবাদ হয়ে যাচ্ছ। নিজেকে একটু সামলাও।" ঝু
বিরক্তিতে বলে উঠল।
"বরবাদ হয়ে যাওয়ার থাকলে, হবই। বাড়ির পাঁচিল দিয়ে তে
আটকানো যায় না।"
ঝুমা বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। পিন্টু এসে দাঁড়াল দরজার সাম
"কী ব্যাপার পিন্টু?"
"স্যার, অনেক খাবার বেঁচে গেছে।"
"তুমি বাড়ি নিয়ে যাও। তোমরা খেও।"
"তারপরও অনেক থাকবে, নষ্ট হবে।"

"আমি বলছিলাম কি, গড়িয়াহাটে ফ্লাইওভারের নীচে যারা থাকে তাদের মধ্যে বিলি করে দিলে ভাল হত না? ওরা পেট ভরে খেত আর হিয়ারানিকে অনেক আশীর্বাদ করত।"
মা বলত, "যখনই পারবি, ভিখিরিদের খাওয়াবি ভাল করে। অনেক পুণ্য হয়।" কথাটা মনে পড়তেই লাফিয়ে উঠলাম আমি। আমার সংসারে এখন অনেক পুণ্যবলের দরকার।
তিনটে গাড়ির কথা ঝুমা বলে বটে, কিন্তু একটা গাড়ি পুরোপুরি অফিসের কাজেই ব্যবহৃত হয়। সেটায় আমি ছাড়া অন্যরাও চাপে প্রয়োজনে। বাড়ির গাড়ি দুটো, বড় গাড়িটা সবাই মিলে বেরোবার জন্য। আর একটা ছোট।
বড় গাড়িটার পিছনে যতটা সম্ভব খাবার আর প্লাস্টিকের প্লেট তুলে, আমি পিন্টুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল, খেতে খেতে হেঁচকি উঠলে লোকগুলো জলের জন্য ছুটবে কোথায়? আমার নির্দেশে, পিন্টু চারটে দু'লিটারের মিনারেল ওয়াটারের বোতল আর কতগুলো প্লাস্টিকের গ্লাস কিনে আনল, সবাইকে জল খাওয়াবার জন্য।
গড়িয়াহাটের ফ্লাইওভারের কাছে গাড়িটাকে সাইড করে, দুটো গামলা নামাতেই, কুকুরেরা তেড়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে পিন্টুর হাঁকডাকে এদিক ওদিক থেকে তিরিশ-চল্লিশজন ফুটপাথবাসী এগিয়ে এসেছে। মানুষের খিদের সঙ্গে লড়াইয়ে কুকুরের খিদে জিততে পারবে কী করে? ওরা সরে গেল। আমি পিন্টুকে চোখের ইশারায় বললাম, কুকুরগুলোও যেন অভুক্ত না থাকে, আজকের রাতটা। ওদের শুভেচ্ছারও প্রয়োজন আছে আমার মেয়েটার।
সার বেঁধে বসে পড়া মানুষগুলোকে পরিবেশন করতে ভারী ভাল লাগছিল। যারা খেতে চায় না তাদের খাইয়ে কী আনন্দ? আনন্দ তো যারা খেতে পায় না, তাদের খাইয়ে!
এদের ভিতরের নেটওয়ার্ক স্ট্রং। খবর পেয়ে নতুন-নতুন ফুটপাথবাসী চলে আসছিল। আসুক। যতক্ষণ খাবার থাকবে, খাইয়ে যাব।
একেবারে চাঁচাপোছা গামলাগুলো যখন আবার গাড়িতে তুলছি, তখন এক বৃদ্ধ এসে হাজির। পাকানো দড়ির মতো চেহারা লোকটার। বয়স সত্তরও হতে পারে, আশিও হতে পারে।
"খাবার সব ফিনিশ?" লোকটা জিজ্ঞেস করল।
পিন্টু দুটো লাড্ডু এগিয়ে দিল লোকটার দিকে।
লোকটা সেই লাড্ডু প্রত্যাখ্যান করে বলে উঠল, "ধুস, খেতে এলাম ফ্রায়েডরাইস, মাংস, লাড্ডু ধরিয়ে দিচ্ছে হাতে!"
"চ্যাম্পিয়ন দাদু আজকে রানার্স। ফ্রায়েডরাইস আর মাংসটা তোফা হয়েছিল, তোমার কপালে নেই।" একটা লোক বলতে বলতে চলে গেল।
আমি একশো টাকার একটা নোট এগিয়ে দিলাম লোকটার দিকে।
লোকটা নিল না, "ধুর মশাই, আমি ভিখিরি নই, আমি বিজনেসম্যান। ওই উলটোদিকের ফুটপাথেই বসি।"
"তবুও আপনি খাবেন। আমার মেয়েকে আশীর্বাদ করবেন।"
"আশীর্বাদ করতেই পারি, কিন্তু এত রাতে এই টাকা দিলেও কি কিছু মিলবে? তাছাড়া দোকানের রিচ খাবার খাই না, সহ্য হয় না। বাড়ির মাংস-ফ্রায়েডরাইস শুনে খেতে এসেছিলাম।"
"আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগছে।"
"খারাপ লাগলেই বা কী করবেন? বাদ দিন, বোসদের শালা চিরকালের ব্যাডলাক। জগদীশ বোস, সত্যেন বোস পাওয়া নোবেল পেল না। নেতাজি সুভাষ আর রাসবিহারী বোস প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার হতে পারল না। আর আজ দেখুন, আপনি এখানকার সবাইকে খাওয়ালেন, কিন্তু চপল বোস খেতে পেল না। যাকগে, একটা সিগারেট হবে?" লোকটা হাত বাড়াল।
আমি নিজেই ততক্ষণে একটা সিগারেট হয়ে গিয়েছি, জীবন যার থাকা প্যাকেটটাই এগিয়ে দিলাম।
চপল বোস নিয়ে নিল।

২২

জীবন থেকে যে-ডাকটা হারিয়ে গিয়েছে সেই ডাকটা জীবনে আনা যে কত কঠিন, আমি নিজেই তার প্রমাণ। ইচ্ছে যে হয় নয়, কিন্তু ইচ্ছে হলেও লোকটাকে 'বাবা' বলে ডাকতে পারি ডাকটা গলার ভিতরেই আটকে ছিল।
ঝুমা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি ঝুমার পাশে জেগে ভাবছিলাম দেওয়া ক্ষত আজও দগদগে, তাকে 'বাবা' বলে ডাকার ইচ্ছে কেন আমার। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের ভিতরে উত্তরটা পেলাম, শে আমি আসলে আমার 'নির্দোষ' সত্তাটাকে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে চাইছিলাম। খুনি নই, আমি খুনি নই। চপল বোসের মাথায় ট মেরে থাকলেও নয়।

ছ'সাত মাস পরের একটা সন্ধেয়, অফিস মিটিং-এর মধ্যে খ পেয়েই যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছে যখন জানলাম যে সর্বনাশই হয়েছে, আমার নিজেকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হল স আগে। কিন্তু গাড়ির চাকায় মাথা থেঁতলে যাওয়া আমার ফুটে মেয়েটার কাটাকুটি করা শরীর মর্গ থেকে বুঝে নিতে নিতে আ মনে হল, কৈশোরে একটা খুন করে উঠতে না পারলেও আম মধ্যবয়সে পৌঁছে একটা খুন আমাকে করতেই হবে। 'বাবা'কে পারিনি কিন্তু 'বাবা' হয়ে মারতেই হবে। চপল বসু বেঁচে গিয়ে নীলাঞ্জ বসু বাঁচবে না, বাঁচা উচিত নয়।
যেখানে ঘটেছিল ঘটনাটা আমি সেখানে ফিরে গিয়েছিলাম, সে রাতেই। দেখেছিলাম, রাস্তার একদিকে অনেকখানি জমাট রক্ত পরদিন ফিরে এসে দেখেছিলাম, দাগটা থাকলেও অনেকখানি হয়ে গিয়েছে, আর পরদিন থেকে কোনও চিহ্নই ছিল না পিচে রাস্তা কত সহজে মুছে দিতে পারে, মানুষকে যা সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়। কিন্তু আমি কেবল বয়েই বেড়াব না, আমি প্রতিশোধ নেব।
আমার বাড়ির এক কিলোমিটারের মধ্যে একটা মাঠে মস্ত মে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির শেষ, মার্চের শুরুতে। নানারকম দোকা খেলার আয়োজন, প্রাইজেরও ছড়াছড়ি। ক্লাস টেনের বোর্ড এ হয়ে যাওয়ার পর একেবারে ঝাড়া হাত-পা কুটুস, সেখানে যাচ্ছিল। সেই শনিবার হিয়াকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।
"হিয়া টিউশন সেরে বাড়ি ফিরল, তারপর আবার বেরল মে যাবে বলে?"
"বাড়ি ফেরেনি। কুটুস ওকে টিউটোরিয়াল থেকেই নিয়ে গিয় মেলার মাঠে।" ঝুমা উত্তর দিল।
"ওহ, আচ্ছা। মানে, হিয়াকে সেদিন মেলার মাঠে নিয়ে যাবে ঠিক করেই রেখেছিল কুটুস। তাই ড্রাইভারকে যেতে না দিয়ে হিয়ার টিউটোরিয়াল অবধি চলে গিয়েছিল।" আমার ভিতরে বিশ্বাসে বদলে যাচ্ছিল।
"সেদিন আসলে দারুণ কয়েকটা ইভেন্ট ছিল মেলায়। ভাবল বোনুকে নিয়ে যাই। মজা পাবে।" কুটুস বলত।
"কী ইভেন্ট রে? সেই তুই যেরকম পিছন থেকে জাপটে ধরে হিয়াকে, সেরকম কিছু?"
কুটুস কোনও উত্তর না দিয়ে সরে যেত আমার সামনে থেকে প্রশ্নটা করলেই।

হিয়ার জন্য ঝুমা চাণ্ডড়ের হাত থেকে বাঁচলেও, হিয়ার মৃত্যুতে

নিয়তি বলে। আত্মীয়স্বজনদের মতোই বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, মেলা থেকে বেরোবার সময় কুটুসের হাত ছাড়িয়ে হিয়া ছুটে যাচ্ছিল আইসক্রিমওয়ালার কাছে, আর ওদিক থেকে ছুটে আসা একটা রাক্ষুসে গাড়ি, পিষে দেয় আমার মেয়েটাকে। কুটুস গাড়িটার নম্বর মুখস্থ বলতে পারায় পুলিশের পক্ষে ড্রাইভারটাকে দু'দিনের মধ্যে লকআপে নিয়ে নেওয়া খুব সহজ হয়। অবাঙালি এক রিয়াল-এস্টেট কারবারির অনেক গাড়ির একটা ওটা। ড্রাইভারটাকে যখন কোর্টে তোলা হয়েছিল, গাড়ির সেই মালিক আমাকে একটা ভাল অ্যামাউন্টের টাকা অফার করেছিলেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে। আমি প্রত্যাখ্যান করার সময় বলেছিলাম, "গাড়িটা আটক থাকতে পারে আপনার। এর বাইরে, যা বুঝতে পারছি, আমি আপনার একটা চুলও ছিঁড়তে পারব না। খামোখা পয়সা নষ্ট করবেন কেন? মেয়ে তো আমার গেছে।"
গাড়ির মালিক চুপ করে গিয়েছিল।

কুটুস কিন্তু চুপ করে রইল না। হিয়া চলে যাবার পর যখন দু-তিনবার পুলিশ এসেছে আমার বাড়িতে, তখন খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হ্যান্ডেল করেছে পুলিশকে। জবাব দিয়েছে, সমস্ত প্রশ্নের। 'অনিচ্ছাকৃত খুন'-এর মামলায় ড্রাইভারটার বেশ কয়েকবছর জেল হয়ে যাবে শুনে জিজ্ঞেস করেছে, ফাঁসি হয় না শয়তানটার?
ওর ওই সহজ স্বাভাবিকতায় হিয়ার মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারা আমাকে আরও হিংস্র করে তুলছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যার ঔরসজাত আর যে আমার ঔরসজাত, দু'জনই কীভাবে আমার জীবনের প্রিয়তম দু'জনকে কেড়ে নিয়েছে। প্রথমজনকে এখন শাস্তি দেওয়া না দেওয়া সমান। কিন্তু দ্বিতীয়জনকে শাস্তি পেতেই হবে। তবে তার আগে আমারও চাই প্রমাণ। যদিও আমার মন আমাকে আমার মেয়ের 'খুনি' চিনিয়েই দিয়েছে। তবু...
সেই 'তবু'টাকে নিকেশ করার জন্যই আমি এখানে-ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাক দিতে শুরু করলাম কুটুসকে। ঝুমা ভাবত যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত আমি বোধহয় কুটুসকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছি। একটা সেতু চাইছি, বাপ আর ছেলের।
মধ্যে দু'দিন বাড়ি ফেরার পথে গড়িয়াহাটে নেমে চপল বোসের সন্ধান করেছি আমি। প্রথমদিন দেখতে পাইনি, পরদিন পেয়েছি। চট বিছিয়ে কয়েকটা খেলনা নিয়ে বসে আছে। দশ হাত দূরের একটা দোকানে চা খেতে খেতে জানলাম, লোকটা আসলে বড় একটা খেলনার দোকান থেকে কিছু খেলনা নিয়ে ফুটপাথে বসে থাকে। বিক্রি হলে, নিজের একটা পার্সেন্টেজ রেখে টাকাটা দোকানে দিয়ে দিতে হয় ওকে। সামনের ফুটপাথ দখল হয়ে ব্যবসা চৌপাট হয়ে যেতে বসায় আসল দোকানগুলো এখন নিজেদের মাল ফুটপাথ থেকে বিক্রি করিয়ে টিকে থাকতে চাইছে। আমি যেমন কুটুস নামের জেরক্স কপিটাকে সরিয়ে দিয়ে চপল বসু নামের অরিজিনালটাকেই মুছে দিতে চাইছি।
একসঙ্গে জগিং সেরে ফেরার পথে আমি ইচ্ছে করে একটু পিছিয়ে গেলাম একদিন। তারপর স্পিড নিয়ে এগিয়ে এসে সজোরে ধাক্কা মারলাম, কুটুসকে। ও ফুটপাথের ঘাস থেকে ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। কিন্তু কোনওদিক থেকে কোনও চাকা এগিয়ে আসছিল না তখন। কনুইটা কেটে গেছে, রক্ত ঝরছে, কুটুস দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল। "কে তোকে ধাক্কা মারবে? তুই কি হ্যালুসিনেশনে ভুগছিস নাকি? ধাক্কা কেন মারবে তোকে কেউ?"
কুটুস উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে তফাৎ রেখে চলতে লাগল। আমি দ্রুতপায়ে হেঁটে ওকে ধরে ফেললাম। তারপর রাস্তার কলের সামনে নিয়ে গিয়ে কনুইয়ের কাছটা ধুইয়ে দিলাম। পকেটে তুলোও রেখে ভেবে মুহূর্তের জন্য একটু বিষণ্ণ হলাম। তারপরই সব গ্লানি ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, "হিয়াও কি এরকম নিজে থেকেই পড়েছিল? নাকি কেউ ধাক্কা মেরেছিল ওকে?"
"বোনু তো গাড়ির ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। তার আগে আমা ধরেই হাঁটছিল।"
"তোর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল কেন? সেদিনের মতো কিছু করেছিলি? জাস্ট কিসিং অ্যান্ড আদার থিংস?"
"না। রাস্তায় ওসব করতে যাব কেন?"
"করতেই পারিস। নতুন কোনও অনলাইন গেম দেখে নতুন কিসিং, হাগিং শিখেছিস হয়তো।"
"ওরকম কিছুই হয়নি। বোনু আইসক্রিম খাবে বলে আমার ছাড়িয়ে ছুটে গিয়েছিল।"
"ওকে একটা আইসক্রিম তুই নিজেই কিনে দিসনি কেন?"
"তুমি সব ভুলে যাও। দু'মাস আগেই ও টনসিলের ব্যথায় সাফার করল না? আবার আইসক্রিম খেলে মরত তো!"
"সেই তো মরেই গেল। বাঁচল তো না।"
"ওই প্রচণ্ড স্পিডে আসা শয়তান গাড়িটা ধাক্কা মারল বলে
"তুই জানতিস যে, ওই গাড়িটাই ধাক্কা মারবে?"
"আমি কী করে জানব!"
"তাহলে ওই গাড়িটারই নাম্বার টুকে নিলি কী করে?"
"ধাক্কা মারার পর একটু স্লো-ডাউন করেছিল গাড়িটা।"
"আর তখন তুই হিয়ার কী হয়েছে না দেখে, গাড়ির নাম্বার ব্যস্ত হয়ে পড়লি?"
"আমি ওই ড্রাইভারটাকে পানিশ করতে চাইছিলাম।"
"কেন? কার জন্য? হিয়া তো তোর নিজের বোন নয়! কোথা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম আমি আর তোর মা..."
"স্টপ ইট! ও আমার নিজেরই বোন।" কুটুস চিৎকার করে আমার কোনও ভাবান্তর হল না।

২৩

ঘটনাটার কথা জানতে পেরে ঝুমা প্রবল অশান্তি শুরু করল কি কুটুসকে সন্দেহ করছ? তা নইলে ওকে ধাক্কা মেরেছ কে
"কেউ কুটুসকে ধাক্কা মারেনি ঝুমা। হিয়ার ব্যাপারটা যদি অ হয়, তাহলে এটাও অ্যাক্সিডেন্ট।"
"তোমাকে একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না। আবার সাইকিয়াট্রিস্টের যেতে হবে তোমায়।"
কুটুস যখন হিয়ার সঙ্গে ওইরকম করেছিল আর আমি প্রতি কুটুসকে চড়-থাপ্পড় মেরেছিলাম, তখন কোনও এক আশ্চর্য কারণে, কুটুসকে বাদ দিয়ে, ঝুমা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে।
ভদ্রমহিলা, আমার এবং ঝুমার মুখ থেকে আলাদা আলাদা করে এবং একসঙ্গে ঘটনাটার কথা শুনলেন। তারপর বললে "অ্যাডোলেসেন্সের সময়টায় মেয়েদের প্রতি ছেলেদের একট স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মাবেই।"
"তাই বলে নিজের বোনের প্রতি?" আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলা
"নিজের বোন যে নয়, তা তো আপনাদের ছেলে অনেক আ থেকেই জানে।" আমাকে শান্ত হতে বলে, ম্যাডাম উত্তর দি
"এখন কী করার তাহলে?" ঝুমা জিজ্ঞেস করেছিল।
"ওইদিনের ঘটনাটা ভুলিয়ে দিতে হবে। আর দু'জনকে আল রাখলে নিষিদ্ধর প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়বে। বরং দু'জনকে দিতে হবে, একে অন্যের সঙ্গে বেরতে এনকারেজ করতে হ ভদ্রমহিলার কথা মোটে ভাল লাগছিল না আমার। বললাম,

কী গ্যারান্টি?"

"এই দুনিয়ায়, কেউই কোনওকিছুর গ্যারান্টি দিতে পারে না। তবে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে লাভের বদলে ক্ষতিই হবে। বরং ওদের পাশাপাশি বসিয়ে চিরকালের ভাইবোনের গল্পগুলো শোনান, কাজে দেবে। সাত ভাই চম্পার গল্প কিংবা জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার গল্পগুলো বলুন। এমনকী ভাইবোনের প্রেক্ষিত থেকে একটা নেগেটিভ চরিত্রকেও পজ়িটিভ করে তুলুন। রাবণ যদি খারাপও হয় তবু সে তার বোন শূর্পণখার সঙ্গে ঘটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল, রামায়ণের ইন্টারপ্রিটেশন এইভাবে করুন। দেখবেন পাশাপাশি বসে শুনতে শুনতে দু'জনের মধ্যে একটা বন্ডিং তৈরি হচ্ছে।"

সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রমহিলা যে অদক্ষ তা নয়, কিন্তু উনি যেভাবে কুটুস আর হিয়াকে একই দাঁড়িপাল্লার দু'দিকে বসিয়ে সমান ট্রিটমেন্ট দিচ্ছিলেন, সেটা হাস্যকর মনে হচ্ছিল আমার। কুটুস যদি দেড় কিলো হয়, হিয়া তবে চারশো গ্রাম; যেকোনও সিচুয়েশনে প্রথমজন অ্যাকটিভ হলে দ্বিতীয়জন প্যাসিভ হতে বাধ্য। ওরা কি একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছয় নাকি? দু'জন কাছাকাছি থাকলে কুটুস যা করে হিয়া তাই মেনে নেয়।

এইসব বলেছিলাম তখন। ঝুমাকে। এখন শুধু চরম অবজ্ঞায় মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, "অনেক তো হল নৌটংকি, এবার ক্ষমা দাও।"

ঝুমা ক্ষমা দিল না, আমি সাইকিয়াট্রিস্ট ম্যাডামের কাছে আবারও যেতে একপ্রকার বাধ্যই হলাম। উনি বললেন, "খুঁড়ে কোনও লাভ হয় না। শুধু সাপ বেরিয়ে আসে কেঁচোর গর্ত থেকে।"

"কিন্তু কেউটে যদি সত্যিই থেকে থাকে কেঁচোর বদলে, তাহলে একই গর্তে তাকে নিয়ে থাকাও তো মুশকিল।" রাতে বিছানায় শুয়ে বললাম।

ঝুমা একদৃষ্টে আমার দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি কি কুটুসের কোনও ক্ষতি করবে নাকি?"

আমি কোনও উত্তর না দিয়ে ঝুমাকে জড়িয়ে ধরে অনেকগুলো চুমু খেলাম। চুমু খেতে খেতে ওকে পেড়ে ফেললাম বিছানায়। তারপর এমনভাবে পিষতে লাগলাম যেন খাজুরাহোর সেই পাথরের মূর্তিগুলো পরস্পরকে আলিঙ্গনের ভিতরেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ঝুমার ব্যথা লাগছিল। ঝুমা হাঁসফাঁস করছিল। যৌবন পেরিয়ে আসা ঝুমা যেন সেই বৃষ্টিহীন চৈত্রের জমি, যেখানে অজস্র কর্ষণেও বীজ পোঁতা যাবে না। সেটাই ভাল। আর ভাল বলে, ঠিক যেমন পাথরে মাথা ঠোকে লোক, আমি ঝুমা-তে নিজেকে ঠুকতে লাগলাম। মিনিটের পর মিনিট। তারপর নিঃশেষ হয়ে পড়ে রইলাম মরা সাপের মতো।

অনেকদিন পর প্রবল শরীর হওয়ায় নিস্তেজ ঝুমা একসময় বলে উঠল, "কুটুসের কোনও ক্ষতি করার আগে আমায় জানিও, আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরে যাব।"

"ঘুমের ওষুধ ফুলপ্রুফ নয় ঝুমা। সাতদিন ঘুমিয়ে থেকে আবার জেগে ওঠে লোক। তুমি গলায় দড়ি দিতে পারবে না?"

"ইয়ার্কি কোরো না গো। ভয় লাগে। এখন তো একটাই বাচ্চা আমাদের। তাই আরও বেশি ভয় লাগে।"

"তোমার কাছে তো চিরকালই একটা বাচ্চা ঝুমা।"

"না, না, না। আমি হিয়াকেও ভালবেসেছি। মেয়ে মনে করেই বেসেছি।" ঝুমা কেঁদে উঠল।

আমি আমার বুকের ব্যথাটা আরও একবার টের পেয়ে চুপ করে যেতে যেতে বললাম, "কুটুস কার কাছ থেকে জানল হিয়া ওর নিজের বোন নয়? তুমি-আমি তো বলিনি।"

"এসব কথা চাপা থাকে না। যাদের জানার ঠিক জেনে যায়।" ঝুমা বলল।

২৪

ঝুমা যখন কাঁদছিল তখন ওকে শান্ত করার জন্য বলেছিলাম,
এই জীবনে নিজের ছাড়া আর কারও ক্ষতি করিনি এখনও প
ঝুমা কথাটা শুনেছিল, কথার ভিতরের 'এখনও পর্যন্ত'টা
খেয়াল করেনি।
তবে পরে যাই হোক, 'এখনও পর্যন্ত' কথাটা মিথ্যে বলিনি ত
অফিসে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার পর, ইসিজি, ইকো, অ্যাঞ্জি
সবই হল। খানিকটা ব্লকও ধরা পড়ল। স্বাভাবিকই। পৃথিবীতে
নির্মমদের তো কোনও অসুখ হয় না। অসুখ আসলে, 'অনুভ
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। জিনের ভিতরেই হয়তো তার রূপরেখা লেখ
যে যত সেনসিটিভ, সে তত বেশি অসুস্থ। সোজা হিসেব।
ঝুমা একদিন টাকার খোঁজে আমার নিজস্ব কাবার্ড হাতড়াতে
পরীক্ষার রিপোর্টগুলো পেয়ে গেল। রাতে আমি ফিরতে আম
সামনে এক এক করে ওগুলো মাটিতে ছুড়ে ফেলে জানতে চ
"ব্যাপারটা কী?"
আমি হেসে উত্তর দিলাম, "প্রেমপত্র খুঁজে পেলে বেশি খুশি
ঝুমা কেঁদে উঠল, "আমি তোমাকে হারাতে চাই না।"
"আমি তো কাউকেই হারাতে চাইনি।"
"এত ধকল কীভাবে নেবে এখন? শরীরের এই অবস্থায়?"
"নেব না। শোরুম, গ্যারেজ সব বিক্রি করে দেব। যে-টাকাটা
যাবে, ফিক্সড করে রাখলে যেটুকু সুদ মিলবে তাতেই চলে যা
কষ্টেসৃষ্টে। আর না চললে, এই বাড়িটা বেচে একটা ফ্ল্যাটে চ
যেরকম ফ্ল্যাটে ছিলাম।"
"এত কষ্টে দাঁড় করানো বিজনেস এরকম দুম করে ছেড়ে দেব
এক মুহূর্ত আগেই আমার শরীর নিয়ে প্রবল চিন্তিত ঝুমা, অ
সিদ্ধান্তের কথা শুনে খুশি হয়নি বোঝাই গেল।
"গাড়ির চাকা আমার হিয়ার মাথাটা থেঁতলে দিয়ে গেছে, ধ্ব
দিয়ে গেছে আমার সামনের দিকে তাকাবার কারণগুলো। আ
আবার একটা স্টেশনারি দোকান দিতে পারি; দাঁড়িপাল্লায় ও
করতে পারি, লাভ-ক্ষতি, আনন্দ-বেদনা, স্মৃতি-বিস্মৃতি, মুসু
বা পোস্ত কিন্তু আমি কীভাবে আর চাকার গুণাগুণ বুঝিয়ে,
বলো তো?" কান্না শুরু হল আমার। নিঃশব্দে।
ঝুমা সেই কান্নার বিন্দুমাত্র আভাস পেল না। জিজ্ঞেস করল,
নাগাদ বিক্রি করবে কিছু ঠিক করলে?"
"সামনের শুক্রবার। হিয়ার জন্মদিনের দিন।"
আমি ঝুমার দিকে না তাকিয়ে বললাম।
ঝুমা আমার দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

২৫

সেদিন সেই হৃৎপিণ্ড কুরে কুরে খাওয়া যন্ত্রণাকে সাময়িকভা
ঠেলে দিয়েছিল সেই তীব্র সঙ্গম। আমি তার ভিতরেই ঝুমাকে
দিয়েছিলাম, "শতভিষার সঙ্গে আমার কী হয়েছিল, কতটা হ
কোথায়, কীভাবে হয়েছিল। নিজের ঘাড়ে দোষ চাপাইনি, নি
আড়ালও করিনি।"
ঝুমা, কুটুসের ব্যাপারে আমায় অবিশ্বাস করতে শুরু করলেও
ঘটনাটার কথা শুনে মেজাজ বা বিশ্বাস দুটোর কোনওটাই হা
দু-তিনদিন পর সকালের চা খেতে খেতে আমি বললাম, "তু
রিঅ্যাক্ট করলে না তো শতভিষার ঘটনাটা শুনে?"
"রিঅ্যাক্ট করার মতো কিছু নয়।" ঝুমা বলল।
আমি অনেকটা ভাললাগা নিয়ে তাকালাম ঝুমার দিকে।

যায়। আমার যেমন বিট্টুর সঙ্গে হয়েছিল।"

"কী হয়েছিল?" আমি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"তখনও তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি। পুজোর ভিতরে একদিন, সপ্তমী না অষ্টমী ঠিক মনে নেই, বিট্টু আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে চাইল। ছেলেটার মামাবাড়ি ছিল আমাদের পাড়ায়, মাঝেমাঝে আসত; আমি জানতাম যে, রিংকির সঙ্গে ওর ইন্টুবিন্টু হয়েছিল, ওরা নাকি কোন ঝোপের ধারে ধরাও পড়েছিল পাড়ার দাদাদের হাতে, কিন্তু এসব জেনেও নিজেকে রেজিস্ট করতে পারিনি সেদিন।"

"কেন?" তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"কারণ প্রতিবার পুজোয় আমার বান্ধবীদের সবার প্রেমিক জুটত, কেবলমাত্র আমার ছাড়া। হয়তো সেই প্রেমগুলোর প্রায় সবকটারই ভ্যালিডিটি ওই পুজোর ক'দিন, কিন্তু সেবছর আমার মনে হচ্ছিল, আমি খুব কুচ্ছিত আর ওরা দারুণ সুন্দরী, তা তো নয়। তাহলে সবাই অফার পেলেও আমি পাই না কেন!

"গেলে সিনেমায়?"

"গেলাম।"

"সিনেমা দেখলে?"

"যতটা পারলাম। বিট্টু উত্যক্ত করছিল, কিস করার চেষ্টা করছিল, বুকে হাত দিচ্ছিল, ছেলেরা যেরকম করে আর কী।"

"জেনারালাইজ় কোরো না। আমি ওরকম করেছি কোনওদিন যখন বেরতাম বিয়ের আগে?"

"তুমি তো ভদ্রলোক। নো ডাউট। কিন্তু আমার মন যে সেদিন একটা লুম্পেনের সঙ্গে হলেও একটু বেরোতে চেয়েছিল, সবাইকে দেখাতে চেয়েছিল 'দেখ, আমারও আছে', সেটা ভেবে অবাক হয়ে যাই মাঝেমাঝে।"

"বিট্টু কি শুধু চেষ্টাই করেছিল?"

"না। দু-তিনটে চুমু তো খেয়েছিলই। যতদূর মনে পড়ে। তবে আমি ঠোঁট চেপে বন্ধ করে রেখেছিলাম। সব ওপর ওপর।"

"সেই ছেলেটা কোথায় এখন?"

"জানি না। ভ্যানিশ করে গেল একদম। ভারতের কোথাও কোনও কল-কারখানায় কাজ করে হয়তো। পেটে বিদ্যে তো ছিল না মৃন্ময়দার মতো।"

"মৃন্ময় সেন? তোমার দাদার শালা?"

"জ্যাঠতুতো শালা। নিজের দাদা হলে তো বউদি ঢাক বাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বলতে বেরোত, ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার ওর মায়ের পেটের দাদা।"

"কুটুস হওয়ার পর মৃন্ময়দা তো একবার আমাদের গড়ফার ফ্ল্যাটেও এসেছিলেন, স্ত্রীকে নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ ওই ভদ্রলোকের কথা তুললে কেন?"

"মৃন্ময়দা যখন একটা চুমু খেতে চেয়েছিল আমায়, আমি ঠোঁট বন্ধ করে রাখতে পারিনি গো। তিরিশ সেকেন্ড আমার মাথাটা ব্ল্যাংক হয়ে গিয়েছিল। হয়তো অতটাও নয়, কুড়ি সেকেন্ড। কিন্তু হয়েছিল।"

"মৃন্ময়দা? চুমু? তোমায়?"

"শকড্ হোয়ো না। মৃন্ময়দার ওয়াইফও গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল, দুটো বাসের রেষারেষির মধ্যে পড়ে তিন-চার টুকরো হয়ে গিয়েছিল একদম, তোমার খেয়াল নেই হয়তো। তখন একদিন বউদির সঙ্গে আমিও ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসব, কথা হয়েছিল। কিন্তু আমি ওঁর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন বউদি ফোন করে বলে যে, ছেলের আন্ত্রিক হয়েছে, ও আসতে পারবে না।"

"তুমি একাই চলে গেলে তখন? আর তোমাকে পেয়েই..."

"অতটা জলমাখা ছাতুর মতো সহজসরল নয় ব্যাপারটা। অতটা রাস্তা চলে এসেছিলাম বলে আমি ফিরে না এসে গেলাম তো বটেই, কিন্তু দেখলাম মৃন্ময়দার হাতে ধরা চায়ের কাপটা কাঁপছে।"

"না, নাটক নয়। পুরো অস্তিত্বটাই কাঁপছিল লোকটার, কেবল
বলছিল যে, চোখ বন্ধ করলেই ওই পরস্পরকে টপকে যাও
ছুটতে থাকা দু'টো বাস আর ছন্দা বউদির ছিন্নভিন্ন দেহটা চো
সামনে ভেসে উঠছে। আমি প্রায় একঘণ্টা কথা বলেছিলাম
সঙ্গে। বেরিয়ে আসার আগে কাছে গিয়ে ওঁর হাত দুটো ধরে
দুটো মেয়ে আপনার। তাদের কাছে এখন আপনিই বাবা, আ
মা। আপনাকে স্ট্রং থাকতেই হবে।"

"তখনই জাপটে ধরল তোমায়?"

"না ধরেনি। মৃন্ময়দা, সিনেমার প্রেম চোপড়া কিংবা শক্তি ক
হাতটাও ধরে থাকেনি। কেবল একটা কথা বলেছিল।"

"কী কথা?"

"বলেছিল, 'আমার চোখে শুধু ছন্দার শরীরের টুকরোগুলো
কোনও সতীপীঠ নেই। তুমিও তো নারী। আমায় একবার, এ
মুহূর্তের জন্য জীবনে ফিরবার মতো একটা সতীপীঠ দিতে প
কথাটার সামনে আমার সব প্রতিরোধ ধসে গিয়েছিল। আমি
আটকাতে পারিনি। ক্ষমা কোরো।"

"শুধু চুমুই হয়েছিল?"

"আমি কিন্তু তোমায় এই প্রশ্নটা করিনি, শতভিষার কাহিনি
কিন্তু তুমি করতেই পারো। আমি তো চাকরি করি না।"

"চাকরি না করলেও, এই বাড়িটা তোমার নামে। তুমিই আম
তাড়িয়ে দিত পারো চাইলে।"

"মন থেকে তাড়াতে পারব? মরে গেলেও?" ঝুমা কেঁদে ফে
কান্নাটা একদম জেনুইন।

অনেকটা রাগ ভিতরে নিয়েও, আমি বুঝতে পারলাম।

২৬

ব্যবসাটা বিক্রি করছিলাম দুই বন্ধুকে। সুমিত শ্রীবাস্তব আর
লাহা। একই স্কুলে, একবছর উপরে-নীচে পড়াশোনা করেছে
দারুণ বন্ডিং ওদের মধ্যে। সাক্সেনা-বোস থেকে শ্রীবাস্তব-ল
সমীকরণ একই রইল ভেবে হেসে ফেলেছিলাম মনে মনে।
চাইলে সবই নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু আমার ইচ্ছে করছিল
গিয়ে কিনে আনা ছোট-বড় কিউরিওগুলো অফিসেই থাক।
প্রতিষ্ঠান নিজের হাতেই গড়ে তুলেছি, সেখানে আমার কোন
থাকবে না?

অতনু আর সুমিত অবশ্য খুশিই হয়েছিল আমার প্রস্তাবে।
চাইলে আমি হিয়ার ছবিটাও রেখে যেতে পারি, চেম্বারে। ওট
ওভাবেই থাকবে।

"না। ওটা আমি নিয়ে যাব।" বলেই ভাবলাম, কোন বাড়িতে
যাব ওটা? যেখানে কুটুস থাকে?

সুমিতরা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে
আমি। বান্ধবগড়ের সাফারি লজে তোলা ছবিটা। খয়েরি এক
পুলওভার পরা হিয়াকে অপূর্ব লাগছে এই ছবিটায়।

মনে আছে, ওই বান্ধবগড়েই বাঘের পায়ের ছাপওয়ালা মাটি
করে তুলে এনেছিল হিয়া। সেই মাটিটা বহুদিন যত্নে রাখা ছি
বাড়িতে। এখন কোথায়? খোঁজ রাখার কথা মনেও নেই আ
হারিয়ে গেছে?

পরক্ষণেই মনে হল, আমার হৃদয়টাই তো সেই মাটি, নখ দি
যেটাকে ফালাফালা করতে করতে বাঘ এগিয়ে গিয়েছে।

কে জানে কোথায়?

পুরো ক্লিন স্লেটেই ব্যবসা হস্তান্তর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এত
চারদিকে যে, কথাটা ভাবা সহজ হলেও করা কঠিন। তাও য
পারি ক্লিয়ার করে যাই ভেবে ডোমজুড়ের আগে যে-বড় সা



ইউনিট আছে কোম্পানির, সেখানে গিয়েছিলাম।

কাজটা সম্পূর্ণ হতে একঘণ্টাও লাগেনি কিন্তু ফিরতি পথে আটকে গেলাম দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কাছাকাছি এসে। অসহ্য এবং অকারণ একটা জ্যাম। অসহ্য কারণ একটা গাড়ি এগোচ্ছে না, অকারণ কারণ প্রতিটা লরি থেকে তোলা আদায়ের প্রক্রিয়া চলছিল বলে জ্যাম দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল।

এক-একবার মনে হচ্ছিল ভালই হয়েছে। বাড়ি ফিরে কারও জন্মদিনের কেক তো আর কাটতে হবে না। পরক্ষণেই আগের বছর এই দিনটার কথা মনে পড়ছিল। আচ্ছা সেদিন যদি চপল বসুর ভাগ্যে কিছু খাবার জুটত তাহলে কি হিয়া বেঁচে যেত? নিজের বাচ্চা মেয়ের মৃত্যুর জন্য যে দায়ী, তার আশীর্বাদে আর একটা ছোট মেয়ে বাঁচত? নাকি আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মৃত্যুর জন্য দায়ী? আমি ঝুমার, ঝুমা আমার, আমরা সবাই হিয়ার? প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছি জেনে বা না-জেনে।

ক'দিন আগেই যেমন হিয়ার জন্মদিন এগিয়ে আসছে বলে আমার ছটফটানি বাড়তে দেখে ঝুমা বলেছিল, "এটা তো আর হিয়ার আসল জন্মদিন নয়। আমরা ওর এই জন্মদিনের তারিখটা ঠিক করেছিলাম। তোমার মনে নেই?"

আমি একগাল হেসে ঝুমাকে বলেছিলাম, "আমি এত ভুলো হয়েছি যে, সব ভুলে যাই। ভাগ্যিস তুমি মনে করিয়ে দিলে। একটা অরফ্যানেজ থেকে আনা মেয়ের আবার জন্মদিন কী? যার জন্মের ঠিক নেই, তার জন্মদিন হয়?"

ঝুমা মুখে হাত চাপা দিয়ে ছিটকে সরে গিয়েছিল।

শরীর বেজুত হওয়ায় একজন ড্রাইভারকে রাখতে হয়েছিল। সেই ড্রাইভারের নাম সুবচন হলেও সে কথা খুবই কম বলত।

আজ বলল, "প্রত্যেকটা লরি জানে পুলিশ এমনিতেও টাকা নেবে, ওমনিতেও। তাই প্রত্যেকেই ওভারলোডেড হয়েই আসে।"

"ভালই করে। ঘুষ যখন দেবেই, তখন আইন ভাঙার সুবিধাটাও নিয়ে নিক যতটা পারে।

সুবচন আবার চুপ করে গেল। দাঁড়িয়ে রইল গাড়ি। আর একটা ওভারলোডেড পৃথিবীতে ফেঁসে রইল অসংখ্য মানুষ যারা প্রেম, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বপ্ন, উচ্চাশা, অসুখে, লোডেড। ওভার

২৭

বাড়িতে ঢোকার মুখেই দেখলাম, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়ে
"কুটুস সেই কোন বিকেলে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি।" কু
মা বলল।

আমার মাথায় প্রথম যে-জবাবটা এল তা হচ্ছে, 'হিয়ার মৃত্যু
সেলিব্রেট করতে গেছে হয়তো', কিন্তু আমি সেটা গিলে ফে
ব্যক্তিগত মনখারাপ যত বেশিই হোক, মায়ের উদ্বেগকে ব্যঙ্গ
নীচতা। আমি দু-একবার করে ফেলেছি, আর করতে চাই না

"তুমি কি একটু দেখবে? ওর মোবাইলটাও বন্ধ আসলে..."

"তুমি টেনশন না করে ঘরে যাও। আমি দেখছি।" বলে সুবচ
ছেড়ে দিয়ে নিজেই বেরোলাম গাড়ি নিয়ে। একবার বাথরুমে
দরকার ছিল কিন্তু থাক...

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আর অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়েও কো
হদিশ না পেয়ে যখন পুলিশের কাছে যাব ভাবছি, তখনই এ
দেখানো রাস্তায় এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা প্যান্ডেল। উপ
থার্মোকল কেটে বড় করে লেখা, 'নয়নতারা ব্লাড ডোনেশন

"রক্ত দিয়েছে কম সে কম দু'শো লোক। আড়াইশোর উপরে
লোক খেয়েছে, আরও অনেকে প্যাকেট নিয়ে গিয়েছে, একদ
এলাহি কাণ্ড স্যার। সব আপনার ছেলের জন্য সম্ভব হল।" এ
মাঝবয়সী লোক এগিয়ে এসে বলল।

'আপনার ছেলের জন্য' কথাটা আমার কানে বাজছিল। আর
চোখ যেন বিশ্বরূপ দর্শন করছিল। মঞ্চের উপরে চেয়ারে হিয়
সেই গোলাপি ফ্রক পরা ছবিটা। উটির কফি-বাগানে তোলা।
চোখ ফেটে জল নামছিল, দেখেই। আচ্ছা, স্মৃতিরও কি কোন
থাকে? মসলা কফির মতো?

"তুই এতসব করবার কথা ভাবলি কবে?" কুটুসকে নিয়ে ফে
পথে আমি জানতে চাইলাম। তার আগে নিশ্চিন্ত করার জন্য
করে দিয়েছি ঝুমাকে।

দিয়েছে আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম। তাই ভেবেছিলাম এমন একটা কিছু করি যাতে অনেকের বডিতে ব্লাড যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়। এই এনজিও-টা খুব ভাল। ওরাই দায়িত্ব নিয়ে সব করেছে। লোকাল কয়েকজন ছেলেও খুব হেল্প করেছে। কেউ খারাপ নয়, জানো তো বাবা, আলটিমেটলি কেউই খারাপ নয়।"

সেই ছোটবেলায় জোর করে 'বাবা' ডাকতে শিখিয়েছিলাম আমি। বলেছিলাম, কিছুতেই 'ড্যাডি' নয়, 'বাবা' বলবে। আজ সেই ডাকটাই আমার হৃদয়ের ভিতরকার সব অভাব, রক্ত দিয়ে পূর্ণ করে দিচ্ছিল। আর কোনও অসুখ ফিল করছিলাম না আমি। কেন করব? পৃথিবীতে কেউই তো আলটিমেটলি খারাপ নয়।

যে-ছেলেটা ক্লাস ইলেভেনে ভর্তি হওয়ার সময় আমি যাইনি একদিনও, তাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে কোথাও একটু আটকাচ্ছিল। তাও জানতে চাইলাম, "তুই টাকা পেলি কোথায়?

মা দিয়েছিল?"

"মা জানে না তো।"

"তাহলে!"

"আমার পকেটমানি থেকে বাঁচাই তো আমি।"

"শুধু তাই দিয়েই?"

"হাতের ব্রেসলেটটা বিক্রি করে দিয়েছি।"

"কী বলছিস?"

"কী হবে বাবা গোল্ড দিয়ে? হিয়া ছিল আমাদের ফ্যামিলির সত্যিকার গোল্ড। থাকল? কেন আমি বাঁচাতে পারলাম না বলো তো ওকে? কানে তার ছিল, আমি শুনতে পাইনি জাস্ট একটু আগেই ও কী বলেছে, কিন্তু গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে ওর ওই চিৎকারটা... আমি ভুলতে পারব না কোনওদিন। বোনু আমাদের ছেড়ে কেন চলে গেল বাবা? কেন?" একটা কান্নার টর্নেডোকে ভিতর থেকে বাইরে বের করে দিতে দিতে নিজের মাথাটা ড্যাশবোর্ডে জোরে জোরে ঠুকতে থাকল কুটুস।

আমি ওকে থামালাম না। টেনে ধরলাম না। কাঁদুক। ঔরসের ধর্ম ছাপিয়ে ভালবাসা, অনাত্মীয়তা মুছে দিয়ে আত্মীয়তার ধর্ম জেগে উঠুক পৃথিবীতে। আর যতক্ষণ না জাগছে জমে থাকা লাভা কান্না হয়ে গলুক। ভাবতে ভাবতে আমিও কখন যেন কাঁদতে শুরু করলাম কুটুসের মতোই।

একটা তারার জন্য। যে-তারাটা আর নেই।

২৮

সেদিন রাতে আর ঝুমাকে কিছু বলার মতো শক্তি ছিল না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে বললাম সবটা। শুনতে শুনতে ঝুমা কাঁদল, হাসল, আবার কাঁদল। পৃথিবীতে কান্না এত বেশি যে, সুখের মুহূর্তেও চলেই আসে। এড়ানো যায় না।

কোথাও বেরোইনি সারাদিন। অন্যের জিম্মায় চলে যাওয়া অফিস থেকে হিয়ার যে-ছবিটা নিয়ে এসেছিলাম, সেটাই বাপ-ব্যাটা মিলে লাগালাম একতলার হলঘরটায়। যাতে বাড়ির ভিতর ঢুকলেই চোখে পড়ে।

"থাক বেটি। আসল স্বর্গ আছে না নেই জানি না, এই কাচের স্বর্গে থাক।" ছবি টাঙানো শেষ হলে বললাম।

দুপুরে মাংস ভাত খাওয়া হল জমিয়ে।

"রেড মিট খাচ্ছ, ক্ষতি হবে না তো?"

"হিয়ার বিলেটেড জন্মদিনটা সেলিব্রেট না করলে আরও বেশি ক্ষতি হবে। রাতে চাইনিজ খাব। হিয়া ভালবাসত না?"

"এবার হিয়াই তোমায় স্বপ্নে এসে বকে দিয়ে যাবে। মিলিয়ে নিও।"

কান্না তো আছেই। কতদিন পর একটু হাসির শব্দও শোনা গে
বাড়িটায়।

দুপুরে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম কী একটা নতুন ব্যবসা করছি। স
ব্যবসা এল, হিয়া আসবে না?

কাল রাতেই ঠিক করে রেখেছিলাম; কিন্তু কাউকে বলিনি।
যখন কুটুসকে নিয়ে বেরোচ্ছি, ঝুমা টেরিয়ে তাকাল।

"কমল মিত্র আর উত্তমকুমার কোথায় যাচ্ছেন, একসঙ্গে?"

ঝুমার প্রশ্নের উত্তরে আমি চোখ নাচিয়ে বললাম, "আমাদে
আরও বেশি ইন্টারেস্টিং। নেহাত সাধারণ লোকজনদের লাই
নিয়ে সিনেমা তৈরি করতে চায় না কেউ।"

লোকটা যেখানে বসে তার একটু দূরেই একটা সিনেমা হল
হয়ে গিয়েছে এখন।

কিন্তু হল বন্ধ হলেও যেহেতু ছায়া আর ছবি দুটোই থাকে, বি
একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আমি কুটুসকে এগিয়ে দিলাম, লোকটা
একটা খেলনা কিনতে।

তার আগে একটা শপিং মলের ফুড-কোর্টে বসে আমি কুটুস
লোকটার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলেছি। না, একেবারে
বাস্তবটাই বলিনি। বাস্তবটাকে সিনেমা করে বলেছি।

আর তারপর সিনেমার ক্লাইম্যাক্সটাকে বাস্তবে বসিয়ে জানতে
চেয়েছি, এমন হলে কেমন হয় রে কুটুস?

কুটুস নিজের হাতের সঙ্গে আমার হাত মিলিয়ে, 'হাই ফাইভ
জবাব দিয়েছে, গ্রেট!

কিন্তু এখন কুটুস ধ্যাড়াচ্ছে। খেলনা দর করছে। ওরে বাচ্চা,
হাতের মুঠোয় নেওয়ার জন্য, দরাদরির জন্য নয়।

বোধহয় কুটুস একটু নার্ভাস। স্বাভাবিক।

বোধহয় আমার এগিয়ে যাওয়াই উচিত এখন।

"কুটুস তুই যে-মার্কার পেনটা খুঁজছিলি, সেটা ওই বাঁদিকের
দোকানটায় আছে।"

কুটুস সরে যেতেই লোকটা হতাশ গলায় বলল, "নিলেন না
আমি কম করেই দিতাম।"

"একত্রিশ বছর আগে যে ছেলেটা তোমার মাথায় টর্চের বাড়ি
মেরেছিল, তুমি তার নামও কি কম করে পুলিশে দিয়েছিলে
পুলিশ ধরল না কেন তাকে? নাকি দাওইনি?"

লোকটা চমকে উঠল, "কে বলছেন আপনি?"

"আমি একটা ছেলে বলছি, যার মা এখন আকাশে; আর ম
আকাশে, সে কি বাবাকে ফুটপাথে বসে থাকতে দিতে পারে

"কিন্তু আমার জন্যই তো তোদের..."

"সাপের বিষ থেকেও ওষুধ হয়। রাগ থেকে ভালবাসা জন্মা
রাগ তো একা তোমারই ছিল না?"

"তোর মা আর সত্যিই নেই?"

"তুমি তো আছ।" বলতে বলতে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিলা
লোকটাকে।

"আস্তে, বুতান আস্তে।" লোকটা বলে উঠল।

আমার বুকটা মোচড় দিতে শুরু করল। এই নামটা ধরে শুধু
ডাকত আমায়। আজ প্রায় বত্রিশ বছর পর নামটা শুনলাম।
নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "ওই ছেলেটা তোমার নাতি
অনেকদিন তো হয়ে গেল, এখন বাড়ি চলো।"

বাবা আমার কনুইয়ের কাছটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ওই
হয়ে আসা চোখে আমার দিকে তাকাল।

মানুষ যেভাবে আয়নার দিকে তাকায়।

অলংকরণ: সৌমেন দাস


সানন্দা
রান্নাঘর ৩

শাক দিয়ে মাছ...

ঢাকা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা না-ই বা করলেন! উৎসবের প্রীতিভোজে পাতে দুই-ই থাকলে মন্দ কী? স্বাদের সঙ্গে কোনও আপস করতে হবে না, কথা দিলাম। শাক আর মাছের চিরন্তন রসায়নে শারদীয়ার স্বর্গীয় রসনাবিলাসের আয়োজন করলেন শহরের কিছু পাঁচতারা ও রেস্তরাঁর বিখ্যাত তিন শেফ। রেসিপি সংকলনে সায়নী দাশশর্মা।

শিরোনাম পড়ে একটু কি নাক সিঁটকোলেন? পুজোর খাওয়াদাওয়া বলে কথা। আর পাতে কি না কোরমা, কালিয়ার পরিবর্তে মাছের সঙ্গত দেবে শাক? পুজোর ক'দিন অষ্টপ্রহর কবজি ডুবিয়ে কালিয়া-কোফতা আত্মসাৎ করার স্বপ্নে দিন গোনে যে বাঙালি, তাদের প্রতি এ সত্যিই অন্যায়! আসলে সমস্যাটা শাক নিয়ে নয়, শাক বললেই যে চিত্রটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা নিয়ে। কোথায় তেল-মশলার প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাওয়া মাছের চিকনরূপ আর কোথায় শাকের নির্লিপ্ত, উদাসীন চেহারা। দুয়ে কখনও মিশ খায়! কে বলেছে খায় না? আপত্তিটা তো এখানেই। শাক মানেই যে মিয়ানো, পথ্যসম এক পদ, এমনটা ভাবছেনই বা কেন? শাক তো উপকরণ মাত্র, তাকে যে রূপ দেবেন, তাই সে সানন্দে গ্রহণ করবে। সবটাই নির্ভর করে রন্ধনকৌশলের উপর। পাতুরির কথাই ধরুন, কিংবা ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক। মাছের সঙ্গে শাকের রসালো রসায়নের এর চেয়ে ভাল উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না। সেক্ষেত্রে স্বাদের সঙ্গে আপস করার প্রসঙ্গ আসে কি? তাছাড়া বাঙালির প্রাণের উৎসবে তাদের রসনাবিলাসের সাধে এতটুকুও অপূর্ণতা থাক, তা-ও কোনওভাবেই কাম্য নয়। শারদীয়ার প্রাক্কালে তাই চেনা-অচেনা নানা পদে শাক-মাছের সেই চিরন্তন সম্পর্কই নবরূপে উপস্থিত করলেন শহরের তিন শেফ। এবার না হয় একটু ভিন্ন স্বাদেই তৃপ্ত হল রসনার বাসনা, মন্দ কী!

কলমি শাকে ভেটকি রোল

উপকরণ: কলমি শাক ১০০ গ্রাম, ভেটকির ফিলে ৪টে (আন্দাজ ৫০ গ্রাম ওজনের এক-একটি), রসুনকুচি ২ চা-চামচ, আদাকুচি ৩ চা-চামচ, আদা-রসুনবাটা ২ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা ২ চা-চামচ, সরষেবাটা ২ চা-চামচ, সরষের তেল ৩ চা-চামচ, সাদা তেল ২ চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোটা জিরে $^1/_2$ চা-চামচ, গোটা লাল লঙ্কা ২টো, পেঁয়াজকুচি ৪ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নারকেলবাটা ২৫০ গ্রাম, নারকেলের দুধ ১০০ মিলি, পাতিলেবুর রস ২ চা-চামচ, নুন স্বাদ অনুযায়ী।

প্রণালী: পুরু কড়াইতে খানিকটা সরষের তেল গরম করে জিরে ফোড়ন দিন। অর্ধেক রসুনকুচি, আদাকুচি এবং পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভাজুন। গোটা লাল লঙ্কা দিয়ে



কলমি শাকে ভেটকি রোল



পুর ভরা মাছের কোফ



কই পাতুরি



লাউ পাতায় ভাপা ভেটকি

সরষে, পোস্ত কিংবা মশলার সঙ্গে
যেমন ভাব, তেমনই শাকের সঙ্গে
রসায়ন চিরন্তন। শাকের আদরযত
মাছের প্রেমে বাঙালি আজন্ম মুগ্ধ

বাদামি হওয় অবধি নাড়াচাড়া করুন। এবার এতে কুচোনো কলমি শাক দিয়ে স্বাদমতো নুন মেশান। নারকেলবাটা এবং সরষেবাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে রাখুন। শাক নরম হলে এবং জল শুকিয়ে গেলে নামিয়ে রাখুন। ভেটকির ফিলে অল্প নুন, গোলমরিচগুঁড়ো এবং পাতিলেবুর রস দিয়ে একঘণ্টা মেখে রাখুন। ঘরের তাপমাত্রায় রাখবেন। একটি করে মাছের ফিলে নিয়ে কোনও ভারী জিনিস দিয়ে থুরে নিন। শাকের মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট বল গড়ে ফিলের উপর রেখে আটোসাঁটো করে রোল করে নিন। তেরচা করে কেটে ১৫ মিনিট রোলগুলো ভাপিয়ে নিন। কড়াইতে সাদা তেল গরম করে আদা, রসুন, পেঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কাবাটা দিন। একে একে জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, গরমমশলাগুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন মেশান। নারকেলের দুধ ঢেলে ঢাকনা বন্ধ করে রাখুন। মিশ্রণ ফুটলে মাছের রোলগুলো দিয়ে ৫-৭ মিনিট ঢিমে আঁচে রেখে পরিবেশন করুন।

পুর ভরা মাছের কোফতা

উপকরণ: কোফতার জন্য: লাল শাক ২০০ গ্রাম, মাছের কিমা
১৫০ গ্রাম, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, আদাকুচি ১ ১/২
আদা-রসুনবাটা ১ চা-চামচ, গোটা লাল লঙ্কা ২টো,
২৫০ গ্রাম, নুন স্বাদ অনুযায়ী, সরষের তেল ৫০ মি
৩ চা-চামচ, হিং ১ চিমটে, কাঁচালঙ্কাবাটা ১/২ চা-চ
১ চা-চামচ। **গ্রেভির জন্য:** পেঁয়াজ ১টা, টোম্যাটো
রসুন কোয়া ৩-৪টে, আদা ১ ইঞ্চি, কাঁচালঙ্কা ১টা,
টেবলচামচ, গোটা জিরে ২ টেবলচামচ, তেজপাতা
২-৩টে, এলাচ ২-৩টে, দারচিনি ১ ইঞ্চি, জয়িত্রীগুঁ
চা-চামচ, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো
চামচ, জিরেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো
ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, সরষের তেল

প্রণালী: কড়াইতে সরষের তেল গরম করে হিং ফোড়
রসুনকুচি, গোটা লাল লঙ্কা দিয়ে ভাজুন। কেটে রাখা
স্বাদমতো নুন, নারকেলবাটা ও ২ চা-চামচ সরষেবা
নাড়াচাড়া করুন। ঢাকনা বন্ধ করে শাকের জল শুকে
পাত্রে মাছের কিমা অল্প নুন, সরষেবাটা, কাঁচালঙ্কাব
রসুনবাটা দিয়ে মেখে নিন। ক্লিং র‍্যাপে মাছের কিমা
নিন। উপরে লাল শাকের মিশ্রণ রেখে রোল করে
মিনিট ভাপিয়ে চাকতির মতো করে কেটে নি
তেল গরম করে জিরে, তেজপাতা ও গো
ফোড়ন দিন। আদা, রসুন, কাঁচালঙ্কা
একসঙ্গে বেটে কড়াইতে ঢালুন। টোম
দিন। স্বাদমতো নুন, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো
ধনেগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো এবং গরমমশ
মেশান। মশলা তেল ছাড়লে ফেটানো
দিন। পরিমাণমতো জল ঢেলে মাছের
রাখুন। মিশ্রণ ফুটে উঠলে নামিয়ে পরিবে



পেঁয়াজ শাকে পাবদার ঝাল



মাছের ডিম দিয়ে লাল শাকের ঝুরো

কই পাতুরি

উপকরণ: কই মাছ ৬-৮টা, সরষে ১/২ কাপ (বাটা), টোম্যাটোবাটা ৩ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা ৩ চা-চামচ, নারকেলকোরা ২ টেবলচামচ, ফেটানো টক দই ১ কাপ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাশ্মিরী লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, সরষের তেল অল্প, কুমড়ো পাতা ২-৩টে।

প্রণালী: একটি পাত্রে টোম্যাটোবাটা, নারকেলকোরা, সরষেবাটা, টক দই, কাঁচালঙ্কাবাটা, হলুদগুঁড়ো, কাশ্মিরী লঙ্কাগুঁড়ো এবং স্বাদমতো নুন মিশিয়ে নিন। কই মাছ এই মিশ্রণে মাখিয়ে রাখুন। বেশ খানিকটা সরষের তেলও দেবেন। কুমড়ো পাতায় একটি করে মাছ (মশলাসহ) রেখে মুড়ে নিন। টিফিন কৌটোয় পাতায় মোড়া মাছ রেখে ঢাকনা বন্ধ করে ২৫ মিনিট ভাপিয়ে নিন। পাতা থেকে খুলে কাঁচা সরষের তেল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

লাউ পাতায় ভাপা ভেটকি

উপকরণ: ভেটকির ফিলে ২০০ গ্রাম, সরষেবাটা ১০ গ্রাম, টক দই ২ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন স্বাদ অনুযায়ী, কাঁচা আমের তেল ২ টেবলচামচ, কাঁচা আমের আচার ১/২ চা-চামচ, লাউ পাতা ২টো।

প্রণালী: মাছের ফিলেতে অল্প নুন ও হলুদগুঁড়ো মাখিয়ে রাখুন। লাউ পাতা প্লেটে রেখে উপরে নুন ছড়িয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পর চামচ দিয়ে নুন চেঁচে ধুয়ে নিন। বাকি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। মাছের গায়ে এই মিশ্রণ মাখিয়ে ১৫-২০ মিনিট রাখুন। লাউপাতায় মাছ রেখে উপরে খানিকটা মশলা রাখুন। চেরা কাঁচালঙ্কা রেখে মুড়ে ১৫ মিনিট ভাপিয়ে পরিবেশন করুন।

পেঁয়াজ শাকে পাবদার ঝাল

উপকরণ: পাবদা মাছ ২টো, সরষের তেল ১০০ গ্রাম, ডালের বড়ি ৭-৮টা, কালো জিরে ১/২ চা-চামচ, আদাবাটা ৩ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ২ চা-চামচ, শুকনো লঙ্কাগুঁড়ো ২ চা-চামচ, চেরা কাঁচালঙ্কা ৪-৫টা, পেঁয়াজশাক ১০০ গ্রাম, সরষেবাটা ১ চা-চামচ, টোম্যাটো ১টা (বাটা), নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: মাছ অল্প নুন ও হলুদগুঁড়ো দিয়ে মেখে নিন। কড়াইতে অর্ধেক সরষের তেল গরম করে মাছ ভেজে তুলে নিন। কড়াই থেকে খানিকটা তেল কমিয়ে বড়িগুলো ভেজে তুলে নিন। ওই তেলে কালো জিরে ও চেরা কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। আদাবাটা দিয়ে নেড়ে করে হলুদগুঁড়ো ও শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো মেশান। টোম্যাটোবাটা দিন। এককাপ জল দিয়ে ফুটতে দিন। মাছ দিয়ে ঢাকা বন্ধ করে রাখুন। ঢাকনা খুলে পেঁয়াজশাক দিয়ে স্বাদমতো নুন মেশান। ঝোল শুকিয়ে এলে নামিয়ে নিন।

মাছের ডিম দিয়ে লাল শাকের ঝুরো

উপকরণ: কাতলা মাছের ডিম ২৫০ গ্রাম, লাল শাক ১১/২ কেজি, পেঁয়াজকুচি ১০০ গ্রাম, আদা-রসুনবাটা ২৫ গ্রাম, গোটা



সজনে-

জিরে $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, তেজপাতা ২টো, সরষের তেল ১ কাপ, নুন স্বাদ অনুযায়ী, হলুদগুঁড়ো $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ৩-৪টে, চিনি ১$^{1}/_{2}$ চা-চামচ, ঘি ১$^{1}/_{2}$ চা-চামচ।

প্রণালী: লাল শাক ধুয়ে নিন। মাছের ডিম ধুয়ে স্বাদমতো নুন, অল্প হলুদগুঁড়ো এবং ২ চা-চামচ সরষের তেল দিয়ে মেখে আধঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে গোটা জিরে ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরলে তেজপাতা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। পেঁয়াজকুচি দিয়ে সোনালি হওয়া অবধি ভাজুন। আদা-রসুনবাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে হলুদগুঁড়ো, স্বাদমতো নুন ও চিনি মেশান। লাল শাক মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। শাক মজে এলে মাছের ডিম মিশিয়ে ঢিমে আঁচে ২০ মিনিট ঢেকে রাখুন। চেরা কাঁচালঙ্কা ও ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

সজনে-লটের ভর্তা

উপকরণ: লটে মাছ ৮০০ গ্রাম, সজনে শাক ১ কেজি, সরষের তেল ১ কাপ, গোটা জিরে ১ চা-চামচ,

প্রণালী: শাক ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। মাছের পেট কেটে ধুয়ে ছোট টুকরোয় কেটে নিন। অল্প নুন ও হলুদগুঁড়ো দিয়ে মাছ মেখে হালকা ভেজে নিন। ওই তেলে গোটা জিরে ফোড়ন পেঁয়াজকুচি ও রসুনকুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করে হলুদগুঁড়ো মশলা তেল ছাড়লে শাক দিন। চেরা কাঁচালঙ্কা, স্বাদমতো চিনি মেশান। শাক থেকে জল বেরলে ভেজে রাখা মাছের দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। শাক মজে এলে এবং মাছ গেলে চেরা কাঁচালঙ্কা ও ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে



লাউ ডাঁটায় রুই মাছের ঝাল

লাউ ডাঁটায় রুই মাছের

উপকরণ: রুই মাছ ৫০০ গ্রাম, ডাঁটা ৪০০ গ্রাম, গোটা জিরে চামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবল পেঁয়াজবাটা ২ টেবলচামচ, রসুনবাটা ২ চা-চামচ, হলু ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ শুকনো লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চ জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন অনুযায়ী, চিনি ১ চা-চামচ, পিউরি ২ টেবলচামচ, সরষের টেবলচামচ।

প্রণালী: লাউ ডাঁটা ছোট করে কেটে মাছের টুকরো সামান্য নুন ও হলুদগুঁড়ো মেখে অল্প ভেজে তুলে নিন। ওই তেলে গোটা জি ফোড়ন দিন। পেঁয়াজকুচি দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে পেঁয়াজবাটা আদা-রসুনবাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। একটি ছোট বাটিতে



ইলিশ মাছের মাথ

সব উপকরণ সামান্য জলে গুলে কড়াইতে ঢেলে নাড়াচাড়া করুন। স্বাদমতো চিনি মেশান। লাউয়ের ডাঁটা দিন। ডাঁটা থেকে জল বেরলে ভাজা মাছ দিয়ে ঢেকে রাখুন। কিছুক্ষণ পরে ঢাকা খুলে নামিয়ে নিন।

ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক

উপকরণ: ইলিশ মাছের মাথা ১ $^{১}/_{২}$ কেজি, কচুর শাক ২ কেজি, ভিনিগার ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজ ২টো (বড় মাপের), আদা-রসুনবাটা ৫০ গ্রাম, কাসুন্দি ৫০ গ্রাম, নুন স্বাদমতো, গোটা জিরে $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা ৩ চা-চামচ, চিনি $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, সরষের তেল ১ কাপ, কাঁচালঙ্কা ৩টে, গোটা শুকনোলঙ্কা ৫টা, ঘি ২ চা-চামচ।

প্রণালী: কচুর শাক ধুয়ে ভিনিগার মেশানো জলে সিদ্ধ করে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে মাছের মাথা ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইতে আরও খানিকটা তেল গরম করে গোটা জিরে ও পেঁয়াজকুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। আদা-রসুনবাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা ও হলুদগুঁড়ো মেশান। ভাজা মাছের মাথা, কাসুন্দি ও শুকনোলঙ্কা মেশান। কচুর শাক দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। স্বাদমতো নুন ও চিনি মিশিয়ে ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

রেসিপি পেয়ে গিয়েছেন, এবার শুধু রান্না করার অ
শাক আর মাছের যুগলবন্দীতে জমে উঠুক সকলে
ভোজ। শুভ শারদীয়া!

রেসিপি সৌজন্য: শেফ সুবীর দেব (কলমি শাকে ভে
পুর ভরা মাছের কোফতা, পেঁয়াজ শাকে পাবদার ঝা
পাতায় ভাপা ভেটকি), এগজ়িকিউটিভ শেফ, **ওহ্ ক্যা**
সিলভার স্প্রিং, ই এম বাইপাস। **যোগাযোগ:** ০৩৩ ২
৭০৩৬।
শেফ বিজয় মলহোত্র (মাছের ডিম দিয়ে লাউ শাকের
ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক, সজনে-লটের ভ
লাউ ডাঁটায় রুই মাছের ঝাল), ক্লাস্টার এগজ়িকিউটি
আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল ও আইটিসি সোনার।
যোগাযোগ: ০৩৩ ২৩৪৫ ৪৫৪৫।
শেফ দীপ মিত্র ঠাকুর (কই পাতুরি), এগজ়িকিউটিভ
হোটেল ভিভান্তা, কলকাতা। **যোগাযোগ:** ৬৬৬৬ ০০

মডেল: অমৃতা
মেক-আপ: মৈনাক দাস
ফোন: ৮২৭৪৯০২৫২৭
ছবি (প্রথম পাতা ও কই পাতুরির ছবি): সুপ্রতিম চ
বাকি রান্নার ছবি: শুভেন্দু চাকী

Spa ঘরে ও বাই

শরীর-ম

ডিটক্সিফিকেশ

দাওয়াই বডি শ

অবগাহন ক

দেশি-বি

স্পা-থেরাপিতে

নতুন করে আবি

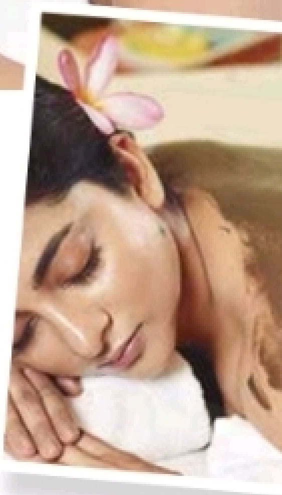
করুন নিজে

লিখছেন সায়নী ঘ











বেলজিয়ামের একেবারে পূর্ব প্রান্তে ছোট্ট একটা শহরের নাম স্পা। যে শহরজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র ন্যাচরাল মিনারেল ওয়াটার স্প্রিং। আর্ডেনস উপত্যকায় রূপকথার মতো সেই শহরটার নাম থেকেই এসেছে আজকের বহুল ব্যবহৃত শব্দটি— 'স্পা'! যেটা শুনলেই শরীর-মনজুড়ে একটা প্রশান্তি খেলে যায়। মেডিসিনাল বাথ হোক কিংবা বিউটি থেরাপি— প্রকৃতির কোলে প্রস্রবণ বা বাষ্পভরা স্নানাগারে অবগাহনের প্রচলন ছিল সেই মধ্যযুগীয় সময় থেকেই। ফুল, পাতা, বীজ ও ভেষজ গুণসম্পন্ন জড়িবুটির নির্যাসসমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়েই মূলত সৌন্দর্যচর্চা হত তখন। মাটি, বালি, কাদার ব্যবহার হতো ত্বকের জৌলুস বৃদ্ধির জন্য। এমনকী, অ্যারোমাথেরাপি-র কনসেপ্টও বহু প্রাচীন। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। আজকের দিনে সেই প্রাচীন প্রথা নতুন কলেবরে ধরা দিয়েছে সৌন্দর্যবিলাসীদের কাছে। শহরের বিভিন্ন স্পা পার্লার কিংবা বিউটি সালঁ পসরা সাজিয়েছে হরেকরকম স্পা এবং বডি মাসাজ ট্রিটমেন্টের। কোনটা ছেড়ে কোনটা বাছবেন? কোনটাই বা আপনার জন্য উপযুক্ত? এসব নিয়েই রইল আলোচনা। পুজোর আগের রূপরুটিনে আপনার

শরীরে লাগান যত্নে
ঠিকরে পড়বে ঠিক

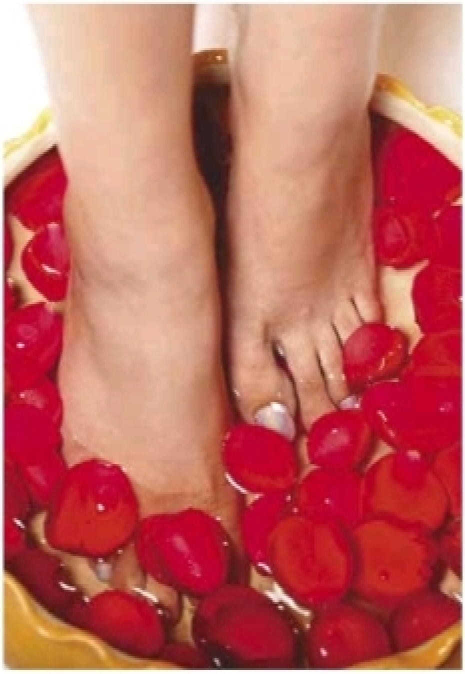
বডি স্পা-এর রকম

ইউরোপ এবং দক্ষিণ
প্রচলিত বিভিন্ন ধর
ও স্পা-এর উপকর
স্পা-এর ধরনে পার্থ
যেমন দক্ষিণ ভারতে
আয়ুর্বেদশাস্ত্র মেনে
ক্ষেত্রে। যা ছড়িয়ে প
অংশেও। আবার থা
কিংবা ইউরোপিয়ান
সমানভাবে জনপ্রিয়
সময়ে। প্রাচ্য ও পা
ও মাসাজের প্রধান









আমাদের এবারের আলোচনা। সালঁ কিংবা স্পা পার্লারে না গিয়েও বাড়িতেও সম্ভব এই ট্রিটমেন্ট, রইল হদিশ।

স্টেপ ১ : বডি স্ক্রাব

যে কোনও ধরনের স্পা ট্রিটমেন্ট শুরুই হয় বডি স্ক্রাবিং দিয়ে। অর্থাৎ শরীরের মৃত কোষ তুলে ফেলা। ত্বকের এক্সফোলিয়েশন যে কোনও বিউটি ট্রিটমেন্টেরই প্রথম ধাপ। মৃত কোষ তুলে ফেলার পাশাপাশি ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখাও স্ক্রাবিংয়ের অন্যতম কার্যকারিতা। পরিচিত স্ক্রাবিং এজেন্ট হিসেবে সল্ট কিংবা সুগার বেসড স্ক্রাব, চাল বা কফির গুঁড়ো ব্যবহার করা যেতে পারে। আমন্ড, জোজোবার মত চেনা এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন স্ক্রাবের মধ্যে। উন্মুক্ত অংশে স্ক্রাবিংয়ের প্রয়োজন বেশি।

স্টেপ ২ : বডি র‍্যাপ

এই পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ত্বককে 'রেজুভিনেট' করা। আপনার বহিরাঙ্গকে ডিটক্স করতে বডি র‍্যাপের জুড়ি নেই। সি-উইড, চারকোল, ক্লে বা মাড প্যাক সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে।



জন্য এই উপাদানগুলোই সবচে
কার্যকরী। যাঁদের ত্বক খুব শুষ্ক, ত
জন্য সবচেয়ে উপযোগী ক্রিম বা
বেসড হাইড্রেটিং বডি র‍্যাপ। খে
সাহায্যে সারা দেহে (দুই হাত, গ
নীচের অংশ থেকে নাভিমূল পর্য
লাগিয়ে নিন প্যাকটি। এরপর প
টাওয়েল, ক্লিংগ র‍্যাপ বা চাদরের
মুড়ে নিন সারা শরীর। ট্যান তো
লাগানো যেতে পারে অ্যালোভে
যার চল শুরু ক্যারিবিয়ান দ্বীপপু
তবে এই বডি মাস্ক দিয়ে কখনও
করাতে যাবেন না। সেটা হবে প

স্টেপ ৩ : বডি মাসাজ

স্পা-এর মূল ধাপ হল বডি মাস
শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী থের
একেক ধরনের মাসাজের পরাম
থাকেন। কয়েকটি জনপ্রিয় ইউরে
এশীয় মাসাজ ট্রিটমেন্ট আলোচি

ডিপ টিসু মাসাজ : পেশিকে আ
এবং প্রেশার পয়েন্ট অনুযায়ী চা
মালিশ করে ব্যথার উপশম করা
টিসু মাসাজের কাজ। সাধারণত
ঘাড়, পায়ের পেশির উপর চাপ
একঘণ্টা বা দেড়ঘণ্টা সময় নিয়ে
এই মাসাজ। লোয়ার ব্যাক পেন,
পেন, স্পন্ডিলাইটিসের রোগীদে
এই মাসাজ খুবই আরামদায়ক।
ভঙ্গিতে সমস্যা, অনিয়মিত ঘুম
অসুবিধেও নির্মূল হয়।







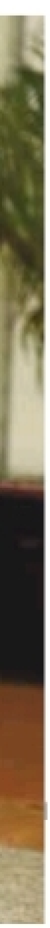
হট স্টোন মাসাজ : তপ্ত, মসৃণ, গোলাকার পাথর ব্যবহার করে শরীরের বিশেষ অংশে (বিশেষ করে পিঠের পেশিতে) রেখে এই থেরাপি করা হয়। ব্যাসল্ট বা মার্বেলের পাথর (প্রায় ৫০-৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) গরম করে তারপর ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে ব্যবহার করা হয়। পিঠের ও হাতের বিভিন্ন প্রেশার পয়েন্টে রাখা হয়, এতে পেশিগুলোও রিল্যাক্সড হয়ে যায়। মাস্‌ল স্টিফনেসের সমস্যা থাকলে করাতে পারেন ৭৫ মিনিটের এই ট্রিটমেন্ট।

বালিনিজ় মাসাজ : ফ্যাটিগ দূর করে শরীরকে নতুন এনার্জি দেওয়ার জন্য প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ায় এই রিল্যাক্সিং স্পা-এর চল ছিল। এখন সারা বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় স্পা-ট্রিটমেন্ট। মাথা ব্যথা, স্ট্রেস, মাইগ্রেনের সমস্যা, অবসাদ ইত্যাদি সমস্যা থাকলে সাহায্য নিতে পারেন এই হোলিস্টিক স্পা-এর। এটাও এক ধরনের ডিপ টিস্যু মাসাজ, যাতে সংশ্লিষ্ট থাকে অ্যারোমাথেরাপিও। মন ভাল করে দেওয়ার পাশাপাশি শরীরে অক্সিজেন সার্কুলেশনও বাড়ায় এই এক-দেড়ঘণ্টার মাসাজ। ইলাং-ইলাং অয়েলের ব্যবহারই সবচেয়ে প্রচলিত। পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে রোজ় অয়েলও।

> ‘ভেষজ উদ্ভিদ ও তাদের বীজ, শিকড় ইত্যাদির নির্যাস দিয়ে তৈরি তেলই আয়ুর্বেদিক মাসাজের প্রধান উপকরণ।’







ভরসা থাকুক আয়ুর্বেদে

বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ ও তাদের বীজ, শিকড় ইত্যাদির নির্যাস দিয়ে তৈরি তেলই আয়ুর্বেদিক মাসাজের প্রধান উপকরণ। আয়ুর্বেদের ঈশ্বর ধন্বন্তরি ও তাঁর শিষ্য সুশ্রুতের রসায়ন ব্যবহার করেই শত-সহস্রাব্দ ধরে এ দেশে চলে আসছে আয়ুর্বেদের ব্যবহার। কয়েকটি প্রচলিত আয়ুর্বেদিক স্পা থেরাপির কথা জেনে নেওয়া যাক।

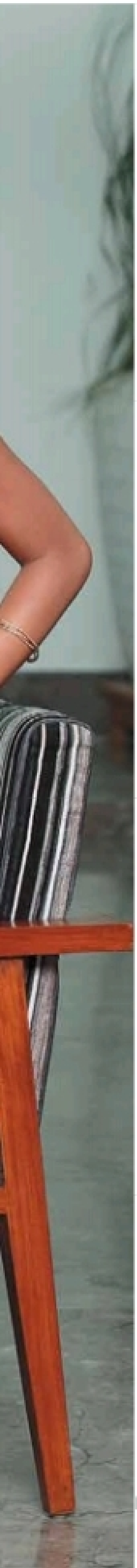
কিজ়ি : নরম মসলিন কাপড়ের পুঁটলিতে ভরা থাকে ভেষজ উদ্ভিদের শিকড়-মূল (ড্রায়েড এবং ফ্রেশ) ও অন্যান্য জড়িবুটি। গরম আয়ুর্বেদিক অয়েল কিংবা ড্রাই মাসাজের ক্ষেত্রে হার্বাল পাউডার বা বালিতে সেই পুঁটলিটি ডুবিয়ে নির্দিষ্ট প্রেশার পয়েন্টে রেখে সার্কুলার মোশনে মাসাজ করা হয়। অশ্বগন্ধা, নিম, সরষে, হলুদ, রোজ়মেরি, অ্যালোভেরা-সহ বিভিন্ন ড্রায়েড হার্বস ব্যবহার করা হয় পুঁটলিতে। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, অস্টিওআর্থ্রারাইটিস, ফ্রোজেন শোল্ডার, স্পন্ডিলাইটিস ইত্যাদিতে এই মাসাজ বেশ কার্যকরী। ত্বকের মুখও খুলে দেয়, রক্ত চলাচল বাড়াতে সাহায্য করে।

শিরোধারা : ধন্বন্তরম তৈলম— শিরোধারা পদ্ধতির মূল উপকরণ এই তেল। এর গুণে অনিদ্রা, মাইগ্রেনের মতো সমস্যার উপশম সম্ভব। প্রায় ৩০-৪৫ মিনিট ধরে একটি পাত্র থেকে চুঁইয়ে তেলটি ফোঁটা ফোঁটা করে কপালে পড়ে ও মাথায় ছড়িয়ে যায়। চাপমুক্তি ও মনঃসংযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রেও শিরোধারা কার্যকরী।

অভয়ঙ্গম : আয়ুর্বেদিক ডিটক্সিফিকেশনের জন্য প্রাচীন ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছিল এই অয়েল মাসাজ থেরাপি। ‘স্পিরিচুয়াল আপলিফ্টমেন্ট’এর পাশাপাশি ‘ওয়েল বিইং’ বা ভাল থাকার উদ্দেশে এবং নানাবিধ দোষ কাটানোর জন্যও অভয়ঙ্গম মাসাজের সাহায্য নেওয়া হত একসময়। আয়ুর্বেদের পঞ্চকর্মা থেরাপির অঙ্গ হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়। অভয়ঙ্গমের পর স্বেদন (ওয়র্ম বাথ) থেরাপি কিন্তু মাস্ট

মডেল: ঐশ্বর্য, মেকআপ: ভাস্কর বিশ্বাস, ফোন: ৯০৫১৮২৩৫২৪
তথ্য ও লোকেশন সৌজন্য: ক্লাব প্রাণা, হায়াত রিজেন্সি, কলকাতা ছবি: শুভদীপ ধর





ত্বক ও মেক-আপ কম্বো

ত্বকের রং যা-ই হোক না কেন, মেক-আপের সঠিক শেড বেছে নিতে পারলে, গ্ল্যামারাস হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। বেস মেক-আপ থেকে আইশ্যাডোর কালার প্যালেটের শেড, মেক-আপের প্রতি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। কমপ্লেকশনের সঙ্গে মিলিয়ে মেক-আপের কম্বিনেশন জানালেন মৌমিতা সরকার।



শারদোৎসব ঘিরে আমাদের অনেক প্রস্তুতি। সারাবছর যেমনভাবেই সাজগোজ হোক না কেন, পুজোয় চাই স্পেশ্যাল মেক-আপ টাচ-আপ। কিন্তু মেক-আপের কথা বলার আগে বলি, কমপ্লেকশন এবং মেক-আপ, এই দুইয়ের মধ্যে একটা দারুণ কেমিস্ট্রি আছে। মেক-আপ সব সময়ই আপনার কমপ্লেকশন অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু এই ধারণা অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। সেকথা মাথায় রেখে, আপনার কমপ্লেকশনে ঠিক কীরকম মেক-আপ করবেন, তারই কিছু টিপ্‌স এবার জেনে নেব।

কমপ্লেকশন তিন ধরনের হয়- ফরসা বা হালকা, মাঝারি এবং গাঢ়। এছাড়াও স্কিনটোন আরও তিন রকমের হতে পারে, ওয়ার্ম, কুল ও নিউট্রাল। আপনার স্কিনটোন ওয়ার্ম না কুল, তা বোঝার সহজ উপায় হল, সোনা ও রুপো, দু'ধরনের গয়না নেবেন। আপনাকে যদি সোনার গয়না মানায়, তা হলে স্কিনটোন ওয়ার্ম। আর রুপোর গয়না বেশি মানালে স্কিনটোন কুল। কিন্তু দু'ধরনের গয়নাতেই মানালে স্কিনটোন নিউট্রাল।

হালকা কমপ্লেকশনের মেক-আপ

বেস মেক-আপ থেকে শুরু করে শিমারের শেড, আপনার কমপ্লেকশনের সঙ্গে মানানসই না হলে পুরো সাজটাই মাটি।

বেস মেক-আপ: মেক-আপ বেস বা ফাউন্ডেশনের শেড আপনার স্কিনটোনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। আইভরি থেকে বেজ রংয়ের ফাউন্ডেশন এই কমপ্লেকশনে ভাল লাগবে। ফাউন্ডেশন পুরো মুখে ফোঁটা-ফোঁটা করে লাগিয়ে মেক-আপ স্পঞ্জ দিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড করবেন। খেয়াল রাখবেন ফাউন্ডেশন যেন সমানভাবে ব্লেন্ড হয়।

কনসিলার: মুখে কোনও দাগ অথবা ডার্ক সার্কল থাকলে সেখানে কনসিলার লাগাবেন। এক্ষেত্রে আইভরি রেডিশ কনসিলার নিতে পারেন। গাল ভারী হলে কন্টুরিং করার জন্য তিন টোন ডার্ক ফাউন্ডেশন ব্যবহার করবেন।

কমপ্যাক্ট: এবার কমপ্যাক্টের পালা। এটিও স্কিনটোনের সঙ্গে মিলিয়েই ব্যবহার করুন।

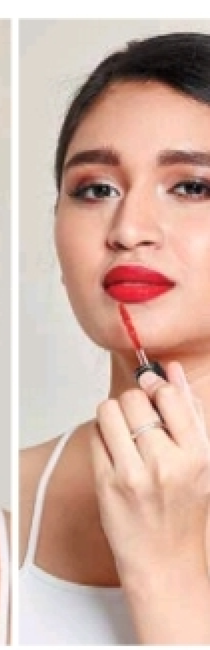
আপনার ত্বক যদি শুষ্ক হয়, তাহলে ময়শ্চারযুক্ত কমপ্যাক্ট লাগাবেন। তৈলাক্ত ত্বকে পাউডার বেস্‌ড অথবা ম্যাট কমপ্যাক্ট ব্যবহার করুন।

আই মেক-আপ: পিচ, পিঙ্ক, ব্রাউন, যে-কোনও আইশ্যাডো চলতে পারে। দিনের বেলার আই মেক-আপে হালকা ব্রাউন বা পিচ আইশ্যাডো ভাল লাগবে। এরপর সরু করে আইলাইনার পরে নিন। চোখের পাতায় মোটা করে মাসকারা লাগাবন। রাতের মেক-আপে মোটা করে আই লাইনার বা স্মোকি আই মেক-আপ করতে পারেন।

আমরা অনেকেই মনে করি, ফরসা বা হালকা কমপ্লেকশনে সব মেক-আপই ভাল লাগবে। এমন ধারণা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়! শুধুমাত্র সঠিক মেক-আপ শেডই আপনাকে দিতে পারে পারফেক্ট লুক।













কমপ্লেকশন যেমনই হোক না কেন, সঠিক মেক-আপের জাদুতে আপনিও হয়ে উঠবেন গ্ল্যামারাস। আই কমপ্লেকশন ও তার মেক-আপের 'A-Z' প্রতিটি ধাপেই হওয়া চাই পারফেক্ট কম্বিনেশন!





ব্লাশার: পিচ, পিঙ্ক, যে কোনও ব্লাশারই ভাল লাগবে।
লিপ কালার: রেড, মেরুন, ব্রাউন, পিচ, পিঙ্ক, ম্যাজেন্টা, যে-কোনও লিপকালার পরতে পারেন। আজকাল ব্লু বা পার্পল লিপকালারও ইন। তাই চাইলে এগুলো ট্রাই করতে পারেন।
সবশেষে শিমারের হালকা ছোঁয়া গ্লসি লুক আনে।

মাঝারি কমপ্লেকশন

বেস মেক-আপ: গোল্ডেন ইয়েলো ফাউন্ডেশন আপনাকে মানাবে। কনসিলিংয়ের জন্য পিচ কনসিলার নেবেন। কন্টুরিং করার জন্য তিনটে টোন ডার্ক শেডের ফাউন্ডেশন ব্যবহার করবেন।
কমপ্যাক্ট: এখানেও স্কিনটোনের সঙ্গে কমপ্যাক্টের শেড মিলিয়ে নেবেন।

ব্লাশার: স্কিনটোন ওয়ার্ম হলে পিচ, অ্যাপ্রিকট ব্লাশার লাগাবেন। স্কিনটোন কুল হলে রোজি পিঙ্ক ব্লাশার ভাল লাগবে।

আইশ্যাডো: হানি বা ব্রনজ় রঙের আইশ্যাডো ভাল লাগে। কুল স্কিনটোনে ল্যাভেন্ডার বা গ্রে রঙের আইশ্যাডো আর ওয়ার্ম স্কিনটোনে কপার, ব্রাউন আইশ্যাডো ভাল লাগবে।

লিপকালার: মাঝারি কমপ্লেকশনে স্কিনটোন ওয়ার্ম হলে রেডিশ অরেঞ্জ, কোরাল, ব্রাউন, বার্গান্ডি লিপস্টিক আর কুল স্কিনটোনে লাল, গোলাপি, মভ, বেরি লিপকালার দারুণ মানাবে।

গাঢ় কমপ্লেকশন

বেস মেক-আপ: ফাউন্ডেশনের আগে মুখে হালকা ময়শ্চারাইজ়ার লাগিয়ে নেবেন। এতে ত্বকে গ্লো আসবে। হানি ফাউন্ডেশন এই কমপ্লেকশনে পারফেক্ট। এরপর কমপ্যাক্ট লাগিয়ে নেবেন।

আইশ্যাডো: চেরি রেড, ব্রাউন, ফুশিয়া, গোল্ডেন, ব্রনজ় আইশ্যাডো আপনাকে মানাবে। তবে ওয়ার্ম স্কিনটোনে লাল, কমলা আইশ্যাডো ভাল লাগবে। আর কুল স্কিনটোনে নীল আইশ্যাডো প্যালেটের রং ভাল মানায়।

ব্লাশার: কোরাল, রেড ওয়াইন, পাম, ব্রনজ় কালার ব্লাশার আপনাকে দেবে গ্ল্যাম লুক।

লিপকালার: পাম, পার্পল, লাল, কমলা, বার্গান্ডি, এই লিপকালারগুলো পরতে পারেন।

বিভিন্ন কমপ্লেকশন ও তার পারফেক্ট মেক-আপের সব ইনফো়ই এখন আপনার হাতের মুঠোয়। তাই মেক-আপের সব ভ্রান্ত ধারণা ভুলে এবার পুজোয় নিজেই হয়ে উঠুন নিজের মেক-আপ আর্টিস্ট!









মডেল: শ্রীময়ী, অনুষ্কা, অঙ্কিতা
মেক-আপ: অভিজিৎ চন্দ
ফোন: ৯৮৩০৬৮৮৮৯০
পোশাক: সিয়েনা কাফে,
ফোন: ৪০৬৫৫৮১২৩, অ্যান্ড, ফোরাম কোর্টিয়া
ফোন: ৮৩৩৬৯০১৪৮৫
ম্যাক্স ফ্যাশন, এলগিন রোড,
ইমেজ এন স্টাইল,
ফোন: ৯০৫১০৯৮৭৪৪
ওয়েস্টসাইড, ক্যামাক স্ট্রিট
গয়না: স্টোর নং ৬ বাই স্রোতস্বিনী
ফোন: ৮৩৩৭০৩৭৯৪৭
লোকেশন: দ্য ললিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল
ফোন: ৪৪৪৪ ৭৭৭৭
ছবি: অমিত দাস

ব্লাশার: স্কিনটোন ওয়ার্ম হলে পিচ, অ্যাপ্রিকট ব্লাশার লাগাবেন। স্কিনটোন কুল হলে রোজ়ি পিঙ্ক ব্লাশার ভাল লাগবে।
আইশ্যাডো: হানি বা ব্রনজ় রঙের আইশ্যাডো ভাল লাগে। কুল স্কিনটোনে ল্যাভেন্ডার বা গ্রে রঙের আইশ্যাডো আর ওয়ার্ম স্কিনটোনে কপার, ব্রাউন আইশ্যাডো ভাল লাগবে।
লিপকালার: মাঝারি কমপ্লেকশনে স্কিনটোন ওয়ার্ম হলে রেডিশ অরেঞ্জ, কোরাল, ব্রাউন, বার্গান্ডি লিপস্টিক আর কুল স্কিনটোনে লাল, গোলাপি, মভ, বেরি লিপকালার দারুণ মানাবে।

গাঢ় কমপ্লেকশন

বেস মেক-আপ: ফাউন্ডেশনের আগে মুখে হালকা ময়শ্চারাইজ়ার লাগিয়ে নেবেন। এতে ত্বকে গ্লো আসবে। হানি ফাউন্ডেশন এই কমপ্লেকশনে পারফেক্ট। এরপর কমপ্যাক্ট লাগিয়ে নেবেন।
আইশ্যাডো: চেরি রেড, ব্রাউন, ফুশিয়া, গোল্ডেন, ব্রনজ় আইশ্যাডো আপনাকে মানাবে। তবে ওয়ার্ম স্কিনটোনে লাল, কমলা আইশ্যাডো ভাল লাগবে। আর কুল স্কিনটোনে নীল আইশ্যাডো প্যালেটের রং ভাল মানায়।
ব্লাশার: কোরাল, রেড ওয়াইন, পাম, ব্রনজ় কালার ব্লাশার আপনাকে দেবে গ্ল্যাম লুক।
লিপকালার: পাম, পার্পল, লাল, কমলা, বার্গান্ডি, এই লিপকালারগুলো পরতে পারেন।







বিভিন্ন কমপ্লেকশন ও তার পারফেক্ট মেক-আপের সব ইনফোই এখন আপনার হাতের মুঠোয়। তাই মেক-আপের সব ভ্রান্ত ধারণা ভুলে এবার পুজোয় নিজেই হয়ে উঠুন নিজের মেক-আপ আর্টিস্ট!



মডেল: শ্রীময়ী, অনুষ্কা, অঙ্কিতা
মেক-আপ: অভিজিৎ চন্দ
ফোন: ৯৮৩০৬৮৮৮৯০
পোশাক: সিয়েনা কাফে,
ফোন: ৪০৬৫৮১২৩, অ্যান্ড, ফোরাম কোর্টইয়া
ফোন: ৮৩৩৬৯০১৪৮৫
ম্যাক্স ফ্যাশন, এলগিন রোড,
ইমেজ এন স্টাইল,
ফোন: ৯০৫১০৯৮৭৪৪
ওয়েস্টসাইড, ক্যামাক স্ট্রিট
গয়না: স্টোর নং ৬ বাই স্রোতস্বিনী
ফোন: ৮৩৩৭০৩৭৯৪৭
লোকেশন: দ্য ললিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল
ফোন: ৪৪৪৪ ৭৭৭৭
ছবি: অমিত দাস





পোশাক থেকে অ্যাকসেসরিজ়, সর্বত্রই তীব্র রঙের ছটা। রঙের প্রগলভতায়

স্পটলাইটে

চোখ ঝলসে যায়। এমনই তার তেজ, জৌলুস! এহেন অবারিত উজ্জ্বলতা যে উৎসবে

নিয়ন

মানায়। বর্ণময় ‘নিয়ন’-এর উজ্জ্বল ফ্যাশনস্কেপ। উপস্থাপনায় সায়নী দাশশর্মা।

মনে সাহসের অভাব নেই। পরনে তাই কটকটে নিয়ন গ্রিন ড্রেস। পায়েও একই রঙের স্টিলেটো। উজ্জ্বলতায় বাঁধ দিতে সঙ্গতে পেস্তা গ্রিন ডেনিম জ্যাকেট।

লেয়ার্ড ড্রেস: ফনেত্তা, যোধপুর পার্ক
ফোন: ৯১৬৭৪১৯৭৫৬
বডিকন ও জ্যাকেট: জ়ারা, সাউথ সিটি মল
ফোন: ০৩৩ ৪৬০৪ ৬২৩০



ফ্যাশনদুনিয়ায় নিয়ন এখন সুপারহিট! এমনিতে সব কমপ্লেকশনই নিয়নের জেল্লায় উজ্জ্বল দেখালেও, শ্যামলা ত্বকে নিয়ন সবচেয়ে বেশি আর্কষক! নিয়ন এমনিতেই বেশ বোল্ড। তাই আতিশয্যের বাহুল্যে তাকে না বাঁধাই ভাল!

কালারফুল বি
লাস্যময়ী দুই
একজনের প
গোলাপি পে
ড্রেস। অন্যজ
নিয়েছেন ডি
কোরাল টপ
গ্রিন স্ট্রেট প্য

ড্রেস: ফরএভা
সাউথ সিটি মল
ফোন: ০৩৩ ৪
টপ: ফনেস্তা, (
ট্রাউজার্স: জার
সানগ্লাস: হিমা
অপটিক্যাল, স
ফোন: ০৩৩ ২



আবারও কোরাল।
তবে সঙ্গতে এবার
উজ্জ্বল নীল।
মেজাজের সঙ্গে
সামঞ্জস্য রেখে পরনে
ফুরফুরে শিফন। সাদা
ব্লাউজ়ে যথাযথ সাজ।

নীল শাড়ি: সুন্দরী,
(গড়িয়াহাট
প্যান্টালুনসের পাশে),
ফোন: ২৪৬১ ৯০০৩/০৪
ব্লাউজ় ও নীল কানের দুল:
গ্ল্যামার ডিজ়াইনার বুটিক
ফোন: ২৪৪২ ১০১১
কোরাল শাড়ি: সারং,
পার্ক স্ট্রিট
ফোন: ৪০০৫ ৪৫৫৪
ব্লাউজ়: ভি-কাট,
হিন্দুস্তান পার্ক
ফোন: ৯৮৩১০৯৮৮৩০
রুপোর দুল: ফ্যাব ইন্ডিয়া



ফিউশন ফ্যাশনে নিয়ন ম্যাজিক। একদিকে ব্রোকেড ক্রপ টপের সঙ্গে উজ্জ্বল গোলাপি ট্রাউজ়ার্স। অন্যজনের পছন্দ অ্যাসিমেট্রিক্যাল কোরাল শার্ট আর বেজ ক্রপড প্যান্টস।

নিয়ন মানেই নিয়ম ভাঙার খেলা নয়। সাহসী হতে আপত্তি থাকলে, পোশাকের পরিবর্তে বেছে নিতে পারেন নিয়ন মেক-আপ। চোখের পাতায় উজ্জ্বল শ্যাডো কিংবা নিয়ন লিপস্টিকও এখন 'হট ট্রেন্ড'! উৎসবের সাজে নিয়নের ছোঁয়া আপনার ব্যক্তিত্বেও আনবে উজ্জ্বলতা।

পোশাক: ফ্যাব ইন্ডিয়া
ই-মেল: www.fabindia.
গয়না: সাক্ষী, সাউথ সিটি
ফোন: ০৩৩ ৪০০৭ ২২৭



রঙের অফুরান জোয়ার। একদিকে নিয়ন গ্রিন ক্রপ টপ আর উজ্জ্বল কমলা লেয়ার্ড ট্রাউজ়ার্সের জুটি। অন্যদিকে টকটকে কমলা ফ্লেয়ার্ড ড্রেস।

টপ: জ়ারা
ট্রাউজ়ার্স: ফনেস্তা
ড্রেস: ফরএভার নিউ
ব্যাঙ্গল: শপার্স স্টপ,
সাউথ সিটি মল
ফোন: ৪৪০৩ ০১০০
ইয়ারিং: ভেরো মোদা,
সাউথ সিটি মল
ফোন: ৪০৬৪ ৩৫০৮

মডেল: (
মেক-আ
অনিরুদ্ধ
ফোন: ৯
জুতো: সি
সাউথ সি
ফোন: ৪
লোকেশ
জে ডব্লিউ
কলকাতা
ফোন: ৬
ছবি: সো
শুটিং কে
টিনা পল



মেরিলের অন্তহীন ভ্রমণ

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মেরিলের যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেদিনও ও ভোরে ঘুম থেকে উঠে জগারস পার্ক থেকে সোজা চলে যায় নাজনিনদের বাড়িতে। ব্রেকফাস্ট করে ওদের চার পাঁচটা কুকুরের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে বিলাসকুঞ্জে ফিরতে বেজে যায় ১১টা। ফিরতে আয়া মেরিলকে স্নানের সব গুছিয়ে দিলে আধ ঘণ্টা ধরে স্নান। তারপর আয়নার সামনে বসে মেকআপ। একটা মেরুন শিফন পরে নেয় মেরিল। গলায়, কানে মুক্তোর গয়না। তারপর রেডি হয়ে বেরিয়ে ড্রাইভ করে পৌঁছয় প্যারেড গ্রাউন্ড। পাশের ময়দানে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছে ক'দিন ধরে। সেখানে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ক্রুওয়ালাদের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা। ওঁ সঙ্গে বসে পাঁচ মিনিট বল পেটাপেটি দেখে তিনজনে মিলে ক্লাবে চলে আসে লাঞ্চ করতে। ক্লাবে এসে দেখে টোনি, ওর তিন নম্বর বৌ রাধিকা, রাধিকার মা, রাধিক ছোট বোন— সব ক্লাব টেরেস আলো করে বসে আছে

করতে বলে দেয় টোনি। জুলাইয়ের শেষ। রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। ভ্যাপসা একটা ব্যাপার টের পাওয়া যায় ঠিকই, তবু মাসের শেষ সপ্তাহের শনিবার তো, যাদের অন্য সময় দেখাই যায় না তারাও অনেকে আজ উপস্থিত। হেভি ব্রেকফাস্ট করার জন্য মেরিল হালকা কিছু খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সুপ আর স্যালাড। আর একটা আমের ডেসার্ট। খেতে খেতে টোনি বলে,''বিকেলে পোকার খেলবে মেরিল?'' টোনি যে ভাল ফুটবল খেলত এক কালে, ওকে দেখে এখন কেউ ভাবতেও পারবে না। বিরাট একটা ভুঁড়ি। হাত দুটো দু'পাশে বেলুনের মত ফুলে আছে। চিবুকের নীচে এক তাল মাংস। মেরিল টোনির নতুন বউ রাধিকাকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে মাথা নেড়ে বলে, ''সরি, টোনি। এখান থেকে বেরিয়ে আমাকে অনেক জায়গায় যেতে হবে। চারটে বাজলেই আমি উঠে পড়ব।'' মিসেস স্ক্রুওয়ালার একমাত্র ছেলে বছর খানেক আগে সুইসাইড করেছে। ওর পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর সুলেমান হাইটসের ২৭ তলার ফ্ল্যাট থেকে ঝাঁপ দেয়। ওটাই ছিল ওর ব্যাচেলরস্ ডেন। এরপর থেকে মিসেস স্ক্রুওয়ালা অনেক চুপচাপ। এই জগৎটা অদ্ভুত। যতক্ষণ মুখে হাজার ওয়াটের আলো জ্বালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, ততক্ষণ সবাই তোমাকে চায়। মুখের আলো, গিগলস্ নিভে গেলে, ক্ষুরধার উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কতায় এদিক ওদিক হাতড়ালে মানুষ ভয় পেয়ে পাঁচ হাত তফাতে সরে যায়। সে চারটে বাজলেই বেরিয়ে যাবে শুনে মিসেস স্ক্রুওয়ালা বললেন, ''উই উইল অলসো লিভ বাই দেন।'' এতক্ষণ টোনির সদ্য বিবাহিত বউ একটা কথা বলল,''মে আই নো, হোয়াট ইজ ইওর হবি?'' সমস্ত টেরেসের পিলে চমকে দেওয়া একটা হাসি হাসে মেরিল। তারপর গুমরে গুমরে হাসতেই থাকে। সময় মতো বেরিয়ে মেরিল আসে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে। সেখানে অনির্বাণ অগস্ত্যের এগজ়িবিশন চলছে। অনির্বাণ একজন অতি বিখ্যাত শিল্পী। নানা রকম জেলখানা আঁকে। জেলখানার ভিতর আকাশ, বৃষ্টি। জেলখানার ভিতর বিপ্লবীরা মরে পড়ে আছে। মেরিলকে দেখে অনির্বাণ দু'হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে গালে ঠোঁট চেপে প্রগাঢ় চুমু খায়। সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠলে সে বোঝে কেউ ছবি তুলে নিল এই মুহূর্তটার। তাতে মেরিলের কিছু এসে যায় না। সে একজন সোশ্যালাইট। দেশের কত বিখ্যাত মানুষ তার বন্ধু। এরকম ছবি অনেক ওঠে তার। সে নিজেও আসলে বিখ্যাত। কিন্তু কেন বিখ্যাত কেউই জানে না। যেমন আজও অনির্বাণ তাকে বলল, "তোমার জন্য একটা ছবি রেখে দিয়েছি। ছোট ছবি। কবে নেবে বলো?" "যেদিন দেবে। বলো কবে?" "রবিবার বিকেল বিকেল এসো না আমার স্টুডিওয়। হ্যাভ টি উইথ মি। দু'জন এসেছে ফ্রম দুবাই। একটা এগজ়িবিশন নিয়ে কথা বলবে। ওরা সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রির কয়েকজনের খোঁজ করছিল। তোমার তো সকলেই বন্ধু।''

ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি থেকে বেরিয়ে মেরিল ছোটে হোম মিনিস্টারের বউয়ের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। অঞ্জুম বাংলাদেশের মেয়ে। প্রথম বর ছিল ফরেন সার্ভিসে। বিয়েটা ভেঙে যায়। তারপর রেজ্জাককে বিয়ে করে এদেশেই থেকে যায় অঞ্জুম। ওর খুব কেক বেক করার শখ। মাঝে মাঝে ওদের বাংলোর লনে ছোটখাটো একটা বেকিং ফেস্টিভ্যালই অ্যারেঞ্জ করে ফেলে। বড়, বড় লোকেদের বৌদের ভিড়

জড়িয়ে ধরে হইহই করে কথা বলছিল যখন ছবি উ
তার। একটা ম্যাকারন, এক টুকরো কেক আর দু'কা
খেয়ে মেরিল সেখান থেকে আবার পৌঁছে যায় আর
জায়গায়। সেখানে কবিতা পাঠ হচ্ছে। একজন জার্মা
দেশের চারটে শহরে ঘুরে ঘুরে কবিতা পড়ছেন, বে
বাজাচ্ছেন।

তার কবিতাগুলোর অনুবাদ পাঠ করছে আর-একজ
অনুষ্ঠানটা খুব বোরিং লাগছে। অথচ যখন একটু দে
সে এখানে পৌঁছল, তখন এক ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড হন্ত
এসে তাকে ফ্রন্ট রো'তে বসিয়ে দিয়ে বললেন, ''ই
অনেক দেরি করে ফেললেন।'' মেরিল বলল, ''সরি
আমি...!''

ভদ্রমহিলার মুখ দেখে মনে হল অনেক ক্ষতি হয়ে গি
কিন্তু কেন! প্রায়ই অনেক বিখ্যাত লোকজন তাকে
বলে, ''তুমি না এলে কিন্তু হবে না।'' না গেলে কী
মেরিলও জানতে চায়নি, তারাও বলেনি কখনও। এ
আগে মেরিল হার্লে-তে বসে একা একা খাবার খা
ওয়াইন পান করছিল আর একটা বই পড়ছিল নর্থ
উপর। ছবি কাগজে ছাপা হয়ে গেল, সে জানলই না
মন্ত্রী ফোন করে বলল, ''হোয়াট অ্যান ইন্সপায়ারিং
ট্র্যাভেল করছ, ওয়াইন খাচ্ছ, বই পড়ছ, তাও 'এস
ক্যাম্প ১৪'। আছ ভাল।''

কবিতা পাঠ শুনে একটু ক্লান্ত মেরিল ফিরেছিল বি
শরীরটা এলিয়ে দিয়েছিল সোফায়। আয়া বলল, ''
আজ কি আর বেরবেন? রেস্ট নিন। আমি স্নানের
করে দিই? স্নান করুন। কফি খান...'' মেরিল সঙ্গে
বসে বলল, ''না,না, আজ রুস্তমজির নাতনির জন্ম
তো যেতেই হবে।'' রেডি হল। সাজল। এবার পরল
জাম্পস্যুট। পায়ে ব্লক হিল। একটা ক্রোকোডাইল
ব্যাগ নিয়ে সে পাঁচতারার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল নি
সবচেয়ে ভাল গাড়িটা নিয়ে।

প্রতিটা দিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘোরা
ঘুরতে ঘুরতে, এক পার্টি থেকে অন্য পার্টি অ্যাটেন্ড
করতে, এক ইনভিটেশনে পৌঁছে আর এক ইনভিটে
পৌঁছনোর তাড়ায়, এক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আর-এক
না যেতে পেরে বিরক্ত হতে হতে, এই যাওয়া আর
যাওয়াকেই পেশা করে ফেলা মেরিল আসলে সেদি
পারেনি, সে কতটা ক্লান্ত। সেদিন সন্ধে থেকে ঝমঝ
পড়ছিল। মেরিলের গাড়ির চাকা স্কিড করে গিয়ে ধা
পাশের রাস্তার একটা বড় গাছে। উলটো দিক থেকে
একটা বাস দ্বিতীয়বার ধাক্কা মেরে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দি
গেল তাকে। মেরিল, যে কিনা শহরের বিখ্যাত সো
তার এই অ্যাক্সিডেন্টের তেমন কোনও খবর বের হ
কোথাও। কেউ কেউ ফোন করল। আস্তে আস্তে ফে
আসা বন্ধ হয়ে গেল। যে সব ফোটোগ্রাফাররা তার
তোলার সময় এমন একটা মুখের ভাব করত, যেন
গিয়েছে তারা কেউ, কোনওদিনই যে হসপিটালের
ওষুধে আচ্ছন্ন মানুষের ছবি তোলার বরাত পায় না,
বোঝা গেল। ফলে মেরিলের নাকে নল গোঁজা ছবি
একটাও। কিন্তু তখনও শহরে অজস্র পার্টি থ্রো করা
নেতা, মন্ত্রী, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, অভিনেতা, গাইয়ে, বা

ডাকবাক্সে, ইমেলে, হোয়াটসঅ্যাপে। তারপর সে সবও থেমে গেল একটা সময়। ১৩ মাস হসপিটালে থেকে, এক বিকেলে বিলাসকুঞ্জে ফিরল মেরিল। দু'একজন দেখতে এল। মিসেস স্ক্রুওয়ালা এলেন বার দুয়েক। তারপর সব চুপচাপ। ভিড় থেকে মুছে গেল মেরিল। আরও একটা বছর গড়িয়ে গেল। আর তখনই একদিন মেরিল স্নান সেরে আয়নার সামনে বসে সাজতে লাগল। আয়া সেই সাজ দেখে অবাক হয়ে আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল সব। সেদিন থেকে শুরু হল মেরিলের অন্তহীন ভ্রমণ। সকাল বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে মেরিল মেক-আপ করে নেয়। আয়নার একদিকে একটা অবেলার ছায়া ঘনিয়ে এলে মেরিল বোঝে, ঘড়ির কাঁটা একটার দিকে এগোচ্ছে। ঠিক এই সময়টা তার এসপ্ল্যানেড থেকে হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেটের দিকে যেতে ইচ্ছে করে। দুপুর একটা নাগাদ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে জাহাজের জানলার মতো গোল ল্যান্ডিংয়ের জানলায় হ্যান্ডব্যাগ রেখে মা দাঁড়ালে, আয়া কুঁচিটা ঠিক করে দিত। এই সময় মা প্রতিদিন কোথাও একটা যেত!

কেউ জিজ্ঞেস করলে বলত, "এসপ্ল্যানেড যাচ্ছি।" মেরিল তখন সবে স্কুল থেকে ফিরেছে। বাড়িতে ঢুকলেই টোবি ঝাঁপিয়ে পড়ত তার উপর। টোবির সঙ্গে খেলতে খেলতে সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবত একদিন বড় হয়ে সে-ও একটা বাজলে নরম শাড়ি আর সাদা স্লিভলেস ব্লাউজ পরে, ঘাড়ে পাউডার লাগিয়ে এসপ্ল্যানেড যাবেই। যদিও এখন, প্রায় মধ্যবয়সে পৌঁছে সে আবিষ্কার করেছে এই, ঠিক এই দুপুরগুলো তার সবচেয়ে ভাল লাগে দিল্লির ইন্দিরা গাঁধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে, টারম্যাকের দিকে মুখ করে বসে থাকতে। কাচের ওপারে প্লেনের ওঠা নামা, হ্যাংগারে শান্ত অতিকায় ধাতব পাখির দাঁড়িয়ে থাকা, লাগেজ লোডিং, আনলোডিং, ক্যাটারিংয়ের গাড়িগুলোর লম্বা হয়ে প্লেনের দরজা অবধি উঠে যাওয়া, ট্যাঙ্কার থেকে তেল ভরা, আবার প্লেনের নেমে আসা ও উড়ে যাওয়ার মাঝখানে ওয়াকি-টকি হাতে ইউনিফর্ম পরা চরম ব্যস্ত মানুষ! আর কাচের এদিকে একটা কফি শপের উঁচু টুলে বসে থাকা সে, মেরিল। এই জুলাই মাসে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার শরীরে ছেঁড়া ছেঁড়া কাঁপন ধরে। কেমন মেঘ করে, চলে যায়। প্রতিটা আকাশের কোণে লেগে থাকে একটা করে সজীব, সবুজ বোগেনভেলিয়ার ডাল, যার যাবতীয় ফুলের রং টকটকে লাল। এয়ারপোর্টে যত ভিড়, তত বিচ্ছিন্ন লাগে তার। সে কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে বসে থাকতে চায়। তার ভিতর দিয়ে কেউ কফির কাপ এগিয়ে ধরে, কেউ তুলে নেয়। কেউ ট্রলি ব্যাগ পাশে রেখে বসে পড়ে তারই ওপর। বড় করে মুখ খুলে নিঃশ্বাস ছাড়ে। সে গন্ধ পায় জিভনশি'র। সিগারেটের। শার্টের হাতার সঙ্গে টেবিলের ঠান্ডা পাথরের ঘষা লাগার শব্দ পায় স্পষ্ট। পাশেই ফোনে কথা বলতে বলতে এসে বসে পড়ে একটা মেয়ে। এক কাপ কফি আর একটা ক্রসা-র অর্ডার দিয়ে

হোটেলের জানলার মেয়েটাকে সে ভেবেছিল এয়ারহোস্টেস। এখন এই মেয়েটা কে? কী করে? কেন ভরদুপুরে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে?



মেয়েটাকেও সে দেখতে পায়, তার কথা শুনতে পায় আতঙ্কিত হয়ে কথা বলে দম ফেলে। মেরিলও সারাদি ব্যস্ত। তার মন নিয়ে। তার মন শুধু অন্তহীন ভাবে এক থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে চায়। এমনকী তার এ অন্তহীন চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একের পর এ টানেল তৈরি করে সে এক জায়গায় যেতে যেতে আর জায়গায় চলে যেতে পারে, যায়ও। হয়তো তেমন ভা সেখানে পৌঁছতে চায় না। তার পৌঁছনোর জন্য শেষ কোন চিহ্নের প্রয়োজন আর পড়ে থাকে না। জায়গাই জায়গা নয় যাওয়ার, মেরিল সেটা জানে। কিন্তু সে য জায়গায় যেতে চায় তার মধ্যে কেন এয়ারপোর্টগুলো বেশি হাতছানি দেয় তাকে? এই দুপুর একটার আগে ইন্দিরা গাঁধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। কিন্তু সেটা র হলে? রাত দু'টো হলে তার সব সময় গিয়ে বসতে ই দুবাই, আবু ধাবির মত এয়ারপোর্টগুলোয়। রাত দশট মুম্বই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। রাত বারোটা হলে ঠিক কী হয় বুকের ভিতর, যখন সে একা বসে থাকে গভীর রাতে কোন ভিনদেশি এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে? ব তার মনের অবস্থা ট্রানজিটে অপেক্ষ করতে? দূরে রানওয়েতে নেমে আ বিমানের গায়ের আলো জ্বলা আর দেখে দেখে সে কীভাবে বুঝে যায় বোয়িং ৭৩৭? কোনটা ৭৪৭? ৯/১ প্লেনগুলো হাইজ্যাকড হয়েছিল, সে ৭৬৭? এয়ারপোর্ট তার সমস্ত শরী খঞ্জনি বাজায়, সেই খঞ্জনির ছনছন সঙ্গে তার ভিতরের ট্রানজিস্টারে ব থাকা এরোস্মিথের 'ড্রিম অন' মিে কেমন ঝিম ধরে আসে। ঝুঁকে আসে আসলে তার পাসপোর্ট, তার ভিসা বোর্ডিং কার্ড সবই ট্রানজিট থেকে ঘুরে বেড়ানোর ছাড়পত্র। এই এখন মেক-আপ শেষ করে সে পোশাক কোনদিনই সে ঠিক করে উঠতে পা কেমন পোশাক পরবে। আজও তা কোথায় যেতে ইচ্ছে হবে কখন কে জানে!

তার আয়নায় ঘুরে ফিরে তৈরি হয় আয়ার প্রতিবিম্ব, "বেবিজি, দেবকী ম্যাডাম ফোন করেছেন আমাকে, আ ফোন কি অফ? আপনাকে ফোনে পাচ্ছেন না উনি।" সে নিজের গোলাপি ফোনের খোঁজে চারপাশে তাকা বলছে?" কোনও মানুষ তাকে আর খোঁজে না। কিন্তু কেমন লাগে সেটা মেরিল জানে।

"উয়ো লোগ সুইমিং করনে জা রহে হ্যায়। আপকো য কি নেহি পুছা!" আয়া তার সুইমিং কিট বের করতে চ কাবার্ড থেকে। যেন সে যাবেই।

অমনি মেরিল জলে ডুবে যায়। কত জল। পায়ের তল ফুট জল। সে দেখে সে, দেবকী, মিঠি, বিশাখা, কাজ সবাই মিলে সাঁতারে মগ্ন। জল ফেনায় ফেনায় ভরে ফেটে যাচ্ছে অযুত কোটি বুদ্বুদ হয়ে। তখন মাথার ও খোলা আকাশ কেমন বর্ণহীন। দু'টো চিল পরস্পরকে

পারে। কিন্তু ঠিক তখনই মেরিলের চোখ পড়ে ধূসর আকাশের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা বহুতল হোটেলটার দিকে। অনেক উঁচু একটা তলায়, জানলার ভারী পর্দা সরিয়ে কেউ দিগন্তের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে, কাচের জানলার উপর ঠেসে ধরে আছে শরীরটাকে। একটা মেয়ে। সাদা শর্টস আর সাদা টপ পরে আছে মেয়েটা। সব আলোগুলো জ্বলছে রুমটার ভিতর। নড়ছে না মেয়েটা। অনেক কথা মনে পড়ে যায় মেরিলের। এইরকম একটা মেঘলা দুপুরে, ধোঁয়া ধোঁয়া নিস্তব্ধতার ভিতর এরকম একটা হোটেলের কাচের জানলা থেকে সে-ও তো দূরের দিকে আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে থাকতে চেয়েছিল। মেরিলের মনে পড়ে গেল মেরিন ড্রাইভ, উলটো দিকে পাঁচতারা। একটা মেয়েকে পাথরের মূর্তির মতো হোটেলটার কাচের জানলার সামনে ঠিক এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল মেরিল। এরও অনেক বছর আগে মেরিন ড্রাইভেই 'মঞ্জিল' নামক একটা অতি পুরনো গেস্ট হাউসের খড়খড়ি, চিক, ক্যানপি দিয়ে সাজানো একটা জানলায় সে একটা মেয়েকে এরকম স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভেবে নিয়েছিল মেয়েটা আসলে বন্দি। জিজ্ঞেস করেছিল ইশারায়, "তুমি কি বন্দিনী?" মেয়েটা বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল। একটা অদ্ভুত নাচের মুদ্রা করে বলেছিল বন্দিনী না, শুধু অন্যের হাতের পুতুল। বারবার সে যে গল্প তৈরি করে তাতে নিজেকে ফিট-ইন করা সম্ভব হলে তার সমস্ত আত্মা একটা জলের মতো বয়ে বয়ে গিয়ে ঢুকে পড়তে চায় সেই গল্পে। হোটেলের জানলার মেয়েটাকে সে ভেবেছিল এয়ারহোস্টেস। এখন এই মেয়েটা কে? কী করে? কেন ভরদুপুরে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে? মেরিল জলের মধ্যে থেকে হাত নাড়তে চায়। একবার ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় হোটেলের অনেক উঁচু তলার কোন ঘরের কাঁচের জানলা জুড়ে।

আয়া তার ফোন খুঁজে এনে দিয়ে বলে, "আপ ফিরসে মেকআপ কর রহি হ্যায়? বেনিজি, সাঁতার কাটবেন বললেন যে?" মেরিল দেখল চোখের পাতার উপর ছাই ছাই আইশ্যাডো, ঘন কাজল আর মাস্কারা লাগানোর পর তার চোখটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে। সে আয়াকে বলল,

"যেতে যখন হবে বেনিজি, তব কঁহি ভি চলে যাইয়ে। ওই যে জামুন রংয়ের শাড়ি আছে না, মুকাইশ কাজ করা? হালকা সা জরি? খুব ফিনফিনে? ওরকম ফিনফিনে শাড়ি আমি আর একটা দেখেছিলাম একবার। সির্ফ একবার। তখন আমার দাদা-দাদি দু'জনেই তাজমহল সাফ করত রাতের বেলা। পানি সে ধুতো। সে অনেক আগের কথা বেনিজি। এক পূর্ণিমার রাতে দু'জন আদমি অওরত এল। দোনো হি দেখনে লায়েক। সবে ধুয়ে দেওয়া পাথরের বেদীর ওপর বসল। তখন দেখলাম, ওহ্ পতলি সি শাড়ি। য্যায়সে হাওয়া পেহনি হো। চাঁদনি রাত তো কী? রাত তো! কিন্তু ওই অওরতের সাদা মাখনের মতো নরম শরীর পুরো দেখা যাচ্ছিল শাড়ির ভেতর থেকে।"

আয়া লোহার টুলটা টেনে এনে বসে পড়ল তার পায়ের কাছে," এক আদমি এক অওরত কে লিয়ে ইতনা পাগল হো যাতা হ্যায়? সে কী প্রেম। একবার তাজমহল দেখে, একবার মেয়েটাকে দেখে।" আয়া গালে হাত দিয়ে নিজের কথায় নিজেই অবাক হয়ে গেল যেন। শুনতে শুনতে গাঁয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মেরিলের। তার চোখের সামনের কুয়াশা কুয়াশা দুপুর সরে গিয়ে অনায়াসে নেমে এল রাত। মেরিল কোন কথাই বলতে পারল না। অনেক আর্তি নিয়ে সে তাকিয়ে থাকল আয়ার দিকে। আয়া বলল, "চলে জাইয়ে। কিসিকে সাথ চলে জাইয়ে।"

মেরিল চলে গেল জ্যোৎস্নায় ভিজে দাঁড়িয়ে থাকা তাজমহল দেখতে, টিকিটের দাম মোটে পাঁচশো। এরকম করে কত জায়গায় চলে যাচ্ছে সে যখনই যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এরকম চলে যায় বলেই তো পৃথিবীর এত এত এয়ারপোর্টের সঙ্গে তার এমন নিবিড় সম্পর্ক, এত এত ট্রানজিটের চলন্ত বিছানায় তার মায়াবি জাগরণের স্মৃতি। অজস্র ঘুম ঘুম মানুষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়ার স্মৃতি।

এসবের মধ্যেই সে জানতে পারল মিসেস স্ক্রুওয়ালা আবার বিরাট একটা পার্টি দিচ্ছেন। লোকে করে বলছে, কামব্যাক পার্টি। আগে তো স্ক্রুওয়ালারা প্রায়ই পার্টি থ্রো করতেন। মেরিলকে বলতেন, "তুমি না এলে কিন্তু হবে না!" দিনে দিনে মেরিলের শরীর আরও

জ্বালা ভাব। ওষুধের প্রকোপে
এখন কোনও দিকে অনেকক্ষণ
তাকিয়ে থাকলে চোখ দিয়ে জ
থাকে। অন্তহীন ভ্রমণে অলি গ
জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যায়। মনে
বন্ধ করে না রাখলে মাথা ঘো
সে কান দিয়ে ভ্রমণ করতে চে
কিংবা স্পর্শ দিয়ে। অন্ধকার জ
ঘুরতে যায়। মেকআপ লাগে ন
সে শুকনো পাতার শব্দ পায়।
পচা পাতায় পা ডুবে গেলে হ
ঝিলের পাশে ফুটে থাকা মিনি
হিপ্পি, ড্র্যাগার ফার্ন গায়ে হাত
দেয় তার। তার চোখের তারা
তবু সে বোঝে। গাছের গায়ে
থাকা পিলো মসের ভেতর আ
পড়া বিষাক্ত মাকড়সাকে দেখে
জন্মায় তার। এমন আশ্চর্যজন
মাঝে মাঝে টোবি এসে পড়ে।
চাটে। বলে বাড়ি চলো। টোবি
গন্ধ, লালার গন্ধ তার স্মৃতি থে
ধোঁয়া হয়ে বেরোয়। এত এত
সে আয়াকে ডেকে সামনের ব
কুকুরটার কথা জিজ্ঞেস করে,
রোজ এই সময় কাঁদে কেন অ
"এই সময় মনিবরা কেউ থাকে
ম্যাডাম। সারভেন্ট লোগ পুরে
মেশিন চালিয়ে সাফ করে, শে
তাই ওকে বাগানে বের করে
ও কাঁদে।" বলে আয়া।
একদিন সে খবর পায় কুকি আ
করেছে। কুকি, প্রিয় বান্ধবী। ত
মেরিল একদম বিছানায় শোও
ছাড়াও তার জন্য তখন স্পেশ
ট্রেনড দু-দু'টো নার্স। তখন ত
সব সময় ধরা থাকে একটা রা
পুতুল। যেটা তাকে গিফট কর
কোনও ডিজাইনার বন্ধু। অবি
মতো পুতুলটা। তার পছন্দের
শাড়ি আর মুক্তোর গয়না পরা
সুইসাইডের খবর পাওয়ার প
জীবনে প্রথমবার মর্গ ভ্রমণে য
মেরিলের শরীর এরপর জীবন্ত
গলে যেতে থাকে। মৃত্যুর আগে
সেই গলে যাওয়া টের পায় মে
তখন দৃশ্য নেই, শব্দ নেই, গন্ধ
গলে যাওয়ার মধ্যেও যে একটা
আছে, একটা পরিক্রমা আছে
যেন বুঝতে পারে মেরিল।

অলংকরণ: বৈশালী সরকার



কলকাতার ‘মেঘমুলুক’

সুকুমার রায়ের কবিতা থেকে ধার করে বাড়ির নাম দিয়েছেন ‘মেঘমুলুক’! সেখা
বোঝা যায়, গায়ক শ্রীকান্ত আচার্যর অন্দরমহল যেন শিল্পীর নিজস্ব সত্তারই এক

শিল্পীর বাড়ি। তাই, বাড়ির পরতে পরতে যে শিল্পসত্তার ছাপ থাকবে, তা নিশ্চিত। তবে সংগীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্যর বাড়ি শুধু শৈল্পিক নান্দনিকতায় মোড়া নয়। বরং, এর চারদিকে এক অলিখিত আন্তরিকতা রয়েছে। বাড়ির নাম ‘মেঘমুলুক’। দক্ষিণ কলকাতার নিউ গড়িয়া অঞ্চলে এক পরিবেশ-বান্ধব আস্তানা। ভিতরে ঢুকলেই বোঝা যায়, কী পরম যত্নে, আদরে সাধের বাড়িটিকে সাজিয়েছেন শ্রীকান্ত। বেশ ক'বছর আগে সেলিমপুরে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি সকলকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতেন। কিন্তু তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল এ
যেখানে তাঁরা সবাই
পারবেন। একটা সম
পাকাপাকিভাবে থা
তিনি। কিন্তু সেটা অ
সুরকার বন্ধু দেবজে
জমি কিনে বাড়ি ক

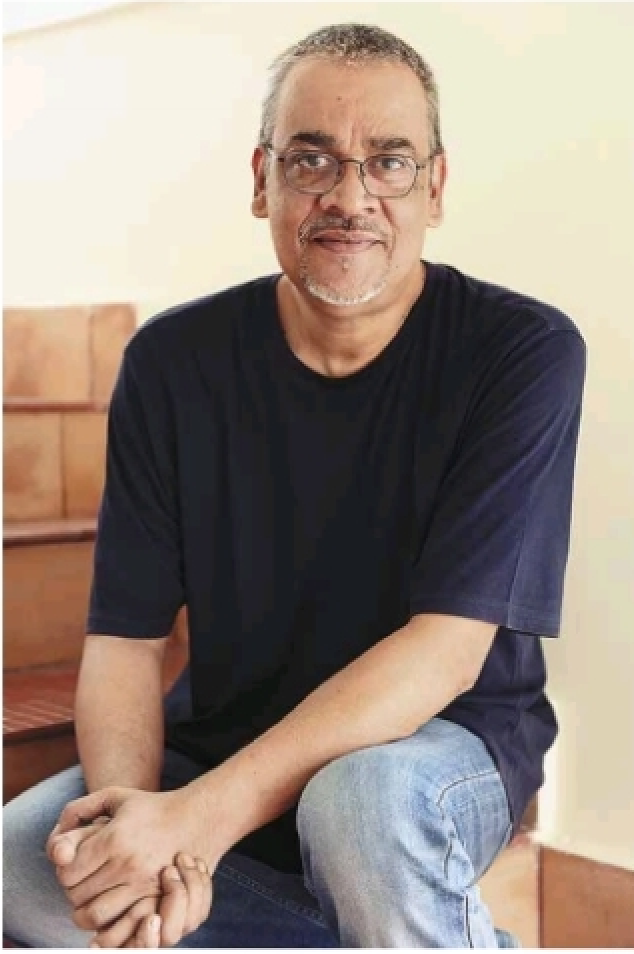


তিনতলায় গানের ঘর

আর এক বন্ধু পরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে জমি খুঁজতে হাজির হন এই অঞ্চলে। ''জমি তো কিনলাম। কিন্তু বাড়িটা করবে কে! একদিন এক বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিতে দিতে ইন্টিরিয়র ডিজাইনিংয়ের একটা ম্যাগাজিন চোখে পড়ে। উলটোতে গিয়ে দেখলাম স্থপতি চিত্রা বিশ্বনাথের লেখা। পরিবেশবান্ধব বাড়ি বানানোর জন্য উনি সুখ্যাত। বাড়ি ফিরে আমি ও আমার স্ত্রী (অর্ণা শীল) ওঁকে ফোন করলাম। ভণিতা না করে সরাসরি বললাম, 'আমরা একটা জমি কিনেছি। তুমি কি বাড়ি বানিয়ে দেবে?' উনি একেবারে অন্য ঘরানার মানুষ। এক মাস পরে বেঙ্গালুরুতে আমি অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করি। ক্লায়েন্ট রেনওয়াটার হারভেস্টিং না করলে উনি তাঁর বাড়ি বানান না। ওঁর নিজের বাড়িতে কোনও ফ্যান নেই! এবং আমাদের অবাক করে উনি বললেন যে আমাদের বাড়ির ড্রয়িং নাকি উনি করে ফেলেছেন! এরপরে কলকাতায় এসে ওঁর সহায়তাতেই আমার বাড়ি তৈরি হয়,'' বাড়ি তৈরির নেপথ্য গল্প শোনালেন শ্রীকান্ত। ২০০৪ সাল থেকে এখানে আছেন। বাড়িতে বর্ষার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে। বাড়ির সিলিংয়ে মাটির সরা বসানো। মাটির সরা এখানে কংক্রিটের বিকল্প। দেওয়ালে



রয়েছে র‍্যাটট্র্যাপ বন্ডিং। অর্থাৎ অ
ইঞ্চির দেওয়ালের গাঁথনির মাঝে
দু'ইঞ্চি ছাড় দেওয়া। এ এক ধরনে
হিট-ইনসুলেশন পদ্ধতি। তাই, প্র
গরমেও বাড়ির ভিতরে এক
আরামদায়ক পরিবেশ
বজায় থাকে।
''সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ বি
হল আমা
গোটা বা
কোনও
পিলার নে
পুরনো দি
যেভাবে লো
বিয়ারিং ওয়া
সাহায্যে বাড়ি বা
হত, সেই পদ্ধতিতেই
বানানো এই বাড়ি,'' জানালেন তি
'মেঘমুলুক'-এর দরজা দিয়ে ভিত
ঢুকতেই চোখে পড়ে একদিকের ইঁ
দেওয়াল। দেওয়ালে পরম আদরে
শোভা পাচ্ছে 'পথের পাঁচালী'র





একতলার ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং



ছিমছাম অন্দরসাজ



সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই চোখে পড়ে সিনেমার পোস্টার

পোস্টার। জানা গেল তাঁর পোস্টার-কালেকশনের নেশার ব্যাপারে! বাড়িজুড়ে কোথাও 'অপরাজিত', কোথাও 'সোনার কেল্লা', কোথাও বা 'যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো।' একতলার ড্রয়িং-কাম-ডাইনিংয়ের মাঝে আর্চিংয়ের বিভাজন। আসবাব থেকে দেওয়াল, কোথাও চড়া রংয়ের আধিক্য নেই। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে গিয়েই দেখলাম, 'আরে, সিঁড়ির হাতলগুলো বাঁশের তৈরি!' উপরতলার ঘরের আসবাবেও বেত আর বাঁশের ব্যবহার করেছেন শ্রীকান্ত। সিঁড়ির নীচের জায়গাগুলোকেও যত্নের সঙ্গে সাজিয়েছেন। বিভিন্ন দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা নানা শিল্পকর্ম ঠাঁই পেয়েছে ঘরের বিভিন্ন কোণে। দোতলার বসার ঘরের দেওয়ালও একইরকম ইটরঙা। কাঠের দরজায় রঙিন কাচের প্যানেল আর এক কোণে সুবিশাল গ্রামোফোন এ ঘরের সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। মেঝেতে উডেন ফ্লোরিং। এই তলেই বাড়ির সদস্যদের থাকার ঘর। গল্প করতে করতে জানালেন, "মেয়ে ডবল মাস্টার্স করতে অস্ট্রিয়া চলে যাচ্ছে। ও পুরোপুরি অ্যাকাডেমিকসেই আছে। ছেলে এবার সেন্ট জেভিয়ার্সে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হল। ছেলের অভিনয় আর গান, দু'টোতেই উৎসাহ। গিটার ওর নেশা বলতে পারেন। আমার শাশুড়ি শান্তিনিকেতনের গরিব



দোতলার বসার ঘর



দেওয়ালজুড়ে উত্তমকুমার।





গানবাজনার শোপিস দিয়ে বাড়ি সাজানো

বাচ্চাদের নিয়ে স্কুল চালান। ওদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। জানেন, আমি সেই কবে থেকে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি! তবে এখন ওখানকার পরিবেশ একেবারে টানে না আমায়।" গোটা বাড়িতে সবচেয়ে মনোরম বোধহয় তিনতলার ঘরগুলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে শিল্পীর গানের ঘর। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেদার আড্ডাও চলে। শিল্পীর অজস্র পুরস্কার-সম্মান তো রয়েইছে, সঙ্গে ঘরের দেওয়ালজুড়ে তাঁর সংগীত-জীবনের কিছু মুহূর্তের ছবিও চোখে পড়ল। দেওয়ালের একদিকে আবার শুধুই উত্তমকুমার! উত্তমকুমারের জন্মদিন উপলক্ষে কোনও এক প্রদর্শনীতে বিক্রি

হচ্ছিল প্যানেলটা। ব্যস, ওমনি কিনে নি
এই ঘরের লাগোয়া স্টাডি রুম। সেখানে
নিজস্ব সময় কাটান শিল্পী। "নিজেকে অ
ব্যস্ত রাখি না। কিছু অবাঞ্ছিত লোকজন
এড়ানোর জন্য হয়তো ব্যস্ততার ভান ক
বই পড়ি, গান শুনি, এই ঘরটায় বসে ব
সঙ্গে আড্ডা মারি। মাঝে মাঝে বিকেলে
বেরিয়ে পড়ি রাধুবাবু-র দোকানে চা খে
বলে থামলেন তিনি। বেরনোর সময় ম
হল, নিজের স্বভাবের মতোই আন্তরিক
ঢেলে বাড়ি সাজিয়েছেন শ্রীকান্ত আচার্য

লেখা: মধুরিমা সিংহ রায়
ছবি: শুভদীপ ধর



পিচ-পারমেজ়ানে মাটন

শুধু বিরিয়ানি-কোর্মাই নয়, মাটন বা ল্যাম্ব দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন কন্টিনেন্টাল নানা পদও। রেসিপি দিলেন রণবীর ব্রার, সঞ্জীব কপূর ও শন কেনওয়ার্দি। প্ল্যাটার সাজালেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।



বালটি গোস্ত



রণবীর ব্রার

ধোঁয়া-ওঠা ঝোলের মাঝখানে, সোনালি আলুর সঙ্গে
কম্বিনেশনে। অথবা বিরিয়ানির সুগন্ধি চালের পরদার
মাঝে। মাংস, অর্থাৎ মাটনকে রোজকার পাতে এভাবে
পাই আমরা সাধারণত। এবার সেই ছক ভেঙে রইল মাটন এবং ল্যা
দিয়ে একগুচ্ছ অন্য স্বাদের রান্না। জামাইকান স্টু, ল্যাম্ব চপ থেকে
শেফার্ডস পাই— একটু এক্সপেরিমেন্ট করেই দেখুন না! কীভাবে রাঁ
বলে দেওয়ার জন্য নামী শেফরা তো রয়েছেনই!

রণবীর ব্রার

*লখনউয়ের ছেলে রণবীরের জীবনে খাবারটাই সবচেয়ে বড় প্যাশন। খাব
প্রতি ভালবাসা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে গোটা দুনিয়ার আনাচ-কা
নতুন-নতুন জায়গা এবং সংস্কৃতিকে চিনেছেন সেখানকার স্বাদের মাধ্যমে
ভারতের তাবড় শেফদের মধ্যে রণবীরের নাম উপরের সারিতেই। তিনটি
সানন্দাকে শেখালেন তিনি।*

মিটবল ট্যাজিন

উপকরণ: মিটবলের জন্য: মাটন কিমা ৭৫০ গ্রাম, রসুন পেস্ট ১
টেবল-চামচ, কুচোনো পার্সলেপাতা ১ টেবল-চামচ, নুন-গোলমরি
সসের জন্য: টোম্যাটো পিউরি ২ কাপ, রসুনকুচি ১ টেবল-চামচ, ম
সাইজ়ের পেঁয়াজ ১টা (কুচোনো), সেলেরি ১ চা-চামচ (কুচোনো),
ফ্লেক্স ১ চা-চামচ, অলিভ ৬-৭টা, নুন-গোলমরিচ, অলিভ অয়েল
পরিমাণমতো, স্টক ১/২ কাপ।

প্রণালী: মিটবলের সব উপকরণ একটা পাত্রে নিয়ে ভাল করে মেশা
ছোট ছোট বল পাকিয়ে রাখুন। একটা পাত্রে অলিভ অয়েল দিয়ে পেঁ
রসুন, সেলেরি আর চিলি ফ্লেক্স সতে করে নিন, যতক্ষণ না নরম,
হয়ে আসে। টোম্যাটো পিউরি দিন। দু'মিনিট রাঁধুন। স্টকটা মিশিয়ে
এবার মিটবলগুলো দিয়ে দিন, অলিভও দিন। ঢাকা দিয়ে ২০-২৫ মি
রাঁধুন। নামিয়ে পরিবেশন করুন।

বালটি গোস্ত

উপকরণ: মাটন ১ কেজি, মাঝারি সাইজ়ের পেঁয়াজ ২টো (কুচোনো
আদা-রসুনবাটা ১ টেবল-চামচ, টোম্যাটো ৫টা (কুচোনো), হলুদগুঁ
১/২ চা-চামচ, ঘি ১ টেবল-চামচ, কালোজিরে ১/২ চা-চামচ, গুঁড়ো
গোলমরিচ ১ টেবল-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ টেবল-চামচ, কাঁচালঙ্কা ২
ধনেপাতা সামান্য।

প্রণালী: কড়াইয়ে ঘি গরম করে জিরে আর আদা-রসুনবাটা দিয়ে
নেড়েচেড়ে মাটনটা দিন। টোম্যাটো দিন। তেল ছেড়ে না আসা অবধি

সতে করতে থাকুন। জল দিন আন্দাজমতো। মাংসটা রান্না হয়ে এসেছে বুঝলে কাঁচালঙ্কা আর ধনেগুঁড়ো দিয়ে দিন। পরিবেশন করার আগে উপরে ধনেপাতা ছড়িয়ে দেবেন।

মিটবল স্প্যাগেটি

উপকরণ: মিটবলের জন্য: মাটন কিমা ৫০০ গ্রাম, ডিম ১টা, পারমেজান চিজ় $^1/_2$ কাপ, ব্রেডক্রাম্ব $^1/_2$ কাপ, রসুন ২ কোয়া (থেঁতো করা), ফ্রেশ অরিগ্যানো ২ চা-চামচ, অলিভ অয়েল ২ টেবল-চামচ, নুন। সসের জন্য: টোম্যাটো পিউরি $^1/_2$ কাপ, মাঝারি সাইজ়ের পেঁয়াজ ১টা (অর্ধেক করে কাটা), রসুন ২ কোয়া, অলিভ অয়েল ২ টেবল-চামচ, ড্রায়েড অরিগ্যানো ১ চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স $^1/_2$ চা-চামচ, নুন। এ ছাড়া সেদ্ধ করা স্প্যাগেটি ৫০০ গ্রাম।

প্রণালী: একটা পাত্রে মাটন কিমা নিন। এতে মেশান ডিম, চিজ়, ব্রেডক্রাম্ব, রসুন, অরিগ্যানো আর নুন। মিশ্রণটা দিয়ে বল গড়ে নিন। প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে মিটবলগুলো বাদামি করে রেঁধে নিন। সসটা বানান এবার। প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে টোম্যাটো পিউরি, পেঁয়াজ, রসুন, অরিগ্যানো আর চিলি ফ্লেক্স দিন। মাঝারি আঁচে ফুটতে দিন। বুদবুদ উঠতে শুরু করলে আঁচ কমিয়ে রাখুন, যতক্ষণ না টোম্যাটো থেকে তেল ছেড়ে আসে। মাঝে মাঝে নেড়ে দেবেন। হয়ে গেলে পাত্রটা আঁচ থেকে নামিয়ে পেঁয়াজটা ফেলে দিন। রসুনের কোয়াগুলো পাত্রের ভিতরেই ফর্ক দিয়ে একটু থেঁতো করে ভাল করে মিশিয়ে দিন সসের সঙ্গে। নুন দিন। ভাল করে মিশিয়ে নিন একবার। মিটবলগুলো সসে দিয়ে ২-৩ মিনিট টস করে নিন। বয়েল্ড স্প্যাগেটির উপর মিটবল আর সস দিয়ে সাজিয়ে, ধনেপাতা ছড়িয়ে খেতে দিন।



মিটবল স্প্যাগেটি



জামাইকান স্টাইল ল্যাম্ব স্টু



মিটবল ট্যাজিন

সঞ্জীব কপূর

কুকারি শো'এর মাধ্যমে প্রথম আট থেকে আশির ড্রইংরুমে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন সঞ্জীব কপূর। শেফ, শো-হোস্ট, রেস্টুরেন্ট কনসালট্যান্ট, একাধিক রান্নার বইয়ের রচয়িতা— সব পালকই জুড়েছে তাঁর মুকুটে। ২০১৭ সালে ৯১৮ কেজি খিচুড়ি বানিয়ে সৃষ্টি করেন গিনেস ওয়র্ল্ড রেকর্ড। সঞ্জীব কপূরের হাতে তৈরি



রেসিপি রইল সানন্দার পাঠকদের জন্য।

জামাইকান স্টাইল ল্যাম্ব স্টু

উপকরণ: ল্যাম্ব শ্যাঙ্ক ৭-৮টা (হাড়সমেত ২ ইঞ্চি টুকরো করে কাটা), নুন, কাবাবচিনি ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ২ চা-চামচ, কারি পাউডার ২ চা-চামচ, জিঞ্জার পাউডার ২ চা-চামচ, লাল লঙ্কাগুঁড়ো $1\frac{1}{2}$ চা-চামচ, তেল ৪ টেবল-চামচ, মাঝারি সাইজের স্লাইস করা পেঁয়াজ ২টো, রসুনকুচি ২ চা-চামচ, আদাকুচি ২ চা-চামচ, টোম্যাটো পিউরি $\frac{3}{4}$ কাপ, চিকেন স্টক ৩ কাপ, দারচিনি ২ ইঞ্চির টুকরো, থাইম ২-৩ গুছি, মাঝারি সাইজের আলু ২টো (১ ইঞ্চি টুকরো করে কাটা), মাঝারি সাইজের গাজর ২টো (১ ইঞ্চি টুকরো করে কাটা), হার্বড রাইস, ধনেপাতা।



সঞ্জীব কপুর

প্রণালী: একটা পাত্রে ল্যাম্ব শ্যাঙ্ক নিন। তাতে ছড়িয়ে দিন নুন, কাবাবচিনি, জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, কারি পাউডার, আদা পাউডার আর লাল লঙ্কাগুঁড়ো। ভাল করে মিশিয়ে নিন। আধঘণ্টা রেখে আভেন প্রি-হিট করে নিন ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এ ডিপ আভেনপ্রুফ প্যানে তেল গরম করে ল্যাম্ব দিন। চড়া আঁ সতে করুন, যতক্ষণ না বাদামি রং ধরে। নামিয়ে রে দিন। একই প্যানে পেঁয়াজগুলো সতে করুন। আদা আর রসুন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। পেঁয়াজ নরম না হওয়া অবধি রাঁধতে থাকুন। টোম্যাটো পিউরি মিশিয়ে মিনিটদুয়েক রাঁধুন। ল্যা শ্যাঙ্কগুলো ওই পাত্রে দিয়ে ভা করে মিশিয়ে নিন সবটা। চিকে স্টক মেশান। নুন দিন স্বাদমতে দারচিনির টুকরোটা দিয়ে দিন। থাইম মিশিয়ে ফুটতে দিন। ঢা দিয়ে আভেনে দিন ৪০ মিনিট। বের করে আলু আর গাজর দিয়ে সবটা আবার ভাল করে মিশিয়ে নি এবার ঢাকা ছাড়াই আভেনে দিন ২৫ মিনিটের জন্য। সার্ভিং ডিশে রেখে উপরে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন। হার্বড রাইসের সঙ্গে এ ল্যাম্ব স্টু খেলে ভুলতে পারবেন না!

রোস্টেড লেগ অফ ল্যাম্ব উইথ গার্লিক অ্যান্ড রোজ

উপকরণ: ল্যাম্ব লেগ ১টা, লেবুর রস $\frac{1}{4}$ কাপ, টাটকা রোজমেরি পাতা ৩ টেবল-চামচ (কুচোনো), নুন, গুঁড়ো করা



শেফার্ড'স পাই



রোস্টেড লেগ অফ ল্যাম্ব উইথ
গার্লিক অ্যান্ড রোজমেরি

গোলমরিচ, থেঁতো করা রসুন ৮ কোয়া, অলিভ অয়েল ২ টেবিল-চামচ, গাজর ২টো (টুকরো করা), সেলেরি ২ আঁটি (কুচোনো), পেঁয়াজ ২টো (কুচোনো)।

প্রণালী: ২৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আভেন প্রি-হিট করে রাখুন। একটা পাত্রে লেবুর রস, রোজমেরি পাতা, নুন আর গোলমরিচ মিশিয়ে নিন। ছুরি দিয়ে মাংসের গায়ে চিরে গর্তগুলোয় থেঁতো রসুন ঢুকিয়ে দিন। লেবুর রস-রোজমেরি পাতার মিশ্রণটা মাংসের গায়ে মাখান। অলিভ অয়েল লাগিয়ে নিন। একটা রোস্টিং প্যানের গায়ে তেল মাখিয়ে পেঁয়াজ, সেলেরি আর গাজরের টুকরোগুলো প্যানে দিন। মাংসটা দিন। আভেনে প্যানটা দিয়ে রোস্ট করুন ১০ মিনিট। উলটে দিন। আবার ১০ মিনিট রোস্ট করুন। এবার আভেনের তাপমাত্রা কমিয়ে ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস করুন। ল্যাম্বটা রান্না করুন যতক্ষণ না হালকা গোলাপি রং ধরছে। ফয়েলে মুড়ে স্লাইস করুন পরিবেশনের জন্য।

শেফার্ড'স পাই

উপকরণ: মিন্স করা মাটন ৩০০ গ্রাম, ম্যাশড পটেটো প্রয়োজনমতো, তেল ২ টেবল-চামচ, মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ ১টা (কুচোনো), রসুন ৮-১০ কোয়া (কুচোনো), আদা ১ ইঞ্চির টুকরো (কুচোনো), সেলেরি ২ টেবল-চামচ (কুচোনো), মাঝারি সাইজের টোম্যাটো ১টা (কুচোনো), টোম্যাটো পিউরি ১ কাপ, মাঝারি সাইজের গাজর ২টো (কিউব করে কাটা), নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, শুকনো অরিগ্যানো ১ চা-চামচ, উরসেস্টারশায়ার সস দেড় চা-চামচ, ফ্রোজেন কড়াইশুঁটি ১/২ কাপ, সেদ্ধ করা সুইট কর্ন আধ কাপ, পার্সলেপাতার গুছি।

প্রণালী: ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আভেন প্রি-হিট করে রাখুন। একটা তলা-ভারী পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ সতে করে নিন মিনিটদুয়েক। আদা আর রসুন মিশিয়ে নিন ভাল করে। মাংসটা দিন এবার। চড়া আঁচে ২-৩ মিনিট সতে করুন। সেলেরি আর টোম্যাটো মিশিয়ে নিন। টোম্যাটো পিউরি দিয়ে নেড়ে নিন একবার। গাজরটা দিন তারপর। নুন, গোলমরিচ, অরিগ্যানো আর উরসেস্টারশায়ার সস মেশান। ঢাকা দিয়ে রান্না হতে দিন। এবার দিন কড়াইশুঁটি আর সুইট কর্ন। আবার মিশিয়ে নিন। মিনিটদুয়েক রেঁধে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। মিশ্রণটা একটা অগভীর বেকিং ডিশে দিয়ে উপরটা ম্যাশড পটেটো দিয়ে ঢেকে দিন। ১৫-২০ মিনিট বেক করুন। পার্সলেপাতা দিয়ে সাজিয়ে খেতে দেবেন।

শন কেনওয়ার্দি

লন্ডনের কিছু বাছাই রেস্তরাঁয় শুরু হয়েছিল শনের কেরিয়ার। ভারতে নিয়ে আসেন ইউরোপীয় রান্নার টেকনিক এবং ট্র্যাডিশন। হোটেল-রেস্তরাঁ থেকে ক্যাফে-কনফেকশনারি— সর্বত্র সৃষ্টি করেছেন নতুন স্বাদ। সেই স্বাদ তিনি ভাগ করে নিলেন সানন্দার সঙ্গে।

রিয়্যাল সেক্সি ল্যাম্ব বার্গার

উপকরণ: ল্যাম্ব কিমা ৪৫০ গ্রাম, ল্যাম্ব ফ্যাট কিমা ১৫০ গ্রাম, রোজমেরি ১ চা-চামচ, গার্লিক পাউডার ১ চা-চামচ, অনিয়ন পাউডার ১ চা-চামচ, কাঁচা পেঁপে বাটা ২ চা-চামচ, মাস্টার্ড ১/২ চা-চামচ, টাবাস্কো সস এবং উরসেস্টারশায়ার সস আন্দাজমতো, পাউরুটির গুঁড়ো ২০ গ্রাম, নুন-গোলমরিচ।

প্রণালী: একটা পাত্রে ল্যাম্ব আর ল্যাম্ব ফ্যাট নিন। এতে মেশান রোজমেরি, গার্লিক পাউডার, অনিয়ন পাউডার, কাঁচা পেঁপে বাটা, দু'রকম সস, পাউরুটির গুঁড়ো। নুন আর গোলমরিচ দিয়ে


শন কেনওয়ার্দি


রিয়্যাল সেক্সি ল্যাম্ব বার্গার

মেখে নিন সবটা। মিশ্রণটাকে ৪ ভাগে ভাগ করে প্যাটির আকারে গড়ে নিন। ট্রে-তে প্যাটিগুলো ঢাকা দিয়ে ফ্রিজে রাখুন অন্তত ৮ ঘণ্টা। নন-স্টিক প্যানে অল্প তেল দিয়ে সোনালি-বাদামি করে ভেজে প্যাটিগুলো বার্গার বানে ভরে নিন।

ল্যাম্ব কোফতা

উপকরণ: তিনবার মিন্স করা ল্যাম্ব ৪০০ গ্রাম (অল্প ফ্যাট সমেত), রসুন ৪ কোয়া (কুচোনো), ছোটো পেঁয়াজ ১টা (কুচোনো), পুদিনাপাতা-পার্সলেপাতা কুচি ১ মুঠো, দারচিনি গুঁড়ো $^1/_2$ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, প্যাপরিকা ১ চা-চামচ (না হলে কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো), নুন।
প্রণালী: সব উপকরণ ভাল করে মিশিয়ে নিন। ফ্রিজে রেখে দিন ঘণ্টাখানেক। কোফতার আকারে গড়ে নিন। স্কিউয়ারে গেঁথে বেশি আঁচে গ্রিল করে নিন ৬ থেকে ৮ মিনিট। লেমন ওয়েজ দিয়ে সাজিয়ে স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশন করুন।


ল্যাম্ব কোফতা

ল্যাম্ব চপ্‌স উইথ পিচি বালসামিক গ্লেজ

উপকরণ: নিউজিল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ান ল্যাম্ব চপ ১২টা, আধখানা করে কাটা পিচ ২টো, ব্রাউন সুগার ২ টেবল-চামচ, বালসামিক ভিনিগার ২ টেবল-চামচ, আদাকুচি সামান্য, রসুন ৪ কোয়া, লবঙ্গ ৪টে, স্টার অ্যানিস ২টো, নুন-গোলমরিচ।
প্রণালী: ল্যাম্ব চপ বাদে বাকি সব উপকরণ ব্লেন্ডারে ভাল করে মিশিয়ে নিন। একটা পাত্রে মিশ্রণটা ঢেলে নিয়ে ল্যাম্ব চপগুলো তাতে দিন। চামচ দিয়ে নেড়ে নিন, যাতে চপগুলোর দু'ধারে মিশ্রণটা লেগে যায়। পাত্রটা ঢাকা দিয়ে সারারাত ফ্রিজে রেখে দিন। পরদিন ম্যারিনেড থেকে তুলে নিন চপগুলো। একটা সসপ্যানে ম্যারিনেড ঢেলে ১৫-২০ মিনিট রান্না করুন, যাতে গ্লেজের মতো দেখায় মিশ্রণটা। ননস্টিক প্যানে চপগুলো দিয়ে ঢিমে আঁচে ৩-৪ মিনিট রান্না করুন চপের দু'টো দিকই। চামচ দিয়ে গ্লেজটা ছড়িয়ে দিন উপরে।
তাহলে পুজোয় বাঙালি রান্নাঘরে মাটনের কন্টিনেন্টাল পদ দিয়ে ভোজ হয়ে যাক!

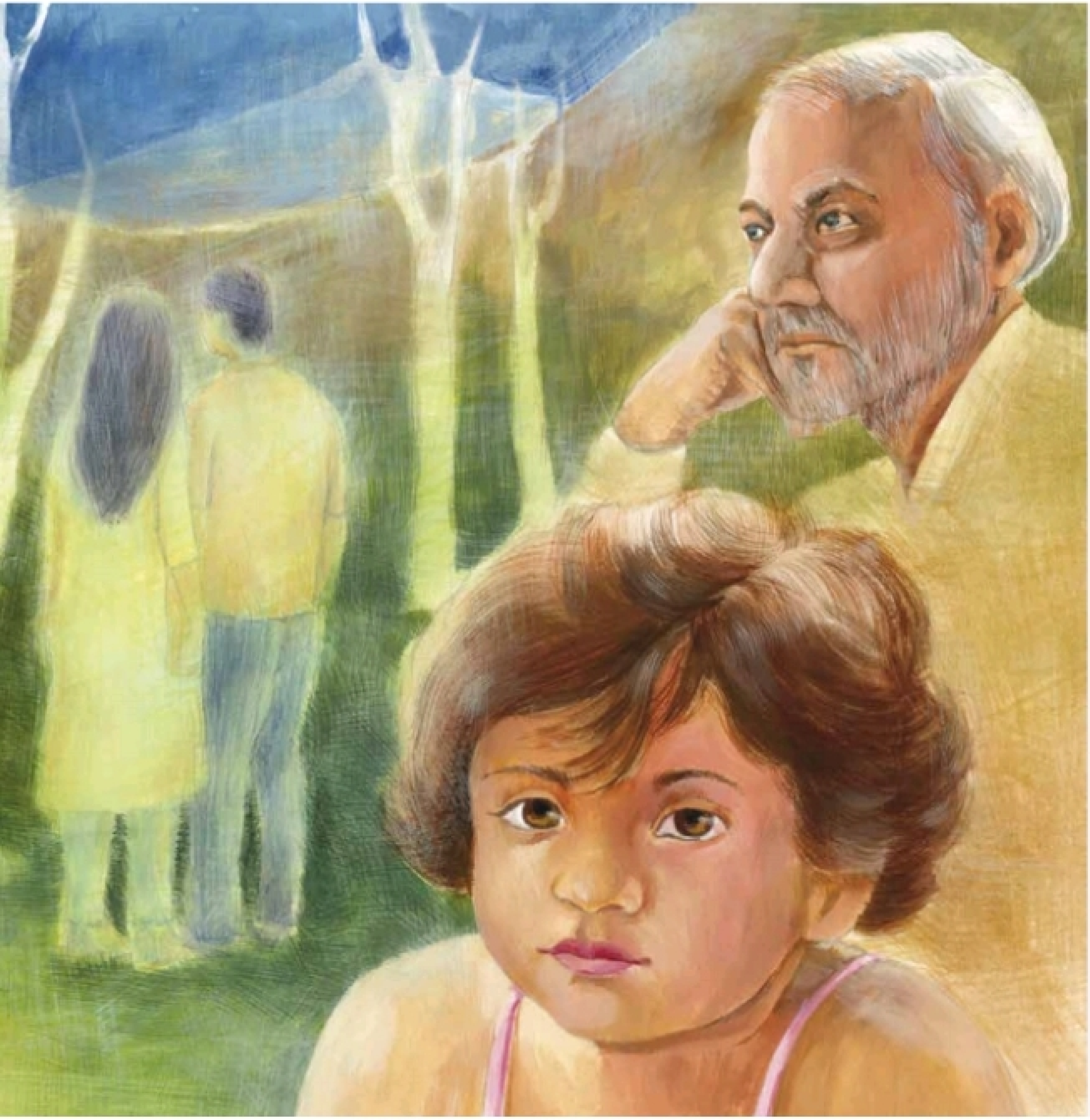

ল্যাম্ব চপ্‌স উইথ পিচি বালসামিক গ্লেজ



স্বাতী নক্ষত্রের আলো

রাজশ্রী বসু অধিকারী

ভরা দুপুরের রোদভাসা আকাশটা কি হঠাৎ অকাল শ্রাবণমেঘে ছেয়ে গেল? নাকি চোখের সাদা জমি বেয়ে কালো পরদায় ঢাকা পড়ে গেল পৃথিবীটা? সামনের করিডোরভর্তি অজস্র বিচারপ্রার্থী মানুষ, কালো-কালো পোশাক পরা অসংখ্য উকিলবাবুর ব্যস্ত পদ-সঞ্চালন, বিশাল আদালতের ঘরগুলো আলো করে বসে থাকা ন্যায়ের প্রতীক মানুষগুলো... সবকিছু মুহূর্তে যেন অদৃশ্য হয়ে যায় স্বাতীর চোখের সামনে থেকে। শুধু একটাই দৃশ্য জুড়ে আছে মন। ধীরে-ধীরে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে প্রেমাংশু। ওর খাদির পঞ্জাবি আর সাদা ধুতির রেশ মুছে যাচ্ছে স্বাতীর চোখ থেকে। অনেকটা দূর থেকেও নজরে পড়ার মতো উঁচু মাথাটা আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একটু-একটু করে স্বাতীর সামনে থেকে মুছে গেল প্রেমাংশু। পৃথিবী শূন্য করে গেল যেন! অবশ হয়ে পড়ে যেতে-যেতে স্বাতী বারান্দার কোণের থামটা ধরে দাঁড়ায়। প্রেমাংশু চলে গেল। এখন ওই সিঁড়িটা দিয়ে উঠে আসছে এক হাসিমুখের দম্পতি। সেই ছবি স্বাতীর চোখে ঘষা পেনসিলের আঁকিবুঁকি দাগ কেটে পেরিয়ে যায়। ভারহীন শরীর একটাই প্রশ্ন রেখে যায় স্বাতীর মনে, "প্রেমাংশু কি আজ নতুন চলে গেল? সেই কতদিন আগেই তো ও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। আজ শুধু সেই বিচ্ছেদের উপর সরকারি শিলমোহর পড়ল। এটাও যে পড়বেই, তারই প্রস্তুতি কি আমি নিইনি গত দু'বছর ধরে? তাহলে আজ কেন এমন ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপের মতো লাগছে নিজেকে? কেন



পৃথিবী ওলটপালট করে দেওয়া হাওয়ায় উড়ে যেতে চাইছে আমার সব সঙ্কল্প, প্রতিজ্ঞা? কে প্রেমাংশু? কেন তার কথা আর ভাবব আমি? আজ এই মাত্র, একটু আগেই তো আমার জীবন থেকে চিরদিনের মতো মুছে দেওয়া হল প্রেমাংশুর নাম। 'ম্যাট স্যুট নম্বর তেত্রিশ বাই দু'হাজার আঠারো। ডিসপোজড অফ অন কম্প্রোমাইজ়। পার্টিজ় এগ্রিড টু দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অফ দ্য কম্প্রোমাইজ় পিটিশন। দেয়ার ম্যারেজ ইজ় হিয়ারবাই ডিজ়লভড অন কনসেন্ট অফ বোথ পার্টিজ়... স্বাতী নির্বাক চোখে তাকিয়ে ছিল। কেমন শূন্য দৃষ্টি, ভাষাহীন, বোবা। করুণাময় কখন এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একগোছা কাগজ, ফাইল। কাঁধের ঝোলাব্যাগ থেকে উপচে পড়ছে বিভিন্ন সাইজ়ের ফোল্ড করা কাগজের গোছা, ডায়েরি। ব্যস্ত ভঙ্গি। কিছুটা সময় ধরে স্বাতীকে ও খুঁজে পাচ্ছিল না। তাতে ব্যস্ততাটা আরও বেড়ে গিয়েছে।

"আরে তুমি এই থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কি করছ বলো তো? ওদিকে সব তো মিটে গেল। উকিলবাবু তোমার খোঁজ করছিলেন। আমি তো খুঁজেই পেলাম না... কী আর করব... আমিই সব মিটিয়ে এলাম। তুমি কি একবার দেখা করবে নাকি?"

যার উদ্দেশ্যে এত কথা, তার কাছ থেকে কোনও উত্তর আসে না। আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ে করুণাময়, "এই রে, কী হল তোমার স্বাতী? একটু জল খাবে? খিদে পেয়েছে?"

"আঃ করুণা, প্লিজ়..." ক্লান্ত বিরক্ত শোনায় স্বাতীর গলা, "আমি যাব এবার... এগোচ্ছি।" যেন হাওয়ায় ভর করে ভেসে-

শুকনো পাতার মতো উদ্দেশ্যহীন সেই পদক্ষেপ... করুণাময় এত সব বোঝে না। কোন তারে ছোঁওয়া পড়লে টং করে তারসপ্তকে বেজে ওঠে কোন আকুল রাগিণী, কতখানি মেঘ জমলে হৃদয়ের জমিতে ঝরে পড়ে কতখানি অদেখা তপ্ত বাষ্প, এসবের খোঁজ রাখার সময় বা মানসিকতা নেই তার। তার শুধু চিন্তা স্বাতীকে যেন রাস্তায় গিয়ে গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়। ব্যাগভর্তি ফাইল, কাগজ সামলে পা চালিয়ে স্বাতীর পিছন-পিছন ছুটে আসে সে। তড়িঘড়ি গাড়িটাকে পার্কিং থেকে ডেকে এনে স্বাতীকে বসায়, নিজেও বসে গুছিয়ে। গাড়ির ব্যাকসিটে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে। শ্বাস টানে লম্বা করে, "একটা ঝামেলা মিটল! উফফ, দিনের পর দিন কী অশান্তি! উটকো ঝামেলা... এবার সব খেল খতম। যাই বলো, পরিতোষবাবু কিন্তু ভীষণই ভাল উকিল। ঠিক যেমন বলেছিলেন, তাই-ই হল। অথচ ওই অনঙ্গবাবুর পাল্লায় পড়ে কী নষ্টই না হল তিনটে বছর! আর জলের মতো টাকা গচ্চা..."

প্রায় দরজার সঙ্গে মিশে গিয়ে জানলার কাচে গাল ঠেকিয়ে বসেছিল স্বাতী। এক ঝটকায় এপাশে ঘুরল, করুণাময়ের দিকে। তীব্র স্বরে বেজে উঠল, "তোমার কী-কী অশান্তি হচ্ছিল করুণা? কেন এত বাজে বকছ তখন থেকে? একটু চুপ থাকতে পারো না?" এতটাই কঠিন ছিল কথাগুলো, এতটাই অপ্রত্যাশিত যে, করুণাময় থমকে গিয়ে তাকিয়ে থাকে অবাক চোখে। বুঝতেই পারেনি কেন এই আচরণ স্বাতীর। বাইরে চোখ সরিয়ে নেয় স্বাতী। হয়তো মনের মধ্যে কোথাও একটুখানি অনুশোচনার দাগ লেগেছিল এভাবে কথা বলে ফেলার জন্য। কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছে হয় না। বরং নিজের উপরে একটা অদ্ভুত রাগ এসে ওকে আরও বেশি চুপ করিয়ে দেয়।

গাড়িটা ছুটে চলেছে শিয়ালদার দিকে। ওখানেই স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে ওঠা হয়েছে। কাজ মিটিয়ে আজ রাতের ট্রেনেই ফেরা হবে শিলিগুড়ি, এমনটাই ঠিক ছিল। এখন গিয়ে হোটেলেই উঠতে হবে ট্রেনের সময় না হওয়া পর্যন্ত। চলন্ত গাড়িতে স্বাতী চোখের সামনে সরে যেতে দেখে চলমান জীবন্ত কলকাতাকে। বিকেলের জনজোয়ারে ভরা পরিপূর্ণ জীবনের ছবি। ফুটপাথ দিয়ে কত অসংখ্য মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু তারা কেউ 'প্রেমাংশু' নয়। কোথাও নেই সেই অহংকারী নিষ্ঠুর দৃপ্ত পদক্ষেপ। হঠাৎ দুই চোখ জ্বালা করে জল আসতে চায়, 'কেন আমি ওই মানুষটার কথা এভাবে ভেবে চলেছি? আমার কি আত্মসম্মান বলতে কিছু নেই? আমি কি ভুলে গেলাম ও কী-কী করেছে আমার সঙ্গে! ও তো সেই কবেই আমাকে পিছনে ফেলে নিজের পথ আলাদা করে নিয়ে চলে গিয়েছে!" মনকে সঠিক পথে ফেরাতে চায় স্বাতী। কিন্তু ওর সমস্ত প্রচেষ্টা ভেস্তে দিয়ে কেউ যেন ভিতর থেকে হাহাকার করে ওঠে। অন্য কোনও অচেনা স্বাতী অবুঝ চোখ মেলে জনস্রোতে খুঁজে চলে প্রেমাংশুকে। পাথরে মাথা কুটে আক্ষেপ করে যায়, এতদিন তবু মামলাটা চলছিল। জীবনের কোনও একটা জায়গায় জুড়ে ছিল প্রেমাংশু। আজ থেকে তো সেই সুতোটাও ছিঁড়ে গেল। এই বিশাল আকাশের নীচে কোটি-কোটি মানুষের ভিড়ে আজ থেকে মুছে গেল প্রেমাংশু আর স্বাতীর বন্ধন। কী ভয়ানক এই একাকিত্ব। কী করে এরপরেও বেঁচে থাকবে স্বাতী?

নিজেকে আর আটকানো যায় না। ফোঁটায়-ফোঁটায় গালের চামড়া পুড়িয়ে ঝরে পড়ে অনাবিল জল। আর কেউ জানে না, শুধু অচেনা এক ভাড়ার গাড়ির কাচ সাক্ষী থেকে যায় সেই বর্ণহীন রক্তক্ষরণের।

করুণাময়ের খারাপ লেগেছিল স্বাতীর ব্যবহার। সে সেই থেকে চুপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সংসারে কিছু-কিছু মানুষ থাকেই, যারা সেই গোত্রের। আর এই ক্ষেত্রে তার প্রধান কর্তব্য হল, স্বাতী সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় তার বাবা মায়ের হাতে নিয়ে গিয়ে তুলে দেওয়া। স্বাতী কী ব্যবহার করল না করল, সে নিয়ে বসে থা চলে না করুণাময়ের। সে স্বভাবসিদ্ধভাবে ব্যস্ত গলায় কথা ওঠে, "এই ভাই... থামুন... থামুন! হোটেলের গেট পেরিয়ে যে," নিজে নামে ফাইলপত্র গুছিয়ে। তারপর হাত বাড়িয়ে স্বাতীর দিকে, "এই দ্যাখো... বসে রইলে কেন? আবার যাবে নাকি? নেমে পড়ো... হোটেল তো এসে গিয়েছে তো! আস্তে আস্তে... সাবধানে ... এখানে দরজাটায় একটু খোঁচামতো বে আছে... লাগলেই টিটেনাস," বেশ অনেকগুলো অপ্রয়োজনী কথা বলতে-বলতে ঘরের দরজা খুলে দেয় করুণাময়। আর পিছনে-পিছনে নির্বাকভাবে দাঁড়ানো স্বাতীর মনে হয়, এত কথা কেন বলছে ও। এত কথা অনর্গল বলে যাওয়াই কি ওর স্বভাব? না কি করুণাময়ও নিজেকে ঢাকতে চাইছে কোনওভ স্বাতীর জলের দাগ লেগে থাকা চোখে হঠাৎ করে করুণাময় অন্যরকম লাগে। কিন্তু সেই চিন্তাটা দাঁড়ায় না বেশিক্ষণ। ফাঁ মন নিয়ে স্বাতী ঘরের সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে বেশ দামী হোটেল। যথেষ্ট ভাল একটা ঘরই বুক করেছে করুণাময়। কাল রাতে এসে ওঠার পর কিছুই দেখেনি স্বাতী করে। মেন্টাল প্রেশারের সঙ্গে যোগ হয়েছিল লম্বা জার্নির ধ তাই ঘুমিয়েও পড়েছিল তাড়াতাড়ি। এখন ঘরের চারপাশে ঘ বেড়ায় ওর শূন্য দৃষ্টি। মনে পড়ে যায়, বিয়ের পরে কত বায়ন আবদারে বিরক্ত করার পর প্রেমাংশু ওকে নিয়ে গিয়েছিল বিহারের ফুলতলিতে। ওর ওইরকমই অফবিট সব জায়গা প ছিল। তাই পুরী-দীঘা-দার্জিলিং না গিয়ে বউকে নিয়ে গিয়ে অচেনা অজানা ফুলতলিতে। কত বছর আগের কথা। কিন্তু মতো মনে আছে স্বাতীর। একটা ছোট্ট জায়গায় মাথাগোঁজার ঠাঁই পেয়েছিল ওরা অতিকষ্টে। সেই আট ফুট বাই দশ ফুট ঘ নড়বড়ে চৌকির তলায় ইঁদুরের আনাগোনা। রাতজাগা পাখি ডাক আর ফাঁক হয়ে থাকা জানলার বাইরে ঝুপসি অন্ধকার তবু কী স্বপ্নের মতো ছিল সেটা! বুকের ভিতর থেকে সেই উ আসা ঘুপচি ঘরখানা যেন তার সবটুকু মাধুর্য নিয়ে উঠে এসে রাজকীয় বিলাসিতার পরিমণ্ডলকে মুহূর্তে ম্লান করে দিতে চ সেই রাতে চরম ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে চৌকিটা ভীষণ জোরে নড় করে উঠেছিল। পরিষ্কার মনে আছে স্বাতীর। দুর্বল পায়াগুলো করতে পারছিল না সবল প্রেমাংশুর অপরিসীম শরীরী উন্মা আর পরদিন সকালে হোটেল মালিককে ডেকে চৌকিটা যখ পালটে দিতে বলেছিল প্রেমাংশু, সেই টাকমাথা রসিক বৃদ্ধ তির্যক চোখে তাকিয়েছিলেন স্বাতীর দিকে! আর স্বাতীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল।

এখন এই সুন্দর সাজানো ঘরে বসে হঠাৎ উড়ে আসা সেই ধুলোমাখা পৃষ্ঠাগুলো যত্ন করে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে স্বা আর হেসে ফেলে একা-একাই। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জ আর ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠা হাসি নিয়ে বসে থাকে চিত্রাপি মতো। "নাও এবার একটু চা..." ট্রে হাতে ওয়েটারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকছিল করুণাময়। স্বাতীর দিকে তাকিয়ে থেমে অতর্কিতে। এ এমন একটা দৃশ্য, যা বোধকরি করুণাময়ের ম কেজো বাস্তববাদী মানুষকেও নিয়ে যাবে অন্য কোনও লেভে ঠিক কী বলবে বা কী করবে বুঝতে না পেরে, ঘরের মাঝখা দাঁড়িয়ে থাকে ও। এমন একটা সময়ে কাউকে যে অন্তত চা বলা যায় না, এ বোধটা করুণাময়েরও রয়েছে। সে শুধু অবা হয়ে ভাবে, ঠিক কী কারণে স্বাতী এত কষ্ট পাচ্ছে। সত্যিই, ভেবেও কোনও কারণ খুঁজে পায় না সে। স্বাতী নড়েচড়ে বসে

অমন করে? এসো..."
"না! মানে চা আনিয়েছিলাম... " কুণ্ঠা নিয়ে বলে করুণাময়।
"হ্যাঁ, তা এদিকে আনতে বলো। কখন থেকে প্রাণটা চা-চা করছে," জোর করে স্বাভাবিক হয় স্বাতী। মাত্র এইটুকুতেই করুণাময় নিজস্ব স্বভাব ফিরে পায়, "তুমি খাবে? এই ভাই, কী হল? ভিতরে নিয়ে এসো। কাটলেট তো সব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে!" খুব খুশি-খুশি মুখে স্বাতীর দিকে এগিয়ে দেয় চা, গরম কাটলেট। আর তেতো মুখে হাসি এনে বিস্বাদ জিভের ডগায় কাটলেটের টুকরো টেনে নিতে-নিতে স্বাতীর মনে হয়... কী অল্পেই না খুশি হতে পারে করুণাময়! অথচ প্রেমাংশুর মান ভাঙানো ছিল রীতিমতো সাধ্যসাধনার ব্যাপার। একদিন-দু'দিন এমনকী তিনদিনও কেটে গেছে কতবার! প্রেমাংশু রাগ করে কথা বলেনি স্বাতীর সঙ্গে, না খেয়ে থেকেছে কত ঘণ্টা। নিষ্ঠুর ছিল প্রেমাংশু।
গরম কাটলেট মুখের ভিতর গিয়ে গলে-গলে নরম অখাদ্য হয়ে পেটে ঢোকে স্বাভাবিক নিয়মে। গরম চা জল হয়ে গিয়ে নামতে থাকে কণ্ঠনালী বেয়ে। আর স্বাতী শুধু হাতড়ায় জীবনের কঠিনতম ধাঁধাঁর উত্তর। আজ যখন সব বাঁধন আনুষ্ঠানিকভাবে কেটে ফেলে পৃথিবীর চোখে ওরা আলাদা দু'টো মানুষ হয়ে গেল, তখন আবার কেন সারা মনপ্রাণ উদ্বাহু হয়ে ছুটে যেতে চাইছে ওই নিষ্ঠুরতম মানুষটার কাছে? কোন চুম্বকে ও এতদিন পরে, এত ঘটনার পরেও স্বাতীর শরীর থেকে মনটাকে এভাবে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল?

২

ভাল করে দেখলেই বোঝা যাবে জায়গায়-জায়গায় ফাটল ধরেছে। কোথাও বা বটগাছের শেকড় ঝুলে-ঝুলে পড়ছে। প্লাস্টার চটে রঙ জ্বলে গিয়ে পুরনো জৌলুস ধ্বংসের মুখে প্রায়। কত বছরের ঝড়-জল সব সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ইমারতের বাইরের আকৃতি একই থাকলেও, নেই সেই চোখধাঁধানো সমীহ জাগানো প্রাসাদোপম সমাহার। তবুও, কথায় বলে মরা হাতি লাখ টাকা। সান্যালবাড়ি আজও সান্যালবাড়ি। এলাকার মানুষের কাছে তো বটেই, সারা শিলিগুড়ি শহর, এমনকী গোটা দার্জিলিং জেলার মানুষ বোধহয় আজও একদা বিখ্যাত এই সান্যালবাড়িকে চিনবে। যতই আর তালপুকুরে ঘটি না ডুবুক, তবু পুকুরের বিশাল-বিশাল ভাঙা ঘাটগুলোই মানুষের মনে এখনও তার বিলীয়মান গভীরতার স্মৃতি বজায় রেখেছে। সেই সান্যালবাড়ির দোতলার একদম দক্ষিণের বারান্দা লাগোয়া বড় ঘরখানায় ইজিচেয়ারে আধশোওয়া হয়ে বসেছিলেন উমা সান্যাল। এ বাড়ির বর্তমান কর্ত্রী। সোনালি ফ্রেমের চশমা, ছোট করে কাটা মাথার চুল আর হালকা কাজ করা তসরের শাড়িতে মোড়ানো ৬৫-৭০ বছর বয়সের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উমাদেবীকে দেখলেই বোঝা যায়, এখনও তাঁর মুখের একটা কথাতেই চলে এ বাড়ির মানুষগুলোর জীবন।
উমাদেবীর সর্বক্ষণের সঙ্গী সরমা, ঘরের কাজ বা প্রয়োজনে পরামর্শদাতা অথবা নিজস্ব ভরসাস্থল... যাই বলা হোক না কেন, সে চুপচাপ পায়ের কাছে বসে মালিশ করছিল রসুনের গরম তেল। বিরক্ত মুখে পা সরিয়ে নেন উমাদেবী, "আঃ! কী তখন থেকে মালিশ করছিস? বললাম বড় খোকাকে খবর দে..."
"ডেকে পাঠিয়েছি মা।"
"তা, কতক্ষণ লাগে তার আসতে? চারতলা থেকে দোতলা কত মাইল দূর? যা, ইন্টারকমে ফোন কর একবার। বল একবার বউয়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আসুক তাড়াতাড়ি!" বিরক্তি উমাদেবীর গলায়। কিন্তু সরমাকে আর ডাকতে হয় না। তার আগেই ঘরে এসে ঢোকে বড় ছেলে প্রাণময়। পিছনে-পিছনে তার বউ নন্দিনী। উমাদেবীর

"বলো মা, ডাকছ শুনলাম!"
"ঠিকই শুনেছ। অনেকক্ষণ থেকেই ডাকা হয়েছে," অপাঙ্গে
দিকে একটু দেখে নিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেন উমাদে
ঠিক জায়গাতেই লেগেছে। নন্দিনী সঙ্গে-সঙ্গে নাকিসুরে ব
করে, "তোমার ছেলে আমার স্কুলের পরীক্ষার খাতাগুলো
দেখে দিচ্ছিল মা।"
"থামো তুমি," মাঝপথে ধমকে থামিয়ে দেন উমাদেবী, "
তোমার স্কুলের খাতা পানুকে দেখতে হবে কেন? তাহলে
দাও চাকরি! অনেক এফিশিয়েন্ট ছেলেমেয়ে রয়েছে।"
নন্দিনী মুখ কালো করে ফেলেছে। প্রাণময় অবস্থা সামাল
চেষ্টা করে মৃদু গলায়, "না, মানে পুপু বায়না করছিল, কাঁদ
তাই ওকে নিয়ে..."
কঠিন চোখে ছেলের দিকে তাকান উমাদেবী, "শোনো পান
তিনটে বাচ্চা নিয়ে তোমার বাবার এই বিশাল সাম্রাজ্য সা
এসেছি বরাবর। যখন উনি চলে যান তোমার দিদি ১২ আ
দু'জন আট আর ছয়। সেখান থেকে টেনে তুলেছি। ব্যবসা,
সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি... সবকিছু সামলাতে হয়েছে আ
প্রাণময় চুপ করে থাকে। এই কথাগুলো কতটা সত্যি, তা
অজানা নয়। শুধু পিছন থেকে অস্ফুটে ভেসে আসে নন্দিনী
"আপনার সঙ্গে কারও তুলনা চলে মা?"
একবার জ্বলন্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছেলের দিকে ফেরে
উমাদেবী। পানুর বউয়ের বেমক্কা কথার জবাব দেওয়ার প্র
মনে করেন না তিনি, "সে ফিরেছে?" সরাসরি প্রাণময়কে
করেন।
"কে মা?" একটু বুঝি অন্যমনস্ক ছিল সে। আবার ধমক
কেটে যায়।
"কে মানে? কাল থেকে কোন কাজটা তোমাকে দেওয়া হ
আবার বলতে হবে?"
প্রাণময়ের সম্বিত ফেরে এতক্ষণে, "ও হ্যাঁ, নিয়েছি তো, খ
নিয়েছি। ওরা আজ ট্রেন ধরবে। কাল সকালে নামবে।"
"আর কেউ গিয়েছে সঙ্গে?" প্রশ্নটা করে কুটিল চোখে ছে
তাকিয়ে থাকেন উমাদেবী।
"না মা। শুনলাম ওরা দু'জনেই শুধু..."
"কেন? এত বড় মেয়েকে এভাবে একা না পাঠিয়ে ঠাকুরম
পারতেন না সঙ্গে? বাচ্চাটাকে পর্যন্ত নিয়ে যায়নি! ছি-ছি,"
বিরক্ত ভঙ্গি উমাদেবীর।
আবারও শোনা যায় নন্দিনীর গলা, "কেন মা? তাতে কী?
দু'জনে খুব ভাল বন্ধু, আমি শুনেছি..."
এবার স্পষ্টত রেগে যান উমাদেবী, "তোমার কাছে তো অ
ব্যাখ্যা শুনতে চাইনি! আর তোমাকে এখন ডাকাও হয়নি।
কথা বলছ কেন?"
"তুমি যাও উপরে। আমি আসছি," প্রাণময় মায়ের রোষ
বউকে আড়াল করার দুর্বল চেষ্টা চালায়।
"আচ্ছা, শোনো, তোমরা দু'জনেই যাও। তবে কাল যখন
আসবে, যদি আমি বাড়িতে না-ও থাকি, তাও যেন কোথা
না গিয়ে আমার জন্য ওয়েট করে! আমার সঙ্গে কথা বলে
বাড়ি থেকে বেরোয়। বলে দেবে ভাইকে, বুঝেছ? আর হ্যাঁ,
গাড়ি স্টেশনে পাঠাবে। সে যেন ট্যাং-ট্যাং করে ভাড়ার গা
চলে আসে এন জে পি থেকে। আমি পছন্দ করি না..."
নন্দিনী মোটেই চুপ করেই থাকতে জানে না। আবারও বলে
"কেন মা, এখান থেকে তো এইটুকু! এ তো রিকশা করেও
যায়। আর ঠাকুরপো তো কতদিন তার বন্ধুকে নিয়ে রিকশা
বড় রাস্তা দিয়েও গিয়েছে ! আমি দেখেছি..."

সেটাই শেখোনি এখনও ভাল করে। মেয়েদের যে কী শিক্ষা দিচ্ছ তুমি, ভগবান জানেন।'' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিতৃষ্ণা মাখানো মুখ নিয়ে চুপ করে যান উমাদেবী। আর নিপাট ভালমানুষের মতো কী জানি কী হল টাইপ মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নন্দিনী। পিছন-পিছন প্রাণময়।

সরমা মা-ছেলের কথার মাঝখানে কখন উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে আসে প্লেটে কিছু ওষুধ, জল আর হাতে একখানা ফাইল নিয়ে, ''নাও। সেই থেকে কথা বলছ। এবার ওষুধটা খেয়ে একটু রেস্ট নাও।''

"তোর বয়স হচ্ছে সরমা। মোটা ফাইল নিয়ে এসে বলছিস রেস্ট নাও। রেস্ট করলে হবে রে? কই দেখি কী আনলি..." সোনালি ফ্রেমের চশমা খুলে মোটা কালো ফ্রেমের রিডিং-গ্লাস চোখে লাগান উমাদেবী।

"হ্যাঁ, এই ফাইল পরিমলবাবু দিয়ে গেলেন। দেখে রাখতে বলেছেন। সন্ধেবেলা আসবেন।''

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে নাকের উপর ফাইল খুলে ধরেন উমাদেবী। মেঘদূত সিনেমাহল আর নিউ সিনেমাহলের শেয়ার, প্রফিট অ্যান্ড লসের ফাইল। প্রাণময়দের বাবা জীবনময় সান্যাল ছিলেন মহাউদ্যমী পুরুষ। তাঁরই হাজাররকম ব্যবসার মধ্যে এই সিনেমাহলগুলোও আছে। যদিও এই পরিবারের নামডাক শুরু হয়েছিল জীবনময়ের বাবা পুণ্যময়ের আমলে। তখন সবে-সবে শিলিগুড়ি শহরের পত্তন হতে শুরু করেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে প্রভূত সম্পত্তি নিয়ে এসে থিতু হলেন পুণ্যময়। প্রচুর টাকার মালিক এবং অতি পরিশ্রমী সদালাপী জনসংযোগকারী হওয়ার জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই শহরের বিশিষ্টজনের তালিকায় যুক্ত হয়ে যেতে আটকায়নি তাঁর। নানারকম সামাজিক কার্যকলাপ ছিল। ঢালাও হাতে দান-ধ্যানও করে গিয়েছেন সারাজীবন। চারদিকে নাম ছড়িয়ে পড়তে তাই দেরি হয়নি। সম্পত্তি খরচ করার দিকে যত নেশা ছিল, উপার্জনের দিকে তত মন ছিল না পুণ্যময়ের। সেই কাজটা করেছেন তাঁর একমাত্র ছেলে জীবনময়। তুখোড় ব্যবসাবুদ্ধি কাজে লাগিয়ে তলানির দিকে যেতে বসা সঞ্চয়ের ঝাঁপি দরকারের চেয়েও বহু বহু গুণ বাড়িয়ে তুলেছিলেন তিনি। সাতখানা চায়ের বাগান, শিলিগুড়িতে তিনখানা, দার্জিলিং এ দু'খানা আর কোচবিহারে একটা...মোট ছ'খানা বেশ বড়মাপের হোটেল, ইঁট- বালি সিমেন্টের সাপ্লাই, আসাম, ডুয়ার্স, ভুটান অঞ্চলে ট্র্যাভেল এজেন্সি... অসংখ্য ব্যবসায় নিজে জড়িয়ে সাম্রাজ্য বাড়িয়েই গিয়েছেন। কত মানুষের কর্মসংস্থান যে ছিল জীবনময়ের কাছে, তার সঠিক হিসেব আজ আর দেওয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষেই। সে মানুষটা একা হাতে সব সামলাতেন। তখনও কম্পিউটারের যুগ আসেনি। আজ যদি কেউ জীবনময়ের কাজের খতিয়ান নিতে বসে তাকে স্বীকার করতেই হবে, ওই ছোটখাট সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার মানুষটার মাথার মধ্যেই ফিটিং করা ছিল সাড়ে পাঁচশ কম্পিউটারের ক্ষমতা। লোকজন, ঠাকুর চাকরে তখন গমগম করত এই চারতলা বিশাল বাড়িটা। আজ থেকে ৫০ বছর আগেও শিলিগুড়ি শহরে বহুতল বাড়ির সংখ্যা হাতেগোনা ছিল। বাইরে থেকে আসা মানুষজন রিকশা ঘুরিয়ে এই সান্যালবাড়ির সামনে আসত একবার চোখের দেখা সেরে নেওয়ার জন্য।

আজ সেই রামও নেই, সেই রাজত্বও নেই। ফাইল হাতে নিয়ে ইজিচেয়ারে বসেই মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটু চোখ বোজেন উমাদেবী। মন ঝটিতি ঘুরে আসে সেই সব বর্ণময় অতীতের দিনগুলো থেকে। কিন্তু দিনের পর রাত্রি আসার মতোই এসে পড়ে পরবর্তী বিবর্ণ যুদ্ধকালীন সময়টাতে। যতদিন জীবনময় বেঁচে

জীবনকে দেখেছেন। স্বামী সন্তান নিয়ে, জমজমাট সংসার নি
কেটেছে তাঁর দিন-রাত্রি। এই ঘেরাটোপের বাইরে যে আর বে
পৃথিবী থাকতে পারে, থাকলেও যে এতটাই কঠিন তার অস্তি
এমন কোনও ধারণাই ছিল না তাঁর।

মাত্র দু'দিনের অসুস্থতায় চলে গেলেন জীবনময়। এত টাকা এ
সম্পত্তি কোনও কাজেই লাগানো গেল না। ভাল করে কিছু বু
ওঠার আগেই চলে গেলেন হঠাৎ করে। উমাদেবীকে এই কঠি
পৃথিবীর আগুনে হাটের মাঝে একা দাঁড় করিয়ে। নিজের বল
তিনটে অসহায় বাচ্চা। কিন্তু আজও এতদিন পরেও কাঁটার ম
একটাই প্রশ্ন উমাদেবীর তসরের ব্লাউজের আড়ালে খচখচ ক
আজও জানেন না তিনি কোন ঘটনায় বেশি আঘাত এসেছিল
বেশি বজ্রপাত হয়েছিল! জীবনময়ের অকাল প্রয়াণে নাকি তাঁ
মৃত্যুর পর প্রকাশিত অসম্ভব অবিশ্বাস্য সেই বিশ্বাসঘাতকতা
উন্মোচনে? চোখ বুজেই বুঝি একটু বেশি ভারী নিঃশ্বাস নিয়ে
ফেলেছেন উমাদেবী। সরমা বহুদিনের লোক, ৪০ বছর এ বা
আছে। সে বোঝে কোন নিঃশ্বাস কী বলতে চায়। পাশে এসে
উমাদেবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় আলতো করে। এখনও ন
নয় করে চারজন কাজের লোক এ বাড়িতে... একমাত্র সরমার
আছে এ অধিকার।

"আবার ওসব ভাবতে বসেছ বুঝি? ফাইল পরে দেখো 'খন।
একটু ঘুমিয়ে নাও বরং। আর বয়স অনেক হল, ছেড়ে দাও এ
চিন্তাভাবনা। কিছু তো ফিরবে না। কতকাল হল চলে গেছে সে
মানুষগুলো..."

"কিন্তু আমি তো এখনও বেঁচে আছি সরমা! আমার কী দোষ
বল? আমি কেন এতবড় পাপ সহ্য করব?" চোখ বুজে থেকে
বলেন উমাদেবী।

"তা কী করবে বলো? কী করার আছে তোমার, নিজে কষ্ট পা
ছাড়া? সব তো চুকেবুকে গেছে কোনকালে!"

"চোকে না সরমা। কিছুই চোকে না। এই আগুন কোনদিন কি
নেভার? কোনদিন সেই মানুষটাকে ক্ষমা করব না আমি। যদি
পরজন্ম বলে কিছু থাকে, তবে আমি সেখানেও ওর সঙ্গে কো
সম্পর্ক স্বীকার করি না।"

এই ধারাভাষ্য কিছু নতুন নয়। জীবনময় চলে যাওয়ার পর থে
আজ এত বছর ধরে একমাত্র সরমাই দিনের পর দিন শুনে আ
এই বুকফাটা আর্তনাদের আক্ষেপ। সবাই যে মানুষটাকে কঠি
বদরাগি, বদমেজাজি বলে জানে, এমনকী পেটের ছেলে-মেয়ে
যাকে ভয় পাওয়াটাই অবধারিত নিয়ম বলে জানে, তাঁকে এক
সরমাই অন্যভাবে চেনে। একমাত্র সরমাই বুঝতে পারে উমাদে
কোন নিঃশ্বাসের কী অর্থ। আর কোনও কথা না বলে হাত থে
ফাইলগুলো সরিয়ে নেয় সে। সেই সঙ্গে নিজেকে দোষারোপ
করতেও ছাড়ে না। এই বিশ্রামের সময়টাতে তারও উচিত হয়
এগুলো এখানে আনা। সরমা তো জানত যে, এই সিনেমাহলে
ফাইলগুলো দেখলেই ওঁর এই প্রতিক্রিয়াই হবে। নাহ, খুব ভু
হয়ে গেছে। সব জেনেও তবু মাঝে-মাঝে নির্বুদ্ধিতা হয়ে যায়
উমাদেবীর কানের কাছে মুখ এনে আস্তে ডাকে সরমা, "মা, এ
শোবে চলো। সন্ধে হতেই তো অফিসঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে।
আর আপত্তি না করে চেয়ার থেকে উঠে সরমার হাত ধরে
খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এসে জীবনময়ের শখের বানানো মেহগনি কা
পালঙ্কে ওঠেন উমাদেবী, যাতে উঠতে টুলের প্রয়োজন পড়ে।
শুয়ে পড়েন সাদা ঝালর দেওয়া ভেলভেটের বালিশে মাথা রে
বনেদিয়ানার সবটুকুই নিজের শোওয়ার ঘরের মধ্যে ধরে রেখে
তিনি। বাইরের জগতের পরিবর্তনের এতটুকু ছাপ এখানে লা

অনুযায়ী সাজসজ্জার প্রতিফলন। এমনকী বিছানায় মাথা দিলে চোখের সামনে বিগত গৃহকর্তার প্রমাণ সাইজ় জীবন্ত প্রতিকৃতি। বালিশে মাথা দিয়ে চশমাটা খুলে ফেলার আগের মুহূর্তে সেদিকে একবার তাকিয়ে নেন উমাদেবী। তারপর আরও একবার ভারী শ্বাস ছেড়ে বলেন, "এই মানুষটাকে আমি কোনওদিন ক্ষমা করতে পারব না সরমা।"

৩

টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ, যেন বুকের ভিতরে বেজে যাওয়া টুকরো-টুকরো মঞ্জিরা। পিয়া কান পেতে ছুঁতে চাইছিল বৃষ্টি। চোখে দেখার উপায় নেই। দু'চোখের পাতাজুড়ে অন্ধকার বহিরঙ্গ। তাই বৃষ্টিধারার রূপ পিয়ার মনে নিজস্ব একটা ছবির মতো, যেখানে প্রতিমুহূর্তে চলতে থাকে রং বোলানোর আর মোছার খেলা। সেই খেলাতে একটিমাত্র খেলুড়ে, পিয়া একা। সারাদিন সেই খেলায় মেতে থেকেই কেটে যায় পিয়ার অন্ধকার ২৪ ঘণ্টা। কখনও সেই অন্ধকার দমবন্ধকরা, কখনও সেই নিকষ কালো পরদার বুকে হাজার রংয়ের আতসবাজি। মাত্র আট বছর বয়সেই আঠারোর মানসিক পরিপূরণ দিয়েছেন ঈশ্বর ওকে। দিয়েছেন প্রখরতম অনুভূতি। সেখানে শৈশবের অস্ফুট কদমফুল নিজস্ব পরিভাষায় সকলের অগোচরে তারুণ্যের পদ্ম ফোটায়, পারিপার্শ্বিক জগত তার খবরও রাখে না। বুকে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে পিয়া শুনছিল বৃষ্টির শব্দ। কখন মাসিমনি ঢুকেছে, বুঝতে পারেনি। পাশে খোলা ছিল 'কথা ও কাহিনী'। উলটে-উলটে পৃষ্ঠাগুলো বয়ে যাচ্ছিল নিজে-নিজে। জানলা দিয়ে আসা বৃষ্টির ছাঁটে হয়তো কিছুটা ভিজেও যাচ্ছিল। আরতি এসে তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে, "কী রে পিয়া, আমি পড়তে-পড়তে উঠে গেলাম আর বৃষ্টি এলো ঝেঁপে! বইটা বন্ধ করতেও পারিসনি? দেখ তো ভিজে গেল কতটা!"

"আমি দেখছিলাম মাসিমনি।"

"তুই? দেখছিলি? কী দেখছিলি? কেমন করে দেখছিলি?" আরতি ঠোঁট বেকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ গো, হাত দিয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখছিলাম কবিতাগুলো। ভিজতে পেলে আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে কি না! দেখো না কী সুন্দর বৃষ্টির ছাঁট এসেছে বইটার উপর। আর বিছানার এই কোণটা! এখানেও অনেকটা ভিজে-ভিজে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন ঘরে নেই। ঠিক ওই আকাশের তলায়, বড় বড় গাছগুলোর নীচে... আর কবিতাগুলোও আমার সঙ্গে ছোটাছুটি করছে। আমার গায়ে মাথায় আদর করছে।"

"উফফফ! আর পারবো না তোকে নিয়ে," বিরক্ত আরতি চেঁচিয়ে ওঠে, "মাআআ-মাআআ তোমার নাতনি তুমি সামলাও! ও তো আমাকেই পাগল করে দেবে দেখছি।"

সুবালা শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ঘরে ঢোকে, "এত চেঁচানোর কী হল? কী রাজকার্য দেওয়া হয়েছে তোকে? এইটুকু একটা মেয়েকে দেখে রাখতে পারিস না?"

"ও এইটুকু মেয়ে? ডায়লগ যা দেয় মাঝে-মাঝে, শুনলে তোমার মাথাখারাপ হয়ে যাবে।" আরতি মায়ের কথার উত্তর দেয় মুখে, কিন্তু চোখ তার জানলার বাইরে। সেখান দিয়ে একটু আগেই কলমিলতার ঝোপের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে সুকান্তর সাইকেল। বর্ষাতি পড়া সুকান্তকে আরতির চোখ ঠিকই চিনেছে। এতক্ষণে মোড়ের মাথায় পৌঁছেই গেল হয়তো। ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো মুশকিল। পাড়ার মেয়ের জন্য এসে দাঁড়ানো বেপাড়ার ছেলেকে

হয়ে গিয়েছে বিস্তর। আরতিকে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওখান থে
ইস্কন মন্দিরের দিকের মাঠটায় চলে যেতে হবে সুকান্তর স
তবে যদি একটু কথা বলা যায়। সামনাসামনি কথা বলার
সুখ, তা পাতার পর পাতা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে কোথায়? ম
সামনে থেকে কেটে পড়ার তাল খুঁজতে থাকে আরতি। মা
এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে। দিদির সঙ্গে দিনরাত কথা
কাটাকাটি, লাঠালাঠি লেগে রয়েছে। অথচ দিদির মেয়েটাকে
সেকেন্ড চোখের আড়াল হতে দেয় না। যেহেতু পিয়ার চোখ
নিয়ে সমস্যা রয়েছে,তাই আজ নয়, সেই ছোট্টবেলা থেকে
কাছে সারাক্ষণ কাউকে না কাউকে থাকতে হবে... এটাই সু
আদেশ। বাড়িশুদ্ধ সবাই পালা করে করে থাকে পিয়ার সঙ্গে
আরতির এমনিই কপাল যে, ওর ভাগ্যে সবসময়ই এই শে
থেকে বিকেল-সন্ধ্যেটাই পড়ে যায়। আজকেও তাই হল। তা
উপরে আবার বৃষ্টি। উফফফ... মা যে কেন এখনও গুছিয়ে
না নাতনির কাছে! বাইরে কী কাজ রেখে এলো না কি? তাই
হয় তবেই তো হয়ে গেল। কাল পরশু দু'দিন আসতে পারবে
সুকান্ত। শনি-রবি ওদের ফলের গোডাউনে উইকলি হিসেবা
হয় রাত পর্যন্ত। মালদা থেকে মালিক আসে ওই দিনগুলোয়
সুকান্ত জুনিয়র আকাউন্ট্যান্ট হলেও ওকে থাকতেই হয়। এখ
যদি একটু বেরনো যেত, একছুটে একটু দেখা করে আসতে
মন্দিরের মাঠ থেকে। প্রাণটা হু-হু করতে থাকে আরতির। ম
যে কেন একটুও বসছে না! এখনও কতদিন যে এই সব কষ্ট
করতে হবে ওকে! ছটফট করে ঘরের মধ্যেই পায়চারি করে
"কী রে, তুই অমন পেঁচোয় পাওয়ার মতো লাফিয়ে বেড়াচ্ছি
কেন? যা মেয়েটাকে কবিতা শোনা..."

"না দিদুন, আমি কবিতা শুনব না এখন। তুমি আমার কাছে
বোসো," বালিশের আড়াল থেকে পিয়া বলে ওঠে।

"কেন দিদুন, কবিতা শুনবে না কেন? তুমি তো ভালবাসো
রবিঠাকুর শুনতে..."

"কবিতারা অনেক ভিজেছে আজ। ওরা একটু রেস্ট নিক।"
বাড়িয়ে সুবালার শাড়ির আঁচলটা টেনে ধরে পিয়া, "তুমি সে
গানটা একটু গাও, 'তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুে
সুবালা কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রবল বিরোধীপক্ষ বড় মেয়ে
একমাত্র মেয়ে এই নাতনিটির প্রতি অতিমাত্রায় স্নেহপ্রবণ।
কাছে বসে সে, "দেখো কাণ্ড, এখন বুঝি আমার গান গাইবা
সময়?" তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "তোর মা বড় ভা
কত গুণই তো ছিল একসময়। কিছুই কাজে এল না। অদৃষ্ট,
আমার অদৃষ্ট।"

"ও দিদুন, ওসব কথা ছাড়ো। তুমি গাও," বায়না ধরে পিয়া
নাতনির অনুরোধে চোখ বুজে সুর ধরে সুবালা। আর মাকে
শুরু করতে দেখে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ির বাইরে পালায় আর
এখনও পুরো সন্ধ্যে নামেনি। হয়তো এখনও চলে যায়নি সু
কখনও গান শেখেনি সুবালা। স্কুলের শেষ ধাপ পার করার
আগেই শ্বশুরবাড়ি আসতে হয়েছিল। টানাটানির সংসারের
ধরে তাকে ভদ্রস্থভাবে টিকিয়ে রাখার লড়াই করতে হয়েছে
পদে। তবু ছেলেবেলায় বাবার কাছে শেখা রবিঠাকুরের কবি
আর গানটুকু তাকে এখনও ছেড়ে যায়নি। সেই সঙ্গে নিজের
সহজাত ভালবাসা আর সুরেলা গলা, এইটুকুই আছে নিজস্ব
সম্পদ, শত যুদ্ধেও সুবালাকে শক্তি যোগায়। ভেঙে পড়তে-
পড়তে আজও সে মাথা সোজা রাখতে পেরেছে শুধু এই নি
সম্পদটুকুর জোরে। যখনই মন আর চলতে চায় না, বিবিধ
সমস্যা-সংশয়ের বেড়াজাল অতিক্রম করে না, সুবালা আশ্র

ছোট হয়ে আসছে। সুর চলে গিয়েছে দৈনন্দিনতার অন্তরালে। এখন শুধু এই ছোট্ট মেয়েটার আবদারে কখনও বা গান ধরে সুবালা। সেইরকমই একটা মুহূর্তে প্রাণ ঢেলে দেয় প্রিয় গানটায়। একসময় শেষ হয় গান। চুপ করে উপরদিকে মুখ করে শুয়ে ছিল পিয়া। এবার দিদার হাতটা ধরে সে আস্তে-আস্তে প্রশ্ন করে, "মা বুঝি তোমার চেয়েও ভাল গায়?"

"গায় আর কোথায়? বল, গাইত।"

"কেন? কেন মা আর গান গায় না দিদুন?"

"গান গাইবার মন কোথায় তার? দিনরাত্রি মাথায় ধ্বংস ভর করলে কী করে আর সুর থাকবে? নিজেকেও শেষ করল, আমাদের সবাইকে শেষ করে দিল হতভাগী," গলা বুজে আসে সুবালার। "কিন্তু দিদুন, মা তো বলে গানই মাকে ছেড়ে গেছে। গান কী করে ছেড়ে যায় দিদুন? গান কি মানুষ?"

"ধ্বংসের হাওয়া লাগলে সবই ছেড়ে যেতে পারে রে! মানুষ বা গান, কিছুই অবহেলা সহ্য করে না। তোর মা জীবনে অনেক পেয়েও কিছুই ধরে রাখতে পারল না কপালদোষে," আক্ষেপ করে বলে যাচ্ছিল সুবালা। সন্ধে নেমেছে, পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়নি কে ঢুকছে ঘরে। কানের উপর তীব্র আক্রোশ আছড়ে পড়ে, "মা! সব তো গিয়েছে, এখন ওই ছোট মেয়েটার কানেও বিষ ঢোকাচ্ছ? তুমি কি মানুষ? আর কী কী ক্ষতি চাও আমার?"

সকালের ট্রেন অসম্ভব লেট করে বিকেলে এসে পৌঁছেছে। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে স্বাতী সবেমাত্র ঘরে ঢুকছিল। মায়ের বলা শেষ কথাগুলো কানে যেতে তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ে। সুবালাও ছেড়ে কথা বলার মতো মা নয়। সঙ্গে-সঙ্গেই চারগুণ ফোঁস করে ওঠে, "আমি তোমার ক্ষতি চাই? এতবড় কথা তোমার মতো মেয়েই বলতে পারে শুধু! এই সুবালা না থাকলে এতদিন গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হত। বুকে আগলে রেখেছি কিনা... তাই আমাকেই ছোবল দিচ্ছ!"

"খাওয়ার খোঁটা দিও না মা। খুব তাড়াতাড়ি তোমার জ্বালা কমানোর ব্যবস্থা করছি," যতটা জ্বলে উঠেছিল, হঠাৎ ততটাই শান্ত হয়ে মেয়ের পাশে বসে স্বাতী। সারারাত একটুও ঘুম হয়নি। তার উপর ট্রেনটা এত লেট করল। মনটা এত ভার হয়ে আছে... মায়ের কথাগুলো যেন বরফের কুচির মতো এসে পড়ল দুম করে চেঁচিয়ে উঠে এখন আরও বাজে লাগছে। মা যথারীতি কাটা-কাটা কিছু বাক্যবাণ ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল স্বাতীর। আধ-শোওয়া হয়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখ বোজে। রাস্তার চটকানো শাড়িটাও ছাড়া হয়নি। বুকের ভিতর থেকে পিয়া ডাকে, "মা, ও মা!"

"হুম।"

"তুমি এতদিন বাদে এসেই ঘুমিয়ে পড়ছ কেন?"

"এতদিন কোথায়? মাত্র তো তিনদিন..." স্বাতী চোখ বুজে-বুজেই উত্তর দেয়।

"ও মা, একটা গান করো না। সেই যে 'তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে...'"

"এই গানটা কোথায় পেলি তুই?"

"এই তো দিদুন গাইছিল একটু আগে। কী সুন্দর গলা দিদুনের। কিন্তু দিদুন বলছিল, তুমি নাকি আরও ভাল গান গাইতে। আমাকে শেখাবে মা? প্লিজ় আমাকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দাও না। আমি ঠিক রিড ধরে-ধরে বাজাতে পারব দেখো!"

মেয়েকে আরও বেশি করে বুকে চেপে ধরে স্বাতী, "কিনে দেব সোনা। কিন্তু তার আগে তোমার চোখদুটো আরও বড় ডাক্তার দাও আমাকে..."

"আচ্ছা মা, আমি আর বায়না করব না, তোমার সময়মে কিনে দিও। কিন্তু তুমি এখন একটা গান কর প্লিজ়।"

মেয়ের একটা বায়না তো এক্ষুনি কোনও মতেই রাখা সম নয়। পয়সাকড়ির যথেষ্ট টান রয়েছে। প্রেমাংশু টাকাপয়স দিতেই চেয়েছিল। স্বাতী ওই জায়গাটাতে আর মাথা হেঁট পারেনি। যত কষ্টই হোক, প্রেমাংশুর কাছে ও হাত পাত পারবে না। দরকার হলে ভিক্ষে করে মেয়ে মানুষ করবে। পিয়ার আর একটা বায়না, যাতে পয়সা লাগে না, শুধু ম লাগে, সেটাও কি রাখা সম্ভব? সেই মনটাও কি আছে? চিন্তা করে স্বাতী। সত্যি কত যুগ হয়ে গেল... ও একটাও করেনি? কিন্তু কেন? এই গান ছাড়া তো একটা দিনও কা ওর? এতদিন পিয়া বলেনি, কারণ ও সেভাবে কখনও ম গাইতে শোনেইনি। আজ দিদুনের কাছে শুনেছে মায়ের গ কথা। এবার তো দৃষ্টিহীন মেয়েটা তার নিজস্ব জগতে মা গানের একটা যোগসূত্র খুঁজতে চাইবেই। দিন-দিন এই চা আরও বাড়বে। কারণ ওর পৃথিবীর বেশিটাই জুড়ে আছে আর কবিতা। স্বাতী কী করে পারবে মেয়েটার ভিতরের মুছে দিতে? বাইরের অন্ধকার সারানোর চেষ্টা যত কঠিন, চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ভেতরের আলোটায় অন্ধকার দেওয়া।

অনেক, অনেকদিন পর ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে চোখ বুজে ভু যাওয়া সুর গুনগুন করতে চেষ্টা করে স্বাতী। কিন্তু একটা বের হওয়ার আগে দরজা দিয়ে মাথা গলায় করুণাময়। স্বরে বলে, "তুমি গান গাইছ? বাহ, খুব ভাল। এই তো চ নিজেকে সবসময় খুশি রাখতে হবে। কাল থেকে এমন ম করে ছিলে আমি তো ভয়ই পাচ্ছিলাম। এই তো, মেয়েবে অনেক নর্মাল হয়ে গেছ। আমি জানতাম..."

"আঃ করুণা! এত কথা কেন বলো তুমি? আর সেই থে বাড়িই বা যাওনি কেন? আমি তো তোমাকে বললাম ওই রিকশাটাই ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যেতে! এতক্ষণ ধরে এখানে পড়ে আছ..." ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলে স্বাতী। কিন্তু তা করুণাময়ের কোন হেলদোল দেখা যায় না। স্বাতীর বাবা অমলবাবু পাড়ার দোকানে রোজকার বৈঠক সেরে ঘরে ফিরেছেন। ওঁকে দেখে করুণাময় বিগলিত গলায় বলে, " চলে যাব? বাহ, তাই হয় নাকি? বলুন তো মেসোমশাই, একটা ব্যাপারের পর ফেরা হল, সবকিছু ঠিকঠাক আছে দেখে আমি রাস্তা থেকে চলে যাব? আমার একটা ইয়ে অমলবাবু অগ্রপশ্চাৎ কোনও কিছু না শুনেই করুণাময় একবাক্যে সাপোর্ট করেন। "ঠিকই তো, বটেই তো। তুমি খুকুর কথায় কিছু মনে কোরো না। বোসো, দাবাটা নামাই একহাত হয়ে যাক! আর একটু চা..."

"বাবা," স্বাতী বাবাকে ধমকে থামায়, "এখন কোনও দ চা নয়। বাড়ি যাবে করুণা, ওর বাড়ির লোকও ভাবছে..."

"আমি কিন্তু আর একটু থাকতেই পারি। কিছু এমন..." একটু ম্রিয়মান গলায় বলে। এবার পিয়াকে ছেড়ে উঠে স্বাতী, "তুমি যাবে? ঘরে বাইরে এত অশান্তি আমি আর পারছি না..."

"আচ্ছা, আজ আসি তাহলে। কাল সকালে আসব।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়ায় করুণাময়।

পিছন থেকে ডাকে স্বাতী, "না, কাল সকালে আসবে ন বিকেলে এসো..."

“বললাম তো সকালে আসবে না। বাজারে যাওয়ার থাকলে আমি একাই যেতে পারব,” শুকনো কাঠের মতো আওয়াজ স্বাতীর গলায়। চোখেও সেই কাঠ-কাঠ দৃষ্টি। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে করুণাময় বলে, “আচ্ছা বেশ।” তারপর দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়ে যায়। বেশ বোঝা যায় ওর অনিচ্ছুক পাগুলো এই বাড়ির মাটি ছাড়তেই চাইছে না।

স্বাতী এলোমেলো পায়ে এসে বসে খাটে। করুণার উপস্থিতিটা অসহ্য লাগছিল। ওর ওই একগাদা অনর্গল কথা আর অক্লান্ত লেগে থাকাটা এই মুহূর্ত আর নিতেই পারছিল না। যতই অসময়ের উপকারী বন্ধু হোক, কোথায় কখন থামতে হবে, এই জ্ঞানটাই নেই। আর স্বাতী কিছুতেই একেবারে নিজস্ব পরিমণ্ডল ছাড়া কাউকে নিতে পারবে না এখন, পারছেও না। সেই না পারা গড়াবে কতদিন, কে জানে। অমলবাবু এসে মেয়ের সামনে দাঁড়ান। তিনি সাদাসিধে ভালমানুষ। মেয়ের মুখের ভাঙচুর তাঁর নজর এড়ায় না কখনও। মেয়ের মাথায় হাত রাখেন, “খুকু মা, সব মিটে গেল?”

“হ্যাঁ বাবা, জন্মের মতো সব মিটে গেল।” বাবার বুকে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে স্বাতী। সেই কান্না, যা এই বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে কেবল তীব্র বেগে বজ্রপাত সহযোগে বেরিয়ে আসতে চেয়েও পথ পায়নি। বুকের ভিতর গলানো বরফস্রোত হয়ে ধাক্কা মেরে-মেরে ক্ষয় করে গেছে হৃদয়ের তন্ত্রী। মেয়ের মাথায় হাত রেখে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অমলবাবু। পিছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে সুবালা এবং ছোট মেয়ে। তাঁদের চোখগুলোও আর শুকনো থাকে না। ঘটনাটা ঘটবেই, একদিন এটা জানাই ছিল। কিন্তু কিছু-কিছু জানা ঘটনাও চোখের সামনে ঘটে যেতে দেখলে কেমন অজানা পৃথিবীর মতো অনুভূতি হয়। এই পরিবারের প্রতিটি মানুষ সেই অজানার অভিঘাতে দিশাহারা এইমুহূর্তে। শুধু খাটের উপর থেকে পিয়ার সরু গলার প্রশ্ন শোনা যায়, “কী গো, তোমরা সবাই কান্নাকাটি করছ কেন বলতো? আমি কিন্তু সব টের পাচ্ছি। আমি তো বললাম আর হারমোনিয়াম চেয়ে বায়না করব না। ও দিদুন, তুমি আমার মাকে আর বোকোনা গো। মা আবার গান গাইবে বলেছে তো...”

৪

দু’ হাতে দুটো বাজারের থলি নিয়ে পা চালিয়ে আসছিল ন্যাড়া। তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে এখনও লাস্ট ক্লাসটা ধরতে পারবে। প্রায় প্রতিদিনই কলেজে ক্লাস কামাই হচ্ছে। সকালবেলায় হাজার রকম ফিরিস্তি মিলিয়ে বাজার করার থাকলে মর্নিং ক্লাস অ্যাটেন্ড করাই মুশকিল। আর যেদিন থেকে ছোটকাকিমা ফিরে এসেছে ভারতভ্রমণ শেষ করে, তার বাজারের ফর্দ ক্রমশ লম্বা হয়েই চলেছে। তরিতরকারি, মাছ, মাংস এসব তবু একরকম, এক জায়গাতেই মোটামুটি সব পাওয়া যায়। মুশকিল হল, যষ্টিমধু, ভৃঙ্গরাজ, কেশুতপাতা, আমাদা চূর্ণ... এইসমস্ত কবিরাজি জিনিস নিয়ে। ছোটকাকিমা ডাকযোগে কী একখানা কবিরাজি ডিগ্রি করে, প্রায় সারা দেশ ঘুরে এখন বাড়িতে বসে সেইসব বিদ্যের প্রয়োগে মনোনিবেশ করেছেন। কারও সামান্য সর্দি-জ্বর-হাঁচি-কাশি কিছু হলেই আর রক্ষা নেই। এমনকী কিছু না হলেও ধরে-ধরে, টেনে-টেনে নিয়ে নিজের তৈরি ওষুধ বা পাচন গিলিয়ে দিচ্ছেন সম্ভাব্য অসুখের কল্পনায়। আর ন্যাড়া হচ্ছে সেই রোগী তালিকায় সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি। তাকে যত রাজ্যের হাবিজাবি গাছগাছালি মাল নিজের হাতে কিনে আনতে হয়, আবার তার থেকে তৈরি পাচনও গিলে মরতে হয়। রোজ-রোজ এই ফরমায়েসের বাজার করতে হলে শুধু যে পড়ার ক্ষতি তা তো নয়, ন্যাড়ার জীবনমরণ এই ক্লাসক’টাই তো ওর প্রাণের আরাম, চোখের শান্তি। দঙ্গলে বসে থাকা ছটফটে আরতির দিকে তাকালে তো আ কোনও কষ্টই কষ্ট বলে মনে হয় না। দৈবাৎ যদি কখনও অ কোনও কাজে লাগার সুযোগ জুটে যায়, কোনও নোটিস করে এনে দেওয়া বা লাইব্রেরি থেকে বই তুলে দেওয়া, অ প্রয়োজনের মুহূর্তে হাতের কাছে ভর্তি রিফিল পেন সাপ্লাই যা কিছুই হোক, সেদিন ন্যাড়ার লটারি পাওয়ার কপাল। বি টাইমটাও ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

কবজি -লটরপটর করা ঘড়িখানায় চোখ বুলিয়ে হাঁটার স্পি বাড়িয়ে দেয় ন্যাড়া। নামেই দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আসলে এরা ওকে আশ্রয়ই দিয়েছে। ছোটকাকা ওকে নিয়ে এসেছি ইসলামপুরের গ্রাম থেকে। এক মক্কেলের বাড়িতে গিয়ে দে ন্যাড়াকে। ন্যাড়ার বাবার সাধ্য ছিল না খাইয়েপড়িয়ে মানু ছোটকাকা আসছে শুনে লতায়-পাতায় সম্পর্ক ধরে সাহায় চাইতে এসেছিল। ন্যাড়াকে একবার দেখেই কেন কে জানে দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছিল ছোটকাকা। সেই থেকে ছোটকাকা এবাড়ির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল ন্যাড়ার ভাগ্য। বড়মানুষের ব কত লোকজন এখানে এসে নিজের ভাগ্য বানিয়ে ফেরে। থাকা খাওয়া... এমনকী পড়াশোনারও সুযোগ পেয়েছে। নি গুণে সকলের মন জুগিয়ে টিকে আছে। এখন তো শুনতে গ্রাজুয়েশনের পর ছোটকাকা ওকে ল’ পড়াতে চায়। তারপ নিজের সেরেস্তায় ঢুকিয়ে নেবে জুনিয়র হিসেবে। ছোটকাক আলাদা স্নেহ আছে ওর উপর। কিন্তু তাই বলে উকিল হতে কি ও? অত ভাগ্য কি হবে ওর? আগে তো পাস কোর্সে বি পাশ করুক। তারপর ল’ অ্যাডমিশনের জন্য টেনে লড়তে কিন্তু এতসব কবে যে হবে! তার মধ্যে আরতি না চোখের হয়ে যায়। এমনিতে তো দু’-একটা ফাইফরমাস ছাড়া বিশে কথাই বলে না। সেই চান্সটা আরও কমে যায় দেরি করে ক্লা অ্যাটেন্ড করলে। পা চালায় ন্যাড়া।

ধপ করে ব্যাগদুটো রান্নাঘরের মেঝেতে ফেলে দিয়ে একছু থেকে ক্লাসের ডায়েরিটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ছোটকাকি গলা শোনা যায়, “ন্যাড়া, কী রে খালিপেটে রওনা দিচ্ছিস

“আমি ক্যান্টিনে খেয়ে নেব কাকিমা... দেরি হয়ে গেছে,” তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কারণ ও জানে, ছোট এখনই ব্যাগদুটো উপুড় করে মেঝেয় ঢালবে আর ‘এটা কে আসেনি’, ‘ওটা কেন আসেনি’ শুরু করবে। সাইকেলটা গে নিয়ে যেতেই কঠিন গলা আসে পেছন থেকে, “দাঁড়াও...” প্রমীলা অর্থাৎ ছোটকাকিমা এসে ন্যাড়ার হাতে গুঁজে দেন টাকার একটা নোট, “যাও, টাইমমতো কিছু পেটে দিয়ে অ উদ্ধার করো। একজন উদারহস্ত হয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলে করবেন বলে আর ছেলেটার পকেটে কিছু আছে কি না, সে হুঁশ নেই।”

চোখটা ঝাপসা হয়ে যায় ন্যাড়ার। এই মহিলাকে সত্যি বুঝ পারে না ও। কখনও মনে হয় ওঁর মতো নির্দয়, কর্কশ মহি দুটি নেই। কখনও বা ওঁর স্নেহের সামনে মাথা নিচু করে দ থাকতে হয়। অনেক ভেবেছে ন্যাড়া। কেন ছোটকাকিমার এমন... মনে হয় একমাত্র ছেলেটা জলে ডুবে মারা যাওয়ার থেকেই ছোটকাকিমা এমন পাগল-পাগল টাইপ হয়ে গেছে যদিও সে অনেককাল আগের কথা। মাত্র চার বছর বেঁচে সেই ছেলে। কিন্তু কাকিমা সেই কষ্ট এখনও ভুলতে পারেনি ন্যাড়ারও এ বাড়িতে নয়-নয় করে হয়ে গেল আট বছর। প

এসেছিল, তখন প্রমীলাই সবচেয়ে রাগ করেছিল। কাকুর উপর চেঁচামেচি করেছিল উটকো একটা ছেলেকে বাড়ি বয়ে নিয়ে আসার জন্য। ১২ বছরের ন্যাড়া তখন লজ্জায় অপমানে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল বারান্দার এক কোণে। তারপর এই ছোটকাকিমাই ওকে ডেকে তুলে খেতে দিয়েছিল, কোণের ঘর খুলে দিয়েছিল শুতে। সেইদিন থেকে ন্যাড়া ভাবতে শুরু করেছে কেন এই অদ্ভুত বিপরীত আচরণ ওঁর। এতদিন পরে আজও ও একই রকমভাবে ভাবতে-ভাবতে সাইকেলে প্যাডেল করে এগিয়ে যায় কলেজের দিকে।

শিলিগুড়ি কলেজটা শহরের ঠিক মাঝখানে। জায়গাটা



পয়সাকড়ির যথেষ্ট টান রয়েছে। প্রেমাংশু টাকাপয়সা দিতে চেয়েছিল। স্বাতী ওই জায়গাটাতে মাথা হেঁট করতে পারেনি। দরকারে ভিক্ষে করে মেয়ে মানুষ করবে।

কলেজপাড়া বলেই পরিচিত। সামনের বিশাল মাঠটা আগে খোলাই ছিল। হালে তাকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে দেওয়াল দিয়ে। আর্টস বিল্ডিংয়ের দিকের গেট দিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকতে যাচ্ছিল ন্যাড়া। পিছন থেকে প্রিয় গলার আওয়াজে খুশি হয়ে স্লো হয়ে যায়। তিনটে মেয়ের মধ্যমণি হয়ে একটা সিঁড়িতে বসে আছে আরতি। সেখান থেকেই হাত নেড়ে ডাকছে, ''অ্যাই ন্যাড়া, এদিকে শুনে যা...''

ইসস্‌, ন্যাড়া নামটা কি বিশ্রী! যদিও সবাই এই বলেই ডাকে, তবু যেন আরতির মুখে এই ডাক মানায় না। কলেজের খাতায় একটা ভাল সুন্দর নাম তো আছে ওর। নবেন্দু সরকার। আরতির মুখে সেটাই তো শুনতে চায় ও। মুখে সেকথা বলেও ফেলে, ''কেন? আমার ভালনামটা ধরে ডাকতে পারিস না? নবেন্দু!''

আরতি হেসে কুটিপাটি হয়, ''আচ্ছা-আচ্ছা, এবার থেকে সেই নামেই ডাকব নবেন্দুবাবু, কিন্তু তার আগে একটা কাজ করে দে

''কী কাজ? আর তোরা এখানে বসে কেন? ক্লাসে যাসনি?''
''ধুস, আজ তো সব ক্লাসই অফ হয়ে গেল। শিশিরদা, মো
একসঙ্গে অফ। বাকিটা ইউনিয়নের দাদাদের কচকচি,'' দু
বলে মণিকা। ওকে দেখেই বোঝা যায় আচমকা ছুটির খুশি
ন্যাড়াও মনে-মনে হাঁফ ছাড়ে। যদিও এই পাস কোর্সের বি
ডিগ্রিটা দিয়ে জল গরমও হবে না, তবু ক্লাস না করতে পার
খুবই খারাপ লাগে ওর।
''কী রে! কাজটা করে দিবি কি না বল না!'' আরতি সিঁড়ি থে
নেমে এসেছে রাস্তায়। ন্যাড়ার সাইকেলের হ্যাঁন্ডেল ধরে ঝা
ঝাঁকিয়ে বলে। ওর সঙ্গে থাকা বন্ধুরা, মণিকা আর অপর্ণা মু
হাত চাপা দিয়ে হাসছে। ওরা কিছু একটা নিয়ে কথা বলছি
আগেও। এই হাসিটা তারই এফেক্ট। ন্যাড়া সাইকেলটা চেপে
বলে, ''কাজটা কী?''
আরতি সবুজ রংয়ের সালোয়ার কামিজ পড়ে এসেছে। এদি
ওদিক তাকিয়ে একটানে বুকের ভিতর থেকে বের করে এক
চ্যাপ্টামতো চৌকো ধরনের সাদা খাম। ভিতরে ঠিক যেন ক
চিঠি নয়, অন্য কোনও জিনিস ভরা আছে। ন্যাড়া বুঝতে পা
এটা কী হতে পারে। ও ভেবেছিল আরতি নোটস চাইবে হয়
''এটা একজনকে দিয়ে আসতে হবে, আজই। পারবি? নাম
ঠিকানা সব লেখাই আছে। সার্কিট হাউজের কাছে ফলপট্টি
চিনিস তো? রেগুলেটেড মার্কেট? ওখানে সাত নম্বর গুমটি
তুই জাস্ট ওর হাতে দিয়ে বলবি আমি পাঠিয়েছি, ব্যস।'' খ
ন্যাড়ার হাতে তুলে দেয় আরতি। ভাবখানা এমন, যেন হাতে
নিজের হৃদপিণ্ডটাই দিয়ে দিচ্ছে। গোটা-গোটা বাংলায় নাম
সুকান্ত গিরি। যেন ভালবেসে পোষা ময়নাকে উড়িয়ে দিচ্ছে
আকাশে, এমনই যত্নে খামের উপর লেখা নামটায় শেষবা
মতো হাত বোলায়। তারপর মুখেচোখে লেগে থাকা সামান
লাজুক ভাবটা মুছে ফেলে ন্যাড়ার দিকে তাকিয়ে আবার ত
করে ওঠে, ''জিনিসটা ঠিক মতো পৌঁছতে পারলে কাল তো
ক্যান্টিনে ঘুগনি আর আলুরদম খাওয়াব। পাক্কা...'' এমনভা
বলছে যেন ওইদুটো জিনিস না খেতে পারলে ন্যাড়ার প্রাণ
যাবে। বিরসমুখে খামটা হাতে নেয় ন্যাড়া। আরতি নিজে থে
বলছে আর ন্যাড়া কোন প্রাণে না করবে? কিন্তু এই অচেনা
সুকান্ত গিরির উপরে একটা কেমন যেন খারাপ লাগা এসে
মনে। কে এই মানুষটা, বয়স কত? প্রাজ্ঞ কোনও বয়স্ক লো
নাকি ন্যাড়ারই মতো কোনও কলেজপড়ুয়া? কী সূত্রে আর
ওকে? কীই বা আছে এই খামে? একসঙ্গে অজস্র প্রশ্ন হুড়মু
করে ন্যাড়ার গলার কাছে এসে ঠেলাঠেলি করে। কিন্তু বেরো
পারে না। কারণ ন্যাড়ার অত কথা বলার অভ্যাসই নেই। অ
আরতির সামনে তো ও এমনিতেই নার্ভাস হয়ে থাকে। অনে
ভেবেছে নিজেকে পালটাবে। স্মার্ট হয়ে যাবে, কথাবার্তায় তু
হাঁটাচলায় ড্যাশিং। ও জানে মেয়েরা এইরকম ছেলেই পছন্দ
করে। এদের জন্যই দুনিয়ার যত রোশনাই... কিন্তু ভাবনাকে
পরিণত করা হয়নি ন্যাড়ার এখনও। তাই আজও কোনও প্র
করতে পারে না। শুধু তাকিয়ে থাকে আরতির দিকে। আরতি
ঝাঁঝিয়ে ওঠে, ''কি রে ন্যাড়া? চুপ করে কী ভাবছিস এত?
আস্তে-আস্তে ন্যাড়ার ঠোঁটে ফুটে ওঠে। ধীরে-ধীরে ছোটকা
কিনে দেওয়া আদরের সাইকেলটার হ্যান্ডেলে হাত বোলায়
সত্যিই এটা ওর পক্ষীরাজ। এই সাইকেলে বসিয়ে আরতি
ডবলক্যারি করে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোথায় না কোথ
গিয়েছে ও। সেকথা কেউ কি জানে? এ পৃথিবীর কেউ জানে
সেই গোপন কথা। ন্যাড়া সাইকেলে চেপে বসে। এক পা মা

দেখে। তারপর বলে, "আর যদি উনি এটা না নেন?"
"তাহলে আর কী করবি! জিনিসটা তুই-ই নিয়ে নিস," অপর্ণা কথাগুলো বলে দুলে দুলে হাসতে থাকে। আরতি দুম করে একটা কিল বসিয়ে দেয় অপর্ণার পিঠে, লজ্জা লজ্জা মুখে বলে, "যাহ্, কী সব যা তা বকছিস!"
সেই মুখটার দিকে বেশিক্ষণ তাকালে ন্যাড়ার দমবন্ধ হয়ে যাবে। মাথার ভিতর কে যেন স্পোর্টসের মাঠের হুইসল চালিয়ে দেয় জোরে। ন্যাড়ার পক্ষীরাজ কখন আপনমনে কলেজের মাঠ ছাড়িয়ে হিলকার্ট রোড ধরে সোজা এগোতে থাকে মহানন্দা ব্রিজের দিকে। পিছনে পড়ে থাকে অপর্ণা, মণিকার সম্মিলিত হাসির আওয়াজ আর আরতির হঠাৎ লালচে হয়ে আসা মুখ।
রঞ্জিত হোটেল আর সালুজা হোটেলের মাঝামাঝি পর্যন্ত এগিয়েছিল ন্যাড়া। হঠাৎ করে পিছন থেকে নিজের নামটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক-ওদিক তাকায়। রাস্তার ওপার থেকে জোরে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে আসছে করুণাকাকু। ছোটকাকুর বন্ধু। অতিমাত্রায় ভদ্র। নামকরা বড়লোক বাড়ির ছেলে হয়েও এতটুকু অহঙ্কার নেই। বড় মিষ্টি কথা। ন্যাড়া চুপ করে ওয়েট করে করুণাকাকু কী বলে শোনার জন্য। ততক্ষণে করুণাময় এসে পৌঁছেছে কাছাকাছি। দু'হাতে দুটো ভারী ব্যাগ, "একটা ছোট্ট কাজ করে দেবে ন্যাড়াভাই?" লজ্জা-লজ্জা মিষ্টি হেসে বলে করুণাময়। মনে হাসি চাপে ন্যাড়া। ছোটকাকুর বন্ধু হয়েও ওকে ভাই বললে হাসি পাবেই। মুখে বলে, "কী কাজ করুণাকাকু?"
"এই ... এই ব্যাগদুটো একটু তোমার স্বাতীদিকে দিয়ে দেবে?" দু'হাতের ভারী ব্যাগ দু'খানা বুকের কাছ পর্যন্ত তুলে ধরে আবারও লাজুক হাসে করুণাময়। আর খানিক অবাক হয়ে মনে-মনে দ্রুত ভেবে নেয় ন্যাড়া। স্বাতীদি মানে আরতির দিদি। ওদের বাড়িটা অবশ্য ন্যাড়াদের বাড়ির থেকে খুব দূর নয়। আগে-আগে ন্যাড়া খুব যেত। কিন্তু যেদিন থেকে রাতের অন্ধকারে আরতির মুখটা ঘুরেফিরে আসতে শুরু করেছে বন্ধ চোখের পাতার ভেতরে, ও আর ও বাড়িতে যেতে পারে না। কিছু একটা সঙ্কোচ এসে পায়ে শেকল পরিয়ে দেয়। মনে হয়, সবাই বুঝি ওর চোখের দিকে তাকালেই সব চিন্তাগুলো ধরে ফেলবে। চুপ করে করুণাময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে ন্যাড়া। সেই তাকানোর সাধারণ মানেটাই করে করুণাময়, "তোমার কি আপত্তি আছে ন্যাড়াভাই? আসলে আমি আর এত বেলায় ওদিকটায়... আমার একটা অন্য কাজ আছে কিনা..."
আসল কথাটা অন্য। স্বাতী বারবার করে বলে দিয়েছে করুণাকে সে যেন কোনও বাজার না করে। একটা টাকারও জিনিসপত্র না কেনে। এমনকী স্বাতীদের বাড়ী যাওয়ার সময়টুকুও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তার আগে বা পরে কখনওই ও বাড়ি যাওয়ার স্বাধীনতা নেই করুণাময়ের। কিন্তু তার যে সারাক্ষণ ওখানেই পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে। মন চায় স্বাতীর জন্য, পিয়ার জন্য গোটা শিলিগুড়ি মার্কেটটাই কিনে ফেলতে! এসব কথা কাকেই বা বোঝাবে সে? আর বলতে গেলেও কে-ই বা শুনবে? ওই কঠিনপ্রাণ তেজি মহিলার সামনে গুছিয়ে কথা বলার ভাষাই বা কোথায় বজায় থাকে? পতঙ্গ যেমন পুড়বে জেনেও কেবল আগুনের দিকেই ধেয়ে যায়, করুণাময়ও তেমনই কোনওরকম আশ্বাসমাত্র না পেয়ে কী এক ব্যাখ্যাহীন আকুলতায় সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে বৃত্তাকারে ঘুরে-ঘুরে যায় স্বাতীর চারপাশে। করুণাময় জানে, স্বাতী নিক না নিক, গ্রহণ করুক বা না করুক, নিজেকে নিঃশেষ করতেই হবে ওর কাছে। তাই একগাদা জিনিস কিনে ফেলেছে স্বাতীর জন্য, পিয়ার জন্যও। সেদিন পিয়া হারমোনিয়ামের কথা বলছিল, দরজার বাইরে থেকে শুনেছে ও। সেটাও কিনে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু একেবারে কিছু

পিয়ার জন্য বেশকিছু দামি জামা, কেক, বিস্কুট, ক্যাডবেরি
স্বাতীর জন্য তিনখানা দামি শাড়ি... এই পর্যন্ত কিনেই আ
মতো ক্ষান্ত দিতে হয়েছে।
"কী হল ন্যাড়াভাই? তোমার প্রবলেম আছে কিছু? কিছু
"না না প্রবলেম নেই ঠিক..." ন্যাড়া ভাবছে অন্য কথা।
ব্রাউন খামটা পৌঁছে দিতে হবে কোথাকার কোন এক সুক
গিরিকে। এই অ্যাত্ত মাল নিয়ে অতদূর রেগুলেটেড মার্কে
ও যাবে কী করে? সাইকেলের দু'দিকে দুটো ব্যাগ যদি ঝু
নেয়, ব্যালান্স ঠিক রেখে চালাতে পারবে কি? শেষে রাস্
মধ্যে পড়ে গিয়ে একটা কেলেঙ্কারি হবে না? কিন্তু কী-ই
যদি এই খামটা জায়গা মতো না পৌঁছয়? কে এই সুকান্ত
ক'দিনের আলাপ আরতির সঙ্গে ওর? ন্যাড়ার মতো আর
সঙ্গে সারা পাড়া ঘুরে-ঘুরে কি সে 'চোর পুলিশ' খেলেছে
কখনও? কোনওদিন সারারাত জেগে আরতির প্র্যাক্টিক্যা
এঁকে দিয়েছে? মলাট দিয়ে দিয়েছে আরতির বইখাতায়?
পাড়া খুঁজে-খুঁজে জোগাড় করে এনেছে আরতির ওয়ার্ক
ক্লাসের জন্য মাটির পুতুল? সুকান্ত গিরি কি কখনও রেজ
আগের দিন নিজের জন্য না চেয়ে শুধু আরতির জন্য মন্
নিয়ে এসেছে প্রসাদী ফুল? যদি এই এইগুলোর কোনওটা
করে থাকে, তবে তার কি অধিকার আছে আরতির কাছ
খাম পাওয়ার চুলচেরা বিচার করে করে ডিসিশন নিয়েই
ন্যাড়া। নাহ ... যাবেনা সে রেগুলেটেড মার্কেট। আরতির
কথার খেলাপ হবে? হোক, নাথিং ইজ় আনফেয়ার ইন ল
ওয়ার। পুরনো তাপ্পিমারা জিনসের পকেটে হাত চালিয়ে
একবার দেখে ন্যাড়া। এই খামের মধ্যে যাই থাকুক, তাতে
কারও নয়। একমাত্র ন্যাড়ারই অধিকার। আজ না বুঝলে
আরতি নিজেই বুঝে নেবে সেই কথা।
"আপনি কোনও চিন্তা করবেন না কাকু। আমি ঠিকঠাক
দেব। স্বাতীদির হাতেই দিতে হবে তো?"
"না... মানে... হ্যাঁ... মানে স্বাতী যদি বাড়ি না থাকে!"
"তাহলে আরতির কাছেই দিয়ে আসব। আপনি চিন্তা কর
ন্যাড়া চটপট সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দেয়। মনে-মনে
করে, যেন আরতির সঙ্গেই দেখাটা হয়ে যায়। আরতিকে
পাওয়ার কথা ছিল কাল সকালে। সেখানে অপ্রত্যাশিতভ
এখুনি দেখতে পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মনে
ভালমানুষ করুণাকাকুকে ধন্যবাদ জানায় ন্যাড়া। ওর পক্ষী
তখন উড়ে চলেছে হিলকার্ট রোড পার করে, বিধান রোড
ছুঁয়ে। পাকুড়তলার মোড় ছাড়িয়ে নজরুল সরনির শেষ ম
যেখানে ডানদিকের গলি দিয়ে কিছুটা এগোলেই বেড়া ঘে
বাড়িটায়, বিশাল কাঁঠাল গাছের ছায়ায় দু'খানা প্লাস্টারহী
একটায় আছে ন্যাড়ার দিনরাত্রের নায়িকা, যে এখনও নি
চেনে না, কোনও এক সুকান্ত গিরির ভুল স্বপ্নে বিভোর হ
ন্যাড়া জোরে চালায়। আরও জোরে চালায় তার পক্ষীরাজ
স্বপ্নটার জাল ছিঁড়ে সেই মেয়েটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব
আসতে হবে প্রখর বাস্তব আলোয়। যাতে খামের উপর
মতো লেখা হয় শুধুই নবেন্দু সরকারের নাম।

৫

হাতঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি কাপড়ের ব্যাগ
টেবিলে রাখা বই ক'খানা ঢুকিয়ে নেয় প্রেমাংশু। ঝকঝকে
করা ধুতির পাটে পাট মিলিয়ে পড়া আগেই হয়েছিল। এ

চিরুণি বোলায়। আর বেশিদিন একাজটারও দরকার হবে না। লম্বা আয়নায় একনজরে নিজেকে দেখে নিয়ে সামান্য হাসে। ক্রমশ কপালটা চওড়া হয়ে আসছে। যদি না ও স্বনামধন্য প্রেমাংশু স্যার হত, যদি না ও প্রায় ছ'ফুটের উপর লম্বা হত এবং যদি না ওর মেদহীন শরীরে পিতৃদত্ত সুসঙ্গত নাক চোখ ও ঠোঁটের সমাহার থাকত, লোকে তবে এতদিনে ওকে একজন টেকো মধ্যবয়স্ক মানুষ বলেই মনে করত। অন্তত ওর নিজের তো তাই মনে হয়। কিন্তু এরকমটা তো হয়ইনি, বরং উলটোটাই এখনও হয়ে চলেছে। যে দু'একজন বিরল বন্ধু আছে ওর, তার মধ্যে সুহাস একজন। সুহাস বলে দিন-দিন প্রেমাংশুর গ্ল্যামার নাকি বেড়েই যাচ্ছে, যাকে বলে আনডিফাইং অ্যাপিল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমনকী কলেজে নতুন আসা জুনিয়র কোলিগদের মধ্যেও প্রেমাংশুর ক্রেজ দেখলেই সেটা বোঝা যায়। এসব কথাকে প্রেমাংশু অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। এসব নিয়ে ভাবতে গেলে মনের যে সামান্য হালকা ভঙ্গি থাকা দরকার, সেসব চলে গেছে বেশ কয়েকবছর আগেই। আরও একবার নিজের উঁচু মাথাটা প্রায় আয়নার শেষমাথায় ঠেকিয়ে ঘরের বাইরে এগিয়ে যায় প্রেমাংশু। প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিল বারান্দা পার করে। ওপাশের ঘর থেকে বের হয়ে আসে রঞ্জনা। হাতের থালায় চারখানা ধোঁয়া ওঠা গরম রুটি, থালার উপর একবাটি তরকারি। বড় সাইজের একখানা রসগোল্লা। বেশ পরিপাটি করে জলখাবার সাজিয়ে এনেছে সে। কিন্তু প্রেমাংশুকে দেখেই থেমে যায়।

"এ কী ! আপনি চলে যাচ্ছেন? আমি যে খাবার নিয়ে এলাম..."

থেমে যায় প্রেমাংশু। চওড়া কপালে ফুটে ওঠে বিরক্তি, "তোমাকে তো বারণ করা হয়েছে বহুবার। এভাবে নিষেধ অমান্য করলে তো আমার পক্ষে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে।"

রঞ্জনা একবার চোখ তুলে তাকিয়েই মাথা নামিয়ে নেয়, "আজ এনে ফেলেছি। খেয়ে নিন... আর কখনও আনব না।"

"শোনো রঞ্জনা, গত তিনমাস ধরে এই একই কথা শুনছি আমি। এরকম চলতে থাকলে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গা খুঁজে নিতে হবে। আমার বাড়ির কাজের লোক নও তুমি। আমার রান্নার দায়িত্বও কেউ দেয়নি তোমাকে। বেটার নট টু ফরগেট ইয়োর লিমিটস। আমি এসব পছন্দ করছি না।" কঠিন কঠোর গলায় কথাগুলো বলে প্রেমাংশু। একবারও তাকিয়ে দেখে না সামনের মানুষটির মুখের দিকে। দেখে না কীভাবে ধীরে-ধীরে চুপসে যাচ্ছে ধোঁয়া ওঠা গরম রুটিগুলো। থালা হাতে ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা রঞ্জনার মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে সিঁড়ির পাশে রেখে দেওয়া স্যান্ডেলে পা গলিয়ে হনহন হেঁটে যায় গেট পেরিয়ে। কথা হচ্ছিল কলেজের পাশের গলিতে মোতিদার চায়ের দোকানে বসে। প্রায় একমাস সুহাস ছিল না ব্যান্ডেলে। ব্যবসার কাজে নর্থ বেঙ্গল গিয়েছিল। গতকালই এসেছে। এসেই সকাল থেকে বারবার জরুরি ফোনের নাম করে ডেকে যাচ্ছিল। প্রেমাংশু ভেবেছিল রাত্রে দেখা করবে। কিন্তু অপেক্ষা শব্দটা সুহাসের ধাতে নেই। সেই স্কুললাইফ থেকেই ও একরকম রয়ে গেল। তিন নম্বর ক্লাস নিয়ে বেরোনোর সঙ্গে-সঙ্গেই সবক'টা দাঁত বের করে সুহাসকে টিচার্স রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রেমাংশু।

"কী রে? একেবারে এখানে চলে এলি? বললাম তো সন্ধ্যেবেলা যাব তোর বাড়ি!" প্রেমাংশু বিরক্ত হয়ে বলে।

"আরে ধুস, বাড়িতে সব কথা হয় নাকি? এ হল ফ্রেন্ড টু ফ্রেন্ড টক। চ' না মোতিদার দোকানটায় বসি গিয়ে..."

"এখন? এই বেলা দুটোর সময়?"

"কেন... তোর ক্লাস তো হয়ে গেছে!"

তোলে অনুসন্ধিৎসু। মুখে অবশ্য অনিচ্ছা দেখাতে কার্পণ্য ক
না প্রেমাংশু, "তোর তো একটাই সাবজেক্ট। জানি আমি। তা
একটা মিটিংও আছে আমার।"

"আমি ওয়েট করছি। ওগুলো ম্যানেজ করে আয়," সুহাস
গম্ভীরমুখে একটা ভাঙা বেঞ্চ খুঁজে বসেছিল করিডরের এক
খানিক বাদে দুই বন্ধু গুটি-গুটি কলেজ বাউন্ডারির পিছনে
মোতিদার দোকানে এসে ঢুকেছে। এই জায়গাটায় স্টুডেন্টরা
করেনা। তাদের জন্য অন্য দোকান রয়েছে কলেজের সামনে
দিকে। তাছাড়া রয়েছে কলেজ ক্যান্টিন। এটা একটু পিছনের
দিকে বলে দুপুরবেলাটা ফাঁকাই পাওয়া গেছে। মোতির বানা
স্পেশ্যাল চায়ে লম্বা করে চুমুক দিয়ে তাকায় প্রেমাংশু, "এই
বল কী সাঙ্ঘাতিক কথা, যা সন্ধ্যেবেলায় বলা যাবে না..."

সুহাস এতক্ষণ যতই হাঁসফাঁস করুক এখন আর ওর মধ্যে
ব্যস্ততা দেখা যায় না। ধীরেসুস্থে চা খেতে-খেতে পা দোলাতে
থাকে। এতখানি বয়স হয়েছে, সেটা ওর হাবভাব দেখলে কে
বুঝবে না। অন্যসময় হলে প্রেমাংশু হাসত, কিন্তু এখন ওর
লাগছে। সকাল থেকেই আজ মুডটা ভীষণ খিঁচড়ে আছে। ক্লা
দু' একজনের সঙ্গে রাফ ব্যবহার করে ফেলেছে। ওকে স্টুডে
অত্যন্ত ভালবাসে, তাই সবাই চুপ করে ছিল। নইলে এখন য
দিনকাল, তাতে লেকচারারদের খুবই সতর্ক থাকতে হয় ক্লা
বিরক্তিমাখা মেজাজে বলেই ফেলে প্রেমাংশু, "শোন সুহাস,
ফালতু আড্ডা দেওয়ার টাইম নেই আমার। যা বলতে এসেছি
তাড়াতাড়ি বলে ফ্যাল। আমাকে কলেজে ফিরতে হবে।"

সুহাস চা শেষ করে চুপচাপ সিগারেট ধরায়। মৌজ করে টান
মেরে এতক্ষণে একটু যেন সিরিয়াস হয়। পা দোলানিটা থেমে
ওর,"কী হয়েছে রে তোর? মুখটা সেই থেকে বেগুনের মতো
রেখেছিস..."

সুহাসের হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে একটা টান দিয়ে ফের
দেয় প্রেমাংশু। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, "আরে ধ্যাত! এ
কথা বার-বার বলে বলে বোঝানো যায় না। রোজ এক ব্যাপা
ডিসগাস্টিং!"

"ওহ... আবার সেই রঞ্জনা অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট কেস? আজকে
"আবার কী? আজও সেই একথালা খাবার নিয়ে সামনে দাঁ
সেদিন তো তুই দেখলি আমি কিভাবে বারণ করলাম। তাছা
কি সকালে নাকি? আমি বাড়ি থাকলে তো লাঞ্চ থেকে ডিনা
কিছুই বাদ নেই। আমি বিকেলে বাড়ি ঢোকাই বন্ধ করে দিয়ে
একবারে হোটেলে খেয়ে রাত্রে ফিরি। এভাবে চলে? মানুষ ব
করলে শুনবে না?"

একবারে অনেকটা কথা বলে ফেলে প্রেমাংশু থামে। সুহাস
চুপচাপ শুনছিল। এবার গম্ভীর গলায় বলে, "বুঝলাম..."
আবার তেতে ওঠে প্রেমাংশু, "কী বুঝলি? কী বুঝলি শুনি?"
সুহাস শান্ত। একটু হাসে, "তা তোরই বা এত কীসের আপত্তি
খেতে দোষ কী আছে? আমাকে যদি কেউ এমন যত্ন করে
খাওয়াতো..."

প্রেমাংশু উঠে পড়তেই যাচ্ছিল। সুহাস হাত ধরে টেনে বসায়
ওকে, "শোন, আমি খবর নিয়েই এসেছি। এখন আর কোনও
ক্লাস নেই তোর। চুপচাপ বসবি। কথা আছে আমার।"

"প্লিজ় সুহাস, এসব কথা শোনার টাইম নেই আমার। যেতে
দে আমাকে," প্রেমাংশু গোঁজ মুখে বলে। সেই স্কুল লাইফ
থেকে বন্ধুত্ব ওদের। জীবনের অনেক বাঁক পেরিয়ে, অনেক কি
হারিয়েও এই সম্পর্কটা একই আছে। সুহাস তাই একটুও রাগ
করে না। ঝুঁকে আসে প্রেমাংশুর দিকে। কিন্তু কিছু বলার আ

আমার বাড়ির কাজের লোক নয়, রাঁধুনিও নয়। ও কষ্ট করে রাঁধবে আর আমি খাব, এটা আমার রুচিতে বাঁধে। ওর প্রয়োজন ছিল, আমি ওকে শেল্টার দিয়েছি। ব্যস... এইটুকুই সম্পর্ক। কথাগুলো তো প্রথমদিনেই আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি,'' সামান্য থেমে দম নেয় প্রেমাংশু। "তাছাড়া আজ রান্না করবে, কাল আমার ঘর গোছাতে আসবে, পরশু জ্বর হলে জলপট্টি দেবে... না...আমি কিছুতেই এগুলো অ্যালাও করব না।''

"রঞ্জনা তোকে ভালবাসে। ওকে আর কষ্ট দিস না। বিয়ে কর ওকে। আমি বলছি সুখী হবি তুই...'' সুহাসের কথা শেষ হয় না। ছিলাছেঁড়া ধনুকের মতো টঙ্কার দিয়ে ওঠে প্রেমাংশু, "ভালবাসা? আবার বিয়ে? সুখ? এই শব্দগুলো একটাও আমার জন্য নয়। তোর চেয়ে বেশি তো কেউ জানে না।''

"না ... আমিও জানি না। যা ঘটেছে, সেটা একটা মিসহ্যাপ। এখানেই সব কিছু শেষ হতে পারে না। তোর জীবনের অর্ধেকটা এখনো বাকি আছে। নতুন করে শুরু কর। একটা মেয়ে দিনরাত তোর দিকেই তাকিয়ে আছে, কেন দেখতে পাচ্ছিস না? পাথর হয়ে গেছিস?''

এবার বেশ জোরেই হেসে ওঠে প্রেমাংশু , "হ্যাঁ রে...পাথরই হয়ে গেছি। যাক গে, রঞ্জনাকে আমিই শেল্টার দিয়েছি যখন ও থাক ওখানে। আমিই একটা মেস-টেস দেখে নিচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। যা বললি তুই, তারপর এক বাড়িতে থাকা উচিত হবে না।''

"কেন? তুই নিজেও কি জানতিস না কথাটা? আমাকে মানতে হবে প্রেমাংশু মুখোপাধ্যায় এতটাই ইনসেন্সিবল?'' শ্লেষ ঝরে পড়ে সুহাসের গলায়।

"নাহ... আমার আর এই পৃথিবীর কোনও কথা জানার ইচ্ছে নেই। আমি আর আমার কলেজ, এইটুকু হলেই চলে যাবে বাকি জীবনটা,'' এবার সত্যিই উঠে দাঁড়ায় প্রেমাংশু। ঝোলা ব্যাগটা গুছিয়ে কাঁধে নিতে-নিতে বলে, "কিন্তু এই তোর সাঙ্ঘাতিক ইম্পর্ট্যান্ট কথা সুহাস? তোর বউয়ের সামনে এটা বলা যেত না সন্ধেবেলা? ফালতু আমার মিটিংটা নষ্ট করলি ...''

সুহাসও উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নড়ার লক্ষণ দেখায় না। বরং যেন মাটিতে আরও শক্ত হয়েই পা দু'টো গাঁথা হয়ে গেছে, "না রে, কথাটা অন্য। আমি শিলিগুড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে স্বাতীর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'' প্রেমাংশুর উদ্যত পা থেমে যায় স্বাতীর নাম শুনে। একটাও কথা না বলে তাকিয়ে থাকে সুহাসের দিকে।

"শোন, স্বাতী খুব হেসে-হেসে বিধান মার্কেটে বাজার করছি । সঙ্গে ছিল ওর ওই বন্ধুটা... ওই করুণাময় না কী যেন' আর হ্যাঁ, পিয়াও ছিল। পিয়াকে খুবই যত্ন করে ধরে- ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ওই লোকটা। প্রথমে ওরা একটা বাচ্চাদের জামাকাপড়ের দোকানে ছিল। সেইসময় আমি ওদের দেখতে পাই। তারপর আর আমি চোখছাড়া করিনি। দেখছিলাম কী করে। তারপর ওরা একটা মিউজ়িক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের দোকানে ঢোকে। তারপর...''

প্রেমাংশুর মুখটা স্বাতীর নাম শুনে মুহূর্তের জন্য ছাইয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল। পিয়ার নাম শুনে দু' সেকেন্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হৃদস্পন্দন। সুচতুর অভিনেতার মতো প্রাণপন বলপ্রয়োগ করে প্রেমাংশু ফিরিয়ে আনে বাহ্যিক স্বাভাবিক চেহারা। পাথুরে গলায় বলে, "কিন্তু এসব কথা আমাকে বলছিস কেন? তোর বিজ়নেস টুরে হাজার মানুষের সঙ্গে তো দেখা হতেই পারে...''

সুহাস বন্ধুকে চেনে নিজের হাতের তালুর মতোই। কাঁধে হাত রেখে হাসে, "বলছি কারণ স্বাতী হাজার মানুষের চেয়ে আলাদা। বলছি কারণ তোর জানা দরকার, কার জন্য তুই নিজের জীবনটা নষ্ট করছিস।''

থাকে না।'' বেশ... আর নষ্ট করবো না জীবন। এবার থেকে
করব নিজের মতো। তুই খুশি তো? এবার যাই?'' লম্বা পা
এগিয়ে যায় সামনের দিকে। পিছনে সুহাস দাঁড়িয়ে থাকে।
থাকে না বাল্যবন্ধুটি এগিয়ে যাচ্ছে। বলে যায় নিজের মনে,
মানে, প্রেমাংশু? কী বলছিস? আমি বুঝতে পারলাম না।''
রাস্তা অবধি এগিয়ে গিয়েও ঘাড় ঘুরিয়ে হাসে প্রেমাংশু। হ
নাড়ে, "বোঝার চেষ্টা করিস না। দেখতেই পাবি... ক'টা দিন
অপেক্ষা করে যা!''

৬

নীচের অফিসঘরে ছিলেন উমাদেবী। পুরনো আমলের ১২
১২ অফিসঘর। দু'দিকে দেওয়ালজোড়া ভারি কাঠের আট-
ফিট লম্বা র‍্যাক। উপরের দিকটা সার-সার ফাইল দিয়ে ভ
ওগুলোয় এখন আর হাত পড়েই না বলতে গেলে। জীবনম
সময়ের যাবতীয় ফাইলপত্র যত্ন করে রাখা আছে ওই র‍্যাকে
এবং অন্যপাশের লোহার আলমারিতে। র‍্যাকের সামনে ব
আবলুস কাঠের টেবিল, যাকে ঘিরে রেখেছে পাঁচখানা পেল্লা
সাইজ়ের চেয়ার। টেবিলের উলটোদিকের দেওয়ালে সাজা
হয়েছে হালআমলের সোফাসেট সেন্টার টেবিল দিয়ে। উমা
নিজে বিশাল মাপের ইংলিশ ডিজ়াইনের চেয়ারে বসতেই
করেন জীবনময়ের উত্তরসূরী হিসেবে। আজও তাই বসেছি
সামনে দাঁড়ানো প্রবীরবাবু, "মা, কাল আপনি সই করতে
জায়গায় বাদ পড়ে গেছে...'' ফাইল খুলে একটা পৃষ্ঠা উমা
চোখের সামনে মেলে ধরেন প্রবীরবাবু। উমা একবার তাকি
চোখ সরিয়ে নেন। "ওটা বাদ পড়ে যায়নি। আমি ইচ্ছে কর
করিনি। ওটুকু কানুকে দিয়ে করিয়ে নাও।''
"কিন্তু... উনিও তো সই করবেন না বললেন। কী মুশকিল
এরকম দেরি হলে তো অনেকটা ক্ষতি হয়ে যাবে...'' প্রবীর
বিব্রত গলা শোনা যায়।
মেঘদূত সিনেমার শেয়ার ফাইল নিয়ে এই গণ্ডগোল আজ
এরকম আরও কিছু প্রপার্টির ফাইল আছে, যেগুলো সময়
করানো একটা ঝকমারির কাজ। মা, ছেলে দু'জনেরই চরম
যেন। আর বড় ছেলের সই এখানে কাজ করবে না। হয় উম
নয় ছোটছেলে করুণাময়, যে কোনও একজনকে সই করতে
হবে, এরকমটাই নির্দেশ ছিল কোর্টের। এই সিনেমাহলের
প্রপার্টিলিস্টে যোগ হয়েছে অনেক লড়াইয়ের পর, যা কোন
মতেই সুখস্মৃতিবাহক নয়। তাই আজও এতবছর পরেও এ
ব্যাপারে যে-কোনও সইসাবুদেই এঁদের আপত্তি। হয়তো
ডগায় অতীতের গ্লানি এখনও পরিবাহিত হয়ে চলেছে। দু'-
মুহূর্ত উমাদেবী বসে থাকেন স্তব্ধ হয়ে। হয়তো নিজেকে ফি
আনতে চেষ্টা করছিলেন বর্তমানে। প্রাণময় এসে ঢোকে, "
জিজ্ঞাসু চোখে তাকান উমাদেবী।
"মা, কানু এসেছে। কিছু বলবে হয়তো...''
"তাকে তোমার সাহায্য নিতে হচ্ছে আমার সামনে এসে দাঁ
জন্য?'' গলায় স্পষ্ট বিরক্তি।
"না, মানে ও একাই আসছিল। আমিই বললাম...'' প্রাণময়
নিচু করে ঘাড় চুলকোয়। এতখানি বয়স হল, এখনও মায়ে
চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলতে আটকায় তার। আসল
হল করুণাময় কিছুতেই আসতে চাইছিল না। কলকাতা থে
আসার পর প্রাণময় অন্তত পাঁচ ছ'বার বলেছে মায়ের সঙ্গে
করার কথা। কিন্তু সে খালি এড়িয়ে-এড়িয়ে চলছিল। কেব

ভাইকে তিনতলার কোণার ঘর থেকে এই অফিসঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

"কী আশ্চর্য কানু, তুই মাকে অ্যাভয়েড কেন করছিস বল তো? তোর কথাটা তো তোকেই বলতে হবে নাকি? মা তোর কেবল খোঁজ করছেন!" বিরক্ত হয়ে বলেছিল প্রাণময়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আজ ধরেই এনেছে ভাইকে। এখন মায়ের সামনে এগুলো তো বলা যায় না।

"কী ব্যাপারটা হল বল তো? আমি কি তোমার ভাইয়ের জন্য সব কাজ ছেড়ে বসে থাকব? কোথায় সে?" উমাদেবীর কথার সঙ্গে-সঙ্গেই করুণাময় এসে দাঁড়ায় সামনে। এসে চুপ করে তাকিয়ে থাকে মেঝের দিকে।

উমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছোট ছেলের দিকে তাকান। তারপর বলেন, "কবে ফেরা হয়েছে কলকাতা থেকে?"

"চারদিন হল।"

"আজ সময় হল মায়ের সঙ্গে দেখা করার?"

করুণাময় কিছু বলার আগেই প্রাণময় ভাইকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে, "না মানে ও তো এসেছিল! কী রে বল না..."

"থাক... তুমি থামো।" প্রাণময়কে ছোট্ট করে ধমক দিয়ে করুণাময়ের দিকে ফেরেন উমা, "তা ওদিকে সব মিটল?"

"হ্যাঁ, মানে ওই আর কী..."

"তুমি পরিষ্কার করে কথা বলতে পারো না? স্কুলে কাজ করো কী করে? লোকজন মানে তোমায়?" ছোটছেলের এই মিনমিন করে কথা বলার ভঙ্গিটি আরও যেন রাগিয়ে দেয় উমাদেবীকে।

"হ্যাঁ, ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে!" গলা খাঁকরি দিয়ে বলে করুণাময়। মায়ের সামনে এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন ওর পক্ষে। এই কথাটা উঠবে, জানাই ছিল। তাই এই ক'দিন অ্যাভয়েড করে গেছে দেখা হওয়াটা। আজ আর সম্ভব হল না। এক বাড়িতে থেকে সেটা বেশিদিন কী করেই বা সম্ভব!

"হুউম!" বেশ বড় একখানা হুঙ্কারের মতো আওয়াজ করে হাতের পেপারওয়েটখানা ঘোরাতে থাকেন উমা। দুই ছেলে চুপচাপ। তারা জানে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আগে এভাবে একটু দম নেওয়াটাই মায়ের অভ্যাস। করুণাময় একটু উসখুস করে মনে-মনে। কেন জানি ওর বেশ অস্বস্তি রয়েছে ভেতরে। মাকে ফেস করতে চাইছে না মনটা। কিন্তু এসে যখন পড়েছে আর কোনও উপায় নেই। মাকে বাদ দিয়ে জীবনের কোনও পথ চলতেই শেখেনি ওরা। আর প্রাণময় মায়ের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকে। কী বোমা ফাটাবে, তার কিছু আন্দাজ ওর আছে বই কী। এইসব মুহূর্তে মাকে সামলানোর জন্য নিজের বউটাকেই সেরা বলে মনে হয়। কিন্তু এইসব জরুরি সময় মায়ের আবার তাকে একদম নাপসন্দ।

"বেশ, ঠাকুরমশাই ভালমানুষ। তোমার বাবার অনেক কালের পরিচিত। আমিও তাকে শ্রদ্ধা করি। তার একটা সমস্যায় সাহায্য করেছ, তার মেয়ের প্রয়োজনে যথাসাধ্য পাশে থেকেছ, খুব ভাল। কিন্তু আর তো ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন দেখছি না আমি। ওখানে গিয়ে আর এতটা সময় নষ্ট করার কোনও দরকার নেই।"

কেটে-কেটে একটা-একটা করে শব্দ উচ্চারণ করেন উমা। তারপর সার্চলাইটের মতো দৃষ্টি ফেলেন ছোটছেলের মুখে। প্রাণময়ও অবাকই হয়েছে কিছুটা। মা ক'দিন ধরেই কানুকে খুঁজছিল। কিন্তু দেখা হতেই যে এই কথাটা বলবে সবার আগে, এটা ওর ধারণায় আসেনি। একটু অবাক হয়েই ভাইয়ের মুখের দিকে তাকায় সে। করুণাময় ওদের ভাই বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ফর্সা। মুহূর্তে সেই করে, "কিন্তু মা, আমি তো ও বাড়িতে ঠিক এমনি-এমনি তে না! আমি তো..."

কথা শেষ করতে দেন না উমাদেবী। এককথায় থামিয়ে দেন ছোটছেলেকে, "যে কারণেই যাও বা গিয়েছ এতদিন... আর যাওয়ার প্রয়োজন নেই কোনও। এবার এসো তোমরা। বাকি কাল হবে ম্যানেজারবাবু, ফাইলগুলো দিন দেখি। আর হ্যাঁ প্রতিমাসে এই সই নিয়ে ঝামেলাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তো বলে দিয়েছি সিনেমাহলের ফাইলটা তুমি দেখে নেবে, এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।"

ম্যানেজারের হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে করুণাময়ের দিকে ঠে দেন উমা, "নাও সইগুলো করে দাও!"

ভাইয়ের নিচু করে রাখা মুখটা দেখে প্রাণময় চুপ থাকতে পারে না। নিয়মবিরুদ্ধ জেনেও রেসকিউ অপারেশনে এগিয়ে আসে, "কিন্তু মা, কানু বোধহয় কিছু বলতে চাইছে। ওর কথ একবার..."

এবার নাকের উপর নেমে আসা সোনার চশমার ফ্রেমটার উ দিয়ে বড়ছেলের দিকে তাকান উমাদেবী, "না, কোনও কথা শোনার সময় আজ আর হবে না আমার। তাছাড়া ওর কথা বলতে দাও। তোমাকে মুখবন্ধ করতে তো কেউ বলেনি। যে ও নিজে উচ্চারণ করতেই পারল না, সে কথাকেও কি দাম দি চলতে হবে? এসব ক্ষেত্রে আমি ভেবে নিতে ভালবাসি যে অ কোনও কথাই ছিল না।"

সুস্পষ্ট উচ্চারণ। সঙ্গে কোথাও বুঝি মিশে আছে প্রচ্ছন্ন নেতি সুচিন্তিত মতামত। এরপরে আর কোনও কিছুই বলা চলে না অন্তত অত কথা বলার চল নেই এবাড়িতে। গত কয়েক দশব এই বাড়ি প্রবলভাবে চলছে উমাদেবীর অনুশাসনে। এই বাড়ি ভিতরে কারও সাধ্য নেই সেই নিয়মের অন্যথা করে। এখানে আজও উমাদেবীর কথাই শেষকথা।

মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে প্রাণময়। আর করুণাময় চেয়া টেনে বসে পড়ে সিনেমাহলের শেয়ার ফাইলে সই করতে।

জীবনময়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে উমাদেবী, তাঁর দুই ছেলে প্রাণময়, করুণাময় এবং একমাত্র মেয়ে বীরাবতীর এই বিপুল সম্পত্তির পুরোটায় অধিকার থাকবে, এটাই স্বাভাবিক ছিল। উমাদেবী বহু লড়াই করে মানুষ করে তুলেছেন সবাইকে। মে উচ্চবংশে বিয়ে দিয়েছেন, সুপাত্রের সঙ্গে। এসবই তাঁর মনে গর্বসঞ্চার করে। বীরাবতী বিয়ের পর থেকেই বিদেশে স্বামীর থাকে। ওরা আমেরিকার গ্রিনকার্ড হোল্ডার। জামাই ওদেশেই দু'খানা ওষুধ কোম্পানির মালিক। একে-একে সে দেশ থেকে নিজের ভাইবোনেদের নিয়ে গিয়ে গিয়েছে এসব অনেক কাল আগের কথা। বীরা যে উমাদেবীর সন্তান, একথা তিনি নিজে মাঝে-মাঝে মনে করতে পারেন না, চিনতে পারেন না পেটে মেয়েকে। এখন প্রবল উন্নত বিজ্ঞানের দৌলতে মাঝে-মধ্যে ছেলেরা কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে ওঠা দিদির ছবি এনে মা সামনে ধরে। মাসে এক দু'বার কথাও হয়। কিন্তু কেন জানি মনে হয় ওই ডালটা কাটাই গেছে। অবশ্য তার জন্য উমার ম বিশেষ দুঃখ নেই। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরপরই মেয়ে তার ভা ভাইদের নামে লিখে দিয়েছে। কিন্তু উমা তাঁর কর্তব্য করেছেন বেশ কয়েক লাখ টাকা মেয়ের নামে আলাদা করে ফিক্সড রেখেছেন। মেয়ে না নিক, ভবিষ্যতে নাতি-নাতনিরা পাবে। জীবনময় যখন চলে যান, সেসময় সবাই খুব ছোট! মায়ের অ ধরে এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়ানো তিনটে অবোধ শিশুমাত্র। সদ্য জীবনময়ের শ্রাদ্ধশান্তি মিটেছে। তখনও ব্যাপারটা ধরাই পরে

পরে। উমাদেবী তখনও শোকে মুহ্যমান। চিরদিন যে মানুষটার ছত্রছায়ায় ছিলেন, তাঁর অভাবে এতখানি শূন্যতার মোকাবিলা কীভাবে করবেন সেই দুশ্চিন্তায় চোখে অন্ধকার দেখছেন। এমনই এক প্রখর রোদ্দুরে পৃথিবীপোড়ানো দুপুরে এবাড়িতে এলেন সুনীল ঘোষাল। তিনি শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির নামকরা উকিল, এটা জানা ছিল উমাদেবীর। স্বামীর কাছে বহু লোক আসতেন। ইনিও মাঝেমধ্যে আসতেন। জীবনময়ের কাজকর্ম মামলা-মোকদ্দমাও ইনিই দেখাশোনা করতেন। খবর এল, সুনীলবাবু দেখা করতে চান উমাদেবীর সঙ্গে। মনে-মনে অবাক হলেও সাদা সিল্কের থান জড়িয়ে, মাথায় আঁচল তুলে উমাদেবী এসে দাঁড়ালেন অফিসঘরে। যেখানে দেওয়ালে ঝোলানো জীবনময়ের বিশাল বড় ছবিটা, ঠিক তার মুখোমুখি। গোল করে আঁচল ধরে ঘিরেছিল তিন ছেলেমেয়ে। সেইখানে, সেইদিনই বোমাটা ফাটিয়েছিলেন সুনীল ঘোষাল,

"বউমা, একটা বিশেষ কথা! যে জন্য আমার আসা..."

"হ্যাঁ... বলুন না!"

"বউমা, জীবনময় একটা উইল করেছিল কিছুদিন আগে। মৃত্যুর ঠিক ২০ দিন পরে জানাতে হবে, এমনই নির্দেশ দিয়েছিল সে। আজ একুশতম দিন..."

"উইল? কেন? উইলের কী প্রয়োজন ছিল? এরা তো সব ছোট..." উমা বিস্মিত প্রশ্ন রেখেছিলেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি আরও কতবড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্য।

"উইলের প্রয়োজন ছিল বউমা।" মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে বলেছিলেন সুনীল ঘোষাল। আর ঘোমটার মধ্যে থেকে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন উমা।

"জীবনময় এই বাড়ি আর বেশিরভাগ ফিক্সড ডিপোজিট তোমার এবং ছেলেমেয়েদের নামে করে গিয়েছে। তা প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা হবে।"

"আর এই এতগুলো হোটেল, এত ব্যবসা... ?" উমা সেই প্রথম নিজের গলায় একেবারে নতুন কোনও মানুষের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন।

"ওগুলো... সব সে তার দ্বিতীয় স্ত্রী নীরজা এবং মেয়ে ইরাবতীর নামে করে গিয়েছে।"

"দ্বিতীয় স্ত্রী! মেয়ে! এরা কোথা থেকে এল? আমি বিশ্বাস করি না..." তীব্র চীৎকার করে উঠেছিলেন উমাদেবী। তাঁর জীবন চিরকাল ভরিয়ে রেখেছিলেন জীবনময়। কোনওদিকে তাকানোর সুযোগ হয়নি, ইচ্ছেও না। আলোয় ভরা আকাশে নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়িয়েছেন বিয়ের পর থেকে এতগুলো বছর। জীবনময় চলে যাওয়ায় সেই আলোর আকাশটা শূন্য হয়ে গিয়েছিল শুধু। কিন্তু এখন ঘোর দুপুরবেলায় আকাশজুড়ে যেন অন্ধকার অমাবস্যা নেমে আসে। কীভাবে সেদিন একতলা থেকে উপরে শোওবার ঘরে এসেছিলেন উমা, কীভাবে ১৪ বছরের স্মৃতিবিজরিত ঘরটা থেকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলেছিলেন এক একটা দাম্পত্যচিহ্ন, সেকথা আজ ইতিহাস। স্বামী চলে যাওয়ার শোক সহ্য করা সহজ, নাকি এই কঠিন বাস্তবটাকে আগুনের গোলার মতো একটু-একটু করে কণ্ঠনালী দিয়ে নামতে দেওয়া, সেটা এতদিন পরেও উমার কাছে প্রশ্ন। এ কী অসম্ভব বিশ্বাসঘাতকতা! কোথা থেকে এই নীরজা এল জীবনময়ের জীবনে? আর শুধু এলই না, উমার সঙ্গে প্রায় একই সময়ে একটি সন্তানও উপহার দিল ! এ কী অসম্ভব তঞ্চকতা খেলেছে জীবন তার সঙ্গে? যত ভেবেছেন উমা, ততই ক্ষোভে-রাগে-দুঃখে-বিদ্বেষে একটু-একটু করে পরিণত হয়েছেন শক্ত কঠিন লোহার মতো এক অতিমানবীতে, যার চোখে তাকিয়ে কথা বলতেও লোকে ভয় পায়।

নীরবে ছেড়ে দেননি উমা। জীবনময়ের রেখে যাওয়া অপমানের জেরবার করে ছেড়েছেন ওই নীরজা নামের মহিলা এবং তা মেয়ে ইরাবতীকে। প্রায় অর্ধেক ছিনিয়ে এনেছেন ব্যবসার ভা বহুবছর ধরে সেই প্রবেট মামলা চলেছে। তারপরেও শেষ হ নতুন করে সমস্ত ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছে, যেখানে কঠিন থে কঠিনতর শর্ত আরোপ করে ব্যবসাগুলোর মধ্যে নিজেদের ন ঢুকিয়েই ছেড়েছেন উমা। তারপর বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন ক ওদের নামটুকু মুছেও দিয়েছেন। তার জন্য কখনও টাকা খর করতে হয়েছে, কখনও বা পেশিশক্তি। অনেকক্ষেত্রে বাজার মূল্যের চেয়ে কম টাকাতেও নিজের ভাগ উমাদের বিক্রি কর সরে গেছে নীরজা। শুধু এই মেঘদূত সিনেমা এবং আরও দু সিনেমাহলের ক্ষেত্রেই কীরকম করে যেন উমাদের পাশাপাশি থেকেই গেছে নীরজা আর ইরাবতীর নাম। এটা দু'পক্ষই সম ভাগ পেয়ে আসছে কোর্টের নির্দেশে। কোনও অজ্ঞাত কারণে নীরজাও এই ব্যবসার শেয়ারটা ট্রান্সফার করতে চায় না। অ সেইরকমই কোনও অজানা বিতৃষ্ণা থেকেই উমা বা করুণাম চায় না এই ফাইলে সই করতে।

কিন্তু খারাপ যতই লাগুক, মা একবার বলার পরে সে কথা করার কথা ভাবতেও পারে না করুণাময়। ঘাড় গুঁজে তাই স করতে থাকে সে। হাতে সই করলেও মনের মধ্যে ঘুরপাক থাকে অন্য কথা, যেটা আজকেই বলে ফেলবে বলে বিশেষ ছিল মনে-মনে। কিন্তু বলা তো দূর, প্রসঙ্গটা তোলাই হল না তার উপর মা যা বলে দিল, পরিষ্কারভাবে তার একটাই অর্থ স্বাতীদের বাড়ি আর যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু কী করে সে পারবে করুণাময়? ওই নিষ্ঠুর, রাগী মেয়েটাকে একদিনও না ওর ঝাঁঝালো কথাগুলো না শুনে কী করে বাঁচবে? ওইখানে বাঁধা পড়ে আছে করুণাময়ের প্রাণ। মা কি এতসব জানে? অ এক দোটানায় পড়ে ফাইলে মুখ গুঁজে বসে থাকে করুণাময় নিজের সইটাই ভুলে যেতে বসেছে যেন।

উমার এদিকে চোখ নেই। তিনি হোটেলের আয় ব্যয়ের হিসে নিচ্ছেন। অথবা সব বুঝতে পেরেও কিচ্ছুটি না বোঝার ভান করছেন। জীবন তাঁকে শিখিয়েছে কখন চোখ খোলা রাখতে আর কখন বন্ধ। প্রাণময় ভাইয়ের প্রতি অতিমাত্রায় স্নেহশীল সে ওর মধ্যেকার উতরোল ছুঁতে পারে সহজেই। ঘাড়ে হাত ডাকে, "কানু, এবার চল উপরে যাই। বাকিটা পরে হবে। মা রয়েছেন।"

৭

তিস্তার দিক থেকে মাতাল হাওয়া ভেসে আসছে। মালবাজা দিক থেকে খেলনা গাড়ির চলমান সারি নদীর ওপারের বাঁকে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে সবুজ ভেলভেটের চাদর পরানো জঙ্গলে সেবকেশ্বরী মায়ের মন্দিরের লাল সিমেন্টে বাঁধানো বসার জ বসেছিল স্বাতী। খোলা চুলে লালপাড় হলুদ সিল্কের শাড়িতে স্বাতীকে একটা রঙিন মার্বেল মূর্তির মতোই দেখাচ্ছে। ওর পু দেওয়া হয়ে গিয়েছে আগেই। আজ শনিবার। শিলিগুড়ি থে এতদূরের পাহাড়ে কালীমায়ের মন্দিরে অসম্ভব ভিড়। করুণা চায় না কোনওভাবে স্বাতীর এতটুকু কষ্ট হোক। পুজো শেষ ওকে এখানে বসতে বলে ও নিজে গিয়ে ভেতরে লাইন দিয়ে প্রসাদী ফুল, পাতা, মিষ্টি নিতে। স্বাতী কে জানে কেন কোনও আপত্তি করেনি। চুপ করে বসে আছে দূরের নদী, পাহাড়ের তাকিয়ে। বেশ অনেকক্ষণ ভিড়ে লাইন দিয়ে দু'হাতে স্বাতীর পুজোর ফুল, ফল, মিষ্টিভর্তি চ্যাঙারি আর নিজের ঝুলে পড় কাঁধের ব্যাগ সামলে গলদঘর্ম অবস্থায় করুণাময় এসে দাঁড়া

দুরে কোথাও। ঠোঁট অল্প-অল্প কাঁপছে। যেন নীরবে কোনও মন্ত্রোচ্চারণ করছে। যেন আসল পুজোটা ওর এখনই হচ্ছে। "হয়ে গেছে? সব এনেছ ঠিক করে? কিছু ফেলে আসোনি তো?" স্বাতী ঘুরে তাকায়। উঠে, হাত বাড়িয়ে ডালাটা নেয়। আস্তে-আস্তে এগোয় সিঁড়ির দিকে। নীচ থেকে অন্তত পঞ্চাশটার বেশি সিঁড়ি সাপের মতো উঠে এসেছে। সুন্দর করে বাঁধানো, রেলিং ঘেরা। অনেক আগে এই সিঁড়িগুলোর জায়গায় এলোমেলো পাথর বসানো ছিল মাত্র। বহু কসরত করে উঠতে হত। মন্দিরেরও এত সংস্কার হয়নি। প্রতিবছর প্রেমাংশুর জন্মদিনে এখানে পুজো দিতে আসত স্বাতী। তখন পাশে থাকত প্রেমাংশু। খুব সাবধানে পাথরবসানো উঁচু-নিচু সিঁড়িগুলো দিয়ে নামার সময় স্বাতীর কোমর জড়িয়ে ধরে থাকত। আজ, এতদিন পরেও এসেছে, শুধু প্রেমাংশু নেই কোথাও। এখন আর নামার সময় কাউকে ধরে থাকার প্রয়োজনও নেই। ভাবছিল স্বাতী, সত্যিই কি প্রেমাংশু জীবনের কোথাও নেই? একটা সই এসে সত্যিই ওকে চিরদিনের মতো মুছে দিয়ে গেল? তাহলে আজ আবার স্বাতী কেন এসেছে এখানে? কার মঙ্গলকামনায় সকাল থেকে জলস্পর্শ করেনি? ঘাড়ের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া হাওয়ায়-হাওয়ায় তাহলে কার স্পর্শ লেগে আছে সারাক্ষণ? এই হাওয়া তো বাঁধা পড়ে না। শুধু অসম্ভব শূন্য প্রান্তরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখে বয়ে যায় অগোছালো মনের ঘরবাড়ি উড়িয়ে।

এলোমেলো পা আর অনর্গল ভাবনাবাহিত স্বাতী নেমে আসে মন্দিরের সামনের রাস্তায়। করুণাময় পিছনেই ছিল। বেশ কয়েকবার ডেকেওছে, কিন্তু সাড়া পায়নি। এবার প্রায় লাফিয়ে সামনে আসে। গাড়িটা পার্ক করাই ছিল রাস্তার ধারে। দরজা খুলেই ডাকতে থাকে, "এসো-এসো! তাড়াতাড়ি ঢুকে বসে এসি-তে একটু ঠান্ডা হও আগে। যা রোদ! পাগল ছাড়া কেউ এই গরমে বাড়ির বাইরে বেরোয়? সত্যি, কী যে পোকা নড়ে তোমার মাথায় মাঝে-মাঝে? কী দরকার ছিল হঠাৎ পুজো দিতে আসার? তাও আবার এতদুরে? শিলিগুড়িতে মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়িতে গেলেই তো হত।" অনর্গল কথা বলতে-বলতে নিজের মাখন-মাখন লাল মুখখানা রুমাল দিয়ে ঘষে আরও লাল করে তোলে করুণাময়। বিরক্ত হয়ে তাকায় স্বাতী,

"কী আশ্চর্য করুণা, আমি কবে, কোথায় পুজো দিতে যাব, সব কি তুমি ঠিক করে দেবে? আর তোমাকে তো আসতে বলিনি আমি! আমি তো অটো রিজার্ভ করেই আসতে চেয়েছিলাম। তুমি জোর করে সঙ্গে এলে। এখন এত কথা তো আমি শুনব না।"

করুণাময় হল সেই জাতের মানুষ, যারা একটু প্রতিরোধেই ভেঙে পড়ে। স্বাতীর বিরাগ বুঝতে পেরে তার এতক্ষণের কথার স্রোত থেমে যায়। গাড়িতে ঢুকে পড়তে পড়তে বলে, "আরে না-না! তা নয়, কিন্তু তোমাকে একা ছাড়া যায় নাকি? তাও আবার অটোতে! না-না..."

মুখ বেঁকিয়ে হাসে স্বাতী, "তাই নাকি? আমাকে একা ছাড়া যায় না? কেন বলো তো? যার দায়িত্ব, সেই যখন একা করে দিয়ে চলে গেল! তখন তোমার কিসের দায়?"

বলা যেত। এইখানে বলা যেত পরম প্রতীক্ষার পংক্তিগুলো! যে কথা বলবে বলে দিনরাত্রি এক করে নিজেকে পাখিপড়া করে চলেছে করুণাময়। বলাই যেত, আমি সেই দায়টাই বুকে করে নিতে চাই। কিন্তু জায়গামতো সঠিক শব্দপ্রয়োগে মনের ভাবপ্রকাশ করতে কবেই বা পেরেছে করুণাময়? বরং ঠিক উলটো কিছু বলে পরিবেশকে নিজের বিপরীতে নিয়ে যেতে সিদ্ধহস্ত সে... "তুমিই বা কেন ওই ভদ্রলোকের কথা ভাবছ? আমি বলি কী, যা হয়েছে

"কী বলছ তুমি করুণা?" স্বাতীর অবাক গলার স্বর আর বি
চাউনিটা করুণাময়কেও অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। সে বুঝতে প
কিছু একটা গরমিল হয়েই গিয়েছে। ক্রমাগত ঘাড় নাড়া আর
মুখমোছার পরিমাণ বাড়তে থাকে এসির ঠান্ডায় মোড়ানো চ
গাড়িতেও। বরফের ছুরির মতো স্বাতীর কথাগুলো এসে পড়
কানের পর্দায়, "আমার লাইফ নিয়ে তোমার এত কীসের দু
যা হয়েছে ভালই হয়েছে! এতই সহজ সব চুকিয়ে দেওয়া? এ
সই সবকিছুর চেয়ে বড় হল? আর এতদিনের এই জীবনটা?
দাম নেই কোনও? আমার চোখের সামনে পিয়া নেই? দিন
তাকে দেখছি না আমি? তাহলে কী করে সব চুকিয়ে দেব?
বলো?"

করুণাময় স্তম্ভিত চোখে দেখছিল, যে মেয়েটা শত দুঃখেও ভ
না, তার কঠিন কথাগুলোর সঙ্গে-সঙ্গে চোখের কোণ থেকে
বেরিয়ে আসা কাজলগলানো মুক্তবিন্দু। তার নাকের পাটায়
ফুটে ওঠা ঘামের বিন্দু। তার কপালে লেপটে যাওয়া ঠাকুরে
সিঁদুর। হঠাৎ করে কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই স্বাতীর মুখের
তাকিয়ে করুণাময় বলে বসে মোক্ষম কথাটা,

"আমি... আমি তো আছি! একবার তো নতুন করে শুরু করা
আমি কথা দিচ্ছি..."

"করুণা!" মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তীব্র চিৎকারে, জ্বলন্ত দৃষ্টি
তাকিয়ে থাকে স্বাতী, "আজকের দিনে তুমি এরকম একটা ক
বলতে পারলে? ছিঃ-ছিঃ! তোমাকে আমি সত্যি একজন ভা
মনে করেছিলাম..."

চমকে যায় করুণাময়। ওর মাথায় আসে না, কী অন্যায় কথা
ও বলেছে। এই কথাটা তো সেই কবে থেকেই বলবে বলে
আসছে ও। আর স্বাতীও কি এতদিনে কিছুই বোঝেনি?

"আমি... আমি তো... বাহ রে, আজ আবার কী দিন? এত রে
যাচ্ছ কেন তুমি? ভাল করে একটু চিন্তা করো। পিয়াকে তো
করতে হবে। তাছাড়া সেই মানুষ কি আর তোমার জন্য বসে
থাকবে সারাজীবন? তাহলে তো এত ঝামেলাই হত না... তু
বরং আমার কথাটা ভাল করে ভাবো।" মিনতির মতো করে
যেতে থাকে করুণাময়।

"এই, আপনি থামুন তো একবার!" ড্রাইভারকে আচমকা নি
দেয় স্বাতী। তারপর দুম করে দরজা খুলে নেমে পড়ে, "সরি
করুণা, আমি নেমে গেলাম। নিজের মতো চলে যাব।" কথা
ছুঁড়ে দিয়ে হন-হন করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ডানহা
ধরা পুজোর ডালা। বাঁ হাতে উঁচু করে ধরে রেখেছে শাড়ির
কী ঘটল সেটা বুঝতেই একটু সময় লেগে যায় করুণাময়ের।
তারপর যতক্ষণে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সে রাস্তায় নেমে স্বাতী
ফলো করতে যাবে, ততক্ষণে স্বাতী হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে
ফেলেছে পাহাড় থেকে নেমে আসা একখানা বাস। তাতে উ
যায় একবারও পিছনে না তাকিয়ে। তাকালে দেখতে পেত
অসহায় চোখে দাঁড়িয়ে আছে করুণাময়।

গাড়িতে উঠে বসেছিল করুণাময়। ড্রাইভার শিবেনের ডাকে
নড়েচড়ে বসে, "দাদাবাবু বাড়ি যাব কি?"

"অ্যাঁ, বাড়ি? না না ... দেরি আছে বাড়ি যেতে। তুমি সোজা
হায়দারপাড়ার দিকে এগোও।"

তার মানে স্বাতীদির বাড়ি যাবে ছোটদাদাবাবু। শিবেন এই প
নিত্যচালক। ওকে বলতে হয় না রাস্তা। স্বাতীদের বাড়ির সা
রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়া বিশাল কাঁঠাল গাছটার সামনে স্টা
করে সে। করুণাময় জানলা দিয়েই উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার
করছিল বাড়ির ভিতরটা।

"হ্যাঁ নামব বই কী..." করুণাময় লাফিয়ে নেমে পড়ে কাঁধের ব্যাগ সামলে। এগিয়ে যায় বাড়ির দিকে। দরজার শব্দে ঘর থেকে একগালে সাবান মাখা অবস্থায় বেরিয়ে এসেছেন অমলবাবু। হাতে দাড়ি কামানোর ব্রাশ। ওপাশের রান্নাঘর নামের ভাঙাচোরা জোড়া দেওয়া ঘেরা জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে সুবালাও। তার হাতে খুন্তি। বেলা দেড়টা বাজে। পিয়ার ভাত বাড়তে যাচ্ছিল সে। বারান্দায় বসে আরতি পিয়ার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল।

"আরে কী ব্যাপার করুণাময়? হয়ে গেল তোমাদের? দাঁড়িয়ে কেন? এসো বোসো!" অমলবাবু আপ্যায়ন করেন আন্তরিকভাবেই, "ও আরতি, যা না... একখানা চেয়ার এনে দে না মা তোর করুণাদাকে..."

"হ্যাঁ যাই বাবা," উঠে দাঁড়িয়েও করুণাময়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে আরতি, "আপনি বসবেন তো করুণাদা এখন? দিদি বাড়ি নেই কিন্তু..."

চমকে ওঠে করুণাময়, " সে কী! স্বাতী বাড়ি ফেরেনি এখনও?" পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখে। অনেকটা বেলা হল। ওর তো আগেই চলে আসার কথা। করুণাময় এখানে আসার আগে বিধান মার্কেটেও ঢুকেছিল পিয়ার জন্য চকোলেট আর সকলের জন্য কিছু ফল কিনতে। সেগুলো গাড়িতেই রাখা আছে। এইসব কেনাকাটাতেও বেশ খানিকটা সময় লেগেছে। স্বাতীর বাস তো অনেক আগেই চলে এসেছে নিশ্চয়ই। এখনও তবে আসেনি কেন স্বাতী? এবার এগিয়ে আসে সুবালা। সচরাচর এই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলেই না সে। কেবলই মনে হয়, ও যেন একটা উপদ্রব! কেবলই মনে পড়ে যায় পুরুষোচিত চেহারার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেই সুঠাম সুন্দর মানুষটার কথা, যাকে নিজের স্বভাবদোষে অথবা কপাল দোষে ধরে রাখতে পারল না স্বাতী। কিন্তু মনের জ্বালা মনে চেপেই বলে, "এটা কি কোনও কথা হল? তোমার সঙ্গেই তো বেরলো আমার মেয়ে। তোমারই তো তাকে নিয়ে আসার কথা। যদি না ফেরে, তবে সেই কারণটাও তোমারই জানার কথা..."

"না! মানে, সে তো ঠিকই ... মানে..." তোতলায় করুণাময়।

"মানে-মানে কোরো না। স্বাতী তোমার সঙ্গে যায়নি পুজো দিতে? সেরকমই তো বলেছে বাড়িতে..." সুবালা ক্ষিপ্ত জেরা শুরু করে।

"হ্যাঁ, গিয়েছিল তো! ওখানে পুজো দেওয়া হল।"

"তারপর? সে তো তোমার সঙ্গেই ফিরবে! সে গেল কোথায়?" একগাল কামানো হয়েছে, আর একগালে এখনও সাবান লেগে। সেই অবস্থাতে অমলবাবুর কপালেও দেখা গেল দু' একটা ভাঁজ! আরতির মুখ থেকে ফিচেল হাসিটা উধাও। সে ওয়েট করে আছে পুরোটা শোনার জন্য। চারদিকে তাকিয়ে ঝপ করে বলে ফেলে করুণা, "আসছিলাম তো একসঙ্গেই... ফেরার পথে স্বাতী হুট করে নেমে গেল গাড়ি থেকে। নেমেই বাসে উঠে গেল।"

"নেমে গিয়ে বাসে উঠে গেল? কেন?" এবার অমলবাবু বলেন। করুণা মাথা চুলকোয়। কতটা বলা ঠিক হবে, ভাবে, "ওই তো, আমি বলেছিলাম..."

"কী বলেছিলেন করুণাদা? কী এমন কথা, যে দিদি রাগ করে মাঝরাস্তায় নেমে গেল?" এবার আরতির কৌতূহলী প্রশ্ন।

"বলেছিলাম... এসো নতুন করে শুরু করি। বলেছিলাম, পিয়াকে তো ভাল করে মানুষ করতে হবে..."

এতই আকস্মিকভাবে, এমন অসময়ে, ভরদুপুরে এক উঠোন রোদ্দুরের মাঝখানে কথাটা বলল করুণাময় যে, সদা-আপনভোলা অমলবাবুও তাকিয়ে থাকেন বিস্মিত হয়ে। আরতিও চুপ। শুধু সুবালাই এগিয়ে আসে আর একটু কাছে, "এই কথাটা বলেছ তুমি স্বাতীকে? তার মানে তুমি কি..."

তো নষ্ট হতে পারে না।" লকগেট খুলে দেওয়া জলস্রোতে
অনেকদিনের অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অনর্গল বেরিয়ে আসতে
করুণাময়ের মুখ থেকে। আর সুবালা, যে কিনা কোনওদি
মানুষটাকে সাধারণ ভদ্রতাটুকু দিয়েও আপ্যায়ণ করতে চ
কখনও, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ধমক দেয় আরতিকে, "ত
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী শুনছিস হাঁ করে? যা, চেয়ার নিয়ে অ
থেকে!"

আরতি চলে যাচ্ছিল ঘরে। আবার পিছু ডাকে সুবালা, "অ
শোন, এই গরমে আর বাইরে বসে কাজ নেই। যা ভিতরে
তোর করুণাদাকে, ফ্যানের তলায় নিয়ে বসা। আমি একটু
করে আনি। সেই মেয়ে তো কোথায় গিয়ে বসে আছে, বে
এসেই যাবে ঠিক... যাবে আর কোথায়? যাই আমি রান্না
যাই... তুমি বাবা এই রোদ্দুরে না খেয়ে চলে যেও না যেন
তোমাদের উপযুক্ত নয়, তবু যা রেঁধেছি দুটো মুখে দিয়ে য
গো, তুমি একবার শুনে যাও এদিকে!" অমলবাবুকে ডে
রান্নাঘরের দরজায় পা রাখে সুবালা। অমলবাবু না কামা
এতক্ষণে পরিষ্কার করতে পেরেছেন। সুবালার ডাক শুনে
গেলেন এইবার ফরমায়েস আসবে পাড়ার দোকান থেকে
দই নিয়ে আসার। এতবছর সংসার করার সুবাদে আপন
অমলবাবু গিন্নির গলার আওয়াজের সঠিক অর্থ তো বুঝ
গেছেন। কিন্তু এটা তাঁর মাথায় আসে না, ঠিক কোন জাদু
সুবালা কখনও সহ্য করতে না পারা করুণাময়ের উপর এ
দৃষ্টিভঙ্গিটা একেবারে একশ' আশি ডিগ্রি পালটে ফেলল!
করুণাময় স্বাতীকে বিয়ে করতে চায় বলেই? স্বাতীর উপ
তার দুর্বলতা আছে, এটা কি মা হয়েও সুবালা জানত না
অমলবাবুর কাছে শুধু করুণাময় কেন, পৃথিবীর কারও চ
গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতক্ষণ না তাঁর মেয়ে সেটা অ্যালাও করে
চাওয়াই শেষ কথা অমলবাবুর কাছে।

হাতে করে দই, মিষ্টির কন্টেনার দোলাতে দোলাতে এগো
অমলবাবু। স্বপনের পানদোকানটা পেরিয়ে বাঁক ঘুরতে য
এমন সময় পিছন থেকে ডাকে স্বাতী। সে অনেকটা হেঁটে
বোধহয়। উজ্জ্বল শ্যামলা মুখটা রোদে ঝকঝকে তামার
নিয়েছে। লাল হলুদ সিল্কের শাড়ির আঁচলটা উড়ছে। হাতে
ডালি। মেয়েকে দেখে হঠাৎ অমলবাবুর গতবার যামিনী
দুর্গার মূর্তির কথা পড়ে যায়। ওখানে পুজোটা অমলবাবু
তামা রঙের প্রতিমা এনেছিল ওরা। ঠিক এমনই রঙিন উ
সুন্দর। এ যেন নিজের সন্তানকে ভিন্নরূপে নতুন করে দে
এমন সুন্দর উজ্জ্বল মেয়ে তার! এইটুকু জীবনেই অনেক দু
পেয়েছে সে। না, অমলবাবু আর তাকে কোনও দুঃখ দিতে
না। স্বাতী না চাইলে তাঁর বাড়িতে আর গাছের একটা পা
নড়বে না, তা সে সুবালা যতই অশান্তি করুক।

ভাবনায় বাধা পড়ে। স্বাতী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, "এ ক
এই দুপুরবেলা কোথা থেকে ফিরছ? হাতে এগুলো কী?
তো এতক্ষণে খেয়ে একটু শোওয়ার কথা... "

"তুই কোথায় ছিলিস মা?"

"আমি পুজো দিতে গিয়েছিলাম বাবা... আজ তো..." গল
কেঁপে যায় বুঝি। চুপ করে যায় স্বাতী।

"হ্যাঁ... তা তো জানি। কিন্তু তুই এত দেরি করলি কেন? ক
কখন..."

"করুণা এখানে এসেছে?"

"হ্যাঁ... সে তো অনেক আগেই। কিন্তু তুই গিয়েছিলি কো
"তোমার হাতে এইগুলো দই মিষ্টি বাবা?"

নিয়ে আসতে। কিন্তু তুই এতক্ষণ...''

"মা করুণাকে খেয়ে যেতে বলেছে? দই মিষ্টি কিনতে পাঠিয়েছে তোমাকে?''

একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে থাকে স্বাতী, যা বোঝার বোঝা হয়ে যায় তার এক নিমেষেই। নিশ্চয়ই করুণা এমন কিছু বলেছে, যাতে তার উপর থেকে সব বিদ্বেষ চলে গিয়েছে মায়ের। আর সেই কথাটা যে কী হতে পারে, তা স্বাতী সহজেই আন্দাজ করতে পারে। মা বিগলিত মুখে করুণাকে বসিয়ে পাখার বাতাস করে জামাই আদরে খাওয়াচ্ছে, এই দৃশ্যটা কল্পনা করেই ভীষণ খারাপ লাগতে থাকে ওর।

"আমি এখন বাড়ি ফিরব না বাবা... তুমি যাও। আমি পরে আসছি। আর এই পুজোর ডালাটা নিয়ে যাও।''

"সে কী, মা? আবার কোথায় যাবি?''

"আমি এখন বাড়ি যাব না বাবা। ভাল লাগছে না,'' স্বাতী মুখ গোঁজ করে বলে।

অমলবাবু মেয়ের মাথায় হাত ছোঁওয়ান, "তোর কি করুণাকে...''

"এসব কথা থাক বাবা,'' স্বাতী মাথাটা সরিয়ে নেয়, "তুমি বাড়ি যাও, মা চিন্তা করছে হয়তো। আর... পিয়া রইল ...'' আর একমুহূর্তও না দাঁড়িয়ে সামনে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটা ফাঁকা রিক্সায় চেপে বসে ও। অমলবাবু ধীরে-ধীরে ফিরে আসছিলেন বাড়ির দিকে। সামান্য দু' একটা কথার মধ্যে দিয়েই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, স্বাতী কোনওমতেই এই প্রস্তাবটা পছন্দ করছে না। কী এক অজ্ঞাত কারণে যেন অমলবাবু মনে-মনে খুশি হন। এমন নয় যে, করুণাময় খারাপ ছেলে। শিলিগুড়ি শহরের বুকে তার মতো ধনী অভিজাত, ভদ্র পাত্র আর দু'টি পাওয়া যাবে না। সান্যালবাড়ি এই শহরে এখনও বিশেষ গৌরববাহী। কিন্তু তবুও কেন যেন তাঁর মেয়ের পাশে করুণাময়কে ঠিক মানতে পারেন না অমলবাবু। স্বাতীর পাশে যেন ঈশ্বর একমাত্র প্রেমাংশুকেই তৈরি করেছিলেন। সেই জুটির বাইরের বাঁধন ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু অমলবাবুর মনে আজও প্রেমাংশুর জন্যই অমল আসনটি পাতা আছে। জামাই বলতে তিনি আর কাউকে সেখানে কী করেই বা বসাবেন! একটা নিঃশ্বাস ফেলে টিনের গেট ঠেলে ভিতরে ঢোকেন অমলবাবু। ভিতরে তখন সুবালা যত্ন করে খেতে দিয়েছেন করুণাময়কে। হাতপাখাটা হাতেই আছে যত্ন নির্ধারক আইটেম হয়ে। আয়োজন অতি সামান্য। কিন্তু আন্তরিকতার পাহাড়...

"এ কী বাবা, এই ক'টা ভাত খেলে কি শরীর থাকে? কিছুই তো খেলে না! অন্তত পেঁপের তরকারিটা দিয়ে আর একটু ভাত মাখো। এটা আমার স্বাতী খুব ভালবাসে...''

পেঁপে কোনওকালে খায় না করুণাময়। কিন্তু স্বাতী যা ভালবাসে, সেটা না খেয়েই বা সে কী করে পারে? স্বাতী জানলে দুঃখ পাবে। জোর করেই দু' গ্রাস ভাত মুখে চালান করে। কিন্তু তাড়াতাড়ি গিলতে গিয়ে বিষম খায় আর সেই বিষম ঢাকতে ঢকঢক করে জল খেতে গিয়ে ভিজিয়ে ফেলে পঞ্জাবি। সেই অবস্থাতেই স্বাতী এল কি না দেখতে, বারবার দরজার দিকে আর হাতের সোনার ব্যান্ড লাগানো ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকে। সামনে দাঁড়ানো আরতি খিল-খিল করে হেসে ওঠে, "ওহো মা! তুমি শান্তিতে একটু খেতে দেবে করুণাদাকে? এমনিতেই বেচারি দিদি এল কি না, সেই চিন্তা করছে তখন থেকে! তার উপর তুমি জোর করে পেঁপের তরকারি খাওয়াচ্ছ...''

সুবালার স্নেহ আরো বেশি ঝরে ঝরে পড়ে, "সে আসবে 'খন বাবা। যাবে আর কোথায়! তুমি বরং খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করো, তার মধ্যে ঠিক এসে যাবে...''

"না স্বাতী এখন আসবেনা,'' দরজা দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে বলেন

"আসবে না? তুমি কী করে জানলে... ?''

"আমার সঙ্গে দেখা হল রাস্তায়। বাড়িতেই আসছিল।''

"আসছিল তো গেল কোথায়? তুমি বললে না করুণা বসে আ
ওর জন্য?''

"বললাম তো ?''

সুবালা রেগে ওঠে, " তারপর? এল না কেন?''

"এল না কেন আমি কী করে জানব? আর, কোথায় গেল আম
বলেনি। বলেছে এখন বাড়ি আসতে ইচ্ছে করছে না। আর বল
পিয়া রইল...'' কপালে এক থাবড়া দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সুবালা,

"এই কথা বলল? পিয়া রইল মানে কী? পিয়া তো আছেই! সে
আলাদা করে বলার কী আছে? তবু তোমার মনে হল না কিছু?
জোর করে বাড়ি নিয়ে আসতে পারলে না ওকে? ওর ইচ্ছে-
অনিচ্ছেটাই সব? আর কারও কথা ভাববে না সারাজীবন?''

"না মনে হল না। কিচ্ছু মনে হল না আমার,'' সদাশান্ত অমলব
গলাতেও এবার বিরক্তি ঝরে পড়ে, "অত বড় মেয়েকে জোর ক
কিছু করানো যায় না। অন্তত তোমার মেয়েকে তো নয়ই...''

এই সমস্ত বাদানুবাদের মধ্যে উঠে পড়েছিল করুণাময়। সুবালা
হা-হা করে ওঠে, "এ কী বাবা, দইটাই যে দিলাম না এখনও! উ
পড়লে? আমার কপাল...''

"না, মানে ... আর বসব না মাসিমা। স্বাতী ফিরুক বরং... আমি
না হয় সন্ধ্যের দিকে একবার এসে খবর নিয়ে যাব,'' ঝোলাব্যা
কাঁধে ঝোলাতে- ঝোলাতে বলে করুণাময়, "কোথায় যে গেল
রোদে তাপে... এটা তো খুবই অবাক লাগছে আমার! এরকম
কখনও...'' নিজের মনে উঠোন পেরিয়ে টিনের গেট অবধি বিড়
করতে করতে আসে ও। আর পিছন পিছন আসছিল ফচকে
আরতি। এত দুশ্চিন্তার মধ্যে ফিক করে হেসে ফিসফিস করে ব

"দিদি মনে হয় আপনার ভয়েই পালিয়েছে করুণাদা! যাহ... অ
পেঁপের তরকারি খাওয়া বৃথা গেল! আহারে...''

করুণা আবার লাল হয়, "সে কী! আমার ভয়ে? আমাকে ভয়
পাওয়ার কী আছে? বাহ ... এই তো কলকাতা ঘুরে এল আমার
সঙ্গে! কই ভয় পায়নি তো। যতসব উল্টোপাল্টা কথা ...''

"আহা... তখন কী আর ভয় পাওয়ার মতো মনের অবস্থা ছিল
নাকি দিদির? আমি ঠিকই বলছি ...'' আরতি চেষ্টা করে গম্ভীর
করুণাময় আর কিছু না বললেও আরতির বলা একটা শব্দের
আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খায়। কেন বলল কথাটা? তার মানে কি
ওকে আরও চেষ্টা করতে হবে? বাড়ি ফিরতে-ফিরতে করুণা
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, সন্ধ্যাবেলায় ভাল করে বুঝিয়ে বলবে
স্বাতীকে। ও হয়তো ঠিকমতো বুঝতে পারেনি করুণার কথা।
তাই ভয় পেয়েছে বা রাগ করেছে। সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। ঠিকমত
বোঝালে বুঝবে ঠিকই। স্বাতী বাড়ী ফিরছে না দেখে মনের মধ্যে
যে ভয়টা ঢুকতে শুরু করেছিল, পরবর্তী কর্তব্য ঠিক করে ফেলে
সেই ভয়টাই কেটে যায় করুণাময়ের। গাড়িতে উঠে বাজারের দি
যেতে বলে।

"বাড়ি যাবেন না ছোড়দাবাবু?'' শিবেন অবাক গলায় বলে।

"যাব, যাব... তার আগে দুটো শাড়ি কিনব...''

ওহ... তাহলে স্বাতীদির সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ গাড়ি
বসে-বসে বেশ একটা ঘুম দিয়ে নিয়েছে শিবেন। এবার খুশি
মনে স্টার্ট দেয়। বিধান মার্কেটের সবচেয়ে বড় শাড়ির দোকানটা
সামনে এসে দাঁড়ায় সে।

৮

আগে বরাদ্দ ছিল একতলার বারান্দার শেষে কাঠের পার্টিশান

রাতে শুতে হত। দিনের বেলায় রোল করে রাখতে হত তোশক-বালিশ। এক চিলতে মেঝের বই খাতা রেখে পড়াশোনা। এইভাবেই মাধ্যমিক পাশ করেছে ন্যাড়া, এই বাড়িতে থেকে, এই ঘরে থেকে। ইলেভেনে ওঠার পর অবস্থাটা পালটালো। একতলার একটা ঘরে ওকে শুতে দেওয়া হল। সেটা একটা পুরোপুরি ঘর বলা যায়। শুধু চারদিকের দেওয়ালগুলোর সামনে জড়ো করা থাকত রাজ্যের চালের বস্তা, তেলের জার, কাগজের বাক্সভর্তি সারামাসের মুদিখানার মালপত্র এবং সংসারের বাতিল ভাঙাচোরা জিনিসপত্র। তারই মধ্যে একপাশে একটা চৌকি আর ল্যাম্পশুদ্ধ একটা ছোট্ট টেবিল পেয়ে ন্যাড়া যেন স্বর্গ পেয়ে গিয়েছিল। নিজের বাড়িতে কখনও এভাবে নিরিবিলিতে পড়াশোনা করার সুযোগ পাওয়া যায়নি। এইটুকুই অনেক ছিল ওর কাছে। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ছোটকাকিমার দৌলতে ন্যাড়া শিফট হয়েছে দোতলায়। টানা বারন্দার শেষমাথায় ছোটকাকুর একটা অফিসঘর মতো ছিল, ওখানে ফাইলপত্র, আইনের বই ভর্তি ছিল। ওই ঘরের উপরে আরও একটা ঘর তুলে সমস্তটাই নিয়ে গেল ছোটকাকু। ছোটকাকিমা সেই দোতলার ফাঁকা হয়ে যাওয়া ঘরটায় ন্যাড়ার সমস্ত জিনিসপত্র তুলে দিল। একদিন কলেজ থেকে ফিরে ব্যবস্থা দেখে ন্যাড়া অবাক। একটা সিঙ্গল খাট, দেওয়াল আলমারি, পড়ার টেবিল, দরজায় ফুলছাপ পর্দা। সবকিছুর শেষে ন্যাড়ার নিজস্ব জগৎ হল এই ঘর। এইজন্য মনে-মনে ছোটকাকিমার কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই ওর। সবচেয়ে বড় কথা, এই ঘরে ঢুকে নিজের ইচ্ছেমতো দরজা বন্ধ করা যায়। আর কারও কোনও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই এখানে।

কলেজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়েছে আজ। লাস্ট ক্লাসটা হল না। ন্যাড়া বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের খাটে লম্বা হয়েছে। ওঠার সময় কাকিমা বলেই দিল, পড়া বা ঘুম বা যা কিছু নিজের কাজ সব দুপুরেই মিটিয়ে নিয়ে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে যেন রেডি হয়ে নীচে নামে। রেডি কীভাবে হতে হবে, সেটাও কাকিমা বলে দিয়েছে। পয়লা বৈশাখের পাওয়া চুড়িদার আর সবুজ পাঞ্জাবি পরতে হবে। কাকিমা ওকে নিয়ে বাগডোগড়ায় বাপের বাড়ি যাবে। ছোটকাকুর সময় নেই। এইসব দায়িত্ব এখন ন্যাড়ার। কিন্তু ওবাড়িতে যেতে বেশ অস্বস্তি আছে ওর। ওখানে কাকিমার দাদার মেয়ে পূর্ণা রয়েছে। সে এমনভাবে তাকায়, কথা বলতে আসে বা ভাবভঙ্গি করে, একদম ভাল লাগে না ন্যাড়ার। তার উপর আবার চুড়িদার পরে যাওয়া... সে বড় লজ্জার। যাক গে, বিকেলে আরেকবার কাকিমাকে বলে দেখবে না হয় , যদি ছেড়া জিনসটাই পরে যাওয়ার পারমিশন পাওয়া যায়। জানলার দিকে মুখ করে বুকে বালিশ নিয়ে উপুড় হয় ন্যাড়া। হাতের ভাঁজ করা প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে ধীরে-ধীরে বের করে ওর অমূল্যধন। আরতির একটা ল্যামিনেটেড ছবি। আরতি হাসছে। ওর চোখের কালো মণিতে, চিবুকের ভাঁজে, কপালে গড়িয়ে পড়া কিছুটা খুচরো চুলের গুচ্ছে সেই হাসি ঢেউ তুলে-তুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে ল্যামিনেটেড ফ্রেমের বাইরে। ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত ঘরে, টেবিলের বইখাতার জঙ্গলে। তারপর ন্যাড়ার পরিক্রমা সেরে সেই হাসি ক্রমশ অনড় হয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে যাচ্ছে ওর বুকের ভিতর।

এই ছবিটা আরতি দেয়নি ওকে। এটা সেই কোনও এক সুকান্ত গিরির জন্য অনেক ভালবেসে সুন্দর প্যাকিং করে পাঠিয়েছিল আরতি। সেই ভালবাসার প্যাকেট আরতিকে না জানিয়ে ন্যাড়া নিজের সংগ্রহে নিয়ে এসেছে। আরতির কোনও ব্যাপারে কোনও সুকান্ত গিরির বা পৃথিবীর আর কারও কোনও অধিকার স্বীকার করে না সে। একথা আজ না হোক কাল, আরতিকেও মানতে হবে। আরতিকে না জানিয়ে এই ছবিটা নিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনও ওর। নিজের নিঃশ্বাস ছাড়া আর কাউকে এই সময়ের ভাগ রাজি নয় সে। ছবির দিকে তাকিয়ে হাসে ন্যাড়া। বলবে, সব আরতিকে। তবে তার আগে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে পায়ের তলায় মাটি শক্ত করতে হবে। যেদিন অ্যাডভোকেট ছোটকাকুর সঙ্গে কোর্টে জয়েন করবে, সেইদিন আরতির ক খুলে বলবে সব। বলবে কোথায় আছে ওর এই অমূল্য ছবি কেনই বা আছে। হঠাৎ করে একটা শব্দ হতেই খানিক চমক ও। ধড়ফড় করে কোনওমতে বালিশের তলায় ছবিটা গুঁজে উঠে বসে। প্রমীলা দাঁড়িয়ে আছে খাটের ঠিক ধারটায়। মুখে অদ্ভুত হাসি। কেমন একটা করে যেন তাকিয়ে আছে ওর দি সর্বনাশ! দরজাটায় কি ছিটকিনি দেওয়া নেই? এক সেকেন্ড মনে পড়ে না ন্যাড়ার। ছোটকাকিমা এভাবে তাকিয়েই বা অ কেন!

"কিছু কি আনতে হবে কাকিমা? বাজারে যাব?" জিজ্ঞেস ক ন্যাড়া।

প্রমীলা পা ঝুলিয়ে বসে খাটের ধারে, "নাহ... কিছু আনতে না। ঠিকমতো পড়াশোনা করছিস তো বাবা? তোকে কিন্তু উকিল হতেই হবে... আর তো চারমাস আছে অ্যাডমিশন বি এ-র রেজাল্ট বেরোনোর আগেই হবে। এর মধ্যে ফাইনা এগজামটাও আছে ..."

মনে-মনে অবাক হয় ন্যাড়া। ছোটকাকিমা এত খবর রেখে আছে, এটাই ওর অবাক লাগছে। আবারও কৃতজ্ঞতায় মাথ হয়ে আসে, "কাকিমা, আমি খুব ভাল করেই পরীক্ষা দেব। তো পেতেই হবে।"

"হ্যাঁ, এখন তো তোকে পেতেই হবে বাবা। না দাঁড়ালে তো চলবে না..."

"মা... মানে?" চমকায় ন্যাড়া।

প্রমীলা হাসে, "মানে আবার কী? পড়, খুব মন দিয়ে পড়," দাঁড়িয়ে পড়ে, "শোন, আজ আর তোর বাগডোগরা গিয়ে ,আমি একাই চলে যাচ্ছি বরং।"

ন্যাড়া বলে ওঠে, "বাহ তা কেন? আমি যাব... আমি রাতে মেকআপ করে নেব না হয়..."

প্রমীলা যেতে-যেতেও ঘুরে দাঁড়ায়, "না রে। তোর আর সম করাব না। ওটা তোর জায়গা নয়।"

ছোটকাকিমা চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসেই থা ন্যাড়া। কথাগুলো ঠিক কী দাঁড়াল, ভাবতে চেষ্টা করে। ওটা জায়গা নয় মানে? কাকিমা কি কোনও কারণে রাগ করেছে উপর? ছোটকাকিমা কি দেখতে পেয়ে গিয়েছে আরতির ছ মনে হওয়া মাত্রই ভিতরটা নড়ে যায় ন্যাড়ার। আরতির ছবি ট্রাঙ্কের তলায় জামাকাপড়ের নীচে চাপা দিয়ে, বই খুলে পড় বসে ও।

পড়তে-পড়তে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল ন্যাড়া। ছোটকাকুর ডাকে ঘুম ভাঙে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে জো জোরে ডাকছে সুবিমল। সন্ধে হব হব। এইমাত্র কোর্ট থেকে বোধহয়। জামাকাপড় ছাড়া হয়নি। ন্যাড়া লাফিয়ে নীচে না

"এই ফাইলটা আমার আলমারিতে রাখবি। আর ব্রিফ ক'টা টেবিলে। দেখিস যেন মিশে না যায়। এগুলো এখন চেম্বারে না," খুব তাড়াহুড়ো করে কথাগুলো বলেই আবার পিছন সুবিমল।

"কাকু... একটু রেস্ট নিয়ে যাবে না? কাকিমা বোধহয় বাগ বেরিয়ে গেছে। আমি চা করে দিচ্ছি, খাবার করাই আছে। করে দিই..."

" না রে সময় নেই। এখুনি চেম্বারে ঢুকতে হবে," সুবিমল ব

"আচ্ছা... তুই দেখ কাউকে দিয়ে চা-জলখাবারটা বাইরে পাঠানো যায় কি না। আসলে করুণা এমনভাবে ফোনটা করল... আমারও বেশ একটু..."

"কী হয়েছে কাকু?" ন্যাড়া খানিক কাছে এগিয়ে আসে।

"আরে এই তো আমি সবে কোর্ট থেকে বের হতে যাচ্ছি, করুণার ফোন। প্রায় কাঁদতেই বাকি রেখেছে। কী নাকি সর্বনাশ হয়ে গেছে ওর, এক্ষুনি আমার চলে আসা দরকার। আমি তো যাচ্ছেতাই স্পিডে গাড়ি চালিয়ে এলাম। এসে পড়বে যে কোন মুহূর্তে..."

"আচ্ছা বেশ... আসেনি তো! তুমি হাত পা ধুয়ে চা খেয়ে নাও ততক্ষণ। এসে গেলেই আমি তোমায় ডাকছি," ন্যাড়া ঝড়ের গতিতে উপরে গিয়ে কাগজপত্র রেখেই বারান্দার শেষে টুকরো কিচেনে ঢোকে। ফ্রিজে রাখা চিড়ের পোলাও মাইক্রো আভেনে ঢোকায়। গ্যাসে চায়ের জল চাপায়। একটা সুগার ফ্রি আর একটা গ্রিন টি লিফ দিয়ে গরম জলের কাপ আর খাবারের বাটি এনে রাখে বাইরের ছোট টেবিলে।

ন্যাড়ার কথায় সুবিমল চলে গিয়েছিল দোতলায়। কোর্টের পোশাক পালটে মুখেচোখে জল দিয়ে আসতে পেরে সত্যিই খানিকটা ফ্রেশ লাগছে। সারাদিনের চিটচিটে ঘাম ধুলো-ময়লা, সব ধোওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যেন ক্লান্তিটাও উধাও এক নিমেষে। চায়ে চুমুক দিয়ে আয়েসের সুর টানে সুবিমল। এক চামচ চিড়ের পোলাও মুখে দিয়ে চিবোয় খানিক ,"তোর কাকিমা গেল বাগডোগরা, তুই গেলি না?"

"আমাকে নিয়ে গেল না তো। আমি যেতে চেয়েছিলাম। বলল, ওটা আমার জায়গা নয়..." মুখ গোঁজ করে বলে ন্যাড়া। হা হা করে হাসে সুবিমল, "তাই? তাই বলল বুঝি? যাক... এতদিনে বুঝেছে প্রমীলা। আমি তো আগেই বলেছিলাম। তখন শোনেনি..."

"মানে? তুমিও মনে করো ওটা আমার জায়গা নয়? মানে আমি কখনও বাগডোগরা যেতেই পারব না?"

"আরে না না, তা কেন... যাবি নিশ্চই। তবে ওই জায়গাটা তোর জন্য নয়," খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ায় সুবিমল।

"কিছুই বুঝলাম না," ন্যাড়া গোঁজ মুখেই বলে। সুবিমল ওর পিঠটা চাপড়ে দেয়," অত সব কথা বোঝার দরকার কী? তুই শুধু নিজের পড়াশোনাটা বোঝ এখন, তাহলেই হবে।"

কাকা ভাইপোর কথার মধ্যে উদ্ভ্রান্তের মতো এসে দাঁড়ায় করুণাময়। সে চেম্বারে ঢুকে বন্ধুকে না পেয়ে সটান ভিতরে চলে এসেছে। ফর্সামুখ টকটকে লাল, চুল এলোমেলো। গায়ের পাঞ্জাবিটা উলটো করে পরা।

"কী হল করুণা? এমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?"

"সুবিমল... ভাই! আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেল!"

"সে কী? কী হয়েছে? এমন করছ কেন? বোসো আগে... ন্যাড়া জল নিয়ে আয় একগ্লাস।" সুবিমলও ব্যস্ত হয়। করুণার মুখের কাছে বাড়িয়ে ধরে ন্যাড়ার এনে দেওয়া জলের গ্লাস। একটানে গ্লাসটা শেষ করে করুণাময়। রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। তারপর উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে উঠোনের দিকে।

"কী হয়েছে করুণা? এত আপসেট কেন তুমি?" এতক্ষণে প্রশ্ন করে সুবিমল। ন্যাড়াও খানিক দূরে দাঁড়িয়ে উত্তরের অপেক্ষায় থাকে। বড়দের কথার মধ্যে থাকতে নেই, এই সহবতটুকু ছাড়া চলে না।

"স্বাতী চলে গেছে সুবিমল," ফ্যাসা-ফ্যাসা গলায় বলে কর

"চলে গেছে? কোথায়? কি বলছ!" সুবিমল অধৈর্য হয়। বন্

দুর্বলতার কথা তার অজানা নয়। ইন ফ্যাক্ট, সে অনেকবার

বোঝানোর চেষ্টাও করেছে যে শি ইজ় নট হিজ় কাপ অফ

করুণা নিজের সিদ্ধান্তে অটল।

"করুণা, এত ভাঙলে কি চলে? অবস্থার মোকাবিলা করতে

বলো, কী হয়েছিল?" গুরুগম্ভীর উকিলের গলায় বন্ধুকে

দেয় সুবিমল।

"স্বাতী কোথায় গিয়েছে, কেউ জনে না সুবিমল। আমি এই

বাড়ি থেকেই আসছি। আরতির মোবাইলে একটা মেসেজ

'ক'দিনের জন্য বাইরে গেলাম। কেউ চিন্তা করিস না। আমি

আছি।' তারপর থেকেই মোবাইল সুইচড অফ।"

"সে কী? কিন্তু এভাবে হঠাৎ... একটু খুলে বলো তো!"

করুণাময় ধীরে-ধীরে সকালে শেভক যাওয়ার ঘটনা, কী-

হয়েছিল, ও কী বলেছিল স্বাতীকে, কীভাবে স্বাতী গাড়ী থে

নেমে গেল... সব খুলে বলে। সুবিমল পরিষ্কার বুঝতে পার

করুণাময়ের দেওয়া বিয়ের প্রপোজা

খারাপ লেগেছে স্বাতীর। স্বাতীর অস্ব

বেশ বুঝতে পারে সে। করুণা যতটা

সিরিয়াস, নিজের ভাবভঙ্গি ততটাই

করে বলে, "ধুস, এটা কোনও ব্যাপা

ছোটকাকুর কথায় ন্যাড়াও অবাক হ

তাকিয়ে থাকে। এমন একটা ঘটনা এ

উড়িয়ে দিচ্ছে ছোটকাকু? ঠিক বিশ্বাস

চায় না যেন ওর। করুণাকাকুরও এব

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিয়ে আহত

বলে, "তুমি এভাবে বলছ সুবিমল?

"হ্যাঁ-হ্যাঁ বলছি। নাও, ওঠো এখন।

চেম্বারে গিয়ে বসি। দু' একটা মক্কেল

কথা আছে। তারপর না হয় তোমার

যাব'খন একবার অমলদার বাড়ি।

ন্যাড়া... আরেকবার চা কর তো! আ

মোড়ের মাথা থেকে তিনটে গরম চি

কাটলেট নিয়ে আয়।" করুণাময়ের

তুলে বাড়ির সামনের দিকে চেম্বারে

এগোতে-এগোতে বলে সুবিমল।

"তুমি চিকেন কাটলেট খাবে কাকু?

জানতে পারলে কিন্তু..." ন্যাড়ার কথা শেষ হয় না।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ খাব। জানতে পারবেই বা কেমন করে? সে তো

নেই। এক, তুই যদি না চুকলি কাটিস। সেজন্য তোকেও খা

চলো হে করুণা..."

ন্যাড়া অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পিছন থেকে। সত্যি, এই

ছোটকাকু বা ছোটকাকিমা দু'জনের মতিগতিই ওর বোধগম

বাইরে। কখন এরা কী বলে, কী করে কিছুই বোঝা যায় না

ফোটানো জলে চায়ের পাতা ভিজতে দিয়ে ন্যাড়া গেটের ব

বেরিয়ে পড়ে। দোকানটা মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই। এপাড়া

বিখ্যাত চিকেন কাটলেট। চটপট কিনে নিয়ে ফিরতে গিয়ে

থেকে আরতিদের বাড়ির রাস্তাটা ঘুরছে, সেই অবধি এসে

যায় ন্যাড়ার গতি। যাবে নাকি একবার আরতিদের বাড়ি?

সত্যি কোথায় যে গেল! জানতে পেরেও ন্যাড়া যাবে না এ

কী হচ্ছে ওখানে! একমুহূর্ত থেমে যাওয়া পা দুটোকে জোরে

আবার বাড়ির দিকে এগোয় ন্যাড়া। এখন থাক। আগে ছো

কী ঠিক করে সেটাই দেখা যাক। ছোটকাকু মুখে যাই বলুক,

প্রেমাংশুর মুখটা স্বাতীর নাম শুনে মুহূর্তের জন্য ছাইয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল। পিয়ার নাম শুনে দু' সেকেন্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হৃদস্পন্দন।



সবে এগিয়েছিল ন্যাড়া। পিছন থেকে ভেসে আসে ডাক। দৌড়ে আসছে আরতি। হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে ন্যাড়ার সামনে দাঁড়ায়। ওর কাটলেটের ঠোঙা শুদ্ধ হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেলে।

"কী রে আরতি? কী হয়েছে? কাঁদছিস যে?"

"ন্যাড়া... তোকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম ... বাবা!"

"কী হয়েছে জেঠুর?" ন্যাড়া আরতির কাঁধে হাত দিয়ে ঝাকুনি দেয়।

"ন্যাড়া... বাবা কলতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে! আমি ... আমি আর মা কোনওমতে টেনে বারান্দা পর্যন্ত এনেছি!" হু-হু করে কাঁদতে থাকে আরতি।

"দাঁড়া, কাঁদিস না। চল..." উলটো পথে হাঁটতে শুরু করে ন্যাড়া। সামনে সাইকেল চালিয়ে আসছিল পাশের পাড়ার বিল্টু। ওকে দাঁড় করায়, "এই বিল্টু শোন, এই ঠোঙাটা ধর, আমাদের বাড়ি যা। ছোটকাকুকে বলবি অমলজেঠু অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আমি ওখানে যাচ্ছি।"

আরতির হাত ধরে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যায় ন্যাড়া। সারাক্ষণ যাকে ঘুমে জাগরণে নিজের পাশে বিভিন্নভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ও, সে যখন বিপদের দিনে এসে ওরই হাত ধরেছে, তখন সদ্যজাগ্রত পৌরুষ দিয়ে ন্যাড়া সেই হাতের উপযুক্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে, এমনই একটা জেদ নিয়ে পৌঁছে যায় আরতিদের বাড়ির টিনের গেট লাগানো দরজায়। সেখানে তখন অমলবাবুর সবেমাত্র জ্ঞান ফিরেছে। তাকে বারান্দায় শোওয়ানো অবস্থায় সুবালা সমানে জলের ছিটে দিয়ে যাচ্ছে আর কান্নাজড়ানো গলায় ডেকে চলেছে। দিদুনকে কাঁদতে শুনে পাশে দাঁড়ানো বাচ্চা মেয়েটাও দৃষ্টিহীন দুই চোখ দিয়ে অবিরল জল ঝরিয়ে চলেছে। ন্যাড়াকে দেখে যেন অনেকটা ভরসা পায় সুবালা। বিপদে যে একটা ছেলে কত বড় অবলম্বন, তা যার ছেলে নেই শুধু সে-ই জানে। যে মেয়ে পারত ছেলের চেয়েও বেশি করতে, আজ তার চিন্তাতেই হয়ত মানুষটার এই অবস্থা।

"এই তো জেঠু চোখ মেলেছেন!" ন্যাড়া বারান্দায় অমলবাবুর মাথার কাছে বসে পড়ে মাথাটা কোলে নিয়ে, "কী হয়েছে জেঠু আপনার? একটুও ভয় পাবেন না... এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার ডাকছি এখুনি!"

"দেখো না বাবা কী থেকে কী হয়ে গেল! চা খেল, মুড়ি খেল কলতলায় গিয়েই হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেল!"

"আচ্ছা জেঠিমা, আসুন ওঁকে আগে ঘরে নিয়ে যাই। এখানটা জলে একদম ভিজে গেছে।"

ন্যাড়ার কথা শেষ হয় না, টিনের গেট ঠেলে ঢুকে আসে সুবিমল আর করুণাময়। বিল্টুর কাছে খবর পেয়েই করুণাময়ের গাড়িতে সঙ্গে-সঙ্গেই চলে এসেছে ওরা।

"ওই তো... ছোটকাকু চলে এসেছে। আর টেনশন করবেন না জেঠিমা," নিশ্চিন্ত গলায় বলে ন্যাড়া।

করুণাময় এই সন্ধ্যাবেলাতেও ঘন-ঘন রুমালে মুখ মুছতে থাকে। উঠোনে পায়চারি করে। বিড়বিড় করে যায় সমানে। সুবিমল সেসব কথায় কান না দিয়ে গম্ভীর গলায় ডাকে, "করুণা, মুখ পরে মুছবে। এখন এদিকে এসে হাত লাগাও... অমলদাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এখুনি।"

কথাটা শুনে সুবালা, আরতি, এমনকী পিয়াও একসঙ্গে চমকে ওঠেয় সুবালা কোনওমতে জিজ্ঞেস করে, "কেন? হাসপাতালে কেন? এই তো জ্ঞান ফিরেছে ওঁর ... বাড়িতেই একটা ডাক্তার আনা যায় না?"

"না বউদি... দেখছেন না অমলদার চোখে কোনও দৃষ্টি নেই? কোনদিকে তাকিয়ে আছেন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এটা ভাল লাগছে না আমার... এখনই ট্রিটমেন্ট দরকার! এই করুণা, ন্যাড়া...

উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সহজে ভুল হয় না তার। শুধু একটা
ভুল হয়ে গিয়েছিল নিজের ছেলেটার বেলায়। ডুবে যাওয়া
থেকে তুলে এনে তাকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে পাড়ার
দিয়ে পেটের জল বের করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ততক্ষণে
হওয়ার হয়ে গিয়েছিল। ফল হয়নি কোনও। সুবিমলের সে
ভুল। এখনও তাই নিজের ঘর-বাড়ি-চেম্বার-মক্কেল সব ছে
এককথায় দৌড়ে এসেছে খবরটা পেয়েই।

করুণাময়ের গাড়িতে অমলবাবুকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়
আর করুণাময়। ড্রাইভারসমেত আর কারও জায়গা হওয়া
নয় ফোরসিটার ছোট গাড়িতে। স্টার্ট নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই
হাতটা চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে আরতি, "আমি যাব বাবা
ন্যাড়া আরতির হাতটা মুঠো করে ধরে, "কাঁদিস না, দাঁড়া
সাইকেলটা নিয়ে আসি একছুটে..."

ঝড়ের বেগে সাইকেল চালাচ্ছিল ন্যাড়া। সামনের রডে আ
বসিয়ে। আরতির উড়ন্ত চুল থেকে ভেসে আসা ফুল-ফুল
ওর নাকে ঝাপটা মেরে মিশে যাচ্ছিল রাস্তার অগুনতি মে
আর গাড়ির ডিজেল, পেট্রলের গন্ধে। ন্যাড়ার এই হঠাৎ প
মুহূর্তটা যেন ওর সাইকেলকে করে দিয়েছিল পক্ষীরাজ! সে
পক্ষীরাজে আরতিকে চাপিয়ে করে নবেন্দু সরকার হয়ে উঠ
ও। পক্ষীরাজ তখন ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং পেরিয়ে তীব্র গতি
চলেছে শিলিগুড়ি হাসপাতালের দিকে।

৯

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বাতী। কে জানে ক
পুরনো একটা ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ছে ফড়ফড় করে। সে
তাকিয়ে থাকে স্তব্ধ মূর্তির মতো। মূর্তির চোখে জল নেই।
সিল্কের শাড়িটা যেন ঝড়বিধ্বস্ত কল্কাফুলের স্তূপের মতো
আছে স্বাতীর সারা শরীরে। যেন যে-কোনও মুহূর্তে রঙিন
ঝাড়বাতিটা টুকরো হয়ে পড়বে মাটিতে।

"আসুন, এখানে এসে একটু বসুন। চা-খাবারটা খেয়ে নিন
সেই থেকে ওই একভাবে দাঁড়িয়ে আছেন," রঞ্জনা হাতের
ট্রে-তে চায়ের সরঞ্জাম, বিস্কুট, মিষ্টি সাজিয়ে এনে রাখে টে
উপর। এসে দাঁড়ায় স্বাতীর পিছনে। স্বাতী নড়ে না। হালকা
স্বাতীর কাঁধ ছোঁয় রঞ্জনা, "কী হল, শুনছেন? আসুন..."
স্বাতী ঘুরে তাকায়, "আমি কিছু খাব না এখন..."

"তা বললে কি হয়? উনি শুনলে খুব রাগ করবেন," রঞ্জনা
"কেন? আপনার উপর রাগ করবে কেন প্রেমাংশু? কে হন
ওর? আপনাকে তো কখনও... " একদমে কথাগুলো বলে
স্বাতী। অদ্ভুত জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকে রঞ্জনার দিকে
আবারও হাসে, "কে হই? তা তো বলতে পারব না! সেটা
ওঁকেই জিজ্ঞেস করবেন। তবে আমার সঙ্গে ওঁর রাগেরই স
প্রতি কথায়, প্রতি মুহূর্তে!"

স্বাতী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে রঞ্জনার দিকে। তারপর সোফ
বসে এলিয়ে দেয় মাথা। বুঝি আর সোজা রাখা যাচ্ছে না
ভরকেন্দ্র। কাল দুপুর থেকে যে অসহ্য ঝোড়ো আবেগের
ওকে সমস্ত যুক্তিবুদ্ধি রহিত করে একটানে নিয়ে এসে ফে
এতখানি রাস্তা, এইবার বোধহয় তার থেকে রেহাই পেতে
শরীর-মন। ঘুম... একমাত্র ঘুমই পারে সেই সাময়িক মুক্তি
দিতে। চোখ বুজে আসতে চায় স্বাতীর, তবুও কাঁটার খোঁচা
না ভেতর থেকে। আর সেই খোঁচা আরও বাড়িয়ে তুলতেই
অনেকটা কাছে এগিয়ে আসে রঞ্জনা। তার আথিতেয়তায়

তো কিছুই খাচ্ছেন না। এমন করলে কী চলে?"
"কখন আসবে প্রেমাংশু? এত রাত হয়ে গেল..." রঞ্জনাকে থামিয়ে দিয়ে আনমনাভাবে বলে ওঠে স্বাতী। যেন কাউকে নয়, নিজেকেই জিজ্ঞেস করছে। ওপাশ থেকে কোনও উত্তর আসার আগেই বাইরের গেটে শব্দ হয়। কেউ লোহার গেট খুলে ঢুকছে। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রঞ্জনার মুখ, "ওই তো, এসে গেলেন।" সামান্য একটা গেটের শব্দে এতখানি আলো জ্বলে উঠতে পারে কারও মুখেচোখে? স্বাতীর ক্লান্ত দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি। আর কেমন একটা শূন্যতা এসে ঢেকে দেয় ওর চোখের কালো মণিগুলোকে। অবসন্ন হয়ে আবারও সোফায় বসে পড়ে স্বাতী। বাইরের বিভিন্ন রকম শব্দে বেশ বোঝা যায়। শোনা যায় রঞ্জনার মৃদুগলায় দেওয়া বার্তা, ঘরে কোনও এক মহিলা এসেছে বেশ কিছুক্ষণ। অপেক্ষা করছে প্রেমাংশুর। চা মিষ্টি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কিচ্ছু ছোঁয়নি। শোনা যায় বিস্ময়সূচক পুরুষকণ্ঠের জিজ্ঞাসা, "এত রাত্রে আবার কে এল?"
কী এক জেদের উপর ভর করে, ঝোঁকের মাথায় এতদূর চলে এসেছে স্বাতী। কেন এল, ঠিক কোন কথাটা ও বলতে চায় প্রেমাংশুকে? কোনও প্রশ্নেরই উত্তর ছিল না স্বাতীর কাছে। নিজেকে কোনও প্রয়োজনের অস্তিত্ব দিয়ে ভোলাতেও চায়নি সে। শুধু মনে হয়েছে প্রেমাংশুর কাছে যে-কোনওভাবে এসে একবার দাঁড়ানো খুব দরকার। ক্রমশ যখন ডুবে যাচ্ছে এক কূলহারানো সমুদ্রে, তখন একমাত্র প্রেমাংশুই পারবে ওকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে! কী সেই পথ, সেসব নিয়ে একবারও ভাবেনি স্বাতী। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে মনে হয় খুব ভুল করেছে। প্রেমাংশু আর একা নেই। স্বাতীর ফেলে যাওয়া জায়গাটাও আর ফাঁকা নেই। সেখানে ওই মহিলা পাকাপাকি কায়েম করেছে নিজের আসন। ভয়ঙ্কর অপমানবোধ হতে থাকে স্বাতীর। ন'বছরের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার পর, নতুন সম্পর্কে ঢুকতে যার ন' মাসও লাগলো না, তার কাছে ছুটে এসেছে স্বাতী করুণাময়ের দেওয়া বিয়ের প্রপোজালের চটচটে খারাপ লাগা মুহূর্তে? ছি-ছি, মূর্খ! কত মূর্খ স্বাতী! চলে যেতে হবে। এখনই চলে যেতে হবে এই বাড়ি থেকে। ধড়ফড় করে উঠে পড়েছিল স্বাতী। সোফা থেকে এগিয়েছিল দু'-তিন পা। কিন্তু প্রায় ৩২ ঘন্টার ক্লান্ত, না খাওয়া শরীর চরম বিট্রে করে। শুকনো ডালের মতো ভেঙে দরজার সামনে সব ভার ছেড়ে দেয় স্বাতী। ক্ষণিকের জন্য জ্ঞানহারা হয় ছিন্নমূল লতার মতো বলিষ্ঠ দুই হতচকিত হাতের মধ্যে। প্রেমাংশু ঘরে ঢুকে বিস্ময়ের শেষ সীমায় গিয়ে অস্ফুটে উচ্চারন করেছিল, "তুমি !"
সেই একটা মাত্র শব্দও কানে যায়নি স্বাতীর। ওর দুলতে থাকা দুর্বল শরীরটাকে শক্ত করে প্রেমাংশু ধরে না ফেললে ঘটে যেতেই পারত যে কোনও দুর্ঘটনা। অন্তত খাটের বা টেবিলের কোণায় লেগে একটা রক্তপাত হতে পারত খুব সহজে। কিন্তু হল না। প্রেমাংশু কয়েক মিনিট সেই ঝড়ে উড়ে আসা কলকে ফুলের ডাল বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। ওর বুকের মধ্যে স্বাতী? সত্যিই স্বাতী? কী করে সম্ভব হল এই অসম্ভব? নিজের পাথর হয়ে যাওয়া মুখটা ছাড়া আর তো কারুর মুখ দেখেনি ও সকালে ঘর থেকে বেরোনোর আগে পর্যন্ত? তাহলে? সেদিন কোর্টে সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবারও যে কোনওদিন এভাবে বুকে জড়িয়ে ধরবে স্বাতীকে, এমন অসম্ভব স্বপ্নও তো দেখেনি ও। তাহলে কি এই মুহূর্তটা সত্যি নয়? তাহলে কি এবার সত্যিই প্রেমাংশুকে যেতে হবে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে? ধীর-স্থির, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ মানুষটার সব ভাবনাগুলো গুলিয়ে যেতে থাকে। একদৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরা স্বাতীর শুকিয়ে আসা

ছিল জানে না। খেয়াল আসে রঞ্জনার গলার স্বরে, "ওঁকে
দিন খাটে। আর এই জলটা দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিতে হবে। শ
খুব দুর্বল বোধহয়। আমি দুধ গরম করে এনেছি," মেশিনের
কথাগুলো বলে যাচ্ছিল রঞ্জনা। স্বাতী যে আলো দেখেছিল র
মুখে এখন তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। শুধু ঘোলা চাঁদে
বিষণ্ণ মায়া লেগে আছে চিবুকে আর গলায়। প্রেমাংশু কেমন
অস্বস্তিতে পড়ে। স্বাতীকে নিয়ে খাটে শুইয়ে দেয়। মাথায় নি
বালিশখানা চেপেচুপে দেয়। সারা কপালে গালে ছড়িয়ে থাক
এলোচুলের রাশি নিজেরই অজান্তে পরম স্নেহে গুছিয়ে দেয়
তারপর রঞ্জনার দিকে ফিরে বলে, "উনি... উনি আমার..."
রঞ্জনা হাসে, "আমি বুঝতে পেরেছি। উনি আপনার সবচেয়ে
নিজের লোক।"
প্রেমাংশু কাউকে কোনও কৈফিয়ত দিতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু
কী ছিল রঞ্জনার গলার আওয়াজে? প্রেমাংশু অযাচিত এবং
স্বভাববিরুদ্ধভাবে বলে ওঠে, "কিন্তু আমাদের..."
আবারও হেসে ওঠে রঞ্জনা। কথার মাঝখানেই বলে ওঠে, "
কী? ওটা তো কাগজের কাটাছেঁড়া। ভিতরটা তো জুড়েই আ
বাইরেটাও আবার রিপেয়ার করে নেওয়া যায়।"
অবাক হয়ে প্রেমাংশু ভাবে এত কথা কি কোনদিনও আগে
বলেছে রঞ্জনা? এমনভাবে ভাবতেও যে জানে ও, সেটাও কি
আগে কখনও জেনেছে প্রেমাংশু?
"এত ভাবনার কিছু নেই বোধহয়। আমার মনে হয় ওঁর জ্ঞান
এসেছে। ক্লান্তির জন্য ঝিমিয়ে আছেন হয়তো। দুধটা খাওয়া
হবে। তারপর আপনাদের দু'জনের খাবার আনব। আপনার
ধোকার ডালনা আর চিকেন করেছিলাম। আজ নিশ্চয়ই খাবে
একটুও রাগ না করে..." অদ্ভুত একটা ঠোঁট টেপা হাসি মুখে
চলে যায় রঞ্জনা।
প্রেমাংশু কঠিনপ্রাণ, আবেগশূন্য। নিজের জীবন ছাড়া
কোনওদিকে তাকায় না। এই আপাত খোলশের ভিতর থেকে
একটা অন্য মানুষ উঠে আসতে চায় যেন। রঞ্জনার কোনও ক
বা কথা নিয়ে শুধু বিরক্তি ছাড়া আর কোনওরকম ফিলিংস
এতদিন দেখায়নি ও। কখনও রঞ্জনাকে ভাল করে তাকিয়েও
দেখেনি। স্বাতীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর থেকে তো কোনও মে
দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করে না। মনে-মনে বেশ অবাক হয়
প্রেমাংশু। কিন্তু সেই অবাক লাগাটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।
কারণ বিস্ময়ের উপর মুহূর্তে চেপে বসে গভীরতর বিস্ময়। স
বিছানায় এলিয়ে শুয়ে থাকা স্বাতীর দিকে তাকিয়ে। সামাজি
হিসেবে স্বাতী এই মুহূর্তে আর কেউ নয় ওর। কিন্তু ওর দিকে
তাকিয়ে কেন তা মনে হচ্ছে না! কেন মনে হচ্ছে এই মানুষটা
এ জগতে কেউ নেই ওর!
বিয়ের পর প্রথম দুটো বছর স্বপ্নের ঘোরে কেটে গিয়েছিল
স্বাতী অবুঝ ছিল, চঞ্চল ছিল। কিন্তু ওর মধ্যে ছিল অনেকখা
প্রাণ। সারাক্ষণ উচ্ছ্বসিত ঝরনার মতো জীবনকে বয়ে নিয়ে
পারত নতুন নতুন দিকে। নিত্যদিনের প্রাণময়তায় চতুর্দিক র
করে, নিজে মেতে থাকত। প্রেমাংশুকেও ছুটিয়ে বেড়াত। কি
জীবন শুধুই রঙের ঝাড়বাতি নয়। একটু স্ট্র্যাটেজিক না হলে
একটু-একটু করে ঢেকে দেয় সব রং। আর স্বাতী জানতই না
কোনও কৌশল। ওর কাছে প্রধানতম ছিল ওর নিজের খুশি
ভাল থাকা। যখন প্রেমাংশু ওর তালে তাল দিয়ে চলতে পে
ভীষণ ভাল কেটেছে সময়। কিন্তু সবসময় সম্ভব হয়নি স্রোতে
ভেসে গিয়ে শুধু হুল্লোড়ে মেতে থেকে জীবন কাটানো। নতুন
চাকরি, অন্য শহরে থাকা নিয়ে ক্রমাগত অভিযোগ করে যা

প্রেমাংশু দুর্বল হয়েছে, পাশে চেয়েছে স্বাতীর সহমর্মী উপস্থিতি! কিন্তু স্বাতী থেমে থাকেনি। কখনও বোঝেইনি কী চাইছে প্রেমাংশু। হই-হই করে একদল বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে পিকনিক অথবা সিনেমায়। যে গভীরতম উপলব্ধি থাকলে একজন মেয়ে পারে ক্রমশ নারী হয়ে উঠতে, তা বোধহয় ছিলই না স্বাতীর মধ্যে। এইরকম এক চঞ্চল মানসিক অবস্থায় মা হয় স্বাতী। বুকের মধ্যে পেয়ে যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অনুভূতি। কিন্তু ভেতর থেকে বড় হয়ে উঠল না একটুও। থেকেই গেল সেই ষোল বছরের উদ্দাম দৌড়ে বেড়ানো কিশোরীটি। ফলে যা অবশ্যম্ভাবী, তাই হল। প্রেমাংশুর পক্ষেও আর সম্ভব হয়নি ক্রমাগত বেতো ঘোড়াকে শিক্ষা দেওয়ার মতো করে রোজকার অশান্তিযাপন। আলাদা হয়েই যেতে হল বাধ্য হয়ে। সেই সময়টায় ওর মনে হয়েছিল, স্বাতীর মতো মেয়েকে নিয়ে বোধহয় সংসার করাই যায় না। তাই মেয়ে নিয়েই আলাদা হতে চেয়েছিল সে। কিন্তু স্বাতী যখন পিয়াকে দিল না, সেটা একটা ধাক্কা ছিল প্রেমাংশুর কাছে। কিন্তু ও ভেবেছিল স্বাতী মুক্ত হতেই চেয়েছে মনে-মনে। কিন্তু আজ এই ঘুমন্ত নিষ্পাপ ক্লান্ত মুখ দেখে মনে হচ্ছে সেদিন বোধ হয় স্বাতীকে আরও কিছু সময় দেওয়া উচিত ছিল প্রেমাংশুর।

একথা ঠিক যে সুহাসের মুখে করুণাময়ের কথা শুনে প্রেমাংশু ধরে নিয়েছিল, স্বাতী নতুন করে জীবন শুরু করতে চলেছে। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও, নিজের কাছে অস্বীকার করা যায় না ভিতরের রক্তক্ষরণ। অসহ্য কষ্টে ভাঙলেও বাইরে নিজেকে স্থির রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেই চলেছে ও। শুধু আরও বেশী পাথুরে হয়েছে চোখের দৃষ্টি , আরও বেশি ধারালো হয়েছে কঠিন চোয়াল। এই ক'দিন প্রেমাংশুর জীবনে আর কোনও প্রশ্ন ছিল না। এমনকী সেদিন বিয়ে ভেঙে কোর্ট থেকে ফিরে আসার পরেও হয়নি। সুহাস বারবার ইঙ্গিত দিয়েই চলছিল রঞ্জনার দিকে। প্রাণের বন্ধুকে নতুন করে ঘরবাসী না করতে পারলে যেন ওর শান্তি নেই। কিন্তু প্রেমাংশু দুঃস্বপ্নেও পারেনি রঞ্জনার কথা ভাবতে।

এখন স্বাতীর পাশে বসে, ওর দিকে চুপ করে তাকিয়ে ওর মনে একটাই প্রশ্ন জেগে ওঠে, কী এমন ঘটল যে, স্বাতী এভাবে এতদুর চলে এল? বাড়ির সবাইকে ছেড়ে, সেই ওর নতুন সঙ্গীটিকে ছেড়ে, এমনকী পিয়াকেও ছেড়েও! ও তো অল্পে বিচলিত হওয়ার মেয়ে নয়! ও তো এত পথ পাড়ি দিয়ে প্রেমাংশুর কাছেই এসেছে। ডিভোর্সের এতগুলো দিন পর কী এমন ঘটল যে, এভাবে দমকা হাওয়ায় নিভে যাওয়া বাতির মতো দুর্নিবার বেগে এসে প্রেমাংশুর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল? কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে ও এখন? মনের কথা শুনবে, নাকি মাথার? মন বলছে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে, মিশিয়ে নিতে নিজের সঙ্গে। কিন্তু মাথা? করা কি উচিত? দুই বিপরীত বোধের প্রবল অভিঘাতে বিহ্বল মন নিয়ে বসে থাকে প্রেমাংশু।

১০

খাটে পা ঝুলিয়ে দু' হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল স্বাতী। একদম পাশে বসে কানের কাছে মুখ রেখে ডেকেই চলেছে প্রেমাংশু। কিন্তু স্বাতী কিছুতেই মুখ থেকে হাত সরাবে না। বুঝি সাড়াও দেবে না একটা কথার। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে মেঘলা কিছু মিষ্টি মেদুর হাওয়া পাঠিয়েই ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিয়েছে। প্রেমাংশুও যেন এই ঘরের বাইরের পৃথিবীটা ভুলে গেল। সমানে স্বাতীর মুখ থেকে হাত সরানোর খেলায় নিজেকে মাতিয়ে রেখেছে। খুব সুন্দর একটা নিটোল ভালবাসার অণুগল্প যেন।

করেই যায় প্রেমাংশু। কিন্তু স্বাতী কী করে চোখ মেলবে? কী তাকাবে ওর দিকে? যদি কেবলই গত রাত্রির ঝড়টা এসে স দাঁড়ায়? কী ভাবে, কী মনে করে সেই শিলিগুড়ি থেকে এত ব্যান্ডেল পর্যন্ত চলে এল স্বাতী, কেনই বা এল, কোন অধিক এল, এর কোনও ব্যাখ্যাই দিতে পারবে না ও। শুধু এখন সকালবেলায় উঠে গতকাল রাত্রিটার কথা মনে করে ভীষণ আর চোখ মেলে তাকাতে পারছে না। কীভাবে তাকাবে এই আকাঙ্ক্ষিত মানুষটার দিকে, যে আর সামাজিকভাবে ওর বে শুধু মনে হয়, এইগুলো ঘটারই ছিল বুঝি! আগে থেকেই বে সাজিয়ে রেখেছিল, যাতে একরাতে সবকিছু ওলটপালট হবে এখন কী করে প্রেমাংশুকে ফেস করবে? ও কি ভাববেনা, জেদ দেখিয়ে চলা স্বাতী আসলে ভিতরে-ভিতরে ভীষণ হ্যা অজস্র ভিন্নমুখী চিন্তার স্রোত বয়ে যেতে থাকে মাথার ভিত এলোমেলো পা ফেলে খাট থেকে নামতে যায় স্বাতী। আর আধ-শোওয়া হয়ে থাকা প্রেমাংশু ওকে ধরে ফেলে নিজের টেনে নেয়। হুমড়ি খেয়ে এসে বুকের উপর পড়ে স্বাতী। প্রে পালটে গিয়েছে একরাত্রে। ওকে দেখেই বোঝা যায়, কোনও কাজ করছে না ওর মধ্যে। বরং অনেক বেশি সাবলীল যেন নিজের অগোচরে এমনই একটা রাত্রির অপেক্ষায় ছিল সে। জানা ছিল না, কোন পথে আসবে সেই মুক্তির রাত। নতুন জোয়ারে ভেসে গিয়ে স্বাতীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ও, "বে যাচ্ছ? এখনও বেলা হয়নি ভাল করে। আর একটু শোও..."

"না-না! ওই উনি উঠে পড়েছেন বোধহয়। এমনিতেই তো ক ভাবছেন, তার ঠিক নেই!" মুখ নিচু করেই বলে স্বাতী।

"কে উঠে পড়েছে, রঞ্জনা? আরে ধুস, ওর সঙ্গে আমাদের ক

"রঞ্জনা? ওঁর নাম রঞ্জনা, কে উনি? আগে তো কখনও..." প্রেমাংশুর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে স্বাতী।

"ও একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়েছিল। আমি কিছুদিনের শেল্টার দিয়েছি।"

"কী হয়েছিল?"

"আরে তুমি তো নিবারণকাকুর কথা জানতে!"

"হ্যাঁ, তোমাদের দেশের বাড়ির গ্রামেই থাকেন।"

"থাকতেন। ওঁরই মেয়ে রঞ্জনা। কাকু মারা যাওয়ার সময়টা আমি ছিলাম হাসপাতালে, ওঁর পাশে। অন্য একটা কাজে দেখা হয়ে গিয়েছিল। নিবারণকাকু চলে গেলেন। বাবা ছাড়া কেউ ছিল না রঞ্জনার। গ্রামে একা থাকার কিছু প্রবলেম আ পক্ষে। একটা স্কুলেও প্যানেলড হয়ে আছে। যতদিন না জ করে, হোস্টেল তো পাবে না। তাই ওর রিকোয়েস্ট অনুযায়ী ঘরে থাকতে দিয়েছি। এই তিনমাস হল... স্কুলের অ্যাপয়ে লেটারটা পেলেই চলে যাবে। ওকে নিয়ে তোমার চিন্তা করা দরকার নেই," প্রত্যয়ী গলায় বলে প্রেমাংশু।

চুপ করে কথাগুলো শোনে স্বাতী। তারপর যেন অনেক দুর বলছে এমন গলায় বলে, "তাই? কিন্তু ওই আলোটা?"

"কোন আলোটা? কী বলছ?"

"নাহ... কিছু না," নড়েচড়ে বসে স্বাতী, "একটু চা খেতে হত। কিন্তু সে বোধহয় রঞ্জনাকেই বলতে হবে। কেমন একট লাগছে..."

"আরে না-না, ওই পাশের ছোট্ট ঢাকা বারান্দায় রান্নার সব ব্যবস্থা আছে। তুমি তো ওদিকটা দেখনি। তুমি যাওয়ার পরে কন্সট্রাকশন..."

"যাওয়ার? নাকি পাঠিয়ে দেওয়ার?" আবারও প্রশ্ন স্বাতীর

"ছাড়ো ওসব, আমি কিছু মনে করতে চাই না। দাঁড়াও তোম



ফার্স্টক্লাস চা করে খাওয়াচ্ছি," গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়তে যায় প্রেমাংশু। আর স্বাতী আবার তাকে বালিশের ওপর চেপে শুইয়ে দিয়ে নেমে দাঁড়ায়, "উঁহু, তুমি নয়। আমি করছি..."

"আগে কোনওদিন করেছ সকালের চা?" স্বাতীর হাত ধরে রেখে গভীর চোখে তাকায় প্রেমাংশু। বেশ বুঝতে পারছে এক মুহূর্তের জন্যও ওকে চোখছাড়া করতে মন চাইছে না। একথা সেকথা বলে ধরে রাখতে চাইছে সামনে। কিন্তু স্বাতী আস্তে আস্তে বলে, "আগে তো কত কিছুই করিনি। অনেক ভুলের মাশুল গুনলাম তো! তুমিও তো বুঝিয়ে দাওনি..."

"হ্যাঁ, আমারও ভুলের সংখ্যা কম নয়। হয়তো আমারই বেশি। আমি অনেকটা বড়। তাই দায় আমারই বেশি ছিল..."

গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠা ঘরের বাতাস পালটাতে চায় স্বাতী। ছটফট করে বলে, "কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার এতক্ষণ পরেও চা পেলাম না। এটা আরও বড় ভুল। যাই, দেখি..."

আবারও হাত বাড়িয়ে ওকে আটকায় প্রেমাংশু। দুই চোখে হাসি, "উঁহু, এসবের চেয়েও আরও বড় একটা ভুল আছে এই ঘরে..."

"কী?"

স্বাতীর গায়ে পিঙ্ক কালার সাটিনের শোল্ডার নট নাইটি ছিল। সাটিনের অংশ কম, গোলাপি লেসের কাজই বেশি। এটা পরে ঘরের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় স্বাতীর পক্ষে। প্রেমাংশু জানে ওকে। বালিশের পাশ থেকে হাউজ়কোটটা এগিয়ে দেয়। আর সেই হাসি-হাসি চোখের সামনে দাঁড়ানো স্বাতী নতুন করে অনুভব করে গতরাতের ঝোড়ো মুহূর্তগুলো, নতুন করে লজ্জা পায়। মেঝের উপর দলা পাকানো হয়ে পড়ে আছে ওর সিল্কের শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ়, ব্রা। কখন ওগুলো পালটে ওকে পরানো হয়েছে এই নাইটি, কতদিন আগে থেকে প্রেমাংশু কিনে রেখেছিল... সেসব অজস্র কথারা সব একসঙ্গে

হুড়মুড়িয়ে দরজার সামনে ভিড় করে। তাদের দিকে অপা
লালচে মুখ নিয়ে স্বাতী একছুটে চলে যায় বাইরে।

রান্নাঘর ঠিক বলা যায় না। পিছনের লম্বা বারান্দাটাকে ঘি
মোটামুটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্টোভ আর টোস্টার ধুলো
পড়ে আছে অনাদরে। তাকের উপর বেঢপ তিনটে তিন সা
কৌটো, চা চিনি দুধ নিয়ে কারও হাতের ছোঁওয়ার জন্য ক
অপেক্ষমান। এদিক ওদিক খুঁজে একটা নতুন বিস্কুটের প্যা
পাওয়া গেল। কতদিন যে কেউ এখানে ঢোকেনি বোঝা মু
হুঃ, বৌকে বিদেয় করে ভারি একার সংসার হচ্ছে। গ্যাসটা
আছে, এই অনেক। মনে-মনে হেসে কোনওমতে চা করে
কাপে ঢেলে একটা থালার উপর করে নিয়ে এসে ঘরে ঢো
খাটের উপর বসে বিস্কুটের প্যাকেট খুলতে-খুলতে বলে, "
তোমার রান্নাঘর! মাগোও! কী নোংরা! কতদিন ঢোকোনি
প্রেমাংশু কিছু বলার আগেই আবার বলে ওঠে, "আমি কি
পরিষ্কার করে নিয়েছি। শোনো, টোস্টারটা আছে দেখলাম
গিয়ে পাউরুটি আর ডিম নিয়ে এসো। আর কিছু বাজারও
হবে।"

প্রেমাংশু চুপ করে তাকিয়ে দেখছিল স্বাতীকে। এবার ওর
জড়িয়ে ধরে বলে, "তুমি রান্না করবে নাকি? সত্যি?"

"ওমা, না রাঁধলে খাব কী? চা খেয়ে তো আর পেট ভরবে
বাপু খিদে একদম সহ্য করতে পারি না..."

"হ্যাঁ, সে কী আর আমি জানি না! কতদিন খিদের চোটে অ
হাতেই কামড়ে দিয়েছ সময়মতো রান্না হয়নি বলে।"

স্পষ্টতই লজ্জা পায় স্বাতী। লজ্জা প্রেমাংশুর কথার জন্য ন
নিজের ফেলে আসা আচরণগুলো মনে করে। সত্যি কী অ
ছিল ও। সকালে উঠে চা করে, ভাত ডাল রেঁধে নিজে খে

ফিরেও একই গল্প। আর স্বাতী সারাদিন মেতে থেকেছে বেড়ানো, হাসি, মজা, হুল্লোড়, সিনেমা... এইসব নিয়ে। প্রেমাংশুও যে ক্লান্ত হতে পারে, ওর জন্য যে কিছু করা প্রয়োজন, এই ধারণাটাই ছিল না স্বাতীর। সব সহ্য করত প্রেমাংশু। মাঝে-মাঝে শুধু ভয়ঙ্কর রেগে যেত। না খেয়ে থাকত দু'দিন। কিংবা কথা বন্ধ করে দিত। তখন সাধ্যসাধনা করে ওর রাগ ভাঙাতে হত। আজ বুঝতে পারে স্বাতী, যেটা চলছিল, সেটাকে কোনওমতেই সংসার করা বলে না। এই যে আজ মনে হচ্ছে, এই মানুষটার সামনে সবটুকু ভালবাসা দিয়ে ভাত রেঁধে, বেড়ে দিই, এই যে মনে হচ্ছে নিজের সবকিছু দিয়ে ওর ভাল থাকার ব্যবস্থা করি, এই অদ্ভুত অনুভূতিটাই সেদিন ছিল না স্বাতীর। তার ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। নাহ, ওকে কোনও দোষ দেবে না স্বাতী। সত্যিই তো পিয়ার জন্মের পরেও তো 'মা' হতে পারেনি ও। সত্যিকারের মা ও হয়েছে অনেক পরে। এই কঠিন রোদে পোড়া পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা অবস্থায়, প্রেমাংশুকে ছাড়া। তখন একটু-একটু করে অনুভব করল মাথার উপর প্রেমাংশুর মতো একটা সবল ছাতা থাকা আর না থাকার পার্থক্যটা। বিস্কুটের প্যাকেট হাতে নিয়ে বসে থাকে স্বাতী। খুব তৃপ্তি করে চা-টা খায় প্রেমাংশু। যেন কতদিন পরে মনের মতো এককাপ চা পেয়েছে। যেন কতকাল ও চা বস্তুটাই পায়নি। তারপর কেউ ওর মুখের কাছে ধরেছে এ জগতের শ্রেষ্ঠ পানীয়। চা খেয়ে লাফিয়ে নামে খাট থেকে। চলাফেরায় সেই নতুন বিয়ের উন্মাদনা, "শোনো, আমি বাথরুম থেকে এসেই চট করে একবার বাজারটা ঘুরে আসছি। তুমি যা-যা বললে, তা তো আনবোই, তাছাড়াও..."

"আবার কী?"

"বাহ, দু'-একটা শাড়ি, ব্লাউজ় তো কিনতে হবে নাকি? আর তাছাড়া তোমার ওইসব..." চোখ নাচিয়ে মেঝের উপর পড়ে থাকা স্বাতীর ব্রা-টা দেখায় প্রেমাংশু।

"ইস, যাও তোমাকে কিছু কিনতে হবে না... আমি এগুলোই জলে ভিজিয়ে মেলে দিচ্ছি..." তড়বড় করে বলে ওঠে স্বাতী।

"আচ্ছা-আচ্ছা, সে আমি বুঝব..." হাসতে-হাসতে বেরিয়ে যায় প্রেমাংশু। স্বাতী শ্যামলা মুখে লালের ছোপ লাগিয়ে বসে থাকে খাটের উপর। কতক্ষণ বসেছিল, কে জানে। প্রেমাংশু পাঞ্জাবি গলিয়ে চলে গেছে বাজারে। দরজা ভেজানোই ছিল। ছায়া পড়ে সেখানে।

"আসব বউদি?"

স্বাতী চমকে তাকায়। রঞ্জনা দাঁড়িয়ে আছে হাতের উপর একটা ট্রে ধরে। কিন্তু এ কোন রঞ্জনা? একেই কি কাল দেখেছিল স্বাতী? কাল যদিও ও নিজেই মানসিক ও শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত ছিল, তবু চোখের দৃষ্টিটা তো পালটায়নি। স্মৃতিটাও না। কাল এই একই মহিলাকে দেখেছিল উজ্জ্বল, সুন্দর। আতিথেয়তায় পূর্ণ। আর আজ কে যেন ওর দু'-চোখের তলায় পুরু করে কালির পোচ বুলিয়ে দিয়েছে। মুখটা শুকনো। চুল উস্কোখুস্কো। শাড়িটাও ছাড়া হয়নি সকালে, "এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? রাত্রে ঘুমোননি? শরীর খারাপ হয়েছিল নাকি?"

রঞ্জনা হাসে, "না-না, কিচ্ছু হয়নি। খুব ভাল ঘুমিয়েছি। আপনি?" প্রশ্নটা শুনেই আবার স্বাতীর চোখে ভেসে ওঠে গতরাতের উথালপাথাল ঝড়! ঝড়ের হাওয়ায় মত্ত প্রেমাংশু। সেই সব ছবি মনে করে আবার লাল হয় স্বাতী। সদ্য বিয়ে হওয়া বউটির মতো নিজের অজান্তেই চোখ বুজে ফেলে, "হ্যাঁ আমিও খুব ভাল ঘুমিয়েছি! ওই মানে... "

রঞ্জনা একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল স্বাতীর দিকে। যেন টেনে-টেনে ছিঁড়ে দেবে স্বাতীর মিথ্যে ঘুমের গল্প। একটু পরে শব্দ করেই হাসে। সেই শব্দে আবার চমকায় স্বাতী, "কী হল, হাসছেন যে?"

দরকার। তাই হাসছি..."

"ওহ," হাউজ়কোট টেনেটুনে সরে বসে স্বাতী, "বসুন না। কী এনেছেন?"

"না বউদি বসব না। উনি আমায় দেখলে আবার রেগে যাবে"

"ওমা সে কী! রাগ করবে কেন?"

"সেটা সবাই বুঝবে না। বললাম না, ওঁর সঙ্গে আমার রাগে সম্পর্ক? সেসব কথা থাক। এই ক্যাসারোলে ঘুগনি, আলুর রুটি আছে। দু'জনে খেয়ে নেবেন কেমন? আপনি দিলে উনি করবেন না।"

স্বাতী কিছু বলার আগেই আবার হেসে চলে যায় রঞ্জনা। হা মধ্যে কী ছিল, কীই বা আছে ওই রাগের সম্পর্কটার মধ্যে? ভাবতে-ভাবতে স্বাতীর চোখে কেবলই ভেসে ওঠে এক রা মধ্যে আমূল পালটে যাওয়া রঞ্জনার বিবর্ণ মুখখানা।

১১

বারবার মোবাইলটা কানে চেপে কিছুক্ষণ পরপরই হতাশ ভ মাথা নাড়ছিল আরতি। হাসপাতালের গেট থেকে এগিয়ে আ আসতে এই দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিল ন্যাড়া। বেশ বোঝা যাচ্ছে অভীষ্ট ফোনটা নট রিচেবল বলছে। কিন্তু এত সাতসকালে বা ফোন করছে আরতি? আবার কোনও প্রবলেম হল না কিন্তু ন্যাড়া তো হাসপাতালের ভিতর থেকেই এল। এদিকব খবর ওর জানা। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে আসে ন্যাড় রে, তখন থেকে কাকে এত ট্রাই করছিস? নে আমার ফোন ট্রাই কর!"

"না-না ঠিক আছে। বিজ়ি পাচ্ছি। রিংব্যাক করবে ঠিক..." হাতের মোবাইলটা ওড়নার আড়ালে নিয়ে নেয়, যেন একব তাকালেই ন্যাড়া বুঝে ফেলবে কাকে ফোন করছিল ও। ন্যা কৌতূহল প্রবল হয়। ঘাড়ের কাছে মুখ এনে বলে, "বাড়ি ঠিক আছে তো? কাকিমা, পিয়া? স্বাতীদির কোনও খবর

"না। সেসব নয়, আমার একটা বন্ধু। ওকে বারবার চেষ্টা ক পাচ্ছি না। বাবার খবরটা দিতাম..." আনমনা গলায় বলে আরতি। আর ন্যাড়ার সিক্সথ সেন্স প্রবল হয়ে ওঠে। ভিতর কেউ বলে ওঠে আরতি প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইছে।

"তোর আবার কোন বন্ধু, যাকে আমি চিনি না? কাকে কী হবে বল, আমি জানিয়ে দিয়ে আসছি..."

"আঃ, তুই ছাড় না! আমি পরে দেখে নেব," আরতি হাওয় হাত নাড়িয়ে ব্যাপারটা শেষ করতে চায়। তারপর হঠাৎ মনে গিয়েছে, এইভাবে ন্যাড়ার দিকে সরে আসে, "আর একটা আমার মনে হচ্ছে জানিস তো..."

"আচ্ছা, ওই চায়ের দোকানটায় বসি চল। চা খেতে-খেতে শুনি," ন্যাড়া বটগাছের তলায় গুমটি চায়ের দোকানে এগি যায় আরতিকে নিয়ে। "দাদা, দু'টো চা আর টোস্ট..." দোক হাঁক পেরে বেঞ্চের উপর বসে পড়ে তারা। সাতসকালে মে নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি। এই দু'দিনের মধ্যেই আরতির উপর কেমন যেন একটা দায়িত্ববোধ এসে গিয়েছে ন্যাড়ার। হয়তে সেটা অমলকাকুর অসুখকে কেন্দ্র করেই জন্মেছে। আরতির অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটানোর জন্যও হয়তো। আরতি বেশিরভাগ সময়েই তর্ক না করে চুপচাপ ন্যাড়া কথা মেনে

"নে খা। আর কিছু নিলে বলবি। ওমলেটও পাওয়া যাবে," আরতির হাতে প্লেট তুলে দিয়ে হুস করে গরম চায়ে চুমুক ন্যাড়া।

"শোন না," আরতি বলে।

“আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, দিদি জাম্বোর কাছে গেছে,” আরতি টোস্টে কামড় বসিয়ে বলে।
“ধ্যাত, তা কী করে হবে? ওঁর সঙ্গে তো ডিভোর্স হয়ে গেছে। আর স্বাতীদিকে তো করুণাকাকু সেই কবে থেকেই...”
“না রে, তুই কিছু জানিস না। অনেক কিছু ঘটে গেছে এর মধ্যে,” আরতি ন্যাড়ার শার্টের কনুইটা চেপে ধরে বলে।
“কী ঘটে গেছে?”
“করুণাদা তো দিদিকে বিয়ের কথা বলেছিল। ওই পরশুদিনই। ওরা পুজো দিতে গেল না? সেখান থেকে ফেরার সময়। শুনেই দিদি রাগ করে গাড়ি থেকে নেমে চলে যায়। আর বাড়ি আসেনি। অবশ্য বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ওইদিনই সন্ধ্যাবেলায় বাবা অজ্ঞান হয়ে গেল...”
“সে কী? এটা তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না,” ন্যাড়া জটিল অঙ্ক মেলানোর চেষ্টায় মাথা খাটায়। তাহলে কি বড়মেয়ে চলে যাওয়ার আঘাতটাই নিতে পারলেন না অমলকাকু? একেবারে সেরিব্র্যাল অ্যাটাক বাঁধিয়ে ফেললেন? এযাত্রায় বেঁচে গিয়েছেন সময়মতো হাসপাতালে আনা গিয়েছে বলে। ভগবান বাঁচিয়েছেন যে, প্যারালিসিস হয়নি। সামান্য ক্ষতি হয়েছে চোখদুটোর। তবে সেরে উঠবেন। ডাক্তারবাবু বলেই দিয়েছেন কিছুদিন ট্রিটমেন্টে থাকলেই ব্লারড ভিশন ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাতীদির চিন্তায় আবার যদি অ্যাটাক আসে অমলকাকুর?
চায়ের দোকানে পয়সা মিটিয়ে উঠে পড়ে ন্যাড়া। কবজি উলটে ঘড়ি দেখে। এখনও ভিজ়িটিং আওয়ার্স শুরু হতে দশ মিনিট দেরি। অলস পায়ে হাসপাতালের বিল্ডিংয়ের দিকে এগোতে-এগোতে জিজ্ঞেস করে, “আচ্ছা তোর হঠাৎ কেন মনে হচ্ছে যে, স্বাতীদি তোর জামাইবাবুর কাছে গেছে? ওরা তো আর স্বামী-স্ত্রী নয় এখন। এতদিন মামলা লড়ে ডিভোর্স পেয়ে আবার ওঁর কাছে হুট করে চলে গেল! তিনদিন ধরে থেকেও গেল, এটা কেমন অ্যাবসার্ড লাগছে না?”
“না রে ন্যাড়া, তুই জানিস না। দিদি প্রেমাংশুদাকে ভীষণ ভালবাসে। আমি কতদিন দিদিকে মাঝরাত্রে কাঁদতে দেখেছি...”
আরতির মুখে কথাগুলো শোনামাত্র ন্যাড়ার চোখে ভেসে ওঠে করুণাকাকুর লাল মুখটা। ঘন-ঘন রুমাল দিয়ে মুছছে আর কাঁদো-কাঁদো হয়ে ছোটকাকুকে বলছে, ‘স্বাতী কোথায় চলে গেছে...’ ন্যাড়া জানে করুণাকাকুও ভালবাসে স্বাতীদিকে। ওকে ভাল করে দেখলে যে কেউ এটা বুঝবে। তাই বলে, “ধুর! এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! দেখ, হয়তো কোনও বন্ধুর বাড়ী গিয়ে আছে।”
আরতি নিজের বক্তব্যে অটল। সে আবারও নিজের মনেই বলে, “মেয়েরা যাকে একবার ভালবাসে, তাকে আর কখনও ভুলতে পারেনা রে। এসব তুই বুঝবি না...”
আরতির বলার ভঙ্গিতে কিছু একটা ছিল, যা মুহূর্তে ন্যাড়ার বুকের ভিতর বাক্যটা খোদাই করে দেয়। ন্যাড়া মনে-মনে বারকতক আওড়ায় কথাটা। কিন্তু ন্যাড়া দেখায় না। আরতির দিকে তাকিয়ে বলে, “যা, তুই আগে দেখে আয় কাকুকে। আমি তো রাতে ছিলাম...”
ন্যাড়া পাড়ার ছেলে, এক ক্লাসের বন্ধু, ছোটবেলার খেলার সঙ্গী। তবুও আজকের যুগে এতটা কারও কাছ থেকেই আশা করা যায় না, সেটা আরতি জানে। কিন্তু বাবাকে হাসপাতালে আনার পর থেকে সারাক্ষণ ন্যাড়া পড়ে আছে এখানে। পরপর দু' রাত্রি জাগা হয়ে গেল। ন্যাড়া এখানে আছে বলে আরতি আর ওর মা নিশ্চিন্তে বাড়িতে ঘুমোতে পারছে। নিশ্চিন্ত, কৃতজ্ঞ দৃষ্টির ফোঁটায় ন্যাড়ার চোখদুটো ধুয়ে দিয়ে পায়ে-পায়ে বাবার বেডের দিকে

গেছে। আরতির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খেয়াল করেনি। এ
ছোটকাকিমার নম্বর দেখে জিভ কেটে রিংব্যাক করে ও। কা
কল মিস করলে খুব রেগে যায়। তাছাড়া সারারাত ন্যাড়া ব
নেই, কী খেল, ঘুমোলো কি না, কখন ফিরবে, এইসব প্রশ্ন
ভাবতে-ভাবতেই ওপাশে কাকিমার ঝাঁঝালো আওয়াজ পা
যায়, “এতক্ষণে সময় হল? বলে দিয়েছিলাম না সকাল হলে
করতে? আজ আর রাতে থাকা অ্যালাও করবো না...”
“না মানে, সরি কাকিমা। আমি ফোন করতেই যাচ্ছিলাম...”
“আমার ফোন ধরিসনি কেন? সব ঠিক আছে তো, অমলদ
“হ্যাঁ, কাকু ঠিক আছে। কাল ছেড়ে দেবে বলল। আরতি এ
ভিতরে আছে...”
“হুমম... বুঝলাম,” কাকিমার হাসিটা যেন এখান থেকেই
পাচ্ছে ন্যাড়া। কিন্তু কিছু বলার আগেই কাকিমা বলল, “তা
বাড়ি এসে, খেয়ে একটু রেস্ট নাও। উদ্ধার করো আমাকে!
কেটে যায় কল। অথবা কেটে দেওয়া হয়। ন্যাড়া মোবাইল
ঢুকিয়ে এক পা, দু' পা করে সিঁড়ি নামতে থাকে। এখনই বা
যাওয়া দরকার। কিন্তু আরতিকে আর একবার না দেখে যায়
করে? ছোটকাকু যতই ওকে ডিউটি দিক, কাকিমা রেগে গে
বাঁচাতে পারবে না। রেস্ট না নিলেও অন্তত ভাল করে খাও
সারলে কাকিমা শান্ত থাকবে। ঘাড় ঘুড়িয়ে উপর দিকে তাক
ন্যাড়া। নাহ, আরতির নামার কোনও লক্ষণ নেই। এমন অ
নিয়ে কী করে বাড়ী ফিরবে ন্যাড়া? অনেকটা সময় দাঁড়ানো
যখন আরতি এল না, ওকে মেসেজ করতে যাচ্ছিল ন্যাড়া।
ভিতর ফোন সাইলেন্ট করা আছে নিশ্চয়ই। সবেমাত্র ‘আমি
লিখেছে, এমন সময় কম্পাউন্ডের মধ্যে এসে থামে দু' খান
একটা তো করুণাকাকুর। এটা চেনা আছে ন্যাড়ার। ও এগে
যাচ্ছিল। তার আগেই করুণাকাকু গাড়ি থেকে নেমে সামনে
দাঁড়ায়, “এই যে ন্যাড়াভাই, তুমি রয়েছ? বাহ, ভেরি গুড!”
এতে ভেরি গুডের কী হল বোঝে না ন্যাড়া। চুপ করকে দাঁড়িয়ে থাকে।
“কী হল ন্যাড়াভাই? তুমি একেবারে স্পিকটি নট যে? এনি
প্রবলেম?” করুণাকাকু ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে।
“না-না, জেঠু ভালই আছেন। শকটা কাটিয়ে উঠছেন ধীরে
ডাক্তারবাবু বললেন, হয়তো কাল ছেড়ে দেবেন।”
“বাহ, ভেরি গুড!”
যাক, এই ভেরি গুডটা জায়গামতো হয়েছে। ন্যাড়া ফিক ক
ফেলে। করুণাময়ের সেদিকে নজর নেই। সে কানের কাছে
এনে ফিসফিস করে, “ন্যাড়াভাই বলছি কী, মা এসেছেন।
দেখবেন। ভিজ়িটিং আওয়ার্স তো প্রায় শেষ! দেখো না, যদি
বলে-টলে...”
ন্যাড়া চমকায়। ও বাবা, করুণাকাকুর মা? তিনি তো সাঙ্ঘা
রাশভারী মহিলা বলে শুনেছে ছোটকাকিমার কাছে! আর
বড়লোক। কী কাণ্ড, ওঁকে এতক্ষণ ধরে গাড়িতে বসিয়ে রে
করুণাকাকু! ন্যাড়া বলে, “আমি দেখছি। আপনারা আসুন...
কনেকর্তার মতো ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলে যায় ন্যাড়া। উপরে গি
নার্সদের বলতে হবে। অবশ্য ওঁকে শিলিগুড়ির সবাই চেনে
টাইম শেষ হয়ে গেলেও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ন্যাড়া
বেশি কাঠখড় পোড়াতে হল না। রাউন্ড শেষে একজন সিনি
ডাক্তারবাবু আসছিলেন করিডোর ধরে। তাঁর পিছন পিছনই
আরতি। কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হয়েছে একটু আগে।
লিস্ট ওর হাতে। ন্যাড়াকেই খুঁজছিল। ন্যাড়া ওর দিকে তাকি
দাঁড়াতে বলেই ডাক্তারবাবুকে রিকোয়েস্ট করে দু'জনকে অ

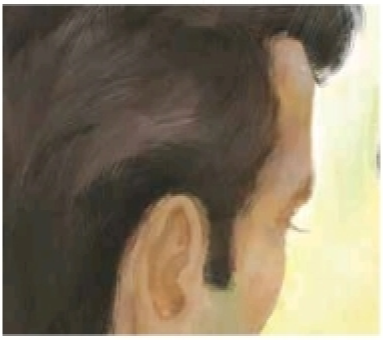
নার্সকে ডিরেকশন দিয়ে এগিয়ে গেলেন নিজের পথে। আরতি চুপচাপ শুনছিল। এবার এগিয়ে আসে, "কী রে, কী বলছিস? করুণাদার মা এসেছেন, সত্যি? তিনি তো ভীষণ রাগী!"
"হুমম, কিন্তু তিনি এখানে তো আর রাগ করতে আসেননি। এসেছেন কাকুকে দেখতে," ন্যাড়া গম্ভীরভাবে সুচিন্তিত মতামত দেয়। তারপর আরতিকে বলে, "যা, ওঁরা নীচে আছেন। ডেকে নিয়ে আয়... "
"না বাবা আমি পারব না! ওঁকে দেখলেই ভয় করবে।"
আরতি প্রায় ন্যাড়ার পিছনে লুকিয়ে যায় পারলে। ওর ভাবভঙ্গি দেখে ন্যাড়া হাসে, "আশ্চর্য! একজন মানুষই তো... এত ভয়ের কী আছে! নে সরে দাঁড়া, আমিই যাচ্ছি।"
বলে, কিন্তু যেতে হয় না ন্যাড়াকে। করুণাময় মা আর বউদিকে নিয়ে উপরে চলে এসেছে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে, "এই যে ন্যাড়াভাই, তুমি এখানে? আরতিও আছ? বাহ, ভেরি গুড..."
করুণাময়কে দেখলেই আরতির হাসি পায়। এমন সিরিয়াস পরিবেশেও নিজেকে আটকাতে না পেরে ফিক করে হেসে ফেলে। আর রাশভারী গলায় পিছন থেকে বলে ওঠেন উমাদেবী, "এটা হাসাহাসির জায়গা নয়।" তারপর মাথা উঁচু করে ওয়ার্ডের ভিতরে এগিয়ে যান। আরতির চুপসে যাওয়া মুখটা দেখে মায়া করার সময় পায় না ন্যাড়া। সেও এগিয়ে যায়, "আসুন এইদিকে..."
"তুমি?" সোনার চশমার ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ চোখে ন্যাড়াকে জরিপ করে বলেন উমাদেবী।
"ও আমার বন্ধু সুবিমলের ভাইপো। উকিল সুবিমল..." করুণাময় বলে।
"বাহ, এ ছেলে উন্নতি করবে। কাণ্ডজ্ঞান আছে..." পরিষ্কার অভিমত প্রকাশ করে অমলবাবুর বেডের পাশে গিয়ে দাঁড়ান উমাদেবী। ন্যাড়া ততক্ষণে নিচু হয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকছে, "জেঠু, দেখুন কে এসেছেন আপনাকে দেখতে... জেঠু..."
ধীরে-ধীরে চোখ মেলে তাকান অমলবাবু। চোখের দৃষ্টি এখনও অস্বচ্ছ। একটা ঘোলাটে পর্দার সামনে ভেসে ওঠে সাদা তসর পড়া অবয়ব। গলার আওয়াজে বুঝতে পারেন, কে তাঁর সামনে। আকস্মিক এই উপস্থিতি কিছুটা অকল্পনীয়ও বটে। অমলবাবু বরাবর সান্যালবাড়িতে পুরোহিতের ভূমিকা পালন করে এসেছেন। শুধু কী যেন এক অজ্ঞাত কারণে গত বছর দুই ধরে তাঁর আর ডাক পড়েনি সেখানে। সরাসরি কোনও কারণ কেউ কখনও বলেনি। তিনিও জিজ্ঞেস করেননি। শুধু মনে-মনে অনেকটাই খারাপলাগা রেখেছেন। দূরবর্তী কারণ হিসেবে তিনি যা অনুভব করেন, তা কাউকে বলা যায় না। উমাদেবী পছন্দ করছেন না করুণাময় এবং স্বাতীর মেলামেশা, একথাটা তার বারবারই মনে হয়েছে। কিন্তু স্বাতী এতই সহজ তার ভাবে-ভঙ্গিতে যে, বাবা হয়ে তিনি সে প্রসঙ্গ মেয়ের কাছে উত্থাপন করা ঠিক মনে করেননি। তাছাড়া শুধুমাত্র এই কারণেই যে এতদিনকার যজমানীটা তাঁর চলে গেল, একথাটা যেন নিজের কাছেও লজ্জার। তাই অনুমানটা নিজের মধ্যেই রেখে দিয়েছেন অমলবাবু। শুধু মনে-মনে একটা অভিমান তাঁর থেকেই গিয়েছে, যার খবর মেয়েরা বা সুবালা জানে না। আজ এতদিন পরে উমাদেবী তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে যে এই হাসপাতালে আসবেন তাঁকে দেখতে, এটা কিছুটা অবিশ্বাস্য লাগে অমলবাবুর। সেই সঙ্গে যেন লুকনো অভিমানের বুকেও কিছুটা প্রলেপ পড়ে। দুর্বল হাত দু'খানা জড়ো করে নমস্কার করতে চেষ্টা করেন তিনি।
"কী করে এমন কাণ্ড বাঁধালেন ঠাকুরমশাই? শুনেছি মানসিক চাপ থেকেই এমন হয়, কীসের এত চাপ ছিল আপনার? আমরা কোন উত্তর আসে না শায়িত রোগীর মুখ থেকে। শুধু চোখ ঝরে পড়ে দু'ফোঁটা জল। আরতি ওড়নার প্রান্ত দিয়ে মুছিয়ে সেই জল।
"তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন ঠাকুরমশাই। আপনি ছাড়া মেয়ে দেখবে কে? নাতনিটাও তো আপনার দিকেই তাকিয়ে..."
"না-না মা, তা কী করে হবে? সে তো শুনেছি দেখতেই পায় কী ঠাকুরপো, তাই তো বলেছিলে তুমি?" তড়বড় করে বলে নন্দিনী।
"আহ, তুমি থামো তো... সব জায়গায় কথা বলতে নেই," ধমক দিয়ে সামনে তাকান উমাদেবী। করুণাময়ের দিকে তাকি জিজ্ঞেস করেন, "ডাক্তারবাবু কী বলছেন? কীরকম আছেন করুণাময় সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্নটা পাস করে দেয়, "ন্যাড়াভাই, কে আছেন অমলদা?"
আশ্চর্য লোক তো! এই একটু আগেই তো শুনল সবটা, আব এক কথা জিজ্ঞেস করছে! মনে-মনে অবাক হয়ে ন্যাড়া আবা পুনরাবৃত্তি করে কথাগুলোর।
নন্দিনী আবার কথা বলে ওঠে, "ওমা, তবে যে তুমি বললে ঠাকুরপো, ওঁর এখন-তখন অবস্থা? এখন স্বাতী আর আরতি নিয়েই যত চিন্তা! তার উপর ওদের মা আছে, স্বাতীর মেয়ে আছে... কত চিন্তা করছিলে তুমি! এই তো উনি প্রায় সেরেই উঠেছেন! তুমি আর এত চিন্তা কোরো না..."
করুণাময়ের মুখখানা দেখার মতো হয়। হ্যাঁ বলেছিল সে এই কথা। কাল রাতে খুব দুঃখ করে নিজের দুশ্চিন্তার ভাগ দিয়ে বউদিকে। কিন্তু বউদি যে এভাবে হাটে হাঁড়ি ভাঙবে, সেটা ভাবতেও পারেনি। এখন মায়ের সামনে আর চোখ তুলে তা কী করে করুণাময়? রুমাল ঘষে গালের চামড়াটাই ছিঁড়ে ফে এমনভাবে মুখ মুছতে থাকে বেচারা।
অপাঙ্গে ছেলের দিকে একটা ধিক্কার মেশানো দৃষ্টিনিক্ষেপ ক কঠোর গলায় বলেন উমাদেবী, "তোমাকে আমি বেশি কথা বারণ করেছিলাম নন্দিনী। পানু তোমাকে কোনও শিক্ষাই দে আর কোথাও তোমাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না দেখছি।"
ন্যাড়া আর আরতি চুপ করে শুনছিল। ন্যাড়া ভাবছিল আরতি যে ভয় পাচ্ছিল, তার কারণ আছে। সত্যিই ওঁকে ফেস করাটা একটা সমস্যা। কখন যে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবেন, বলা মুশ এরকম মানুষের সামনে সারাক্ষণ মেপে কথা বলতে হয়।
নন্দিনী বাচ্চা মেয়ের মতো সুর করে বলে ওঠে, "কেন মা, ত কী করলাম?"
একে কিছু বলে বোঝানো বৃথা। এই মেয়েটি যে ঠিক কী ধাতু তৈরি, তা উমাদেবী আজও বুঝে উঠতে পারলেন না। এতগু ডিগ্রি নিয়ে একটা স্কুলে এতদিন ধরে টিচারি করে ক্রমাগত নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ করে যাওয়া... এটা কি ওর স্বাভাবিক স্ব না শুধু শাশুড়ির সঙ্গেই করে চলা অভিনয়, তা নিয়ে সংশয় উমাদেবীর।
কোনও উত্তর না দিয়ে তিনি ন্যাড়ার দিকে তাকান, "আমি চললাম। তোমার কাকাকে বোলো, উনি কেমন থাকেন, আম একটা খবর দেয় যেন।" সবাই বেরিয়ে আসছিল ওয়ার্ড থেকে নন্দিনী তার মধ্যেই শাশুড়ির বলা যাবতীয় কথা ভুলে ফিসফি করে, "কেন মা, কানু ঠাকুরপোই তো আপনাকে খবরটা দিতে পারে! সে তো সারাক্ষণ এদিকটাতেই থাকে।"
উমাদেবী এই অনাবশ্যক কথার জবাব দেন না। এক-এক ক সিঁড়ি নামতে থাকেন। ন্যাড়া তাঁর হাত ধরে রয়েছে শক্ত করে শুধু একবার তারই মধ্যে ক্রুদ্ধ চোখে তাকান নন্দিনীর দিকে।

মুহূর্তে সে আবার কলকল করে ওঠে নিজের ভঙ্গিমায়, "দেখুন মা, ঠাকুরমশাইয়ের ছোট মেয়েটিও কী মিষ্টি দেখতে!" আরতির গালটা টিপে দেয় ঝপ করে। তারপর আবারও বকুনি খাওয়ার আগে বলে ফেলে আরও একঝুড়ি কথা, "তবে যাই বলো, স্বাতী কিন্তু একদম অন্যরকম। ওরকম কাটা-কাটা নাকচোখ খুব একটা পাওয়া যাবে না। পুরো আগুন একেবারে, কী ঠাকুরপো, ঠিক বলিনি?"
ঠাকুরপো উত্তর দেবে কী, বারবার মায়ের সামনে নিষিদ্ধ নাম উচ্চারণের ফলে সে লাল হয়ে উঠেছে। গাড়ির ভিতর থেকে কঠোর গলায় উমাদেবী বলে ওঠেন, "কানু, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কতগুলো বাজে কথা না শুনে নিজের গাড়িতে ওঠো গিয়ে। সোজা বাড়ি আসবে। হোটেল নিয়ে কিছু কথা আছে। ম্যানেজারদের ডেকেছি। তোমাদের দু' ভাইকেই থাকতে হবে।"
চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে রোদ ঝলমল শিলিগুড়ি শহরটার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে স্বীকার করতে বাধ্য হন উমাদেবী। সত্যিই স্বাতীকে অগ্নিশিখার মতো লাগে দেখতে। শুধু চেহারাতে নয়, স্বভাবেও সে আগুনেরই মতো। সেই আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হাজার পতঙ্গ, যার মধ্যে প্রধানটি হল তাঁর সন্তান করুণাময়। আর যাতে লেলিহান আগুনের তাপে তাঁর নরম ছেলেটা মাখনের মতো গলে নিঃশেষ না হয়ে যায়, তার সবরকম ব্যবস্থা নেবেন তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

১২

এটা কী ট্রেন? মানে ট্রেনের নামটা জানার মতো সুযোগ বা সময় কোনওটাই ছিল না। একটাই উদ্দেশ্য স্বাতীকে অন্ধের মতো ভরদুপুরে টেনে নিয়ে এসেছে ব্যান্ডেল স্টেশনে। যে করে হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে এই জায়গাটা ছেড়ে দূরে যেতে হবে। টিকিটের লাইনে কোন ভিড় ছিল না। একটা নিউ জলপাইগুড়ির টিকিট কেটে ও ছুটে এসেছিল দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। কানের পর্দায় আছড়ে পড়ছিল অ্যানাউন্সমেন্ট। একটা শব্দও পরিষ্কার করে শোনেনি ও। শুধু এইটুকুই জেনেছিল যে, কোনও একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ছে দু'নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। এখন উঠে পড়ার পর, অবিশ্বাস্যভাবে একটি সাইড লোয়ার বার্থের জানলায় বসে মনে হয় স্বাতীর, নাহ... ভাগ্যটা ভালই। এটাই তিস্তাতোর্সা এক্সপ্রেস। আর চেঞ্জ করতে হবে না। কাল একেবারে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে নামা যাবে। ভাগ্য শব্দটা মনে আসতে এবার একা-একাই ঠোঁট চেপে হেসে ফেলে ও। আর কারও যেন ওর মতো ভাগ্য না হয়। সব আছে, কিন্তু কিছুই নেই। আজও তাই সামনে-পিছনে না তাকিয়ে নিজের প্রায় ফিরে পেতে চলা সাম্রাজ্য ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এল। এবার ভাসবে নাকি ডুববে, তা সেই ভাগ্য নামের দেবতাই জানেন। কেন সে এভাবে পালিয়ে এল? এই পালানো আর সেদিনের শিলিগুড়ি থেকে পালানোটা কি একই রকম? সেদিন সে পালিয়েছিল করুণার প্রপোজালের সেনসেশন থেকে বাঁচতে। সেদিন প্রেমাংশুর কাছে নিজেকে অর্পণ করবে বলে করুণাময়ের কাছ থেকে পালিয়েছিল। আর আজ? আজ প্রেমাংশুর মাদকতাময় সান্নিধ্য ছেড়ে করুণার কাছে পালাচ্ছে। কিন্তু, কার জন্য? সে কি কোনওদিন বুঝবে স্বাতীর এই নিজেকে ধ্বংস করে মরা ডালে জলসিঞ্চনের প্রচেষ্টা? এই সুইসাইডের মতো তীব্র যন্ত্রণাবাহী

অমলবাবু মেয়ের মাথায় হাত ছোঁওয়ান, "তোর কি করুণাকে..."
"এসব কথা থাক," স্বাতী মাথাটা সরিয়ে নেয়, "তুমি বাড়ি যাও, মা চিন্তা করছে"



না। কিন্তু স্বাতী নিজে জানবে সে কী, সে কেন। আর হয়তে
একজন বুঝবে, যদি স্থির হয়ে রাত্রির অন্ধকারে জোনাকিভ
আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে। হয়তো সে মনের গভীরে
স্বাতী যতদূরেই যাক না কেন, যার সঙ্গেই থাক না কেন, সে
একজনকেই নিজের করে চেয়েছিল। স্বাতীর মনের কালিমা
সমস্ত অক্ষরে শুধু একজনেরই নাম লেখা, প্রেমাংশু।
কিন্তু প্রেমাংশু কি ভাববে কখনও এইসব কথা? না কি ক
থেকে ফিরে এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পেয়ে বিস্ম
থমকে যাবে পাথরের মূর্তির মতো? তারপর একরাশ ঘৃণায়
নাক-মুখ কুঁচকে উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে বশে আনার চেষ্টা
রঞ্জনার তৈরি ব্ল্যাক কফির কাপে চুমুক দিয়ে?
জানা নেই। এতসব জটিল প্রশ্নের কোনওটারই উত্তর জানা
আর ক্ষমতাও নেই বুকের তলার পাথুরে মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে
বের করে আনার। একটাই কথা মনে হয় স্বাতীর, জানলার
মাথা ঠেকিয়ে শুধু মন নয়, ওর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাও
শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো
একটাই চাওয়া নিয়ে থমকে থাকে
এই অনন্ত যাত্রা যেন শেষ না হয়।
ট্রেন যেন ওকে আরও-আরও দূরে
নিয়ে যায় প্রেমাংশুর কাছ থেকে।
ট্রেন যেন ওকে করুণাময় কেন, স
চেনা পৃথিবীর ধরাছোঁয়ার বাইরে
যায়। ভাবে স্বাতী। এইধরনেরই বি
অবাস্তব ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকে।
জাগতিক পারিপার্শ্বিকের কিছু স
চিরকাল আছেন, যাঁদের কাজই
কাউকে নিজের মধ্যে শান্তিতে থ
না দেওয়া। এইরকম একজন মহি
তৎক্ষণে সটান বসে পড়েছে স্বাত
উলটোদিকের জায়গাটায়।
হয়তো বেশ কিছুক্ষণই বসেছে।
শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল স্ব
জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকার
কিছুই খেয়ালে আসেনি স্বাতীর।
মিহি টানের ডাক শুনে নড়েচড়ে
মহিলা একমাথা সিঁদুর, দু' হাতভর্তি শাঁখা-পলা, লাল তাঁ
শাড়িতে বেশ ঝলমল করছে। বয়সটা স্বাতীরই ধারেকাছে
মহিলা একগাল হাসে স্বাতীর দিকে তাকিয়ে, যেন এইমাত্র
হচ্ছিল দু'জনের মধ্যে! অপরিচিতের প্রতি এত হাসি স্বাতীর
কোনওকালেই আসে না। সে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করে,
বলছিলেন?"
"না মানে এটা বার্থ নাম্বার ফাইভ। এটা আমার। আপনারট
কত?"
"অ্যাঁ?" স্বাতী নড়েচড়ে বসে। সে তো শুধু টিকিটটাই কেটে
জাস্ট কোচটা দেখে উঠে পড়েছে। বি থ্রি। টিকিটটার দিকে
তাকিয়েও দেখেনি ভাল করে। এবার ব্যাগ থেকে বের করে
ওর বার্থ নাম্বার ইলেভেন। "আমি চলে যাচ্ছি," বলে উঠে
যায়।
"ওমা সে কী? বসুন না। পরে যাবেন 'খন," খপ করে সহ
অন্তরঙ্গতায় স্বাতীর হাতটা ধরে বলে মহিলা, "আমি মোটে
করে থাকতে পারি না। খুব ভাল হল আপনাকে পেয়ে।"
কোনওকথা না বলে স্বাতী আবার জানলার কাঁচে গাল ঠে

ব্যাগ থেকে বের করে ফেলেছে প্রমাণ সাইজের তিনখানা বড়-বড় টিফিন কৌটো। আর মুখ চলেছে অবিশ্রান্ত।

"আমার বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তো একেবারে আমার জ্বালায় ঝালাপালা। ওরা বলে, 'একটু চুপ থাকতে পারিস না রে জোছনা?' আমি বলি, 'না বাপু পারি না। ভগবান এই এত বড় জিভ আর গলার আওয়াজখানা দিয়েছেন কেন শুনি? মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যই তো? আমার যা-যা মনে হয় বলব না?'"

স্বাতী জানলা দিয়ে যতই বাইরে তাকিয়ে থাকুক, তাতে ওর কিছুই আসে যায় না। কানের উপর এসে আছড়ে পড়তে থাকে অজস্র ধারাপাতের মতো কথার টুকরো। শেষের কথাগুলো নিয়ে মনে-মনে নাড়াচাড়া করে স্বাতী। যা-যা মনে হয়, সব কি মুখে বলা সম্ভব? সবাই কি পারে? স্বাতী তো কিছুই প্রায় বলতে পারে না। আগে বরং অনেক বেশি পারত। এখন যেন কথাগুলো প্রায়ই ওর বুকের তলায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে। বসে থাকে আর তীক্ষ্ম নখের আঁচরে রক্তাক্ত করে তোলে পাথরের মতো ভারী হয়ে ওঠা বুকের দেওয়াল। সেই সময়গুলোতে ও হয় আরও বেশি গুম মেরে যায় আর নয়তো ভুলভাল আচরণ করে ফেলে। তার চেয়ে বোধহয় কথাগুলোকে বেরিয়ে যেতে দেওয়াই ভাল। কিন্তু স্বাতী কী করে পারবে? তাহলে তো ও মনের ভিতর শুকনো পাহাড়ি নদীর মতো মৃতপ্রায় স্রোতটাকে খুলে মেলে ধরত প্রেমাংশুর কাছেই! এভাবে পালিয়ে আসত না। কিন্তু পারল না তো! কিছু বলতেই পারল না। রঞ্জনা নামের সেই মেয়েটা এসে দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল ওর আর প্রেমাংশুর মাঝখানে। রঞ্জনার কান্না, রঞ্জনার নিঃশ্বাস... স্বাতীর সব পাওয়ার আনন্দ ম্লান করে দিল একমুহূর্তে। নিজেকে মনে হতে লাগল একজন মার্ডারার।

"ওমা, আমি তখন থেকে ডেকে যাচ্ছি। আপনি তাকিয়ে আছেন অথচ কিছুই শুনছেন না! অবশ্য এরকম হয় জানেন। এমন এক একটা মুহূর্ত আসে, যখন চোখ কিছু দেখে না, কান কিছু শোনে না..." কথা বলে যেতে-যেতে চটপট দু'খানা কাগজের প্লেটে সাজানো হয়ে যায় লুচি, আলুরদম, মিষ্টি। নিজেরটা কোলে টেনে নিয়ে স্বাতীর দিকে এগিয়ে দেয় আর একটা প্লেট, "নিন ভাই, আসুন খেতে খেতে গল্প করি..."

বিব্রত হয় স্বাতী, "আমি খাব না। আপনি খেয়ে নিন।"

ততধিক সোচ্চার আপত্তি আসে উলটোদিক থেকে, "খাব না বললে হয় নাকি? এতটা রাস্তা একসঙ্গে এলাম! এখন তো আমরা বন্ধু হয়ে গেছি। আপনি না খেলে কিন্তু আমি ভীষণ রাগ করব," জোর করে হাতে ধরিয়ে দেয় প্লেট। তারপর খাওয়া থামিয়ে বলেই ফেলে ওর সামগ্রিক ইতিহাস। শিলিগুড়ির মেয়ে জ্যোৎস্না। কলকাতা এসেছিল নিজের শাড়ির ব্যবসার কাজে। কাল ট্রেন থেকে নেমে পরশুই আবার যেতে হবে কোচবিহার। অনেক লড়াই করে, পরিশ্রম করে এই ব্যবসাটা দাঁড় করাতে পেরেছে। জীবনে চলার পথে অনেক মানুষ আসবে ভালবাসার হাত নিয়ে। তাতে নাকি ভুলতে নেই। যে ভুলেছে, সেই মরেছে। অবাক হয়ে স্বাতী তাকিয়ে থাকে জ্যোৎস্নার মুখের দিকে। কী অবলীলায় লুচির পেটে আলু পুরে গোল-গোল করে মুখে পুরছে আর উচ্চারণ করে যাচ্ছে সারগর্ভ জ্ঞান। এমনকী স্বাতীকে খাইয়েই ছেড়েছে একটা গোটা লুচি।

"হ্যাঁ ভাই, তখন থেকে তো আমি আমার কথাই বলে যাচ্ছি। আপনার কথা তো কিছুই শুনলাম না। কোথায় যাচ্ছেন? নাম কী আপনার? একা যাচ্ছেন বুঝি? এদিকে কোথায় এসেছিলেন?"

এতগুলো প্রশ্নের একটাই উত্তর স্বাতীর কাছে, ছোট্ট একটা

খুঁজে নেয়, "নিশ্চয়ই শিলিগুড়ি যাচ্ছেন? ওখানেই বাড়ি, কো
পাড়ায়?"

"হালদার পাড়া..."

"আমার আশ্রমপাড়া। একদম কাছেই আপনার থেকে। খুব
হল। দেখা হবে মাঝেমাঝে!"

স্বাতী বুঝতে পারছে এত কথার পর ভদ্রতার খাতিরে ওর কি
অন্তত বলা উচিত। কিন্তু বলার মতো একটাও বাক্যও গুছিয়ে
উঠতে পারছে না। কী বলবে আর কেনই বা বলবে? অনেক
পরে বলে, "আপনিও কি একাই এসেছিলেন? আপনার স্বা
আসেননি?"

"স্বামী? আমার? সত্যি ভাই, এমন একটা কথা বললেন আ
না হেসে পারলাম না।"

"কেন, এতে হাসির কী আছে?"

"আরে বাবা আমার কোনও স্বামী-টামি নেই..."

"নেই মানে? তাহলে এই এত সিঁদুর..." নির্বাক স্বাতীর মুখে
এসে যায়।

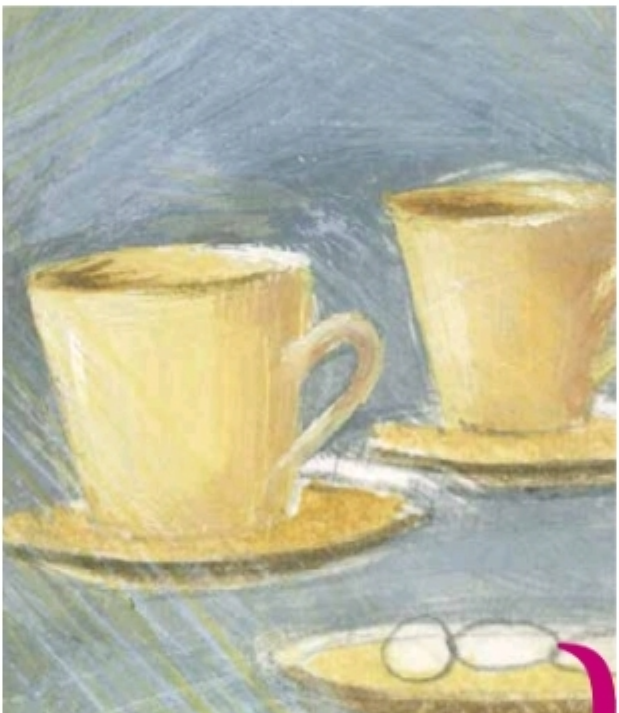
"নেই মানে নেই ... এত অবাক হওয়ার কী আছে? স্বামী
কোনওদিন ছিলই না আমার। বিয়ে একটা করেছিলাম অবশ
খুব সহজ ভঙ্গিতে কথা বলে জ্যোৎস্না। একটু থেমে জল খায়
ঢক-ঢক করে।

"তাহলে? বিয়ে করেছিলেন তো তিনি কোথায়? নিশ্চয়ই তাঁ
মঙ্গলকামনায় সিঁদুর পড়েন আপনি" স্বাতী প্রশ্ন করেই যায়।
এতক্ষণ ধরে অনর্গল কথা বলে চলা মহিলাটি বেশ মজাদার
চোখে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। হঠাৎ আয়েশ করে একটা
আড়মোড়া ভাঙে। তারপর বলে ওঠে, "সেই লোকটা বিয়ে
ছ'মাস ছিল আমার সঙ্গে। তারপরেই জানা গেল তার আগে
একটি বউ আছে। ঘেন্নায় চলে এলাম। তারপর সব সম্পর্ক
চুকিয়েও দিলাম। সিঁদুরটা কিন্তু ছাড়িনি। বরং আরও বেশি ক
ইউজ় করি। চলতে-ফিরতে আজও ম্যারেড মেয়েরাই বেশি
সুবিধে পায়।"

গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে স্বাতী। ওর তো সিঁদুর দেখলেই
প্রেমাংশুর মুখ মনে পড়ে। ডিভোর্সের পর তাই তুলেই দিয়ে
ওই পাট। অবশ্য আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভেবেছিল ন
করে সিঁদুর পড়বে। কিন্তু দুপুরবেলায় যখন রঞ্জনাকে দেখল
ওইরকম অবস্থায়... সব চিন্তাভাবনা, স্বপ্ন মুহূর্তে তালগোল
পাকিয়ে গেল। এখন ওই সিঁদুরের কৌটোটাও ওর হাতব্যাগে
এককোণায় মুখ লুকিয়ে রেখে ওর সঙ্গে শিলিগুড়ি চলেছে।
স্বাতীর মতো কৌটোটাও জানে না কী আছে ওর ভাগ্যে। প্রে
সকালে বেরোনোর সময় বলে গিয়েছিল, সে তিনটে ক্লাস নি
ফিরে আসবে। করুণাময়ের সব কথা বলা হয়ে গিয়েছিল স্বা
বেরোনোর সময় হেসে বলেছিল, "আমি কলেজ চললাম। দে
যেন এর মধ্যে আবার পালিয়ে তোমার সেই প্রেমিকের কাছে
যেও না। তাহলে তার গুলি খাওয়া কেউ আটকাতে পারবে
"একদম বাজে কথা বলবে না। করুণাকে বন্ধু ছাড়া আর কি
ভাবিনি আমি," প্রেমাংশুর পিঠে ছোট্ট কিল মেরে ওরই বুকে
লুকিয়েছিল স্বাতী।

"এই শোনো, বাড়িতে তো সবাই খুব চিন্তায় আছে। যা একটা
কাণ্ড করে চলে এসেছ। ওদের একটা খবর দিও। তারপর দে
কবে যাওয়া যায়। কত যুগ হয়ে গেল পিয়াটাকে দেখিনি। এ
ওকে চেন্নাই নেত্রালয়ে দেখাব। আজ ছুটির জন্য দরখাস্ত কর
"আমি পারব না। মা কচুকাটা করবে। তুমি বরং ফোন কোরে
"আচ্ছা বেশ, আমি ফিরি তাহলে। তারপর দু'জন মিলেই বা

তোমার অন্তর্ধান রহস্য," কথাগুলো বলে আরও একবার স্বাতীকে আদরে আদরে অস্থির করে দিয়ে চলে গিয়েছিল প্রেমাংশু।
স্বাতী ভাবল, 'ও চলে যাওয়ার পর বেশ তো ছিলাম আমি ঘরটার মধ্যে। সারা বিছানায় ওর গন্ধমাখা বালিশের চাদরের ওম নিতে নিতে বেশ ছিলাম আমি। কেন উঁকি দিতে গেলাম পাশের ঘরে? তা হলে তো আমার জীবন এইভাবে আবার এলোমেলো হয়ে যেত না।'
অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর উঠেছিল স্বাতী। হঠাতই ওর মনে



তখন অমলবাবুর সবেমাত্র জ্ঞান ফিরেছে। তাকে বারান্দায় শোওয়ানো অবস্থায় সুবালা সমানে জলের ছিটে দিয়ে যাচ্ছে আর কান্নাজড়ানো গলায় ডেকে চলেছে।

হয়েছিল সকাল থেকে তো একবারও রঞ্জনা আসেনি এঘরে। অন্যদিনের মতো চা জলখাবার এনে সাধাসাধিও করেনি। হয়তো প্রেমাংশু ঘরে আছে বলেই। মনে হয়েছিল দেখে আসি একবার। যতই প্রেমাংশু রেগে যাক ওর উপর, মেয়েটা রয়েছে যখন এখানে... ব্যবহারটাও অত্যন্ত ভাল, মিষ্টি করে 'বউদি বউদি' ডাকে, ওর খোঁজ নেওয়াটা তো স্বাতীর কিছুটা দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এইসব নানাকথা ভাবতে-ভাবতেই উঠে পড়েছিল স্বাতী। এগিয়ে এসে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে টানা লম্বা বারান্দার শেষে রঞ্জনার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। আর দাঁড়িয়েই ওর পা দুটো আটকে গিয়েছিল দরজার ফ্রেমের বাইরে। কয়েকটা মুহূর্ত কেউ যেন ওকে স্থবির করে রেখেছিল। তারপরেই আর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়নি।
দরজাটা ভেজানো ছিল। দুটো পাল্লার মাঝখানে এক ইঞ্চি মতো ফাঁক ছিল। প্রেমাংশু কলেজে বেরিয়ে গিয়েছে। স্বাতীও ঘরের বাইরে আসে না সাধারণত। সেই এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে স্বাতী দেখেছিল একটা ফ্যানের তলায় একটা টুল নিয়ে দাঁড়ানোর

মতো নির্বাক ভাষা, যা এক নিমেষে জীবন মৃত্যুর মাঝখানের
সীমারেখা অতিক্রম করে তুলে ধরে যাবতীয় ব্যর্থতার ইতিহা
ঝড়ের বেগে এসে স্বাতী একটানে রঞ্জনাকে নিজের খুব কাছে
এসেছিল। সঙ্গে রুদ্ধশ্বাস জিজ্ঞাসা, "কী করছ তুমি? কী সর্বনা
করছিলে? কেন?" রঞ্জনা কাঁপছিল থরথর করে। বোধহয় ও
নিজেও শিউরে উঠছিল এই ভেবে যে, কী করতে যাচ্ছিল! স্বা
ওকে এনে খাটে বসায়। বুকের ভিতর জড়িয়ে নেয় পরম মম
রঞ্জনা নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি আর। স্বাতীকে জড়িয়ে ধ
এতদিনের যত না পাওয়া, আশাভঙ্গের বেদনা, রুদ্ধ যন্ত্রণা...
মুক্ত করে দিয়েছিল চোখের জলের ধারাস্রোতে। ওকে জড়ি
ধরে স্বাতী তাকিয়ে ছিল শূন্য দেওয়ালে। স্বাতীর মনে হচ্ছিল,
কেন এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছিল রঞ্জনা? কী এমন শূন্য
ওর মনে? বেশিক্ষণ ভাবতে হয় না। ফ্যানের হাওয়ায়, চোখে
সামনে বিছানার ধারে পড়ে থাকা একটা কালার ছবি উলটে
কালো মোটা ফ্রেমের চশমা ভেদ করে উজ্জ্বলচোখে তাকিয়ে
প্রেমাংশু। একহাতে রঞ্জনাকে জড়িয়ে রেখে আলতো ছোঁওয়া
ছবিটা ওলটায় স্বাতী। সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা
কবিগুরুর বিখ্যাত সেই সমর্পণের ভাষা... 'আমার সকল নি
বসে আছি সর্বনাশের আশায়...' বিশেষভাবে চোখে পড়ে, '
শব্দটা কেটে দিয়ে লেখা হয়েছে 'ছিলাম'।
স্বাতীর কাঁধে মাথা রেখে তখনও কেঁপে-কেঁপে উঠছিল রঞ্জনা
হয়তো সে আশা করেছিল স্বাতী আরও কিছু জানতে চাইবে।
হয়তো সেই না বলা প্রশ্নগুলোর জন্য আতঙ্কিত অপেক্ষা ছিল
রঞ্জনার। কিন্তু বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেলেও যখন স্তব্ধতা
কাটেনি, রঞ্জনাই ধীরে-ধীরে মুখচোখ মুছে ঘুরে বসে স্বাতীর
মৃদু গলায় বলে একটি মাত্র কথা, "তুমি? কিছু বলতে এসেছি
সুনামিগ্রস্ত ভূমিখণ্ডের মতো হৃদয় সামলে সুচতুর অভিনেত্রীর
খোলস পরে নিয়েছিল স্বাতী। স্পষ্ট চোখে রঞ্জনার দিকে
তাকিয়েছিল স্বাতী, "একটা কথা তোমাকে বলতে এসেছিলা
কিন্তু তুমি ওটা কী করছিলে? সর্বনাশ হয়ে যেতে পারত। জী
এতই তুচ্ছ?"
রঞ্জনা মেঝের দিকে মুখ নামিয়ে বসেছিল। আস্তে-আস্তে জল
স্বরে বলেছিল, "আমার জীবন তো তুচ্ছই। কোনও মূল্য নেই।
"তাই কী হয়? কখন কার জীবন কীভাবে অনন্ত মূল্যবান হয়ে
যায়, কেউ কি জানে? কিছুই তুচ্ছ নয় পৃথিবীতে..." স্বাতীর
আশ্বাসবাণীতে এতটুকু আলো জ্বলেনি রঞ্জনার অন্ধকার কো
সোজা হয়ে বসে বলেছিল, "কী বলতে এসেছিলে?"
"আমি চলে যাচ্ছি গো। প্রেমাংশুকে বলে দিও," বলেছিল স্বা
আর অবাক দুটো চোখ মেলে রঞ্জনা বলেছিল, "চলে যাচ্ছ?
প্রেমাংশুর মতো মানুষকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ তুমি? কেন? ভীষ
ভেঙে পড়বে তো ও!" স্বাতীর হাতদু'টো চেপে ধরে ছটফট
করেছিল ও, "ওকে কষ্ট দিও না তুমি প্লিজ়! ও তোমাকে ছাড়া
রঞ্জনার হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল স্বাতী। সমস্ত বরফ গলায় ঢে
বলেছিল, "কিন্তু আমি ওকে আর ভালবাসিনা রঞ্জনা। এই ক
সেটাই পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। ইন ফ্যাক্ট, আমারও
নিজেকে জানা দরকার ছিল। আমি করুণাময়কে ভুলতে পার
আর প্রেমাংশুকে ঠকাতে চাই না। তাই... " ঢোঁক গিলে থেমে
স্বাতী। ও পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল এক আলোর বিচ্ছুরণ
রঞ্জনার মুখেচোখে, যার খবর ও নিজেও জানে না।
"আমি করুণাময়ের কাছেই ফিরে যাচ্ছি রঞ্জনা। প্রেমাংশুকে
সামলে রেখো," ঝড়ের বেগে নিজের লাল হলুদ সিল্কের শা
পরে নেওয়া আর একটা কুড়িয়ে পাওয়া টুকরো কাগজে দু'টো

আসা। মাত্র এইটুকু সারতে একযুগের সমতুল্য দু'টো মিনিটের বেশি সময় নিয়েছিল স্বাতী। আর মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হেঁটে-হেঁটে ক্লান্ত রঞ্জনা নিজেকে হঠাৎ একটা ছায়া সুশীতল ঝর্নাধারার পাশে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে শুধু দাঁড়িয়েছিল। একবারও স্বাতীকে ডেকে ফেরানোর চেষ্টা করেনি। একটা অসম্ভব সুদূর ভবিষ্যতের ভাবনায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল রঞ্জনা। আর সেই সময়টুকুর মধ্যে স্বাতী পেরিয়ে এসেছে লক্ষ যোজন পথ। ঘর থেকে বারান্দা, উঠোন, রিকশা, স্টেশন, টিকিট কাউন্টার... সব পেরিয়ে অবশেষে এই তিস্তা তোর্সা নামের বিশাল অজগর, যার পেটের মধ্যে এক নিমেষে ঢুকে গেল স্বাতীর আলো ঝলমল রঙিন ভালবাসার ভবিষ্যৎ। স্বাতী স্বার্থপর নয়, নিজের স্বার্থের জন্য স্বাতী আরেকজনকে অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারবে না। তাই পালিয়ে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় খুঁজে পায়নি ও। কারণ স্বাতী জানে, যে একবার চেষ্টা করে, সে বার-বার চেষ্টা করবেই নিজেকে শেষ করে দেওয়ার। বড় যন্ত্রণার এই বোধহীন বেঁচে থাকা। এই কয়েকমাস প্রেমাংশুহীন জীবন কাটিয়ে সেই অনুভূতি হয়েছে ওর। ট্রেনটা তখন সারারাত জাগা স্বাতীকে নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ঢুকছে। তার সরে-সরে যাওয়া চাকার তালে-তালে স্বাতীও ক্রমশ ঢুকে পড়ছে এক অন্তলীন আলোকময় অন্ধকার পরিবৃত্তে।

১৩

খাটের পাশে অজস্র শিশি-বোতলে ভরা টুল। যেন জীবনরসে টইটম্বুর একেবারে। সেই কবেকার পুরনো হজমের ওষুধ থেকে কাশির সিরাপ, প্রতিটি শিশি সুবালা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সঞ্চয় করে। কখন কী কাজে লাগে, বলা তো যায় না। সেই অকাজের জিনিসগুলোর ফাঁকে-ফাঁকেই গুঁজে রাখা হয়েছে অমলবাবুর অতি দরকারি সব ওষুধপত্র, যা এখন তাঁকে অনেকদিন পর্যন্ত নিয়ম করে খেয়ে যেতে হবে। স্বাতী অনভ্যস্ত হাতে খুঁজছিল প্রেসক্রিপশন। বুঝতে চাইছিল বাবাকে কখন কোনটা খেতে বলেছে ডাক্তার। সুবালা সবজি সেদ্ধ সুপ নিয়ে ঘরে ঢোকে। আর ঢুকেই বাবার পাশে মেয়েকে দেখে ঝামটা মেরে ওঠে, " বাবাকে তো মেরেই এনেছ। এখন আর এসব নাটক করে কী হবে! বিছানা জুড়ে বসে না থেকে এখন দয়া করে সরে গেলে ভাল হয়। আমি সুপটা খাইয়ে যেতে পারি।"

স্বাতী বিছানার পাশ ছেড়ে নড়ে না। কটুবাক্যের কোন উত্তরও দেয় না। শান্ত স্বরে বলে, "আমাকে দাও, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।"

ওর এই শান্ত গম্ভীর ভঙ্গিতেই আরও চটে যায় সুবালা। ঝাঁঝিয়ে বলে, "কারওর সাহায্য দরকার নেই আমার। আমি তো মরে যাইনি এখনও। যাও সরে বোসো তুমি।"

"না মা, বলছি তো আমাকে দাও। এখন থেকে বাবার দেখাশোনা আমি করব।"

স্বাতীর কথায় আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে সুবালা, "না তুমি করবে না। কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে এই সংসারের জন্য। যেখানে গিয়েছিলে, সেইখানেই যাও। শেষ করে দিল মানুষটাকে। এখন সেবা দেখানো হচ্ছে..."

"মা!"

"ধমকাচ্ছিস কী? কী ভুল বলেছি আমি? তোর চিন্তায়-চিন্তায় এই মানুষটার অতবড় অসুখটা হয়নি?"

এবার শুয়ে থাকা অমলবাবুই বিরক্ত গলায় বাধা দেন, "আহ, তোমাদের কারওর কিছু করার দরকার নেই। আমি বেঁচে আছি

দুর্বলতা। সুবালার এই বিষোদ্গার তাই সহ্য হয় না। স্বাতী
শরীরে আবার বাড়ি ফিরে এসে যেন অমলবাবুর কাছে সব
খণ্ডন করে নিয়েছে। সুবালা এত সহজে মেনে নিতে পারে
কোনও কিছুই। আর স্বাতীও এখনও মায়ের একটা কথারও
দেয়নি। তার ফল হিসেবে সুবালার এই তীব্র ঝংকার, প্রতি
রাগপ্রকাশ। ঠকাস করে সুপের বাটিটা মেঝের উপরে নামি
দিয়ে চলে যায় সে।

কী যেন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে স্বাতীর। চুপচাপ ব
তুলে নিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে বাবার পাশে, "হাঁ করো তো ব
চামচ তুলে ধরে অমলবাবুর মুখের কাছে। বিনা বাক্যব্যয়ে
থাকেন অমলবাবু। সেরিব্রালের প্রথম ধাক্কাটা কাটানো গি
কিন্তু শরীর এখনও খুবই দুর্বল। এতগুলো মানুষ তাঁর উপ
নির্ভর করে আছে। ছোট মেয়েটার পড়াশোনা, স্বাতী, পিয়া
সুবালা... এদের চিন্তায় অমলবাবুর ঘুম হয় না। চোখ বুজে
থাকলেও কপালে প্রকট হয়ে ফুটে ওঠা ভাঁজগুলোই বলে
মস্তিষ্কের ক্ষয়ের গল্প। স্বাতী ছুঁতে পারে বাবার চিন্তা। কপা
বুলিয়ে নরম গলায় ডাকে, "বাবা..."

চোখ মেলে তাকান অমলবাবু।

"কেন এত ভাবছ বাবা? এই তো আমি এসে গেছি। আর
যাব না তোমাকে ছেড়ে। আমি দেখছি কীভাবে সংসারের
যায়। কিছু একটা উপায় বের করবোই, তুমি ভেবো না।"

"তুই কোথায় চলে গিয়েছিলি মা? সেদিন তোকে মা দুর্গার
মতো দেখাচ্ছিল! আর... তারপরেই তো তুই কোথায় চলে
এই দুর্গা তো আমি কোনওদিন বিসর্জন করতে পারব না ম
আবেগতাড়িত কণ্ঠ বুজে আসে অমলবাবুর। স্বাতী বাবার
ভেজা কোল মুছিয়ে দেয়, "না বাবা, আর যাব না। তুমি ক
না।"

অমলবাবু মেয়ের হাত চেপে ধরেন দুর্বল মুঠিতে।

"কী বাবা? কী বলছ?"

শুয়ে শুয়েই একবার দরজার দিকে তাকিয়ে নেন অমলবাবু
সুবালা আসছে কি না, বুঝে নেন। তারপর স্বাতীর দিকে
বলেন, "হ্যাঁ রে মা, প্রেমাংশু কেমন আছে রে? সে কিছু ব
রাগ পড়েছে তার? তুই বল আর না বল, আমি তো জানি
কাছেই ছুটে গিয়েছিস তুই! কেন সেকথা কাউকে বলছিস ন
তাহলে তো এভাবে তোর মা দিনরাত তোকে..."

বাবার হাতটা চেপে ধরে স্বাতী। শান্ত করে মাথায় হাত বুলি
আস্তে বলে, "ভাল আছে বাবা। আরও ভাল থাকবে এরপ
স্বাতী অবাক হয়নি। সে জানতই, আর কেউ না বুঝুক, বাব
বুঝতেই পারবে কোথায় গিয়েছে ও। জানতই যে, বাবার প্র
সামনে ওকে দাঁড়াতেই হবে। সেই প্রস্তুতি ছিলই ভিতরে ভি
কিন্তু এখন আংশিক উত্তর দেওয়া ছাড়া আর কিছু সমাধান
ওর কাছে। সম্পূর্ণ উত্তরটা নিয়ে এসে বাবা, মায়ের সামনে
পিয়ার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে ভেবেছিল। কিন্তু স্বা
হতে পারল না স্বাতী। সবাই ওকে বোকা বলবে। বলবে মূ
স্বাতী পারেনি রঞ্জনার কান্নাটা ইগনোর করতে। এখন প্রেম
রঞ্জনাকে গ্রহণ করবে কী করবে না, সে সমস্যাটা রঞ্জনার
সেখানে স্বাতীর ভূমিকা নেই। তবু যাতে প্রেমাংশুও রঞ্জনা
নিয়ে সুখী হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে একটা চরম মিথ্যের
নিজের হাতে বুনে এসেছে স্বাতী।

'প্রেমাংশু অনেক কথা বলেছে বাবা। তুমি তো জানো তো
মেয়েটা বরাবর অঙ্কে কত কাঁচা ছিল। সে শুধু মুখস্থ করে-
পাশ করে গেছে জীবনভর। আমি সেইসব কথার পাহাড় ম

নিজের মনে অমলবাবুর অজস্র প্রশ্নের নিশ্চুপ উত্তর দিয়ে যায় স্বাতী। আর অমলবাবু কী জানি কী ভেবে মেয়ের হাতে তাঁর কাঁপতে থাকা উষ্ণতা পৌঁছে দিতে থাকেন বিড়-বিড় করা কিছু শব্দের মাধ্যমে, "ঠিক আছে মা। পরেই বলিস 'খন। আমার তাড়া নেই কোনও। তুই ভাল থাকলেই আমার শান্তি। অনেক ঝড় গিয়েছে তোর উপর দিয়ে। এবার একটু থিতু হয়ে বস দিকি।"

"এই তো বাপ মেয়ের সোহাগপর্ব চলছে বাবা! এসো, ভিতরে এসো," সুবালা কী এক জাদুমন্ত্রে গলার আওয়াজকে মধু দিয়ে মেজে কথা বলতে-বলতে ঘরে ঢোকে। আর তার পেছনে কুণ্ঠিত পায়ে করুণাময়। হাতে এক ঢাউস ব্যাগ। স্বাতী কথা বন্ধ করে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। যেন আর কোনও কিছু বলার নেই, শোনারও নেই। কিন্তু সুবালা তো থেমে থাকার মানুষ নয়। সে এই চুপচাপ থেমে থাকা আবহাওয়া বরদাস্ত করতে পারে না। ঝনঝন করে বেজে ওঠে, "কী ব্যাপার, সব বাক্যি চলে গেল যে! ছেলেটা কতদিন পর এলো, ওকে বসতে দিবি, খোঁজখবর নিবি, তা না ... গিঁট পাকিয়ে বসে আছে দেখো?" মায়ের কথার একটাও উত্তর না দিয়ে ঘরের কোণ থেকে আরতির খাতা বই চাপিয়ে রাখা চেয়ারটা উদ্ধার করে এনে মাঝখানে রাখে স্বাতী, "বোসো করুণা।"

এটুকুতেই বিগলিত করুণাময়, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসছি-বসছি। আগে এগুলো রাখ..."

ব্যাগটা পায়ের কাছে রেখে নতুন শীত নেমে আসা সন্ধ্যায় মুখে রুমাল ঘষা হয়ে যায় করুণাময়ের। এতদিন এই মানুষটা এলে সামান্য চা করার উদ্যোগটুকুও স্বাতীকেই নিতে হত। আজ মায়ের গলার আওয়াজই বলে দিচ্ছে, পরিস্থিতি যে কোনও কারণেই হোক পালটেছে। এখনই সুবালা নিজে ছুটবে চা এবং সাধ্যমতো টা-এর জোগাড় করতে। এই জানাটাই মনে-মনে স্বাতীকে আরও বিমুখ করে তোলে। মনটা বিমুখ হয়ে থাকে মায়ের উপর, সমস্ত পরিবেশের উপর। আর সেই ঝাঁঝটা এসে পড়ে করুণাময়ের উপর। করুণাময় কথা বলতে শুরু করেছে। "এই তো অমলদা! প্রায় সেরেই উঠেছেন। আর চিন্তা নেই। আর স্বাতী শোনো, আর যেন কোথাও দুম করে চলে যেও না! তুমি দেখলে তো, যেদিন তুমি গেলে সেইদিনই এই কাণ্ড! না-না স্বাতী, এটা তুমি একেবারে ঠিক কাজ করোনি। তা গিয়েছিলে কোথায়? ওই প্রেমাংশুবাবুর কাছে নয়তো? চুপ করে আছ কেন? তুমি কিছু না বললেও আমি ঠিক জানি! কিন্তু কেন? সব তো চুকেবুকেই গেছে। আবার কেন তার কাছে? তাছাড়া সে কি রাখল তোমায়? সেই তো ফিরেই আসতে হল..."

"করুণা," আচমকা চিৎকার করে ওঠে স্বাতী, "আর একটা কথাও আমি শুনব না আমার সম্বন্ধে। এত অধিকার দিইনি আমি তোমাকে!" চেয়ার থেকে চমকে লাফিয়ে ওঠে সে, "মানে? আমি তো কিছু... কী মুশকিল! কেন তুমি শুধু-শুধু এতটা... না মানে আমি তো... এত রাগের কী আছে..."

"চুপ, একদম চুপ! কোনও কথা শুনতে চাই না আমি," করুণাময়ের সামনে এসে মুখের উপর আঙুল তুলে হিসহিস করে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে দুপদাপ পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় স্বাতী। বেরনোর সময় চা, চিঁড়েভাজা নিয়ে ঢুকে আসা সুবালার সঙ্গে ধাক্কা লাগতে-লাগতে লাগে না। সুবালা গিয়েছিল রান্নাঘরে। একটা ভাল মুড নিয়ে আসছিল সে। অনেকদিন পর আবার ছেলেটা-মেয়েটার দেখা হয়েছে। এবার একটা কিছু হিল্লে হবে নিশ্চয়ই। স্বাতী নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার এতবড় সুযোগটা ছাড়বে না আশা করি। খুব খুশি হয়েই করুণাময়ের আপ্যায়নের

দু'টো কুঁচকে ওঠে তার, "কী ব্যাপার? মেয়ে ওভাবে বেরিয়ে কেন? আর এই ভর সন্ধ্যায় গেলই বা কোথায়? পিয়াটা গা ক্লাসে। এখনই আরতিও এসে যাবে ওকে নিয়ে। মেয়ে এসে কোথায় জানতে চাইলে, কী বলব?" হাতের কাপ-ডিশ-ট্রে সব নামাতে-নামাতে নিজের মনে বলে যেতে থাকে সে। ক আবার বসে পড়েছে ঘরের মাঝখানে রাখা চেয়ারটায়। ব্যস্ত সুবালা। কাঁধে, মাথায় হাত বোলায়, "কী হয়েছে বাবা? অ করছ কেন? একটু জল খাবে?" নিরুত্তর করুণাময়কে রেখে অসুস্থ স্বামীর উপরেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সুবালা, "কী হয় বল তো? মেয়েটা কোথায় চলে গেল আবার? আর কী বলে করুণাকে? নিশ্চয়ই কিছু অসভ্যতামি করেছে? সুবিধের তো তোমার মেয়ে..." অমলবাবু সচরাচর সুবালার অভিযোগের কোনও উত্তর দেন না। তিনি জানেন, সংসারে সবার মন প তাঁর কর্ম নয়। কিন্তু এবার কোনওমতে উঠে বসতে-বসতে "করুণার কোন দরকার ছিল না কতগুলো অপ্রয়োজনীয় ক বলার।" সুবালা হা-হা করে ধরতে আসার আগেই খাটের রাখা হাওয়াই চটিতে পা গলিয়ে ফটফট শব্দ তুলে বেরিয়ে বাথরুমের উদ্দেশ্যে।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে টানা বারান্দা। মাথার উপর টিনের শেড বহুকাল আগে মেঝেটুকুই শুধু পাকা করতে পেরেছিলেন অমলবাবু। ছাদ ঢালাই আর এই জন্মে হল না। সেই বারান্দা শেষমাথায় টিনের দরজা দিয়ে আড়াল করা অংশটুকুই আপ রাত্রিকালীন জলবিয়োগের জায়গা বলে নির্দিষ্ট করা আছে। সেরিব্রাল অ্যাটাক হওয়া ইস্তক এই কাজটাও ঘরের মধ্যে র ডাবরেই সারতে হচ্ছিল। আজ উত্তেজিত হয়ে নিজেই বাইরে এসেছেন অমলবাবু। অন্ধকার যেখানে ঝুপসি হয়ে নেমে এ বুকের তলা পর্যন্ত, এরকমই এক কোণায় দু' হাঁটুতে মুখ গুঁ বসেছিল স্বাতী। বাবাকে দেখে ছুটে এসে ধরে ফেলে।

"কী করেছ বাবা? কেন বাইরে এলে? তোমার না ওঠা বার আমায় ডাকবে তো একবার! আমি কোথাও যাইনি বাবা, এ অন্ধকারে বসেছিলাম!"

"না মা, আমার দুগ্গা মা... অন্ধকারে থাকিস না রে মা! আলে আয়, আলোতেই তোকে মানায়। আমি তো আছি। তোর ভ অমলবাবু মেয়ের উপরে শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে ধীরে-ধী ফিরে আসেন ঘরে।

ঘরের ভিতরে তখন করুণাময়ের আনা বিশাল বস্তা আকৃতি থেকে একে-একে সুবালা বের করে ফেলেছে বাজার উজাড় জিনিসের পাহাড়। ঠিক একা নয়, বলা ভাল করুণাময় এবং দু'জনে মিলেই করে চলেছে কাজটা। মেঝেতে ছড়ানো আপে কলা, বেদানা, আঙুর, ন্যাসপাতি, তিন চার রকমের দেশী- বিদেশি হেলথ ড্রিঙ্কের প্যাকেট, শিলিগুড়ির প্রায় সমস্ত বড় দোকানের সাত আটখানা বড়-বড় বাক্স, বিশাল একটা কেব অসংখ্য দামি দামি বিস্কুটের প্যাকেট। করুণা ভুলে গেছে এ আগেকার ব্যাপারটা। স্বাতীর রাগ বিরক্তি অপমানটা... অত আহ্লাদের সঙ্গে একটা-একটা করে জিনিস বের করে দিচ্ছে ভিতর থেকে। সুবালাও খুশি। ওকে দেখে আশ্চর্য লাগে স্বা আবার মনেও হয়, কত সহজেই করুণার রাগ চলে যায়। রা প্রেমাংশুর। একবার রেগে গেলে ওকে আগের অবস্থায় আন রীতিমতো সাধনার ব্যাপার।

বাবাকে যত্ন করে শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল স্ব মনটা এমন হয়ে আছে, ওর ইচ্ছে করে না করুণাময়ের সাম একটুও বসে থাকতে। কিন্তু বাবাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যে

স্বাতীকে। একবার অলস চোখের আনমনা দৃষ্টি নিজেই ঘুরে আসে মায়ের উপর থেকে এবং তার সামনেই বসে থাকা বিগলিত হাসিমুখ করুণাময়ের দিক থেকে। উপঢৌকন দিতে পেরে কৃতজ্ঞ ওই হাসিমুখটা স্বাতীর কাছে নতুন কিছু নয়। বাবার সঙ্গে বিভিন্ন পার্বণে ও গিয়েছে সান্যালবাড়ি। সেইসূত্রে ছোটবেলা থেকেই করুণা ওর বন্ধু। চিরকালই ও স্বাতীকে যা হোক, কিছু দিতে পারলেই খুশি হয়েছে। বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওর এই অভ্যাসটা একটুও না কমে আরও বেড়েই গিয়েছে। এর জন্য বহু ঝগড়াঝাঁটি, গালমন্দ, অশান্তি হয়েছে স্বাতীর সঙ্গে। কিন্তু সে সবই ছিল দুই বন্ধুর আদানপ্রদান। অন্তত স্বাতীর কাছে তো তাই। তখন রাগ হয়েছে। কিন্তু আজকের মতো এমন খারাপ লাগেনি। স্বাতী নিজের মনেই তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে, কেন আজ ওর মন থেকে এই অসহ্য চটচটে ভাবটা যাচ্ছে না! মায়ের মুখের হাসিটা অনেক্ষণ একই ডিগ্রিতে ধরা ছিল। স্বাতী মনে-মনে চিন্তা করে, মা এর আগে কোনওদিন করুণাকে দেখে এতক্ষণ ধরে এমন হেসেছে কি না। উঁহু, মাথাটা নড়ে যায় ওর। হাসবে কী, মা তো করুণাকে বিশেষ পছন্দই করত না কখনও। বড় বাড়ির ছেলে বলে মুখে কিছু বলত না, এই যা । প্রেমাংশুর সঙ্গে ডিভোর্সের মামলা শুরু হওয়ার পর থেকে তো মা দু'চক্ষে দেখতেই পারেনি কোনওদিন ওকে। মায়ের কেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল করুণাময়ই দায়ী স্বাতী-প্রেমাংশুর সব গণ্ডগোলের জন্য। সেটা যে নয়, তা কোনদিন মাকে বোঝানো যায়নি। আর চিরদিন তাই ওরা মা-মেয়ে দুই বিপক্ষ শিবির হয়েই থেকে গেছে।

সেই মা যখন আজকে করুণাময়ের জন্য যত্ন করে চা আনে, খাবার আনে, তখন স্বাতীকে অভ্যন্তরের রহস্য ভেদ করার প্রচেষ্টায় নামতে হয় বই কী। কিন্তু সেই রহস্যটাও আর রহস্য থাকে না, যখন বাবার জন্য আনা ফলমূলের তলা থেকে দামি চারখানা শাড়ির বাক্স করুণা মায়ের হাতে তুলে দেয়। আর মা হেসে সেইগুলো এনে ধরে স্বাতীর চোখের সামনে, "কী তখন থেকে গোমড়া মুখে বসে আছিস! শাড়িগুলো দেখ..."

"শাড়ি আবার দেখার কী আছে? আমার এসব ভাল লাগে না।"

"কী ভাল লাগে তোমার? কারণে অকারণে মানুষকে অপমান করতে? এত ভালবেসে ছেলেটা নিয়ে এল ওর জন্য আর উনি একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারছেন না! ন্যাকামি দেখলে গা জ্বলে যায়!" তীব্র ঝংকার দিয়ে ওঠে সুবালা। আর করুণাময় লাল-লাল মুখ নিয়ে অনুরোধের গলায় বলে চলে, "না মানে ...ওই বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম তো! দেখে বেশ ভাল লাগল। মানে ... তোমায় বেশ মানাবে!"

"শোনো করুণা, একটা কথা তোমাকে স্পষ্ট করে এখনই আমি বলে দিতে চাই," আবার স্বাতী আঙুল তুলে এসে দাঁড়ায় করুণাময়ের সামনে। কিন্তু কথা শেষ হতে পারে না। তার আগেই বারান্দা থেকে কচি গলার ডাক ভেসে আসে।

"মা, জানো দিদিমনি আজ কী বলেছেন?" হই-হই করে মাসির আঙুল ধরে ঘরে এসে ঢুকেছে পিয়া। এত খুশি ওকে অনেকদিন দেখেনি স্বাতী। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মেয়ের দিকে। পিয়া জড়িয়ে ধরেছে মাকে। খারাপ মেজাজে ছিল স্বাতী। পিয়াটা ঘরে ঢুকেই যেন একপশলা অসময়ের বৃষ্টির মতো উড়িয়ে নিয়ে যায় মনে জমে থাকা যত ধুলোবালি। মেয়েকে আদর করে স্বাতী । চুলগুলো আদর করে নেড়ে দিতে-দিতে বলে, "কী রে! তখন থেকে শুধু মা-মা করছিস! কী হয়েছে, সেটা তো বলবি?"

এবারে আরতি তড়বড় করে বলে ওঠে, "কী ভাল গাইল দিদি পিয়াটা! তুই ভাবতে পারবি না। গানের দিদিমণি প্রশংসা

স্বাতীর মুখেও খুশি ঝিলিক দেয়। আত্মজার প্রশংসা সকল গৌরব। এবার বাবার খাটে বসে পিয়াকে পাশে বসিয়ে জি করে, "কোন গানটা গাইলি রে? শিখলি বা কোথায়? এই মাত্র ক'দিন যাচ্ছিস! এখন তো সরগম চলবে অনেকদিন..."

"কেন? আমি তো দিদার কাছে শুনে-শুনে কবেই শিখেছি দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে," গুন গুন করে পিয়া কচি গলার নিষ্পাপ আনন্দে প্রাণ পায় রবিঠাকুরের গান। স্বাতী মেয়ের মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরে। তারপর মেঝের উ গিয়ে সুবালার কাছে বসে। হঠাৎ করে থমকে যাওয়া সুবাল হাতদুটো ধরে নাড়া দেয়, "মা, তুমি ওকে এই গানটাই শি এই গানটা? এত সুন্দর গাইছে ও তোমার কাছে শিখে? আর এই তুমি কি এক মানুষ? সব ভুলে গিয়েছ মা? তুমি ভুলে গিয়েছ? আমি কেন ভুলতে পারছি না মা?"

রাগী, তেজি, কখনও চোখের জল না ফেলা মেয়েটা, সারা মায়ের প্রতিপক্ষ হয়ে ছুরি শানানো মেয়েটা সুবালার বুকে গুঁজে নিজের বুকে জমে থাকা বরফ থেকে বিন্দু-বিন্দু জল করে নিতে চায় শুকনো কাঠ-জীবনটার গোড়া ভেজানোর আর সংসারের জাঁতাকলে পড়ে স্বার্থপরতার মূর্তি হয়ে ওঠ নিজের মনের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে কিছুই ভো সে। সব ভোলা যায় না। একটা সময় ছিল, যখন অফিস ফিরে প্রেমাংশু সোজা এখানেই আসত। স্নান করে জামাক ছেড়ে বসত এই মেঝের উপর ধূপ জ্বালিয়ে। এই গানটা দি শুরু হত তার সন্ধ্যারতি। সেখানে স্বাতী, সুবালা, আরতি, অমলবাবু... সকলের উপস্থিতি ছিল আবশ্যিক। একটা অস পবিত্রতার আবহে এই ছোট্ট ঘরটা হৃদয়ের প্রাচুর্যে ভরে থা তারপর চা, জলখাবার, গল্প। সেইসব দিন ভোলা যায় না। কখনও অমন সুন্দর সন্ধ্যা নামবে না এই বাড়িতে। সুবালা পাথর নয়, স্বামী হয়ে অমলবাবু বা পেটের মেয়ে হয়ে স্বাতী জানে না, সেটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। সুবালাও মানুষ। সোনার টুকরো জামাই পেয়েও হারানোর শোক যে কতখা তা একমাত্র সুবালার মতো শাশুড়িই বুঝবে। চোখে আঁচল দিয়ে বাইরে চলে যায় সুবালা। ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে করুণাময়ের আনা ফলের স্তূপ, কেক, বিস্কুট, মিষ্টি আর এ শাড়ির বাক্স।

১৪

সন্ধে নামার কিছু আগে ঝড় উঠল। প্রথমে অনেক দূরের অ একটা কালো বল নিয়ে লোফালুফি শুরু করল হাওয়ারা। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা আর মনে-মনে স্কুলের বারান্দ যেতে চাওয়া নারকেল গাছগুলো শেষরক্ষার তাড়নায় বুঝি জানিয়েছিল ঝুপসি কাঁঠাল গাছের কাছে। কিন্তু বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ মাষ্টারমশাই কোনও উপায় তো দিলেনই না, বরং নিজেও ভার বেমালুম ভুলে গিয়ে মেতে উঠলেন হাওয়ার কারসাজি খাটের উপর উপুড় হয়ে, বুকে বালিশ, দু'হাতের চেটোয় থু রেখে চারদিকে উড়ে যেতে চাওয়া বই খাতার সমুদ্রে ভেসে বাইরের ঝড়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল ন্যাড়া। ন্যাড়া বললে হবে। এই আকাশ ছোঁওয়ার মুহূর্তগুলোয় ও হয়ে যায় নবে আনমনা ছিল ও, ভীষণ অন্যমনস্ক। হঠাৎ দরজার পাল্লায় হতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। ছিটকিনি লাগানো নেই। কাকিম হলে একবার ডেকেই ঢুকে পড়ত। তাহলে? ভুরুটা একবার হয় ওর। গলা তুলে হাঁক দেয়।

আরও বেশি অবাক লাগে, যখন দেখে পায়ে-পায়ে আরতি

সরিয়ে লাফিয়ে উঠে বসে। দু' হাতে ছড়িয়ে থাকা বইপত্র সরিয়ে বসার জায়গা করে,"কী রে তুই? হঠাৎ!"
"কাকিমা বললেন তুই উপরে আছিস," থেমে-থেমে বলে আরতি। হঠাৎ আসার কারণ কিছু বোঝা যায় না ওকে দেখে। একটা নীল হলুদ ছাপার শাড়ি পরে আছে। ন্যাড়ার ভাল লাগে ভীষণ। বলে, "এরকম শাড়ি পরে লেডি সেজে গিয়েছিলি কোথায়? আর দাঁড়িয়েই থাকবি নাকি? এসেই যখন পড়েছিস ভুল করে... দাঁড়া, চপমুড়ি আর চা আনি। এই ওয়েদারে দারুণ জমবে।"
"সবসময় এত বাজে কথা বলিস কেন ন্যাড়া? আমি চপমুড়ি খেতে আসিনি।" কিছুটা ভাঙা-ভাঙা গলায় কথাগুলো বলে আরতি। আর ন্যাড়ারও যা বোঝার ছিল, বোঝা হয়ে যায়। খুব কিছু মনখারাপ নিয়ে ছুটে এসেছে আরতি। ছোটবেলা থেকে এরকমটাই তো হয়ে এসেছে বরাবর। তা সে পরীক্ষায় কম নম্বর পাক, হারিয়ে ফেলুক খাতার পাতায় লুকিয়ে রাখা সিনেমার টিকিট বা বকুনি খাক মায়ের কাছে। ন্যাড়াই আরতির বরাবরের মুশকিল আসান। মন ভাল করে দেওয়ার জাদুকাঠি। কিন্তু আজ কিছু একটা ঘটেছে। আরতির এই থমথমে চোখ, ঘাড় গুঁজে দাঁড়ানোর ভঙ্গি ন্যাড়ার মনের অ্যান্টেনাগুলোকে টানটান করে তোলে। "আচ্ছা, চা খেতে হবে না। কিন্তু বসবি তো একটু!"
সহজভাবে কথা বললেও ন্যাড়ার টেনশন হয়। খুব গন্ডগোল চলছে আরতির বাড়িতে। স্বাতীদিকে নিয়ে সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। ন্যাড়া এই নিয়ে ছোটকাকু-কাকিমাকেও আলোচনা করতে শুনেছে। করুণাকাকুর সঙ্গে যদি স্বাতীদির বিয়েটা হয়, তাহলে নাকি সমস্যাটা মিটে যাবে। কিন্তু এদিক ওদিক থেকে শুনে এবং নিজের চোখে স্বাতীদিকে দেখে ন্যাড়ার যা মনে হচ্ছে, তা হল স্বাতীদি ওই প্রেমাংশুদাকেই ভালবাসে। ন্যাড়া আরতির দিকে তাকায়। খাটের কোণায় বসেছে মেয়েটা। মুখটা নিচু করা।
"কী হয়েছে বল তো? কী এত ভাবছিস তখন থেকে? কিছু প্রবলেম থাকলে বল আমাকে..."
যেন আরতি ঘুমোচ্ছিল। ন্যাড়ার কথার আচমকা ঢেউ এসে যেন নির্মম হাতে ঝাঁকিয়ে তুলে দিয়েছে ওকে, এমনভাবেই চমকে ওঠে আরতি। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ন্যাড়া সেই ছোট্টবেলার পর আরতিকে আর কাঁদতে দেখেনি চট করে। এই সেদিন অমলকাকুর অসুখটা বাদ দিলে, আরতিকে শুধু হাসতেই দেখেছে। এখন এই ফাঁকা ঘরে এভাবে কেঁদে উঠবে আরতি, এটা যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। ন্যাড়া কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে। মনে হয় বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে, মুছিয়ে দেয় আরতির চোখের জল। কিন্তু সব ইচ্ছে শুধু বুকের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে স্থবির থেকে যায় ন্যাড়ার মনে। নড়তে পারে না সে একটুও। অপেক্ষায় থাকে, কখন আরতির কান্না থামবে।
আরতিও তাই করল। বেশ খানিক্ষণ কান্নাকাটির পর সোজা হয়ে বসে আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মুছে তাকায়, "সরি রে, তোকে কিছুটা বিরক্ত করলাম। যাই আমি..." উঠে দাঁড়ানোর উপক্রম করে আরতি। আর লাফিয়ে খাটের উপর থেকে নেমে আসে ন্যাড়া, "সে কী রে? যাবি কী ? এই তো এলি..."
আরতি হাসে, "বাহ, যাব না তো কী করব? এখানে কি থাকতে এসেছি নাকি আমি?"
'সে তো তোকে একদিন আসতেই হবে। এখানে এই বাড়িতে নয়, অন্য কোনও বাড়িতে, কিন্তু আমার কাছেই থাকতে হবে তোকে। এটাই তো তোর-আমার ভবিতব্য। এই স্বপ্নটাই তো আমি দেখে

আর কিছুদিন পরে ঠিক জেনে যাবি।' মনে-মনে আউড়ে যা
কথাগুলো ন্যাড়া ছাড়া কেউ কখনও শুনতে পায়নি। আরতি
শুনতে পায় ন্যাড়ার পরের কথাগুলো, "কাঁদলি কেন তুই?
হয়েছে আমাকে বলবি না?"
"নাহ, কিছু হয়নি, এমনি। আমি যাব এবার," আরতি মেঝে
থেকে উঠে দরজার দিকে ফেরে। কিন্তু দরজা আটকে ন্যাড়া
দাঁড়ায়।
"এমনি কেউ কাঁদে না আরতি। কী হয়েছে বল।"
আরতি চুপ। মাথা নিচু করে আঙুলে শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে
যাচ্ছে। ন্যাড়া আর পারে না। নিজে নয়, কেউ যেন ওকে চাল
করছে, এভাবেই এগিয়ে আসে আরতির দিকে। দু'কাঁধে হাত
রেখে ডাকে, "তাকা আমার দিকে। বল কী হয়েছে। শুধু-শু
কান্নাকাটি করার মেয়ে তুমি নও। কেউ কিছু বলেছে? কী হল
তাকা আমার দিকে?"
আরতি চোখ তুলে তাকায়। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেছে, এই
বলে, "কিছুদিন আগে তোকে একটা প্যাকেট দিয়েছিলাম
রেগুলেটেড মার্কেটে একজনকে দিতে, মনে আছে?"
কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে ন্যাড়ার মাথার মধ্যে ঝনঝন করে
বেজে ওঠে নামটা, সুকান্ত গিরি! ভুলবে কী করে ও? আরতি
হাতের যত্ন করে লেখা নাম। ভিতরে আরতির হাসিমুখের
ল্যামিনেটেড ছবি। কিছু না বলা সত্ত্বেও আরতি অনেক কথা
দিয়েছিল ওই একটা প্যাকেটের মধ্যে দিয়ে। আর সেই অসহ
কথাটাকে ন্যাড়া নিজের হাতে 'নেই' করে দিয়েছে প্যাকেটটা
জায়গামতো না ডেলিভারি করে। যাই হোক, ও ইনোসেন্ট মু
বলে, "হ্যাঁ, মনে আছে। কী হয়েছে তার? কে ওই সুকান্ত গি
"ওকে...ওকে... খুব ভালবাসি রে আমি! তোকে বলা হয়নি।
ভেবেছিলাম পরে বলব," আবার আরতির চোখ ভরে আসে
জলে। আর আরতির মুখে ভালবাসি কথাটা শুনে মাথার ভি
একটা ছুটে যাওয়া ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ টের পায় ন্যাড়া। টের
দেওয়াল ভাঙার ধ্বংসলীলা। দম আটকানো গলায় বলে, "
নিশ্চয়ই তোকে খুব ভালবাসে?"
আরতির চোখে জল ভরে আছে। কিন্তু আর কাঁদছে না ও।
ন্যাড়ার দিকে সোজা তাকায়। সেই চোখ দেখে হঠাৎ কেমন
করে ওঠে ন্যাড়ার। বাইরের ঝোড়ো হাওয়াটা যেন ঘরের ভি
ঢোকার জন্য, সব সাজানো জীবন ছারখার করার জন্য ওত
আছে।
"কী রে আরতি? চুপ করে আছিস কেন, বল?"
"ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে ন্যাড়া! সাতদিনের জন্য ওর
গিয়েছিল ঘুমে। ২০ দিন পর ফিরে এল সঙ্গে বউ নিয়ে। বি
করতেই গিয়েছিল। আমাকে বলেছে কিছুই জানত না নাকি,
বাড়ির লোকেরা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি
জানি, ও ইচ্ছে করেই আমায় ঠকিয়েছে। দেড় বছরের সম্পর্ক
সব ভুলে গেল! আমার গ্র্যাজুয়েশনের পর বাবাকে বিয়ের ক
বলবে বলেছিল..." একনাগাড়ে বলে যায় আরতি। চোখের
পড়া জলের বিন্দু গড়িয়ে নেমে কখন শুকিয়ে গিয়েছে! ওর
তাকিয়ে দুঃখ হওয়া উচিত। কিন্তু ন্যাড়ার উলটো অনুভূতি
একটা অদ্ভুত আনন্দে মন ভরে যায়।
আরতিও নিজেকে সামলেছে কিছুটা। ওর বয়সে প্রথম প্রেমে
ধাক্কা খাওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকটাই তীব্র। এই ক'দিন একা-
একা সহ্য করেছে। বাড়ির এমন অবস্থা যে, একা বসে কাঁদে
উপায়টুকুও নেই। কলেজের বন্ধুদের বলা যায় না এই পরাজ
কথা। শুধু একজনকেই বলা যায়, আরতি জানে যে কখনও

"আর আমার পড়াশোনা হবে না রে। যখনই বই খুলছি, সুকান্তকে মনে পড়ছে। তার উপর বাড়ির এই অবস্থা। দিদিটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। মা দিনরাত দিদিকে যাচ্ছেতাই বলে যাচ্ছে। বাবার শরীর ভাল নেই..."
ন্যাড়া এসে দাঁড়ায় আরতির সামনে। ন্যাড়া হয়ে নয়, নবেন্দু হয়ে। আরতির হাত ধরে, "শোন আরতি, বাড়ির অবস্থা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। এখন তুই শুধু তোর পড়াশোনা নিয়ে ভাববি। আর সব আমার উপর ছেড়ে দে। মনে রাখিস, আমাদের দু'জনকেই খুব ভাল করে পাশ করতে হবে।"
"তোর উপর ছেড়ে দেব সব চিন্তা?" আরতি অবাক হয়ে তাকায়।
"বললাম তো। তুই শুধু পড়াশোনা করবি এখন। আর কিছু ভাববি না। বাড়ির কথা না, ওই সুকান্ত গিরির কথাও না। মনে কর কোনওদিন ওই নামের কাউকে চিনতিসই না। যে এভাবে ঠকিয়েছে তোকে, তার নাম কেন মনে রাখবি তুই? জীবন অনেক বড়। বহু কিছু করার আছে আমাদের। ভাঙলে চলবে না। তোকে আমি ভাঙতে দেব না। ওঠ..."
কথাগুলো চুপ করে শোনে আরতি। চুপ করে সামনে দাঁড়ানো ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকে ভরে নেয় ওর বলে যাওয়া প্রত্যেকটা কথা। এই ছেলেটাকে তো কোনওদিন চিনত না আরতি। আজ যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠেছে, এসে বসেছে এই ঘরে তখনও এই ছেলেটা ওর কাছে অচেনাই ছিল। এমন করে নির্ভর করা যায়, এমন গভীর আওয়াজে বুকের মধ্যে থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিতে পারে...এই ছেলেটাকে তো আজই প্রথম দেখল ও! এই ঘর, এই ছেলেটাই যেন ওর একমাত্র পথপ্রদর্শক।

১৫

আজ আকাশের মুখ ভার। সকালবেলার রং একটু অন্যরকম। যেন দুধের বালতিতে এঁটেল মাটির গোলা মিশিয়ে দিয়েছে কেউ। এই মাটিগোলা রংয়ের আকাশ থেকে উঁকি মারছে দু'-এক কুচি সাদা সাদা মেঘ। স্বাতী বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে দেখছিল আকাশের দিকে। বৃষ্টি হবে কী হবে না, এই হিসেব করছিল মনে-মনে। অথবা হয়তো নিজের জীবনের আকাশে ঘনিয়ে আসা কালো মেঘের ঠাসবুনট সরিয়ে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছিল এতটুকু আলো। সুবালা এসে পাশে দাঁড়ায়। ঠং করে বারান্দার উপর নামিয়ে রাখে একটা স্টিলের গ্লাস। সকাল থেকে এই নিয়ে তিনবার চা হল। আরতি যখন কলেজ গেল, তখন একবার। অমলবাবু যখন ঘুম থেকে উঠলেন, তখন একবার। চা খেয়ে এই দুর্বল শরীরে মানুষটা কোথায় গেলেন, কে জানে। স্বাতী বরাবরই সবচেয়ে বেলা করে ওঠে। এখন যেন ওর বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকাটা আরও বেড়েছে। সুবালা জানে, ও ইচ্ছে করে জেগে জেগে শুয়ে থাকে। এই নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রবণতার মধ্যে সুবালা আর কিছু দেখতে পায় না বা চায়ও না। শুধু স্বাতীর ঘরসংসারের কাজেকর্মে অনীহাটাই তার কাছে প্রবল হয়ে ওঠে। সে জন্য সোচ্চার রাগপ্রকাশ করতেও আটকায় না। রাগের কারণ তো আর একটা নয়। স্বাতীর প্রতিটি আচার আচরণেই রাগ হয় সুবালার। পেটের মেয়ে যে এমন শত্রু হতে পারে, তার কোনও ধারণাই ছিল আগে। কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে তত টের পাচ্ছে। এত বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা ইস্তক বারান্দায় বসে আছে তো আছেই। পিয়াটাকে একটু যত্ন-আত্তি পর্যন্ত করে না। গান, কবিতা শোনানো তো দূরস্থান। চা খাবেন, সেটাও হাতের গোড়ায় এনে ধরে দিতে হবে। রান্নাঘরে পা রাখলে যেন ক্ষয়ে যাবে মেয়ে। অসুস্থ বাবাটা

বাড়িতে বসে আছে! বাবার কাছে অনেক বিয়ে করা মেয়েই
অবস্থার বিপাকে পড়ে। কিন্তু তারা তো এমন অলস জীবন
না! কিন্তু এই মেয়ের যেন কিছুই আর করার নেই, জীবনটা
দাঁড়িয়ে পড়েছে সিগন্যাল না পাওয়া রেলগাড়ির মতো। অথ
ঠিক করে নেওয়ার সুযোগ ওকে দিয়েছিলেন ভগবান। করুণ
কত করে চাইল ওকে, সুবালা হাতে চাঁদ পেয়েছিল। কিন্তু স্ব
মুখ ফিরিয়েই থাকল। এত অপমানের পরেও করুণাময় আ
ছাড়েনি। প্রায় রোজই একবার করে মাসিমা ডাক দিয়ে এসে
দাঁড়ায়। স্বাতীর মন ঘুরল কি না, এই প্রশ্নটা বড় স্পষ্ট করে
থাকে ওর লাল-লাল হয়ে ওঠা গালে মুখে। কিন্তু স্বাতী পাত
দিলে তো!
যেন কিছুই বুঝতে পারছে না এমনই সহজ স্বাভাবিক ব্যবহ
ওর। কেমন আলগা-আলগা... এই ভাবভঙ্গিটাই সুবালাকে
বিরক্ত করে তুলেছে স্বাতীর প্রতি। তেমনি হয়েছে মেয়ের ব
তিনি যেন মেয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে তাঁর কাছে আছে, এটা তে
খুশি। অমলবাবুকে একবারের জন্য মেয়েটাকে সৎ পরামর্শ
দেখল না সুবালা। চায়ের গ্লাস নামিয়ে দিয়ে রান্নাঘরেই ফির
যাচ্ছিল সে। পিছন থেকে স্বাতীর ডাক শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে থে
যায়, "বলে ফেলো কী আদেশ? আমি তো আছিই পার্মানেন
চাকরানি তোমাদের!"
"মা চা জিনিসটা যে গরম খেতে হয়, এটা কি জানা নেই তে
এরকম জল-চা কী করে দিলে বলো তো?" আকাশ পর্যবে
থামিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে স্বাতী।
ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে মাথায় আগুন জ্বলে যায় সুবালা
এসে গ্লাসটা হাতে তুলে নেয়। হিসহিস করে বলে ওঠে, "য
যেমন যোগ্যতা মা। এটা যে পাচ্ছ, সেটাই অনেক।" কথাটা
ফেলে সুবালার নিজেরই একটু খচখচ করে উঠেছিল মনটা।
কী কথা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে? অবস্থা যত কঠিনই হোক
রাগই থাকুক ভিতরে, মেয়েকে খাওয়ার খোঁটা দেওয়ার ম
নীচে ও নামতে পারল কী করে? স্বর নরম করে আবার হয়
কিছু বলতেই যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সুবালাকে অবাক
জোরে হেসে ওঠে স্বাতী, "আচ্ছা মা, আজ আমি তোমার ঘ
পড়ে আছি বলে এমন ঠান্ডা চা দিচ্ছ? খোঁটাও দিলে! কিন্তু
শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন আসব, তখন এসব তোমার মনে থা
তো? নাকি তখন প্রাণের উপর দিয়ে ভালবাসা দেখাতে বস
মেয়ের কথায় একটু আগের অনুশোচনার রেশ মিলিয়ে যায়
সুবালার মন থেকে। তিক্ত হেসে বলে, "তুই শ্বশুরবাড়ি থে
আসবি? সেই দিনটা দেখার কপাল কি আর আমি করে এ
"দেখতে পাবে মা, খুব শিগগিরই পাবে। অনেক ভেবে দেখ
তোমার হাতের ঠান্ডা চা খাওয়ার চেয়ে করুণার মতো একট
নির্বোধকে বিয়ে করাও বেটার। অন্তত পিয়াটার একটা হিল্লে
হবে। আজই আমি যা বলার বলে দেব করুণাকে। এটাই তে
তুমি?" কঠিন মুখে বলে স্বাতী। আর পিয়ার কথা শুনে চোখে
আঁচল চাপা দিয়ে বসে পড়ে সুবালা। কান্নাবিকৃত গলায় বলে
যেতে থাকে, "বেইমান মেয়ে তুই। পিয়াকে বুকে ধরে রাখি
এত কষ্ট করে বড় করলাম। ওকে নিয়ে তুই এটা বলতে পার
"চুপ করো মা। দিনরাত তুমি ওর কাছে আমাকে নিচু করছ
আমি কি টের পাই না? আমার জীবনটা তোমার কাছে ইম্প
নয়। লোকে কী বলল, কী ভাবল সেটাই বড়। আমি ভেবেছি
গানের স্কুল করব একটা। কেটে যাবে মা মেয়ের জীবন। কি
তোমার মেন্টাল টর্চারের জন্য আমাকে এই বাড়ি ছেড়ে চলে
যেতে হবে এমন একটা লোকের কাছে, যাকে আমি কোনও

করুণাকে মেনে নিতে হবে আমাকে। তোমাকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবো না মা," শক্ত চোয়ালে একটা-একটা করে শব্দ ছুড়ে সুবালাকে মারতে থাকে স্বাতী।আর তার আঘাতে সুবালার মধ্যেকার ঢাকা পড়ে যাওয়া গোপনতম 'মা' রক্তাক্ত হয়। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে দৈনন্দিন ছাপোষা সুবালার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এক নতুন আশা। রাগ করেই হোক, অভিমান করেই হোক বা যেভাবেই হোক, স্বাতী মনস্থির তো করেছে! করুণাময়কে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। আর এই নিত্যদিনের অশান্তির আগুনে রোজ পুড়তে হবে না। চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় সুবালা। হাতে চায়ের গ্লাস।
"দাঁড়া, আমি তোর চা-টা গরম করে এনে দিই।" কথা ক'টা বলে বহুদিন পর মেয়ের মাথায় ছোঁওয়াতে যায় অনভ্যাসের হাত। আর



ন্যাড়ার কথার আচমকা ঢেউ এসে যেন নির্মম হাতে ঝাঁকিয়ে তুলে দিয়েছে ওকে, এমনভাবেই চমকে ওঠে আরতি। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে সরে যায় স্বাতী, "ছোঁবে না মা তুমি আমাকে। তোমার মনের মতো এই হাতটাও ময়লা।"
পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল সুবালা। স্বাতী অনেকক্ষণ ঘরে চলে গেছে। সশব্দে বন্ধ করে দিয়েছে পলকা কাঠের দরজা। সুবালা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়ের বলে যাওয়া কথার আঘাতে যে নতুন করে আবার কাঁদবে, সেই অনুভবটাও যেন আসতে চায় না আর। সত্যিই কি সুবালা এত খারাপ মা? তার পেটের মেয়ে তাকে এতটাই নিচু চোখে দেখে? সে কি কোনওদিন কোনও ভাল কিছু করেনি স্বাতীর জন্য? আজ যে এতখানি চিন্তা নিয়ে তাকে দিনরাত অভিনয় করতে হচ্ছে, সেসব কার জন্য? শুধুমাত্র নিজেদের সামাজিক অবস্থা ভেবে? স্বাতীর ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা নেই তাতে? পিয়ার ভাবনা নেই? আগে যখন একের পর এক ভুল করে গেছে স্বাতী, পই-পই করে বারণ করেনি সুবালা?

মতো করে চেষ্টা করে গিয়েছে মেয়ের যাতে ক্ষতি না হয়, যে যাতে ভাল থাকে। আর মেয়ে চিরদিন তাকে শত্রু ভেবে গে করুণাময় ঢুকছিল টিনের গেট সরিয়ে। একজন সমব্যথী পে মনে করে, মনের দু'টো কথা বলবে মনে করে সুবালা দু' পা এগিয়ে গিয়ে ডাকে, "এসো বাবা, বোসো। আজ এত সকা যে... চা আনি একটু দাঁড়াও।"
সুবালার মতে, করুণাময় হল এই জগতের সবচেয়ে সুখী মা সে ধরেই নিয়েছে, করুণাময় নিজে যেহেতু সদাপ্রফুল্ল থাকে স্বাতীকেও সে সহজেই সুখী করতে পারবে। স্বাতী সেই সাধ পায়ে ঠেলছে বলেই না মেয়ের উপর সুবালার এত রাগ! সুব একটু আগের স্তম্ভিতভাব কাটিয়ে তড়িঘড়ি রান্নাঘরে এসে চ জল চাপিয়েছে। পুরনো হয়ে আসা মিটশেফের ভিতর থেকে করেছে কবেকার কেনা, অপেক্ষাকৃত ভাল জাতের কাপ প্লে সেট। ছাঁকনিতে চা ছাঁকতে গিয়ে হঠাতই মনে হয় সুবালার, তো করুণাময়ের হাতে ব্যাগ বা প্যাকেট দেখল না! ছেলেটা এবাড়িতে আসে, সঙ্গে করে নিয়ে আসে বড়-বড় সাইজের তাতে থাকে নিত্যনতুন খাবারের জিনিস, মিষ্টি, ফলপাকুর, তোয়ালে, বিস্কুট...
কাউকে মুখে বলা যায় না যদিও, কিন্তু মনের অগোচরে পা নেই। নিজের কাছে লুকোনোরও নেই, এই জন্যই আরও যে আপন মনে হয় ছেলেটাকে। আর এখন তো করুণা কখন অ সেই আশাতেই থাকে সুবালা। এই ছেলেটার হাত ধরে তবু ভাল জিনিসপত্রের দেখা পাওয়া যায়। নইলে এবাড়ির যা অ চিরকাল এদিকের ফুটো ঢাকতে ওদিক ছিঁড়ে যায়।
চা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সুবালা, "ওমা, এ কী বাবা? এখনও সেই দাঁড়িয়েই আছ? দেখেছ মেয়েটার কাণ্ড! ঘর থে চেয়ারটা বের পর্যন্ত করে দেয়নি!"
স্বাতীর একটু আগের বলা কথাগুলো, জমে ওঠা তীব্র বিদ্বে সব ভুলে গিয়ে জোরে-জোরে মেয়ের নাম ধরে ডাকাডাকি থাকে সুবালা। যেমন সশব্দে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দরজাটা, যে কেঁদে কঁকিয়ে খুলে যায়। স্বাতী বেরিয়ে আসে। চোখেমুখে বি "কী হল? আবার ঠান্ডা চা নিয়ে কথা শোনাতে ডাকছ বুঝি লাগবে না আমার কিছু..."
সুবালা গলা খাদে নামায়, "আঃ, আবার শুরু করিস না। চে দে, করুণা এসেছে। সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা।"
মায়ের কথা শুনে উঠোনের দিকে তাকায় স্বাতী। তাকায় আ হেসে ওঠে জোরে শব্দ করে, "ও তাই বলো, করুণা এসে গিয়েছে? গুড, ওর হাজিরার টাইমটাও ক্রমশ এগিয়ে আসত দেখছি। যাই হোক, এই তুচ্ছ একটা মানুষের জন্য কম কষ্ট ক না ছেলেটা। আজই ওর সব কষ্টের অবসান করে দিচ্ছি!"
মেয়ের কথার ভঙ্গিতে ভয় পায় সুবালা। এই মেয়েকে কোন বিশ্বাস নেই। এত কিছুর পরেও অহংকারে মট-মট করছে। তবু মচকাবে না। দু'পা সামনে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে, "ও কী হচ্ছে? অমন পাগলের মতো হাসছিস কেন? কী ভা ছেলেটা? এমনিতেই নরম মনের, তার উপর আজ যেন কেম একটু হয়ে রয়েছে। দেখ না আজ প্রথম ও খালি হাতে এল। স্বাতী চুপ করে গিয়ে মায়ের কথা শুনছিল। শেষের কথাটা একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে ওর ঠোঁটের কোণে। কী মেশা আছে সেই হাসিতে, ঘৃণা? ঠিক স্পষ্ট হয় না। শুধু এইটুকু বু পারে সুবালা, এত কথা ওকে বলা উচিত হয়নি। কোনটার করবে, বোঝা দায়। নিজের বলে ফেলা কথা ধামাচাপা দেও জন্য বলে ওঠে, "আয় আয়, কী বলবি বলছিলি ওকে?"

জানাতে হবে তাই না? হ্যাঁ আসছি। ... বাড়ি পাঠিয়েছ তো। ও ফেরার পর বললে হত না? বেশ মা মেয়ে দু'জনে একসঙ্গে দাঁড়াতাম করুণার সামনে! একসঙ্গে ও দু'জনের দায়িত্ব নিত, দেখতেও ভাল লাগত!"

সুবালা ঠিক বুঝতে পারে না স্বাতীর কথাগুলো। শুনতে তো ঠিকঠাকই লাগছে। ভাল-ভাল কথা বলছে। কিন্তু কী যেন একটা লেগে রয়েছে শব্দগুলোর গায়ে! কিন্তু না, এসব আর ভাবতে চায় না সুবালা। স্বাতী বারান্দা ধরে উঠোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়তো ওরা এখন কথা বলবে। হয়তো স্বাতী এখনই করুণাময়কে জানাবে যে, সে রাজি আছে তাকে বিয়ে করতে। ঠিক এইসময়টায় কি ওদের ধারেকাছে থাকাটা শোভন হবে? না থাকাই উচিত। কিন্তু মেয়ের যা রকমসকম, তাকে ভরসা করাও যায় না। নানা কথা ভাবছিল সুবালা। স্বাতী করুণার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সবে। করুণাময় স্বাতীকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসে সুবালার দিকে। আর এতক্ষণে নজরে পড়ে সুবালার, করুণাময় আজকে বাজারের ব্যাগটা না আনলেও রোজকার মতো কাঁধের ঝোলাটা এনেছে ঠিকই। আর এই মুহূর্তে সুবালার সামনে দাঁড়িয়ে সেই কাপড়ের ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে সমানে কিছু খুঁজে যাচ্ছে। কিন্তু পাচ্ছে না।

"কী হল বাবা, কিছু খুঁজছ?" সুবালা বলে।

"হ্যাঁ মানে না... ওই আর কী... মানে এইখানেই তো ছিল... ব্যাগের ভিতর.."

"না করুণা, ব্যাগের ভিতর রাখনি। বড্ড ছটফট করছিলে, কখন বের করে হাত থেকে মাটিতে ফেলে দিয়েছ," স্বাতী কাছে এগিয়ে এসেছে। হাতে একখানা বড়সড় সোনালি খাম, তাতে সিঁদুরের টিপ লাগানো। হাসে স্বাতী করুণাময়ের দিকে তাকিয়ে, "এইটাই খুঁজছ তো তখন থেকে?"

কাঁপা-কাঁপা হাতে খামটা নিয়ে সুবালার দিকে এগিয়ে দেয় করুণাময়। দিয়ে অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সুবালা হাতে ছোঁয় না খামটা। তার মন আবার কু গাইছে। তীক্ষ্ণ গলায় বলে, "এটা কী করুণাময়?"

আবার হাসে স্বাতী। ছোট পাহাড়ি নদীর মতো কুলকুল করে বয়ে যাওয়া হাসি। সকালবেলার রোদ লেগে সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ে উঠোনের ধারে ঝুঁকে আসা আমগাছটার নিচু ডালটায়, "আহা অমন করছ কেন মা? করুণা তোমাকে দিচ্ছে একটা জিনিস, হাতে নিয়ে দেখবে তো? আগেই অত প্রশ্ন করছ কেন বেচারিকে? দেখছ না কেমন নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে..."

"না মাসিমা... মানে মা এটা আপনার হাতেই দিতে বলেছেন," ওকে ডিফেন্ড করার জন্য স্বাতী পাশে আছে জেনে কিছুটা নিশ্চিন্ত গলায় বলে করুণাময়। ওর হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে চোখ বোলায় সুবালা। বিড়-বিড় করে পড়ে ফেলে কী লেখা ভিতরে। পড়ে আঁতকে ওঠে, "এ কী, এ তো বিয়ের কার্ড! তুমি বিয়ে করছ করুণাময়? কাকে বিয়ে করছ? না-না এটা কী করে সম্ভব?"

করুণাময় ধরা পড়া আসামির মতো মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা চুলকোয়, মাটিতে পা ঘষে। তারপর বলে ওঠে, "না, মানে মা বললেন... আমি তো স্বাতীকেই... কিন্তু ও তো... মা নিজেই সব ঠিক করে ফেলে জানালেন! জানেন তো আমার মাকে," কতগুলো শব্দ এদিক-ওদিক নাড়িয়ে গুছিয়ে বলে যায় করুণাময়। আপ্রাণ চেষ্টা করে বোঝানোর যে, কতটা অসহায়তার মধ্যে ও মায়ের পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। দিনের পর দিন যে স্বাতী ওর প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি, সেই অভিযোগটাও প্রচ্ছন্নভাবে উঁকি মারে ওর এলোমেলো শব্দগুলোর মধ্যে থেকে। সুবালা কিছু বোঝে কি না, বোঝা যায় না। কিন্তু স্বাতী হেসে ওঠে জোরে-জোরে। সুবালা ভীষণ বিরক্ত হয়ে তাকায় করুণাময়ের

করেছিলাম..." চোখে আঁচল চাপা দেয় সুবালা। আর সে... তাকিয়ে আবার জোরে হেসে ওঠে স্বাতী। হাসির দমকে দু... শরীর। স্বাতীর ক্রমাগত হাসি শুনে অবাক চোখে তাকিয়ে ... করুণাময়। কেন যে স্বাতী এমন হাসছে, তা বোধগম্য হয় ... সত্যি বলতে কী, ওর একটু ভয়ই ছিল। ব্যাপারটা কীভাবে ... স্বাতী? যদিও কোনওদিন ওর কাছ থেকে কোন সদর্থক কি... পায়নি করুণাময়, তবু দীর্ঘদিন মনে-মনে একটা আশাই পো... করে এসেছে সে। স্বাতীকে ভালওবেসেছে নিজের মতো ক... কিন্তু মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাটা বলার সাহস ওর হ... তাছাড়া দাদা-বউদি যখন পুরো ঘটনা শুনে একে-একে বি... যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিল যে স্বাতী ওকে ভালবাসে না, ... আর মায়ের কথায় রাজি না হয়ে পারেনি করুণাময়। তবু ও... মনে-মনে চিন্তা ছিলই স্বাতী কীভাবে রিয়্যাক্ট করবে, তাই ... যদি রাগ করত বা কান্নাকাটি করত, সেগুলো নিজের মতো... সামলে নিতে পারত করুণাময়। কিন্তু এই আকাশ ফাটানো... এর অর্থ কী? ওর কি সত্যিই খুব আনন্দ হয়েছে? না কি ও... হয়ে গেছে? করুণাময় বিভ্রান্তবোধ করে। খুব আস্তে-আস্তে... গলায় প্রশ্ন করে, "তুমি হাসছ কেন এত?"

অমলবাবু বাড়ি ফিরেছেন। এসে দাঁড়িয়েছেন এদের সবার ... কেউ খেয়াল করেনি। উনি এক নজরে পুরোটা দেখে নিয়ে... বুঝে নিয়েছেন যা বোঝার। করুণাময়ের কাঁধে হাত রেখে ব... "স্বাতী কেন হাসছে, সেটা তুমি কোনওদিন বুঝবে না করুণ..." তারপর মেয়ের দিকে ফেরেন। স্বাতীর গায়ের রং ফর্সা নয়... কিন্তু রোদ পড়লে বা উত্তেজিত হলে ওর চাপা-চাপা শ্যাম... রংয়ের উপর একটা লালচে আভা এসে কেমন তামাটে ক... দেয়। অমলবাবু মুগ্ধচোখে মেয়ের সেই তামাটে হয়ে ওঠা মু... দেখছিলেন। তারপর মেয়ের হাতটা ধরে ঘরের দিকে পা ব...

"ঘরে আয় মা, খুব জরুরি কথা আছে।"

১৬

খাটের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছিল স্বাতী। চুলগুলো সব ক... থেকে পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে বিছানার উপর। যেন স্কুলপ... ছেলের দল দৌড়ঝাঁপের পর ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছে বাড়ি... কান্নার দমকে-দমকে কেঁপে উঠছে স্বাতীর পিঠ কোমর। অ... পাশেই বসেছিলেন। মেয়ের মাথায় পিঠে সান্ত্বনার হাত বো... "ওঠ মা, এভাবে কাঁদলে চলে? এখন অনেক কাজ তোর!" স্বাতী ওঠে না। বাবার কোলে মুখ গুঁজে দেয়। নিজেকে নি... করে। নিরুচ্চার উত্তরহীন সব প্রশ্ন।

'কেন কাঁদছি আমি? এই কান্না যন্ত্রণার নাকি আনন্দের? এ... মুক্তির? নাকি এই কান্না সব হারিয়েও সব ফিরে পাওয়ার ... সুখ? বিছানার মাঝখানে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে আর ... বিয়ের কার্ড। অমলবাবুকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে চেনা পিও... ধরিয়ে দিয়েছে বাড়ি অবধি আসার পরিশ্রমটুকু বাঁচিয়ে। এ... দিনে একই বাড়িতে একসঙ্গে দু'খানা বিয়ের কার্ড আসাটা ... আশ্চর্য সমাপতন বই কী!

কার্ডের খোলা পাতায় লেখাটা জ্বলজ্বল করছে এই মেঘলা, ছায়াঢাকা, লাইট না জ্বালানো ঘরের মধ্যেও। রঞ্জনার বিয়ে... এক অনিমেষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হচ্ছে। অমলবাবুকে সপ... আমন্ত্রণ জানিয়েছে কন্যাকর্তা প্রেমাংশু মুখোপাধ্যায়।

অলংকরণ: সমরজিৎ রজক



বোল্ড লিপস্টিক



ঐশ্বর্যর সঙ্গে আড্রিয়ান জেকবস



মেক-আপে লেটেস্ট ট্রেন্ড

নিয়ন আইশ্যাডো, লিপ ইনজেকশন বা টেক্সচারড হেয়ার আপড়ু...মেক-আপের দুনিয়া শাসন করছে কারা? দেশের তিন নামী সেলেব্রিটি মেক-আপ শিল্পীর থেকে শুনলেন মধুরিমা সিংহ রায়।

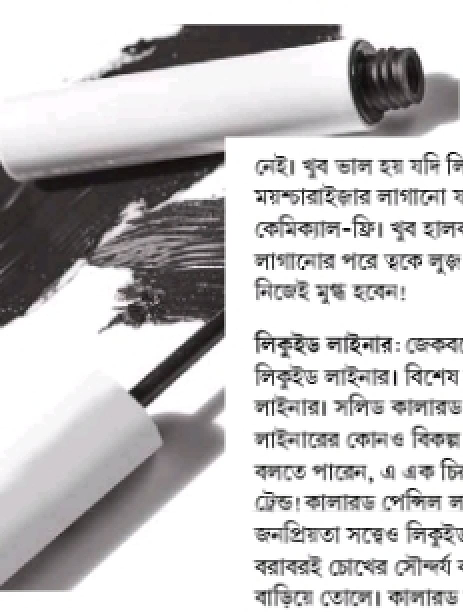
ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মেক-আপ আর্টিস্ট ইনিই। আড্রিয়ান জেকবস। সেলেব থেকে মডেল, সকলেই সেজে উঠেছেন তাঁর হাতের জাদুতে। তিনিই এবার তালিকা তৈরি করলেন লেটেস্ট ট্রেন্ডের।

পপ শেড লিপস্টিক: বর্ষার মরশুমে তো বটেই, সারা বছরই আপনার মেক-আপ কিটে রাখুন পপ শেডেড লিপস্টিক। পার্টিতে গ্লসি লুক চাইলে পপ শেড লাগাতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে আরও ভাল অপশন হল লিকুইড-বেসড টিন্ট। এধরনের বেশিরভাগ টিন্টেই হালকা শিমার থাকে। ঠোঁট চ্যাটচ্যাটেও করে না। আবার ঠোঁটে গ্লসি এফেক্টও আসে সহজেই। পার্টি লুকের জন্য আদর্শ।

লিপ ইনজেকশন: সত্যিকারের ইনজেকশন ভেবে ভয় পেয়ে যাবেন না যেন! এ একধরনের প্লাম্পিং লিপ গ্লস। ঠোঁটে লাগালে ন্যাচারাল পাউট এফেক্ট আসতে বাধ্য! আবার একইসঙ্গে গ্লসি লিপসও পেয়ে যাবেন। লিপ ইনজেকশনের পর লিপ লাইনার লাগিয়ে নিন। আর শেষে লিপস্টিক লাগিয়ে নিলেই আপনি পার্টি-রেডি।

কালারড লাইনার ও কালারড মাসকারা: রঙিন আইলাইনার এখন দারুণ জনপ্রিয়। আর সঙ্গে রঙিন মাস্কারা এই মরশুমের সেরা নতুন ট্রেন্ড বলতে পারেন। জেকবস নিজেও মেক-আপের সময় ব্লু মাস্কারা ব্যবহার করেন। আপনি চাইলে ব্ল্যাক মাস্কারাও ব্যবহার করতে পারেন। আবার নীল বা কালো ছাড়া অন্য রঙের মাস্কারাও লাগাতে পারেন। যদিও পুরোটাই আপনার পছন্দ আর অকেশনের উপর নির্ভর করবে।

লিকুইড ফাউন্ডেশন: মেক-আপের ক্ষেত্রে লিকুইড ফাউন্ডেশন সবসময়ই ভাল অপশন। এটা মোটেও কোনও নতুন ট্রেন্ড নয়। তবে, এই ট্রেন্ডের কোনও বিকল্পও



নেই। খুব ভাল হয় যদি লিকুইড ফাউন্ডেশনের সঙ্গে অ্যান্টিসেপটিক ময়শ্চারাইজ়ার লাগানো যায়। এধরনের ময়শ্চারাইজ়ার এমনিতেই কেমিক্যাল-ফ্রি। খুব হালকাও। ময়শ্চারাইজ়ার ও ফাউন্ডেশন লাগানোর পরে ত্বকে লুজ় পাউডার লাগান। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য দেখে নিজেই মুগ্ধ হবেন!

লিকুইড লাইনার: জেকবসের ব্যক্তিগত পছন্দ লিকুইড লাইনার। বিশেষ করে রঙিন লাইনার। সলিড কালারড লিকুইড লাইনারের কোনও বিকল্প নেই। বলতে পারেন, এ এক চিরন্তন ট্রেন্ড! কালারড পেন্সিল লাইনারের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও লিকুইড লাইনার বরাবরই চোখের সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। কালারড লাইনার, অল্প লিকুইড ফাউন্ডেশন আর লিপ ইনজেকশন...এটুকুই যথেষ্ট। সঙ্গে হালকা গোলাপি লিকুইড ব্লাশ। যে কোনও অকেশনের জন্য আর কী ই বা চাই!



লিকুইড লাইনার



প্লাম্পড আপ লিপস

মেক-আপ দুনিয়ায় এখন রঙের ফোয়ারা। নিয়ন রঙা আইশ্যাডো বা গাঢ় বোল্ড রঙের লিপস্টিক। আজকের প্রজন্ম বেছে নিচ্ছে রঙিন সাজসামগ্রী। উজ্জ্বল রঙের পোশাকের সঙ্গেও দিব্যি মানিয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল লিপস্টিক। আর কালারড আই লাইনারও বরাবরের মতো দারুণ জনপ্রিয়।





রঙিন আই মেক-আপ

টেক্সচারড হেয়ারডু বা ভার্সেটাইল পনিটেল। বোল্ড রঙের লিপস্টিক বা রঙিন আইশ্যাডো। মেক-আপে কোন কোন বিষয় এখন জনপ্রিয়? জানাচ্ছেন সেলেব্রিটি মেক-আপ আর্টিস্ট আরতি নায়ার।

রঙিন আই মেক-আপ: চোখের মেক-আপের ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার আগের তুলনায় অনেকটাই এখন বেশি। তা সে রোজকার সাজের জন্যই হোক বা পার্টি মেক-আপ, আইশ্যাডো থেকে আইলাইনার সবেতেই রাখতে পারেন রং। নানা রঙের আইশ্যাডোতে আজকাল অনেকেই স্বচ্ছন্দ। তবে উৎসবের কথা মাথায় রাখলে, সাধারণত সকলেই একটু সাবেকি মেক-আপ করতে চান। টানা কাজল, গাঢ় আই লাইনার...এটুকুই উৎসবের চেনা মেক-আপ। তবে এখন ডার্ক স্মোকি আইজ়ের বদলে সফট স্মোকি আইজ়ের দিকেই ঝুঁকছেন অনেকে। হেভি আইল্যাশও পরছেন অনেকে। কালো কাজলের বদলে অনেকেই আজকাল ব্রাউন, ডার্ক ব্লু, ডার্ক গ্রিন রং ব্যবহার করছেন।



উজ্জ্বল লিপস্টিক: ঠোঁটে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও আজকাল অনেকেই বেশ সাহসী। ব্রাইট লিপস্টিক এখন ফ্যাশনে ভীষণভাবে ইন থিং! সেদিক থেকে মহিলারা আজকাল পরীক্ষামূলক রংও দিব্যি লাগাচ্ছেন। আগে অনেকেই হেভি আই মেক-আপের সঙ্গে নুড লিপস রাখতে পছন্দ করতেন। কিন্তু এখন ঠোঁটের



সফট স্মোকি আইজ়



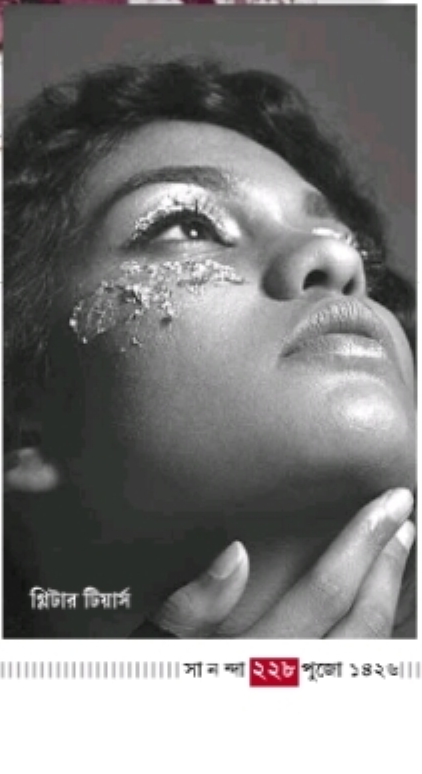
সোনমকে মেক-আপ করাচ্ছেন আরতি নায়ার





জন্য অনেকেই স্বচ্ছন্দে বোল্ড কালারস বেছে নিচ্ছেন।

টেক্সচারড আপডু: চুলের ক্ষেত্রে নিট লো বান বরাবরই জনপ্রিয় হেয়ার ট্রেন্ড। কিন্তু এখন অনেকেই টেক্সচারড আপডু-এর দিকে ঝুঁকছেন। কার্লিং আয়রনের সাহায্যে চুল কার্ল করে নিন। কার্লড চুলের উপরিভাগ থেকে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে নীচের দিকে পনিটেল বাঁধুন। আপডু-এর বেস এটাই। এবার চুল র‍্যাপড লুজ় বান-এ বেঁধে নিন। পরিপাটি লুক নয়, বরং একটু মেসি লুক-ই এখন পছন্দের তালিকায় শীর্ষে। ট্র্যাডিশনাল কোনও অকেশনেও আজকাল এরকম চুল বাঁধাই পছন্দ করছেন সকলে। পুজোর মরশুমেও এই ট্রেন্ড বেশ ইন!



গ্লিটার টিয়ার্স

পনিটেল: পনিটেল সত্যিই চিরন্তন। তবে পনিটেল নানারকমের হতে পারে। পনিটেল নিয়ে রীতিমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে পারেন। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এমনিতেই লোকজন মেক-আপ বা ফ্যাশন সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। বেয়ন্সে বা জেনিফার লোপেজ়ের পনিটেল স্টাইলও আজকাল ভীষণ জনপ্রিয়।

বেছে নিন পার্পল রংকে: নিয়ন নীল, হলুদ আর গোলাপি—এই তিনটে এখন ফ্যাশন থেকে মেক-আপ, সবেতেই চলছে। আর একটি রং এখন দারুণ জনপ্রিয়—পার্পল। সেলেবরা তো প্রায়ই এরকম বোল্ড লিপস্টিকে সেজে ওঠেন। আর তাঁদের ফলো করছেন সাধারণ ফ্যাশন-সচেতন মানুষও! ভারতীয়দের স্কিনটোনের সঙ্গেও দিব্যি মানানসই এই রং।

গ্লিটারড আইজ়: গ্লিটার হল আরও এক ট্রেন্ড যা মেক-আপ ও ফ্যাশন দুনিয়ায় রীতিমতো

দীর্ঘস্থায়ী। গ্লিটারড আইজ় যে কোনও পার্টিতে প্রথম পছন্দ। সঙ্গে গ্লিটার টিয়ার্সও বেশ জনপ্রিয়। চোখে শিমারড লুক তৈরি করার জন্য ফেস্টিভ সিজ়ন থেকে পার্টি, সব জায়গাতেই এর চাহিদা!

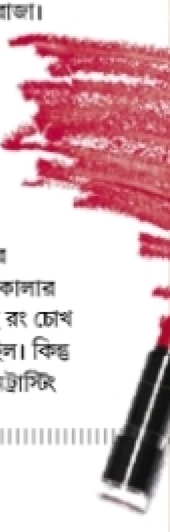
জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ় থেকে অনুষ্কা শর্মা। বলিউডের তাবড় তাবড় সেলেব ***শান মুত্তাথিলের*** *শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ! এ মরশুমের সেরা ট্রেন্ডের হদিশ দিলেন তিনি।*

হাফ উইংগড আইলাইনার: এ মরশুমের সবচেয়ে বড় ট্রেন্ড বোধহয় এটাই। এতকাল আমরা উইংগড আইলাইনারের জনপ্রিয়তা দেখে এসেছি। সাতের দশকের সব জনপ্রিয় নায়িকারাই মোটামুটি এই ট্রেন্ড ফলো করতেন। কিন্তু এখন ভিন্টেজ এই ট্রেন্ডের জায়গা নিয়েছে হাফ-উইংগড আইলাইনার।

ডিফাইনড লিপ লাইনার: নব্বইয়ের দশকে এটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। মাঝে সেভাবে চোখে না পড়লেও, এখন রীতিমতো চোখে পড়ছে এই ট্রেন্ড। এতদিন ধরে আমরা একই রঙের লিপস্টিক ও লিপ লাইনার ব্যাবহার করতাম। অর্থাৎ, আপনি যদি ঠোঁটে লাল লিপস্টিক লাগান, তাহলে লিপ লাইনারও ওই একই রঙের লাগাতেন। লিপ লাইনার মূলত লিপস্টিক আউটলাইন করার কাজেই ব্যবহৃত হত। কিন্তু এখন লিপস্টিক ও লিপ লাইনার আলাদা রঙের হলেও অসুবিধে নেই! ধরুন, আপনি লাল লিপস্টিক লাগালেন, সঙ্গে পার্পল লিপ লাইনার লাগাতেই পারেন। বা নুড লিপস্টিকের সঙ্গে কোনও ডার্ক লিপ লাইনারও দিব্যি মানিয়ে যায়।

নিয়ন আইশ্যাডো: এমনিতেই ফ্যাশনে এখন নিয়ন-ফিভার চলছে। মেক-আপ দুনিয়াই বা পিছিয়ে থাকে কী করে! আইশ্যাডো থেকে লিপ কালার, সবেতেই প্রাধান্য পাচ্ছে নিয়ন রং। উজ্জ্বল নিয়ন সবুজ, নীল, কমলা বা গোলাপি... মেক-আপে এখন এরাই রাজা।

আইশ্যাডো ও লিপস্টিক একই রঙের: হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। চোখে যে রং, ঠোঁটেও সে রংই প্রাধান্য পাচ্ছে। ফ্যাশনের মতোই মেক-আপ দুনিয়াতেও এখন মোনোক্রোম-ফিভার চলছে। আগে পোশাকের কালার প্যালেটের সঙ্গে মানানসই রং চোখ ও ঠোঁটে লাগানোর চল ছিল। কিন্তু এখন পোশাকের সঙ্গে কনট্রাস্টিং





শার্প নোজ কন্টুরিং



নিয়ন আইশ্যাডো



❛লিপ লাইনার এবং লিপস্টিকের রং একই হতে হবে! কে বলেছে? লাল লিপস্টিকের সঙ্গে অন্য রঙের লিপ লাইনার চলতেই পারে। ডিফাইনড লিপ লাইনার আজকাল বেশ পছন্দের। সঙ্গে গাঢ় ব্লাশ-অনও দিব্যি চাইছেন মানুষ।❜



কালার চোখ ও ঠোঁটে লাগাচ্ছেন ফ্যাশন-প্রেমীরা। চোখে কোনও সলিড রঙের শ্যাডোর সঙ্গে একই শেডের লিপস্টিক এখন মেক-আপ ট্রেন্ড হিসেবে রীতিমতো 'ভাইরাল'!

ফ্লাশড চিক: আগে হালকা ব্লাশ-অন লাগানোর ট্রেন্ড ছিল। সাধারণত সাইড চিকবোনে হালকা রংয়ের ব্লাশ-অন লাগাতেন সকলে। কিন্তু এখন চিকবোনের উপরিভাগে ব্লাশ-অন লাগানোটাই ট্রেন্ড। আর অ্যাপল অফ দ্য চিকস-এও লাগাতে পারেন। তবে সবক্ষেত্রেই এখন আর হালকা রং নয়, ফ্যাশন-সচেতন মানুষরা বেছে নিচ্ছেন গাঢ় ব্লাশ-অন।

শার্প নোজ় কন্টুরিং: সাধারণ নোজ় কন্টুরিংয়ের চেয়ে এই পদ্ধতি একটু আলাদা। শার্প কন্টুরিংয়ের ক্ষেত্রে ব্লেন্ডিংয়ের পর নাক চোখা দেখায়। একইসঙ্গে নাকের ডগাও হাইলাইট করা হয়।

পুজোর মরশুমে সেলেব মেক-আপ আর্টিস্টদের থেকে এই মহার্ঘ টিপসগুলো নিশ্চয়ই কাজে লাগবে! তাহলে সেজে উঠতে দেরি কোথায়!



ডায়ানা পেন্টির সঙ্গে শান মুত্তাথিল



মোনোক্রোম মেক-আপ

নাচের ছন্দে সুস্থ শরীর

ভরতনাট্যম, কত্থক থেকে হিপ হপ, সালসা; শরীরকে ফিট রাখতে নাচ একেবারে আদর্শ। জিম-মর্নিং ওয়ক ছেড়ে আনন্দের সঙ্গে হবে শরীরচর্চা। ওয়র্কআউট হিসেবে নাচের উপকারিতা খুঁজে আনলেন রূপকিনী সেনগুপ্ত।



নৃত্যশিল্পীদের একটি প্রিয় লাইন রয়েছে; 'হোয়াই ওয়ক হোয়েন ইউ ক্যান ডান্স?' অর্থাৎ, নাচের মতো এমন সুন্দর ওয়র্কআউট পদ্ধতি থাকতে সেটাকে বেছে নেবেন না, তা হয়? আসলে ফিট থাকার ইচ্ছেটা কিন্তু রয়েছে আমাদের সকলেরই! জিম, মর্নিং ওয়ক, চেষ্টাও করে দেখলেন অনেক কিছুই। ফল? কিছুদিন পর থেকেই একঘেয়েমির ফাঁসে আটকে এক্সারসাইজ়কে বিদায় জানিয়ে পুরনো রুটিনে ফেরা। অথচ এই ওয়র্কআউট ব্যাপারটা যদি হত অনেকটা আনন্দের? গানের তালে, বাজনার ছন্দে, 'নৃত্যের তালে তালে'ই যদি হয়ে যেত এক্সারসাইজ়? নাচের এই দিকটাই তুলে ধরা যাক আজ।

যে কোনও ডান্স ফর্মই এক্সারসাইজ় হিসেবে অত্যন্ত ভাল। আমাদের দেশের ওডিসি, ভরতনাট্যম, কত্থক হোক বা জুম্বা, হিপ-হপ, সালসা, ফিটনেসের ক্ষেত্রে সবেরই গুরুত্ব যথেষ্ট।

কীভাবে ফিট রাখে নাচ?

নাচের মুভমেন্ট যতটা নিয়ন্ত্রিত ততটাই মসৃণ। ফলে শরীরের শক্তি, ভারসাম্য ও দ্রুততা বাড়াতে সাহায্য করে নাচ। ফিটনেস ও নমনীয়তা বাড়ে, সঙ্গে শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়। শরীরকে একটা যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শেখায় নাচ; আপনি যেভাবে চাইবেন, শরীরের মুভমেন্ট হবে সেভাবেই। দিনের অন্তত কয়েক ঘণ্টা সময় দিতে হবে নাচ প্র্যাক্টিসের জন্য। এর ফলে বাড়ে সহ্যশক্তি, এ রোবিক হেলথ ও স্ট্যামিনা। নাচে প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম হয়, তাই ঘামও হয় খুব। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই মেদ ঝরে ও শরীর টোনড হতে শুরু করে। নাচ শিখতে শুরু করার সত্যিই কোনও বয়স নেই। একেবারে ছোটবেলা থেকে নাচ শেখা শুরু করেননি বলে বেশি বয়সে এসে



ব্যালে নাচ



ওডিসি নাচের মুহূর্ত

কিছু ডান্স ফর্মের উপকারিতা:

ভরতনাট্যম:
যতটা গ্রেসফুল এর স্টেপগুলি, ততটাই কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন পরে এই নাচে। টানা দু'ঘণ্টার ভারতনাট্যম সেশন কার্ডিয়ো এক্সারসাইজ় হিসেবে আদর্শ। যেহেতু এই নাচের প্রতিটি পশ্চারে শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখতে হয়, ফলে জোর বাড়ে শরীরের নীচের অংশের। থাই ও কাফ মাসল শক্তিশালী ও টোনড হয়, উন্নত হয় রক্ত সঞ্চালন। এটি এক ধরনের 'কনট্যাক্ট এক্সারসাইজ়', ফলে বাড়ে বোন ডেনসিটি।

কত্থক:
সবচেয়ে ফিজ়িক্যালি ডিমান্ডিং ক্লাসিকাল নাচ একে বলা যায়। এর ফিটনেস কোশেন্ট এতটাই বেশি, যে 'কত্থক যোগা' নামক আলাদা একটি ফিটনেস ট্রেন্ডও আছে। কঠোর শারীরিক পরিশ্রম তো হয়েই, সঙ্গে পায়ে ভারী ঘুঙুর বেঁধে নাচার ফলে ওয়েট ট্রেনিং এক্সারসাইজ় হয়। ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন এই নাচে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এক্সারসাইজ় হয় মুখের পেশিরও।



আর শেখা যাবে না, তার কিন্তু কোনও মানে নেই। ধৈর্য্য ধরলে, নাচ ধীরে ধীরে আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করে তুলবেই। প্রথম প্রথম এক-একটা পোজ় ধরে রাখা বেশ কষ্টকর হতে পারে। আসলে, অন্য যে কোনও ওয়র্কআউটের মতো নাচও শরীরের উপর স্ট্রেন তৈরি করে। তাহলে চাপ সহ্য করে সঠিক ব্যালান্স ও পোজ় ধরে রাখার রহস্য কী? নৃত্যশিল্পীদের মতে, শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণই এর সমাধান। যোগাসনের মতো নাচও নিয়ন্ত্রিতভাবে নিঃশ্বাস নেওয়ার অভ্যেস করায়। নাচ শরীরকে এমনভাবে তৈরি করে, যে বেশি ওজন নিলে বা পরিশ্রম করলেও আঘাত লাগার সম্ভাবনা কমে যায় অনেকটাই। কোর মাসলের জোর বাড়াতে জন্য নাচের সঙ্গে সঙ্গে যোগাসন বা অল্প ওয়েট নিয়ে এক্সারসাইজ়ও করতে পারেন।

অন্যরকম উপকারিতা

ফিট রাখার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যও উন্নত করে নাচ। মন শান্ত ও ভাবনাচিন্তা পরিষ্কার হয়। প্রচুর স্টেপ মনে রাখতে হওয়ার ফলে স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগও বাড়ে। ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে, পশ্চার ও আত্মবিশ্বাসও উন্নত হয়।

ওডিসির উপকারিতা: ভারতীয় ক্লাসিকাল নাচে পায়ের আঙুল থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গের এক্সারসাইজ় হয়। টর্সো, কনুই, গোড়ালি ইত্যাদি জয়েন্টেরও। এক ঘণ্টা জিম করার চেয়ে অনেক বেশি ফল পাওয়া যায় এক ঘণ্টা নাচ করলে। নৃত্যশিল্পীদের দেখলে বয়স বোঝা যায় না, ত্বক, চুল, ফিগার আর সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যও খুব ভাল থাকে। আসলে নাচের সঙ্গে মনের একটা যোগ রয়েছে। ফলে হরমোন সিক্রিশন সঠিক থাকে। ভারতীয় ক্লাসিকাল নৃত্যশিল্পীদের যে শারীরিক ফিটনেস থাকে, সেটা অন্য কোনও কিছুতে হওয়া সম্ভব নয়। ওডিসি নাচে টর্সো মুভমেন্ট বেশি হয়। গোড়ালি, হাঁটু, কোমর, কনুই, কবজির সম্পূর্ণ এক্সারসাইজ় হয়। সেই জন্য ওডিসি নৃত্যশিল্পীদের ফ্লেক্সিবিলিটি খুব বেশি হয়। ডান্সারদের হাঁটু, কোমরে ব্যথার সমস্যা হয় না। চাইলেই বেশি বয়সে থেকে নাচ শুরু করা যায়, তাদের শুধু একটু বেশি প্র্যাক্টিস করতে হবে।

দেবমিত্রা সেনগুপ্ত, ওডিসি নৃত্যশিল্পী



দল বেঁধে জুম্বা

জুম্বা ও অ্যারোবিকস:
হাই এনার্জি লাতিন মিউজিকের সঙ্গে অ্যারোবিক মুভমেন্ট জুম্বার মূল বিশেষত্ব। ফলে কার্ডিয়ো ওয়র্কআউট হিসেবে এটি আদর্শ। হিপ হপ, সাম্বা, সালসা, ম্যাম্বোর মতো বিভিন্ন নাচের স্টেপ মেশানো হয় এতে। শরীরের নীচের অংশকে টোন করার জন্য রাখা হয় স্কোয়াট ও লাঞ্জ। জুম্বার মূল উদ্দেশ্য, ওয়র্কআউটের মধ্যে দিয়ে মন ভাল রাখা। শরীরের প্রায় সমস্ত পেশির মুভমেন্ট হয়, ফলে নমনীয়তা এবং ফুল বডি ওয়র্কআউট হয়। এক-একটা জুম্বা সেশনে অ্যাভারেজে ৪০০-৫০০ ক্যালরি, বা তার বেশিও ঝড়ানো যায়। ফুসফুস এবং কোর পেশিগুলি বেশি কাজ করার ফলে শরীরের সমস্ত অংশে রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয়।

বেলি ডান্স:
মধ্যপ্রাচ্যের এই ফোক ডান্সে বিভিন্ন জটিল টর্সো মুভমেন্ট করা হয়। কোমর, পেট ও পিঠকে টোন করার জন্য আদর্শ বেলি ডান্স। নমনীয়তা ও রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয়, থাই ও অ্যাবডোমিনাল অংশের মেদ ঝরে ও পেশি শক্ত হয়। পশ্চার উন্নত হওয়ায় পিঠে ব্যথার মতো সমস্যা কখনওই হয় না বেলি ডান্সারদের। অন্য এক্সারসাইজ়ের তুলনায় হাড়ের উপর কম চাপ পড়ে, ফলে বোন ডেনসিটিও ভাল হয়।

হিপ হপ:
হিপ হপ মিউজ়িকের অনুপ্রেরণায় এই স্ট্রিট ডান্স। ব্রেকিং, লকিং, পপিংয়ের মতো বিভিন্ন কমপ্লেক্স স্টাইলকে এই নাচের অন্তর্গত। দ্রুত গতিতে একের পর এক স্টেপ করা হয় হিপ হপ নাচে, ফলে এক্সারসাইজ় হয় সারা শরীরের সমস্ত পেশির। পেশিশক্তি, নমনীয়তা ও ভারসাম্য বাড়ানোর পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতেও সাহায্য করে হিপ হপ।

সালসা:
লাতিন আমেরিকার এই নৃত্যধারা নিয়মিত প্র্যাক্টিস করলে এক ঘণ্টায় ৪০০-৫০০ ক্যালরি পর্যন্ত ঝরানো যায়। শরীরের উপরের অংশ ও হাতের সবচেয়ে বেশি ওয়র্কআউট হয় এতে। হ্যামস্ট্রিং, কোয়াড্রিসেপস, কাফ ও কোর মাসলের শক্তি বাড়ে। মহিলাদের একটা বয়সের পরে হাড়ে ক্যালশিয়ামের মাত্রা কমে যায়। সালসা হাড়ের জোর বাড়িয়ে আর্থ্রাইটিস বা অস্টিয়োপোরোসিস রোধ করতেও সাহায্য করে।

ব্যালে:
ইনটেন্স ওয়র্কআউট হিসেবে আদর্শ ব্যালে। রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে ও হার্ট ভাল রাখতে সাহায্য করে এই নাচ। বাড়ে সহ্যশক্তি ও স্ট্যামিনা। ব্যালের স্টেপগুলি শক্তি ও নমনীয়তা বাড়াতে একেবারে পার্ফেক্ট। ব্যালের প্রত্যেকটি স্টেপে নিজেকে সঠিকভাবে ক্যারি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ফলে ব্যালে ডান্সারদের পশ্চার খুবই ভাল হয়। আধ ঘণ্টা ব্যালে করলেই প্রায় ২০০ ক্যালরি পর্যন্ত ঝরানো সম্ভব।

প্রথম ছবি সৌজন্যে: আইস্টক
দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি সৌজন্যে: দেবমিত্রা সেনগুপ্ত
শেষ ছবি: শুভদীপ ধর (ফোটো)

সুন্দরী ও রাজনীতি

সৌন্দর্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রুচি, লালিত্য, চমৎকারিত্ব। রাজনীতি মানে শাসন, কূটনীতি, রাষ্ট্রনীতি। সৌন্দর্য ও রাজনীতির মেলবন্ধন নিয়ে লিখছেন দেবমাল্য চক্রবর্তী।



ইন্দিরা গাঁধী



সনিয়া গান্ধী



বেনজির ভুট্টো

অ্যায় দিল-এ-নাদান, অ্যায় দিল-এ-নাদান
আরজু কেয়া হ্যায়,
জুস্তজু কেয়া হ্যায়...

রাজিয়া সুলতানা গাইছেন গানটি। নাকি হেমা মালিনী? নাকি লতা মঙ্গেশকর? সবকিছু যেন মিলেমিশে একশা। গাইছেন তাঁর প্রেমিক ইয়াকুতের (যে চরিত্রে স্বয়ং ধর্মেন্দ্র) জন্য। জান নিসার আখতার এবং খৈয়াম মিলে গানটি লিখেছিলেন। কামাল আমরোহি ছিলেন ছবিটির পরিচালক। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। 'রাজিয়া সুলতান'। এগুলো স্রেফ ফিল্মি তথ্য। কিন্তু এই গান, এই গাথার গভীরে লুকিয়ে থাকা আসল মানুষগুলোকে খুঁজে বার করতে গেলে, সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মতো উঠে আসবে এক রাজনীতিবিদের কথা। এক সুন্দরী প্রশাসকের কথা। এ দেশের প্রথম নারী শাসকের কথা। মনটা ঝটিতি চলে যেতে চাইবে দিল্লির সুলতানি দরবারে। ১২৩৬ থেকে ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে। এক অনন্যযৌবনা, অপার্থিব সুন্দরী কী দাপটের সঙ্গে সিংহাসনে বসে আছেন। কী বিচক্ষণতার সঙ্গে চালাচ্ছেন ভারতবর্ষ নামে একটা বিরাট, বৈচিত্রপূর্ণ দেশের প্রশাসন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কীভাবে একাধিক কবি-সাহিত্যিক-স্থপতি প্রসন্নচিত্তে সাহিত্যকীর্তি রচনা করছেন।
রাজত্ব, প্রশাসন, সিংহাসনে এক নারী! যিনি মোটেই রাজান্তঃপুরিকা নন। প্রকাশ্য দরবারে রাজকীয় পোশাক পরে সিংহাসনে বসেন। বোরখা পরতেন না। পুরুষের বেশে তিনি আলখাল্লা এবং পাগড়ি পরে জনসমক্ষে ঘোরাফেরা করছেন। সভাসদ, আমির-ওমরাহদের সঙ্গে রাজ্য শাসন নিয়ে খোলামেলা আলোচনায় সদাব্যস্ত। সুলতান ইলতুতমিসের কন্যা রাজিয়া সুলতানা। শুধু তাই নয়, রাজিয়া কিন্তু নিজেকে সুলতানা বলতেও রাজি ছিলেন না। 'সুলতানা' অর্থে কোনও সুলতানের বেগম। রাজিয়া তাই নিজেকে বলতেন 'সুলতান', মানে রাজা। ভারতবর্ষের এত-শত রাজা-বাদশার ভিড়ে কিন্তু রাজিয়ার শাসিত চারটে বছর হারিয়ে যায়নি। সেই সুন্দরী সম্রাজ্ঞীকে আমরা মনে রেখে দিয়েছি। নাহ, তিনি সুন্দরী বলে না। তিনি যোগ্য বলে।

"My father was a statesman, I am a political woman. My father was a saint. I am not." **—Indira Gandhi**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাম রেখেছিলেন প্রিয়দর্শিনী। জওহরলাল নেহরুর প্রিয় ইন্দিরা। ইন্দিরা গাঁধীর কোঁকড়ানো চুলের মোহে হয়তো অনেক পুরুষই পড়েছেন। তাতে আর দোষ কী! ভারতবর্ষও যে 'রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'কে চমকাতে পারে, সেটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন এই মহিলাই। সুন্দরী, বিদুষী এবং দাপুটে। 'রাজনীতির মেয়ে' হিসেবে সম্ভবত স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের মুখ তিনিই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, অপারেশন ব্লু স্টারের 'আদেশ' দিয়েছিলেন এই মহিলাই। বিরোধীরা একসময় বলেছিল, 'গুংগি গুড়িয়া'। আবার সেই মানুষটাকেই সংসদে বিরোধীদের তুলোধোনা করতে দেখেছেন দেশের মানুষ। আর এখনও পর্যন্ত তো আর কোনও মহিলাকে প্রধানমন্ত্রীর তখ্‌তে দেখল না ভারতবাসী। বিবিসি তাঁকে 'ওম্যান অফ দ্য মিলেনিয়াম' তকমা তো আর এমনি এমনি দেয়নি!
ইন্দিরা গাঁধীর ড্রেসিং স্টাইলের কথাই ধরুন। যে কারণে তিনি এখনও স্টাইল আইকন। দেশে প্রায় সব সময়ই খাদি পরতেন। হাতে বোনা শাড়ি, বাঁ-কাঁধের উপর আঁচলটা ড্রেপ করা। সিল্ক কিংবা জর্জেটের শাড়িতে ব্রাইট ব্রোকেড। ঝুমকা, নেকলেস জন্মে পরেননি। বরং ইন্দো-চিন যুদ্ধে ন্যাশনাল ডিফেন্স ফান্ডে সব গয়না দান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ট্রেডমার্ক রুদ্রাক্ষের মালা ভোলার নয়। বিদেশ সফরে ট্রেঞ্চ কোটের সঙ্গে শাড়ি। সৌন্দর্য মানে যে আসলে আভিজাত্য, সেটা তাঁর চেয়ে ভাল কে বোঝাতে পেরেছিলেন।
অবশ্য ইন্দিরার পুত্রবধূ, সনিয়ার প্রেমেও তো রাজীব পড়েছিলেন ইতালিয়ান সৌন্দ দেখেই! নিজের স্তিমিত খোলস ছেড়ে কংগ্রেসকে জাতীয় রাজনীতিতে ফিরিয়ে এনেই তাঁর মাস্টার স্ট্রোক, মনমোহন সিংহকে প্রধানমন্ত্রী করা। রাহুল গাঁধী যখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে থাকতে চাইলেন না, আবার দলকে শক্ত হাতে ধরলেন কিন্তু সনিয়া গাঁধীই।
পড়শি রাষ্ট্র পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো। স্টাইল আইকন এবং তার সঙ্গে ফেমিনিস্ট


মার্গারেট থ্যাচার


জয়ললিতা

স্পর্শ। এখন চোকার্স নিয়ে ফ্যাশন দুনিয়া নতুন করে ভাবছে। বেনজ়ির কবেই সেসব করে দেখিয়ে দিয়েছেন। কলেজ যুগে তাঁর পনিটেল-লুক ধীরে ধীরে 'সফিস্টিকেটেড' হল রাজনীতিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। এল স্কার্ভস। হাতে সরু লেদার ওয়াচ, স্কোয়ার ডায়াল এবং একটি পেনডেন্ট নেকলেস। মাঝখানে পার্ট করা শর্ট হেয়ার। কখনও মিনিম্যাল, কখনও ডার্ক মেকআপ। কামিজে পাফ্‌ড স্লিভস। ইন্দিরা-সনিয়ার সৌন্দর্যের উত্তরাধিকার বয়ে চলেছেন প্রিয়ঙ্কা গাঁধী বঢরা। ঠাকুরমার মতোই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন কংগ্রেসি এবং দেশীয় রাজনীতিতে। রাহুল গাঁধী এবং সোনিয়া গাঁধীর ছায়ায় কিছুটা ঢাকা পড়ে গেলেও তিনি যখন পুরোদমে রাজনীতিতে এলেন, লোকজন কিন্তু তাঁর মধ্যে ঠাকুরমা ইন্দিরা গাঁধীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রিয়ঙ্কা গাঁধীর স্টাইল সেন্স নিয়ে পৃথিবীর বড়-বড় ফ্যাশন পত্রিকার কভারস্টোরি হতে পারে। যেমন সুন্দরী, তেমনই বাকপটু। সংসদে কি খুব শিগগিরই আমরা তাঁকে দেখতে পাব? প্রশ্নটা বড় জ্বালাচ্ছে!

Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't. **—Margaret Thatcher**

ইতিহাস তাঁকে বলবে, 'আয়রন লেডি'। কিন্তু সে তো বহিরঙ্গে। মার্গারেট থ্যাচারের বাটন-ডাউন কোট, তাঁর হ্যান্ডব্যাগের সংগ্রহ দেখলে বোঝা যায়, আসলে তাঁর ব্রিটিশ আভিজাত্য এবং 'ক্লাস' কতটা। ফর্ম্যাল পোশাকের কথা ছেড়েই দিন। শার্প শোল্ডার প্যাডস দেওয়া অর্থোগোনাল জ্যাকেট, জামায় সফ্‌ট ড্রেপিং কলার, নেক স্কার্ভস কিংবা পুসি বো-এ

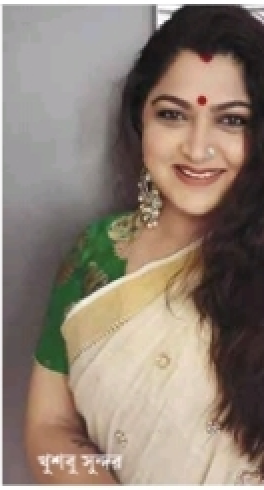

প্রিয়ঙ্কা গাঁধী

ক্যামেরার সামনে চিরকালই স্বচ্ছন্দ ছিলেন থ্যাচার।

তোমার মতন কেউ ছিল না কোথাও?
কেন যে সবের আগে তুমি চলে যাও।
কেন সে সবের আগে তুমি পৃথিবীকে করে
গেলে শূন্য মরুভূমি
(কেন যে সবার আগে তুমি)
ছিঁড়ে গেলে কুহকের ঝিলমিল টানা ও
পোড়েন,
কবেকার বনলতা সেন।"
বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশ

অভিনেত্রী থেকে তামিলনাড়ুর প্রায় ১৫ বছর (১৯৯১ থেকে ২০১৬) মুখ্যমন্ত্রিত্বের ভার সামলে দেওয়া জয়ললিতা। 'আম্মা' এখনও যেভাবে মানুষের মনে রয়ে গিয়েছেন, বোঝার উপায় নেই তিনি নেই! শুধু তামিলনাড়ু কেন, গোটা দেশের রাজনীতিতেই যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ভদ্রমহিলা, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে, আঞ্চলিক রাজনীতিতে তাঁকে ইন্দিরা গাঁধীর সমকক্ষ বললে অত্যুক্তি হবে না। জয়ললিতার মতো সুন্দরী খুব কম আছেন তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। তখন তো তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে শুধুই দেবদেবী। দক্ষিণের দাপুটে অভিনেতা এমজি রামচন্দ্রনের 'ব্রেন চাইল্ড' বলা চলে তাঁকে। কিন্তু সেটাই তো সব নয়। জয়ললিতার ব্যক্তিত্ব, বিরোধীদের ধরাশায়ী করার সহজাত ক্ষমতা, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে


ডিম্পল যাদব


খুশবু সুন্দর


হরসিমরত কওর বাদল


মহুয়া মৈত্র

চলার ক্যারিশমা তো তাঁর একান্ত নিজের। গ্ল্যামার শব্দটি রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে তখনও ব্যবহার করা হত না এত ঘনঘন। জয়ললিতার মতো ব্যক্তিত্বরা সেটা সুনিশ্চিত করেছিলেন। তারপর তো অভিনেত্রীদের ঢল নেমেছে সংসদে, বিধানসভায়। এমন নয় যে, তাঁরা শুধুই সুন্দরী বলেই ভোট দিয়ে মানুষ তাঁদের নির্বাচিত করেছেন। বরং উলটোটাই ভাবা উচিত, যোগ্য বলেই তাঁরা জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। আর সৌন্দর্যটা স্রেফ একটা 'স্ট্রেঞ্জনেস ইন প্রোপোরশন'!
এ দেশে যে হারে সুন্দরী, সুন্দরীতর এবং সুন্দরীতম অভিনেত্রীরা রাজনীতিতে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন, বেড়াচ্ছেন এবং বেড়াবেন, তাতে বাঙালি না হলেও তাঁকে জীবনানন্দ দাশ পড়ানো যেতে পারে। অন্তত অনুবাদে তো বটেই। তাহলে রাজনীতিতে সুন্দরীদের জয়জয়কারের বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। সকলেই আসলে এই ক'টা লাইন বলতে চান মনে মনে। তবে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে কিন্তু কিটসই রাজা! কেন বলুন তো? কারণ, রোম্যান্টিকতাকে তিনিই তো এভাবে ভাবতে পেরেছিলেন।

"Man is a political animal" —***Aristotle***

রাজনীতি ছাড়া মানুষ হয় না! কবে এ কথা বলে দিয়ে গিয়েছেন প্লেটোর এই সুযোগ্য ছাত্র। অ্যারিস্টটল বলে দিয়ে গিয়েছেন, লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে রাজনীতি করতে হবে। 'পলিটিক্স' শব্দটা বরং ব্যবহার করলে তার অভিঘাত একটু বেশিই হবে। যে কারণে, রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, ''বাংলায় পলিটিক্সের পরিবর্তে রাজনীতি শব্দ প্রচলিত হইয়া গেছে। কিন্তু রাজনীতি শব্দটি পুরাতন, পলিটিক্স্ আমাদের পক্ষে নূতন। আমাদের দেশে যখন রাজনীতি ছিল তখন ঠিক আধুনিক পলিটিক্স্ ছিল না। সুতরাং উভয় শব্দের মধ্যে অর্থের কিছু ইতরবিশেষ আছেই।'' (রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, সাময়িক সার সংগ্রহ) যে কারণে প্রসঙ্গটির অবতারণা, তা হলে পলিটিক্স শব্দটার মধ্য সত্যিই সেই দাপট আছে, যেটা হয়তো রাজনীতি শব্দটার মধ্যে নেই। যে দাপট লক্ষ করা


মিমি ও নুসরত

গিয়েছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনেও। ৭৮জন মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন এবারের নির্বাচনে। এবং তাঁদের মধ্যে অন্যতম আলোচিত মিমি চক্রবর্তী, নুসরত জাহান এবং মহুয়া মৈত্র। প্রথম দু'জন জনপ্রিয় অভিনেত্রী, চেনা-মুখ। তৃতীয় জন কিন্তু বিদেশের কর্পোরেট চাকরি ছেড়ে এসে 'পলিটিক্স'-করা লোক। একদম মাটির কাছাকাছি থেকে, সংগঠন করে, তারপর ভোটের টিকিট পাওয়া একজন নেত্রী। মহুয়া বুদ্ধিমতী, সুন্দরী তো বটেই। কিন্তু তিনি যে সংসদে এতটা হইচই ফেলে দেবেন, সেটা বোধহয় কেউই ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি। তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ, শব্দচয়ন থেকে শুরু করে কর্পোরেট অ্যাটিটিউড—এক কথায় 'ওয়াও'! এই 'ওয়াও ফ্যাক্টর'এর জন্যই কিন্তু তিনি তরতর করে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছেন তা নয়। মহুয়াকে লক্ষ করলে বুঝতে পারবেন, কীভাবে তা বডি ল্যাঙ্গোয়েজের সঙ্গে কথাগুলো তিরে মতো বিঁধছে এসে। শুধু সুন্দরী বলেই কি না, বোধহয়!
আম আদমি পার্টির অলকা লাম্বা, হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বংশী লালের নাতনি কংগ্রেসের শ্রুতি চৌধুরী কিংবা পেশায় ডাক্তার কংগ্রেসের জ্যোতি মিরধাকেই দেখুন। এনসিপি-র আগাথা সাংমা, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের স্ত্রী ডিম্পল কিংবা পঞ্জাবের শিরোমণি অকালি দলের সাংস হরসিমরত কওর বাদলকেই বা বাদ দিই কেন? প্রত্যেকের বয়স ৩৫ থেকে ৪৫-এ মধ্যে। প্রত্যেকেই বেশ ফ্যাশন সচেতন। কেতাদুরস্ত। কিন্তু যখন রাজনীতির প্রশ্ন আসে, কেউ চাইলেও এসব কথা তুলে ওঁদের দমিয়ে রাখতে পারবেন না। যেমন মিমি-নুসরতকে পারেননি। তাঁদের প্রথমদিন সংসদে জিন্স্ পরে যাওয়া বা ধর্মের দোহাই দিয়েও পারেননি।
উত্তর-পূর্বের আঙ্গুরলতা ডেকা, বিজেপির অন্যতম সোশ্যাল মিডিয়া সেনসেশন। দক্ষিণের নাগমা কিংবা রম্যা চুটিয়ে



থেরেসা মে



হিলারি ক্লিন্টন



এঙ্গেলা মের্কেল

রাজনীতি করছেন। জয়প্রদা কিংবা হেমা মালিনীও সেই কবে থেকে রাজনীতিতে সুন্দরীদের জয়ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন। এবং এখানে ভানুরেখা গণেশন, সংক্ষেপে রেখার কথাটা আলাদা ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংসদের উত্তাপ বেশ কয়েক ডিগ্রি বাড়িয়ে দিয়েছেন রেখা। কিংবা কংগ্রেসের খুশবু সুন্দর বা নবনীত কৌর। বিশ্ব মানচিত্রে রাজনীতি কি শুধুই 'পলিটিক্স' করার জন্য?

নাহ্! সুন্দরীদের সঙ্গে রাজনীতিকদের জড়িয়ে পড়াকে তাহলে কী বলবেন? বিল ক্লিন্টনের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের ইনটার্ন মনিকা লিউইন্‌স্কির কেচ্ছা নিয়ে কী মত? চার ঘণ্টার ইমপিচমেন্ট ট্রায়াল? কিংবা তারও আগে যদি আমেরিকার আর-এক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির সঙ্গে লাস্যময়ী মেরিলিন মনরোর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কথা ওঠে? সুন্দরীরা বারবার নিয়ন্ত্রণ করেছেন রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের। নিন্দুকেরা যে যা-ই বলুন, স্বপ্নসুন্দরীদের সেক্স অ্যাপিলের কাছে বিশ্বের দৃঢ়তম নেতাও বিগলিত না হয়ে পারেননি। তাঁরা প্রেমে পড়েছেন বারবার। হিলারি ক্লিন্টন, এঙ্গেলা মের্কেল, থেরেসা মে-র ফ্যাশন স্টেটমেন্টই বা কম যায় কীসে! তিনজনেরই শর্ট হেয়ার। তার উপর অফিশিয়াল এবং ইনফর্ম্যাল ড্রেসকোড চোখে আঙুল দিয়ে আলাদা করা যায়। আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু উদ্ধত নয় সে লুক। দেখে বোঝা যায়, রাজনীতিতে তাঁরা বেশ শক্তিশালী। কিন্তু কোনও অহংকার নেই। এই তো সৌন্দর্য, তাই না!



সারা প্যালিন

আলাস্কার প্রাক্তন গভর্নর সারা প্যালিনকে ভুলে যাই কী করে! ওই রিমলেস চশমা, ওই ভুবনমোহিনী হাসি! কানাডিয়ান হাউস অফ কমনসে এক শিখ মহিলা গিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন বছর খানেক আগে। তিনিই প্রথম কোনও শিখ মহিলা হিসেবে সেখানকার লিবারাল পার্টির সদস্য হিসেবে জয়লাভ করেন। রুবি ধাল্লা। কানাডার সংসদ এবং সংসদের বাইরেও একই ভাবে সক্রিয়। সৌন্দর্যে এবং বুদ্ধিমত্তায়। তারপর ধরুন, ইজ়রায়েলের ওর্লি লেভি। ইজ়রায়েল বেইটেনু পার্টির সদস্য শিরোনামে এলেন দল থেকে পদত্যাগ করে। এই মুহূর্তে নির্দল হিসেবে রাজনীতি করছেন ওর্লি। তাঁর আবেদনের চর্চাও সর্বত্র। পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে সুন্দরীদের রীতিমতো রমরমা। লেবাননে এই মুহূর্তে বেশ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সেথরিদা জিজিয়া। পড়াশোনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে। তারপর লেবানন মেরোনাইট লিগের এই সদস্যের 'এলিগেন্স' এবং ফ্যাশন সচেতনতা দেখার মতো। এর পর একটু ইউরোপের দিকে যাওয়া যাক। গ্রিসের ইভা কাইলি। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য ইভা, প্যাসোক-এর (প্যানহেলেনিক সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট) চেনা মুখ। যে কোনও ইউরোপিয়ান অভিনেত্রী তাঁর রূপের কাছে কুপোকাত হতে বাধ্য। আগে ছিলেন জনপ্রিয় টেলিভিশন উপস্থাপক। আর্কিটেকচার এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক ইভাকে দেখলেই ঘায়েল হবে যে কেউ! ইতালির রাজনীতিতে মারিয়া কারফাগনাকে মনে করা হয়, বিশ্বের অন্যতম 'সেক্সি পলিটিশিয়ান'। সালের্নো ইউনিভার্সিটির ছাত্রীও রাজনীতিতে আসার আগে টেলিভিশনেই বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছেন। ফোর্জা ইতালিয়া পার্টির



মরিয়ম নওয়াজ



হিনা রব্বানি খার

পার্লস, রবার্তো কাভালি-র শেডস, বিরকিন-এর ব্যাগের (যার দাম নাকি প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা) সঙ্গে সাবেকি পোশাকের মিশেলে হিনা স্টাইল আইকন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে আর-এক লাস্যময়ী, মরিয়ম নওয়াজ। নওয়াজ শরিফের মেয়ে।

সদস্য তিনি। সিলভিও বার্লুস্কোনির মন্ত্রিসভার তিনি ছিলেন ইকুয়াল অপরচুনিটি মন্ত্রকের দায়িত্বে। এছাড়াও সুন্দরী হিসেবে স্পেশ্যাল মেনশন পাওয়া উচিত, জাপানের ইউরি ফুজিকাওয়া, রাশিয়ার আলিনা কাবায়েভা, সার্বিয়ার ভানজা হ্যাডজোভিকের। তাঁদের প্রোফাইল খুলে দেখলে যে কোনও নামী মডেল লজ্জা পেতে পারেন। যেমন শরীরী বিভঙ্গ, তেমনই বাকপটুত্ব। অদ্ভুত এক কম্বিনেশন! একটা সময় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রসিকতা চালু ছিল— 'মাধুরীকে নিয়ে দাও, কাশ্মীর নিয়ে নাও'। 'এলওসি কার্গিল' ছবিতে অভিষেক বচ্চনের মুখে জনপ্রিয় সংলাপ, 'ফ্রম মাধুরী উইথ লাভ'! কিন্তু মাধুরীর মাধুর্যে যদি পাকিস্তানের নেতারা বিদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে এদেশের মানুষও হিনা রব্বানি খারকে দেখে ওই একই কথাই বলেছিলেন— 'হিনাকে দিয়ে দাও, কাশ্মীর নিয়ে নাও'! কূটনীতিতেও সেই সুন্দরীরাই! ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটসের স্নাতক হিনা ৩৩ বছর বয়সে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের দায়িত্ব পান। পার্লস, রবার্তো কাভালি-র শেডস, বিরকিন-এর ব্যাগের (যার দাম নাকি প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা) সঙ্গে সাবেকি পোশাকের মিশেলে হিনা স্টাইল আইকন। ঘরোয়া বৈঠকে জিন্‌সেও স্বচ্ছন্দ তিনি। এখন অবশ্য অহোরাত্র ইমরান খানকে তুলোধোনা করছেন বিরোধীর আসনে বসে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে আর-এক লাস্যময়ী, মরিয়ম নওয়াজ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মেয়ে। ২০১২ থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে এসে বেশ চমকে দিয়েছিলেন। এখনও দিচ্ছেন বইকী!



ইভা কাইলি

Beauty is truth, truth beauty,—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.
Ode on a Grecian Urn, John Keats

ওয়ার্ডসওয়ার্থ বললেন তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যেই ব্যস্ত থাকবেন। কোলরিজ খুঁজলেন সুপারন্যাচারালকে। শেলি ভাবলেন, সৌন্দর্য হল গিয়ে 'আইডিয়াল'। বায়রন আবার চলে গেলেন সৌন্দর্যে মুক্তি খুঁজতে। যা কিছু 'পার্থিব', যা কিছু ছোঁয়া যায় সব নীলকণ্ঠের মতো পান করলেন কে? কিটস! রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে এই কিটস আর স্পেনসারই সবকিছুর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন সৌন্দর্য। 'আ থিং অফ বিউটি ইজ আ জয় ফরএভার'— বললেন ভদ্রলোক! এবার এডগার অ্যালা পো বললেন, "There is no exquisite beauty… without some strangeness in the proportion." বোঝো! 'ফিলজফি অফ কম্পোজিশন'। সব গন্ডগোল। কিন্তু সৌন্দর্য খুঁজতে গেলে দু'পক্ষকেই পাশাপাশি নিয়ে চলতে হবে। কী বলেন?

"ব্রজেশ্বর ও সাগরকে বিদায় দিয়া দেবী চৌধুরাণী-হায়! কোথা গেল দেবী? কই সে বেশভূষা, ঢাকাই সাড়ি, সোণাদানা, হীরা মুক্তা পান্না–সব কোথায় গেল? দেবী সব ছাড়িয়াছে–সব একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে। দেবী কেবল একখানা গড়া পরিয়াছে–হাতে কেবল এক গাছা কড়।"
দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যিনি সংসদে বিতর্কে অংশ নেন, তিনি রাঁধেনও, চুলও বাঁধেন। এবং তার চেয়েও বড় কথা, এই যে রণোত্তেজিত বা রণক্লান্ত 'দেবী'দের আমরা দেখি, তাঁরা কিন্তু সংসদের ভিতর কিংবা বাইরে লড়ে চলেছেন। তাঁদের মতো অনেকেই লড়ে চলেছেন প্রতি নিয়ত। সৌন্দর্য আসলে কখনও কারও মুখমণ্ডল বা দেহের গড়ন দিয়ে হতে পারে না। তা মনে হয়, একটা 'ইলিউশন'। এই মুহূর্তে তাঁরা 'দেবী চৌধুরাণী'র মতো অস্ত্রসস্ত্র সজ্জিত, পর মুহূর্তেই তাঁদের হাতে একগাছা চুড়ি। তা-ও তো যথেষ্ট!



এখানে আকাশ নীল

দেবব্রত বিশ্বাস

চারপাশে ঘন কুয়াশার আস্তরণ। কুয়াশা যেন সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে চরাচরে। রহস্যের চাদরে আবৃত করেছে চারিদিক। আমার চারিদিকে সাদা সুতোর মতো ঝরে পড়ছে কখনও, আবার কখনও জমাট বেঁধে চেপে ধরছে দৃষ্টিক্ষেত্র। কুয়াশার কণা আমার চোখের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা হয়ে জমে আছে দূর্বাঘাসে শিশিরের মতো। চোখের পাতা অনেক ভারী লাগছে সেজন্য। সূর্য ওঠেনি, উঠলে সূর্যের আলো সেই কুয়াশার ফোঁটায় বিচ্ছুরিত হত নিশ্চয়ই। সাতরঙা রামধনু তৈরি হত আমার চোখের পাতায়। বেশ ইন্টারেস্টিং হত ব্যাপারটা। কুয়াশা নাকের মধ্যে ঢুকে ফুসফুসে পৌঁছে যাচ্ছে। ভরপুর চৈত্রের ভোরে এমন কুয়াশা হয়? আমার জানা ছিল না। ঝিমঝিম শব্দ হচ্ছে যেন। কুয়াশা, না বৃষ্টি? নাকি আমার মস্তিষ্ক নিজে থেকেই এমন একটা শব্দ তৈরি করে চলেছে? রাতজাগা মস্তিষ্কে এরকম নানা বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ চলতেই থাকে। কুয়াশা এতই ঘন যে, চার হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। আমার হাঁটার মধ্যে কেমন যেন একটা টলমলে ভাব ফুটে উঠছে। এই টলমলে ভাব আমি কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। কালকের রাত্রিজাগরণ এসব ঘটাচ্ছে বুঝতে পারছি। এসব ভাবনার মধ্যে হঠাৎ করে আবার সেই পরিটিকে দেখলাম, ঘন কুয়াশায় আমার ঠিক দু'হাত দূরে উড়ছে। রাত্রিজাগরণ হলেই এই পরি আমার কাছাকাছি ওড়াউড়ি করে। ছোট্ট পরি। হাতের তালুতে বসতে পারে। আমি হাত পেতে দিই। পরি বসে। তার ডানাগুলো ঠিক প্রজাপতির মতো। তাই আমি তার নাম রেখেছি 'প্রজাপরি'। প্রজাপতি আর পরির



মিশ্রণ। আমার হাতে বসে পরি তার রিনরিনে গলায় বলল—
পরি: কেমন আছ?
আমি: ভাল। তুমি ভাল আছ?
পরি: হ্যাঁ। পরিদের দেশে আমরা সবসময় ভাল থাকি।
আমি: আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের দেশে?
পরি: না। আমাদের দেশে কেবল পরিরাই যেতে পারে।
আমি: তা হলে আমাকেও পরি বানিয়ে দাও।
পরি: উঁহু। তা হবে না।
আমি: আচ্ছা, তুমি কি রাতে ঘুমোও?
পরি: হ্যাঁ। আমি ভোরপরি। কেবলমাত্র ভোরের বেলাতেই বেরোই।
আমি: আমি তোমার কী নাম দিয়েছি জানো? প্রজাপরি।
পরি: কিন্তু আমি যে ভোরপরি।
আমি: আমার কাছে তুমি প্রজাপরি।
পরি: হি হি হি। কী মজার নাম!

"আরে শ্রীকান্তদা যে, সকাল সকাল হাতে কী নিয়ে ঘোরেন? পুঁটিমাছ নাকি? হেঁ হেঁ হেঁ।"
একটা চেনা আবার অচেনা শব্দে আমি সামনে তাকাই। গাঢ় কুয়াশায় একজনকে আবছা দেখলাম ছায়ামূর্তির মতো। ঠিক চিনতে পারলাম না। আমি চেয়ে রইলাম। সে আবার বলল, "কী, চিনতে পারলেন না নাকি আমাকে? আবার কি সেই রোগ হল? আমি, আমি, নিমাই। চলেন চা খাবেন। আপনি আমার দোকানে প্রথমে চা না খেলে আমার বউনি ঠিকঠাক হয়

না। আবার দাঁড়িয়ে রইলেন? চলেন তো।"
এবার চিনলাম। নিমাই। চায়ের দোকান আছে। আমি ওর বাঁধা খদ্দের। কী করে যে মাঝে-মাঝে চিনতে পারি না! কালকের রাতজাগা প্রভাব বিস্তার করতে লেগেছে, মস্তিষ্কের স্মৃতি-সঞ্চয়ের জায়গায় কিছু একটা করছে। আমি হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি কিছুই নেই। পরি নেই। হাত ফাঁকা। আমি নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, "চলো তা হলে।"

নিমাইয়ের আমার ওপর খুব বিশ্বাস। আমি প্রতিদিন সকালে, কোনও-কোনওদিন বিকেলেও চা খাই। কিন্তু ও টাকা নেওয়ার নামও করে না। আমাকে চা খাওয়ালে নাকি ওর ব্যবসা ভাল হয়।
আমি আমেজ করে চা খাচ্ছি আর ভাবছি, আমার কি কোনও অলৌকিক শক্তি আছে? সবাই কেন আমাকে এত মানে? নিমাইয়ের কথাই ধরা যাক। প্রতিদিন ও আমাকে এমনিই চা খাওয়ায়, পয়সা নেয় না। আরও প্রচুর উদাহরণ আছে। একটা শক্তি আছে আমার। সেটা হল স্বপ্ন দেখার শক্তি। আমি যে কোনও জায়গায় বসে স্বপ্ন দেখতে পারি। শুধু যে আমি পারি তা নয়। আমি যাকে দেখাতে চাই তাকেও দেখাতে পারি। যেমন দেখিয়েছিলাম সুরঞ্জনাকে। সুরঞ্জনা কে? পরে বলছি। নিমাইয়ের চায়ের তুলনা হয় না। আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে, "নিমাই, তুমি কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
নাম শুনেছ?"
"কী যে কন শ্রীকান্তদা! শুনব না? আমার মেয়েটা প্রতিদিন না-শোনালে আমার ঘুম আসে না। হেঁ হেঁ হেঁ। বাজে স্বভাব হয়েছে!"
"আচ্ছা! তা কী গান তোমার মেয়ে তোমাকে শোনায়?"
"অনেক গানই শোনায়, তবে আমার একটা খুব প্রিয় গান আছে।"
"ও আচ্ছা। কোন গানটা তোমার প্রিয়?"
"ওই যে, 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে...' কী যে কই শ্রীকান্তদা, ও গান শুনলে চোখ দিয়ে জল থামে না।"
"হুঁ। তুমি কি ওঁর 'শেষের কবিতা' পড়েছ?"
"আজ্ঞে না শ্রীকান্তদা। পদ্য-কবিতা আমি পড়ি না। সারা দিন চায়ের দোকান চালাই। চা করি, কাপ ধুই। পদ্য-কবিতা পড়ার সময় কোথায়? হেঁ হেঁ হেঁ।"
"'শেষের কবিতা' কিন্তু কবিতা নয়। তোমার মেয়েকে বোলো পড়ে শোনাবে তোমাকে। তবে এটা জেনে রাখো, তোমার এই চা 'শেষের কবিতা'-র প্রায় কাছাকাছি পর্যায়ের হয়েছে।"
"বলছিলাম কী শ্রীকান্তদা, যদি সময় বের করতে পারেন, একটিবার আমার বাড়িতে আসবেন? মেয়েটার বড় ইচ্ছে আপনাকে দেখার। সারা দিন শরীর খারাপ নিয়ে পড়ে থাকে আর বইপত্র পড়ে। খুব রোগা আমার মেয়েটা। মা-হারা মেয়ে আমার। আসবেন একটিবার?"
"অবশ্যই যাব। দেখবে, একদিন ঠিক চলে গেছি।"
"কবে আসবেন? আপনি এলে আমার মেয়েটা খুব আনন্দ পাবে। আর এসে পড়লে চাট্টি না-খেয়ে ফিরতে পারবেন না। মেয়ে আমার রান্নায় ঠিক যেন অন্নপূর্ণা। ওই অসুস্থ শরীর নিয়ে এত সোয়াদ যে কী করে আনে রান্নায়, ভগবানই জানেন! আমরা গরিব, তেমন ভাল ভাল জিনিস তো খেতে পারি না, কিন্তু আমার মেয়েটার হাতে যে কী আছে, সবই মনে হয় অমৃত!"
"বাহ্! তা হলে তো খেতেই হয় একদিন। কী নাম তোমার মেয়ের?"
"অনু। ভাল নাম অন্নপূর্ণা।"
"খুব মিষ্টি নাম।"
"শ্রীকান্তদা, খুব কষ্টে আছি ওই মেয়েকে নিয়ে। ওর বিয়ের বয়স হয়েছে। কিন্তু আমি গরিব মানুষ, এখনও ওর বিয়ে ঠিক করতে পারছি না। বড় বেশি পণ চায় সবাই। মেয়ে আমার জন্ম থেকেই মা-হারা। বড় মায়া আমার ওর ওপর। এত মায়া থাকা উচিত নয়। কিছুদিন আগে এক পাত্রপক্ষ মেয়েকে দেখতে এল। পছন্দও হল। কিন্তু যা পণ হাঁকল!
আমাকে বিক্রি করলেও তা উঠবে না। ছেলের ঘর ভাল ছিল।
দোকান আছে। পাকা বাড়ি। পায়খানা-বাথরুম-কল সব আ
ঘরে বিয়ে হলে মেয়েটা জীবনে একটু সুখের মুখ দেখত। হল
নিমাই ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।
"তুমি কিছু চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বলছি
মেয়ের শরীর ঠিক হয়ে যাবে। কোনও রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে
"আজ্ঞে। আপনি বললে ঠিক না হয়ে যায় না। আসবেন তো
বাড়ি একবার? অনুর খুব ইচ্ছে আপনাকে দেখে, আপনাকে
রান্না করে খাওয়ায়। অসুস্থ শরীর নিয়ে বেরোতে পারে না।
বসে বই পড়ে।"

কুয়াশার ঘোর কেটে অদ্ভুত রোদ উঠেছে। রোদ এত হলুদ হ
আমার জানা ছিল না! নাকি শুধু আমারই মনে হচ্ছে এসব!
রাত্রিজাগরণের ফল! মস্তিষ্ক করছে এসব। দূর থেকে দেখলাম
আসছে। অরিত্র আমার ছেলেবেলার বন্ধু। উচ্চ মাধ্যমিক পা
সে ডাক্তারি পড়তে শুরু করে, এই বর্ধমানেই। বর্ধমান মেডি
কলেজ অর্থাৎ বিএমসি-তে। অত্যন্ত ভাল র‍্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও
কেউ কলকাতার কোনও মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে
পারেনি। তার মতে, "পড়ব তো আমি। মাস্টারেরা কি কোর্স
খাইয়ে দেবে? কাজেই আমার যাহা কলকাতা তাহাই বর্ধমান।
যাহা বাহান্ন তাহাই তিপ্পান্ন। আর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে
হবে, অন্য কোথাও কি তা হবে?"
ভয়ংকর রকমের ভাল ছাত্র অরিত্র। 'ভাল' বললে ঠিক বোঝা
না। গুড, বেটার, বেস্ট-এর চেয়ে কম করে পঁচিশ ডিগ্রি উপ
থেকে থাকে তবে সে তা-ই। ডাক্তারি তার কাছে নস্যি। সে
নয়, কিন্তু অসম্ভব মেধাবী। অরিত্রর স্বভাব হচ্ছে সকাল থেকে
বেড়ানো। সারা দিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। এর-তার স
মারে। রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালার সঙ্গে সময় কাটায়। তার
হয় রাত একটার পর। তার মতে পড়ার সঠিক সময় হল রাত্রি
বলে, "নিজেকে মেলে ধরার সময় হল রাত। রাত ছাড়া কো
ঠিক হয় না, বুঝলি। তান্ত্রিকরা তন্ত্রসাধনা করে রাতে। রসিক
তান্ত্রিকরা। অল্পবয়সি কুমারী মেয়ের লাশ ছাড়া ওদের সাধনা
হা হা।"
অরিত্র এসে পিঠে চটাস করে একটা থাপ্পড় মেরে বলল, "কী
ঠিক আছে?"
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুম।"
"আমার সন্দেহ হয়। তোর মাথায় ভালরকম গন্ডগোল আছে
বলতে পারিস। মিটার মিটার ছিট। কয়েকশো লোকের জামা
পক্ষে যথেষ্ট। ভাগ্যিস এখনও কোনও বড় কোম্পানি তোর
পেলেই তুলে নিয়ে যাবে। এক মুহূর্ত দেরি করবে না। নিমাইদ
খাওয়াও।"
"তোর সব জায়গায় এই ডাক্তারি ফলানোটা ছাড়।"
"আমি নিজেকে ডাক্তার ভাবিই না। তায় আবার ডাক্তারি ফ
বাহ্, অপূর্ব চা। ভোরবেলার ভৈরবী রাগিণীর মতো। চায়ের
নোবেল থাকত, তা হলে অবশ্যই নিমাইদা একটা নোবেল
নিমাইদা, তোমাকে নিদেনপক্ষে একটা ফিল্ড মেডেল অন্তত
উচিত। তারপর শ্রীকান্ত, তোর কি কাল সারা রাত জাগরণ?"
বর্ধমানের এক অতি অভিজাত বংশের ছেলে অরিত্র। তারা
বংশানুক্রমে ডাক্তার। অরিত্রর দাদু ছিলেন ডাকসাইটে ডাক্তা
একবার বর্ধমানের রাজার এক কঠিন ব্যামো সারিয়ে দেন। ও
পৃথিবীবিখ্যাত সার্জেন। অরিত্র নিজেও ডাক্তারি পড়ছে। কিন্তু
হাবভাব দেখে কে বলে সেকথা! এই কোনও রিকশাওয়ালার
জমিয়ে আড্ডা মারছে, পরক্ষণেই হয়তো কোনও ট্রাফিক পু
পান খাচ্ছে। উচ্চবংশের মানুষ অরিত্রর বাবার ধারণা, ছেলে

গেছে। তিনি তার বিয়ের জন্য একবার উঠেপড়ে লেগেছিলেন। আমার সঙ্গে তখন কিছু কথা হয়েছিল। তার নমুনা নিম্নরূপ:

অরিত্রর বাবা: অরিত্র তো তোমার বন্ধু?

আমি: আজ্ঞে।

অরিত্রর বাবা: তা কেমন বন্ধু? কোন পর্যায়ের বন্ধু?

আমি: অতি উচ্চপর্যায়ের বন্ধু। উচ্চকোটিরও বলতে পারেন।

অরিত্রর বাবা: তুমি কি আমার সঙ্গে সূক্ষ্ম রসিকতা করার চেষ্টা করছ? যদি করে থাকো আর করবে না।

আমি: যে আজ্ঞে।

অরিত্রর বাবা: তোমার বন্ধু যে অনেকদিন আগে থেকেই গোল্লায় যেতে শুরু করেছে তা কি তুমি জানো?

আমি: আজ্ঞে হ্যাঁ।

অরিত্রর বাবা: গুড। আর এটা কি জানো এই গোল্লায় যাওয়ার সূত্রপাত তোমার থেকে?

আমি: আজ্ঞে না।

অরিত্রর বাবা: হুম্‌ম। জানা উচিত ছিল। তোমার জানা উচিত ছিল। আর এত 'আজ্ঞে-আজ্ঞে' করছ কেন?

আমি: আজ্ঞে, আর করব না।

অরিত্রর বাবা: গুড।

বলে তিনি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। পা সামনে একটা বেতের মোড়ায় রাখা। সেই পা নড়তে লাগল। তিনি বললেন, "ওর কাণ্ড দেখে সেদিন আমার চেতনা লোপ পাওয়ার জোগাড়। গোলাপবাগের দিকে গেছিলাম। গাড়ির জানলা দিয়ে হঠাৎ দেখি ও এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে আর বিড়ি টানছে। ধোঁয়া ছাড়ার সময় আকাশের দিকে মুখ করে রিং তৈরির চেষ্টা করছে। কী অধঃপতন!" বলে তিনি হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে তীব্র চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, "সেদিন বাড়ি ফিরল রাত এগারোটার পরে। কোনও ভদ্রবাড়ির ছেলে এত রাতে বাড়ি ফেরে আমার জানা ছিল না। ওই রিকশাওয়ালার সঙ্গে বিড়ি খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই একবাক্যে স্বীকার করে নিল! কী দুঃসাহস!"

আমি: হুম্‌ম! অতি দুঃসাহস।

অরিত্রর বাবা: কী বলল জানো? বলল, শ্রীকান্ত তো খায়, তবে আমি কেন পারব না? এখন বুঝতে পারছ, কেন বলছি ওর গোল্লায় যাওয়ার সূত্রপাত তোমার থেকেই?

আমি: আজ্ঞে হ্যাঁ পারছি। খুব ভালভাবেই পারছি।

অরিত্রর বাবা: তোমার প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অতি প্রবল। ছিটগ্রস্তরা এরকম হয়। তাদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। তাদের কাছাকাছি যারা আসে তারাও নিজেদের ছিটগ্রস্ত ভাবতে থাকে। তোমার চিকিৎসার প্রয়োজন আছে, অতি সত্বর। আমি করাব তোমার চিকিৎসা। তোমাকে মেন্টাল হসপিটালে অ্যাডমিট করাব। ডা. খাসনবিশের কাছে পাঠাব রাঁচিতে। তুমি কি ইচ্ছুক? অবশ্য তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে কোনও গুরুত্ব রাখে না। ছিটগ্রস্তরা নিজেদের খুব স্বাভাবিক ভাবে। তুমিও তাদের ঊর্ধ্বে নও। তুমি কি নিজেকে স্বাভাবিক মনে করো?" কথাগুলো বলতে বলতে দেখলাম অরিত্রর বাবা চোখ থেকে চশমা খুলে তার কাচ মুছতে লাগলেন। এই তাঁর এক মুদ্রাদোষ। কথা বলতে বলতে চোখ থেকে চশমা খোলা এবং তার কাচ পরিষ্কার করা।

রাঁচি যাওয়ার প্রস্তাব এই নিয়ে প্রায় পাঁচশো অতিক্রম করল। বললাম, "আজ্ঞে, তা একটু-আধটু করি। মাঝে-মাঝে সন্দেহও হয়।"

অরিত্রর বাবা: গুড। আত্মচেতনা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। বদ্ধ উন্মাদ এখনও বলা যায় না। তবে আমি নিশ্চিত যে কিছুদিনের মধ্যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে। কোনও সন্দেহ নেই।"

আমি: আপনি যা ভাল মনে করবেন তাই করুন।

অরিত্রর বাবা: আর-একটা কথা, তুমি অরিত্রর ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

আমি: আজ্ঞে আমি না এলেও আপনার পুত্র আসবেই। মেসে দেখব সে আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

অরিত্রর বাবা: ওই যে বললাম, তোমার প্রভাব বিস্তারের ক্ষম প্রবল। সে বসে থাকলেও তুমি যাবে না মেসে। থাক সারা দিন জানি ওর ধৈর্যের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। তুমি না গেলে সাত দিন তোমার মেসে ও ঠায় বসে থাকবে। হয়তো না, থাক আমার মত হল তুমি রাঁচি রওনা হও, আজই। আমি সব ব্যব এরপর তিনি কিছুক্ষণ থামলেন। বেতের চেয়ারে হেলান দিলে উপর আবার তাঁর পা নড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর বললেন, " গিয়ে কাজ নেই। কয়েকদিন পোস্টপন করো। দ্যাখো, তোমার প্রভাবে আমি আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।"

আমি: আজ্ঞে, বলুন আপনার আসল কথা।

অরিত্রর বাবা একবার চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখে নিলে তারপর চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে লাগলেন। সবসময় য চশমা পরা অবস্থায় দেখা যায় তাদের চশমা ছাড়া দেখলে অ তিনি বললেন, "অরিত্রর যে-রোগ হয়েছে সে রোগের একটা বিবাহ।"

আমি: আজ্ঞে...

অরিত্রর বাবা: হ্যাঁ, বিবাহ। আমার এক বন্ধুর এক কন্যার সঙ্গে ওর বিবাহ দেব। জানি ও রাজি হবে না। তাই তাকে রাজি করা তোমাকে দিলাম। পৃথিবীতে ও একমাত্র তোমার কথাই শুনবে বিবাহ সম্পন্ন হলে তোমার রাঁচি যাওয়ার ব্যবস্থা আমি নিজেই এখন তুমি আসতে পারো। গেট লস্ট।

আমি: যে আজ্ঞে।

অরিত্র চা শেষ করার পর আরও এক কাপ চা খেল। তারপর এক কাপ। তারপর বলল, "চল, একটা সিগারেট মেরে আসি আমরা মনোহরের সিগারেটের দোকানের দিকে অগ্রসর হলাম সিগারেটের ছোট একটা গুমটি আছে মনোহরের। ভিতরে কে একজনই কোনওরকমে বসতে পারে। ওখানেই মনোহর সারা থাকে। পান, সিগারেট, বিড়ি বিক্রি করে আর বই পড়ে। একব আছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে বাংলা ডিপার্টমেন্টে সাহি নির্মলেন্দু চক্রবর্তী এসেছিলেন। আমি মনোহরকে খবরটা দিয়ে সে দু'খানা নতুন বই কিনে নির্মলেন্দু চক্রবর্তীকে দিয়ে সই করি সেই থেকে আমার উপর বিরাট ভরসা। কাছে যেতেই একগাল বলল, "আরে শ্রীকান্তদা, আসেন আসেন। কী খাবেন? ছোট না কিং সাইজ়?"

অরিত্র বলল, "মনোহরদা, আজ বিড়ি।"

আমরা দু'জনে দুটো বিড়ি ধরালাম। অরিত্র এক টান মেরে বল "মাঝে-মাঝে বিড়ি খেতে খুব ভাল লাগে। সিগারেটের ধোঁয়া শুকনো। আর বিড়ির ধোঁয়া হাইড্রেটেড। ফুসফুসে গেলে ভাল ফিলিং হয়।"

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুম।"

অরিত্র বলল, "হাই তুলিস কেন? কাল রাতে ঘুমোসনি?"

"নাহ্‌। কাল সারা রাত বাইরে হাঁটাহাঁটি করে কাটিয়েছি।"

"ভাল। খুব ভাল। কিন্তু তাই বলে হাই তুলতে হবে? আমিও সারা রাত বইয়ে মুখ গুঁজে কাটিয়েছি। আমাকে হাই তুলতে দে

"না।"

"তা হলে? নেক্সট টাইম থেকে আর হাই তুলবি না।"

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "ঠিক আছে, তুলব না।"

"আমি এখন আসি। গৌতম রিকশাওয়ালার বউয়ের খুব জ্বর, দিন। একবার সে-মুখো হব। মনে হচ্ছে টাইফয়েড। আজ হাস ভর্তি করাব। বিদায়," বলে অরিত্র আয়েশ করে বিড়িতে একট মেরে রওনা দিল।

আমিও রওনা দিলাম মেসের উদ্দেশে। আজ সারা দিন ঘুমোব। রাত্রিজাগরণের পর সারা দিন ঘুম। মহা আরামদায়ক। ঘর অন্ধকার করে ঘুমোতে হবে। এ হল মস্তিষ্ককে এক ধরনের বিভ্রান্তিতে ফেলা। আসলে দিন হলেও মস্তিষ্ককে বোঝাতে হবে এটা রাত। তার জন্য আয়োজন চাই। চাই দিনকে রাত করে ফেলার ক্ষমতা। প্রকৃতি সমস্ত জীবকুলকে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মে বেঁধে দিয়েছে। তার মধ্যে একটা হল সার্কেডিয়ান চক্র। এই চক্র অনুসারে আমাদের রাত্রে ঘুম পায় আর দিনে জেগে থাকতে ইচ্ছে করে। অবশ্য এটা আমরা নিজেরা 'ইচ্ছে' করে করি না। করে আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা জিন। জিন সূর্যের সঙ্গে সিনক্রোনাইজ়ড থাকে। ফলে জিনই রাত্রে ঘুম আনে, আবার সূর্য ওঠার সময় ঘুমও ভাঙায়। মানুষ তো ক্রীতদাস। আজ এই ক্রীতদাসত্ব থেকে



রাস্তার কুকুর থেকে অভিভাবকহীন গরু, সবার দায়িত্ব মাসি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। পাড়ার মেয়ে-কুকুর সন্তানবতী হলে, তার যত্নআত্তি মাসি একা হাতে সামলান।

মুক্তি। আজ বরং উলটো একটা ব্যাপার ঘটাব। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করব।

এসব ভাবতে ভাবতে আমি হেঁটে চলেছি। হাতে বিড়ি, নিভু নিভু করছে। আগুন জোরালো করতে আমি বেশ জোরে কয়েকটা টান মারলাম। লাল হয়ে জ্বলে উঠল বিড়িটা। আমি সাধারণত বিড়ি খাই না। কেমন যেন গন্ধ লাগে। কিন্তু আজ কেন জানি না ভাল লাগছে। শুধু যে ভাল লাগছে তা নয়। খুব ভাল লাগছে। সিগারেটের ধোঁয়াটা যেন সত্যিই শুকনো। বিড়ির ধোঁয়ায় কেমন যেন একটা জলীয় ভাব আছে। অরিত্রর ভাষায় 'হাইড্রেটেড'। ফুসফুসে বেশ ভাল ফিলিং আসছে। অরিত্রর কথা আমার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। আমার মস্তিষ্ক মেনে নিয়েছে বিড়ির এই বিশেষ 'গুণ'। ভাললাগা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। আমার এই এক ব্যাপার আছে! কোনও কিছু ভাল লাগতে শুরু করলে তা ক্রমশ ভাল লাগতেই থাকে। যেমন, এখন বিড়ি ভাল লাগছে। এই ভালবাসা নিয়ে মেসে পৌঁছে ঘুমোতে পারলে খুব ভাল হয়।

২

মহিলা বটে আমার বিন্দুমাসি! এমন মহিলা আমি জীবনে খুব দেখেছি। কম কেন বলছি, একেবারেই দেখিনি। উনি ইউনিক। বেগ তুমি যেভাবেই মাপো না কেন তা চিরকাল ইউনিকই থাক সেরকম বিন্দুমাসিকে যেভাবেই দেখা যাক না কেন উনিও ইউ থাকবেন। ওঁর একটাই শখ— খাওয়ানো। মানুষ এবং সমস্ত পেটপুরে খাওয়াতে পারলেই ওঁর যাবতীয় সুখ। বিন্দুমাসিকে শোনা যায়, "আসল সুখ কিসে জানিস? আসল সুখ হল ক্ষুধা খাওয়া দেখার মধ্যে। তোর খিদে পেলেই আমার কাছে চলে পাড়ার রাস্তার কুকুর থেকে অভিভাবকহীন গরু, সবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। পাড়ার মেয়ে-কুকুর সন্তানবতী যত্নআত্তির সব ভার মাসি একা হাতে সামলান। উনি বলেন, হয়ে মিতুর কীরকম নোলা বেড়েছে দেখেছিস?"

"মিতু কে? তোমার ভাইঝি নাকি?"

"ও মা, আমার ভাইঝি হতে যাবে কোন দুঃখে! তুই খুব ভাল জানিস আমার কোনও ভাই বা দাদা নেই। তা হলে ভাইঝি আ কোথা থেকে? ফাজলামি করছিস আমার সঙ্গে? ফাজিল ছেলে মিতু হল পাড়ার ওই মাদি কুকুরটা! তুই চিনিস না, তাই না? সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব একদিন। কেমন?"

"তা দিয়ো! কী নজরানা দিতে হবে তাকে?"

"তুই একটা চালচুলোহীন ছেলে। তুই আবার কী নজরানা দিবি বেচারার খুব কষ্ট যাচ্ছে। পেটে বাচ্চাগুলো কিলবিল করছে। হারে পেট ফুলেছে মনে হচ্ছে ছ'টার কম হবে না! এই সময় নোলা বাড়ে। পরম যখন আমার পেটে, তখন... মা গো মা... কী নোলাটাই না বেড়েছিল। মাটির হাঁড়িতে রাখা কেজি কেজি তেঁতুল খেয়ে শেষ করে দিয়েছিলাম। আমার শাশুড়িমা তো আগুন। কুকুরেরও যে তা-ই হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?"

আমি বললাম, "ঠিক ঠিক, হীরক রানি!" 'হীরক রানি' কথাটা করে বললাম। ওই 'ইতি গজ'-র মতো আর কী! মাসির কানে রক্ষে থাকত না।

বিন্দুমাসি আমার নিজের মাসি নন। মানে, নিজের মায়ের কো বোন নন। দুর-সম্পর্কেরও নন। উনি আমাদের ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কৃষ্ণস্যারের স্ত্রী। আমি কিছুদিন কৃষ্ণস্যারের ছেলেকে পড়িয়েছিলাম, যখন সে হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়ত। তখন থে আমার পরিচিত। আলাপ ক্রমে এমন জমে উঠল যে, আমি শে স্যারকে 'মেসো' বলতে বাধ্য হলাম। বাধ্য হলাম অবশ্য বিন্দু জন্যই। মাসির মতে, "স্যার হল দূরের সম্পর্ক। তুই এখন আম ঘরের ছেলে। তাই তোর স্যারকে মেসো বল। আমি তোর মাসি তোর স্যার তোর মেসোই হল, তাই না? হা হা হা।"

আমি হাই তুলতে তুলতে বলেছিলাম, "স্যার, স্যার থাকাই ভ মেসো-ফেসো হয়ে ওঁর লাভ নেই।"

মাসি বলেছিলেন, "আমার কথার উপর একদম কথা বলবি ন 'মেসো' বলতে বলেছি, বলবি। মুখে মুখে তর্ক করবি না। মুখে করা আমি একদম পছন্দ করি না।"

আমি আবার হাই তুলতে তুলতে বলেছিলাম, "এ যে একেবা হিটলারের মতো শোনাচ্ছে," বলে আমি হাতটা সামনের দিকে বলেছিলাম, "হাইল ম্যাডাম হিটলার!"

"থাপ্পড় মেরে তোমার তিনটে দাঁত ভেঙে দেব ফাজলামি করলে তারপর থেকে ওঁরা হয়ে উঠলেন আমার নিজের লোক। স্যার উঠলেন 'মেসো'। আমার শেষ ঠিকানা হল বিন্দুমাসি। দিন, রা সকাল, দুপুর— যে-কোনও সময়ে একবার ওঁর কাছে পৌঁছে হল। বিন্দুমাসি ভাতের থালায় ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত, সঙ্গে আর একহাতা ঘি দিয়ে বলবেন, "খা। চপচপ করে খা।"

আমি মজা করে বলব, "মাসি, তুমি টেবিল থেকে উঠে যাও

কারও সামনে খেতে আমার খুব খারাপ লাগে।"
মাসি বলবেন, "মারব এক থাপ্পড়। তোর খাওয়া না দেখলে আমার আরাম হবে না। এক কাজ কর, চোখ বুজে খা। আর না হলে ভাব তোর আশপাশে ত্রিসীমানায় কেউ নেই। হাসিস না, আমি হাসির কথা বলিনি। নে, খা তো!"
আমি চুপ করে খেতে থাকব। মাসি কথা বলার জন্য ছটফট করতে থাকবে। একমুহূর্ত কথা না বলে থাকতে পারে না এই মহিলা। মেসোর মতে 'মহা বাচাল মহিলা'! কথা বলার জন্য ছটফট করে করে কিছুক্ষণ পরে মাসি বলবে, "কী রে, কেমন লাগছে?"
"খাবার সময়ে আমি কথা বলা পছন্দ করি না।"
"আমার সঙ্গে একদম ইয়ার্কি করবি না! এক চড়ে তিনটে দাঁত ফেলে দেব। আবার হাসে!"
"সত্যি মাসি, তোমার হাতে যে কী জাদু আছে! সাধারণ একটা ডিমভাজার যে এত স্বাদ হয়, তা তোমার হাতের ডিমভাজা না খেলে কেউ বুঝতে পারবে না। ভাবছি তোমাকে একটা উপহার দেব।"
"তোর চালচুলো নেই। তুই আবার কী উপহার দিবি আমাকে?"
"ভাবছি তোমাকে একটা গাছ উপহার দেব।"
"তা দিতে পারিস। আমি টবে লাগাব। কী গাছ?"
"না, টবে লাগানোর গাছ নয়। একটা আস্ত বটগাছ। মহীরুহ।"
"তোর তো কোনও জমি-জায়গা ছিল না কোনওকালে। তবে বটগাছ এল কোথা থেকে? অন্যের গাছ জবরদখল করলি নাকি? এ ছেলে তো মহা ফাজিল! আবার দাঁত বের করে হাসিস কেন? আমি কোন হাসির কথাটা বললাম শুনি?"
"কারও গাছ জবরদখল করিনি। বটগাছটা সবসময় আমার সঙ্গেই থাকে।"
"তোর সঙ্গেই থাকে?"
"হুঁ।"
"একটা আস্ত বটগাছ?"
"হুঁ।"
"নাহ্। গরম পড়ার আগেই তোর মাথায় আবার বায়ু বেড়েছে দেখছি। রোদে ঘুরিস না। না হলে কবে দেখব রাস্তার মাঝখানে হাত তুলে ন্যাংটো যিশুবাবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস আর বাচ্চারা ঢিল ছুড়ছে।"
এমনই মানুষ আমার বিন্দুমাসি। ভগবান ওঁকে বানানোর সময় হিসেবে কিছু ভুল করে ফেলেছেন। মায়ার পরিমাণের হিসেবে ভুল। এত মায়া যে কারও মধ্যে থাকতে পারে, তা বিন্দুমাসিকে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। আমি আর-একটা জিনিসও দেখেছি, যাদের মায়ার পরিমাণ খুব বেশি, তাদের রাগের পরিমাণও বেশি হয়। বিন্দুমাসির বেলাতেও তাই। একবার রাগলে ওঁর মাথায় বালতি করে জল ঢালার উপক্রম হয়। তবে এই রাগের পুরোটাই সীমাবদ্ধ মেসোর উপর। মেসোর ভাষায় মাসি হল, "কঠিন মহিলা। অতি কঠিন মহিলা। আ ভেরি টাফ লেডি। আমি খুব কঠিন শিক্ষা দেব ওকে।"
আমি বলি, "কী শিক্ষা মেসো?"
মেসো থতমত খেয়ে বলেন, "সে খুব কঠিন শিক্ষা। এখনও ঠিক করে উঠিনি। কিন্তু দেব একদিন।"
আমি হাই তুলতে তুলতে বলি, "সেদিন কিন্তু আমাকে ডেকে নেবেন। আমি আপনার শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি দেখব। শিখে রাখব, যদি ভবিষ্যতে কাজে আসে।"
"রসিকতা কোরো না। আমি তোমার রসিকতার পাত্র নই। আমি তোমার গুরুজন সেকথা সবসময় মনে রাখবে। গুরুজনদের সঙ্গে রসিকতা করা উচিত নয়। আর, কী কাজে তুমি লাগাবে? তুমি কি সংসার করার কথা ভাবছ? ভ্যাগাবন্ডের আবার সংসার! এভাবে জীবনযাপন করে তুমি কী প্রমাণ করতে চাও বলো তো? হিপি হয়েছ সব, হিপি! অল হিপিজ়! নোংরা জামাকাপড় পরা, দীর্ঘদিন চুল না কেটে জটাধারী বাবা হওয়া, এসব কী? কোনদিকে যাচ্ছে আমাদের ইয়ং জেনারেশন? যাও, একবার তোমার ছাত্রকে দেখে এসো, কী হাল হয়েছে তার! মাস্টার্স
আছে আজ দু'বছর। নেট-এ বসছে আর নেট-এর জালে আ
যাচ্ছে। নেট যে সে আর উতরোতে পারবে না জানি। এই নি
হল। দু'বছর মানে চারটে নেট তার গালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে
টু লং ইয়ারস হি ফেলড অ্যান্ড ফেলড। এবারও তার কোনও
হবে না আমি জানি। কিন্তু ওই কঠিন মহিলা, মানে তোমার
চাইছে না। সিলি উওম্যান। তোমাকে আবার আমাকে 'স্যার'
'মেসো' বলা ধরিয়েছে! হোয়াট আ পিটি!"
আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ মেসো।"
মেসো জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে চাইলেন।
হাই তুলতে তুলতে বললাম, "মানে, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।"
কথা না বাড়িয়ে হাঁটা দিলাম। মেসো বলে উঠলেন, "ও কী?
কোথায়? বললাম যে তোমার ছাত্রকে একবার দেখে যাও।"
আমি দরজার কাছ থেকে বললাম, "পরে আসব মেসো। আ
এখন প্রচুর কাজ জমে আছে।"
মেসো নিজের মনেই বলতে থাকলেন, "হিপিদেরও কাজ থা
নাকি! যত সব পাগল-ছাগল আর মাথাখারাপ লোক জোটে
আমার কপালে।"
আমি বেরিয়ে সোজা হাঁটা লাগালাম। অন্তবিহীন সে যাত্রা।
কোথাও থামি না। কোথায় যেতে হবে জানি না। গন্তব্যের উ
চললে আমাদের হয় না। আমাদের যাত্রা হবে গন্তব্যহীন।

৩

চারিদিক বেশ শান্ত। মৃদু হাওয়া বইছে। আমি একটা বিশাল
তলায় বসে আছি। আমার চারপাশে গাঢ় ছায়া। মায়াময় ছায়
যেন আবেশ নিয়ে আসে। আমার পায়ের কাছে একটা টলট
পুকুরও রয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও তো কোনও পুকুর ছিল না
কীভাবে যেন চলে এল এক নিমেষে। সেই পুকুরে আবার ক
পানকৌড়ি ডুবছে আর উঠছে একটা করে সাদা মাছ মুখে নি
পরিষ্কার জলে আমি পা ডুবিয়ে বসে আছি। একটা ঠান্ডা অনু
আমার পা বেয়ে উঠে মাথা পর্যন্ত চলে আসছে। কেমন যেন
চোখ জড়িয়ে আসছে। জায়গাটা যেন অচেনা। আবার পরক্ষ
বলে মনে হচ্ছে। চেনা-অচেনা মিলেমিশে যাচ্ছে। আমার চারি
বটের ঝুরি নেমে এসেছে। একটা ঝুরি আমার ঠিক ঘাড়ের ক
দিচ্ছে। বেশ আমেজ আসছে। আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।
ভাব আসছে। হাওয়া একটু জোরালো হল। বটের ঝুরিটা আ
দিচ্ছে। একটা পানকৌড়ি আমার পায়ের খুব কাছে চলে এসে
করে সে উড়ে গেল। তার গায়ের জল ছিটকে আমার চোখেমু
আমি চোখ মেলে দেখলাম আমার মুখের সামনে একটা বীভ
ভয়ে 'ওরে গেলুম রে' বলে ডাক দেব কি না ভাবছি এমন স
আমার সামনে যেটা আছে ওটা আসলে একটা মুখ। অপরিচি
কিছু সময় গেলে বুঝলাম ওটা আসলে আমার বন্ধু ডোকরার
না বলে একটা হাঁড়ি বলাই ভাল। কালো হাঁড়ি। সেই হাঁড়িতে
চুলের ঝাঁক। ওর আসল নাম ডোকরা নয়— পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
কানা ছেলের নাম প্রায়শই দেখা যায় পদ্মলোচন। তেমনই এ
পূর্ণচন্দ্র! চাঁদের কোনও লক্ষণ বর্তমান নেই। শুধুই অমাবস্যা।
আর্ট কলেজের ছাত্র। মূর্তি তৈরিতে তার ব্যুৎপত্তি আছে। ব্যু
সে-রকমের নয়। ভগবান মনে হয় বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নি
প্রেরণ করেছেন। মিকেলাঞ্জেলো আর রামকিঙ্কর বেজ-এর প
প্রতিভা মনে হয় পৃথিবীতে আর আসেনি। ধাতব মূর্তি তৈরি
কাজ বলা হয়। সেই থেকেই ওর নাম হয়েছে ডোকরা। ধাতু
অন্যান্য মাধ্যমেও সে সুনিপুণ। মাটিতে হাত দিলে মাটিও প্র
বললাম, "হতচ্ছাড়া! দিলি তো সুন্দর স্বপ্ন ভাঙিয়ে! গাধা কো

ডোকরা উত্তরে কেবল ফোঁৎ করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। ডোকরা খুব কম কথা বলে। আর যদি-বা কথা বলে তা হলে চোখ বন্ধ করে বলে। চোখ বন্ধ করার কারণ হিসেবে বলে যে চোখে চোখ রাখলে সে নাকি কথা হারিয়ে ফেলে। কারণটা আমার বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। মাঝে-মাঝে মনে হয় আমিও চোখ বন্ধ করে কথা বলতে পারলে বেশ ভাল হত। চেষ্টাও করেছি কয়েকবার। বিশেষ করে মেসোর সঙ্গে। মেসো প্রায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছেন। তাঁর বাড়ি গেলে আবার একবার চোখ বন্ধ করে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ডোকরার দিকে তাকিয়ে বললাম, "জানিস, আমি স্বপ্নের মধ্যে ঘুমোতে যাচ্ছিলাম। খুব ইচ্ছে ছিল স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন দেখার। আমার অনেকদিনের ইচ্ছা।

সেই ইচ্ছা আজ প্রায় পূরণ হতে চলেছিল। তুই দিলি সব চটকে!"

আবার ফোঁত করে একটা শব্দ শুনলাম।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুম! কথা বল গাধা! চোখ বুজেই বল। খোলা রাখতে হবে না।"

জানি এরকম জোর করলে ডোকরা কোনও কথা বলবে না। ওকে সময় দিতে হবে। তার আগে সেলোটেপ দিয়ে চোখ বন্ধ করে দিলেও ও কথা বলবে না। চুপ করেই আছে। থাকবেও। ওর মনের মধ্যে কী খেলা করছে জানি না। ও নিজেও হয়তো জানে না। এই এক স্বভাব মনে হয় সব প্রেরিত মানুষেরই আছে। রবীন্দ্রনাথও হয়তো এরকম ছিলেন। জানি না ঠিক এরকমই ছিলেন কি না। তবে ডোকরা এরকমই।

বুঝলাম তাকে জিজ্ঞেস করে কোনও সদুত্তর পাওয়া যাবে না।

আমি তারপরেও জিজ্ঞেস করলাম, "খেয়েছিস কিছু সকাল থেকে?"

এবারেও চুপ। আমি উঠে পড়লাম। বললাম, "চল তোকে আগে খাইয়ে আনি।"

খাওয়ার জন্য যেতে হবে রবির হোটেলে। আমার তার সঙ্গে মাসোহারার চুক্তি। প্রতিদিনই প্রায় খাই। তবে চুক্তির টাকা কখনও দিই না। সে চায়ও না।



খাওয়ার জন্য যেতে হবে রবির হোটেলে। আমার তার সঙ্গে মাসোহারার চুক্তি। প্রতিদিনই প্রায় খাই। তবে চুক্তির টাকা কখনও দিই না। সে চায়ও না। আমি তার হোটেলে খেলেই তার তৃপ্তি।

আমি ডোকরাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা লাগালাম। ও কিছু না বলে চুপটি করে আমার পিছু পিছু চলল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। হাঁটার সময়ে সিগারেট আমার খুব প্রিয় জিনিস। আমি ডোকরাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, সিগারেট খাবি?" সে যথারীতি কিছু বলল না। আমি তার কাছ থেকে কিছু শোনার আশাও করি না আর। এখন কথা বলতে হলে নিজের মনে বলি। নিজের মনেই বলি আর নিজেই জবাব দিই। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম রবির হোটেলে। আমাকে দেখে রবির মুখের ভাবের তেমন কোনও পরিবর্তন হল না। আমি বললাম, "রবিদা কেমন আছ? খবর সব ভাল?" রবি হিসেবের খাতায় মনোনিবেশ করল। রবি এমনই। কম কথার মানুষ। আমি ডোকরাকে নিয়ে একটা টেবিলে বসলাম। রবি একসময় তার এক কর্মচারীর উদ্দেশে বলে উঠল, "এই হরে, শ্রীকান্তদাদের থালা গরম জলে ধুয়ে ওপরে কলাপাতা দিয়ে ভাত বেড়ে দে।"

হরে বলে কর্মচারীটি থালা ধুয়ে পরিপাটি করে আমাদের খেতে দিল। আমি গরম ধোঁয়া-ওঠা ভাতের থালা আর মাছের ঝোলের বাটি টেনে নিয়ে ডোকরাকে বললাম, "নে শুরু কর।"

ডোকরা কিছু না বলে খেতে শুরু করল। তার খাওয়া দেখে বুঝলাম কাল থেকে সম্ভবত সে কিছু খায়নি। তার খাওয়া দেখতে লাগলাম। ক্ষুধার্ত মানুষের খাওয়া দেখার মধ্যে একটা আরাম আছে। আমার বিন্দুমাসি ঠিক কথাই বলেন। আজ আমি সেটা খুব ভাল করে বুঝলাম।

হরে আমাদের খাওয়ার তদারকি করতে থাকল। তদারকি
অবিরাম বকবক করে চলা। হরে বলতে লাগল, "জানেন শ্রী
আজ আমাদের হোটেলে তেলাপিয়া মাছ হয়েছে। কে ধরেছে
আমি। সব মাছ আমি ধরেছি। কেষ্টসায়রের পুকুর থেকে। হা
ধরেছি। কোনও ছিপ বা জাল ব্যবহার করিনি।"

"বাহ্, বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো! জাল বা ছিপ ছাড়া মা
কীভাবে মাছ হাত দিয়ে ধরলে?"

"সায়রের ধারে যে-দমের ঝোপ আছে সেখানে শালারা ঝাঁ
থাকে। এই রে শ্রীকান্তদা, মাফ করে দেন! ভুল করে গাল দি
এই জিভ কাটছি আর কখনও হবে না।"

"কোনও অসুবিধা নেই। 'শালা' হল আদরের কথা, ওটা বে
গাল নয়।"

"থাক শ্রীকান্তদা, আর বলতে হবে না। আমি আর গাল দেব
হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওই দমের ঝোপে গিয়ে হাত দিয়ে খপ ক
হয়। ঝাঁকের মধ্যে থেকে একটা না একটা মাছ উঠবেই। তবে
কাঁটাও দেয়। এই দেখুন," বলে হরে তার হাত দুটো তুলে ধ
সামনে।

আমি দেখলাম লাল হয়ে কয়েক জায়গায় ফুলে আছে। বলল
তোমার ব্যথা করছে না?"

"হে হে হে। আমাদের আবার ব্যথা! কী
শ্রীকান্তদা। ও সব সেই ছোটবেলায় হতো
না। তবে এই হাত নিয়ে যখন উনুনের কা
তখন জ্বালা করে। একদিন কী হয়েছে শো
দমের ঝোপ নড়ছে। আমি খপ করে ধরল
বুঝলাম মাছ পেয়েছি। আনন্দে হাতটা জ
বের করে আনতেই দেখি, একটা মস্ত ঢোঁ
মাথা হাত দিয়ে ধরে তুলে এনেছি। মাথাট
ছিল বলে ব্যাটা কামড় বসাতে পারেনি।
মোক্ষম কামড়ে আমার হাত থেকে আড়
তুলে নিত। হে হে হে! যে-সাপের বিষ
কামড়ের জোর বেশি। এই যে শ্রীকান্তদা
তো কিছুই খাচ্ছেন না! আপনার বন্ধুর প
শেষ। দাঁড়ান, আর- এক পিস কড়া করে
তেলাপিয়া মাছ আপনাদের দু'জনকে দি
বলে, হরে আমাদের পাতে আরও একট
মাছ দিল আর ডোকরাকে জোর করে আ
খাওয়াল।

আমি বললাম, "হরে, তুমি কি জানো যে
একজন
অসাধারণ মানুষ?"

"আজ্ঞে কী যে বলেন! আমি গরিব মানুষ।"

"গরিব মানুষ কি অসাধারণ হয় না? এই নিয়ে কি কোনও
হয়েছে? যদি না-হয়ে থাকে, তা হলে এখনই কাউকে আইডি
হবে। তার থিসিসের নাম দেওয়া হবে 'আ সিস্টেম্যাটিক স্ট
রিলেশনশিপ বিটুইন পভার্টি অ্যান্ড কাইন্ডনেস অফ হিউম্যা
হিউম্যানিটিজের কোনও গবেষককে ধরতে হবে।"

"বাপ রে বাপ। কী সব শক্ত শক্ত ইংরেজি বলছেন শ্রীকান্তদ

"জানো হরে, তুমি একজন অসাধারণ লোক। কখনও সময়
তোমাকে আমার বটগাছটার তলায় একবার নিয়ে যাব। দু'জ
থাকব মায়া মায়া বটের ছায়ায়। হঠাৎ করে দেখবে কোথা থে
টলটলে শীতল জলের পুকুর চলে এল। দু'জনে পা ডুবিয়ে ব
পুকুরে পানকৌড়িরা খেলা করবে। তারপর উড়ে যাবে ডানা

"অ, তা সেসব বুঝি দেশের বাড়িতে?"

"উঁহু। সব এখানেই। সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। এটাই আমার দেশ।

"তোমার সব বুঝে কাজ নেই হরে। সব বোঝা ভাল নয়। যে-যত বুঝবে সে তত অসুখী। সুখী তারাই যারা কম বোঝে! তবে আমি তোমাকে একদিন ঠিক নিয়ে যাব!"

"তা যাবেন। ভালই লাগবে ছায়ায় বসে থাকতে। বসে বসে একটা বিড়ি খাব। হে হে হে।"

খাওয়া শেষ করে আমরা উঠলাম। রবিকে বললাম, "তা হলে আসি।"

রবি বলল, "আপনার পান রাখা আছে। তবে একটাই পান। দু'জন আসবেন সেটা তো জানতাম না। ভাগ করে খেতে হবে।"

আমি "কোনও ব্যাপার না" বলে পানটা নিয়ে অর্ধেকটা মুখে পুরলাম আর অর্ধেকটা ডোকরাকে দিলাম। ডোকরা নির্বিকার মুখে পান চিবোতে লাগল। আমি বুঝলাম এবারও সে নিজে থেকে কিছু বলবে না। আমরা হাঁটতে লাগলাম। প্রখর রোদ। কিছুটা আসার পর শুনলাম পিছন থেকে আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে। আমি পিছন ফিরে তাকালাম। রবি ডাকছে আর আমার দিকে হেঁটে আসছে। আমার কাছে এসে বলল, "শ্রীকান্তদা, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

আমি বললাম, "বেশ তো, বলো না।"

"কথাগুলো প্রাইভেট," বলে ডোকরার দিকে তাকাল।

আমি অগত্যা রবির সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে গেলাম আর মনে মনে আঁচ করতে থাকলাম কী বলতে পারে রবি। আমার ইনটুইশন বেশ ভাল। ভালভাবেই বুঝতে পারছি কী বলতে চলেছে রবি।

রবি বলল, "শ্রীকান্তদা! আপনাকে আমি অন্তর থেকে ভালবাসি। তাই আপনার খাওয়া নিয়ে কিছু কোনওদিন বলি না। মাসের পর মাস আপনি কোনও টাকাপয়সা দেন না। আমি তাও কিছু বলি না। কিন্তু এইসব বন্ধুদের ধরে ধরে আনলে আমি তো মুশকিলে পড়ব। আমি তো দানছত্র খুলে বসিনি! ঠিক কি না?"

আমি বললাম, "একদমই ঠিক।"

"তা হলেই বলেন! এরকম করা কি আপনার উচিত?"

আমি বললাম, "নাহ্, একেবারেই উচিত নয়।"

"যান, আসুন এবার। আর আমার কথাটা একটু মনে রাখবেন। আমার এ সময় আবার খদ্দেরের ভিড় থাকে। আপনার সঙ্গে বকবক করলে চলবে না।"

আমি ডোকরার সঙ্গে এগিয়ে চললাম।

"সিগারেট খাবি?"

ডোকরা কিছু বলল না। বলবেও না জানি। আমাদের মধ্যে কথাবার্তার সবটাই একতরফা। পুরোটাই আমি বলি। ডোকরা কেবল শোনে। আমি সিগারেট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে নিল। নিয়ে নির্বিকার মুখে টান দিতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে আমরা মোহনবাগান মাঠের পাশে পৌঁছে গেলাম। কড়া রোদে নেশা নেশা ভাব। আমি একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় বসলাম। দুপুর এখন। রাস্তায় কোনও লোক নেই। কৃষ্ণচূড়ার মগডালে একটা ঘুঘু বসে আছে। মাঝে-মাঝে বিষণ্ণ সুরে ডাকছে। সেই সুর পরিবেশকে আরও বিষণ্ণ করে তুলছে। আমি ডোকরাকে সময় দিচ্ছি। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে কিছু বলবে না। তাকে তার সময় দিতে হবে। ইচ্ছে হলে সে তার কথা আরম্ভ করবে। চোখ বুজে বলবে তার কথা। আমরা বসে আছি। বসেই আছি। ডানা ঝাপটে ঘুঘুটা কোথায় উড়ে গেল কে জানে, হয়তো তার প্রিয়জনের কথা মনে পড়েছে। হয়তো কোনও প্রাচীন ঘরের কার্নিসে তার বাসা। সেখানে হয়তো তার অপেক্ষায় কেউ আছে। অন্য সময় হলে আমি আমার বটগাছটাকে আনার চেষ্টা করতাম। চেষ্টা করতাম সেই পানকৌড়ি-ভরা পুকুরের শীতল টলটলে জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে। কিন্তু ডোকরার জন্য সেটা করা যাচ্ছে না। আমি অনন্ত অপেক্ষায় আছি কখন সে কথা বলে।

"আমার কিছু একটা হয়েছে। গত এক মাসে একটাও মূর্তি বানাতে পারিনি। হাত কাঁপে। মাথা কাজ করে না। চোখে অন্ধকার দেখি,"

তার চোখ বন্ধ। আমি তার দিকে তাকালাম। মুখে কিছু বললা
লেখকদের রাইটার্স ব্লক হয় শুনেছি। তখন তাদের মাথায় কি
না। তারাশঙ্কর থেকে বিভূতিভূষণ, হুমায়ুন আহমেদ থেকে ম
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেকের এরকম অবস্থা হয়েছিল শুনেছি। ত
রবীন্দ্রনাথের মনে হয় হয়নি কখনও। হলেও আমার জানা নে
কোনও শিল্পীর এরকম দশা হয় বলে শুনিনি। যা হোক, এই
ডোকরার অসুবিধে। তার চোখ ভিজে ভিজে লাগল। কোনও
কিছু মন থেকে চায় আর তা পূর্ণ হয় না, তখন মনে হয় এরক
আমি জীবনে কোনওদিন সেরকম কিছু চাইনি। আমাদের কিছু
না। কিন্তু ডোকরাকে আমি চিনি। তার অধ্যবসায় আমি নিজে
দেখেছি। সে তার জীর্ণ ঘরের চালায় যখন মূর্তি তৈরি করতে
তার মধ্যে দৈবশক্তি ভর করে। সে আর মানুষ থাকে না। রূপ
হয় প্রেরিত পুরুষে। এক অদ্ভুত আভা তার খালি গায়ে, কাে
বিরাজ করে। বিরাজ করে তার মুখমণ্ডলে। তার এখনকার মু
আমার খুব খারাপ লাগল। ছেলেটা সত্যিই খুব মনোকষ্টে আ
বসে গেছে গর্তে। সেই যে চোখ বন্ধ করেছে কথাগুলো বলার
এখনও খুলছে না। ব্যাপারটা ওর কাছে গুরুতর। আমারও গু
মনে হচ্ছে। শিগগির এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কী
যায়, যাতে তার 'আর্টিস্টস ব্লক' খুলে যাবে আর সে স্বমহিমা
মূর্তি গড়তে শুরু করবে?

তার হাতে নরম কাদার তাল বা বেঢপ ধাতু বাঙ্ময় হয়ে উঠবে
প্রাণ ফিরে পাবে! আমি বললাম, "তা হ্যাঁ রে, তোর এই অব
থেকে?"

স্বাভাবিকভাবেই সে কোনও কথা বলল না। তবে চোখ খুলে
যাক, বন্ধ চোখ খুলেছে। এবার তার বন্ধ রাইট হেমিস্ফিয়ারটা
হয়। আমি তার উত্তরের অপেক্ষায় বসে রইলাম। আবার এক
প্রতীক্ষা। আমি দুটো সিগারেট বের করে একটা ওকে দিলাম
ধরালাম। বুক ভরে ধোঁয়া টানছি। দেখি ডোকরাও টানছে। টা
আকাশের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে। অনেক দূরের
একটা উদাসী চিল উড়ছে। সেটা উড়তে উড়তে ক্রমশ বিন্দু হ
গেল। ডোকরা এখনও চুপ। আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।
হাই তুলতে থাকলাম। বটগাছটাকে আনব কি না ভাবতে থা
অনেকক্ষণ পর ডোকরা মুখ খুলল। কিন্তু চোখ বন্ধ রাখল, "
মাসখানেক আগে এক রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। ভাব
কিছু বানাই। উঠে বারান্দায় এলাম। সেখানে কাদার তাল ছিল
নিয়ে বানাতে যাব, এমন সময় মনে হল আমি কিছুই জানি ন
থেকে আমি একটিও মূর্তি বানাতে পারিনি।"

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "লোকে পরীক্ষার আগে
যায় শুনেছি। তুই তো দেখছি চিত্তির করলি। তোর আসলে ক
লেখক হওয়া উচিত ছিল। তাদের মাঝে-মাঝে রাইটার্স ব্লক হ
তারা কিছু লিখতে পারে না। তোর তো দেখছি 'আর্টিস্টস ব্লক
কথা কি আছে ডিকশনারিতে? না থাকলে আজই ঢোকানোর
করতে হবে। যাই হোক, খুব শিগগির কোনও এক রাতে আ
ঘুরে আসব। তুই তৈরি থাকিস," বলে আমি তার পিঠে হাত
"চল, বিকেল হতে চলল। আমাকে একবার স্টেশনে যেতে হ
সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। একবার তার সঙ্গে দেখা করে
হবে।"

আমি উঠে চলে আসতে লাগলাম। আর পেছন ফিরে তাকাল
আমাদের পেছন ফিরে দেখতে নেই। আমরা স্বপ্নের জগতের
লোককে স্বপ্ন দেখাব, নিজেরাও দেখব। কিন্তু কোনও বাঁধনে
না। ঠিক রামকৃষ্ণদেবের কথার মতো। পাঁকাল মাছ হতে হবে
পাঁকে থেকেও গায়ে কোনও পাঁক লাগবে না। আমি হাঁটতে
জানি, ডোকরা আমার জন্য রাতে অপেক্ষা করে থাকবে। আ

না যাই সে সারা রাত অপেক্ষা করবে। পরের দিনও যদি না যাই তাও সে অপেক্ষা করবে। তার মধ্যে আমার প্রতি একধরনের অন্ধ আনুগত্য দেখেছি আমি। যে-আনুগত্য সাধারণত মানুষের মধ্যে থাকে না। থাকে মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে। ডোকরার আনুগত্য আছে তার কাজের প্রতি আর আমার প্রতি। আর কারও প্রতি তার আনুগত্য আছে বলে আমার জানা নেই।

৪

আমি আজ এসেছি হাতকাটা বিশুর কাছে। সে আমার একান্ত ভক্ত। হাতকাটা বিশু আসলে খুব কুখ্যাত লোক। যৌবনে কতবার মানুষ খুন করে জেলে গেছে। এখন বয়স হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া ইস্তক তার খুব করুণ অবস্থা। বিশু স্টেশনের কাছে ভিক্ষা করে। একবার বোমা বাঁধার সময় একসঙ্গে অনেক বোমা ফেটে অনেক লোক মারা যায়। বিশু ভাগ্যের জোরে বেঁচে যায়। কিন্তু তার বাঁ হাতটা উড়ে যায়। আমাকে দেখে বিশু বলল, "আরে, শ্রীকান্তদা যে! কেমন আছেন?"
তার পাশে বসতে বসতে বললাম, "আমি ভালই বিশু। তুমি?"
বিশু খিকখিক করে হেসে বলল, "ভগবান যেমন রাখছেন! তবে খুব খারাপ না। ভিক্ষে করে দিনমান ভালই কাটে। রাতে একটু কষ্ট হয়, এই যা।"
আমি বললাম, "কিসের কষ্ট? মশা কামড়ায় বুঝি?"
"আজ্ঞে না। অন্য ধরনের কষ্ট।"
আমি বললাম, "তোমার হাত কাটার গল্পটা আর-একবার বলো। অনেকদিন শুনিনি।"
"কী যে কন শ্রীকান্তদা! কতবার কয়েছি সে গপ্পো! আপনের মন ভরে না! আপনি একটা মানুষ বটে!" বলে বিশু আরম্ভ করে।
"আমার তখন কতই-বা বয়স। তা ধরেন দশ-এগারো হবে। আমরা লোকোপাড়ার বস্তিতে থাকি। বাপ কে তা জানা নাই। মায়ের সঙ্গে থাকি। মাকে বাপের কথা শুধালে মা গোসা করে। কয়, 'বাপ লিয়ে কী করবি? আমি তো সব ধ্যান রাখছি। আমিই তোর মা, আমিই তোর বাপ। এই কথাটা মনের মদ্যে ঢুকিয়ে লে।' আমার সমবয়সিরা ইশকুলে যায়। আমি যাই না। কী হবে ইশকুলে গিয়ে! মা দিনরাত খেটে খেটে মরে। কোনও-কোনওদিন দেখি রাতের বেলায় মায়ের ঘরে লোক আসে। আমি দোরে ঘুমাই ক'টা কুকুরের সঙ্গে। লোক এলে মা তারে নিয়ে ঘরে ঢোকে, দোর দেয়। আমি কান করে থাকি। পুলাপান বয়সে খুবই কৌতূহল থাকে কিনা! কিছুক্ষণ পর মায়ের গোঙানির মতো শব্দ শুনতে পাই। তারপর মারের মতো শব্দ আসে। মা তখন আরও গোঙায়, কান্না শুরু করে।"
আমি বলি, "বিশু তোমার গল্পের এই অংশটা বাদ দাও।"
"হেঁ হেঁ। কী যে কন। শুনেন সব কথা। গপ্প শুনতে গেলে সব শুনতে হয়, কোনও অংশ বাদ দিলে চলে না। এটাই নিয়ম। না হলে গপ্পের টেস থাকে না। বিরস লাগে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এরকম করে কত রাত যে পার করেছি তার ইয়ত্তা নাই। ওই সব শব্দের মদ্যিখানে আমি কুকুরের সঙ্গে ঘুমাই। সেসব লোক কখন চলে যায় জানতে পারি না কোনওদিন। পরের দিন সকালে আবার সব আগের মতো চলতে থাকে," বলে সে কিছুক্ষণ চুপ করল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, "একদিনের কথা। সেদিন রাতের বেলা আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কত রাত জানি না। হঠাৎ করে মোদো লোকের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের ভেতর থেকে মায়ের চরম কান্নার শব্দ আসছিল। মা চিৎকার করছে আর সেই লোকটা লাঠি দিয়ে মাকে মারছে। আমি ঘরের আগল ঠেলে ঢুকে দেখি মা সম্পূর্ণ উলঙ্গ! আর সেই লোক মায়ের গায়ে লাঠির ঘা মারছে। আমার মায়ের ওপর খুব মায়া হল। কী করব ভেবে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু কিছু করতেই হবে। আমি ছুটে বের হলাম। চেঁচামেচি করলাম। তাতে সেই লোক আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বাইরে এসে আমাকেও গালি পাড়তে

লাগল, 'শুয়োরের বাচ্চা, চুপ করে থাক নইলে তোর আজ শ
বলে আমাকে লাঠি দিয়ে পিটতে লাগল। রাগে আমার মাথাখ
হয়ে গেল। রাগ যে কত চণ্ডাল সেদিন প্রথম বুঝলাম। সমস্ত
করে কাঁপতে লাগল। শালা, একটু আগে আমার মাকে মারছি
আমাকে মারতে আসছে! রাগে অন্ধ হয়ে তাকে মারার জন্য ধ
কিছু আছে কি না মরিয়া হয়ে খুঁজতে লাগলাম। কাছেই একটা
ছিল, হাতে ধরে দিলাম এক কোপ। কী জানি বাপ তখন আমা
কী চেপেছিল, শয়তান হয়তো, রাগে অন্ধ হয়ে কোপের পর
থাকলাম। বলতে থাকলাম, 'শালা তুই আমার মাকে মারবি?
মারবি? লে শালা কোপ খা।' প্রথম কোপেই কীরকম একটা
শব্দ পেলাম। তারপরের কোপগুলা দেওয়ার সময়ে কোনও শ
না। যেন জড়বস্তুতে কোপ মারছি। নরম বস্তু। মা ওর মারের
অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল ঘরে। আঁধার রাত। আর কোনও শব্দ
আমি আবার শুয়ে পড়লাম। খুব ঘুম পাচ্ছিল, ক্লান্ত লাগছিল।
একটা লম্বা ঘুম। সকালে উঠে দেখি উঠোন লোকে লোকারণ্য
লোক মরে পড়ে আছে। চারিদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে! সে কী দৃ
বিশাল কান্না জুড়ে দিয়েছে, 'ওরে আমার বিশু রে। এ তুই কি
রে। তোরে যে এবার পুলিশ লিয়ে যাবে রে। আমি তোরে ছাড়
বাঁচব রে।' কিছুক্ষণ বাদে পুলিশ এল। আমারে ধরে নিয়ে গেল
"জেল থেকে খালাস হলাম অনেক বয়সে। মা মরে গেছে। ব
বেদখল হয়েছে। কী আর করব, চোরের দলে ভিড়ে গেলাম।
অনেক বিদ্যার শিক্ষা পেতে লাগলাম। পকেট মারা, ছিনতাই,
মোলায়েম টানে জামাকাপড় ফাঁক করা...আপনি কি জানেন শ্রী
যে, বেলেড চালাতে হয় লম্বালম্বি। ট্যারা হলে হবে না। শুধু চা
কাটিবে, মাংস কাটিবে না। আপনাকে একদিন শিখিয়ে দেব।"
আমি বললাম, "বিশু, আর মানুষ খুন করেছ কখনও?"
"আজ্ঞে। আর-একটা করেছিলাম। ছিনতাই করার সময় খুব
বললাম চুপ কর শালা। সে কান দিল না। ধস্তাধস্তি করতে লা
মাথায় খুন চেপে গেল। আবার সেই চণ্ডাল রাগ উঠল। দিলাম
গলায় একটা পোঁচ। ধড়ফড় করতে লাগল মাটিতে পড়ে।
"আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়লাম। অনেক বচ্ছরের জেল।
বড় আরামের জায়গা শ্রীকান্তদা। বারবার যেতে ইচ্ছা করে। খ
চিন্তা নাই। যে-ঘরে থাকা সেই ঘরেই হাগা-মোতা। হে হে হে
বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই। খালাস পেলাম
অনেক বচ্ছর পর। তখন আমি বোমা বাঁধতে শিখছি। বোমা
দিই বিভিন্ন জায়গায়। একদিন হল কী, একটা নতুন পুলা এল
লাইনে। সে বোমা বাঁধাই শিক্ষার জন্য আমারে ধরল। তো নি
তারে চেলা করে। বেশ ভাল চলছিল। একদিন বোমা বাঁধছি।
সময় কারেন্ট চলে গেল। আমি তারে সাবধান করে দিলাম, এ
না নড়তে। শালার তাজা খুন, শুনবে কেন! যেই উঠেছে অমনি
বোমায় পা পড়েছে। কাছাকাছি অনেক বোমা ছিল। সব একস
গেল। সে কী শব্দ বাপ! তারপর আর কিছু মনে নাই। যখন জ্ঞ
দেখি আমি হাসপাতালের বেডে। আমার বাঁ হাত নাই। উড়ে
বোমায়। তারপর আবার জেল। বের হয়ে আমি ভিক্ষুক বনে
ভগবানের প্রতি মন দিলাম। সারা দিন এই রেল ইস্টিশনে বসে
লোকজন পয়সা দেয়। আমার চলে যায়।"
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "খুব ইন্টারেস্টিং। আজ উ
আমাকে আবার অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হবে।"
বিশু বলল, "আপনি যে কী শ্রীকান্তদা, আমি বুঝি না। আমাদে
ভগবান গুনে দিয়েছেন। সেই শ্বাসের সংখ্যা শেষ হলেই আম
যাব। কাজেই বেশি হাঁটাহাঁটি করে সেই শ্বাস কমানোর কী মা
আপনি অন্যরকম মানুষ। আপনার ক্ষেত্রে ভগবানের সব নিয়
না। আজ রাতে আমার সঙ্গে একটু খেতে হবে আপনাকে। চা
খাবেন। নিজে রাঁধি ইটের উনুনে। ভাত, আলুসিদ্ধ আর ডিমভ

হাতেই করি। অন্য হাত তো নাই। হে হে হে। ইচ্ছে থাকলেও উপায় নাই!"

আমি বললাম, "আচ্ছা, আজ আমি তোমার অতিথি। রাতে চলে আসব," বলে আমি রওনা দিলাম। হাঁটতে থাকলাম।

ভাবছি একবার মেসোর কাছে যাব। ডোকরার মতো চোখ বন্ধ করে তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে। দেখতে চাই তাঁর সহ্যের সীমা কতদূর। অথবা অরিত্রর বাবার কাছে যাওয়া যেতে পারে। তাঁর ধৈর্যেরও একটা ছোট পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। চোখ বন্ধ করে কথা বলা, বেশ ইন্টারেস্টিং হওয়ার কথা। একবার সুরঞ্জনার বাড়ির পাশ দিয়েও হেঁটে আসা যায়। আমি সুরঞ্জনাকে কোনওদিন বলি না আমার যাওয়ার কথা, তবুও কেন জানি না সে কীভাবে টের পেয়ে যায়। ঈশ্বর মেয়েদের কিছু বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। বিশেষ উদ্দেশ্যেই হয়তো। আমি গেলেই দেখতে পাই সে দাঁড়িয়ে আছে তাদের দোতলার বারান্দায়। একটা ছোট্ট টিপ পরে সে কপালে। তার কপালটা আমার কেমন যেন আকাশ আকাশ মনে হয়। আর তার সেই টিপ যেন সেই আকাশে চাঁদ। সে যখন চুল খুলে রাখে, তার লম্বা কালো চুলের ঢল যখন তার পিঠ বেয়ে নেমে আসে, আমার মনে হয় মেঘ করেছে। সুরঞ্জনার সঙ্গে আমার আলাপের সময়টা ছিল বড় অদ্ভুত। বলি সে ঘটনার কথা।

সেদিন ছিল 'গভীর হাওয়ার রাত'। আমি রাস্তায় হাঁটছি। রাত কত জানি না। আমার হাতে কখনও ঘড়ি থাকে না। সারা দিনের তীব্র গরমের পর সন্ধে থেকে গভীর হাওয়া উঠেছিল প্রকৃতির কোন অদ্ভুত খেয়ালে। তখন এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশ বেশ গরম। মারামারি, খুন-জখম চলছে। আমি হাঁটছি। বাতাসে বারুদের জোরালো গন্ধ পাচ্ছি। বুঝতে পারছি একটু আগেই এখানে অ্যাকশন হয়ে গেছে। পুলিশের একটা গাড়ি আমার পাশ দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল। কিছুদুর গিয়ে থেমে গেল। একজন পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে আমার কাছে এসে সপাটে একটা চড় বসিয়ে দিল। বলল, "এখানে ঘোরাঘুরি করছিস কেন? বোমা কোথায় রেখেছিস বের কর তাড়াতাড়ি।"

আমি বললাম, "আমি রাজনীতির লোক নই।"

পুলিশটা আবার চড় মারতে যাচ্ছিল। এমন সময় ওয়াকিটকিতে খবর এল পুলিশ লাইনের কাছে মারপিট লেগেছে। তাই ওরা আমাকে ছেড়ে গাড়ি নিয়ে রওনা দিল। সে যাত্রা বেঁচে গেলাম।

আমি আবার হাঁটা লাগালাম। কিছুদুর এগোতেই একটা গলির অন্ধকার থেকে কান্নার শব্দ পেলাম। একজন মেয়ের কান্না। এত রাতে কে কাঁদে? আমি জোরে বলে উঠলাম, "কে আছে ওখানে?"

কান্না থেমে গেল। এখন ফোঁপানির শব্দ পাচ্ছি। আমি আবার বললাম, "ভয় নেই। আমি রাজনীতির লোক নই। তুমি যেই হও, নির্ভয়ে বেরিয়ে আসতে পারো।"

অনেকক্ষণ পর সে বেরিয়ে এল। ভয়ে কুঁকড়ে। তাকে দেখে ভীত হরিণীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। এখনও কাঁপছে। আমি তাকে দেখে একটা ধাক্কা খেলাম। এত সুন্দর!

তারপর আমরা হাঁটা লাগালাম। এখন কোনও রিকশা বা অন্য কিছু নেই। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। কিছুটা হেঁটে সে ধাতস্থ হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কী? এই সময় কী করছিলে এখানে? এখন কেউ রাস্তায় বেরোয় একা একা?"

আমার এতগুলো প্রশ্ন শুনে মেয়েটি রীতিমতো থতমত। তার ওপর কিছুক্ষণ আগে হয়ে যাওয়া মারপিট। কোনও কথা তার মুখ দিয়ে বেরল না। সে চুপ করে মুখ নামিয়ে হাঁটতে থাকল। আমি তার উত্তরের অপেক্ষা করলাম না। জানি তার ভয় কাটতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। আমিও নিশ্চুপে হাঁটতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর মেয়েটি বলে উঠল, "আমার নাম সুরঞ্জনা," তারপর আবার চুপ করে হাঁটতে থাকল। তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে, মনে হল যেন একঝাঁক শঙ্খচিল উড়ে গেল। আমার মনে হল যেন বহুযুগের ওপার থেকে আমি ওই গলার স্বর শুনছি। দেখা হওয়ার আগে কিছু মনে ছিল না। কিন্তু দেখা হও কথা হওয়ার পর হঠাৎ করেই সব মনে পড়ে গেল। মনের কো থেকে উঠে এল সে স্মৃতি। এই স্মৃতি কি এ জন্মের? নাকি অপ আরও অনেক আগের জন্মের? আমার সবকিছু কেমন গুলিয়ে লাগল। নিজের নাম মনে করার চেষ্টা করতে থাকলাম। আমি মায়ার বাঁধনে পড়ে যাচ্ছি? বড় শক্ত এ বাঁধন। সুরঞ্জনার ক্ষীণ ভেসে এল, "এখানে টিউশন পড়তে এসেছিলাম।"

আমার সমস্ত কথা যেন কেউ কেড়ে নিয়েছে। চেষ্টা করেও কি আনতে পারছি না। একবার আড়চোখে দেখলাম তাকে। ঠিক রাজহংসীর মতো হাঁটছে এখন। কিছুক্ষণ আগের ভীত ভাব দু তা হলে কি তার আমার উপর কিছুটা হলেও নির্ভরতা এসেছে বলল, "আমি ইউনিভার্সিটিতে..."

এই সময় কোথা থেকে একরাশ কথার ঝাঁক আমায় পেয়ে বস আমার সেই বিখ্যাত ইনটুইশন। আমি তার কথার মাঝেই বলে "তুমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ো? তোমার বিষয় সম্ভবত ইংরেজি অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বললাম। কেন বললাম জানি না। বলিয়ে নিল আমাকে দিয়ে?

সুরঞ্জনার দিকে চেয়ে দেখি, সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আ দিকে। কী ছিল সে দৃষ্টিতে জানি না। কিন্তু সে দৃষ্টির কোনও তু কোনওদিন পাইনি। কথায় সে দৃষ্টির বর্ণনা করার সাধ্য আমার আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "তোমার বাড়ির লোক নিশ্চয় চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন।"

সুরঞ্জনা এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত। মেয়েদের এই এক ব্যাপার! কারও উপর নির্ভর করতে শুরু করলে, সেই নির্ভরতা উত্তরো পেতে থাকে। এবার সে নিজে থেকেই বলল, "হ্যাঁ, তা করবে আসতেই বারণ করছিল। কিন্তু আজ একটা জরুরি নোট নেও তাই চলে এলাম। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে বলল। আমিই তাকে চলে যেতে বললাম। ইচ্ছে ছিল বন্ধুদের সঙ্গে রি ফিরব। কিন্তু তার আগেই এখানে মারপিট শুরু হল।"

এবার একটা পুলিশের গাড়ি আমাদের সামনে এসে জোরে ব্রে গাড়ি থামতেই ভেতর থেকে অনেক পুলিশ নেমে এল। তার স একজন সুদর্শন পুরুষ। তিনি এসেই সুরঞ্জনাকে নিয়ে গাড়িতে ঠিক ছোঁ মেরে তুলে নিলেন যেন। তারপর গাড়িতে উঠলেন। তিনি সুরঞ্জনার বাবা। সুরঞ্জনা চেষ্টা করল তাঁকে কিছু বলার। তিনি কিছু শোনার অবস্থায় ছিলেন না। দেখতে দেখতে আরও পুলিশের গাড়ি চলে এল। তা থেকে অনেক পুলিশ নামল। সু বাবা তাদের কিছু বললেন। তারপর প্রথম গাড়িতে করে তাঁরা গেলেন। আমি পোড়া বারুদের গন্ধ যেন আরও বেশি করে পে দ্বিতীয় গাড়ির পুলিশেরা এসে আমার কলার ধরল। একসঙ্গে আমি বুঝতে পারছি বেশ জটিল একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে আগেই চড় খেয়েছি। এবার মনে হচ্ছে আরও কিছু খেতে হবে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে গাড়িতে তুলল।

আমি এখন বসে আছি বর্ধমান থানায়। বর্ধমান থানার সবচে ব্যাপার হল এর সামনে রাস্তার উলটোদিকে বিরাট একটা লাই আছে। লাইব্রেরি মানেই মন ভাল করা একটা ব্যাপার। আমি আসার পর আর চড় খাইনি। তবে অনেকরকমের গালাগালি পুলিশের মুখে গালাগাল অসাধারণ ব্যাপার। সে গালাগাল শু অবশ্য এই প্রথম নয়। বেশ কয়েকবার শুনেছি। কিন্তু সেসব গ ছিল অন্যদের উদ্দেশে। আজ নিজের উদ্দেশে শুনে আরও আ করলাম। চড়টাও খুব খারাপ লাগেনি তখন। বেশ অন্যরকম অনুভূতি। আমাকে বসিয়েছে ওসি-র রুমের বাইরে। ওসি-র রু ঢোকার জন্য একটা স্প্রিং লাগানো হাফ দরজা। তা ঠেলে কন

ঢুকছে-বেরোচ্ছে। কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। নিজেকে মনে হচ্ছে ক্রিমিনাল। একজন কনস্টেবল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আমি ডেকে বললাম, "স্যার, আর কতক্ষণে আমি ওসি সাহেবের দর্শন পাব?"
কনস্টেবলরা সাধারণত 'স্যার' ডাকে অভ্যস্ত নয়। সে 'স্যার' শুনে একটু খুশিই হল মনে হল। ফিসফিস করে বলল, "চুপ করে বসে থাকুন। আপনার বিরুদ্ধে মহিলা অপহরণের কেস লাগাতে বলেছেন। কাজেই চেঁচামেচি করবেন না। তা হলেই বিপদে পড়বেন।"
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুম। বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।"
কনস্টেবলটি কিছুটা অবাক চোখে তাকাল। পুলিশের চোখে বিস্ময় দেখে আমার বেশ লাগল। পুলিশ সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা ছিল তার পরিবর্তন হল। আমার ধারণা ছিল যে পুলিশরা ভাবলেশহীন হয়। তাদের বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা থাকে না। জটিল সব কেস দেখে দেখে তারা ক্রমে নির্লিপ্ত হয় যায়। কিন্তু এই কনস্টেবলের অবাক ভাব আমার সেই ধারণার পরিবর্তন করে দিল। আমি বললাম, "স্যার, শুধুই কি মহিলা অপহরণের কেস? নাকি সঙ্গে অন্য কিছুও ফ্রি দেবেন বলে মনস্থির করেছেন আপনার ওসি সাহেব?"
বলল, "ফাজলামি করবেন না। পুলিশ বড় কঠিন জিনিস একথা জানা নেই? এখন চুপ করে বসে থাকুন," বলে সে চলে গেল নিজের কাজে। আমি চুপ করে বসে থাকলাম। ভাবছি একটা সিগারেট ধরালে কেমন হয়। মন্দ হবে না।
কিছুক্ষণ পরে আবার একটা গাড়ি এসে থামল। বেশ কয়েকজনকে নামানো হল। তাদের মধ্যে একজনকে আমার পাশে বসানো হল। বাকিদের সরাসরি লক-আপে চালান করা হল। লোকটিকে দেখলাম একপলক। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি সাধারণত মানুষকে ভড়কে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু এই লোকটা তার হাসি দিয়ে আমাকেই ভড়কে দিল। কিছু একটা ছিল তার হাসিতে। যা তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে দিচ্ছিল না। সে হেসেই যাচ্ছে।
কিছুক্ষণ পর সে আমাকে হাসিমুখে বলল, "ভাই, ভাল আছেন? অধমের নাম রাখহরি দত্ত। ছোটখাটো ব্যবসা করি। তা আপনি কী কেসে? খুন না রাহাজানি?"
হাই তুলতে তুলতে বললাম, "মহিলা অপহরণের কেসে। আপনি?"
সে একটু নাক কোঁচকাল। বলল, "ছ্যাঃ। শেষে কিনা মহিলা। মশাই আপনি ডোবালেন দেখছি। খুন নয়, জখম নয়, মারপিটও নয়, শেষে কিনা মহিলা অপহরণ? ছ্যাঃ ছ্যাঃ। কী আছে মহিলাদের?"
"থাক। আর বলতে হবে না।"
"আমি মশাই বেশ সরেস একটা কেসে এসেছি। মাঝে-মাঝে পুলিশের দর্শন করা ভাল। পাপক্ষয় হয়। সারা জীবনে কত পাপ করি বলুন দেখি? সেগুলো খণ্ডনের ব্যবস্থাও করা দরকার। ঠিক কি না?"
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "ঠিক ঠিক।"
সে অনর্গল বলে চলল, "তা মশাই এবারে আমি আমার তৃতীয় পক্ষকে মেরেই ফেলেছি। আগের দুটো বেঁচে নেই। তাই তৃতীয় পক্ষ। হ্যা হ্যা হ্যা," বলে সে হাসতেই থাকল। সেই অদ্ভুত বিচ্ছিরি হাসি। এতক্ষণ ধরে কোনও সাধারণ মানুষ হাসতে পারে? হাসি থামলে সে গলা নামিয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "মেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছি।"
আমি নিরুৎসাহ হওয়ার ভান করলাম। সে তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখতে থাকল এবং সেটা আমি তার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম। একেই বোধ হয় মানুষের সিক্সথ সেন্স বলে। আমি তার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি যে, সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সেই অদ্ভুত বিচ্ছিরি হাসি। আমি তার দিকে না তাকিয়েই বললাম, "তা হলে আগের দু'জনকেও কি..."
আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই সে বলল, "আপনি মশাই খুব বুদ্ধিমান। আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আসবেন আমার বাড়িতে কখনও," বলে সে আবার সেই হাসি হাসতে লাগল। এমন সময় ডাক

পড়ল ওসি-র চেম্বারে। ধীর পায়ে ওসি-র চেম্বারের দরজায় দাঁ
বললাম, "স্যার, আসতে পারি?"
ওসি চোখ না তুলেই বললেন, "আসুন।"
আমি গিয়ে তাঁর টেবিলের এ পাশের চেয়ারে বসে পড়লাম। তি
আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি কি তোকে বসতে বলে
হারামজাদা?"
আমি তৎক্ষণাৎ স্প্রিং লাগানো পুতুলের মতো উঠে বললাম, "
স্যার। এক্সকিউজ মি। না জেনে একটা ভুল করে ফেলেছি। এবা
ক্ষমা করে দিন। পরের বার এলে এরকম ভুল আর হবে না।"
তিনি চোখ লাল করে আমার দিকে তাকালেন, "ফাজিল ছোঁড়া
মুখে মুখে কথা, না? কেলিয়ে মুখ ভোঁতা করে দেব।"
আমি কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যেন কত বড় অপরা
ফেলেছি। ওসি সাহেব বড় কঠিন বস্তু মনে হচ্ছে। এঁকে সহজে
আনা যাবে না। মন বলছে বেশ বেগ পেতে হবে। তাঁর টেবিলে
করে টেলিফোন বেজে উঠল। তিনি টেলিফোন তুলে কানে লা
বললেন, "ওসি ইন্দ্রজিৎ মিত্র স্পিকিং।" তারপর ধড়মড় করে
থেকে উঠে প্রচণ্ডরকম হেলে পড়ে বলতে লাগলেন, "আজ্ঞে হ
না মানে, ওরা খুব গন্ডগোল করছিল। না না, আমি রাউন্ডে বে
কনস্টেবলরা তুলে এনেছে স্যার। না না স্যার, আপনাকে আর
আসতে হবে না। আমি ছেড়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার। অবশ্যই স্যার।,
ফোন রেখে সামনের টেবিলে রাখা কাচের গ্লাস থেকে ঢকঢক
খেলেন। হাঁক পাড়লেন, "বিজু সিং। ইধার আও।"
একজন কনস্টেবল এল। ওসি তার দিকে গলার পরদা খুব উঁচু
বললেন, "তোমরা কি আমাকে এক মিনিটও শান্তিতে থাকতে
না? কাদের তুলে এনেছ? এখনই ওদের ছেড়ে দাও। আমার চা
খাবে তোমরা?"
বিজু সিং বলল, "ওরা ঝামেলা করছিল স্যার। প্রত্যেকের কা
পিস্তল আর ছোরা ছিল।"
তাই বলে তুমি রুলিং পার্টির লোকেদের তুলে আনবে? গাধার
কোথাকার। এখনই ওদের গাড়ি করে যেখান থেকে তুলে এনে
নামিয়ে দিয়ে এসো। একচুলও যেন এধার-ওধার না হয়।"
কনস্টেবল বেরিয়ে যেতেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আগুন চো
বললেন, "হারামজাদা, নাটক দেখছিস? মজা পেয়েছিস? কী ন
মেরে পেছনের ছাল তুলে দেব। সারা জীবন বসতে পারবি না।
হারামজাদা কী কেসে এসেছিস তুই?"
আমি আমতা-আমতা করে বললাম (আবহাওয়া গরম দেখে হ
তুলতে বলার সাহস পেলাম না), "আজ্ঞে স্যার আমার নাম শ্রী
ওই মহিলা অপহরণের চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েছি।"
"কী? কী বললি? মহিলা অপহরণ? অপহরণ করে কী করবি?
মার্ডার? বল কী করবি? কী নাম বললি? শ্রীকান্ত? তোর নামে
কেস সাজাব না! ফাঁসি নিশ্চিত।"
আমতা-আমতা করে বললাম, "আজ্ঞে স্যার।"
"কী কাজ করিস তুই? স্মাগলিং, চুরি, ডাকাতি নাকি খুন?"
আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "আজ্ঞে একটু লোক ঠকা
জাতীয় কাজ করি।"
"হুম। দেখেই বুঝেছি তুই খুব সহজ বস্তু না। তোর চোখ থেকে
ঝরে পড়ছে। এ চোখ আমার চেনা। সারা জীবন এই চোখ নিয়ে
কাটিয়ে দিলাম। তা কী ধরনের লোক ঠকানোর কাজ করিস?"
আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "ওই ভুজুংভাজুং দিয়ে লে
বিভ্রান্তিতে ফেলে দিই।"
"বটে!"
"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। সবাই আমাকে কী করে যেন মেনে নেয়। মে
খুব ভুল কাজ করে। আমাদের মতো লোকেদের মেনে নিতে নে
"তা কী ধরনের ভুজুংভাজুং দিস লোককে?"

“আজ্ঞে স্যার একটু স্বপ্ন দেখাই। আর কখনও-সখনও একটু-আধটু ভবিষ্যৎও বলে ফেলি। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার, আমি ফরচুন টেলার নই। আমার চোদ্দোপুরুষ কোনওদিন ফরচুন টেলার ছিল না।”

ওসি সাহেবের তাৎক্ষণিক রাগ একটু কমেছে বলে মনে হতে লাগল। তিনি বললেন, “বুঝলাম। এই আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম। দেখে বল দেখি কী আছে আমার ভবিষ্যতে?”

আমি তাঁর হাত ধরে খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকলাম। তারপর তাঁর হেড লাইনকে দেখিয়ে বললাম, “আপনার আয়ু প্রচুর।” ফেট লাইনকে দেখিয়ে বললাম, “আপনার মাথায় প্রচুর বুদ্ধি।” আর মাউন্ট অফ ভিনাসে আঙুল রেখে বললাম, “আপনার চন্দ্রস্থান বলছে আপনার একটা টেলিফোন আসবে।”

বলতে বলতেই ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। ওসি সাহেব ফোন তুলে আবার বললেন, “ওসি ইন্দ্রজিৎ মিত্র স্পিকিং।” তারপরেই ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “কী বলেন স্যার! এ হে, বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি এখনই ব্যবস্থা করছি স্যার। না না স্যার, কোনও ভুল হবে না।”

আমি মশাই বেশ সরেস একটা কেসে এসেছি। মাঝে-মাঝে পুলিশের দর্শন করা ভাল। পাপক্ষয় হয়। সারা জীবনে কত পাপ করি বলুন দেখি?

ফোন রেখে ওসি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, “আরে মশাই, আপনি যে জজসাহেবের মেয়েকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিলেন তা বলেননি কেন? আহা রে, কতক্ষণ আপনাকে কষ্ট করে বসিয়ে রাখলাম। এই বিজু সিং! কোথায় গেলে, তাড়াতাড়ি চা নিয়ে এসো। এ কী আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন বসুন,” বলে তিনি নিজে এপাশে এসে আমাকে চেয়ার ঠিক করে দিলেন। আমি বেশ আরাম করে বসলাম।



বুঝতে পারছি এখন আমার বেশ খাতির চলবে। ওসি সাহেব হেঁ হেঁ করে বললেন, “আপনাকে দেখেই বুঝেছি যে, আপনি কোনও অপরাধ করতেই পারেন না। আপনার চোখ বলছে সেকথা। অপরাধীর চোখ অন্যরকম হয়। আমি চিনি সে চোখ। সারা জীবন এই চোখ দেখেই কাটিয়ে দিলাম! আমি আগেই বুঝেছি আপনাকে ভুল করে তুলে এনেছে। এই কনস্টেবলগুলো বড় কাঁচা। হেঁ হেঁ।”

আমি এবার হাই তুলতে তুলতে বললাম, “হুম। ভালই করেছেন। আচ্ছা, একটা সিগারেট পাওয়া যাবে?”

ওসিসাহেব পরম আদরে তাঁর দামি সিগারেট দিলেন। তারপর তা ধরিয়েও দিলেন। আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে সিগারেটে টান মারতে লাগলাম। মাঝে-মাঝে ওপরের দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে রিং বানানোর চেষ্টা করতে লাগলাম।

পুলিশ স্টেশন থেকে প্রায় জামাই আদর খেয়ে বেরোলাম। পেছনের ছাল উঠল না। গাড়িতে করে বিজু সিং আমাকে গোলাপবাগে ছেড়ে দিল। সেই ছিল আমার সঙ্গে সুরঞ্জনার প্রথম আলাপ। তারপর সুরঞ্জনা বহুবার আমাকে চিঠি লিখেছে। কতকিছুই না লেখা থাকত সে সব চিঠিতে। একজন মেয়ে যখন কোনও পুরুষকে পছন্দ করে ফেলে তখন সবকিছুর বাঁধ ভেঙে ফেলতে দ্বিধা করে না কখনও। সুরঞ্জনাও করেনি। একটা চিঠিতে লিখেছিল,

শ্রীকান্ত,

আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে এ জীবনে আমি তোমাকে পাব না। কোনও কারণ নেই এরকম মনে হওয়ার। কিন্তু আজ কয়েকদিন ধরে এরকম হচ্ছে। জানো, আগে তোমার দেওয়া স্বপ্ন আমি অনেক চেষ্টা করেও দেখতে পারিনি! সবাইকে তুমি স্বপ্ন দাও। আমাকেও দিয়েছ। কিন্তু আমার কেন জানি না সে স্বপ্ন দেখাতে কিছু একটা বাধা আসছিল।
স্বপ্নের কাছাকাছি গিয়েও সে স্বপ্ন আমি কখনও দেখতে পার
যখন তুমি লাইব্রেরিতে আমার সামনে এসে বসলে আমার ম
আমার সামনে আর কিছু নেই, ছিল না কোনওদিনও। সমস্ত
শুধু তোমার উপস্থিতি। তুমি আমার জীবনে এলিক্সির হয়ে এ
হঠাৎ করে তুমি আমার হাত ধরেছিলে। আমার সারা সত্তায়
অভূতপূর্ব শিহরন খেলে গেছিল। তখন তুমি বলেছিলে তোম
কথা। দিয়েছিলে সেই স্বপ্ন আমাকে। কিন্তু আমি কোনওদিনও
দেওয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারিনি। সেদিন সারা রাত অ
কথা ভেবেছি। ঘুম আসেনি। এক কঠিন ইনসমনিয়া আমাকে
ধরছে ক্রমাগত।

সেদিন ভোরের দিকে কখন যেন একটু চোখ লেগে গিয়েছিল
আমি বসে আছি এক অপার্থিব শান্ত জায়গায়। মনে হচ্ছিল
জগৎ। ক্রমে দেখলাম আমি বসে আছি এ
বটের ছায়ায়। কী ছিল সে ছায়ায় জানি ন
খুব মায়া জন্মাল তখন। মনে হতে লাগল
সবাই আমার সন্তান। তাদের আমি বুকে
আগলে রাখতে পারলে ভাল হয়। বটের
এসে আমার ঘাড়ে আলতো করে যেন হা
দিতে থাকল। তারপর দেখলাম একটা ঠা
পুকুর আমার সামনে এগিয়ে আসতে লা
পায়ের তলায় এসে থামল সেই পুকুর। অ
পুকুরের জলে ডুবে গেল। আমি আরামে
হয়ে পড়লাম। এত আরাম পৃথিবীর হতে
এ অন্য কোনও ভুবনের। সেই পুকুরের
মতো স্বচ্ছ। কয়েকটা পানকৌড়ি জলে অ
খেলা করতে লাগল। কয়েকটা পানকৌ
গেল আমার ওপর দিয়ে। তাদের পাখনা
পড়া জলের ছিটে আমার গায়ে পড়তে
হয়ে পড়লাম। তখনই দেখলাম দূরে এক
অস্পষ্ট, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন তাকে ক
কত যুগের সম্পর্ক যেন তার সঙ্গে আমা
ক্রমশ আমার কাছ থেকে দূরে চলে যে
আরও অস্পষ্ট হয়ে পড়তে লাগল। আমাকে কেমন যেন এক
করা কষ্টের অনুভূতি চেপে ধরল। সেই কষ্টের আবেশে মনে
আমি বেঁচে নেই। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তখন
সেই স্বপ্ন থেকে বেরোতে পারিনি। আমি নিশ্চিত জানি স্বপ্নের
একজন তুমি। তুমিই দেখিয়েছিলে আমাকে সেই স্বপ্ন। স্বপ্নের
তুমি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছ। আমার জীবন থেকে
অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছ। সেদিন আমি সারা দিন কেঁদেছি।
কোনও কারণ নেই তবুও কেঁদেছি। আমি জানি আমাকে সার
কাঁদতে হবে তোমার জন্য। এই ব্যথা নিয়ে বাঁচতে পারব না।
ব্যথা ছাড়াও বাঁচতে পারব না। এ তুমি কী করলে আমার স

সুরঞ্জনার চিঠি কখনও শেষ হয় না। শেষ হয়েও মনে হয় শে
সুরঞ্জনার চিঠি এলে আমি কখনও সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলি না
দিই আমার পকেটে। সবসময় সেই চিঠি বুকে নিয়ে ঘোরাফে
সুরঞ্জনাকে বুকে নিয়ে ঘোরাফেরা করি। আজ আর সুরঞ্জনার
পাশ দিয়ে গেলাম না। পথে পথে হাঁটতে লাগলাম।

৫

স্টেশনে পৌঁছলাম অনেক রাতে। আজ আমি বিশুর অতিথি
সামনে পলিথিন পেতে অনেক মানুষ ঘুমিয়ে রয়েছে। নক্ষত্র
আকাশের নীচে রাতের শিশিরের সঙ্গে মিশে ঘুমনোর মধ্যে
আলাদা অনুভূতি তো অবশ্যই আছে। নক্ষত্রের আলো কিন্তু

স্টেশন চত্বরের জোরালো আলো নক্ষত্রদের ঢেকে দিয়েছে। স্টেশনের মাথায় দিপদিপ করে জ্বলছে অতিকায় এলইডি ঘড়ি। প্রত্যেক সেকেন্ডে সে লাল বা সবুজ আলোয় ঢেকে ফেলছে স্টেশন চত্বরকে। আমি এসব ফেলে এগিয়ে গেলাম। বিশুর রাতের ঠিকানা হল স্টেশনের পাশে যে-গোডাউনগুলো আছে, তার কাছে কিছু পরিত্যক্ত বড় পাইপের একটায়। সেই পাইপের একটা দিক পলিথিন আর চটের বস্তা দিয়ে বন্ধ করা। তাতে একটা সরু জানলা। সামনের দিকে একটা চটের পরদার মতো আটকানো। ভেতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। চটের ফাঁক দিয়ে আলোর রেশ বেরিয়ে আসছে সুতোর মতো। নিঝুম রাত। ঝিঁঝির ডাকে পরিবেশ মুখর। এরকম বেশ কয়েকটা পাইপ আছে এখানে। প্রত্যেকটাতে একটা করে পরিবার থাকে। সেগুলোর একটা থেকে মাঝে-মাঝে একটা বাচ্চার কান্না ভেসে আসছে। বিশুর পাইপটা একটু ফাঁকা জায়গায়। তার চারপাশে বেশ ঝোপঝাড়। সেই ঝোপ থেকে ঝিঁঝিরা সমলয়ে ডাকছে। কী মধুর সেই কোরাসধ্বনি! চটের পরদা ফাঁক করে ডাকলাম, "বিশু জেগে আছ?"

"আজ্ঞে, আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনি বড় ভুলো মানুষ। জানতাম দেরি করবেন। তাই জেগে আছি।"

"ইচ্ছে করে দেরি করিনি।"

"আজ্ঞে তাও জানি। আসেন, এবারে খেতে বসি। বড় খিদে লেগেছে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

বিশু এক হাতে তার হ্যারিকেন বের করে আনল। একটা বাঁকাচোরা কালি-পড়া হাঁড়ি আর কিছু বাসনপত্র নিয়ে এল পাইপ থেকে। তারপর পরিপাটি করে গরম ভাত বেড়ে দিতে লাগল। ভাত বাড়তে বাড়তে বলতে লাগল, "আমি জানতাম আপনি দেরি করে আসবেন। তাই দেরি করে রান্না করেছি। তেমন কিছু জোগাড় করতে পারিনি। ঢ্যাঁড়শভাজা আর ডিমভাজা করেছি। আর অনুকূলকে বলে কিছু মাছ চেয়ে এনেছি। সামুদ্রিক মাছ, পচা পচা। কিন্তু ভাল করে ভেজেছি। খারাপ লাগবে না।"

বললাম, "অবশ্যই খারাপ লাগবে না। পচা মাছের সোয়াদ অনেক বেশি খোলতাই হয়। দাও দেখি। আমারও বড় খিদে পেয়েছে।"

বিশু বড় যত্নে তার রান্না করা খাবার আমার সামনে দিল। খাবারের অপূর্ব সুবাসে আমার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। গরম ভাতের মতো এমন জিনিস পৃথিবীতে নেই। আমি প্রাণভরে ঘ্রাণ নিতে থাকলাম।

আমরা খাওয়া শুরু করলাম। বিশুর হাতে সত্যিই ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে। খাবার এত স্বাদু হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। অমৃত কি এর চেয়েও ভাল? আমার মনে হয় না। পচা মাছের পদ যেন কোন সুদূর জগৎ থেকে স্বাদ বহন করে এনেছে। আমি বললাম, "বিশু, তুমি এ কী করেছ?"

"কেন? খারাপ হয়েছে?"

"ভালর অনেক ওপরে যদি কিছু থাকে তা হলে তা-ই হয়েছে।"

"কী যে কন! আমি গরিব, পাপী মানুষ। আমার রান্না কি ভাল হয়? অনেক পাপ করেছি। সাতজন্মেও সেসবের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তার ওপর আবার একটা হাত নাই!"

"আজকের এই রান্নাতে তোমার সব পাপ ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেল। তুমি এখন সম্পূর্ণ পবিত্র মানুষ। পাপের কোনও চিহ্ন আর নেই তোমার ভিতরে।"

খাওয়া শুরু হতেই একটা কুকুর পাশে এসে বসল। খুব আগ্রহ নিয়ে খাওয়া দেখছে। আমাদের হাত যখন ভাত মাখার জন্য থালায় নামছে, সে তখন নীচে তাকাচ্ছে, আর ভাতের গ্রাস যখন মুখে উঠছে তখন ওপরে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, "বিশু, এ কি তোমার কুকুর?"

"আজ্ঞে, ও সবার কুকুর। তবে কুকুর বলা উচিত নয় শ্রীকান্তদা। ওরে আমরা নিজের ছেলের মতো দেখি। এই এলাকার খুব প্রিয় ও।"

আমি বললাম, "আচ্ছা। তা কী নাম তোমাদের এই ছেলের? কালু, ভুলু না লালু?"

"আজ্ঞে ওসব নাম হল গিয়ে কুকুরের নাম। ও তো আমাদের বাচ্চা, তাই ওর একটা ভাল নাম আছে— হরিদাস। আমি আদর করে
বলে। হে হে হে।"

নিজের নাম শুনেই হয়তো কুকুরটা বিশুর দিকে চেয়ে লেজ
লাগল। বিশু বলল, "হরি দাঁড়া, তোর জন্যও ভাত রয়েছে।
খাওয়া হলে দিচ্ছি।"

আমি অবাক হয়ে দেখলাম হরিদাস এই কথা শুনে হাসছে।
মতো হাসছে। বেশ খিকখিক করে শব্দও হচ্ছে। অবাক চো
বিশুর দিকে তাকালাম। সে হেসে বলল, "হরিদাসের উপর
আশীর্বাদ আছে। ও মানুষের মতো অনেক কিছু করতে পা
এখন কেমন দাঁত কেলিয়ে হাসছে। আবার দুঃখ হলে কাঁদে
"সে কী, ও আবার কাঁদে নাকি?" আমি বেশ বিস্মিত হলা
"তবে আর বলি কী! ওর কান্না অনেকেই দেখেছে। সবই ও
আশীর্বাদ।"

আমি খাবারে মনোনিবেশ করলাম। দেখতে লাগলাম হরিদ
মায়াময় মুখ! বাঁকানো কান। আচ্ছা, আমার আজ কী হয়ে
মধ্যে এত মায়া দেখছি কেন? তা হলে কি আমিও আর পাঁ
মতো সাধারণ হয়ে পড়ছি? আমার তো সাধারণ হলে চলবে
আমাদের হতে হবে অসাধারণ। সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকতে হ
আমরা হলাম অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রেরিত কি? প্রেরিত
হয় আমার জানার খুব ইচ্ছে। কোনওদিন কোনও প্রেরিত ম
দেখতে কেমন হয় জানি না। না, ভুল বললাম, প্রত্যেকেই
মানুষ দেখেছে। সেই মানুষ হল মা। মায়েরা কোনও সাধার
ঈশ্বরের এক অদ্ভুত সৃষ্টি হলেন মা। তাঁদের প্রেরণ করা হয়
প্রকৃত প্রেরিত মানুষ।

"খাওয়ার সময় এত ভাবনাচিন্তা করা উচিত নয় শ্রীকান্তদা
গিয়ে ওপরওয়ালার দান। তাকে সম্মান করতে হয়।"

"বিশু তুমি মাঝে-মাঝে বড় ভাল কথা বলো। মনটা খুশিতে
ওঠে।"

আমি আর কথা বললাম না। খেয়ে উঠে পড়লাম। বিশু উঠে
করে হাত ধুল। আমি বসে বসে সব দেখলাম। তারপর সে
পাইপঘর থেকে একটা ছোট হাঁড়ি বের করে সবটা ভাত এ
ঢেলে হরিদাসকে দিল। হরিদাস আনন্দে তা খেতে লাগল অ
লেজ নাড়তে লাগল।

সব শেষ করে বিশু বলল, "আজ আপনি এখানেই ঘুমোবে
আপনার শোওয়ার ভাল ব্যবস্থা করেছি। আপনি শোবেন ও
পাইপে। খোঁড়া কার্তিক আজ নাই। ওটা ওরই ঘর। আপনি
ঘুমোবেন। ওটা হল দোতলা ঘর।"

আমি তাকালাম কার্তিকের ঘরের দিকে। নীচে দুটো পাইপ
রাখা আছে। তার ওপরে আর-একটা পাইপ। সেটাই দোতল
লাগছে। আমি বললাম, "অতি উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু চলো,
খোলা আকাশকে ছাদ করে শুই। নীচে নরম ঘাসের বিছানা
ওপরে অসংখ্য নক্ষত্র ভরা আকাশ। কী, ভাল হবে না?"

"আপনি বললে ভাল না হয়ে যায়! অবশ্যই ভাল হবে। চলু
আমরা আকাশের নীচেই ঘুমোই।" বলে বিশু আমার জন্য
ব্যবস্থা করতে তৎপর হল। একটা চাদর আর-একটা বালিশ
দিল ঘাসের ওপর। নিজের জন্যও একই ব্যবস্থা করল। আম
পড়লাম। চোখের সামনে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি জেগে আছে।
পড়েছিলাম কোনটা যেন সপ্তর্ষিমণ্ডল, কোনটা যেন কালপু
যেন শুকতারা, কোনটা ধ্রুবতারা। আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে
সব চেনা তারারা মিলেমিশে যেতে লাগল। সপ্তর্ষিমণ্ডল, ক
শুকতারা, ধ্রুবতারা মিলেমিশে একটা মোটা জ্বলন্ত পিণ্ড হ
তারপর সেই পিণ্ড আস্তে আস্তে ছোট হতে লাগল, আরও
লাগল। ছোট থেকে ছোট হতে হতে একসময় বিন্দু হয়ে মি

অন্ধকারে। পিণ্ডটাকে আমার মনে হল গ্রামের দুপুরে পুব আকাশে উড়ন্ত একটা চিল। সেই চিল যেন দিগন্তরেখায় মিলিয়ে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। পাশ থেকে গোঙানির শব্দে জেগে উঠলাম সহসা। দেখলাম বিশু চাপা গলায় গোঙাচ্ছে। আমি তাকে ঠেলে তুলে বললাম, "বিশু কী হয়েছে? কোনও কষ্ট হচ্ছে নাকি?"

বিশু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ফিসফিস করে বলে উঠল, "শ্রীকান্তদা, আমি পাপী মানুষ। এই কষ্ট আমার পাওনা।"

আমি বললাম, "কীরকম কষ্ট হচ্ছে তোমার?"

"এ কষ্ট এ দুনিয়ার নয়। অন্য দুনিয়ার," বলে সে চুপ করে গেল। আমিও কিছুক্ষণ কোনও কথা বললাম না। দেখলাম বিশুর মুখ কষ্টে বেঁকে যাচ্ছে। ওকে সামলে নেওয়ার সময় দিলাম। অনেকক্ষণ পরে মনে হল সে একটু সামলে উঠল। তারপর আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "জীবনে অনেক পাপ করেছি। বদলা নিচ্ছেন ঈশ্বর।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলতে লাগল, "বড় ব্যথা হয় আমার বাদ যাওয়া বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকি। কিন্তু এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায় নেই। হাতই নেই তো সে হাত চুলকোব কী করে? অথচ সে ব্যথা যে কী কষ্টকর, নিজের না হলে বোঝা শক্ত।"

আমরা চুপচাপ শুয়ে আছি। কখন একটু ঘুম এসেছে জানি না। কাছাকাছি কোথাও মেয়েলি হাসির শব্দে আমি জেগে উঠলাম। তাকালাম বিশুর দিকে। দেখলাম সেও জেগে উঠেছে। ফিসফিস করে বলল, "পাপড়ি আবার খদ্দের পেয়েছে।" বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আমার কানে সেই হাসির একটা রেশ রয়ে গেল। কল্পনায় দেখলাম একটা কুঁড়েঘর। সেই ঘর থেকে একইরকম হাসির শব্দ ভেসে আসছে। তবে সে শব্দ ক্ষীণ। তার বাইরে একটা চৌকিতে ঘুমোচ্ছে একটা ছোট ছেলে। দশ-বারো বছর বয়স হবে। হাসির শব্দে কি তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে? তার পাশে দেখলাম একটা কুকুর শুয়ে আছে। ছেলেটার মুখটা অবিকল বিশুর মতো। বুঝতে পারলাম আমার তন্দ্রায় বিশুর গল্প কাজ করছে। অবচেতন থেকে ওর গল্পের প্লট বেরিয়ে আসছে। আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। উঠে নিশ্চুপে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক হাঁটাহাঁটি করব আজ সারা রাত। আজও 'গভীর হাওয়ার রাত', 'অসংখ্য নক্ষত্রের রাত'। মনে পড়ছে জীবনানন্দের কবিতা:

'সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল— আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসরপ্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;'

আজ সারা রাত হাঁটব এই নক্ষত্রখচিত রাতে। রাতের শহর বড় বিচিত্র। রাত শহরের চরিত্র পরিবর্তন করে দেয়। চেনা পরিবেশকেও লাগে অচেনা। রাতের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তবেই রাতের শহরকে বোঝা যায়। আমি হাঁটতে লাগলাম। আমাদের কোথাও থামতে নেই। দেখতে নেই পেছন ফিরে।

৬

দারুণ গরম। বাইরে রোদ যেন পৃথিবীকে ঝলসে দিতে চাইছে। সামনে একটা একচিলতে টিনের ঘর। সেই ঘর থেকে গুনগুন করে গানের সুর ভেসে আসছে। কী গান বোঝা যাচ্ছে না। তবে সুরটা মন হরণ করে নিচ্ছে। কে গাইতে পারে এমন গান? তার গলায় নিশ্চয় স্বয়ং সরস্বতী আছেন। ছোট্ট ঘরটার সামনে একটা আমগাছ। উঠোন পেরিয়ে একটা দরজা। ঘরের বাইরে রান্নাঘর। এটিও খুব ছোট। রান্নাঘরের কাঠের উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপানো। হাঁড়ির গায়ে কালো হয়ে কালি পড়েছে। হাঁড়ির মুখে একটা স্টিলের থালা চাপানো। সেই থালা কাঁপছে ফুটন্ত ভাতের সঙ্গে। ভাতের ফেনা উঁকি মারছে হাঁড়ি থেকে। কিছুটা মাড় হাঁড়ির

কোনা থেকে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। গরম বাষ্প উড়ছে। গ
মনজুড়োনো মিঠে গন্ধে ম ম করছে ঘরময়। বঙ্কিমের 'আনন্দম
এরকম ভাতের বর্ণনা আছে। জুঁইফুলের মতো ভাত। পরিপাটি
নিকনো উঠোন। জীবানন্দ ভাগ্যবান পুরুষ যে এরকম ভাত খে
হাঁড়ি থেকে বেশ কিছুটা ফ্যান ছলকে উনুনে পড়ায় ছ্যাঁক করে
হল। সেই শব্দে একটি অপরূপা কিন্তু ক্ষীণকায়া মেয়ে বেরিয়ে
তাড়াতাড়ি থালা তুলে কিছুটা জল হাঁড়িতে ঢেলে দিল। তারপ
গেল ঘরের ভেতরে। ভেতরে দেখলে দেখা যায় একটা বিছানা
চৌকিতে পাতা। কিন্তু অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। পুরো ঘরটাই পরিচ্ছন্ন
ঘরে এত পারিপাট্য আসে কোথা থেকে? মাঝে-মাঝে প্রকৃতি
যেন বেহিসেবি চাল চালে। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে বই পড়
মেয়েটি। ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায় বইটা রবীন্দ্র রচনাব
মেয়েটি 'চোখের বালি' পড়ছে। পড়তে পড়তে তার মুখের রে
পরিবর্তন হচ্ছে। কখনও বিষাদের ছায়া নেমে আসছে মুখ জুড়ে
কখনও আনন্দে ঝলমল করছে। এরকম রূপ সচরাচর এই বা
যায় না। চোখ নীলাভ। তবে শরীর বাঙালিদের মতো সুললিত
বড় ক্ষীণা সে। মুখ পাণ্ডুর। মনে হয় অনেকদিন কোনও কঠিন
ভুগে ভুগে এই পাণ্ডুরতা এসেছে। কিন্তু এই পাণ্ডুরতা তার মধ
অসাধারণ মায়া লেপন করেছে। এ মায়া সেই মায়া যা একজন
সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট রাখে। এ মায়া সহসা অপত্য স্নেহের মা
একবার নীল চোখ তুলে তাকালেই সেই মায়ার বাঁধনে বাঁধা প
সকল জীবকুল। শরীরের বল কেড়ে নিয়ে হয়তো প্রকৃতি তাকে
প্রদান করেছে। কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে ডাক এল, "অনু মা
সব ঠিক আছে তো?"

মেয়েটি যেন এই ডাকের অপেক্ষায় ছিল। ছুটে বেরিয়ে এল।
আবার বলল, "মায়ের শরীরটা কি এখন ভাল?"

"হ্যাঁ, অনেক ভাল। বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি স্নান করে চলে এ
সব রান্না হয়ে গেছে। কেবল ভাতটা নামালেই হল। তুমি স্নান
ফিরতে ফিরতে হয়ে যাবে। তুমি এলেই আমরা দু'জনে খেতে
বলে আবার সে চলে গেল ঘরের ভেতরে। সেখান থেকে বেরি
ভাতের হাঁড়ি নামাল নিখুঁত পরিপক্ব হাতে।

নিমাই হেসে সরষের তেল মেখে স্নান করতে গেল পাশের পু
এসে দেখল অন্নপূর্ণা পরিপাটি করে খাবার বেড়ে অপেক্ষায় ব
নিমাইয়ের চোখটা ভিজে ভিজে হয়ে উঠল। একটা অসম্ভব মা
করল তার ওপর। এই মা-হারা মেয়েটিকে সে কী-ই বা দিতে
পড়াশোনাটা পর্যন্ত করাতে পারেনি। অথচ কী আগ্রহ মেয়ের
প্রতি! প্রত্যেক বইয়ের এক-একটা পাতা যেন গোগ্রাসে পান ক
বড়লোক বাড়িতে জন্মালে নিশ্চয়ই সে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে
এতদিনে। কিন্তু তার পোড়াকপাল। জন্মাল নিমাইয়ের ঘরে। চ
দোকান থেকে আর কতই-বা আসে? সংসার চালাতেই অবস্থ
তার ওপর আবার পড়াশোনা!

দু'জনে খেতে বসল। আয়োজন তেমন বেশি কিছু নয়। তবে স
স্নেহে পরিপূর্ণ। রান্না হল এমন একটি শিল্প, যাতে আনাজপাতি
চিনির চেয়ে মনের পরিমাণ লাগে বেশি। এখানে সেই মনের প
আরও অনেক বেশি আছে। কাজেই এ অন্ন যে অমৃত তা বলে
হবে না। অন্নপূর্ণা মুখ নিচু করে খেতে লাগল। নিমাই চেয়ে চে
লাগল তার মেয়েকে। ভাবতে লাগল, এত রূপ নিয়ে কেন এ
মা! আমাদের ঘরে তো এত রূপ আসার কথা নয়! কিন্তু কে ব
গরিবের মেয়েকে? ভাবতে ভাবতে খেতে লাগল নিমাই। এই
মুখ তুলে বলল, "বাবা, তুমি আমাকে নিয়ে ভাবনা থামাবে?
ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে। মিছে কেন ভাবছ?"

এই হয়েছে একটা ব্যাপার! অসুখের পর থেকে অনু যেন নিমা
মনের কথা বুঝতে পারছে। কোথা থেকে পেল সে এই শক্তি?
শরীর খারাপ হলে মন কি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে? সেদি

যেমন খেতে এসে নিমাইয়ের শরীরটা কেমন করে উঠল। ভাবছিল আর দোকান খুলবে কি না। সেই সময় অনু বলল, "আজ একটু বিশ্রাম নাও। কাল থেকে আবার দোকানে যাবে।" তাজ্জব বনে গেছিল নিমাই। এ কী করে সম্ভব! ভগবান কী লীলাখেলা খেলছেন তার সঙ্গে? তার মতো গরিবের সঙ্গে এসব খেলা কি ঠিক? গরিবের জীবন হবে সাদামাটা, কোনও বাঁক থাকবে না জীবনে। থাকবে না কোনও চমকে যাওয়ার মতো ঘটনা। কিন্তু কয়েকদিন ধরে নিমাইয়ের সঙ্গে এ কী হচ্ছে? অনুর একটার পর একটা বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। নিমাই অনেক চেষ্টা করেও বিয়ে ঠিক করতে পারছে না। এই তো আগের বারই একটা ভাল ঘর থেকে সম্বন্ধ এসেছিল। ছেলের নিজের একতলা পাকা বাড়ি, সেই বাড়িতে নিজের মুদিখানার দোকান। কিন্তু যা পণ হাঁকল তাতে নিমাইকে বিক্রি করলেও তা উঠবে না। বড় চিন্তায় নিমাইয়ের দিন কাটছে। মুদির বাড়িতেই সে মেয়ের বিয়ে ঠিক করতে পারছে না, আর শ্রীকান্তদা বলে অনুর নাকি বিয়ে হবে রাজপুত্রের সঙ্গে। নিমাই জানে শ্রীকান্তদা অসাধারণ মানুষ। যদিও পাগল ছাড়া আর কী! তবে সমস্ত পাগলামির পরেও তাকে কেন জানি না খুব ভাল লাগে নিমাইয়ের। ইচ্ছে করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে কথা বলতে। এটা সত্যি যে, শ্রীকান্তদা সকালে তার দোকানে চা খেলে তার সারা দিন ভাল যায়। এসব ভাবনার মাঝে অনু বলে উঠল, "শ্রীকান্তদার কথা ছেড়ে খাওয়ায় মন দাও বাবা।"

নিমাই প্রায় বিষম খেতে যাচ্ছিল। বলল, "মা রে, তুই কি আমার মনের কথা সব বুঝতে পারিস?"

"বাবা, তোমার মনের কথা আমি কী করে বুঝব? আমি কি দৈবক্ষমতার অধিকারী? কী যে সব বলো না তুমি!"

নিমাই আর কিছু বলে না। মন দিয়ে খেতে চেষ্টা করে। অনু বলে ওঠে, "তোমাকে বলেছি যে একদিন শ্রীকান্তদাকে নিয়ে এসো আমাদের বাড়ি। আমার কতদিনের ইচ্ছে আমি নিজে হাতে রেঁধে মানুষটাকে খাওয়াব। মেসে-টেসে থাকে। কোথায় খায়, কী খায় কে জানে!"

"সে কি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ রে মা! তার মধ্যে কিছু একটা আছে। আমি খুব বুঝতে পারি। সে মানুষকে ধরে-বেঁধে আনা খুব কঠিন। ওরকম মানুষেরা আসেও নিজের ইচ্ছেয় আর যায়ও নিজের ইচ্ছেয়।"

"তবুও তুমি কাল বলবে আবার। আমার মন বলছে বেশি দেরি করলে আমার সঙ্গে আর তার দেখা না-ও হতে পারে!"

"এ কী বলিস মা! শ্রীকান্তদার কথা খুব ফলে যায়। সে কী বলেছে জানিস? বলেছে কোনও মুদি নয়, তোর বিয়ে হবে এক রাজপুত্রের সঙ্গে।"

"বাবা, তুমি কি জানো তুমি খুব ভালমানুষ? আর একটু বোকাও। ভালমানুষেরা সাধারণত বোকা হয়। না হলে কি তুমি বিশ্বাস করতে যে, আমাদের বাড়িতে কোনও রাজপুত্র সম্বন্ধ নিয়ে আসবে?"

"সে তুই যা-ই বল মা। শ্রীকান্তদার কিছু একটা ব্যাপার আছে।"

"থাকতেই পারে। কিন্তু সেটা আমাদের বেলায় খাটবে না।"

"কেন এরকম বলছিস?"

"কিছু জিনিসের কোনও কারণ হয় না। তবে আমার কথাটা মনে রেখো। শ্রীকান্তদাকে একটিবারের জন্য আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসো।"

"সে চেষ্টা কি আর করি না রে মা! রোজ সকালে বলি একবার করে। কিন্তু ওই মানুষকে বলে কিছু হয় না। দেখবি, কবে ঠিক হুট করে চলে আসবে। এসেই বলবে কই অনু, আমার খুব খিদে পেয়েছে। কিছু চট করে খাওয়াও তো দেখি! হা হা হা।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিমাই একটু জিরিয়ে নিতে লাগল। অন্নপূর্ণা নিজের ঘরে গিয়ে আবার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পড়ল। নিমাই শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল কীভাবে সে অনুর বিয়ে দেবে। এখন তার ভাবনাচিন্তার এই একটাই বিষয়। বয়স বাড়ছে মেয়েটার। একটাও মনের মতো সম্বন্ধ আসছে না। যদিও কোনওটা পছন্দ হচ্ছে, পণের জন্য পিছিয়ে আসতে হচ্ছে। কী যে বিপদে পড়ল সে! এই বিপদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও উপায় তার মাথায় আসছে না। তবে কি অনু শেষে অনু... যাবে?

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুম এসে গেছে নিমাই টের পা... হঠাৎ তার খুব শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। একটা অব্যক্ত ব্যথায় বুকট... ছিঁড়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে খাওয়া ভাত যেন তার গলা... উঠে আসতে চাইল। সে চোখ মেলতে চেষ্টা করল। কিন্তু এক নি... অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী ঢেকে গেল। সে চিৎকার করে অনুকে ড... লাগল। কিন্তু মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোল না। একটা অদ্ভুত... শব্দ তার গলার ভেতর থেকে উঠে এল। হড়হড় করে পেটের ভে... থেকে সব খাবার উঠে আসতে লাগল। এক অচেতনতার গভীরে... তলিয়ে যেতে লাগল। জ্ঞান হারানোর আগে দেখল অনু হন্তদন্ত... আসছে তার কাছে। তারপর সব শূন্য হয়ে গেল।

৭

বেলা হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখি কম্পাউন্ডার বিরজাবাবু বসে... আছেন আমার ঘরে। মুখটা শুকনো। বিরজাবাবু হলেন অরিত্রর... কম্পাউন্ডার-কাম-সেক্রেটারি-কাম-সবকিছু। তাঁর অটুট বিশ্বাস... বিরজাবাবুর ওপর। বুঝলাম আবার অরিত্র কিছু কীর্তি করে বসে... কোনও নতুন কীর্তি করলেই আমার ডাক পড়ে। ওর বাবার দৃঢ়... ওর সমস্ত কাজের পেছনে আমার কোনও না কোনওভাবে হাত... অরিত্রর রাজ্যে সে রাজা আর আমি তার মন্ত্রী। মন্ত্রণা দেওয়াই... প্রধান কাজ। তিনি মাঝে-মাঝে চিঠি লিখে বিরজাবাবুকে আমার... পাঠান। চিঠির বিষয়বস্তু মোটামুটি একই থাকে। তার নমুনা নীচে... হল:

শ্রীকান্ত,

তোমার ভবঘুরে জীবন তোমার কাছে খুব লোভনীয়... থাকতে পারে। কিন্তু তোমার জীবনধারা যে সবাইকে গ্রহণ করতে... এমন কোনও কথা নেই। তবু এমনই হচ্ছে। তুমি খুব ভাল করেই... অরিত্র তোমার জীবনধারার প্রতি অতি উৎসাহী। তোমার সবকি... নকল করতে চায়। আর ওর এই চাওয়া থেকেই যত বিপত্তি।

তারপর অরিত্র কী কী কাণ্ড ঘটিয়েছে তার বিবরণ এবং সবশে... লিখেছেন:

পত্রপাঠ বিরজার সঙ্গে আমার কাছে চলে আসবে।

কখনও এর অন্যথা হয়নি। সেদিন ঘুম থেকে উঠে আমি চৌকিতে... রইলাম। কিছুক্ষণ বসে থেকে হাই তুললাম। হাই তোলার সময়... কাছে হাত এনে তুড়ি মারলাম। উঠে টেবিলে হাত বাড়ালাম। খো... আমার জন্য প্রতিদিন একটা করে ছোট নিমের ডাল নিয়ে এসে... ভাঙা টেবিলে রেখে দেয়। খোকনের মা আমাদের মেসের কাজে... আপাতত আমার দাঁতনের ব্যাপারে আসি। দাঁতন করার মধ্যে এ... স্বর্গীয় সুখ রয়েছে। দাঁতন করার সময়ে অদ্ভুত সব আইডিয়া আ... মাথায় আসে। সেদিন দাঁতন করছি অনেক দেরিতে উঠে, দেখি প... কুকুর ভুলু আমাকে দেখছে। আমাকে ঠিক নয়, আমার দাঁতন ক... প্রক্রিয়া দেখছে। বললাম, "কী রে ব্যাটা, করবি নাকি দাঁতন?"... ভুলু নিরুত্তর। হঠাৎ মনে হল, ভুলু তো কোনওদিন দাঁতন করে... একবার ওকে দাঁতন করালে বেশ হয়। ওকে ধরলাম। কিছু বলক... তারপর মুখে মধ্যে দিলাম নিমের কাঠি পুরে। কিছুক্ষণ অবাক... চেয়ে রইল ভুলু। তারপর দিল এক দৌড়। সেদিন থেকেই আমা... দেখলে আর আমার ধারেকাছে ঘেঁষে না। বুঝলাম নিমের দাঁতনে... স্বাদ ওর একেবারেই পছন্দ নয়। মনে মনে খুব কষ্ট পেলাম। ঠিক... করে রেখেছি ওকে একদিন জমিয়ে পেটপুরে খাওয়াব। সেই ইচ্... এখনও পূরণ হয়নি। দাঁতন সেরে আবার ঘরে এলাম। দেখি বির... একইভাবে বসে আছেন কাঠের চেয়ারে। আমি ঢুকতেই আমাকে...

চেয়ে দেখতে লাগলেন। বিরজাবাবুকে কোনওদিন বিস্মিত হতে দেখিনি। আমি নিজে এই ব্যাপারটা অনেকদিন ধরে অভ্যেস করার চেষ্টা করছি। এখনও পেরে উঠিনি। ঠিক সময়ে বিস্ময় চেপে ধরে আমাকে। নীল আকাশে সাদা মেঘের রাশি দেখে আমার মনে হয় হিমসাদা সজিনার ফুল—

'এখানে আকাশ নীল— নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা— রং তার আশ্বিনের আলোর মতন;'

অথবা নিশুতি মধ্যরাত্রে ঘোরাঘুরির সময়ে যখন শুনি কোনও গৃহস্থের বাড়ির ছোট বাচ্চার কান্না আর সেই সঙ্গে তার মায়ের সুর করে ঘুমপাড়ানি ছড়া:

'কে বলে রে আমার গোপাল বোঁচা,
সুখ-সাগরের মাটি এনে,
নাক করিব সোজা!
কে বলে রে গোপাল আমার কালো,
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করেছি আলো!'

এই গান শুনে আমার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না। তবে এত চেষ্টা করেও তো বিরজাবাবুর মতো হতে পারলাম না!

ঘরে এসে আমার নিস্পৃহ ভাব ধরে রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম। এটা এক ধরনের অভিনয়, যা আমরা সবাই সচরাচর করে থাকি।

"খুব সকালে বেরিয়েছেন দেখছি, খেয়েছেন কিছু?"

বিরজাবাবু চুপ করে রইলেন। ডোকরার সঙ্গে এখন এঁর মিল পাচ্ছি। কথা বললে যারা চুপ করে থাকে তারা সবাই ডোকরার গোত্রের। আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "চলুন আমার সঙ্গে। একসঙ্গে সকালের প্রথম চা খেয়ে আসি। চায়ের অনেক রূপ আছে। সকালের চা একরকম আবার বিকেল বা সন্ধের চায়ের রূপ অন্যরকম।"

বিরজাবাবু কিছু না বলে চুপচাপ আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। আমরা এগোলাম ধীর পায়ে। এবার বিরজাবাবু বললেন, "চিঠিটা পড়ে দেখুন।"

আমি বললাম, "চিঠি পড়তে হবে না। কী হয়েছে বলুন দেখি।"

"ছোটদাদাবাবু আবার পালিয়েছে। দু'দিন তার দেখা নেই। গিন্নিমা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। বড়বাবু খুব বিচলিত।"

"এত বিচলিত হওয়ার কী আছে? ও তো মাঝে-মাঝেই এরকম করে। আবার ফিরেও আসে।"

"তা ঠিক। কিন্তু এবারের ঘটনা একটু গুরুতর। বাড়ি ছাড়ার আগে ছোটদাদাবাবু-বড়বাবুর মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছে। ছোটদাদাবাবু আর কোনওদিন বাড়ি ফিরবে না।"

"এবারের ব্যাপারটা বেশ গুরুগম্ভীর দেখছি। তা কী নিয়ে ঝগড়া?"

"বড়বাবু ছোটদাদাবাবুকে বিয়ে নিয়ে ধরেছিলেন। তাতেই ছোটদাদাবাবু বিগড়ে যায়।"

"তা হলে ডাক্তারবাবু ছেলের 'রোগ' ছাড়াতে উদ্যোগী!"

"কী বললেন?"

"না, কিছু না। চলুন, নিমাইয়ের দোকানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চা আপনাকে খাওয়াব। এ চা রবি ঠাকুরের 'শেষের কবিতা'-র মতো।"

"আমার কবিতা ভাল লাগে না।"

"'শেষের কবিতা' আসলে কবিতা নয়। যাই হোক, কবিতা যে সবার ভাল লাগতে হবে এমন কোনও আইন নেই। সবাইকে পড়তেই হবে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, অমিয়, শক্তি...

'বুকের ভিতর কিছু পাথর থাকা ভাল— ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়
সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ওই পাথরের পাল একের পর এক বিছিয়ে
যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার, যেন ঢেউ, যেন কুমোরটুলির সালমা-চুমকি-জরি-মাখা প্রতিমা

বহুদূর হেমন্তের পাশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে

বিরজাবাবু বললেন, "আমার কোনও সন্দেহই নেই যে আপন
কিছু দোষ রয়েছে। বড়বাবু বারবার বলেন একথা।"
"হা হা হা। ঠিকই বলেন।"
আমরা হাঁটিতে হাঁটিতে চলে এলাম নিমাইয়ের চায়ের দোকানে
কাছাকাছি। বিরজাবাবুর সঙ্গে বকতে বকতে আজ আর প্রজাপ
আনা হল না। নিমাইয়ের দোকানে এসে দেখি দোকান বন্ধ। ত
অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরেও নিমাইকে দেখতে
বিরজাবাবুকে বললাম, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন। চা যখন
বলেছি তখন আপনাকে চা খাইয়েই ছাড়ব, আর নিমাইয়ের চ
খাওয়াব। চলুন, নিমাইয়ের বাড়ি কাছেই। ওর বাড়িতেই হানা
আমরা হাঁটা দিলাম নিমাইয়ের বাড়ির দিকে। বিরজাবাবু আমা
পেছন পেছন আসতে লাগলেন। আমরা পৌঁছে গেলাম আলম
কাছাকাছি। নিমাইয়ের বাড়ির খোঁজ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ
তার বাড়ি পাওয়া গেল। কিন্তু কেউ বাড়িতে নেই। খোঁজ নিয়ে
গেল গতকাল নিমাইয়ের খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। সম্ভবত
হার্ট অ্যাটাক জাতীয় কিছু। যে-বয়স্ক ভদ্রমহিলা বললেন তিনি
চললেন, "তোমরা কে বাবারা? নিমাইকে কীভাবে চেনো? সে
যমের সঙ্গে লড়াই করছে হাসপাতালে। মেয়েটার জন্য বড় কষ্ট
পাড়ার অনেকে গেছে।"
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কখন, কীভাবে, কী হয়েছিল?"
বুড়ি বলল, "আমি তেমন কিছু জানি না বাবারা। শেষদুপুরের
সবাই ছুটছে নিমাইয়ের বাড়ির দিকে। অনুর কান্নার শব্দ আস
ছুটে এসে দেখি নিমাই দুয়ারে পড়ে আছে, চারিদিকে বমি ছড়ি
মুখ দিয়ে গ্যাজলা উঠছে। অনু খুব কাঁদছে। পাড়ার সবাই মিলে
হাসপাতালে নিয়ে গেল।"
আমি বিরজাবাবুর দিকে চেয়ে বললাম, "আমি খুব দুঃখিত বি
আপনাকে আজ চা খাওয়াতে পারলাম না। এটা আপনার পা
থাকল। একদিন আপনাকে ডেকে চা খাওয়াব। আজ আমাকে
যেতে হবে।"
"কিন্তু বড়বাবুকে কী বলব? তিনি যে আপনাকে সঙ্গে করে নি
বলেছেন। আপনাকে না দেখলে তিনি খুব রাগ করবেন। একব
সঙ্গে চলুন। তারপর না হয় হাসপাতালে যাবেন।"
আমি বললাম, "ডাক্তারবাবুকে বলবেন যে খুব তাড়াতাড়ি অ
ফিরে যাবে। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। আর আমার মন ব
একটা নতুন কিছু নিয়ে অরিত্র ফিরবে। বিদায়।"
বলে, আমি হাঁটা দিলাম। জানি বিরজাবাবু অবাক হয়ে, কিছুট
হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন সেখানে। কিন্তু আমাদের সেসব দেখতে
আমরা কখনও পেছন ফিরে তাকাই না। কোনও মায়ায় আমর
বাঁধা পড়ি না। কিন্তু আমি কি তা পারছি? এই যে নিমাইয়ের
হাসপাতালে ছুটে যাচ্ছি, এর ব্যাখ্যা কী? পৃথিবীতে কার্যকারণ
কিছু হয় না। কিন্তু সবই কি কারণে ঘটে? এই বিষয়ে পল ডির
বিজ্ঞানী আর আইনস্টাইনের মধ্যে বিরোধ ছিল। প্রথম দলের
সম্ভাবনাময়, কার্যকারণের কোনও প্রয়োজন নেই। আর আইন
সারা জীবন বিশ্বাস করে গেলেন যে ঈশ্বর কোনওদিন পাশা

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের ইমার্জেন্সি ডিপ
পৌঁছে দেখি ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে। আমি গেটের
গিয়ে সিকিওরিটিকে বললাম, "ভাই, ভাল আছেন?"
লোকটা কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল।
দেখেছি সিকিওরিটি গার্ড, বড়লোকের গাড়ির ড্রাইভার, ম্যানে
এইসব লোকেরা খুব সন্দেহপ্রবণ হয়। সমস্ত কোয়ালিফিকেশ
সঙ্গে এটাও যেন আবশ্যিক। আমি নিজের জন্য কোনওদিন

পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখার বিজ্ঞাপন দিলে অবশ্যই মোটা অক্ষরে লিখে দেব 'সন্দেহবাতিক লোকেরা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন'।
আমি আবার মধুর করে হেসে বললাম, "ভাই কথা বলছেন না যে! ভাল আছেন?"
সে বলল, "এখন কোনওভাবেই ভেতরে যাওয়া যাবে না। কাজেই এসব করে কোনও লাভ নেই। যান এখান থেকে। কাজের সময়ে বিরক্ত করবেন না।"
আমি হাল ছাড়লাম না, দাঁড়িয়েই রইলাম। কিন্তু লোকটার শরীরী ভাষা বলে দিতে লাগল যে সে দমে যাওয়ার পাত্র নয়। তবুও আমি হাল ছাড়লাম না। নিমাইয়ের কাছে যেতেই হবে। মেসো হলে বলতেন, "আই হ্যাভ টু গো ইনসাইড অ্যাট এনি কস্ট।" আমি সেরকম কিছু বলছি না। কারণ, লোকটা আরও বিগড়ে যেতে পারে। আমি আবারও বলতে লাগলাম, "ভাই বাড়ির খবর সব ভাল তো?"
লোকটি আবার বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে রইল। পাশে পড়ে থাকা খবরের কাগজ নিয়ে খুলে বসল। আমাকে পাত্তাই দিল না। আমি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। মনে হচ্ছে কোনও লাভ হবে না। একটা সিগারেট ধরাতে পারলে ভাল হত। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। নিমাইয়ের চা না খেলে সকালটা ঠিক কাটে না। একটা সিগারেট অথবা বিড়ি ধরাতে পারলে খুব ভাল হত। হাইড্রেটেড ধোঁয়াযুক্ত বিড়ি। হাই তুলতে তুলতে সামনের লোকটাকে বলেই ফেললাম, "ভাই, একটা সিগারেট হবে?"
লোকটা আবার বিরক্ত হয়ে তাকাল। আমি বললাম, "বিড়ি হলেও ক্ষতি নেই। হাইড্রেটেড ধোঁয়ায় বেশ ভাল ফিলিং হবে ফুসফুসে। আছে নাকি ভাই?"
লোকটা এবার কেটে কেটে বলল, "আপনি বড্ড জ্বালাতন করছেন। এটা হাসপাতাল। এখানে ধূমপান নিষেধ। এখন ফুটুন।"
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুম।"
একবার ভাবলাম দিই একটা জমকালো ধমক। এরা সাধারণত খুব ভিতু হয়। বিশেষত কোনও বড় মানুষের পাল্লায় পড়লে এদের ভয়ের পরিমাণ অনেকগুণ বেড়ে যায়। তারপর মনে হল, নাহ্, ধমক-চমক করে কাজ নেই। এখন ফিরেই যাই। ভিজিটিং আওয়ারেই আসা যাবে। এই ভেবে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করেছি, এমন সময় শুনলাম খুব পরিচিত ক্ষীণ গলায় কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। ফিরে দেখি অরিত্র বেরিয়ে আসছে। আমার কাছে এসে সে তার পরিচিত ভঙ্গিতে পিঠে একটা পেল্লায় চাপড় দিয়ে বলল, "নিমাইদার অবস্থা ভাল নয় রে। চল দেখে আসবি," বলে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে চলল। আমি ঢোকার সময়ে সিকিওরিটি গার্ডের দিকে তাকালাম। দেখলাম সে আমাদের চুপ করে দেখছে। আমি ঢুকে গেলাম অরিত্রর সঙ্গে। চারিদিকে রোগীর ছড়াছড়ি। কারও হাত কাটা, কারও পা কাটা। কেউ প্যাকাটির মতো শুকনো। বীভৎস সব দৃশ্য চারিদিকে। বেশির ভাগ বেডে দু'জন করে কোনওরকমে শুয়ে আছে। বেডে যাদের জায়গা হয়নি তারা মেঝেয় পড়ে আছে। পা ফেলার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। বললাম, "চারিদিকে কী অবস্থা রে অরিত্র!"
"এ তো কিছুই নয়। অবস্থা আরও খারাপ হয়। এখন তাও কিছুটা ফাঁকা দেখতে পাচ্ছিস। এত ফাঁকা কখনওই থাকে না।"
বলতে বলতে মেঝেয় পড়ে থাকা রোগীদের কোনওরকমে ডিঙিয়ে আমরা তিনতলায় চলে এলাম। অরিত্র একটা কেবিনে নিয়ে গেল। দেখলাম সেখানে নিমাইদা শুয়ে আছে। চারিদিকে অসংখ্য তার আর পাইপ বেরিয়ে বিভিন্ন মেশিনের সঙ্গে নিমাইদাকে সংযুক্ত করেছে। বিচিত্র সব ক্যাঁক-ক্যাঁক জাতীয় শব্দ হচ্ছে। নিমাইদার বেডের পাশে একজন রুগ্‌ণ কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। আমরা ঢুকতেই সে তার বড় বড় আয়তনেত্রে তাকাল। মুখে কিছু বলল না। আমি অরিত্রর দিকে তাকাতেই সে মাথা নাড়ল। বুঝলাম মেয়েটি

নিমাইদার মেয়ে অন্নপূর্ণা। এ-ই সেই মেয়ে যে-নিমাইদাকে 'জী মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' গানটা গেয়ে শোনায়। আমরা কিছুক্ষণ সেখানে থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এসে অরিত্রকে বললা
"সকালে বিরজাবাবু এসেছিলেন। তুই নাকি দিন দুই ধরে নিখো
অরিত্র বলল, "সে এক গল্প! বাবার মত হল যে, তোর সঙ্গে মি আমার সব গোল্লায় যাচ্ছে। কিছুতেই বাবাকে বোঝাতে পারছি সেরকম কিছুই নয়। কোন এক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে চায়। তাই মারলাম ডুব বাড়ি থেকে কয়েকদিনের জন্য। চলে এ আমার গোপন আস্তানায়।"
"তোর গোপন আস্তানার খবর কিন্তু আমি জানি না।"
"গোপন আস্তানা হল এই হাসপাতালের একটা চেম্বার। সেটা স্টাফদের রেস্টরুম। আমি সেখানেই ডেরা গেড়েছি গত দু'দিন খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধে হয় না। বরেনদার ক্যান্টিনের বেশ ভালই লাগে। বাবার ধারণা হয়েছে আমার বিয়ে দিয়ে দি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই তার এক বিজনেসম্যান মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে বসে আছে। আমি কখনও রাজি হব না।"
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুম।"
"কিন্তু আমি মত বদলেছি একজনকে দেখে," বলে সে লজ্জায় নীল-বেগুনি হতে লাগল। অরিত্রর মতো ছেলেকে এত লজ্জা আগে কখনও দেখিনি। কাউকে কারও পছন্দ হলে এত লজ্জা থেকে চলে আসে? এই লজ্জার উৎপত্তি কোথায়?
অরিত্র বলতে লাগল, "আমার এরকম অবস্থা আগে কখনও হ এরকম অনুভূতি কাল রাত থেকে হচ্ছে। বুঝতে পারছি না কেন এরকম হচ্ছে," তার চোখ ব্যথাতুর হয়ে উঠল।
এই ব্যথাও কি লজ্জার সঙ্গেই চলে আসে মানুষের মধ্যে? এই উৎপত্তিই-বা কোথায়?
অরিত্র বলে চলল, "কিন্তু সে আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে ন তাকানোর মতো পরিস্থিতিও নয়। কিন্তু আমার যে মন মানছে
আমি বললাম, "অন্নপূর্ণা কিছুই বলছে না?"
এবার অরিত্র অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। নিজের মনেই বলল, "আমার মনে রাখা উচিত ছিল যে তোর বিশেষ ক্ষমতা কিন্তু কীভাবে বলবে সে কথা! কাল যখন সন্ধের দিকে নিমাইদ হাসপাতালে নিয়ে এল, তখন অন্নপূর্ণাকে পাগল-পাগল লাগা চোখমুখ উদ্‌ভ্রান্ত। কথা বলতে পারছে না। আমি তখন আমার ডেরা ছেড়ে একবারের জন্য বেরিয়েছি। এটা মনে হয় কোনও যোগাযোগ। না হলে তখনই কেন আমি বেরোব! নিমাইদাকে বুঝলাম হার্ট অ্যাটাক। সঙ্গে সঙ্গে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করিয়ে নি চিকিৎসা শুরু করে দিলাম। আর-একটু দেরি হলে অনেক কিছু পারত।"
"তোর কেসটা বেশ জটিল ঠেকছে আমার কাছে। বাড়ি থেকে দিতে চাইছে বলে তুই বিবাগী হয়ে ঘর ছেড়েছিস আর এখানে এসে মেয়ে পছন্দ করে ফেলেছিস! ওই অম্বলের জ্বালায় ঘর ছে তেঁতুলতলায় বাসের মতো অবস্থা আর কী। তা, বাড়ি থেকে য বলছে তখন তুই বিয়ে করে নিলেই তো পারিস। সব ল্যাঠা চুকে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।"
"তুই একথা বলছিস? আরে বাবা আমি বাবার ওই বন্ধুর মেয়ে বিয়ে করতে পারব না। আর বাবা যা মানুষ! যদি শোনে যে আ পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে না করে অন্য কাউকে বিয়ে করতে চ তা হলে বাবার মাথায় যে কী ধরনের বাজ পড়বে তা আর কেউ জানুক তুই খুব ভাল করে জানিস।"
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুম।"
"কতবার বলেছি আমার সামনে হাই তুলবি না।" বলে অরিত্র রাগ দেখাল। তারপর শুরু করল, "জানিস, কী অসাধারণ মেয়ে

অন্নপূর্ণা! কাল থেকে একবারের জন্যও সরেনি ওর বাবার পাশ থেকে। প্রথম দর্শনেই বুঝেছি ওর অ্যানিমিয়া জাতীয় কিছু আছে। গায়ের রং পাণ্ডুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী যেন মায়া আছে। ওকে দেখে আমার হারুকি মুরাকামির 'On Seeing the 100% Perfect Girl One Beautiful April Morning' গল্পটার কথা মনে পড়ে গেল। ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছে ও আমার জন্য ১০০% পারফেক্ট। আমার পরবর্তী জীবন কাটবে একমাত্র ওর সঙ্গেই। আর কারও সঙ্গে নয়।"
আমি আবার হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুম।"
আমার হাই তোলা দেখে আবার অরিত্র রাগত চোখে তাকাল। তারপর বলতে লাগল, "কিন্তু বাবা মানবে না। কিছুতেই মানবে না। দেখিস, বাবা আমাদের কখনওই এক হতে দেবে না। আমি আমার বাবাকে খুব ভাল করে চিনি।"
অরিত্র মাথা নিচু করল। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। আমি অন্যদিকে তাকালাম। অরিত্র এখন তার জীবনের সবচেয়ে মধুর পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সময়ের অনুভূতি সবসময়ই সেরা। কেউ আলাদাভাবে সেই অনুভূতির মাধুর্য নিতে পারবে না। মাঝে-মাঝে ঈশ্বর কারও কারও জীবনে এমন কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যেগুলো কেবলমাত্র তার নিজের, অন্য কারও নয়। অরিত্র এখন ঈশ্বরের সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখি সে মাথা তুলল। তার দু'চোখ থেকে জলের ধারা নামছে গাল বেয়ে। আমি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলাম। আমাদের আশ্চর্য হতে নেই। কিন্তু অরিত্রকে দেখে আমি সত্যিই আশ্চর্য হলাম। চমৎকৃত হলাম। একটা অজানা আনন্দের স্রোত আমার শরীরে বয়ে গেল। অরিত্রকে আমি কোনওদিন কাঁদতে দেখিনি। আজকের অরিত্র আমার বহু বছরের চেনা অরিত্র নয়। এ এক নতুন মানুষ। ভালবাসার আগুনে পোড়া পবিত্র এক মানুষ। আমি আলতো করে তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, "পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই তোদের দু'জনকে আলাদা করার। তোরা দু'জন দু'জনের জন্য এসেছিস। কোনও শক্তিই তোদের আলাদা করতে পারবে না। আয়, তোকে একটা স্বপ্ন দিই। প্রকৃতিই তোদের কাছাকাছি এনেছে। আর সেই প্রকৃতিই তোদের এক করবে," বলে আমি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম অরিত্রর মাথায়। বললাম, "তুই একটা স্বপ্ন দেখবি। এই স্বপ্ন তোর সমস্ত দুঃখ দূর করবে।" কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম দু'জনে। তারপর বললাম, "কিন্তু অন্নপূর্ণা যে কাল থেকে কিছুই খায়নি সে ব্যাপারে তোর কি কিছু বক্তব্য আছে? ওকে কি কিছু খাওয়াতে হবে না? একেই ও রুগ্ণ। তার ওপর এতক্ষণ উপোস! ওর শরীর কি নিতে পারবে?"
"এ মা! আমি তো ভুলেই গেছিলাম। চল চল, এখনই ওকে কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যাক," বলেই একলাফে উঠে পড়ল অরিত্র। কিন্তু পরক্ষণেই আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ চুন করে বলল, "কিন্তু ও কি আমার কথা শুনবে? দেখেই মনে হয় বড্ড জেদি।"
আমি বললাম, "শুনবে মানে! আলবত শুনবে। চল, দেখি কী করে না শোনে," বলে আমি ওর চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চললাম। আমার উৎসাহ দেখে অরিত্রও খুব উৎসাহিত বোধ করতে লাগল। উত্তেজনায় ফুটছে সে। টগবগ করতে করতে আগে আগে চলল। যত কাছে আসতে লাগল অরিত্র যেন তত আড়ষ্ট হতে লাগল। এক্সপোনেন্সিয়াল ডিকে। কেবিনের কাছাকাছি এসে দেখি অরিত্র বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বললাম, "কী হল, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?"
অরিত্র কিছু বলল না। অগত্যা নিজেই ঢুকে পড়লাম। কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে অনুর মাথায় হাত রাখলাম। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, "শ্রীকান্তদা, বাবা কি বাঁচবে? আর কি বাবা আমার রান্না খেয়ে বলবে, 'মা রে অমৃত খেলাম?'"
আমি তাকে কাঁদার সময় দিলাম। কাল থেকে তার মনে যে-কষ্ট জমে আছে তা চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ুক। বিগলিত লাভার মতো
চোখের জল মরুভূমির মতো রুক্ষ গালের ওপর দিয়ে নেমে যাব
অনেকক্ষণ পর সে ভেজা চোখ তুলে তাকাল। আমি বললাম,
"নিমাইদা এখনই চলে যাবে কী রে? তোর ছেলেপুলে ওকে যত
ঘোড়া না বানাচ্ছে ততক্ষণ কি ওর ছুটি আছে?"
আমার কথা শুনে অনু আবারও কেঁদে ভাসাল। আমি বললাম,
"তুই নিশ্চিন্ত থাক, নিমাইদাকে ভাল হতেই হবে। ভগবানের এ
গভীর ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করতে পারছি আমি। কিছু কাটা কাটা ঘ
যেগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে।"
অবাক বিস্ময়ে অনু তার বড় বড় চোখ তুলে তাকাল। আমি হে
মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, "যে-মানুষটার জন্য নিমাইদা
যাত্রা বেঁচে গেল সেই মানুষটাকে দেখবি না?" বলেই বাইরের দি
তাকিয়ে হাঁক পাড়লাম, "অরিত্র ভেতরে আয়।"
নিঃশব্দ বেড়ালের মতো অরিত্র ভেতরে এল। আমি গিয়ে তার
ধরে টেনে কাছে নিয়ে এলাম। বললাম, "এই ব্যাটা! এত লজ্জা
আছে? এ হল অনু। নিমাইদার কন্যা। তুই কি চিনিস?" বলে মু
হাসতে লাগলাম।
অরিত্র মাথা নিচু করেই রাখল। তার মুখ কি আরক্তিম? চোখ বি
স্বপ্নালু? আমি অনুর দিকে ফিরে বললাম, "অনু, এ হল অরিত্র।
আমার অতি প্রিয় বন্ধু। অরিত্র এখন ডাক্তারি পড়ছে। কিছুদিনে
খুব বড় ডাক্তার হবে।"
অনু এবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল অরিত্রর দিকে। চাউনির মধ্যে
বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা আর মুগ্ধতা মিলেমিশে একাকার। দেখুক ওরা
একে-অপরকে। অচেনার দূরত্ব মিটে যাক। নতুন নতুন অনুভূতি
আসুক। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়
মেয়েটির বাবা। সত্যিই, ভালবাসা যে কার জীবনে কীভাবে, কে
পরিস্থিতিতে আসে সেটা বিস্ময়ের! এরকম একটা শুভ মুহূর্তে অ
থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের কিছু উপভোগ করতে হয় না। আ
মানুষকে মিলিয়ে দিয়ে নিশ্চুপে সরে যাব।
আমি বেরিয়ে পড়লাম হাসপাতাল থেকে। এবার আমাকে হাঁটিে
অনেক দূর। দুপুরের রোদের নেশায় চুর হয়ে আমাদের বেড়িয়ে
হবে। পেছন ফিরে দেখা চলবে না। আমাদের পেছন ফিরে দেখা
নেই। আমরা কর্মহীন। আমরা ভবঘুরে। আমাদের কোনও অ্যাম্বি
নেই। কোনও প্রত্যাশা নেই কারও কাছে। আমরা পাঁকাল মাছে
মতো। আমরা শুকনো বালির মতো। আমাদের যত চেপে ধরবে
পিছলে বেরিয়ে পড়ব। আমরা নীল আকাশের অংশ। নীল রং
স্বপ্নের রং। আমরা সর্বদা স্বপ্নে বিভোর। আমরা নিজে স্বপ্ন দেখি
অন্যদেরও দেখতে সাহায্য করি। আমরা আকাশের মতোই ব্যা
আমরা পৃথিবীকে স্পর্শ করি দিগন্তরেখায়। শেষপ্রান্তে।

৮

আজ ঠিক করেছি দামোদরের কাছে যাব। দামোদর কোনও ব্যক্তি
একটি নদী। উঁহু, নদী নয়, নদ। আচ্ছা নদী কি কখনও নদ হতে
না? বা নদ নদী? একজন পুরুষ, আর-একজন প্রকৃতি। ব্রহ্মাণ্ডে
মূল দু'টি উপাদান। সৃষ্টির আদি উৎস। একজন আদম আর-এক
ইভ। আর তাদের সেই আপেল। এই আপেল ফল অতি জটিল
প্রাণ সৃষ্টি থেকে বিজ্ঞান সৃষ্টি— সবই এই নিরীহ, কিন্তু জটিল
থেকেই। আচ্ছা আদম আর ইভ যদি আমাদের দেশে জন্মাত, তা
কী দেখে তারা আকৃষ্ট হত? পেয়ারা? নাকি কাঁঠাল? এইসব অ
উচ্চপর্যায়ের ভাবনাচিন্তা করতে করতে আমি এগোচ্ছি। অনেক
করেও কখনও হাঁটার সময়ে আমার সেই বটগাছ আর শীতল
পুকুরকে আনতে পারিনি। হাঁটতে হাঁটতে সেই বটগাছের মায়াম
শীতল ছায়ায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে পারিনি কখনও। পানকৌড়িরা ডা
ঝাপটে উড়ে যাবে আর আমার সারা গায়ে লাগবে তার গা থেকে

পড়া জলের ছিটে... নরম আরামের অনুভূতি জাগবে সারা শরীরে... হাঁটার সময়ে এমনটা কখনও হয়নি। আমার খুব দেখার ইচ্ছে হাঁটার সময়ে বটগাছকে কেমন লাগে। সে কি এক জায়গায় স্থির থাকে? নাকি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে বেড়ায়?

মধ্যরাতে বেশ কয়েকবার গেছি দামোদরের কাছে। রাতের শেষ হওয়া দেখেছি। কিন্তু ভরদুপুরে কখনও যাইনি। তবে দুপুরের রোদে দামোদরের রূপ কেমন হয় তা জানা বিশেষ দরকার। না হলে তাকে ঠিক জানা যায় না। আজ সেই জানার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছি। আমি দেখেছি, যা ভেবে বেরোই তা কখনও হয়ে ওঠে না। আমি হাঁটছি। হাঁটছি। গরম রোদের মধ্যে হেঁটেই চলেছি।

হঠাৎ একটা বড় গাড়ি আমার কাছে এসে হুস করে থামল। সেই গাড়ির পিছনের সিটের কাচ নেমে গেল। কালো কাচ। ভেতর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। বড়ই আশ্চর্য আবিষ্কার। গাড়ির ভেতর থেকে অরিত্রর বাবার মুখ দেখা গেল। তিনি আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমি বললাম, "মেসোমশাই, ভাল আছেন?"

তিনি কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "গাড়িতে উঠে এসো।"

এ আদেশ অমান্য করে এমন লোক পৃথিবীতে কেউ আছে কি না আমার জানা নেই। আমি তাঁর গাড়িতে উঠে পড়লাম। সামনের সিটে বসলাম। গাড়ি চলতে লাগল। ভেতরে এসি চলছে। বাইরে বিকট রোদ। গাড়ির জানলা কালো বলে বাইরের রোদ-ঝলমলে দিনও কেমন মেঘলা-মেঘলা লাগছে। রোদের নেশার পর এসির নেশাও যেন আমাকে পেয়ে বসল। কাল রাতে ঘুম হয়নি। তাই বোধ হয় আমার ঘুমঘুম পেতে লাগল। পিছনে অরিত্রর বাবা বসে আছেন। আমার দামোদরে যাওয়া আপাতত ক্যানসেল্ড। এখন আমাকে অরিত্রদের বাড়ি যেতে হবে। সেখানে কী অপেক্ষা করছে কে জানে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম অরিত্রদের পেল্লায় বাড়িতে। সামনে বিশাল বাগান। তারপর গাড়িবারান্দা। পুরনো জমিদারবাড়ির ধাঁচ। বাড়ির সামনে জলপরির মূর্তির ফোয়ারা। প্রকৃত অভিজাত বাড়ি আর কী।

আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল গাড়িবারান্দার নীচে। সেখানে আরও তিনটি গাড়ি পরপর দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে নেমে অরিত্রর বাবা বললেন, "এসো, ভেতরে এসো।"

আমরা দু'জনে ভেতরে গেলাম।

একটা বড় সোফায় বসলেন ডাক্তারবাবু। আর-একটার দিকে আমাকে নির্দেশ করলেন বসার জন্য। আমি বসলাম। কিছু কিছু লোক থাকে যাদের কথা মানেই এক ধরনের আদেশ। আমি বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ সব নিশ্চুপ। ঝড়ের আগের নৈঃশব্দ্য। অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারছি।

অনেকক্ষণ পর অরিত্রর বাবা বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশি।"

আমি বললাম, "আজ্ঞে, কী ব্যাপারে?"

"দেখো শ্রীকান্ত! তুমি নিজেকে যতটা নির্বোধ দেখানোর চেষ্টা করো, ততটা নির্বোধ তুমি নও। যতটা পাগলাটে নিজেকে দেখানোর চেষ্টা করো, ততটা পাগলাটেও তুমি নও। তুমি হলে, যাকে বলে শয়তান! মূর্তিমান শয়তান!"

"আজ্ঞে।"

"জানি তোমার প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা প্রবল। অরিত্রর মতো ভাল আর সাদাসিধে ছেলের মাথা ঘুরিয়ে দিতে তুমি ভালই পার। কিন্তু এটা করা কি তোমার উচিত? তুমিই বলো। অরিত্র আমাদের বংশের একমাত্র প্রদীপ। তোমার তো কুল-বংশের ঠিক নেই। কাজেই তুমি বুঝবে না এসব ব্যাপার।"

আমার কুলের সত্যিই কোনও ঠিক নেই। জন্মানোর পর বাবা-মা কী জিনিস কোনওদিন দেখিনি। খুব ছোটবেলায় এক অনাথ আশ্রমের
কথা কাটা কাটা মনে আসে। কিছু ছবি। ছেঁড়া ছেঁড়া। মনে পড়ে এ
ঘরে অনেক ছেলের সঙ্গে আমি, আর-একজন সাদা পোশাক পর
ফাদার। তাঁর সারা শরীর সাদা আলখাল্লায় ঢাকা। কিন্তু তাঁর মুখ
কিছুতেই মনে পড়ে না। মনে পড়ে আমাদের সবার একসঙ্গে থে
বসার কিছু দৃশ্য। অনাথ আশ্রমে একজন ছিল যে আমাদের খুব
চটকাত। রাতে তার ঘরে ডেকে নিয়ে যেত আমাদের মতো ছোট
ছেলেদের। কোলে বসিয়ে খুব গা টিপত। অসভ্য জায়গায় হাত দি
যেদিন যে-যেত পরের দিন তার সারা শরীরে ব্যথা থাকত। আর
তেমন কিছু মনে পড়ে না। তারপর মনে পড়ে অরিত্রর কথা। আম
দত্তক নিতে সাহায্য করেন অরিত্রর বাবা। আমার পালকপিতা ছি
অরিত্রর বাবার এক পেশেন্ট। আমার আর অরিত্রর বয়স একই ছি
কাজেই বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি। অরিত্রর বাবাও আমাদের বন্ধুত্ব
তেমন কিছু বলেননি। ওদের বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল অবা
অরিত্রর বাবার গলা শুনলাম, "আমার খুব ভুল হয়েছিল হরিহর
তোমায় দত্তক নিতে বলা। অজ্ঞাতকুলশীল কাউকেই বাড়িতে ঢো
উচিত নয়। এখন বলো অরিত্র কোথায় আছে গত কয়েকদিন ধর
আমার ধারণা তুমি নিশ্চিত জানো সে কোথায় আছে। এখন ঝে
কাশো। না হলে আমাকে আবার কাশির ওষুধ দিতে হবে," বলে
চশমা খুলে কাচ মুছতে লাগলেন। যারা সবসময় চশমা পরে তা
চশমা খুললে অদ্ভুত দেখতে লাগে। এখন অরিত্রর বাবাকে সেরক
লাগছে।

আমি বললাম, "আজ্ঞে, আমি ঠিক জানি না। অরিত্রর সঙ্গে আমা
অনেকদিন দেখা হয়নি। সে কোথায় আছে তাও জানি না।"

অরিত্রর বাবা চশমাহীন চোখে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে
রইলেন। তারপর চশমার ডাঁটি দিয়ে কপাল চুলকোতে চুলকোতে
বললেন, "তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আমি খু
ভাল করে জানি যে, অরিত্র জগতে শুধুমাত্র একজনকেই তার সব
কথা বলে আর সেই একজন হলে তুমি। জানি না তোমার মধ্যে
দেখেছে। তোমার প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অতি প্রবল। আমি জা
তুমি কিছুক্ষণ কথা বললে আমিও তোমার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে য
তখন তুমি যা বলবে তা-ই আমার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল মনে হ
এমনকী, তুমি যদি আমাকে খালি গায়ে রাস্তায় হাঁটতে বলো, আ
হয়তো তা-ই করব। খুব বিপজ্জনক বস্তু তুমি। তুমি কি জানো অ
বিয়ে ঠিক করা হচ্ছে? তোমার অবশ্যই জানা উচিত। পাত্রী আমা
অতি প্রিয় এক বন্ধুর মেয়ে। আমি এবং অরিত্রর মা দু'জনেই চাই
সঙ্গেই অরিত্রর বিয়ে হোক। কিন্তু অরিত্রর মাথায় ভূত চেপেছে।
নাকি এখন বিয়ে করবে না। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে অপদার্থ
কোনও বখাটে মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে। না হলে এরকম একটা
কেউ নাকচ করতে পারে? তুমি কি এই ব্যাপারে কিছু জানো? অ
আমি জিজ্ঞেসই-বা করছি কেন! তুমি অবশ্যই জানো এবং আজ
এই ব্যাপারে ঝেড়ে কাশবে। একেবারে খোলাখুলি সব বলবে।"

আমি বললাম, "আজ্ঞে, আমি এই ব্যাপারে কিছু জানি না। অরি
সঙ্গে আমার বেশ কিছুদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি," কথাগুলো বলার
সময়ে আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। ডোকরার স্টাইল কপি
করলাম। তারপর চোখ খুলে তাকালাম ডাক্তারবাবুর দিকে। দেখ
তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছেন। বুঝতে পারছি তাঁর বি
লাগছে। কিন্তু তিনি এমন মানুষ যে, শত বিরক্তি সত্ত্বেও মুখে কি
বলবেন না। আমি তাঁর বিরক্তিকে আরও উসকে দেওয়ার জন্য
চোখ বুজে বলতে লাগলাম, "তবে অরিত্রর বাড়ি-ছাড়া এই প্রথম
তো নয়। আগেও সে বেশ কয়েকবার গৃহত্যাগ করেছে। কাজেই
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই। ছেলেটার মধ্যে নিমাই আর গৌত
বুদ্ধের ভাব প্রবল। অসাধারণ ছেলে স্যার। লাখে এমন একটা
হয়," পুরোটাই চোখ বন্ধ করে বলে তারপর চোখ খুললাম। দেখি
ডাক্তারবাবু থমথমে মুখে তাকিয়ে আছেন।

বললেন, "আমাকে আবার 'স্যার' বলা কবে থেকে শুরু করলে? তুমি সবসময় যে আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করো, এটা আর করবে না। করলে ফল খুব খারাপ হবে।"
আমি বললাম. "আজ্ঞে স্যার, আর করব না।"
"হুম। তুমি কি জানো যে, তোমার মাসিমা, মানে অরিত্রর মা গত দু'দিন ধরে শয্যাশায়ী?"
"আশঙ্কা করেছিলাম।"
"আমার জন্য না হোক, অন্তত ওঁর কথা ভেবে তুমি অরিত্রর ঠিকানাটা আমাকে জানাও।"
আমি কিছুক্ষণ চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলাম। জানি এরকম করলে অরিত্রর বাবা আরও বিরক্ত হবেন। এমন ভাব করতে লাগলাম যেন ধ্যানস্থ



চারিদিকে অসংখ্য তার আর পাইপ বেরিয়ে বিভিন্ন মেশিনের সঙ্গে নিমাইদাকে সংযুক্ত করেছে। বিচিত্র সব ক্যাঁক-ক্যাঁক জাতীয় শব্দ হচ্ছে।

হলেই বুঝতে পারব অরিত্র কোথায় আছে। এই অবস্থার মধ্যে শুনতে পেলাম, "আমার সঙ্গে বুজরুকি করতে আসবে না। আমি তোমার বুজরুকিতে পা দেব না। এসব বুজরুকি তুমি তোমার ফলোয়ারদের সঙ্গে কোরো।"
আমি তেমন পাত্তা দিলাম না। ধ্যানস্থ অবস্থাতেই নিজেকে রেখে দিলাম। এবার শুনতে পেলাম, "বাবা, তুমি কেন ওকে বাড়িতে এন্টারটেন করো?"
অসাধারণ মিষ্টি গলা। অরিত্রর বোন অয়স্তিকার। ছোটবেলায় আমার বিশেষ ভক্ত ছিল ও। এখনও আছে হয়তো। কিন্তু সেটা আর মুখে প্রকাশ করে না, কাজে অথবা হাবভাবেও নয়। মেয়েরা যে কী চায় বা কী চায় না, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। এ এক জটিল ধাঁধা! আমার একসময় কবিতা লেখার ইচ্ছে হয়েছিল। লিখেওছিলাম কয়েকটা। সেগুলো থাকত একটা ডায়েরিতে। আমাকে প্রতিবছর একটা করে নতুন ডায়েরি দিত অয়স্তিকা। সেসব ডায়েরি আমি ভরিয়ে ফেলতাম কবিতায়। তারপর পাঠাতাম অয়স্তিকাকে। সেরকমই একটা কবিতা এখনও মনে আছে:
'যেদিন নিভে যাবে প্রেম দূরায়ত নক্ষত্রের দেশে,
আশ্বিনের আবছা আলোয় নীলাকাশে দিগন্তের শেষে,
যেদিন মিলিয়ে যাবে পুরাতন মৃত সব নক্ষত্রেরা আকাশের কো
সেদিন হয়তো-বা আমি হেঁটে হেঁটে পার হব বিস্তৃত প্রান্তর দূর্বা
আগায়—
সকালের শিশিরের মতো পড়ে রব মাটির উপর।'
আমার প্রতি সেই আকর্ষণ কি তার আর নেই? হয়তো আছে। প্রকাশের অভাবে তা ছটফট করছে। হয়তো আমার জায়গা অ নিয়েছে। অনেক সম্ভাবনা আছে। অয়স্তিকা বলল, "তোমার ল করে না? আমার দাদাকে তুমি ছোটবেলা থেকেই চেনো। সে কী সোজা মনের মানুষ তা তুমি ভাল করেই জানো। সব জেনেও তুমি তাকে বারবার তোমার জগতের দিকে টেনে নিয়ে যাও? করে হোক কালকের মধ্যে দাদাকে তুমি বাড়ি ফিরিয়ে আনবে।"
আমি বললাম, "ভাল আছ অয়স্তিকা?"
"আমার ভালমন্দ নিয়ে কি তোমার কোনও লাভ আছে? আর আমাদের ভাল থাকতে দিচ্ছ কই?"
অয়স্তিকার চোখে কি ঘৃণা? কে জানে। আজ সকাল থেকেই আ যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মানুষের অনুভূতি বুঝতে প না। আমার অনুভূতির সেনসরগুলো যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। এ কি রাতজাগার ফল? রাত জেগে মাথার নিউরনের মধ্যে নিশ্চয় শর্ট-সার্কিট হয়ে গেছে। যেদিক দিয়ে কারেন্ট যাওয়ার কথা তার উলটোদিকে যাচ্ছে। কাজেই সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। রাত মস্তিষ্ক অনেকরকম খেলা দেখায়, অনেক ম্যাজিক দেখায়।
"কী হল? কোন জগতে চলে গেলে? পাগলামিরও একটা লিমি থাকে। কিন্তু তোমার সবই আনলিমিটেড! মাথাখারাপ লোক এ মাঝে-মাঝে আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয় পুরোটাই তে নাটক। গুরুত্ব পাওয়ার জন্য সস্তা অভিনয়। নয় কি?"
আমি বললাম, "হুম।"
অয়স্তিকা চলে যেতে লাগল। আমি বললাম, "চললে অতন্দ্রীল
"ভুলভাল নাম ধরে ডাকার কোনও মানে নেই। তুমি খুব ভাল জানো আমার নাম অয়স্তিকা, অতন্দ্রীলা নয়। আমি অমিয় চক্র কবিতার চরিত্র নই, রক্তমাংসের মানুষ। খুব জীবন্ত একজন মা একটু আগেই আমার সঠিক নাম ধরে তুমি ডেকেছ। কাজেই ভ করবে না। আমি সবকিছু সহ্য করতে পারি কিন্তু ভান করা পুর একদম দেখতে পারি না," বলে সে চলে গেল। অরিত্রর বাবা ব "আশা করি তুমি বুঝেছ আমরা কী বলতে চাইছি। কালকের ম তুমি আমাকে অরিত্রর খোঁজ এনে দেবে। নাউ গেট লস্ট।"
আবার পথে নামলাম। পথই আমার সঠিক জায়গা। পথেই আ সবকিছু খুঁজে পাই। পথ আমাকে পেয়ে বসেছে। পথের এই পে বসা এক মারাত্মক জিনিস। একবার পেয়ে বসলে সহজে ছাড়বে কচ্ছপের কামড়ের মতো ধরে থাকবে। শত মেঘ গর্জন করলেও কামড় থেকে মুক্তি নেই। পথের নেশাতেই হয়তো হিউয়েন সাং চিন থেকে পাড়ি জমাতে পেরেছিলেন এদেশে। বোলপুরে আমা একজন জার্মান সাহেব আছেন যাঁকে সবাই হন্টন সাহেব নামে তিনি সুদূর জার্মানি থেকে হেঁটে এসেছিলেন। বোলপুরে এক অ সুন্দরীর প্রেমে পড়ে তার সঙ্গেই জীবন অতিবাহিত করছেন। ঠি বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এর চরিত্র। বনের রাজা দোবরু পান্না নাতনির প্রেমে পড়ে জীবন অতিবাহিত করার মতো অবস্থা।
ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। তেষ্টা পাচ্ছে। তীব্র মধ্যে চারিদিকটা কেমন ফিকে লাগছে। তীব্র রোদ আর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না, দুইয়েরই যে কী রূপ! একজন তার সমস্ত গরিমা, তে হাজির, আর-একজন তার স্নিগ্ধতা, মায়া, কুহক নিয়ে হাজির। পাশের কৃষ্ণচূড়াতে একটা কোকিল ডেকে উঠল। কী আবেশ ম

তার সুর! যেন বুক চিরে শব্দ বের করছে। শব্দব্রহ্ম কথাটা খুব ভাল করে প্রকট হচ্ছে কোকিলটার প্রতিটি তানে। কাকে ডাকছে সে অমন সুরে? তার কোকিলাকে? তার জন্য কি কেউ অপেক্ষা করে বসে আছে?

"পেন্নাম হই শ্রীকান্তবাবা।"

আমি ফিরে তাকালাম। কেউ একজন রিকশা থেকে আমাকে ডাকছে। রিকশায় চড়ে নয়, রিকশা চালাতে চালাতে। আমি চেয়ে রইলাম। সে আবার বলল, "কী বাবা, চিনতে পারলে না?"

এবার আমি চিনলাম, রিকশাওয়ালা জগা। জগার সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ আছে। বিশেষ একটা কারণ আমায় বারবার তার কাছে টেনে আনে। তার কারণ কাহিনির শুরুতেই বলেছি। একবার ভাড়া খেটে এসেই সে কোনও নিরালা জায়গায় বসে বিশ্রাম নেয়। রিকশার সিটের তলা থেকে বের করে আনে একটা বহু পুরনো বাঁশের বাঁশি। তারপর রিকশার সিটে বসে মন উজাড় করা সুরে বাজায় সে বাঁশি। কয়েকবছর আগে আমি একবার তার রিকশা করে যাচ্ছিলাম। আমাকে আমার গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে সে বসে পড়ল তার রিকশায়। তারপর বাঁশিতে ধরল সেই পাগল করা সুর। আমি অভিভূত হয়ে শুনেছিলাম।

জগা বলল, "কোথায় যাবেন বাবা?"

আমি বললাম, "যেখানে নিয়ে যাবে।"

শুনে জগা হেসে বলল, "বাবার যেমন কথা! পথ ধরে হাঁটিলেই হবে। কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। পথের মধ্যেই সবকিছু আছে। ঠিক কি না?"

আমি বললাম, "একদম ঠিক।"

"আসেন, উঠে আসেন আমার রিকশায়।"

"তা উঠছি।"'

"আজ আর ভাড়া খাটব না। চলেন বাড়ি গিয়ে চাট্টি খাওয়া-দাওয়া করা যাক।"

"তোমার আইডিয়া মন্দ নয়। চলো, আজ আমি তোমার অতিথি হই।" বলে আমি রিকশায় উঠে পড়লাম। রিকশা চলতে শুরু করল। রিকশায় উঠলেই আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি। তা হলে কীরকম একটা উড়ছি উড়ছি ভাব হয়। মনে হয় নীল আকাশে উড়ে চলেছি। পাশে পরিযায়ী পাখিরা ভেসে চলেছে। তাদের ডানা ঝাপটানোও যেন দেখতে পাই। তাদের সঙ্গে আমি একইভাবে উড়ছি বলে তাদের স্থির মনে হয়। নীল আকাশে একঝাঁক পাখি আর তাদের মাঝে আমি। তাদের হলুদ ঠোঁট, সাদা গা, দুটো ডানা দু'দিকে প্রসারিত। আমি রিকশায় বসে মাঝে-মাঝে দু'হাত ছড়িয়ে দিই। এখনও আমি আমার দু'হাত ছড়িয়ে দিলাম। ওড়াটা ওড়ার মতোই হতে হবে। হাঁটার মতো হলে চলবে না। আচ্ছা, জার্মানি থেকে কোনও সাহেব উড়ে এসে এখানে বাস করতে শুরু করলে তাঁর কী নাম হবে? উড়ন্ত সাহেব? তবে বিমানে উড়ে এলে চলবে না। নিজে নিজে উড়ে আসতে হবে। তবেই উড়ন্ত সাহেব নাম দেওয়া যাবে।

অনেক রাস্তা পেরিয়ে যখন জগার বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। জগার বাড়িটা বেশ! পুরোটা টিনের। টিনের আগড় করা দরজা। সেই দরজার মাঝখানে একটা শেকল লাগানো আছে জমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে। ওইভাবেই শেকলটা একটা আংটার সঙ্গে আটকানো। কোনও তালা নেই। শুধুই শেকল তোলা। জগা আগড় ঠেলে দরজা খুলে বলল, "আসেন বাবা, ভেতরে আসেন।"

আমি ভেতরে ঢুকে বসলাম। জগা রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ঠিক করলাম আবার আমার সেই বটগাছটাকে বের করে আনব। ভাবতে থাকলাম সেই মায়াময় বটগাছটার কথা। একসময় শুয়ে পড়লাম। অবশেষে সেই বটগাছ আমার দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল। আমি বসলাম তার গভীর ছায়ায়। জানি না কী গভীর মায়া আছে তার ছায়ায়। সেই পুকুরে মহানন্দে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে অনেকগুলো পানকৌড়ি। তারা ডুব দিচ্ছে পালা করে। উঠে আসছে একটা করে সাদা মাছ মুখে নিয়ে। সেই মাছ মহানন্দে খাচ্ছে তারা। আবার ডুব দিচ্ছে। তীব্র রোদে তাদের মসৃণ গা থেকে যেন আলো ঠিকরোচ্ছে। কালো রং এত উজ্জ্বল হতে

পারে! ক্রমে আমার পায়ের কাছে পুকুরটা সরে এল। আমি পা
বসলাম সেই ঠান্ডা জলে। গভীর ঘুম আমাকে চেপে ধরতে লা
দূরে পুকুরের ওপারে এক বালিকাকে দেখলাম। সে আমাকে
ডাকছে। কিছু বলছে আমাকে। আমি শোনার খুব চেষ্টা করছি।
কিছুতেই বুঝতে পারছি না সে কী বলছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছে
একটা নেই-নেই ভাব হচ্ছে। কে এই বালিকা আমি বুঝতে পা
সে কেন আমাকে ডাকছে তাও জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে সে
কতদিনের চেনা। কত আলোকবর্ষ আগেও যেন আমাদের মধ্যে
ছিল। মনে হল, সেই বালিকা যেন ভয় পাচ্ছে। দূর থেকে একজ
এগিয়ে এল। সেই বালিকা ভয়ে কুঁকড়ে যেতে লাগল। লোকটা
কাছে আসতে লাগল বালিকাটি যেন দিশাহারা হয়ে পড়তে ল
এখন মনে হচ্ছে আমি এই লোকটাকেও চিনি। খুব ভালভাবে
একটা ব্যথা আর তার সঙ্গে অনির্বচনীয় ভয় আমার শরীরে ব
লাগল। আমি চিনতে পারছি সেই লোকটাকে। এইরকম লোক
খুব ভাল করে চিনি। এইরকম লোকরাই অনাথ আশ্রমের ছো
বাচ্চাদের রাতে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে যায়। আমার রীতিম
হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই স্বপ্ন এখনই শেষ হোক। কিন্তু শেষ করতে
না। ক্রমে লোকটি সেই বালিকাকে ধরে ফেলল। আমি স্পষ্ট ত
হাতের স্পর্শ পেলাম আমার গায়ে। চমকে জেগে উঠলাম। উ
জগা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আমাকে সে ঠেলা দিয়ে তুল
হয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাবার কী হল? এরকম করছেন কেন?
স্বপন দেখছিলেন বুঝি?"

ছোটবেলার সেই ভয়ের রেশ কাটতে আমার বেশ সময় লাগে
সময় নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে বললাম, "ও তেমন কিছু না জগাদ
চলো, আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

আমরা খাওয়ার উদ্যোগ করতে লাগলাম। জগা ভাত বাড়তে
বলতে লাগল, "বাবা, আজ ভাত ফুটাইনি। কাল রাতের ঠান্ডা
রয়েছে। যা গরম পড়েছে, রিকশা চালিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি
টিনের ঘরে গরমও লাগে বেশি। তাই ভাবলাম রাতে বেশি ক
করে রাখি। আজ সেই পান্তা ভাত গরম করে খাব। তা বাবা,
আসবেন তা তো জানতাম না। আপনার কি পান্তা খেতে অসু
তা হলে এখনই কিছুটা ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দেব।"

আমি বললাম, "জগাদা, গরমের দিনে পান্তা হল অমৃত। তুমি
ভাত বেড়ে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।"

"এই যে দিই বাবা," বলে জগা পরম যত্নে আমার স্টেনলেস
থালায় ভাত বেড়ে দিল। ঠান্ডা ভাত। এই ভাত পেটের ভেতরে
যে কী আরাম হবে! ভাবতেই ভাল লাগছে। পরিপাটি করে থা
বেড়ে জগা তার সঙ্গে নানা তরকারি সাজাতে লাগল। প্রথমেই
একটা শাক। ভাজা-ভাজা দেখতে। তারপর মাছভাজা। এরপর
বাটিতে করে দিল আমড়ার টক, তিনটে আমড়া-সহ। একটা
পেঁয়াজ আর একটা লম্বা পুষ্ট দেখতে লঙ্কাও দিল। তাজা পেঁয়া
একটা মন ভাল করা আমেজ আছে। আমরা শুরু করলাম। অ
নিয়ে খেতে যাব এমন সময় জগা বলে উঠল, "আরে আরে,
কী! পান্তা কি শুকনো শুকনো খেতে আছে? জল ঢেলে চটকে
হয়। তার আগে সরষের তেল আর একটু লবণ দিয়ে মাখতে
দেখেন," বলে জগা বেশ কিছুটা সরষের তেল আর নুন ভাতে
দিয়ে চটকাতে লাগল। বলল, "চটকে কড়া ভাতকে মাখনের
মোলায়েম করে ফেলতে হবে। তারপর দিতে হবে জল," এই
একগ্লাস জল তার থালার ভাতে ঢেলে দিল। তার দেখাদেখি
সেসব করলাম। নুন আর তেল মিশে এক অসামান্য স্বাদ এসে
ভাতে! সরষের তেলের ফোঁটা ভাসছে ভাতের জলের মধ্যে।
সপসপ করে খেতে লাগলাম। সঙ্গে ভাজা-ভাজা শাক মুখে দি
অপূর্ব স্বাদ। জিজ্ঞেস করলাম, "এ কিসের শাক রান্না করেছ?"
জগা বলল, "সজনের শাক। সিদ্ধ করে তারপর রসুন আর ল

ভাজতে হয়। কেমন হয়েছে বাবা?"
আমি বললাম, "এ স্বাদের তুলনা হয় না।"
মাছভাজায় কামড় বসালাম। নুনে পোড়া শুকনো-লঙ্কার তীব্র ঝাল মাছের স্বাদকে অন্য মার্গে নিয়ে গেছে। জগা বলল, "এরকমভাবে মাছ ভাজতে আমার মায়ের কাছে শিখেছি। মা এরকম করে মাছ ভাজত। খাওয়ার সময় বলত যে, এই তেজি মাছ মুখের ভেতর ভাতের গেরাসকে ঠেলা মেরে পেটে চালান করবে। হে হে হে।"
আমি টকের বাটির দিকে হাত বাড়ালাম। জগা বলল, "বাবা, যে-আমড়াগুলো দিয়েছি, ওগুলোকে থালায় তুলে চটকে ছাল ছাড়িয়ে নেন। তারপর মাড়ি, আঁটি থেকে আলাদা করে লবণ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে চটকে নেন। দেখবেন আচারের চেয়েও ভাল লাগবে। আমি জগার কথামতো কাজ করে চললাম। খেতে খেতে মনে হল যেন অনেকদিন পরে তৃপ্তি পাচ্ছি। ভাত শেষ হয়ে গেলে জগা বলল, "এবার ভাতের জলটা খেয়ে নেন। আরাম পাবেন।" আমি তা-ই করলাম। ভাতের জল খেয়ে দেখলাম সত্যিই খুব আরাম হচ্ছে। বললাম, "জগাদা, এরকম খাবার আমি কখনও খাইনি।"
"কী যে বলেন বাবা! গরিবের খাবার। এর মধ্যে আর এমন কী আছে!"
আমি বললাম, "এর মধ্যে যা আছে তা হয়তো পৃথিবীর আর কোনও খাবারে নেই। তবে এবার কিন্তু তোমাকে তোমার বাঁশি শোনাতে হবে।"
"আপনি যখন শুনতে চাইছেন তখন কি আর না বাজিয়ে পারি? অবশ্যই বাজাব।"
আমাকে তার চৌকির বিছানায় বসিয়ে নীচে বসে জগা তার বহু পুরনো বাঁশের বাঁশি বের করল। আমি জগাকে অনেকদিন চিনি। প্রতিবার দেখেছি বাঁশি বাজানোর সময়ে তার রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। আজও হল। এক অদ্ভুত জ্যোতি তার মুখমণ্ডলকে ঘিরে ধরল। তারপর সে তান ধরল তার বাঁশিতে। তার ছোট্ট কুঁড়েঘর সেই অপার্থিব শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার মনে হতে লাগল আমি একের পর এক ছায়াপথ পেরিয়ে যাচ্ছি। জগার বাঁশি না শুনলে শব্দব্রহ্ম কী জিনিস বোঝা যাবে না। আমার প্রতিটা লোম খাড়া হয়ে উঠল। এক ধরনের শিহরনের প্রবাহ বইতে লাগল আমার প্রতিটা স্নায়ুকোষে। শুনতে শুনতে একটা আনন্দমিশ্রিত ভয় যেন আমার সমস্ত সত্তাকে জড়িয়ে ধরল। ভয়ের মধ্যেও এক অনির্বচনীয় সুখের আবেশ আসতে থাকল দেহে আর মনে। পরবর্তী ঘণ্টাখানেক আমি যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাসফর করে ফিরে এলাম। খুব কাছ থেকে দেখতে পেলাম সুরের ছায়াপথ। সুরের নীহারিকা। বাঁশি থামলেও তার অসাধারণ একটা রেশ আমার মধ্যে থেকে গেল। জানি, সেই রেশ কাটানো খুব মুশকিল। এটাই হয়তো সেই রেশ, যা বিরহিণী রাধার অন্তরে থেকে যেত। সে তাই বারবার ছুটে যেত তার কানুর কাছে।
জগার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আবার হাঁটছি। পথই আমার ঠিকানা। পথের মায়া আমার মধ্যে গভীরভাবে বসে রয়েছে। মাথার ভেতর ঘুরছে জগার বাঁশির তান। এই তানকে আমি নষ্ট হতে দিতে চাই না। সারা জীবন থাকুক এই তান। এই সুর। আজ সারা রাত আমি জেগে কাটাব। জগার বাঁশির সুরকে আমি অন্তরের মধ্যে ভরে ফেলেছি। একা রাতে আমি এই সুরের সঙ্গে বসবাস করব। কেউ থাকবে না আমার আর এই সুরের মধ্যে। শুধু থাকবে রাতের নৈঃশব্দ্য আর নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে একফালি চাঁদ। সেই চাঁদের আবছা আলো অন্ধকারকে আরও জোরালো করে দেবে। সেই অন্ধকারে আমি বুকের ভেতর থেকে সেই অভূতপূর্ব সুরকে টেনে আনব। একবার জগাকে নিয়ে যেতে হবে আমার বটগাছটার তলায়। বটের ঠান্ডা ছায়ায় টলটলে পুকুরের জলে পা ডুবিয়ে আমি তার বাঁশির অপূর্ব সুর শুনব। সময়ের কোনও খেয়াল থাকবে না।

৯

আজ একবার বিন্দুমাসির বাড়ি এসেছি। মেসো আগুনঝরা চোখে
তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। মাসি স্কুটার নিয়ে বেরিয়েছেন
আগে। মেসো, মানে স্যার, অনেকক্ষণ আগে ইউনিভার্সিটি
অভুক্ত থেকে বেশ বিরক্ত। বললাম, "স্যার, ভাল আছেন?"
মেসো কিছু বললেন না। তেতো মুখে তাকিয়ে রইলেন। মে
দেখে আমার বেড়ালের কথা মনে পড়ে গেল। হুলো বেড়াল।
যেভাবে তাকিয়ে থাকে তিনিও সেইভাবে তাকিয়ে আছেন।
বারচারেক হাই তুললাম। জানি হাই তোলাটা মেসোর একেব
নয়। তাই বারবার সেটাই করতে থাকলাম। কাউকে বিরক্তির
সীমায় নিয়ে গেলে সে কিছু অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে। এ
সবার ক্ষেত্রে এক নয়। বিভিন্নজনের বিভিন্ন সীমারেখা থাকে
আমি মেসোর দিকে তাকিয়ে আছি আর তিনি আমার দিকে।
আঁকো'-র মতো 'বসে তাকাও' প্রতিযোগিতা চলছে। কিছুক্ষ
থেকে আমি আবার হাই তুলতে তুলতে চোখ বন্ধ করে বলল
বললেন না তো কেমন আছেন?"
"তুমি আমাকে 'মেসো' বলে ডাকতে না?"
"ঠিক মনে পড়ছে না। অনেকদিন আসিনি তো, তাই ব্যাপার
ভুলে গিয়েছি। আমি মনে হয় আপনাকে 'স্যার'-ই বলতাম।"
"স্ট্রেঞ্জ! আমার তা হলে কেন মনে হচ্ছে যে তুমি আমাকে 'মে
গোছের কিছু একটা বলতে! বাই দ্য বাই, তুমি অনেকদিন আ
ঠিক। এটাও ঠিক যে, তুমি না এলেই এ বাড়ির মঙ্গল। তুমি
উন্মাদ। তোমার প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা সাংঘাতিক। মাকড়স
জাল বোনে তুমিও তেমন জাল বোনো তোমার প্রভাবের। ইঁ
স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম মাই হাউস। কখন যে আমার ওপরেও তো
অ্যাপ্লাই করে দেবে আমি বুঝতেই পারব না!"
বলে, তিনি চোখ বুজে ডিভানে হেলান দিলেন। আমাদের 'ব
প্রতিযোগিতা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হল। আমি হাই তুলতে ল
বেশ শব্দ করেই তুলতে লাগলাম। সেই শব্দ শুনে মেসো বল
কি কাফ সিরাপ খেয়েছ? না হলে এরকম আনকালচার্ডের ম
তুলছ কেন? আর দেখছি কথা বলার সময়ে চোখ বন্ধ করছ।
নতুন অভ্যেস?"
আমি বললাম, "এর আসল আবিষ্কর্তা হল ডোকরা।"
মেসো নাক-মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "সে আবার কে? তোমার
বন্ধুদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়।"
আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। ডোকরা আমার অতিশয়
তবে সে নিকৃষ্ট নয়। একেবারে সরেস।"
মেসো বললেন, "তুমি দিন-দিন অত্যন্ত ফাজিল হয়ে পড়ছ।
সঙ্গেও ফাজলামি করার চেষ্টা করে চলেছ অনবরত।"
আমার অভিসন্ধি কাজ করতে শুরু করেছে। অভিসন্ধি না ব
বলাই ভাল। এই থিয়োরি আমি বহুবার প্রয়োগ করেছি বহু
ওপর। প্রত্যেকবারেই সফল হয়েছে সেই এক্সপেরিমেন্ট। মানু
যে-কোনও অনুভূতির একেবারে শেষ সীমায় নিয়ে যেতে হ
হলেই তার আসল রূপ বেরিয়ে পড়বে। মানুষ চেনার সবচে
উপায় এটাই। সাইকোলজিতে কি নোবেলের ব্যবস্থা আছে?
আমি নিজের নামে একবার অ্যাপ্লাই করে দেখতাম। এইসব
মধ্যেই মেসো তাঁর বড় হাভানা চুরুটটা ধরিয়ে ফেললেন। এ
ছেড়ে কাশতে লাগলেন। আমারও মনটা সিগারেট-সিগারেট
লাগল। বললাম, "স্যার আপনি কবে থেকে হাভানা চুরুট ধ
মেসো চোখ না খুলে টান মারতে থাকলেন। এখন চুরুটের সু
সাদা ধোঁয়া থেকে কড়া নিকোটিন তাঁর রক্তের মাধ্যমে দেহে
কোষে ছড়িয়ে পড়ছে। মেসো বললেন, "আমার এক বন্ধু কে
রিসার্চ করতে গিয়েছিল হাভানায়। সেখান থেকে সে আমাকে
চুরুট পাঠায়। সেই যে ধরেছি আর ছাড়িনি। এক-একটা চুরুটে
থার্টি ডলারস আ পিস! আজকের হিসেবে বাষট্টি ইনটু তিরিশ
আঠারোশো ষাট টাকা করে।"

তিনি আবার চুরুট টানতে লাগলেন। আমি আবার হাই তুলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা স্যার, আপনি কখনও বিড়ি খেয়েছেন?"
মেসো যেন আকাশ থেকে পড়লেন। যেন এরকম কথা তিনি জীবনে কখনও শোনেননি। আর-একটা টান মেরে তিনি বললেন, "হোয়াট ডিড ইউ সে? বিড়ি? যা লেবার আর রিকশাওয়ালারা খায়? তুমি ভাবলে কী করে যে, আমি বিড়ি খাব? হেসো না রাসকেল। হাসি পাওয়ার মতো কিছু আমি বলিনি।"
আমি হাসতেই থাকলাম। মেসো অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। আমি জামার পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে বাগিয়ে ধরলাম মেসোর দিকে। বললাম, "পরীক্ষা করে দেখুন আপনার হাভানা চুরুট ভাল, নাকি আমাদের লোকাল ব্র্যান্ড মনসা বিড়ি ভাল। বিড়ির ধোঁয়ায় কিছুটা জলও থাকে। এর ধোঁয়া হাইড্রেটেড। ফুসফুসে দারুণ একটা ফিলিং আনে। নিন।"
মেসো যেন অধিক শোকে প্রস্তরীভূত হয়ে গেলেন। একজন ছাত্র যে তাঁকে বিড়ি এগিয়ে দিতে পারে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। রেগে উঠে বললেন, "হাউ ডেয়ার ইউ? স্কাউন্ড্রেল। তোমার মাসি তোমাকে লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে। সব সংস্কার ভুলে গিয়েছ? কীভাবে গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলতে হয় কেউ শেখায়নি?"
আমি বললাম, "চটছেন কেন স্যার? শিক্ষক আর পিতা সমান। আর ছেলের ষোলো বছর হলে পিতা তার বন্ধু হয়ে ওঠে। আমার কথা নয়। স্বয়ং চাণক্য বলে গেছেন। তিনি বলেছেন,
'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।।'

অর্থাৎ পুত্রের পাঁচ বছর পর্যন্ত তাকে লালন করা উচিত, তার পরের দশ বছর শাসন করা উচিত আর সে ষোলো বছরে পদার্পণ করলে তার সঙ্গে মিত্রের মতো আচরণ করা উচিত। তাই আমি আপনার ছাত্র-কাম-ছেলে-কাম-বন্ধুও হলাম। ঠিক কি না?"
মেসো কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "ইউ আর ভেরি রাইট। একটা বয়সের পর ছোটদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করাই শ্রেয়। না হলে জেনারেশন গ্যাপ তৈরি হয়। তোমার কথায় যুক্তি আছে। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান পাগল। খুব ডেঞ্জারাস ছেলে। দাও, দেখি তোমার বিড়ি। দেখি কেমন তার হাইড্রেটেড ধোঁয়া!"
মেসো আমার হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে চুরুটের সঙ্গে তুলনা করতে লাগলেন। পরীক্ষা করতে করতে তিনি মাঝে-মাঝে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না এই এত ছোট বস্তুটা তিনি খেতে চলেছেন। বিড়িটা ধরিয়ে বেশ কয়েকটা টান মেরে ডিভানে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। বিড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বললেন না বা চোখও খুললেন না। বিড়ি শেষ করে আরও অনেকক্ষণ তিনি চোখ বুজে রইলেন। তারপর বললেন, "ইউ আর রাইট মাই বয়। দিস স্মোক ইজ় রিয়েলি ফাইন অ্যান্ড হাইড্রেটেড টু। ইট ফিলস ভেরি নাইস। মাঝে-মাঝে আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয় তুমি ঠিক পাগল নও। তুমি পাগলের অভিনয় করো। এই অভিনয় করা যার-তার পক্ষে সম্ভব না। ওয়ান হ্যাজ় টু বি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট টু অ্যাক্ট দ্য ওয়ে ইউ ডু। ফার মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান অর্ডিনারি পিপল।"
এমন সময় বাইরে স্কুটারের শব্দ শোনা গেল। মেসো যেন কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি চুরুট ও বিড়ির শেষ অংশ লুকিয়ে ফেললেন। মুখের সামনে হাত নেড়ে ধোঁয়া সরাতে লাগলেন। বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, "শি ইজ় আ ভেরি টাফ লেডি। কঠিন মহিলা। ডোন্ট ইউ ডেয়ার টেল হার অ্যাবাউট দিস স্মোকিং সেশন।"
মাসি ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন। তারপর মেসোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসব কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তু
চুরুট ধরিয়েছিলে? দাঁড়াও দাঁড়াও, শুধু চুরুট নয়। এ যে বিড়ির
বাজে গন্ধ। কে খেয়েছে বিড়ি? এই বাড়িতে কীভাবে বিড়ি ঢুকল
আজ একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব।"
মেসো কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, "কী যে বলো, বিড়ি আবার
খাবে? আমি এই একটু শ্রীকান্তর সঙ্গে গল্প করছিলাম।"
মাসি আমাকে এতক্ষণে লক্ষ করলেন। বললেন, "ও মা শ্রীকা
কখন এলি? আচ্ছা, তুই কেমন ছেলে বল দেখি! দিনের পর দি
পর মাস পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ তোর কোনও পাত্তাই নেই। কী
তোর? তোর এই মাসিটা বেঁচে আছে কি না তা জানতেও তোর
করে না? আচ্ছা কুলাঙ্গার ছেলে দেখছি তুই! আচ্ছা, আমার কথ
না-ই ভাবলি, তোর ছাত্রের কথাও একবারের জন্য ভাববি না!
একটা।"
আমি মিষ্টি করে হাসলাম। একটু লাজুক ভাবও মিশিয়ে দিলাম
হাসিতে। মেসোর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়
মাসির মনোযোগ আমার দিকে ঘুরেছে দেখে তিনি একটু নিশ্চি
হয়েছেন। কিন্তু এই নিশ্চিন্ত ভাব কতক্ষণ থাকবে তা বলা মুশ
মাসিকে চুপ করানোর একটাই ওষুধ আমার জানা রয়েছে। মা
বকাবকি করতে লাগলেই মুখটা কাঁচুমাচু করে বলতে হবে, মা
খিদে পেয়েছে। ব্যস, আর দেখতে হবে না। মাসির চোখ ছলছ
উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রান্না করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কাজে
নিজে বাঁচার জন্য আর মেসোকে বাঁচানোর জন্য বলেই ফেলল
"মাসি, আমি আর মেসো কিন্তু খুব ক্ষুধার্ত। কাল থেকে তেমন
পেটে পড়েনি। মেসো বাড়ি ফিরে কিছুই খাননি।"
"সে কী? একটু আগে বলবি তো! আমি কি তোর মন পড়তে প
একটু দাঁড়া, এখনই আসছি। কার্তিকের শিঙাড়া এনেছি। সরষে
আর আচার দিয়ে মুড়ি মেখে নিয়ে আসছি শিঙাড়া দিয়ে। একটু
কর। খুব কষ্ট হবে না তো?"
আমি বললাম, "তা একটু হবে বই কী। কী বলেন মেসো?"
মেসো থতমত খেয়ে বললেন, "তা ঠিকই। তবে ওটুকু অসুবিধে
ওভারলুক করে নেব। তুমি তাড়াতাড়ি করো। বেচারা শ্রীকান্ত
থেকে না খেয়ে বসে আছে। দেখছ না মুখটা কেমন শুকিয়ে গে
রে!"
মাসি মুড়ি মাখতে চলে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, "মাসি, স
তেলের সঙ্গে পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কাকুচিও দিয়ো।"
হাসিমুখে মেসোর দিকে তাকালাম। দেখলাম, মেসো আমার দি
একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "এই যে বল
নাকি আমাকে 'স্যার' বলে ডাকতে। তা হলে এখন আবার 'মে
বললে? ইজ় দিস আ জোক?"
আমি বললাম, "আজ্ঞে না মেসো। মাসির সামনে 'স্যার' বলে
চেয়ে আপনিই বেশি বকুনি খেতেন। মাসি প্রথমে আমাকে ধম
আপনাকে 'মেসো' না বলে 'স্যার' বলার জন্য। তারপর আপন
ধমকাতেন এই বলে যে আপনি কেন আমাকে 'মেসো' না বলে
বলতে দিলেন। তাই ভাবিয়া করিলাম কাজ, করিয়া ভাবিলাম
ঠিক করেছি তো?"
মেসো চুপ করে থাকলেন। বুঝতে পারছি আমার কথাটা তাঁর ম
ধরেছে। তারপর বললেন, "আমি তোমাকে এ যাবৎ একজন প
ভেবে এসেছি। কিন্তু তুমি মোটেই পাগল নও। ইউ আর ভেরি
ইন্টেলিজেন্ট। রিয়েল ট্যালেন্ট। এরকম লোকেদের আমি খুব ভ
তোমাকেও ভয় পাচ্ছি। বেশ জাঁকিয়ে ভয় পাচ্ছি। তোমার প্রভা
বিস্তারের ক্ষমতার পরিচয় আরও একবার পেলাম। ইউ কনভি
স্মোক আ বিড়ি অ্যান্ড দ্যাট মেড মি ফিল ফ্যাবিউলাস! ইট ওয়
দ্যান হাভানা সিগার। তোমার কাছে কি আর বিড়ি আছে?"
"হ্যাঁ এখানে আসার আগে এক প্যাকেট মনসা বিড়ি কিনেছি।

মনোহরের কাছ থেকে। আপনার চাই?"

"অবভিয়াসলি। এতদিন আমি এই জিনিস থেকে বঞ্চিত আছি ভাবতেই পারছি না। ইটস রিয়েলি হাইড্রেটেড। এখান থেকে যাওয়ার আগে তুমি আমাকে ওই প্যাকেটটা দিয়ে যাবে। পরিবর্তে আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেব।"

"আমার টাকার দরকার নেই।"

"আলবত আছে। তোমার কাছে আমাকে টাকার প্রয়োজনীয়তা শিখতে হবে? যা দিচ্ছি চুপচাপ নিয়ে নেবে। এক অর্থে তুমি আমার উপকার করেছ। আমায় আর দাম দিয়ে হাভানা চুরুটের কিনতে হবে না। আই অ্যাম গ্রেটফুল ফর দ্যাট। বাই দ্য ওয়ে, হু ইজ় দিস মনোহর?"

"মনোহর আমার খুব প্রিয় লোক। পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান আছে ওর মেডিক্যাল মোড়ে। ওর কাছে নির্মলেন্দু চক্রবর্তীর নিজের হাতে সই করা দুটো বই আছে।"

লক্ষ করলাম একথা শুনে মেসো একটু নাক কোঁচকালেন। বললেন, "নির্মলেন্দুর সই করা বই থাকা কি খুব আশ্চর্য ব্যাপার?"

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার! মনোহর হল অতি সাধারণ ব্যক্তি। তবে ওর একটা অনবদ্য কাহিনি আছে। মনোহরের দোকানটা আসলে একটা ছোট্ট গুমটি। তাতে কোনওমতে একজন মানুষ বসতে পারে। মনোহর সেখানে সারা দিন বসে থাকে আর বই পড়ে। কখনও তাকে বই ছাড়া দেখিনি। একবার ইউনিভার্সিটির বাংলা ডিপার্টমেন্টে সাহিত্যিক নির্মলেন্দু চক্রবর্তী এসেছিলেন। আমি তার আগের দিন মনোহরকে সেই খবর জানিয়েছিলাম। পরের দিন আমি ক্লাস কামাই করে নির্মলেন্দুর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম বাংলা ডিপার্টমেন্টে। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে দেখি মনোহর নির্মলেন্দুর দুটো নতুন বই কিনে নিয়ে চলে এসেছে। তখনই বইগুলোয় সই করিয়ে নিয়েছিল। সেই থেকে সে আমাকে খুব খাতির করে। এখনও কি ওকে একজন অসাধারণ লোক মনে হচ্ছে না?"

মেসো চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, "মেসো আমাদের মধ্যেই এমন কিছু চরিত্র আছে যাদের ভাল করে লক্ষ করলে অনেক অসাধারণত্ব পাব।"

এমন সময়ে মাসি একটা ট্রে-তে তিনটে মুড়ির বাটি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সেন্টার টেবিলে ট্রে-টা নামিয়ে রেখে বললেন, "তা, তোমাদের কী নিয়ে এত আলোচনা চলছে?"

মেসো বললেন, "সেরকম কিছুই নয়।"

মাসি মুড়ির বাটিতে শিঙাড়া দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তুই মহা পাজি হয়েছিস ইদানীং। আমাদের কথা একটুও ভাবিস না। আমি তোকে পইপই করে বলেছি মাঝে-মাঝে এসে তোর ছাত্রকে সাহস জুগিয়ে যেতে। কিন্তু তোর আর সময় হচ্ছে না। বেকার ছেলের কী এত কাজ বল দেখি!"

আমি একমুঠো মুড়ি নিয়ে মুখে ফেলে খুব চিবোচ্ছি। এরপর শিঙাড়ার একটা কোণে কামড় দিয়ে বললাম, "খাওয়ার সময়ে কথা বলা আমি একদম পছন্দ করি না। এখন চুপ করো।"

মাসি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, "দিন-দিন তোর ফাজলামিও খুব বেড়ে চলেছে। আমার সঙ্গে ফাজলামি করবি না। আমি তোর ফাজলামির পাত্র নই।"

মেসো একগাল মুড়ি নিয়ে চিবোতে চিবোতে বললেন, "জেন্ডার ঠিকঠাক রেখে কথা বলো। জেন্ডারের ভুল মারাত্মক ভুল। তুমি কখনও পাত্র হতে পারো না। তুমি হলে পাত্রী। কাজেই কথাটা হবে, 'আমি তোর ফাজলামির পাত্রী নই।' বুঝলে?"

মেসোর কথা শুনে মাসি কিছুক্ষণ মুড়ি খাওয়া থামিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থম মেরে বসে রইলেন। আবহাওয়া বেশ গরম। ঝড়ের আগের অবস্থা। এখনই প্রবলবেগে আছড়ে পড়বে আয়লা-তিতলি জাতীয় কিছু। আমি নিস্পৃহ হয়ে মুড়িতে মনোযোগ দিলাম। মাসি আরম্ভ করলেন, "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা হল এই লোকটাকে বিয়ে করা।

আসলে কখনও কোনও মাস্টারকে বিয়ে করতে নেই। সারা জ
জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারে এই মাস্টারগুলো। সারা দিন শুধু পড়া
জীবন কী জিনিস তা কখনওই বোঝে না। অন্যদেরও সবসময়
মারার তাল করে।"

আমি বললাম, "মাসি, মেসো কিন্তু প্রফেসর। শুধু মাস্টার নন
যেমন-তেমন প্রফেসর নয়। খুব বিখ্যাত প্রফেসর। দেশে তো
সারা পৃথিবীতেই ওঁর নামডাক। তাবড় তাবড় ইউনিভার্সিটি থে
লেকচার দেওয়ার ডাক পান।"

মাসি ঝংকার দিয়ে বললেন, "তুই থাম। খুব এসেছে আমার প্র
সেদিন কী হয়েছে জানিস? বাজারে একটা মাছ কিনেছে। সাড়ে
টাকা কেজি। তা মাছটার ওজন হয়েছে এক কেজি সাতশো প
উনি তার দাম হিসেব করতে গিয়ে খাবি খাচ্ছেন। প্রফেসরি দে
অনেক দেখা আছে এরকম প্রফেসর। মাছওয়ালা ঝট করে ব
সাড়ে তিনশো টাকা কেজি দরে এক কেজি সাড়ে সাতশো মা
হল ছ'শো বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা। আবার একদিন ঠেলাগ
পটল কিনেছে। পাঁচশো পটলের দাম কষেছে তিনশো সতেরো
এই তো হাল! হুঁহ্, আবার প্রফেসরি ফলানো হচ্ছে! এরকম প্র
আমি এক হাটে কিনে আর-এক হাটে বিক্রি করে দিতে পারি,
টেরও পাবেন না।"

মেসো করুণ মুখে মুড়ি চিবোতে লাগলেন। আমি ভাবতে থাক
কী জিনিস এই প্রেম! মাসি যতই মেসোর বদনাম করুক, মেসে
কয়েকদিনের জন্য বিদেশে পাড়ি দিলে মাসিরই সবচেয়ে মনখ
থাকে। বলে বেড়ান, "হাবা মানুষটা এতদূর গেল! ঠিকঠাক পৌঁ
পারবে কি না কে জানে! ওদের বাপ-ব্যাটার কাজই হল আমা
চিন্তায় ফেলা! জীবনটা জ্বলে গেল আমার।" তবে ভালবাসার
মুখে কখনও বলবেন না। মুড়ি খাওয়া শেষ করে আমরা গরম
বসলাম। আপাতত মাসি-মেসোর ঝগড়া বন্ধ রইল। আমরা ত
একমাত্র ছেলে পরমের কথায় চলে এলাম। মেসো বললেন, "
আ লস্ট কেস। আমি ওর কাছে কোনও আশা রাখি না। জানি
নেট ক্লিয়ার করতে পারবে না। সেই মেন্টাল সেট-আপ ওর নে
দিনে একঘণ্টাও মন দিয়ে পড়ে না। কীভাবে সে পাশ করবে ে
শক্ত পরীক্ষা? আই অলসো সাপোজ় দ্যাট হি হ্যাজ় নট বিন ে
স্টেবল অফ লেট। তুমি কি ইদানীং ওর হাসি দেখেছ? একটান
চলে। কোনও সাধারণ মানুষ ওভাবে হাসতে পারে না। আ ল
আই সে।"

মাসি বললেন, "নিজের ছেলের নামে এরকম বলতে তোমার
করে না? অবশ্যই ও পাশ করবে। শ্রীকান্ত, তুই শুধু একটু সা
ওকে। দেখবি, খুব ভালভাবে ও নেট পাশ করবে। আসলে এ
ও টেনশন নিতে পারে না। পড়তে বসলেই বলে বুক ধড়ফড় ক
পরীক্ষার হলে গিয়ে ওর কীসব যেন হয়! কোয়েশ্চেন পেপারে
লেখাগুলো ওর সামনে ওড়াউড়ি করে। আগের বার পরীক্ষার
কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল। তোর মেসো আর আমি গিয়েছি
ওর সঙ্গে। বেরিয়ে এসে বলল যে 'আলফা' নাকি ওর গালে ক
দিয়েছে। অবাক হয়ে দেখলাম গালের একটা অংশ বেশ ফুলে
আর টকটকে লাল হয়ে আছে। কী যে করি ওকে নিয়ে! পড়তে
আনমনা হয়ে পড়ে। বলে একই জিনিস আর পড়তে ভাল লাগ
এই বলে বাইক নিয়ে পাড়ায় চক্কর মারতে বেরিয়ে পড়ে। তুই
আগেই বেরোল। কখন ফিরবে জানি না। তবে তোকে এখানে
ও খুব খুশি হবে। একমাত্র তোকেই ভরসা করে ও, আর কাউ
সেদিন ওর বাবাকে বলল, 'তুমি কিছুই জানো না। আমাকে ে
নিজের মতো করে থাকতে দাও।' কী যে মুশকিলে পড়েছি। তু
থাক বাবা। এখনই এসে পড়বে।"

বললাম, "মাসি আজ আর বসতে পারব না। প্রচুর কাজ জমে
মাসি রেগে গিয়ে বললেন, "বেকার ছেলে তুই, তোর যে এত

বুঝি না বাপু।"
মেসো বলে উঠলেন, "দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ..."
মাসি ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি চুপ করো। তোমার জন্যই পরম এরকম হচ্ছে। যেমন বাপ তার তেমন ব্যাটা। দু'জনে মিলে আমাকে শেষ করে দিল।"
আমি উঠে বললাম, "আজ আমি উঠি মাসি। আবার পরে আসব," বলে বেরিয়ে আসতে লাগলাম। দরজা অবধি এসে আবার মেসোর কাছে ফিরে গিয়ে পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করে মেসোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "মেসো, নিন আপনার মনসা বিড়ি। ওই এক হাজার টাকা এখন আপনার কাছেই গচ্ছিত রাখুন। দরকার মতো আমি আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেব।"
মাসির দিকে তাকিয়ে দেখি মাসির অধিক শোকে পাথর-পাথর অবস্থা। তিনি যেন ঘটনাটাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। খুব গভীর নিম্নচাপের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। এই খবর হয়তো এতক্ষণে হাওয়া অফিসে পৌঁছে গেছে। একটু পরেই তারা রেডিয়ো, টিভিতে ঘোষণা করবে পূর্বাভাস। আমি আর অপেক্ষা না করে সটান দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। করুক ওরা ঝগড়া। ঝগড়া করে ওরা ওদের ভালবাসাকে আরও মজবুত করুক। বেরিয়ে এসে অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে আমি আমার গন্তব্যহীন হাঁটা শুরু করলাম। ফের আরম্ভ হল অন্তহীন পথ চলা। 'চলি চলি চলি চলি পথের যে নাই শ্যায...'
'কবিকে দিও না দুঃখ, দিলে সে-ও জলে-স্থলে হাওয়ায় হাওয়ায়
নীলিমায় গেঁথে দেবে দুঃখের অক্ষর। কবি তার নিঃসঙ্গতা
কাফনের মতো মুড়ে রাখে আপাদমস্তক, হাঁটে ফুটপাথে একা'

১০

গন্তব্য না থাকলেও পথ বুঝি পথিককে নিজের মতো কোথাও নিয়ে যায়। বুঝতে পারে পথিকের মন। সবার ক্ষেত্রে পারে না, কিছু মানুষের হয়তো পারে। যাদের সঙ্গে পথের মনের সম্পর্ক তাদের পারে। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ভানু সাহার শুঁড়িখানার সামনে চলে এসেছি বুঝতে পারিনি। মাতালের বিলাপে আমার ধ্যানভঙ্গ হল। শুঁড়িখানার ভেতর থেকে অনেক মাতালের জড়ানো গলা ভেসে এল। মাতাল বিভিন্ন ধরনের হয়। কোনও মাতালের পেটে মদ পড়লেই দুঃখ উথলে ওঠে। আবার কোনও মাতালের আনন্দের স্ফুরণ ঘটে। তবে মাতালের মনস্তাপ বড় কঠিন জিনিস। এই মাতালদের মধ্যে আমার বেশ কিছু পরিচিত মাতাল আছে। তারা বিখ্যাত তাদের মদ খাওয়ার প্রতিভার জন্য। এমনই একজন হল পীতাম্বর। লোকে বলে মোদো পীতাম্বর। পীতাম্বরের সঙ্গে আমার খুব ভাব। পীতাম্বর আমাকে দেখলে আর ছাড়তে চায় না। সারা দিন কুলিগিরি করে বর্ধমান স্টেশনে। তারপর সন্ধে থেকে বসে পড়ে ভানু সাহার শুঁড়িখানায়। পেটে কয়েক পাত্তর পড়লেই তার অদ্ভুত সব ভাব আসে। কখনও সে ভাব আনন্দের আবার কখনও বিষাদের।
ভানু সাহা হিসেবি, তালেবর লোক। মাতালদের সামলানো তো আর যে-সে কাজ নয়। ব্যবসায়িক বুদ্ধি লাগিয়ে অনেকরকম কাজ ফেঁদেছে ভানু। সবগুলোই রমরমিয়ে চলছে। বর্ধমানে তার বেশ নামডাক। যদিও সেই নামডাক খুব ভাল কিছু নয়। তবে ভানুর মতে ভাল-খারাপ হল আপেক্ষিক ব্যাপার। একজন খুনি বা চোর তার নিজের কাছে সবসময়ই ভাল। অন্যের চোখে খারাপ হতে পারে। তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কী? না, ভাল-খারাপ বলে কিছু হয় না। মানুষই এসবের হিসেবনিকেশ করে থাকে।
আমাকে দেখে ভানু সাহা বেশ জোরালো গলায় হাঁক মারল, "এই যে শ্রীকান্তদা, একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন অধমের দোকানে।"
হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুমম। বাড়ির সব খবর ভাল?"
"আপনাদের কৃপায় সব ঠিকঠাক আছে। আমারও কোনওভাবে দিনমান কেটে যাচ্ছে। কোনও অসুবিধেয় পড়তে হয়নি এখনও পর্যন্ত, এ
ভরসা। দারোগাদের মাসোহারার ব্যবস্থা আছে। গুন্ডাদেরও আছে
তাই তেনারা বড় আসেন না এদিকপানে। তা আসেন না একটিব
দোকানে।"
আমি বললাম, "তোমার দোকান বড় পবিত্র জায়গা হে! পাপী-ত
মানুষেরা পাপ ধুতে আসে। কী বলো?"
"দাদার রসিকতা করার অভ্যেসটা গেল না। এই পথে কি ভুল ব
আমি গিয়ে বসলাম তার গদির পাশে। ভানু বলল, "আজকালক
টিকে থাকা খুব মুশকিল দাদা। সব জিনিসপত্রের যা দাম! হাত দি
গেলে হাত পুড়ে যায়। এই যে দেখছেন পচুই মদ, এ তৈরি করতে
লাগে। তা বাখর আজকাল প্রায় সোনার দামে গিয়ে ঠেকেছে। ম
দামও বাড়াতে পারি না। মাতালগুলো তা হলে মহা ঝামেলা কর
যে বিপদে পড়েছি! ওরে ও গদাই, শ্রীকান্তদাকে চাট্টি চাট দিয়ে য
গদাই গদাইলশকরি চালে আমার সামনে একপ্লেট চাট রেখে গে
চাল দেখে ভানু রেগে উঠে বলল, "এই শালা গদা, ওরকম হেল
চলছিস কেন? চনমন করে কাজ করতে পারিস না? দেব শালা ব
মেরে ভাগিয়ে, তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল," তারপর আমা
তাকিয়ে বলল, "দোষ নেবেন না দাদা। শালাদের ধমক না মারলে
কেলিয়ে বসে থাকবে। কিচ্ছু কাজ করবে না।"
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুম। বেশ জোরদার ধমক-
করতে পারো দেখছি। তোমার গলাটাও খাসা। এ লাইনে তোমার
ভানু বিগলিত হয়ে বলল, "হেঁ হেঁ হেঁ। তা আপনি আশীর্বাদ কর
হয়ে যায় কোথায়! আপনি হলেন গিয়ে বাকসত্য মানুষ। পরমহং
বলা যেতে পারে। হেঁ হেঁ হেঁ।"
আমি চাটের প্লেট থেকে একটা ভাজা মাংসের টুকরো তুলে মুখে
চিবোতে লাগলাম। ভানু বকে যেতে থাকল, "জানেন দাদা, আম
আজ পর্যন্ত বিষ পাওয়া যায়নি। পচুই মদ বড় জটিল জিনিস। এ
উনিশ-বিশ হলেই মদ আর মদ থাকে না, বিষ হয়ে যায়। খেলেই
মৃত্যু। কী জিনিস ভাবুন! টাটকা থাকলে ভাত, আর পচে গেলে ম
হেঁ হেঁ।"
হাই তুলতে তুলতে বললাম, "হুম। ছিল চশমা, হয়ে গেল বেড়া
"কী যে বলেন দাদা, চশমা সারা জীবন চশমাই থাকে। কোনওদি
বেড়াল হতে পারে না। রসিকতার অভ্যেস গেল না। হেঁ হেঁ হেঁ।"
এমন সময়ে মহা শোরগোল শোনা গেল শুঁড়িখানার ভিতর থেকে
উঠে যেতে যেতে বলল, "আবার কোন শালা ঝামেলা পাকিয়ে
আমি মন দিয়ে চাট খেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি পীতাম্বর
কলার ধরে নিয়ে আসছে ভানু। সামনে এনে আচ্ছা করে দু'চড় ক
দিল তার গালে।
আমি বললাম, "ভেরি গুড ভানু। গাঁধীজি বলেছেন, কেউ এক চ
রাজি না হলে অন্য গালে আর-এক চড় লাগিয়ে দিতে।"
ভানু অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। বলল, "তা কেন? গাঁধী
বলেছেন এক গালে চড় মারলে আর-এক গাল এগিয়ে দিতে। ত
পড়েছিলাম ইশকুলে।"
আমি বললাম, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমি একটু মডিফাই করে বল
আর কী। তা দেরি কেন, লাগিয়ে দাও আর-এক গালে আর-এক
ভানু পীতাম্বরের অপর গালে আর-একটা চড় দিতে উদ্যত হয়েও
নামিয়ে নিল। আমি বললাম, "কী হল ভানু? থামলে কেন? চাল
ভানু পীতাম্বরকে ছেড়ে গদিতে এসে বসল। বলল, "থাক, ও এখ
নেই। বেহুঁশ লোককে মারতে ইচ্ছে করে না।"
ছেড়ে দিতেই পীতাম্বর মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। তার বেশ জমিয়ে
নেশা হয়েছে। মুখ দিয়ে নাল-ঝোল পড়ে যা-তা অবস্থা। মাটিতে
গোঙাচ্ছে। কেমন কান্না-কান্না গোঙানি। ভানু একদৃষ্টে চেয়ে আছে
তার দিকে। ভানুর চোখে কি একটু মায়া খেলে যাচ্ছে? আমার অ
আজকাল মায়ার অসুখ হয়েছে। বিশ্রী অসুখ। সবকিছুর মধ্যেই ম

দেখতে পাই। এরকম হওয়া উচিত নয়। একেবারেই উচিত নয়। আমি সাধারণের মতো আচরণ করলে হবে না। আমাকে হতে হবে অসাধারণ। অনাথ আশ্রমের সেই লোকটাকে মনে পড়ে। তার কাছে রাতে যেতে হত। সে আমাদের ধরে চটকাত। অন্যেরা খুব কাহিল হয়ে পড়ত, কিন্তু আমি স্বাভাবিক থাকতাম। আমি আর-পাঁচজনের মতো হতে পারি না। আমার সামনে কোনও দায়িত্ব নেই। নেই কোনও দায়। আমরা দায়ভার বহন করি না। আমরা অন্য শ্রেণির। কিন্তু কয়েকদিন ধরে যেন আমার সেই ব্রত ঠিকমতো রক্ষা করা হচ্ছে না। মায়ায় পড়ে যাচ্ছি। মায়ার বাঁধন বড় কঠিন বস্তু। মাতালের মনস্তাপের চেয়েও কঠিন। মায়া কাটাতে কয়েকদিন আমাকে অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে।

পীতাম্বরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভানু বলল, "পীতাম্বর লোকটা ভালই। কোনওদিন ঝামেলা করে না। আজ কেন করল কে জানে। আজ টাকাও দিচ্ছিল না। তার ওপর গদাইকে চড় মেরেছে। তাই মাথাটা একটু গরম হয়ে গেছিল। বেচারা কেমনভাবে পড়ে আছে, দেখলেও খারাপ লাগে।"

বললাম, "বাজে কাজ করেছে তাই মার খেয়েছে।"

ভানু তবুও বলে যেতে থাকল, "মদ পেটে পড়লে ওরা আর সাধারণ থাকে না। তাই একটু শক্ত হতেই হয়। কিন্তু ইচ্ছে করে না শক্ত হতে। আমার কি বয়স হয়ে যাচ্ছে দাদা? আমি কি বুড়ো হয়ে পড়ছি?"

আমি বললাম, "তা বুড়ো তো হচ্ছই। বয়স প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে ঠেলছে আমাদের সবাইকে।"

ভানুর কেমন যেন একটা পরিবর্তন হল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার চোখ ভিজে ভিজে লাগতে লাগল। একটু পরে বলল, "দাদা জানেন, আমি বড় পাপী মানুষ। অনেক অপরাধ করেছি। বহু মেয়েছেলেকে ভোগ করেছি। ব্যবসার জন্য দু'জনকে খুন করেছি। আপনাকেই বললাম। আর কাউকে কখনও বলিনি। তবে এখন মনে হয় পাপগুলো না করলেও জীবন কেটে যেত। খুব অনুশোচনা হয়। কাউকে বলতে পারি না, তাই আরও কষ্ট হয়।"

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "তা বেশ করেছ। দরকার হলে আরও করবে। তবে কাউকে বলবে না। আমাকেও নয়। মানুষের মন বড় পাপী বস্তু হে। কখন যে কী হয় বলা কঠিন। আর মহাপুরুষেরা বলে গেছেন দেওয়ালেরও নাকি কান-টান কীসব রয়েছে, ঠিক কি না?"

ভানু দুঃখিত স্বরে বলে উঠল, "আজ্ঞে, সেই জন্যই আপনাকে আমি পরমহংস বলি।"

"ওসব হংস-ফংস হয়ে কাজ কী ভানু?"

"আপনার না থাকতে পারে, কিন্তু আমরা জানি, আপনার ব্যাপার-স্যাপার আর-পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো নয়। যাই হোক, এবার পীতাম্বরকে বাড়ি পৌঁছনোর ব্যবস্থা করি। ওরে ও গদাই, মোড় থেকে একটা রিকশা ডেকে পীতাম্বরকে একটু পৌঁছে দিয়ে আয়।"

আমি বললাম, "গদাইকে ছাড়ো। রিকশা এলে আমিই ওকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। আচ্ছা ভানু, তোমার কাছে মহুয়া আছে?"

"মহুয়া দিয়ে কী করবেন? আপনি তো এসব স্পর্শ করেন না।"

আমি বললাম, "ভাবছি ধরব। ধরে পাপমুক্ত হব।"

ভানু আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারছি আমাকে নিয়ে তার কনসেপ্ট পুরো ঘেঁটে গেছে। মাঝে-মাঝে নিজেকে নতুন নতুন রূপে পেশ করতে বেশ ভাল লাগে। সব ভাবমূর্তি নিমেষে ভেঙে ফেলে নতুন মানুষ হতে সবাই পারে না। এর জন্য শক্তি লাগে। সেই শক্তি সবার থাকে না।

আমি রিকশায় পীতাম্বরকে নিয়ে উঠে বসলাম। সঙ্গে ভানুর দেওয়া স্পেশ্যাল মহুয়া। মহুয়ার ঝরা ফুলের ফারমেন্টেশন করে বানানো হয় এই অদ্ভুত জিনিস। রিকশায় উঠে দেখলাম পীতাম্বরের নেশা অনেকটা কেটে গেছে। ভানুর চড়ের গুণেই হয়তো। সে বেশ স্বাভাবিক আচরণ করতে লাগল। দু'-একটা কথাও বলতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "পীতাম্বর, আজ টাকা দিলে না কেন?"

পীতাম্বর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পরে বলল, "আ
সারা দিনের ইনকাম ফুলিকে দিয়ে দিয়েছি।"

আমি বললাম, "ফুলি কে?"

"ফুলি হল ইস্টিশনের এক ভিখিরি। সে তার মেয়েকে আজ ইশ
ভর্তি করেছে, তাই টাকার দরকার ছিল। আমি ওকে সব টাকা দি
দিয়েছি। পড়ুক মেয়েটা," বলে চুপ করল।

"তা বেশ করেছ। তা হলে আজ আবার শুঁড়িখানায় গেলে কেন
"সন্ধেবেলা ওটা না হলে আমি থাকতে পারি না। বউ আর ছে
মনে পড়ে যায়," বলে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

পীতাম্বরের বউ আর ছেলে একসঙ্গে পুড়ে মারা যায়। তারপর
পীতাম্বর পাঁড় মাতাল। আমি তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতেই সে বি
পড়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ল। রিকশাওয়ালাকে ছেড়ে দিয়ে
মহুয়া হাতে হাঁটা লাগালাম। রাতের পথ আমাকে ডাকে। এ ডা
অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কারও নেই। তার ওপর রাতে যদি পথে
চাঁদের আলো... সেই আলো পৃথিবীকে পরিণত করে এক অন্য
এক মায়াপুরীতে। সেই জ্যোৎস্না-জগতে নেই কোনও দুঃখ, ক
শুধু মায়া। অপরিসীম মায়া। আমার বিন্দুমাসির চেয়েও অনেক
বেশি মায়া।

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম ডোকরার ঘরের কাছে। দেখি ডো
বারান্দায় বসে আছে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে। সামনে একটা কা
গোলাকার টেবিল। তার ওপরের পাটাটা ঘোরে। টেবিলের পা
কয়েকটি টুল। একটা টুলে কিছুটা মাটি। আর-একটা টুলে মাটি
বানানোর নানা সরঞ্জাম। পরের টুলে স্বয়ং ডোকরা। আমি ঢুকে
পিঠে চাপড় মেরে বললাম, "কী রে, তোর অবস্থার কিছু উন্নতি
যথারীতি কোনও উত্তর পেলাম না। জানতাম পাব না। তবুও
করতে বেশ ভাল লাগে। তার নিরুত্তর থাকার কারণেই হয়তো
করতে ভাল লাগে। ফটাফট উত্তর দিয়ে দিলে আর প্রশ্ন করার
উৎসাহ পেতাম না। আমি দ্বিগুণ উৎসাহে জিজ্ঞেস করলাম, "
কিছু খেয়েছিস?"

ডোকরা নিরুত্তর।

এবার আরও উৎসাহ নিয়ে বললাম, "আচ্ছা ঠিক আছে, মুখে
বলতে হবে না। চোখের পলক ফেল। তোর উত্তর 'না' হলে এ
পলক ফেলবি আর 'হ্যাঁ' হলে দু'বার। বুঝলি? 'না'-এর জন্য এ
বললাম, কারণ তোর প্রায় সব উত্তরই হবে 'না'। কাজেই তো
খাটতে হবে। এবার বল, সারা দিন কিছু খেয়েছিস?" তবুও ডে
নিরুত্তর। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি তার চোখের দিকে। কি
সে একবার পলক ফেলল। দ্বিতীয়টার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক
কিন্তু পড়ল না। বললাম, "চল, তোকে খাইয়ে আনি রবির দো
থেকে।" অনেক রাত হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মন বলছে রবি
এখনও হোটেল খোলা রেখেছে। আমার অনুমান মাঝে-মাঝে
যায়। তবে আজ যদি না মেলে তা হলে মুশকিল আছে।

দু'জনে হাঁটা লাগালাম। বেশি দূর নয় রবির হোটেল। আমরা
জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মায়াজগতের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকলাম।
ডোকরার চোখ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে মায়াজগতের সৌন্দর্যে। সে
পান করছে পৃথিবীর রূপ। ডোকরার মাথা কাজ না করলেও চো
কাজ করে যাচ্ছে। আমরা হাঁটতে থাকলাম।

রবির হোটেলে পৌঁছে দেখি ঝাঁপ ফেলার প্রস্তুতি চলছে। রবি হি
মেলাচ্ছে। আমি গিয়ে বললাম, "রবিদা, ভাল আছ?"

রবি নির্বিকার চোখে তাকাল। ডোকরাকে দেখে তার নির্বিকার
আরও কিছুটা বাড়ল মনে হল। সে বলল, "শ্রীকান্তদা, আপনি
করেন! এত রাতে কেউ আসে দোকানে? এখন তো আর কিছুই
নেই। আজ একটু বেশিই ভিড় হয়েছিল। তিন দফা রান্না করতে
এখন আর কিছুই পাবেন না।"

এই সময় হরে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। আমাকে দেখে বিগলিত হয়ে গেল। বলল, "আরে শ্রীকান্তদা যে! আপনি এত রাতে! কতদিন আসেননি বলেন দেখি! আমার কথা ভুলে গেছিলেন নাকি? হেঁ হেঁ হেঁ। আসেন আসেন, ভেতরে আসেন। আমরা নিজেদের জন্য ভাত চড়াচ্ছি। আজ সারা দিন প্রচুর ভিড় হয়েছে। কিছুই বেঁচে নেই। তাই এখন রান্না বসাতে হচ্ছে। আমাদের ভাতে আর-একটু বেশি চাল দিয়ে দেব। আপনার আর আপনার বন্ধুর খুব হয়ে যাবে। আসেন।"

আমি রবির দিকে তাকালাম। রবি বলল, "যান, খেয়ে নিন। আমি আজ আর থাকতে পারব না। মেয়েটার একটু জ্বর এসেছে। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। ঠিক করে খাবেন। এখন যান, অনেক রাত হল।"

আমরা আর দ্বিরুক্তি না করে ভেতরে গেলাম। দেখলাম ভেতরে বড় চুলো জ্বলছে। তাতে একটা হাঁড়ি চড়ানো। পাশে একজন একটা মুরগি কাটছে। হরে বলল, "আজ বড় ভাল সেল হয়েছে সারা দিন। তাই মালিক খুশি হয়ে মাংস খাওয়াচ্ছেন আমাদের। আপনারাও খান আমাদের সঙ্গে। নধর দেশি মুরগি। খেয়ে বড় আরাম পাবেন। এখন একটু বসেন তো দেখি চেয়ারে। আমরা হাতের কাজগুলো করে নিই।"

রান্নাবান্না করে খেতে অনেক রাত হয়ে গেল। হরের আন্তরিকতায় রান্না আজ অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আজ আর পানের ব্যবস্থা করতে পারল না হরে। সেই জন্য খুবই দুঃখিত দেখাতে লাগল তাকে। আমি তাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে ডোকরাকে নিয়ে ফিরে এলাম তার ডেরায়। এসে লক্ষ করলাম ডোকরা নিজের টুলটাতে বসে পড়ল, তার চোখের সেই ভ্যাবাচ্যাকা দৃষ্টি এখনও কাটেনি। নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। আমি তাকে বললাম, "ডোকরা, তোর মাথা খুলেছে?"

সে তাকাল আমার দিকে। নিষ্পলক। আমি বললাম, "মুখে বলতে না পারিস পলক ফেল।" সে একবার পলক ফেলল। আমি বললাম, "আচ্ছা, চিন্তা নেই। তোর জন্য মগজের মহৌষধ এনেছি। তোর এখানে কাপ বা গ্লাস আছে? থাকলে নিয়ে আয় চটপট।"

ডোকরা ভেতরে গেল আর আমি মহুয়ার বোতল বের করে ফেললাম। সে দুটো গ্লাস আনল। আমি বললাম, "দুটো গ্লাসে কী হবে রে গাধা কোথাকার? আমার কি মগজ বন্ধ হয়ে আছে যে, আমি ওষুধ খাব? তোর মাথা বন্ধ, তুই ওষুধ খা। দে দেখি গেলাসটা," বলে এক গ্লাস মহুয়া ঢেলে দিলাম। গ্লাসটা ওকে দিয়ে বললাম, "ক্রিয়েটিভ কাজ করতে গেলে মাঝে-মাঝে নার্ভকে ঝাঁকুনি দিতে হয়। তোর নার্ভকে আজ জোরালো একটা ঝাঁকুনি দেব। নে, ঢক করে মেরে দে।"

ডোকরা আমার কথা শুনে এক গ্লাস মহুয়া মেরে দিল। আমি আর-এক গ্লাস ভরে দিলাম। সে সেটাও শেষ করে দিল। ধীরে ধীরে পুরো বোতলটাই সে শেষ করে ফেলল। তারপর মেঝেতেই ঘুমে ঢলে পড়ল। আমি চেয়ারে ঠেস দিয়ে মাথা এলালাম।

কতক্ষণ কেটেছে জানি না। একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি ডোকরা পাগলের মতো গোল টেবিলে মাটি দিয়ে কিছু করছে। কোনও বাতি জ্বলছে না। চারিদিকে জ্যোৎস্নার বন্যা। বারান্দায় অঢেল চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় মত্ত হয়ে ডোকরা মূর্তি গড়ে চলেছে। একতাল মাটি কীভাবে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, তা ডোকরাকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। দেখতে দেখতে কাদামাটি অপরূপ নারীরূপে পেশ করল নিজেকে। সেই মূর্তি মসৃণ নয়। কিন্তু এই অমসৃণতাই যেন মূর্তির শোভা কোটিগুণে বর্ধিত করেছে। প্রাণ এনে দিয়েছে মাটির মূর্তিতে। মূর্তি শেষ হতে হতে রাত প্রায় গড়িয়ে গেল। শুক্লপক্ষের চাঁদ অস্ত গেল আকাশে। নতুন দিনের রবি জেগে ওঠার প্রস্তুতিতে মন দিয়েছে। মূর্তি গড়া শেষ করে ডোকরা গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ল। এমন গভীর ঘুম হয়তো সে অনেকদিন ঘুমোয়নি। তলিয়ে যাক সে সুষুপ্তির গভীরে। পাড়ি দিক ঘুমের অচিন দেশে। আমি জানি, তার নার্ভ একটা অভূতপূর্ব ঝাঁকুনি খেয়েছে আজ। তার ব্লকেজ কেটে গেছে। সে এখন অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে। ঘুমোক ডোকরা। জীবনে[...]
ঘুমটা ঘুমিয়ে নিক আজ।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। পথে নেমে দেখি তুমুল কুয়াশা। কেউ যে[...] পরদা দিয়ে চরাচর ঢেকে দিয়েছে। পরদা সরিয়ে সরিয়ে আমি হেঁ[...] চলেছি। আমার চলার মধ্যে কেমন যেন একটা টলমলে ভাব। ম[...] হচ্ছে অন্য কোনও ভুবনে রয়েছি। এই অবস্থায় আবার দেখলাম [...] ভোরপরিকে। রাত জাগলে কি দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়? মোহনবাগান[...] পাশ দিয়ে আসার সময়ে দেখলাম কয়েকজন অতি লম্বা মানুষ ধ[...] মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। আমার গা ঘেঁষেও কতজন অদ্ভুত লোক [...] গেল। হয়তো রাতের ডিউটি শেষ করে তারা ফিরছে যে-যার নি[...] জায়গায়। ভোরপরি আমার মাথার চারপাশে ঘুরতে লাগল। আম[...] কথোপকথন চলতে থাকল।

পরি: কেমন আছ?

আমি: আমি সবসময় ভাল থাকি। তুমি কেমন আছ ভোরপরি?

পরি: আমিও ভাল আছি। তুমি তো নিশাচর। আমাকে তোমার স[...] একদিন রাতে ঘুরতে নিয়ে যাবে? আমি প্রতিদিন খুব ভোরে উঠি[...] আমারও ইচ্ছে করে একদিন তোমার সঙ্গে সারা রাত ঘুরে বেড়া[...]

আমি: অবশ্যই নিয়ে যাব। যেদিন যাব সেদিন তোমার নাম হবে [...] রাতপরি। কেমন?

আমাদের কথা চলতেই থাকল। আমিও হাঁটতে থাকলাম। মেসে [...] রাতের ক্লেদ কাটানোর জন্য কিছুক্ষণ ঘুমোতে হবে। সারকেডিয়া[...] চক্রকে উলটে দিতে হবে।

১১

চোখ মেলতেই দেখি বিরজাবাবু বিরস মুখে বসে আছেন ঘরের চেয়ারটায়। আমি দেখেও না দেখার ভান করলাম আর ঘুমের ভ[...] মটকা মেরে পড়ে রইলাম। কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তাকে জাগানো [...] কিন্তু ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলে সে ঘুম ভাঙানো সহজ কথা[...] জানি, বিরজাবাবু খুব কঠিন বস্তু। আমি যদি সারা দিন না উঠি, [...] সারা দিন চেয়ারে ওইভাবেই বসে থাকবেন। ঘণ্টাখানেক ওভাবে[...] রইলাম। তারপর ধড়ফড় করে উঠে বসলাম, যেন এইমাত্র ঘুম ভ[...] উঠে বিরজাবাবুকে দেখে ততোধিক অবাক হওয়ার ভান করলাম[...] মনে হল বিরজাবাবু আমার অভিনয় বুঝে গেছেন। বিরজাবাবু ক[...] আশ্চর্য হন না। তাঁর এই আশ্চর্য না হওয়া আমাকে আশ্চর্য করে[...] অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, ওরকম হতে পারিনি। আমি উঠে হাত[...] ধোওয়া পর্যন্ত তিনি মুখে কিছু বললেন না। প্রাতঃকৃত্য সেরে ফি[...] জিজ্ঞেস করলাম, "চিঠি কই?"

বিরজাবাবু এতেও অবাক হলেন না। একটা ভাঁজ করা কাগজ আ[...] দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি ভাঁজ খুলে পড়া শুরু করলাম। অন্য[...] হলে এখনই পড়তাম না। আসলে চিঠি যতক্ষণ না পড়া হচ্ছে ত[...] রহস্য। পড়ে ফেললেই সব রহস্য শেষ। অবশ্য প্রেমিকার চিঠি হ[...] অন্য ব্যাপার। তা যতবারই পড়া হয় ততবারই রহস্য আরও ঘনী[...] হয়ে ওঠে। ঘন হয়ে ওঠে ভালবাসা। বিরজাবাবুর হাতে তো কোন[...] প্রেমিকা চিঠি পাঠাবে না। নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন অরিত্রর বাবা। অ[...] হয়তো চিঠি খুলে দেখব, 'শ্রীকান্ত, তোমার ভবঘুরে জীবন তোমা[...] খুব লোভনীয় হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তোমার জীবনধারা যে স[...] গ্রহণ করতে হবে এমন কোনও কথা নেই... ' এই গোছের কিছু। [...] চিঠি খুলেই একটা ধাক্কা খেলাম। চিঠিটা অরিত্রর বাবা লেখেননি[...] লিখেছে তার বোন অয়স্তিকা। বেশ কড়া ভাষা।

শ্রীকান্তদা,

জানি আপনি আমাদের ভাল চান না। কিন্তু এরকম ক্ষতি করবে[...]



স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কাল সকালে দাদা বাড়ি ফিরেছে। সঙ্গে নতুন বউ এনেছে। কোন এক চায়ের দোকানির মেয়ে। বর্ধমানের এক বস্তি এলাকায় থাকে ওরা। দাদার কাছে শুনলাম এই বিয়েতে মুখ্য অনুঘটক হলেন আপনি। এই ঘটনায় বাবা কাল থেকে শয্যাশায়ী। মা কাল থেকে কিছুই মুখে তোলেননি। আপনি কীভাবে আমাদের এতবড় ক্ষতি করতে পারলেন বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা তো আপনার কোনও ক্ষতি করিনি!

যাই হোক, পত্রপাঠ আপনি আমাদের বাড়িতে চলে আসবেন বিরজাবাবুর সঙ্গে। বিরজাবাবু গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। সেই গাড়িতেই আপনি চলে আসবেন। আপনাকে ছাড়া বিরজাবাবু এ বাড়িতে আসবেন না। কাজেই চালাকি করার চেষ্টা করবেন না।

এতদিন অয়স্তিকা আমাকে 'তুমি' বলত। চিঠিতে 'আপনি' বলেছে। কাজেই ঘৃণার পরিমাণ বুঝতে আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বুঝলাম অরিত্র অনুকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছে। নিমাইদা তা হলে ভালই আছে আশা করি। ছুটিও পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই। আমি বিরজাবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, "বিরজাবাবু চলুন, বকুনি খেয়ে আসি।" বলে আমরা দু'জনে রওনা দিলাম গাড়িতে চেপে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি গোলাপবাগের রাস্তা ধরল। ইউনিভার্সিটির অসাধারণ সৌন্দর্যে আবার মুগ্ধ হলাম। গাড়ি ইউনিভার্সিটির বিশালাকার নতুন গেটের নীচ দিয়ে গোলাপবাগের মোড় থেকে ডান দিকে ঘুরে, স্টেশনের দিকে চলল জিটি রোড ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশনের কাছে চলে এল। আমি মুখ বাড়িয়ে দেখতে থাকলাম বাইরের জনপ্রবাহ। একদল লোক স্রোতের মতো চলেছে তাদের গন্তব্যের দিকে। এ দৌড়ের শেষ নেই। এ দৌড় অক্ষয়। চিরন্তন। আমাদের গাড়ি ক্রমে অরিত্রদের বাড়ির পেল্লায় গেটের ভেতর দিয়ে হুস করে ঢুকে গাড়িবারান্দায় এসে থামল।

বিরজাবাবু বললেন ভিতরে যেতে। আমি গুটিগুটি গেলাম ভে
যেমন পরিস্থিতি আশা করেছিলাম তেমন কিছুর সম্মুখীন হলা
দেখি বসার ঘরে ডিভানে অরিত্র খুব খুশি-খুশি মুখে খবরের
পড়ছে। আমাকে দেখে অরিত্র লাফিয়ে উঠল। ছুটে এসে বলল
এসেছিস! আমি জানতাম তুই আসবিই আসবি। এতক্ষণে নিশ
শুনেছিস যে, আমি অনুকে বিয়ে করে এনেছি। নিমাইদাকে ছু
দিয়েছে হাসপাতাল। মাইল্ড অ্যাটাক হয়েছিল। তার জন্য ২৪
একজন নার্স ঠিক করে দিয়েছি। মেডিক্যাল সুপারভিশনের অ
দরকার নেই। তবুও সাবধানের মার নেই। দিনসাতেক পর থে
আবার নিমাইদা চায়ের দোকানে বসতে পারবে। আর সেই অ
বানিয়ে মানুষকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে।"
আমি বললাম, "বেশ করেছিস।"
অরিত্র বলল, "তোর সঙ্গে অনেক কথা জমে আছে। সেদিন থে
পেটের মধ্যে কথাগুলো বুদ্বুদ কাটছে। চল, ওই ডিভানে বসে
আচ্ছা, তুই কি সকালে কিছু খেয়েছিস?"
এ কথার উত্তরে আমি শুধু একটু হাসলাম। অরিত্র বলল, "ও,
মানে কিছু পেটে পড়েনি। একটু দাঁড়া, আমি খাবার নিয়ে আস
অরিত্র উঠে চলে গেল।
কিছুক্ষণ পরে হাতে দুটো প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল অরিত্র। প্লেটে
ধোঁয়া-ওঠা আলুর পরোটা। দেখেই মনটা ভরে গেল। আমরা
লাগলাম। অরিত্র খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বলল, "সেদিন আমা
খুব খারাপ ছিল, তুই তো দেখলি। তুই চলে যেতেই আমি এক
গেলাম। আরও মনখারাপ করতে লাগল। বসে বসে কখন যে
পড়েছি বুঝতেই পারিনি। ঘুমের মধ্যে কী দেখলাম জানিস? দে
আমি এক শান্ত জায়গায় বসে আছি। মাথার ওপর এক অদ্ভুত
বটগাছ। তার থেকে প্রচুর ঝুরি নেমে এসেছে মাটিতে। এক অ

প্রশান্তি চারিদিকে। হঠাৎ দেখি আমার পা এক টলটলে জলের পুকুরে ডুবে রয়েছে। আশ্চর্য! এতক্ষণ ছিল না পুকুরটা। পুকুরের জল যে এত পরিষ্কার হতে পারে আমার জানা ছিল না। প্রাণ জুড়িয়ে যেতে লাগল। মনখারাপ উড়ে গেল নিমেষে। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই পুকুরে বুদ্বুদের মতো কয়েকটা পাখি চলে এল। তারা খেলা করতে লাগল পুকুরময়। কী যে ভাল লাগছিল! মনে হচ্ছিল এখান থেকে কোনওদিন ফিরব না। পাখিগুলো খেলা করতে করতে আমার খুব কাছে চলে এল। তারপর একসময় ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। তাদের পাখনা থেকে জলের ছাট আমার মুখে, সারা শরীরে লাগল। আমি যেন শীতল হয়ে গেলাম।"

আমি বললাম, "হুম। তারপর?"

"তারপর দূরে আমি এক অপরূপ মেয়েকে দেখতে পেলাম। কী অসাধারণ তার রূপ বলে বোঝাতে পারব না। আমি নির্বোধের মতো তার দিকে চেয়ে রইলাম। ক্রমে সে আমার কাছে আসতে লাগল। কিন্তু তাকে কেমন অস্পষ্ট লাগছিল। সে আরও কাছে আসতে লাগল। একসময় অবাক হয়ে দেখলাম সেই মেয়েকে আমি চিনি। কিন্তু সে কে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। মনে হচ্ছে খুব চেনা, কিন্তু সেই সঙ্গে খুব অচেনাও। আমার সারা সত্তায় যেন একটা ভাললাগা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মনে হতে লাগল আনন্দের আতিশয্যে অজ্ঞান হয়ে যাব। তারপর সেই মেয়েকে চিনলাম," বলে অরিত্র চুপ করল।

আমি বললাম, "কে সেই মেয়ে?"

অরিত্র চুপ করে রইল। আমি বললাম, "আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে সেই মেয়ে আর কেউ নয়, অনু। কী, ঠিক তো?"

অরিত্র এবারেও চুপ করে মুখ নামিয়ে রইল। যখন মুখ তুলল দেখি তার চোখের জল গাল বেয়ে নীচে নামছে। আমি রাধা-কৃষ্ণকে দেখিনি। কিন্তু মনে হতে লাগল অরিত্রর ওপর স্বয়ং কৃষ্ণ ভর করেছেন। অপূর্ব এক আভা তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

"আপনি তা হলে এসেছেন!" অয়স্তিকার তীব্র গলা শোনা গেল, "আসুন আমার সঙ্গে। দেখুন, আপনি আমার বাবা-মায়ের কী অবস্থা করেছেন। লজ্জা করে না আপনার?" বলে অয়স্তিকা আমাকে টেনে ওপরে অরিত্রর বাবার বেডরুমে নিয়ে গেল। দেখলাম, অরিত্রর বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে অন্য দিকে চোখ ফেরালেন। অরিত্রর মা বলে উঠলেন, "তুমি আমাদের এতবড় ক্ষতি করতে পারলে? তোমাকে ছোট থেকে এত ভালবাসলাম, ছিঃ!"

অরিত্রর বাবা মুখ ফিরিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, "তোমাকে আমরা নিজেদের ছেলের মতো দেখতাম শ্রীকান্ত। আমি ভাবতেও পারছি না যে একটা বস্তির মেয়ে আমাদের বাড়ির বউ, একজন চাওয়ালা আমার বেয়াই। কী বলব আমি সমাজকে? আমার বউমার বাবা চায়ের দোকান দেয়? লোকে কী বলবে? আমি আমার বন্ধুকে কী বলব? তুমি আমাদের চোখের সামনে থেকে চলে যাও। আর কখনও তোমার মুখ দেখিয়ো না," বলে তিনি পাশ ফিরে শুলেন।

অয়স্তিকা বলল, "আপনি আপনার জবাব পেয়ে গেছেন। নাউ গেট লস্ট। ফরএভার। আমরাও ভুলে যাব যে, শ্রীকান্ত নামে কাউকে কোনওদিন চিনতাম। দয়া করে আমার দাদার জীবন নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলবেন না। আমি হাতজোড় করছি।"

আমি নিশ্চুপে সব শুনে গেলাম। ফেরার সময়ে একবার অনুর সঙ্গে দেখা করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে এলাম। সে সারাক্ষণ অঝোরে কেঁদে গেল। আমি বললাম, "কী রে, নিমাইদাকে বলেছিলাম না যে, তোর ভাগ্যে এক রাজপুত্র আছে? তা, অরিত্র কোনও রাজপুত্রের চেয়ে কোন অংশে কম!"

ফেরার পথে আবার অরিত্রর সঙ্গে দেখা হল। সে অবিচলভাবে বসে আছে। আমাকে দেখে হেসে বলল, "কী রে, তোর বকুনি খাওয়ার কোটা পূর্ণ হয়েছে?"

আমি হেসে বললাম, "হ্যাঁ হয়েছে। খুব মিষ্টি খেতে। আজ সন্ধেয় কী করছিস?"

"কেন বল তো?"

"তোকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখতে যেতে বলতাম। এক বন্ধু আছে স্টেশনে। এক হাত কাটা। খুব কষ্টে আছে বেচা

"এ আবার কোন বন্ধু? নাম কী?"

"আমার অতি বিশেষ বন্ধু। নাম বিশু," বলে অরিত্রকে বিশুর অসুবিধের কথা বললাম।

সব শুনে অরিত্র বলল, "ও, এই ব্যাপার! আসলে এইরকম ব্য আমরা বলি ফ্যান্টম পেন, ভুতুড়ে ব্যথা। কাটা অঙ্গের সঙ্গে নার্ কেটে গিয়ে এক ধরনের সিউডো সিগন্যাল পাঠায় আমাদের মে মনে হয় যেন সেই বাদ যাওয়া অঙ্গের কোনও অংশে ব্যথা কর মিরর বক্স থেরাপি দিয়ে বিশুর ব্যথা দূর করে দেব, কথা দিলাম আমি অরিত্রকে বিশুর ঠিকানা বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

১২

এরপর মাস ছয়েক অতিক্রান্ত। বর্ধমানে ফিরেছি প্রায় ছ'মাস ব এ ক'দিন অজ্ঞাতবাসে ছিলাম। আমাদের মাঝে-মাঝে অজ্ঞাত যেতে হয়, মায়ার বাঁধন কাটানোর জন্য। আমিও সেই অভিপ্রা অজ্ঞাতবাস নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম পাণ্ডবদের মতো চোদ্দো থাকব অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু আমাদের কোনও পূর্বনির্ধারিত গতে হয় না। কাজেই চোদ্দো বছর ক্যানসেল করে ছ'মাসের মাথায় সকালে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। ফিরে দিনকয়েক টানা দিলাম। খাওয়া-দাওয়া ভুলে শুধুই ঘুমের দেশে বিচরণ করলাম ও মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

একদিন সন্ধের মুখে ঘুমের মধ্যেই একটা আশ্চর্য অনুভূতি হতে লাগল। কেউ যেন আমাকে নিঃশব্দে দেখছে। বড় অস্বস্তিকর অনুভূতি। মনে হল অদ্ভুত দুটো চোখ আমার দিকে নিষ্পলকে আছে। চোখ মেলতেই কিম্ভূতকিমাকার এক মুখ দেখে চিৎকার করে উঠলাম, "ওরে গেলুম রে!" তারপর বুঝলাম সে শ্রীমুখ ডোকরার। ধড়ফড় করে উঠে বসে বললাম, "গাধা কোথাকার! এসেছিস যখন একবার ডাকবি তো! তা না করে ক্যাবলার মতো মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বসে আছিস!"

একটা সিগারেট ধরালাম। আর-একটা দিলাম ডোকরাকে। সে নিশ্চুপে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। তার চোখেমুখে নির্বিকার ভাব প্রবল হয়েছে। আমি বললাম, "তোর মগজের কী হাল? চলছে আবার থম মেরে গিয়েছে?"

সে আমাকে চমকে দিয়ে কথা বলল। বলল, "মাথা ঠিক হয়ে

"হুম।"

আবারও কিছুক্ষণের নৈঃশব্দ্য। বাইরে ঝিঁঝি পোকার ডাক শো যাচ্ছে তীব্রভাবে। অনেকক্ষণ পর ডোকরা বলে উঠল, "আমি পরশু বাইরে চলে যাচ্ছি।"

"কোথায় যাবি? দেশের বাড়ি?"

"নাহ্। অনেক দূর।"

"মানে?"

"মানে আমার সেই রাতে তৈরি মূর্তিটি বিদেশে বিশেষ খ্যাতি করেছে। রাশিয়ার একটা আর্ট ইউনিভার্সিটি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। টিকিটও পাঠিয়েছে। আমার এক বছরের ভিসাও হ গেছে।"

"ভেরি গুড।"

এক সন্ধেয় বিশুর কাছে গেলাম। তাদের এলাকার আদরের হ জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে গেছিলাম। এতদিন পর হরিদাস দেখে খুব খুশি। রীতিমতো হাসতে হাসতে আমার দেওয়া খাবা খেল। বলল, "ভগবানের কী বিচিত্র খেলা দেখেছেন! নির্বাক কু

আমি বললাম, "তারপর, তোমার ব্যথা কমল?"
"শ্রীকান্তদা, আপনি যে আমার কী উপকার করেছেন আমি বলে বোঝাতে পারব না। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"
"আমার সবকিছু ভালই আছে বিশু।"
"আপনার বন্ধু আমার রোগ সারিয়ে দিয়েছে। কী করল শোনেন... সেদিন এসে আমায় বলল তার নাম অরিত্র। তারপর গাড়িতে চাপিয়ে সোজা হাসপাতাল। আমি ভয়েই মরি! কী অপরাধ করেছি তা-ই জিজ্ঞেস করতে করতে চলেছি। হাসপাতালে পৌঁছে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। টেবিলে ডান হাতটা রাখতে বলল। তারপর ডান হাতের পাশে একটা আয়না রাখল। সেই আয়নাতে আমার ডান হাতটাকে মনে হতে লাগল আমার বাঁ হাত। তারপর সেই ডান হাতে নানারকম কসরত করতে লাগল আর আমাকে বলল আয়নায় দেখতে। আমি দেখতে থাকলাম। দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল যেন আমার বাঁ হাত রয়েছে। ডান হাতে স্পর্শ করলে মনে হয় বাঁ হাতে স্পর্শ করছে। সেদিনই আবার আমাকে ইস্টিশনে পৌঁছে দিল। তারপর থেকে রোজ আমাকে নিয়ে যেত আর ওইসব করত। দু'মাস পর দেখি আর আমার সেই ব্যথা নেই। আপনার বন্ধু যে কী ভাল!"

গোলাপবাগের দিকে ফিরতে ফিরতে আমি হেঁটে যাচ্ছি ইউনিভার্সিটির রবীন্দ্র গেট থেকে বিবেকানন্দ গেটের দিকে। এমন সময় একটা বড় গাড়ি আমার পাশে হুস করে থামল। গাড়ির পিছনের সিটের কাচ নেমে গেল। ভেতরে আলো জ্বলছে। সেই আলোতে চিনলাম অরিত্রর বাবাকে। তিনি তাঁর চিরাচরিত হুকুমের গলায় বললেন, "উঠে এসো গাড়িতে। কুইক।"
আমি গাড়িতে উঠে তাঁর পাশে বাধ্য ছেলের মতো বসলাম। তিনি বলতে লাগলেন, "গত কয়েকমাসে তোমার খোঁজ করিনি এমন জায়গা খুব কম আছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছি, কোনও লাভ হয়নি। বিরজা মাস তিনেক প্রতিদিন তোমার মেসে সারা সকাল বসে থেকেছে। কোথায় চলে গেছিলে? একবার বলে যাওয়ার কথাও তোমার মনে হল না? এই তোমার শিষ্টাচার?"
আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, "আজ্ঞে একটু অজ্ঞাতবাসে গেছিলাম। তাই কেউ খোঁজ পায়নি।"
"রাখো তোমার বুজরুকি। তোমার বেসিক সেন্সগুলো কোথায় ছিল এতদিন? এনিওয়ে, তোমাকে মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। তোমার জন্য আমার ছেলেটা একটা অসাধারণ মেয়েকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। ওর মতো বাঁদরের ভাগ্যেও যে এমন একটা মেয়ে ছিল, তা আমরা ধারণাও করতে পারিনি। আহা, কী রুচি! পরিশীলিত, পরিমার্জিত। এমন একটা মেয়ের আরও ভাল কোনও ছেলে পাওয়া উচিত ছিল। ওর ভাগ্য খারাপ তাই আমাদের অরিত্রর মতো একজন বাঁদরের গলায় ঝুলেছে।"
এই সময়ে তাঁর মোবাইল বেজে উঠল। তিনি বললেন, "হ্যাঁ রে মা, আমি এখনই আসছি।"
টেলিফোনের ওপারের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না।
অরিত্রর বাবা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, দেরি হবে না। তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চা না খেয়ে যেতে পারব না।"
...
"হ্যাঁ, আধঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি। হ্যাঁ, ওখানেই ডিরেক্ট চলে যাব। তুই তোর মাকে নিয়ে চলে যা।"
...
"হ্যাঁ রে বাবা, তার বেশি দেরি হবে না।"
...
"না না। কিছুতেই আধঘণ্টার বেশি দেরি হবে না।"
...
...
"জানিস, আজ কাকে পেয়েছি? অ্যাঁ! কী করে জানলি? তুই কি কথা বুঝতে পারিস?"
...
"হ্যাঁ, আজকে যখন পেয়েছি আর ছাড়ছি না। পাকড়াও করে নি যাব।"
...
"আচ্ছা। এবার রাখ। আমি এখনই আসছি চা খেয়ে।"
ফোন রেখে তিনি আমার দিকে তাকালেন। তারপর হেসে বলে "কী পাগলই না হয়েছে এই মেয়েটা! একটা শাড়ি কিনবে, তা না হলে তার চলবে না। কালকে ওর ফার্স্ট সেমেস্টারের পরীক্ষ ওকে ইংরেজি নিয়ে ভর্তি করিয়েছি। আজ ওর ইচ্ছে হয়েছে শা কেনার। ওর মা যাচ্ছে, কিন্তু ওর আমাকেই চাই। কী যে অসুবি মধ্যে পড়েছি! আমার একটা সন্দেহ হয়। এই মেয়ে কোনওভা অন্যের মনের কথা বুঝতে পারে," বলতে বলতে তাঁর চোখেমু হাসি আর আনন্দের জোয়ার বয়ে যেতে লাগল।
প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কিছু শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত থাকে। অরিত্রর পরি সেই মুহূর্তের জোয়ারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে মনে ভগ কাছে প্রার্থনা করলাম, ভগবান ওদের এই জোয়ার যেন চিরস্থা ওদের যেন কখনও ভাটার মধ্য দিয়ে না যেতে হয়।
গাড়ি এসে হুস করে থামল এক জায়গায়। অরিত্রর বাবা নেমে পড়লেন। আমিও নামলাম। গাড়িটা এসে থেমেছে নিমাইয়ের চ দোকানের সামনে। নিমাইকে দেখেই তিনি পেল্লায় একটা ডাক ছাড়লেন, "বেয়াইমশাই, চা কি রেডি? দেখুন, কাকে এনেছি।"
নিমাই প্রায় লাফিয়ে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, "কোথা ছিলে এতদিন শ্রীকান্তদা? আমাদের কথা কি একটুও মনে পড়ে নিমাইয়ের দোকানের অন্য খদ্দেররা সব দেখে অবাক। আমরা করলাম। তারপর অরিত্রর বাবা বললেন, "অনু-মা আমায় বার করে বলে দিয়েছে তোমাকে নিয়ে যেতে। দরকার হলে সে তার কেনা ক্যানসেল করবে। তুমি গাড়িতে ওঠো।"
বললাম, "আজ তো হবে না। প্রচুর কাজ জমে আছে। পরে এক যাব," বলে তাঁকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে আমি হাঁটা দিল

এখন অনেক রাত। সমস্ত শহর ঘুমের অতলে তলিয়ে আছে। এ রাত আমার খুব প্রিয়। আজ কি আমার মন খারাপ? আজ যে সুরঞ্জনার বিয়ে। বিয়েবাড়ি আলোয় ছেয়ে গেছে। সানাই বাজছে সুরে। আমি হেঁটে চলেছি। আমার কেন মনখারাপ হবে তা-ই ভ আমি তো সমস্ত মায়ার বাঁধনের ওপরে। তা হলে সুরঞ্জনার বিয়ে জন্য কেন আমি মনখারাপ করছি?
আমি হনহন করে হাঁটতে লাগলাম। হেঁটেই চলেছি, হেঁটেই চলে পথের কোনও শেষ নেই। পথ কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে প না। ক্রমে চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় সমস্ত চরাচর ভেসে গেল। আমি আমার সেই বটগাছকে দেখতে পেলাম। হাঁটার সময়ে অনেকবা করেও যা কোনওদিন পারিনি তা-ই আজ হচ্ছে। আমি স্পষ্ট দে পাচ্ছি সেই ঝুরিওয়ালা ছায়াময় বটগাছ। সামনে পুকুরে টলটলে জল। আমি পা ডুবিয়ে বসে আছি। কয়েকটা পানকৌড়ি জলে মত্ত। আমার ঠিক তিন হাত দূরে আমার সেই পরি উড়ছে। একটু নববধূর সাজে আবছা একটা মেয়ের অবয়ব। খুব চেনা চেনা ঠে কিন্তু চিনতে পারছি না। মেয়েটি ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে। খুব দূরে যাচ্ছে। আমি কি কাঁদছি? না। আমাদের কাঁদতে নেই। আমরা ক মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়ি না।

অলংকরণ: রৌদ্র মিত্র





বৌদ্ধসঙ্ঘের তোরণ

লালচে পোড়ানো ইট। ঝামাপাথর, বেলেপাথরে তৈরি নয়নমনোহর বৌদ্ধ সার্কিট। ইতিহাস এখানে থমকে আছে অন্তত হাজার বছর। রত্নগিরি-উদয়গিরি-ললিতগিরি-পুষ্পগিরির সৌন্দর্য উপভোগ করে এলেন যশোধরা রায়চৌধুরী।

বৌদ্ধ সংঘের ছায়ায় মায়াময় ওড়িশা

'গেরুয়া চীরবাস পরা এক দল শ্রমণ 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলতে বলতে চোখের ওপর ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলেন। পড়ে রইল অপার্থিব সবুজ পাথরের দরজা আর লাল ইটে গাঁথা সংঘারামগুলি। রত্নগিরিতে ঝকঝকে হলুদ এক দুপুর স্থির হয়ে বসেছে তখন। বটচ্ছায়ে শুধু সুকুমার শ্যামলিমা।' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মরু ও সংঘ'। অমিতাভ মৃৎশ্রেণী বা চন্দনমূর্তির কাহিনির পাতা থেকে উঠে আসেন বুদ্ধ। গায়ে কাঁটা দেয় সংঘের বর্ণনা পড়ে। সে ছিল মধ্য এশিয়া। যেখানে মরুভূমির মাঝখানে খর্জুর ছায়ার অন্তরাল দিয়ে 'প্রস্তরনির্মিত সংঘারামের অর্ধপ্রোথিত উর্ধ্বাঙ্গ' দেখা যায় মরুভূমির ভিতর। সংঘস্থবির পিথুমিত্ত আর ভিক্ষু উচণ্ডের কাহিনি। আমরা অবশ্য অন্য এক বৌদ্ধ সার্কিটে। অবাক, স্তব্ধ, অভিভূত হয়ে দেখি রাশি রাশি স্তূপ, অসংখ্য মূর্তি, আর রত্নগিরির মূল আকর্ষণ— এক সবুজ পাথরের দরজা। ফুটে ওঠে বিভূতি। বৌদ্ধ শ্রমণদের যেন দেখি চোখের সামনে।

জঙ্গল, পাহাড়, সমুদ্র, নদী আর অনন্ত রূপরাশির ওড়িশায় খানিকটা যেন দুয়োরানির মতোই অবহেলিত, অজানা এই বৌদ্ধ সার্কিট। অসংখ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনে সাজানো বিশাল এলাকা। মূলত কটক ও জাজপুর জেলায় অবস্থিত রত্নগিরি-ললিতগিরি-উদয়গিরি-পুষ্পগিরি। প্রতিটি জায়গাতেই কিছু কিছু অসামান্য চিহ্ন আছে বৌদ্ধ বিহার, সংঘারামের। স্তূপ ও বুদ্ধমূর্তিতে ছেয়ে আছে জায়গাগুলি। প্রতিটিতেই পুরাতত্ত্ববিভাগের কাজের ছাপ। নীল টিনের পাতে লেখা ইতিবৃত্ত। পর্যটকই যা নেই! 'হীরক ত্রিভুজ' বা 'ডায়মন্ড ট্রায়াঙ্গল' বলে খুঁজলে ঠিক পাওয়া যাবে ওড়িশার জাজপুরের তিন রত্ন— উদয়গিরি, রত্নগিরি, ললিতগিরির নাম। এই উদয়গিরি কিন্তু উদয়গিরি-খণ্ডগিরি নামে যে প্রাচীন মহাবিহারের ভগ্নাবশেষ ভুবনেশ্বরে আছে, সেখানে নয়। এটা সমনামী, কিন্তু দূরে। মহাবিহারের নাম পুষ্পগিরি সেটিও জাজপুর জেলাতেই।



লাংগুড়ি



বুদ্ধমূর্তি

হালে তাত্ত্বিকরা বের করে ফেলেছেন, এটাই প্রাচীন পুষ্পগিরি মহাবিহার। পুষ্পগিরি ছিল পুব অঞ্চলের এক অত্যন্ত নামকরা অধ্যয়ন পীঠ।

রত্নগিরি

কোন এক তপ্ত গ্রীষ্মদুপুরে আমি আর আমার ভ্রমণপিপাসু বান্ধবী সুপর্ণা চললাম রত্নগিরির সন্ধানে। সুপর্ণার কাছে ছিল সেই অপার্থিব সবুজ দরজার খবর। আর আমার কাছে ছিল ওড়িশার বাসিন্দা হওয়ার সুযোগসুবিধা। সহজ ছিল না পথ খুঁজে পাওয়া। জাজপুর জেলার অন্তহীন সবুজের ভিতর দিয়ে গাড়ি চলছে। ভুবনেশ্বর থেকে মাত্র দেড় ঘন্টার পথ। কিন্তু তারপর এঁকেবেঁকে নানা জনপদ আর ধানখেতের শ্যামলিমার ভিতর দিয়ে পথ গিয়েছে বড় রাস্তা থেকে নেমে। সে পথ ভুল হয়ে গেলে মুশকিল। শেষমেশ অবশ্য লোকেদের জিজ্ঞাসা করে আর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের বোর্ড দেখে পৌঁছে যাই আমরা। প্রথমে রত্নগিরি। প্রচুর পরিমাণে মূর্তি, স্তূপ থরে থরে সাজানো। আকাশের তলায় রত্নবোঝাই জাদুঘর। বাইরে সিঁড়ি বানিয়ে খানিকটা পার্কের মত করে সাজানো।

ভিতরে ঢুকেই একরাশ ছোট স্তূপ, একেবারে জ্যামিতিক ছকে সাজানো। তারপর একে একে ধ্বংসস্তূপ। কোনওটা অর্ধেক, কোনওটা কিছুটা ভগ্নাবশিষ্ট সংঘারামের অংশ। পোড়া ইটে তৈরি।
নয়তো লালচে পাথর বা ঝামাপাথর দিয়ে। ঝামা ওড়িশারই বিশেষ ধরনের পাথর। লালচে রং, ভিতরে অনেক ছিদ্র। সমুদ্রতটের নোনা জলবায়ুর সহজাত অবদান।
দেখলাম, দুপাশে পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি-সহ মূল মন্দিরের বিগ্রহস্থলে ১২ ফুটের বিশাল বুদ্ধমূর্তি। বৌদ্ধ মন্দিরের সেই স্থাণু, অসম্ভব স্পর্শযোগ্য শান্তি বহন করে বেরিয়ে আসি। ছোট ছোট মন্দিরের মতো ২৪টি ঘর বা প্রকোষ্ঠ। সারিবদ্ধ। পাথরের কারুকাজ এখনও অক্ষত। শুধু বিগ্রহ নেই।
কিছু গোটা বা ভাঙাচোরা বিগ্রহ বাইরে রাখা, হয়তো এঁরাই এক সময় পুজা পেতেন ওই সব প্রকোষ্ঠে। কয়েকটা সিঁড়ি ওঠানামার পর মূল আকর্ষণের কাছে ফিরে যাই আবার। সবুজ দরজার কাছে। নানাভাবে ছবি তুলেও আশ মেটে না। এ বিশাল দরজার অখণ্ড সবুজরঙা পাথর কোন দূর দেশ থেকে বয়ে এনেছিল কে? কারা? বাকি সব স্থানীয় লালচে বা মেটে রঙের মধ্যে জ্বলজ্বল করে যুগ যুগ জেগে আছে এই দরজা। দরজার মধ্যবর্তী ফাঁক যেন অনন্তের দিকে আমাদের মনকে টেনে নেয়। আকাশ ওই দরজার ফ্রেমে বন্দি হয়ে আছে। কতকাল ধরে, এমনই। এ যেন নশ্বরতার বিরুদ্ধে মানুষের ছোট্ট এক বিষণ্ণ প্রতিবাদ। রত্নগিরি পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী অবধি জনসমাকুল এক বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। হিউয়েন সাং কথিত পুষ্পগিরি মহাবিহারের এক অংশও বটে।
রত্নগিরিতেই বানানো হয়েছে পুরাতাত্ত্বিক জাদুঘরও। এই হীরক ত্রিভুজের খননকালেই পাওয়া নিদর্শনে সাজানো এই ছোট্ট জাদুঘর।

পুষ্পগিরি

বর্ষার মেঘভারাক্রান্ত আকাশ, অকৃত্রিম ও বৃহৎ শ্যামলিমার মধ্যে জাজপুরের অন্য এক ডেস্টিনেশনের দিকে এবার যাত্রা আমাদের। পুষ্পগিরি। এখানে একদা মহাবিহার ছিল। লাংগুড়ি হিলসও বলেন অনেকে। ৬৭ কিলোমিটার গিয়ে চণ্ডীখোল। সেখান থেকে নেমে আরও ২০ কিলোমিটার দূরে এই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ।
আমরা চলেছি। চণ্ডীখোল বাসস্টপে তিন খাকি উর্দিধারী তরুণকে পেলাম। তাঁদের অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও জানা গেল না, লাংগুড়ি হিলস বা পুষ্পগিরির হদিশ। অগত্যা গুগল ম্যাপ। গ্রামের ভিতরে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলা পথ বলে দেয় ঠিকানা। পথে পথে ঘরোয়া ছোট মন্দির, সুন্দর মাতৃমূর্তি (হিন্দু এবং শাক্ত ধারার পূজন গত ৮০০-৯০০ বছর ধরে হয়তো বা এখানে থিতু হয়ে বসেছে), অপূর্ব নির্মাণের নন্দী ষণ্ডের ছোট্ট মূর্তি, তাতে দেওয়া সাদা কাঠগোলাপের ফুল, কৃষকের মাচায় লতিয়ে ওঠা লাউগাছ, ঝোপঝাড়ে মেলে রাখা গোলাপি শাড়ি আর মাটি থেকে ধান খুঁটে খাওয়া রামপাখি দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। জাজপুর মহানদীর খাত থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে। ভুবনেশ্বর থেকে ঠিক দু'ঘণ্টার রাস্তা। চণ্ডীখোলার মোড়ে হাইরোড থেকে নেমে যেতে হবে। তারপর শুধু সবুজ ক্ষেতে ক্ষেতে ফসলের মাথা দোলানো আর দূরে নীল পাহাড়শ্রেণি। অবিস্মরণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
সুপর্ণা বই ও গুগল থেকে সংগ্রহ করে এনেছে কিছু তথ্য। যে কারণে সেখানে

যাওয়ার এমন অনবদমনীয় আগ্রহ আমাদের। লাংগুডি হিলস খুব বেশিদিন হয়নি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। খোঁড়াখুঁড়ির শুরু ১৯৯৫'এ। হালে তাত্ত্বিকরা বের করে ফেলেছেন, এটাই প্রাচীন পুষ্পগিরি মহাবিহার। পুষ্পগিরি ছিল পুব অঞ্চলের এক অত্যন্ত নামকরা অধ্যয়ন পীঠ। বিশ্ববিদ্যালয়। মহাবিহারে এসে জড়ো হতেন দেশবিদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতরা। ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে এখানে এসেছিলেন হিউয়েন সাং। তাঁর বর্ণনায় পুষ্পগিরির কথা পাওয়া যায়। নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলার পাশাপাশি এই পুষ্পগিরিও ছিল সমান নামকরা।
এই মহাবিহার রমরমিয়ে চলত খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় দশম শতক অবধি। পুষ্পগিরির সঙ্গেই যুক্ত বাকি তিনটি অংশ। কাছাকাছি আলাদা আলাদা তিনটি পাহাড়ের উপর তৈরি রত্নগিরি-উদয়গিরি-ললিতগিরিও এই বিদ্যাচর্চা ও শ্রমণচর্যার কেন্দ্রটির সঙ্গেই যুক্ত ছিল। এদের পতনের শুরু দশম শতকে। ঠিক হাজার বছর আগে! মানে সেই সময়, যখন বাংলা ভাষা পূর্বী-মাগধী থেকে প্রথম কুঁড়ি মেলছে, যখন সন্ধ্যাভাষায় লেখা হচ্ছে চর্যাপদ, সেই সময়! সেই অবধিই বলা চলে, বৌদ্ধধর্মের প্রচার, প্রসার, উত্থানের দিন। তারপর ধীর অবসানের কাল।
কিন্তু এখানেও তো খুঁজতে খুঁজতে আমরা পেয়ে যাই অন্য গল্প। সাম্প্রতিকতর।
এই জাজপুরের বুকে সদাই কিছু তিব্বতি এসে ঘর বেঁধেছিলেন, লাংগুডি হিলসের মাথায় তাঁদের সেই বাড়ির চিহ্নও দেখলাম। জানালার ফ্রেম ও দরজা খুলে নিয়ে গিয়েছেন আশপাশের মানুষ। তিব্বতিরা একদিন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছেন। থাকতে পারেননি। কেন, কীভাবে, সে বোধ হয় আর-এক রহস্য উপন্যাস!
আমরা খুঁজে চলেছি আসল বৌদ্ধ রেলিক্স বা খণ্ডহর। ড্রাইভারের সঙ্গে বসে স্থানীয় ভাষায় গুলতানি করছে কয়েকটি বছর দশ-বারোর ছেলে। তারাই বলে, আসলে সেসব মূর্তি, স্তূপ কোথায়। আমরাও তক্ষুনি রওনা দিই। পাহাড় চড়ি। বেশি উঁচু না। দশ মিনিট হাঁটলেই এবার আসল জিনিস। এ তো সবুজের বুকে লুকিয়ে রাখা খাজানা! চারিদিকে ভুট্টা, আখ, ঝিঙে, ধানের ক্ষেত। মধ্যে সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের বুকে লুকিয়ে আছে একটা রূপকথা। বাদামি লালচে পাথরের স্তূপ। তার মাথায় ফুলের মালার মতো আকারের দীর্ঘ ঝিনুনির মতো কারুকাজ। বুদ্ধের বসে থাকার সেই চিরাচরিত মূর্তি কয়েকটি। তারপর ভাঙা ইটের স্তূপ। ভাঙাচোরা পাথর। সূক্ষ্ম


বৌদ্ধস্তূপ

কারুকাজ অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা আছে তা এখনও গর্বের। অথচ আমাদের মতো দেশে, ওড়িশার মতো পর্যটনবান্ধব রাজ্যেও এ সাইটের অস্তিত্ব ওই বাচ্চাগুলোর সহায়তা ছাড়া খুঁজে পেতাম কিনা সন্দেহ! ওই স্তূপাকৃতি ইটের পাঁজার নীচে নাকি অনেক সোনাদানা, ধনরত্ন আছে। একটা বড় পিতলের হাঁড়িতে। এ অঞ্চলে পুরুষানুক্রমে এসব গল্প প্রচলিত। আসলে ওই পাঁজাটি, মনে হল একটি স্তূপের তলদেশ। জ্যামিতিকভাবে নিখুঁত বর্গাকৃতি। নিপুণতায় পোড়ানো লালচে ইট মনে পড়ায় বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দিরগুলোর কথা।
ছেলেগুলো আসে আমাদের সঙ্গে। ঘাসের ভিতর ছাতু, মানে ছোট ছোট ব্যাঙের ছাতা কুড়োয়। বাড়িতে নিয়ে গেলে মা রেঁধে দেবে। প্রশ্ন করে, চকোলেট আছে কিনা আমাদের মতো শহুরেদের কাছে। আমরা ওদের নাম জিগ্যেস করি। কেউ রঘু, কেউ রাম, আবার রফিকও আছে দলে। স্নিগ্ধতায় ছেয়ে যায় মন। টিপ টিপ বৃষ্টি নামে। শিলাপট্টের উপর বসে মেঘে মেঘে ছাওয়া পুষ্পগিরির দুপুরে মনে পড়ে, কিছুদিনে আগেই দেখা রত্নগিরির কথা। প্রতিটি স্মৃতি এক সূত্রে গাঁথা হয়। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার, যেন আমার আত্মার ভিতরে বসে থাকা এক অনন্ত, অবিনশ্বর কোন আমি। যে একদা শ্রমণ বা ভিক্ষুণী হয়ে এই সব জায়গায় ঘুরেছে। বলেছে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি মন্ত্র। জ্বেলেছে প্রদীপ। বা ঘাসে বোনা ঝাড়ু নিয়ে ঝাঁট দিয়েছে প্রকোষ্ঠের ভিতর বাহির।
যাওয়ার পথে চণ্ডীখোলের চায়ের দোকানে ঠান্ডা দই, স্থানীয় পিঠে যার নাম কাকড়া কিংবা ভাজা মিষ্টি, শিঙাড়া, কচুরি খেয়ে নেবেন। নয়তো গাড়িতে তুলে নেবেন সরবত বা চা। চাইলে পুরনো দিনের কায়দায়, বড় বেডকভার বা শতরঞ্চি নিয়ে যাবেন। পেতে বসবেন সবুজের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। সামনে লালচে পোড়ানো ইট, ঝামাপাথর, বেলেপাথর, নয়নমনোহর বুদ্ধিস্ট সার্কিট। রত্নগিরি-উদয়গিরি-ললিতগিরি-পুষ্পগিরির সৌন্দর্য উপভোগ করুন। ইতিহাস এখানে থমকে আছে অন্তত হাজার বছর।

ছবি: লেখক

কীভাবে যাবেন

ভুবনেশ্বর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ট্রেন, সড়ক এবং বিমানপথে যুক্ত। সেভাবে পরিকল্পনা করে বেরিয়ে পড়ুন রত্নগিরি-উদয়গিরি-ললিতগিরি-পুষ্পগিরি ভুবনেশ্বরকে কেন্দ্র করে গাড়িতে ডে ট্রিপ।

কোথায় থাকবেন

যেহেতু ডে ট্রিপ, তাই ভুবনেশ্বরের যে কোনও হোটেলে থাকতে পারেন। বিলাসবহুল থেকে পকেট ফ্রেন্ডলি, পছন্দমতো হোটেলে বুকিং করে নিন ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

এই বঙ্গের শাড়ি-সাজ

বাংলা সেই কবে থেকে রেশম আর তাঁতের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। যদিও সময়ের দাবিতে তাতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। সনাতনী বালুচরি কিংবা ট্রেন্ডি বেগমপুরি, ফুলিয়ার তাঁত থেকে সোনামুখী সিল্ক, পুজোর সাজে এবার বাংলার সম্ভার থেকেই বেছে নিন শাড়ি। বুনন ও ডিজ়াইনে খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয় শাড়িতে সাজানো হল অভিনেত্রী বাসবদত্তা, তৃণা আর বিবৃতিকে। সাজ-সন্ধানে সায়নী ঘটক।





বাঁ-দিকের ছবি:
বাংলার তাঁতকে এই
প্রজন্ম আপন করে
নিয়েছে নিজেদের
মতো করে। তা সে
ব্রাইট কালারের নরম
হ্যান্ডলুমই হোক কিং
সনাতনী বেগমপুরি।

বাসবদত্তার শাড়ি ও ব্লাউজ: আলমিরা ও কারুবাসা
বিবৃতির শাড়ি ও ব্লাউজ
সন্ধ্যারাগ ও কোজা
সন্ধ্যারাগের ফোন: ৯৮৩০০৩২৫৩৭
বাসবদত্তার গয়না: কায়
বিবৃতির গয়না: কারুবাস

ডান দিকের ছবি:
বাংলা বলতেই প্রথ
মনে পড়ে তাঁতের
কথা। মন্দির নকশি
পাড়ের উপর লাল
কল্কা দেওয়া ফুলিয়া
তাঁতে স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে
বাসবদত্তাকে।

শাড়ি: বিবিধ
ব্লাউজ: কমলা
ফোন: ৯৮১০৬৩১৯৭
গয়না: কারুবাসা



ফুলিয়ার তাঁতকে রিক্রিয়েট করা হয়েছে একটু অন্যভাবে। জুটের সুতো দিয়ে ভরাট কাজ শাড়িটির আভিজাত্য বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ।

শাড়ি ও ব্লাউজ: কমলা
গয়না: কারুবাসা





তস

ব
ও
ট্যা

গয়ন



লাল স্বর্ণকাতানে
মোহময়ী বিবৃতি।
বিষ্ণুপুরী সিল্কের উপর
সোনালি জরির কাজ
আভিজাত্য বাড়িয়ে
তুলেছে খাস বাংলার
এই স্বর্ণচরির।

শাড়ি: সুন্দরী
ফোন: ৯৮৩০৭২৭২৭০
গয়না: এ সরকার জুয়েলার্স
ফোন: ০৩৩৪০৩০১৭১১



একদিকে আটপৌরে করে পরা ট্র্যাডিশনাল
লাল-সাদার চিরন্তন মেলবন্ধন। অন্যদিকে
সোনালি জরির গর্জাস স্বর্ণচরি। অষ্টমীর স
আর সন্ধের সাজের জন্য পারফেক্ট!

বাসবদত্তার শাড়ি: সুন্দরী, তৃণার শাড়ি: কণিক, গয়না:





সিল্ক শুধু সাউথের
বাসবদত্তার পরনে
সিল্ক, বিবৃতি পরেছে
প্রিন্টেড মুর্শিদাবাদি
পরনে হ্যান্ড ব্লকপ্রি

বাসবদত্ত

বাসব

মেক-আপ: অভিজিৎ চন্দ, ফোন: ৯৮৩০৬৮৮৮৯০
স্টাইলিং: সুরজিৎ, ফোন: ৮১১৬১২৬১৭১
লোকেশন: দি অ্যাস্টর হোটেল ফোন: (০৩৩)২২৮২৯৯৫৭
ফুড পার্টনার: চাওম্যান, ফোন: (০৩৩) ২২৯০০০৩৮
ছবি: শুভজ্যোতি রায়চৌধুরী



খাঁচার পাখি

সিজার বাগচী

শ্রীরামপুর স্টেশনে নেমে আকাশ কিছুতেই ঝুমুরের মুখ মনে করতে পারল না। অথচ ও যাচ্ছে ঝুমুরের কাছে। ঝুমুর এখন বাড়িতে একা। কতদিন হবে ঝুমুরকে ও দেখেনি? প্রায় বছর পাঁচেক। শেষ দেখেছিল উত্তরপাড়ার দোলতলা ঘাটে। সেদিন ঝুমুর খুব কাঁদছিল। সেই কান্নার দৃশ্য আকাশের মনে আছে। শুধু মনে নেই ঝুমুরের মুখটা। তার বদলে আকাশের কেবল মনে পড়ছে শুক্লামাসির মুখ। কানে বাজছে শুক্লামাসির কান্না। মোবাইলে কাঁদতে-কাঁদতে শুক্লামাসি বলছিল, "তুই একবার যা বাবা, তুই গেলে যদি ফেরে। মেয়েটা আমার নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে। শুধু নিজে কষ্ট পাচ্ছে না। আমাকেও শাস্তি দিচ্ছে। তুই তো জানিস, তোর মেসোমশাই মারা যাওয়ার পর থেকে ও-ই আমার সব। তুই শুধু একবার যা..."

অফিসে জরুরি কাজের সময় এই ধর
একেবারে বরদাস্ত করা যায় না। তাও
মতো একজন মহিলার কাছ থেকে। আ
কড়া গলাতেই বলেছিল, "আমি এখন
অফিস। এখান থেকে সব কথা বলা যা
বলার বলব।"

শুক্লামাসিকে আর কিছু বলার সুযোগ
লাইন কেটে দিয়েছিল। ফোন না কেটে
আরও খানিকক্ষণ শুক্লামাসি কাঁদলে হ
করে বলে ফেলত, "আমায় কেন ঠেল
আগের কথা কি ভুলে গেলে?"

শুক্লামাসির বয়স এখন ষাট পেরিয়েছে
সুগার, প্রেশার, থাইরয়েড তো আছেই

গিয়েছেন এক বছর হল। উত্তরপাড়ার কাঁঠালবাগানের বাড়িতে একাই থাকেন মাসি। সঙ্গে একজন সারাদিনের কাজের লোক। মেসোমশাই চিরদিনই হিসেবী মানুষ ছিলেন। তাই মাসির টাকার অভাব নেই। কিন্তু টাকার অভাবটাই কি একমাত্র অভাব?

শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল আকাশ। এসে দাঁড়াল টিকিট কাউন্টারের সামনে। জায়গাটা অনেক পালটে গিয়েছে। এখন স্টেশন চত্বর আরও অনেক জমজমাট। দোকানপাট বেড়েছে। ভিড়ও। বহুদিন বাদে ও আজ ট্রেনে চাপল। উত্তরপাড়া ছাড়ার পর তো এদিকে আর আসাই হয়নি। এখন ট্রেন বলতে ওর কাছে মেট্রো। তাও কালেভদ্রে। যেহেতু ওর অফিস সেক্টর ফাইভে, তাই মেট্রো চড়ারও প্রয়োজন হয় না।

টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশ দম নিল। এখন ওকে যেতে হবে মাহেশ। সেখানে জগন্নাথ মন্দিরের আগের স্টপে। ওখানেই ঝুমুরের বাড়ি। কিন্তু কিছুতেই ঝুমুরের মুখটা মনে আসছে না। কত কিছুই তো একে-একে মনে আসছে! শুক্লামাসির ব্যাপারটাই যেমন।

সেদিন শুক্লামাসির ফোন রেখে আকাশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল। ঠিক করেছিল এর পর শুক্লামাসি ফোন করলে আর ধরবে না। অনেক হয়েছে। পাঁচ বছর আগের কিসসা এতদিন বাদে ও আর টানতে পারবে না। কিন্তু শুক্লামাসি শুধু ওকেই ফোন করেনি, মাকেও করেছিল। শুধু করেইনি, আকাশ যে মাসিকে পাত্তা দিচ্ছে না সেটাও কাঁদতে-কাঁদতে শুনিয়ে দিয়েছিল। অতএব এক ছুটির দুপুরে মা এসে বসলেন ওর পাশে। আকাশ ধরতে পারেনি মায়ের উদ্দেশ্য। প্রথমে মা এটা ওটা নিয়ে গল্প করলেন। তারপর ঝপ করে বললেন, "তুই একবার শ্রীরামপুর যা।"

আকাশ বিছানায় এলিয়ে ছিল। মায়ের কথায় সোজা হয়ে বসল। বলল, "মানে!"

মা হাসলেন। বললেন, "দেখ, যা হয়েছে সেটা আঁকড়ে তো জীবন চলে না। তোর বাবার কারখানা যখন লক আউট হয়েছিল, প্রদীপমেসো কিন্তু খুব সাহায্য করেছিল। তোর বাবা তখন যে চাকরিটা পেয়েছিল সেটা প্রদীপমেসোর সোর্সেই। পরে তো আবার কারখানা খুলল। আমরাও সামলে নিলাম। কিন্তু..."

আকাশ তীক্ষ্ণ চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। মা সেই চাউনির সামনে সহজ হতে পারলেন না। ইতস্তত করে বললেন, "শুক্লার প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য রয়েছে। হতে পারে তুই শুক্লাকে পছন্দ করিস না। কিন্তু ভেবে দেখিস, শুক্লা সেদিন যা করেছিল সেটা যে কেউ-ই করত।"

"বেশ তো," আকাশ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "তা আজ হঠাৎ উলটো কথা বলছে কেন?"

"তুই-ই শেষ ভরসা কুশ। শুক্লার উপর রাগ করে ঝুমুরের এত বড় সর্বনাশটা আটকাবি না? শুক্লা হয়তো দোষ করেছে। ঝুমুর তো কোনও দোষ করেনি।"

মায়ের ওই যুক্তির সামনে থমকে গিয়েছিল আকাশ। ঝুমুর! নামটা কতদিন বাদে উচ্চারিত হল ওর সামনে। শুক্লামাসি যেদিন ফোন করেছিল, ঝুমুরের নামটা নেয়নি। শুধু বলেছিল, আমার মেয়ে। মা-ই নামটা নিল। সেটা কি ইচ্ছে করেই? মা কি জানেন যে ওই নামটা আজও ঢেউ তোলে

গাড়ি হল শ্রীরামপুর আসতে। মা বোধহয় আরও কিছু
আন্দাজ করতে পারেন। তাই মাঝে একদিন ফিসফিসি
বললেন, "অমৃতার সঙ্গে তোর সদ্য সম্বন্ধ হয়েছে। অমৃ
যদিও মেয়েটা ভাল, তবু তুই যে ঝুমুরের কাছে যাচ্ছিস
ওকে না জানানোই মঙ্গল।"

আকাশ অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মায়ের দিকে। কী উত্ত
দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। তবে ঠান্ডা মাথায় মায়ের প্রস্ত
ভাবার পর আকাশের মনে হয়েছে, মা ভুল বলেননি।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আকাশ। ঝুমুর নামটা আজও ওকে
চুম্বকের মতো টানে। সেই টান এড়াতে না পেরে ও এ
শ্রীরামপুর। আবার পাঁচ বছর বাদে দেখা হবে ঝুমুরের
কী বলবে আকাশ? শুক্লামাসি পাঠাল? ভাবতে-ভাবতে
আকাশ অটো স্ট্যান্ডের দিকে এগোল।

উত্তরপাড়ার কাঁঠালবাগানে আকাশের জীবনের প্রথম
উনিশটা বছর কেটেছে। উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুলেই
পড়াশোনা। পরে অবশ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে বসেছিল। সে
ভাল রেজাল্ট করে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভে ওর অফিস। কিন্তু আকাশ বা
যাওয়ার সুযোগ খুঁজছে। বিদেশ না হলেও নিদেনপক্ষে
বেঙ্গালুরু। একবার সুযোগ পেলে ও আর পিছনে ফিরে
তাকাবে না।

উত্তরপাড়ায় ওদের পরিবার আর শুক্লামাসিরা কাছাকা
বাড়িতে থাকত। শুক্লামাসিদের নিজস্ব বাড়ি। আকাশদে
ছিল ভাড়া। মায়ের দূরসম্পর্কের বোন হয় শুক্লামাসি।
সম্পর্কটা এতটাই দূরের যে তিন-চারবার সেই সম্পর্কে
কথা শোনার পরও এখন ঠিক মনে নেই আকাশের। যে
কাছাকাছি বাড়ি, তাই দূরের সম্পর্কও কাছের হয়ে গি
ঝুমুর হল শুক্লামাসির একমাত্র মেয়ে। আকাশ আর ঝু
একই বয়সি। ঝুমুর পড়ত দেবীশ্বরী বিদ্যানিকেতন স্কু
পরে ও ইতিহাসে অনার্স পাশ করেছিল স্কটিশ চার্চ ক
থেকে।

পিঠোপিঠি বড় হলেও ঝুমুর চিরকালই ছিল জেদি। এক
ছোটবেলায় আকাশ প্রচুর মার খেয়েছে ঝুমুরের হাতে।
বড় হওয়ার পর ঝুমুর মারত না। তবে হুকুম চালাত।
আকাশের কাজই হল ঝুমুরের সব নির্দেশ তামিল করা
এভাবেই বড় হচ্ছিল দু'জন। এভাবেই একদিন পরস্পরে
কাছে এল ওরা। তখন দু'জনে স্কুলে উঁচু ক্লাসে। সামনে
মাধ্যমিক। এক সঙ্গে পড়াশোনা। কোচিংয়ে পড়তে যাও
কেউ প্রথমে সন্দেহ করেনি। উচ্চ মাধ্যমিকের সময়ও
তেমন কোনও গোলমাল অভিভাবকদের চোখে পড়েনি
গন্ডগোলটা হল উচ্চ মাধ্যমিকের পরের ছুটিতে।

সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। শুক্লামাসি গিয়েছিল ধর্ম
প্রদীপমেসো অফিসে। তাই ঝুমুর ডেকেছিল আকাশকে
আগেও কয়েকবার এমন ডাক এসেছিল। সেই সব বা
মতো এবারও মাকে ফাঁকি দিয়ে আকাশ নিঃশব্দে হাজি
হয়েছিল ঝুমুরদের বাড়িতে। কিন্তু সেদিন ওদের কপাল
খারাপ ছিল। ওভারহেড লাইনের তার ছিঁড়ে যাওয়ায়
ট্রেন ঠিকমতো চলছিল না। শুক্লামাসি এক ঘণ্টা স্টেশ
অপেক্ষা করে ট্রেন না পেয়ে বাড়ি চলে আসে।

ঝুমুর কিংবা আকাশ কেউ ভাবেনি এমন হতে পারে।
টের পেল, তখন আর কিছু করার নেই। মাসি দাঁড়িয়ে

দরজায়। দরজা অবশ্য বন্ধ ছিল। মাসি কিছু না দেখলেও বুঝতে পেরেছিল। তবে সেটা ওদের দু'জনকে বুঝতে দেয়নি। আকাশকে শুধু বলেছিল, "আমি বা তোর মেসোমশাই না থাকলে এ বাড়িতে আসবি না।"

আকাশ মাথা নিচু করে বাড়ি চলে এসেছিল। ও ভেবেছিল বিষয়টা ওখানেই মিটে যাবে। ভুল ভেবেছিল আকাশ। শুক্লামাসি সেই রাতে প্রদীপমেসোকে সব জানিয়ে দিয়েছিল। পরে ঝুমুরের কাছে আকাশ শুনেছিল, প্রদীপমেসো নাকি তখনই যাচ্ছিলেন ওর মা-বাবার কাছে। শুক্লামাসি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আটকেছিল। তবে প্রদীপমেসো চোয়াল শক্ত করে বলেছিলেন, "ওই হারামজাদা ছেলেকে যেন আর কোনওদিন এই বাড়ির ত্রিসীমানায় না দেখতে পাই। পেলে ওর ছাল ছাড়িয়ে নেব।"

শুক্লামাসি এর পর মাকে পুরো ব্যাপারটা জানিয়েছিল। যদিও ততদিনে বাবার কারখানা ফের চালু হয়ে গিয়েছে। তবু প্রদীপমেসো আর শুক্লামাসির কাছে দুর্দিনের সাহায্য নেওয়ার জন্য মা এবং বাবা দু'জনেই মাসি-মেসোর সামনে একটু কুণ্ঠিত থাকতেন। শুক্লামাসি তার সুযোগও নিয়েছিল।

বাবা কিংবা মা অবশ্য আকাশকে কিছু বলেননি। শুধু মা একদিন ওকে বুঝিয়েছিলেন, "তুই ঝুমুরকে মন থেকে মুছে ফ্যাল। এই সম্পর্কের কোনও ভবিষ্যত নেই। হিসেবমতো তোরা আত্মীয়।"

"কীসের আত্মীয়!" আকাশ ফুঁসে উঠেছিল, "তোমার সঙ্গে শুক্লামাসির যা সম্পর্কে সেটা নিষিদ্ধ সম্পর্কের আওতায় পড়ে না।"

"তোর যুক্তিতে সমাজ চলবে না। এই নিয়ে কথা হবে। শুক্লা কিংবা প্রদীপদাও মানবে না।"

আকাশ আরও তর্ক করতে পারত। কিন্তু করেনি। এর পর ঝুমুরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তবে সম্পর্ক ভাঙল না। মাঝে-মাঝেই ঝুমুর মেসেজ করত। সেই মেসেজ পেয়ে আকাশ চলে যেত দোলতলা ঘাটে। সেখানে খানিকক্ষণ কাটিয়ে ফের দু'জনে হাঁটা দিত বাড়ির দিকে।

বাবা ততদিনে একটা ছোট ফ্ল্যাট কেনার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন উত্তরপাড়াতেই ফ্ল্যাট কিনবেন। কিন্তু অল্প দামে একটা বাড়ির দোতলা তিনি পেয়ে গেলেন কলকাতার রামগড়ে। মা দোনোমনো করছিলেন। বাবা সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। অতএব এই সব ঝামেলার কিছুদিনের মধ্যেই ওরা রামগড়ের নতুন ঠিকানায় চলে গেল। আকাশও জয়েন্ট এন্ট্রান্সে চান্স পেয়ে ভর্তি হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তবু ঝুমুর যোগাযোগ রেখেছিল। আকাশও সুযোগ পেলে চলে আসত শ্যামবাজার কিংবা কলেজ স্ট্রিটে। সেই যোগাযোগ ভাঙল ঝুমুর গ্র্যাজুয়েশন করার পরই। আকাশ আর ঝুমুর যে চুপি-চুপি দেখা করছে একথা প্রদীপমেসোর কানে গিয়েছিল। তারপরই ঝুমুরের উত্তরপাড়ার বাইরে পা ফেলা বন্ধ করে দেন তিনি। মাস ঘুরতেই শ্রীরামপুরের এক বনেদি পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধও পাকা করে ফেলেন। সব কিছু এত দ্রুত হয়েছিল যে ওদের দু'জনের কিছু করার ছিল না। এক বন্ধুর ফোন থেকে খবরটা আকাশকে দিয়েছিল ঝুমুর। বলেছিল সেদিন বিকেলে একবার দোলতলা ঘাটে আসতে। গিয়েছিল আকাশ।

বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে ঘাটের দিকে যেতেই ও দেখল ঝুমুর এগিয়ে আসছে। আগের চেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। চোখের কোলে কালি। চুল রুক্ষ। কে বলবে এই মেয়ের তিন মাস বাদে বিয়ে! আকাশ আর ও ঘাটের পাশের বালিয়াড়ির মতো জায়গাটায় সরে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিল ঝুমুর। আকাশ কিছু বলতে পারেনি। নিজের গভীর থেকে ফোয়ারার মতো যে জলস্রোত উঠে আসছিল সেটা সামলাতে শুধু ঝুমুরের মাথায় হাত বুলিয়েছিল।

সেই ছিল শেষ দেখা। ঝুমুরের বিয়েতে ওদের নেমন্তন্নও করেননি প্রদীপমেসো।

অটো স্ট্যান্ডের দিকে যেতে-যেতে আকাশের মনে পড়ছিল সব। বুধবারের দুপুর। তবু অটো পেতে অসুবিধে হল। লম্বা লাইন। খানিক বাদে ও অটো পেল। প্রাচীন শহরের আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল সেই অটো। মিনিট পনেরোয় ওর স্টপ এসে গেল। অটো থেকে নামল আকাশ। এবার আসল কাজ। সেই কাজ হল ঝুমুরকে উত্তরপাড়ায় ফিরতে রাজি করানো।

তাড়াহুড়ো করে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন প্রদীপমেসো। পা অরিজিৎ সরকারী চাকুরে। দোতলা বাড়ি রয়েছে। বিয়েতে পণ নেয়নি। তাতেই গলে গিয়েছিলেন মেসো। এতটাই যে বিয়েতে ছেলেকে খাট, আলমারি, গয়না ছাড়াও একটা গাড়ি দিয়েছিলেন কিন্তু ঝুমুরের বিয়ে সুখের হয়নি। অরিজিতের মা নেই। থাকার মধ্যে রয়েছে বাবা আর-এক ডিভোর্সি দিদি। আপাতভাবে নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। তবু বিয়ের ছ' মাসের মাথাতেই ঝঞ্ঝাট শুরু হল। জানা গেল অরিজিতের বিস্তর বদগুণ। মদ খায়। সাট্টা খেলে। না জানি আরও কী সব করে বেড়ায়। নেশার ঘোরে তিন চারদিন তো ঝুমুরকে চড়-থাপ্পড়ও মেরেছে। অরিজিতের দিদিও কম যায় না মারধরে। খবর পাওয়ার পর প্রদীপমেসো গিয়ে হাজির হয়েছিলেন শ্রীরামপুরে। অন্য কেউ হলে মিটমাট করতে চাইত। কিংবা মেয়েকে ফিরিয়ে আনত। প্রদীপমেসো ওই রাস্তায় হাঁটলেন না। বরং শ্রীরামপুরের বাড়িতে গিয়ে অরিজিৎ এবং ওর পরিবারকে শাসিয়ে এলেন, মেয়ের গায়ে যদি আর-একবার হাত ওঠে তা হলে তিনি ফোর নাইনটি এইট ধারায় কেস দেবেন। মায়ের কাছে পরে শুক্লামাসি কবুল করেছিল, প্রদীপমেসোকে এভাবে শাসাতে সে অনেকবার বারণ করেছিল। মেসো শোনেননি। উলটে মাসিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, "আরে কী কর ওরা? দেশের আইন মেয়েদের পক্ষে।"

প্রদীপমেসোর এই আচরণের জেরেই ঝুমুরের শ্বশুরবাড়ির জীবন আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। মুশকিল হল, সমস্যা যদি সেইটুকু নিয়ে হত তা হলেও হয়তো পরিস্থিতি এত জটিল হত না। বিয়ের পর ঝুমুর কেমন ভিতর থেকে চুপ করে গিয়েছিল। শ্বশুরবাড়ির সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করত। ননদ কিছুই করত না। ঝুমুরকে সব কাজ করতে হত। অরিজিতের সঙ্গে ঝগ হলে মার খেতে হত। তবু ঝুমুর বাপের বাড়ি আসতে চাইত না। প্রদীপমেসো হম্বিতম্বি করলেও ঝুমুর কোনওদিন শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করেনি। প্রদীপমেসোকে এসব কিছু জানায়ওনি। জানিয়েছিল প্রতিবেশীরা। ঝুমুর কোনও প্রতিবাদ ন করায় সুবিধে হয়ে গিয়েছিল অরিজিৎদের। নির্যাতিতা যদি নিজে না প্রতিবাদ করে তা হলে অভিযোগ ধোপে টিকবে কী করে? শেষ পর্যন্ত একদিন তো অরিজিৎ সরাসরি নিজের শ্বশুরমশাইকে বলেই ফেলেছিল, "আপনি এসে রোজ এত কীসের হুমকি দিচ্ছেন? আপনার মেয়েই তো আপনাকে পোঁছে না। আপনাদের বাড়ি যেতে চায় না। যান, যান নিজের বাড়ি যান। আর যেন কোনওদিন আপনাকে এ বাড়িতে ঢুকতে না দেখি।"

শুক্লামাসি কাঁদতে-কাঁদতে মাকে বলেছিল, প্রদীপমেসো সেই অপমান হজম করতে পারেননি। মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিলেন। তারপরই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার কোনও সুযোগ পাননি প্রদীপমেসোকে বাঁচানোর।

প্রদীপমেসো মারা যাওয়ার পর ঝুমুরের উপর অত্যাচার বাড়তে থাকল। এখন অরিজিতের চোখ পড়েছে উত্তরপাড়ার বাড়ি আর শুক্লামাসির ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের দিকে। অরিজিৎ জানে দুটো মিলিয়ে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি হাসিলের জন্য চলছে নির্যাতন। ঝুমুর সেই নির্যাতন সহ্য করছে। কিন্তু কিছুতেই ওই বাড়ি ছেড়ে মায়ের কাছে আসছে না। এ যেন এক ধরনের আত্মহনন। ঝুমুর কেন এমন করছিল প্রদীপমেসো ধরতে পারেননি। কিন্তু শুক্লামাসি বুঝেছেন। তাই নিজের থেকেই যোগাযোগ করেছেন আকাশদের সঙ্গে। একমাত্র আকাশই পারে ঝুমুরকে ওখান থেকে বের করে আনতে।

এখন অরিজিৎ অফিসে। ওর বাবা, দিদি গিয়েছে কলকাতায়। সেখানে অরিজিতের বাবার কিছু রুটিন চেকআপ আছে। এখন গেলে ঝুমুরকে ফাঁকা পাওয়া যাবে।

রাস্তা পেরোল আকাশ। রাস্তা পেরিয়েই একটা গলি। গলিটা খানিক গিয়েই ডান দিকে বেঁকে গিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে বাঁ দিকে ঝুমুরের শ্বশুরবাড়ি। একবারেই বাড়িটা চিনতে পারল আকাশ। বেশ পুরনো বাড়ি। ধীরে-ধীরে ও গিয়ে দাঁড়াল বাড়ির দরজার সামনে। ডোরবেলে চাপ দিল।

ভিতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, “কে?”

ঝুমুরের গলা। আকাশ কতদিন বাদে ঝুমুরের ডাক শুনল। আর ডাক শুনতেই ঝুমুরের মুখটা ওর মনে পড়ে গেল। আকাশ আবার ডোরবেল টিপল। এবার আর ঝুমুরের গলার আওয়াজ শোনা গেল না। তবে দরজা খুলে গেল।

প্রদীপমেসো চোয়াল শক্ত করে বলেছিলেন, “ওই হারামজাদা ছেলেকে যেন আর কোনওদিন এই বাড়ির ত্রিসীমানায় না দেখতে পাই।”



দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে ঝুমুর। রোগা। ক্ষয়াটে চেহারা। গাল ভেঙেছে। কপাল অনেক চওড়া হয়ে গিয়েছে। সিঁথিতে এক-দুটো পাকা চুল। অনেক কালো হয়ে গিয়েছে ঝুমুর। যে শাড়িটা পরে আছে সেটাও ম্যাড়ম্যাড়ে। ঝুমুরকে দেখে এক মুহূর্ত কোনও কথা বলতে পারল না আকাশ। ঝুমুরও তাই। আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, “আয়।”

আকাশ দরজা দিয়ে ঢুকে জুতো খুলল। ঝুমুর সদর দরজা আটকাল।

ভিতরে এসে আকাশ চারপাশ তাকাল। মধ্যবিত্তের বসার ঘর যেমন হয়, এই ঘরও তেমনই। দরজার ডান দিক দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে। সোজা গেলে বসার ঘর কাম ডাইনিং রুম। এক পাশে রান্নাঘর। বাথরুম। আর-একটা ঘরও দেখা যাচ্ছে।

ঝুমুরের পিছু-পিছু আকাশ বসার ঘরে এল। সোফায় বসল। ঝুমুর বসল উলটো দিকের সোফায়। বলল, “তোকে ঠিকানা কে দিল, মা?”

ঘাড় নাড়ল আকাশ।

ঝুমুর বলল, “নিশ্চয়ই এই সময় আসার কথাও মা-ই বলেছে?”

আকাশ ফের মাথা নাড়ল।

ঝুমুর হাসল। বলল, “তারপর কেমন আছিস? চেহারায় তো দিব্যি জেল্লা এসেছে।”

“কিন্তু তোর একি অবস্থা!” আকাশ এতক্ষণে কথা বলল।

ঝুমুর হাসল। কোনও জবাব দিল না।

আকাশ প্রায় স্বগতোক্তির মতো করেই বলতে থাকল, “চেহারা ভেঙে গিয়েছে...মুখ-চোখ কেমন হয়ে গিয়েছে...তুই, তুই কি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করিস না?”

ঝুমুর ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে রাখল। বলল, “প্রেম করছিস?”

“তুই কিন্তু আমার কথাগুলো এড়িয়ে যাচ্ছিস,” আকাশ বলল।

“সে তো তুইও আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দিলি না।”

“প্রথম প্রশ্নটা কিন্তু আমিই করেছিলাম।”

“তাতে কী এল গেল? প্রথম প্রশ্ন সব সময় জরুরি প্রশ্ন হয় না।”

আকাশ স্থিরভাবে ঝুমুরকে দেখল। বলল, “মনে আছে ঝুমুর, সেই তুই খবর পাঠাতি ওই সময় বাবা, মা কেউ থাকবে না...”

“তুই কি সেই লোভে এই সময় এসে হাজির হলি?” ঝুমুরের ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি খেলে গেল।

আকাশের মনে হল কেউ যেন এক মগ জলে কালো রং গুলে ওর মুখে ছুড়ে মারল। আহত চোখে ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে ও বলল, “তোর তাই মনে হচ্ছে?”

ঝুমুর কোনও জবাব না দিয়ে উঠে গেল। ফ্রিজ থেকে স্কোয়াশের বোতল নিয়ে পানীয়টা গ্লাসে ঢালল। সেই গ্লাসটা দিল আকাশকে। বলল, “তোকে দেখে এতটাই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে, শরবত দেব তাও মাথায় কাজ করেনি। নে, আগে খেয়ে নে।”

আকাশ গ্লাসটা নিল। চুমুক দিল। বলল, “তুই কেন নিজেকে এভাবে শেষ করছিস?”

ঝুমুর আবার গিয়ে বসল নিজের সোফায়। আকাশের প্রশ্ন শুনে ওর দিকে সোজাসুজি তাকাল। বলল, “আমি বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছি। তোরা টের পাসনি।”

“মানে!”

ঝুমুর এবার দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। বলল, “দোলতলা ঘাটের সেই দিনটার কথা খেয়াল আছে? সেদিন বাড়ি ফিরে বাবাকে বলেছিলাম, ‘তুমি এই বিয়ে দিয়ো না। এর ফল ভাল হবে না।’ বাবা তার উত্তরে আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরেছিল। বলেছিল, ‘আচার্য পরিবারের মেয়ে হয়ে তুই এমন নোংরা হলি কীভাবে?’ আমি তাও বোঝাতে চেয়েছিলাম। বাবা বলেছিল, ‘নেহাত তোকে গলা টিপে মারতে পারছি না। যদি সুযোগ থাকত তাই করতাম।’”

আকাশ গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিল। থেমে গেল। অস্ফুটে বলল, “আর শুক্লামাসি?”

“মা? মা আবার কবে বাবার বিরোধিতা করেছে? সেই রাতে আমি যখন কাঁদছিলাম তখন মা এসে বলেছিল, ‘ন্যাকামি করিস না। তোর এই ন্যাকামি আমার অনেক দেখা আছে। দেড় বছর বয়সে তোর পক্স হয়েছিল। তখন যমে মানুষে টানাটানি চলেছিল। রাতের পর-রাত জেগে তোকে সুস্থ করে তুলেছিলাম। মনে হচ্ছে, সেটা না করলেই ভাল হত।’”

ঝুমুর হাসল।

আকাশ কোনও কথা বলতে পারল না। একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, “রাগের মাথায় অনেক সময় বাবা-মায়েরা এমন বলেই থাকে...”

ঝুমুর মাথা নাড়ল। বলল, “তোর থেকে আমার বাবা-মাকে আমি বেশি চিনি কুশ। বাবা এই বিয়েটা দিয়েছিল নিজের ইগো স্যাটিসফাই করতে। রঞ্জন আচার্যর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে অমুক

গায়ে হাত তুলতে?’ তুই একবার অ্যাপ্রোচটা দ্যাখ। ‘আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলতে’। কিন্তু বিয়ের এত বছর বাদেও কেন আমার বাচ্চা হল না, তা নিয়ে বাবার কোনও মাথাব্যথা ছিল না। মাও কোনওদিন জানতে চায়নি।”

“এই সব ভেবে নিজেকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ বল তো?”



ঝুমুর আবার গিয়ে বসল নিজের সোফায়। আকাশের প্রশ্ন শুনে ওর দিকে সোজাসুজি তাকাল। বলল, “আমি বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছি। তোরা টের পাসনি।”

“আমি লাভের আশায় নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি, এই তথ্যটা পেলি কোত্থেকে? সত্যি কথা বলতে, অরিজিৎ আমায় যত কষ্ট দিয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি দিয়েছে আমার বাবা-মা। অরিজিৎ এরকমই। বাঘের কাছে গেলে বাঘ হালুমই করে। হুক্কা হুয়া করে না। তুই যেমন বাঘের কাছ থেকে শেয়ালের ডাক শুনতে চাইলেও পাবি না, তেমনই অরিজিতের কাছে থেকেও এর বাইরে কিছু পাবি না। কিন্তু আমার বাবা-মা পারত আমাকে আমার পছন্দের জীবন দিতে। হয়তো আমার পছন্দের সঙ্গে তাদের পছন্দ মেলেনি। তবু আমার তো নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার আছে। বাবা আর মা মিলে সেই অধিকার আমার থেকে কেড়ে নিয়েছে। সেই জন্য আমি কোনওদিনও তাদের ক্ষমা করিনি। করবও না। আমি জানি, বাবা চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে মারা গিয়েছে। মাও প্রতিদিন যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে একটু-একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু এগিয়ে যাচ্ছে না, এই ভয়ে নিয়ে এগোচ্ছে যে, তাদের সারা জীবনের সঞ্চয় লুঠ করার জন্য একটা লোক শকুনের মতো অপেক্ষা করছে। কিন্তু এই পরিণতি তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছে।”

শরীর এতক্ষণ টানা কথা বলার পর ঝুমুরও হাঁপাচ্ছে। আকাশের একবার মনে পড়ল অমৃতার কথা। তবু নিচু বলল, “তুই কি আমার জন্যও যেতে পারিস না?”

ঝুমুর একবার ওকে দেখল। অপলকভাবে। বলল, “এখ আর তা সম্ভব নয় রে।”

“কেন?”

ঝুমুর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, “একটা পাখিকে খাঁচার ম পাঁচ বছর রাখার পর যদি খাঁচার দরজা খুলে দিস, দেখ পাখিটা খাঁচা ছেড়ে বেরোতে চাইছে না। তার মানে এই নয় যে, পাখিটা সুখে আছে। আসলে পাখিটা আর বাই জগতের উড়তে পারছে না। আজ আর আমি তোর হাত উড়তে পারব না।”

“কেন পারবি না? জীবন...”

“পারব না কুশ। তা ছাড়া তুই আর-একটা মেয়ের হাত এসে আমার হাত আবার ধরবি, সেটাও ঠিক নয়।”

থমকে গেল আকাশ। হতবাক হয়ে তাকাল ঝুমুরের দি ঝুমুর হেসে বলল, “তোকে যখন প্রশ্নটা করলাম, দেখ সরাসরি উত্তর দিলি না। তখনই বুঝতে পেরেছি, তোর আর-একজন এসে গিয়েছে।”

“ওটা প্রেম নয়, সম্বন্ধ!” আকাশ কাতর গলায় বলল।

ঝুমুর সোজা হয়ে বসল। বলল, “তবু। তোকে দেওয়ার আমার কাছে আজ কিছুই নেই। আবার তোর সঙ্গে জড় মানে নতুন জটিলতার মধ্যে গিয়ে পড়া। আমাকে খাঁচা থাকতে হবে। এখানেই আমার মুক্তি।”

“জীবন অনেক বড় ঝুমুর। তোর বাবা-মা, আমি...আম বাইরেও একটা বিরাট জগৎ...”

ঝুমুর উঠে দাঁড়াল। বলল, “তুই এবার ওঠ। আমার শ্বশুরমশাইয়ের ফিরে আসার সময় হয়ে গিয়েছে। আচ এসে যদি দেখে আমি ফাঁকা বাড়িতে পরপুরুষের সঙ্গে তা হলে মারতে-মারতে আধমরা করে দেবে।”

“কিন্তু তোর কী হবে?”

“কী হবে? কিছুই হবে না। একটা বাঁজা মেয়ের জীবনে হয় নাকি?”

আকাশের ভিতর থেকে বহুদিন বাদে আবার ফোয়ারার উঠে আসতে থাকল সেই জলস্রোত। সেটা সামলাতেই গ্লাসটা টেবিলে রেখে উঠে পড়ল। দরজার সামনে এসে পরল। তারপর নিজেই দরজা খুলে বাইরে পা রাখল।

হঠাৎ ঝুমুর পিছন থেকে ডাকল। বলল, “শোন!”

আকাশ ফিরে তাকাল।

ঝুমুর বলল, “তোর সঙ্গে যে মেয়েটার সম্বন্ধ...তার এক দেখাবি?”

ট্রাউজ়ারের পকেট থেকে মোবাইল বের করল আকাশ। গ্যালারিতে গিয়ে অমৃতার একটা ছবি বের করল। মোব এগিয়ে দিল ঝুমুরের দিকে।

ঝুমুর মোবাইলটা হাতে নিল না। তবে ছবিটা দেখল। অল্প হাসল। বলল, “মেয়েটাকে বেশ দেখতে। তোর স মানাবে ভাল।”

আকাশ কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ওর মু উপর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

অলংকরণ: মহেশ্বর মণ্ডল

বিশেষ রচনা









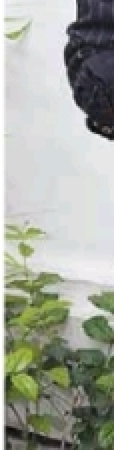




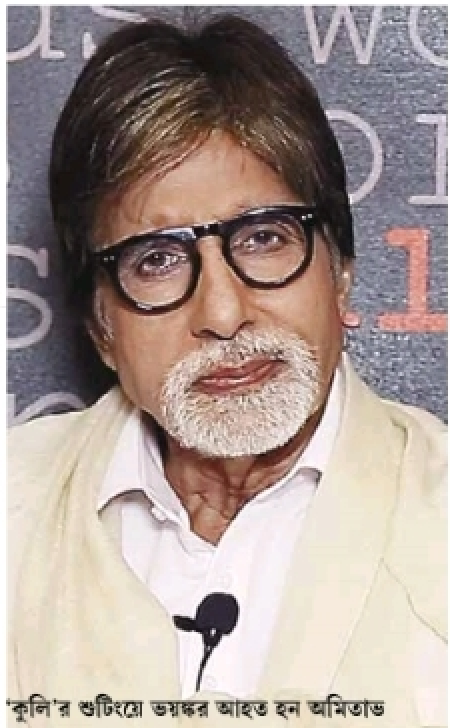


এভাবেও ফিরে আসা যায়...

কঠিন অসুখ বা চোট-আঘাত। ডিপ্রেশন বা ডিজ়এবিলিটি। কোনওকিছুই এঁদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। জীবনযুদ্ধে লড়াই করে ফিরে আসা এরকম চারজন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কথা বললেন মধুরিমা সিংহ রায়।



জীবনের মঞ্চে ঘাত-প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী। তবে কখনও কখনও সেই প্রতিঘাতের তীব্রতা বোধহয় সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়। তবে যাবতীয় ঝড়ঝাপটা সামলে কিছু মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে জানেন। জীবন তাঁদের যত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিই দাঁড় করাক না কেন, তাঁরা হাসিমুখে সেই চ্যালেঞ্জ স্বীকার করেন। আর শেষে মঞ্চের হাজার ভোল্টের আলোয় উদ্ভাসিত তাঁদের জয়োজ্জ্বল মুখখানা! তাঁদের লড়াইকে তখন কুর্নিশ জানাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ! ফিরে আসার লড়াইটাই যে তাঁদের বাকি পরিচিতিগুলোকে ছাপিয়ে তাঁদের 'অ'সাধারণ করে তোলে। যেমন ধরুন যুবরাজ সিংহ দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর মহানায়ক। তবে তাঁর অন্য পরিচয়ও আছে। যে পরিচয়টায় তিনি বিশ্বের বহু মানুষের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। ২০১১ সালে যখন তাঁর সেমিনোমা লাং ক্যানসার ধরা পড়ে, তখন ক্রিকেটে তাঁর স্বপ্নের দৌড় চলছে! সেই দৌড় হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি মাঠে যেমন রাজকীয় মেজাজে ব্যাট করতেন, সেভাবেই ফিরে আসেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "ক্যানসার হয়েছে, এটা প্রথমবার শুনলেই মনে হয় কেউ মৃত্যু পরোয়ানা জারি করল বোধহয়!" ক্যানসারজয়ী অবশ্য আরও অনেকেই আছেন। সাম্প্রতিক কালে ইরফান খান ও সোনালি বেন্দ্রে, বা কয়েকবছর আগে লিজা রে বা অনুরাগ বসুর কথাই ধরুন। "ডাক্তারেরা আমার সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী তখন সাত মাসের প্রেগন্যান্ট। ভেবেছিলাম, আর মাস তিনেক আমি যেন বাঁচি। তাহলে বাচ্চাটাকে দেখে যেতে পারব। ওই কঠিন সময়ে আমার সবচেয়ে বড় মোটিভেশন ছিল আমার সন্তান ও পরিবার," বলেছিলেন অনুরাগ। ইরফান খান তো প্রায় এক বছর ক্যানসারের সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে জিতে ফিরলেন। নতুন সিনেমা 'হিন্দি মিডিয়াম ২'-এর শুটিংও শুরু করেছেন। ঠিক যেভাবে কাজে ফিরেছেন ঋষি কপূর বা নাফিসা আলিও। লিজা রে কয়েক বছর আগে মাল্টিপল মায়েলোমায় আক্রান্ত হওয়ার পরে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়! এখন তিনি লেখিকা ও দুই সন্তানের মা। প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসিখুশি পোস্ট করেন। ক্যানসার কিন্তু তাঁকে অবসাদগ্রস্ত জীবনের দিকে ঠেলে দেয়নি। ঠিক যেমন হেরে যাননি সোনালি বেন্দ্রে বা মনীষা কৈরালা। হাই গ্রেড ক্যানসার ধরা পড়ার পরে সারা রাত



'কুলি'র শুটিংয়ে ভয়ঙ্কর আহত হন অমিতাভ



ডায়াবিটিসের সঙ্গে লড়ছেন সোনম

কেঁদেছিলেন সোনালি। কিন্তু তার পরে তিনি সিদ্ধান্ত নেন তিনি খুশি থাকবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলাও করে লেখেনও সে কথা, 'আই অ্যাম রিয়েলি হ্যাপি'। তবে শুধু ক্যানসার নয়। দীর্ঘস্থায়ী চোট-আঘাত থেকে ফিরে আসার লড়াইটা কিন্তু খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেও বেশ কঠিন। এম.সি মেরি কম, ভিনেশ ফোগত বা স্বপ্না বর্মনের কথাই ধরুন। এক সময়ে দীর্ঘ চোট-আঘাতের কারণে মেরি কমের বক্সিং রিংয়ে ফেরাই অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ফিরে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। দেড় বছরের চোট কাটিয়ে স্বপ্না বর্মনও যখন এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতেন, অনেকে তখনও রীতিমতো অবিশ্বাসী! কেউ কেউ তো আবার অসুখের সঙ্গেই সহাবস্থান করতে অভ্যস্ত! সোনম কপূরের মতো তারকা ছোটবেলা থেকে ডায়াবিটিসে ভুগছেন। সলমন খান মাঝেমাঝেই ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়ার অসহ্য ব্যথায় ভোগেন।

সমস্যা যাই হোক না কেন, জীবনের এসব ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে তাঁরা হয়ে উঠেছেন আরও পাঁচজনের অনুপ্রেরণা। এরকমই চারজন 'কামব্যাক হিরো'র সঙ্গে কথা বলল সানন্দা।

স্বপ্না বর্মন

খেলোয়াড়দের জীবনে চোট-আঘাত খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু চোটের জন্য প্রায় বছর দেড়েক ট্র্যাক থেকে ছিটকে যাওয়ার পরে কীভাবে ফিরে আসা সম্ভব, তা স্বপ্না বর্মন শিখিয়েছেন। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় আসার একটাই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর, যাতে একটা চাকরি জোটে! কলকাতায় এসে কোচ সুভাষ সরকারের সঙ্গে আলাপ ও তারপর একের পর এক সাফল্য। উত্তরবঙ্গের স্বপ্নার জীবনটা বদলে গিয়েছিল রাতারাতি। কিন্তু ২০১৫ সালে কোমরের চোট এমনভাবে ভোগাতে শুরু করল তাঁকে যে ২০১৭-র আগে ট্র্যাকে ফিরতে পারেননি তিনি! "ওই সময় মন খারাপ লাগত। ডিপ্রেশন হত। সকলে প্র্যাকটিস করত। আমার ইচ্ছে করলেও আমি প্র্যাকটিস করতে পারতাম না। শরীর সঙ্গ দিত না। একইসঙ্গে অনেকে অনেক কিছু বলত। 'স্বপ্নার ইনজুরি হয়ে গিয়েছে মানে ও শেষ!' বা 'ওর আর কী হবে। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে'। এরকম নেগেটিভ কথা লোকে বলত। কিন্তু এগুলো বলা উচিত নয়। হতেই পারে, চোট কাটিয়ে তিনি হয়তো অনেকদূর এগিয়ে গেলেন," বললেন স্বপ্না। এগিয়ে যাওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনি নিজেই! "আমি পড়াশোনায় ভাল ছিলাম না। কিন্তু নিয়মিত ডায়েরি লিখতাম। কোমরে চোটের সময় ট্রেনিং বন্ধ ছিল। সেসময়ে পুরনো ডায়েরিগুলো খুলে দেখতাম। ওগুলো আমায় মোটিভেট করত। এছাড়া বাবা-মা আর স্যারের উৎসাহ তো ছিলই! যাঁদের হাত-পা নেই, যাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম, তাঁরা যদি জীবনে এভাবে ফিরে আসতে পারে, তাহলে আমি সামান্য কোমরে চোট নিয়ে ফিরে আসতে পারব না কেন," বললেন তিনি। ফিরে এসে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে



সোনা জেতেন। তবে পারফরম্যান্স দিয়ে কাউকে কোনও জবাব দেওয়ার কোনও ইচ্ছে ছিল না। এমনকি জাকার্তা এশিয়ান গেমসে অসম্ভব দাঁতে ব্যথা নিয়ে সোনা জিতেছিলেন স্বপ্না। ‘‘এতদিনের প্র্যাকটিস দাঁতে ব্যথার জন্য বিফলে যাবে! ভাবতেই পারছিলাম না। তাই অসম্ভব ব্যথা নিয়েও লড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাউকে যদি চোট-আঘাতের কথা বলতে যাই, লোকে ভাববে আমি বোধহয় অজুহাত দিচ্ছি। তবে এখন মনে হয়, চোট ছাড়া কোনও প্রতিযোগিতায় বোধহয় সফল হব না,’’ হাসতে হাসতে জানালেন বিশ্বজয়ী। বহু ওঠাপড়ার সাক্ষী কোচ সুভাষ সরকার জানালেন, ‘‘২০১৫-য় যখন কোমরে ব্যথা শুরু হয়, তখন হাই জাম্প করাতে পারতাম না। অপারেশনেও সেরে ওঠার একশো শতাংশ নিশ্চয়তা ছিল না। ফলে, স্ট্রেংদেনিং এক্সারসাইজ় শুরু করাই। ২০১৫ আর ২০১৬-য় বিশেষ কোনও মেজর টুর্নামেন্ট ও খেলতে পারেনি। ২০১৭-এ ভুবনেশ্বরে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ টার্গেট করে এগোতে থাকি। এতদিন পরে ট্র্যাকে ফিরে আসাটা বিরাট কামব্যাক! দারুণ খেলে সোনা জেতে।’’ এরপরেও গোড়ালি, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটেও ভুগেছেন। কিন্তু যতবারই ভুগেছেন, যতবারই বিরতি নিয়েছেন, তারপরেই দুর্দান্তভাবে ফিরে এসেছেন স্বপ্না। আর প্রতিবারই এই প্রত্যাবর্তন বড় মঞ্চে।

লিজ়া রে

নয়ের দশকে অভিনেত্রী ও সুপারমডেল

> ‘মন খারাপ লাগত। ডিপ্রেশন হত। সকলে প্র্যাকটিস করত। আমার ইচ্ছে করলেও আমি প্র্যাকটিস করতে পারতাম না।’



লক্ষ্যে স্থির

হিসেবে পরিচিত ছিলেন লিজ়া। আর এখন তিনি একজন প্রথম সারির লেখক ও দুই সন্তানের মা। কিন্তু মাঝের সময়টায় তিনি এক অসম লড়াই করে হারিয়ে দিয়েছেন মারণরোগ ক্যানসারকে। তারও আগে তিনি যুদ্ধ করেছে বুলিমিয়ার সঙ্গে। ‘‘টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আগে আমার কস্টিউম ডিজ়াইনার আমার সামনে একজোড়া জুতো রাখলেন। মাই ফিট ওয়্যার ব্লোটেড। স্টেরয়েডের প্রভাব আর কী! মুখ পুরো চাঁদের মতো গোল হয়ে গিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশও স্ফীত হচ্ছিল চোখের সামনেই। এর ঠিক দু’মাস আগেই ডাক্তার আমাকে জানিয়েছিলেন আমার মাল্টিপল মায়লোমা হয়েছে! কিন্তু আমি ভাবলাম এ-ও বোধহয় জীবনের আর এক অ্যাডভেঞ্চার। মাত্র ৩৭ বছরেই এই অসুখ, যা সাধারণত পঁয়ষট্টিতে হয়,’’ আত্মজীবনীতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন লিজ়া। স্টেরয়েড, কেমোথেরাপি হাসপাতাল...এই শব্দগুলো তাঁর জীবনের সঙ্গে সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। পিছনে ফিরে তাকালে কেমন লাগে? উত্তরে লিজ়া জানালেন, ‘‘জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি। আই বিলিভ আই অ্যাম



প্র্যাকটিসের ফাঁকে স্বপ্না



ক্যানসারজয়ী লিজ়া

মোর বিউটিফুল ফর হ্যাভিং বিন ব্রোকেন। আমি এতটাই মানসিকভাবে দৃঢ় ছিলাম যে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পেরেছি।'' তবে ক্যানসার তাঁকে বদলেছে



> ক্যানসারের পরে বুঝতে শিখেছি কোনগুলো জরুরি। আই সিম্পলি কনসেনট্রেট অন হোয়াট ফিডস মাই স্পিরিট। তাই, ক্যানসার-যুদ্ধ জিতে আমি বিয়ে করেছি, সন্তানের মা হয়েছি, আত্মজীবনী লিখেছি আর স্বাস্থ্যকে সবার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।

নিশ্চয়ই! নিজেই বললেন, ''আমি বরাবরই অত্যন্ত কৌতূহলী আর সংবেদনশীল মানুষ ছিলাম। আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। কিন্তু জনসমক্ষে এগুলো গোপন করে রাখতাম। মুখোশ পরে থাকতাম বলতে পারেন। কিন্তু ক্যানসারের পরে আমি বুঝতে শিখেছি কোনগুলো আমার জন্য জরুরি। আই সিম্পলি কনসেনট্রেট অন হোয়াট ফিডস মাই স্পিরিট। বিয়ে করেছি, সন্তানের মা হয়েছি, বই লিখেছি (আত্মজীবনী 'ক্লোজ় টু দ্য বোনস') আর স্বাস্থ্যকে সবার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। আবার নতুন করে কাজ করছি। শুধু উপার্জনের জন্য তো সেভাবে কখনওই কাজ করিনি। যে ধরনের কাজ ভাল লাগে, সেগুলোই করছি। 'ফোর মোর শটস প্লিজ়' (ওয়েব সিরিজ়) করলাম। এ.আর রহমানের 'নাইনটি নাইন সংগস'-এও কাজ করেছি। সারা বিশ্বে প্রচুর পাবলিক স্পিকিং করি আমি। নিজের জীবনের গল্প আর পাঁচজনের সঙ্গে শেয়ার করতে ভাল লাগে। মাতৃত্ব আর কাজ নিয়ে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত।'' কেমোথেরাপির পর চেহারা খারাপ হয়ে গেলে অনেকেই ডিপ্রেশনে ভোগেন। তবে লিজ়ার সোজাসাপটা জবাব, ''চেহারায় পরিবর্তন হলে কী আসে যায়! এসব সুপারফিশিয়াল জিনিসের চেয়ে জীবনটা অনেক ব্যাপ্ত! ক্যানসার ঠিক এগুলোই শেখায়। কঠিন সময়ে পাশে ছিলেন বাবা ও তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু সলিল। তবে 'ইয়েলো ডায়েরিজ়'-এ লেখালেখি তাঁর ফিরে আসার গল্পের আর এক অধ্যায়। ''কত নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হল ব্লগিংয়ের সুবাদে। চিকিৎসার প্রথম দু'মাস চুপচাপ থাকতে কষ্টই হয়েছিল। বুঝেছিলাম, কত মানুষ নিঃশব্দে কষ্ট পান! ব্লগ লিখতে শুরু করার পরে বুঝলাম কোথাও না কোথাও আশা আছে। আই ওয়াজ় নেভার হোপলেস,'' বললেন তিনি।

দীপা মালিক

দীপার ফিরে আসার গল্পটা আবার



দেশের গর্ব দীপা মালিক

অ্যাথলিট বনে যাই। কমনওয়েলথ গেমসে কিছু কিছু বিভাগে মেনস্ট্রিম খেলার সঙ্গেই প্যারা অ্যাথলিটদের খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। ২০১০-এ আমি তথাকথিত 'স্বাভাবিক' খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলাম। এরপরে এশিয়ান গেমসে মেডেল জিতি। ২০১১-তে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপেও প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে (প্যারা অ্যাথলেটিক্সে) পদক জিতি। একটা সময়ে নিজের রেস্তরাঁ ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। সেখান থেকে খেলাধুলোর সেরা মঞ্চে পদক জয়—অনেকটা পথ পেরোতে হয়েছে,'' জানালেন তিনি। ২০১০-এর পরে তিনি বিশেষভাবে সক্ষম অ্যাথলিটদের অধিকারের জন্য লড়াই শুরু করেন। ২০১৬-র রিও অলিম্পিক্সে তাঁর রুপোজয় তো ইতিহাস! ''জীবন আপনাকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সুযোগ দেয়। আপনাকে সেই সুযোগগুলোকে খুঁজে নিতে হবে। আমি শয্যাশায়ী থাকার সময়ে 'পেশেন্ট অন আ হুইলচেয়ার' হিসেবে বাঁচতে চাইনি। বাইক চালিয়েছি। আই ওয়াজ় নেভার আ বার্ডেন অন মাই ফ্যামিলি। বয়স হোক বা ডিজ়এবিলিটি, কোনওটাই আমার কাছে অন্যরকমের! আপাদমস্তক সুস্থ-সবল একজন মানুষ যখন হুইলচেয়ার-বন্দি হয়ে গেলেন, তখন জীবনে হতাশা আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু দীপা একেবারে অন্য ধাতুর মানুষ। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে ছাপিয়ে তিনি দেশকে অলিম্পিক পদক দিয়েছেন। সদ্য রাজীব গাঁধী খেলরত্ন পেয়েছেন। ''যখন আমি প্যারালাইজ়ড হলাম, আমার দুই বাচ্চাই খুব ছোট। আমার পরিবারের লোকেরাও একটু উপেক্ষা করতে শুরু করেছিলেন। আসলে, একটা পরিবারের যাবতীয় কাজকর্ম তো একজন মহিলার দায়িত্বেই থাকে। তিনিই যদি প্যারালাইজ়ড হন, তাহলে সংসার চলবে কী করে! কিন্তু আমি ভাবলাম, এভাবে চললে আমার সন্তানদের কী হবে? ওদের মধ্যে 'কমপ্লেক্স' কাজ করতে পারে। ওরা ভাবতেই পারে, ওদের মা সবসময় হতাশায় ভোগে, কিছু করতে পারে না,'' জানালেন দীপা। চারপাশের সমাজের কাছে 'ডিজ়এবিলিটি' নিয়ে যে 'স্টিগমা' আছে তা দূর করতে গিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন রোল মডেল! রিও অলিম্পিক্স ছাড়াও তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হল ২০১০-এর কমনওয়েলথ গেমস। ''আমি আগে সাঁতার কাটতাম। ৪০ বছর বয়সে সাঁতারু থেকে একজন

যখন আমি প্যারালাইজ়ড হলাম, আমার দুই বাচ্চাই খুব ছোট। আমার পরিবারের লোকেরাও একটু উপেক্ষা করতে শুরু করেছিলেন। আমি ভাবলাম, এভাবে চললে আমার সন্তানদের কী হবে? ওদের মধ্যে 'কমপ্লেক্স' কাজ করতে পারে।



প্রতিবন্ধকতা ছাপিয়ে অলিম্পিক্স পদকজয়ী দীপা মালিক



কঠিন সময় বদলে দিয়েছে কৈলাস খেরকে

বাধা হতে পারেনি,'' জানালেন দীপা।

কৈলাস খের

মঞ্চে যখন তিনি গান করেন, তখন যেন রীতিমতো এনার্জির বিস্ফোরণ ঘটান! কিন্তু এই আপাত হাসিখুশি মানুষটাকে দেখে কেউ বুঝবে একবার অবসাদে আত্মহত্যা করতে বসেছিলেন! সেদিন যদি সিদ্ধান্ত না বদলাতেন, তাহলে হয়তো বলিউড তাঁর মতো একজন প্রতিভাবান গায়কের সঙ্গে পরিচিতই হত না! ''হ্যাঁ, একবার এমন অবস্থা এসেছিল যে আমি মানসিক জোর হারিয়ে ফেলেছিলাম। পৃথিবীতে সকলেই এত বৈষয়িক মানসিকতার। আমি তো সবকিছু হৃদয় দিয়ে ভাবি। আমি এই বৈষয়িক দুনিয়ার সঙ্গে মোটেও খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। ব্যবসা করতাম তখন। প্রচুর লোকসান হয়। এটা গানের জগতে আসার আগের কথা বলছি। খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হয়েছিল আমি এই পৃথিবীর যোগ্য নই। সেসময়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করি! কিন্তু সে সময়ে ঈশ্বর এত পজ়িটিভিটি দিয়েছিলেন আমায় যে ওই দুঃসময় থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম,'' অকপট জানালেন। বয়স তখন খুবই কম ছিল তাঁর। কম বয়সে একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। এই দুঃসময় থেকে বেরিয়ে

> ‘ খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হয়েছিল, আমি এই পৃথিবীর যোগ্য নই। সেসময়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করি! ’

আসার জন্য সংগীত আর আধ্যাত্মিকতাই তাঁর ভরসা ছিল। ''২১-২২ বছর বয়সে ডিপ্রেশন কাটাতে একটা আশ্রমে থাকতে শুরু করি। হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে থাকার সময় আরতির ঠিক আগে আমি গান গাইতাম। সারা বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ আসতেন ওখানে। ওঁরা আমার গানের প্রশংসা করতে শুরু করেন। ভিতরে ভিতরে মোটিভেটেড হতে শুরু করলাম। ওখান থেকে জীবনের এক নতুন অ
শুরু হল, বলতে পারেন।
ফোক টিউনস গাইতাম। ভাবতাম অ
গান আবার কে শুনবে! লোকে বলত
আমার কণ্ঠস্বর ভাল না। প্রচুর রিজে
দেখেছি জীবনে,'' বললেন তিনি।
কিন্তু তারপর সেই যে জীবনের মো
ঘুরল, পরের পর সাফল্য এসেছে ত
কেরিয়ারে। তাঁর মতে, ডিপ্রেশন মা
তৈরি করে। তাঁর থেকে বেরনোর
উপায়ও মানুষ বের করে। ''আমাদে
আশেপাশে যা কিছু আছে, তাঁদের
প্রতি দয়ালু হলে, ওঁদের কাছ থেকে
অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবেন। ছোট থে
দেখতাম যে কারও দিকে তাকিয়ে
হাসলে তিনিও প্রত্যুত্তরে আপনার
তাকিয়ে হাসবেন। পৃথিবীটা বড্ড সু
কিন্তু আমাদের চাহিদা, লোভ ইত্যা
পৃথিবীটাকে জটিল করে তোলে। সু
পৃথিবী থেকে আমি প্রেরণা পাই,''
জানালেন কৈলাস।
স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অবসাদের পর্য
পেরিয়ে এসে জীবনদর্শনটাই বদলে
গিয়েছে তাঁর।


ফ্যাশন ৬



পুজোয় অন্যরকম

এথনিক থেকে ওয়েস্টার্ন, কোনও অংশে পিছিয়ে নেই ছেলেদের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। ফ্যাশনেবল পোশাকে এবারের পুজোকে স্পেশ্যাল করবেন অভিনেতা নীল ভট্টাচার্য ও দিব্যজ্যোতি দত্ত। তাঁদের ফ্যাশন ট্রেন্ড সাজালেন রূপকিনী সেনগুপ্ত।

দু'জনের পোশাকে এথনিক ও ইন্দো-ওয়েস্টার্ন ফ্যাশনের ছোঁয়া। এক বন্ধুর পছন্দ ডার্ক ব্লু ইন্দো-ওয়েস্টার্ন স্টাইলের জ্যাকেট ও গোল্ড ট্রাউজার্স। অন্যজনের পরনের ক্রিম রঙের কুর্তায় ফোল্ডেড কলার, পকেট ও বোতামের ডিটেলিং।

কুর্তা: বহুরূপী, অভিষেক রায়
ফোন: ৯৮৩১ ৪৫৭৫৮
জ্যাকেট ও ট্রাউজার্স: সুরভি পনসারি



একরঙা ডার্ক পিঙ্ক পাঞ্জাবির হাতায় সোনালি কাজ। পোশাকে গ্ল্যামার যোগ করেছে পার্পলের উপর পিঙ্ক ফ্লাওয়ার মোটিফের নেহরু জ্যাকেট। পুজোর সন্ধেয় আদর্শ এথনিক সাজ।

পোশাক: সুরভি পনসারি
ঠিকানা: ১২ লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-১৭
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪৮২৩২



পুজোয় মাস্ট খাঁটি বাঙালি সাজ। পরনে তাই পিচ রঙের পাঞ্জাবি ও সোনালি পাড়ের ধুতি। পাঞ্জাবিতে অভিনবত্ব এনেছে সোনালি ফ্লাওয়ার মোটিফ ও সূক্ষ্ম জরির কাজ।

পোশাক: আনন্দ, কুইন্‌স ম্যানসন, ১৩ রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩ ২২২৯২২৭৫/০৩৩ ২২২ ৯৪১৩৮



ওয়েস্টার্ন ওয়্যারে ক্যাজুয়াল লুক। ক্লাসিক সাদা, কালো আর গ্রে চেকসের জ়িপ দেওয়া জ্যাকেট। সাধারণ ডেনিম, টি-শার্টের লুক এক নিমেষে স্টাইলিশ।

জ্যাকেট: সুরভি পনসারি
ই-মেল: info@surbhipansari.com



হালকা সবুজ ক্রপড ট্রাউজার্স ও সেমি-ফর্মাল জ্যাকেটে নিটেড ও হ্যান্ড প্রিন্টেড প্যাটার্ন। ক্যাজুয়াল ও ফর্মালের মিশেলে অন্যরকম ফ্যাশন।

পোশাক ও জুতো:
জন সেনগুপ্ত কালেকশন, ব্যারাকপুর
ফোন: ৯৬৭৪০৫৭৬১৭

মেকআপ: প্রীতম দাস
ফোন: ৮৬২১০২০০৬১
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা, চকগড়িয়া
ফোন: ০৩৩২৪২৩৯১০০
ফোটো: শুভদীপ ধর
শুটিং কোঅর্ডিনেশন: মৌমিতা সরকার



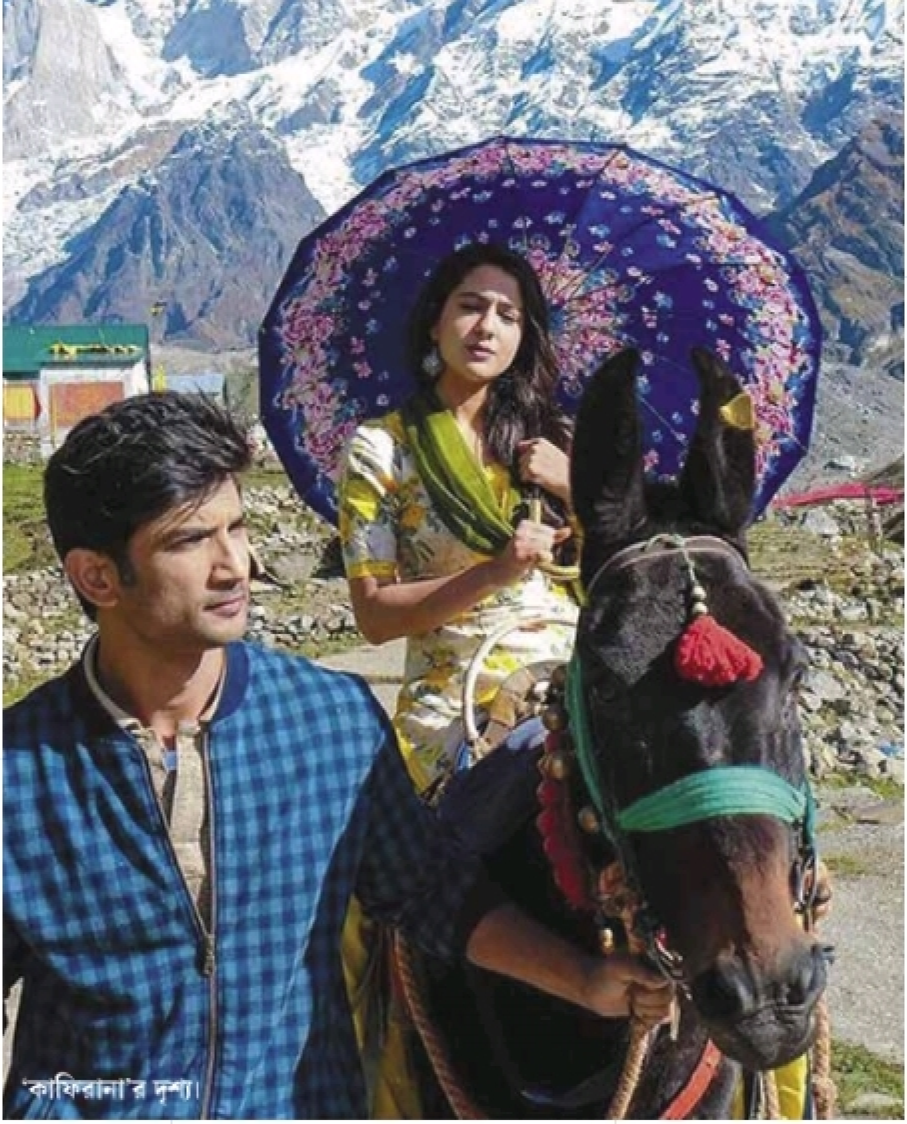
গান ভালবেসে...

হিন্দি গানের জগতে ধীরে ধীরে জমি শক্ত করছেন তরুণ তারকারা। গান বানানো থেকে রূপদান, সর্বত্রই তাঁরা স্বচ্ছন্দ। চার্টবাস্টারে চোখ রাখলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

'নতুন আশা, নতুন জোয়ার'... চেনা বাংলা গানের এই লাইনটা কিন্তু এখন হিন্দি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিরও ট্যাগলাইন হতেই পারে। ছবি হোক বা ওয়েব সিরিজ, গান তৈরি হোক অথবা তাতে রূপদান, সংগীতজগতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন একঝাঁক তরুণ মুখ। স্রেফ গীতিকার, সুরকার বা গায়ক না হয়ে ভার্সেটালিটিকেই ইউএসপি বানাচ্ছেন তাঁরা। এখনও সেভাবে ঘরে-ঘরে পরিচিত নাম হয়ে ওঠেননি। কিন্তু তাঁদের কাজের ধরন, গান বানানোর জানা এবং শোনা ছকের মাঝে দমকা বাতাসের মতো কান-মন জুড়িয়ে দিচ্ছে শ্রোতাদের। এ রকমই কিছু তরুণ তুর্কির দিকে তাকাল 'সানন্দা'।

নিকিতা গাঁধী

গীতা ঘটকের পরিবারের মেয়ে নিকিতা কিন্তু গানের আগে নাচ শেখা শুরু করেছিলেন, একদম খুদেবেলায়। নিকিতার মায়ের যখন মনে হয় মেয়ের গানের দিকে ঝোঁক রয়েছে, তখন শিল্পীর বয়স মাত্র পাঁচ বছর! গানের শিক্ষিকার প্রথমে মনে হয়েছিল, এইটুকু মেয়ে কি পারবে শিখতে? তারপর পাড়ার পুজোয় নিকিতার গান শুনে নিজেই তাঁর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ''আমার বাবা পঞ্জাবি। কিন্তু বাংলা গান ওঁর খুব প্রিয়। বাবাও নজরুলগীতি শিখতেন স্বপ্না আন্টির কাছে। আমি বাবার ক্লাসেও গিয়ে গানগুলো তুলে নিতাম। তারপর আন্টিকে গিয়ে বলতাম, প্লিজ় আমাকেও শেখাও গানগুলো!'' গানকেই পেশা করাটা অবশ্য নিকিতার ভাবনায় ছিল না। চেন্নাইয়ে ডেন্টিস্ট্রি পড়তে গিয়ে এ আর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ''কত কিছু যে শিখেছি ওঁর সঙ্গে রেকর্ডিং করতে গিয়ে,'' কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ল শিল্পীর কথায়। তারপর থেকে চুটিয়ে গাইছেন দক্ষিণী, হিন্দি, বাংলা, মরাঠি ছবিতে। যাঁরা নিকিতাকে পার্টি-সংয়ে শুনে অভ্যস্ত, তাঁদেরও তারিফ কুড়িয়ে নিয়েছেন 'কেদারনাথ' ছবিতে 'কাফিরানা'র মতো গান গেয়ে। শুধু গাওয়াই নয়, কিছুদিন নিজের সিঙ্গল 'হমশকল'এ গান বানানো থেকে এডিটিং, কালার কারেকশন— সব সামলেছেন। গানবাজনার এখনকার ট্রেন্ড সম্পর্কে বললেন, ''এটা সত্যি যে প্রচুর



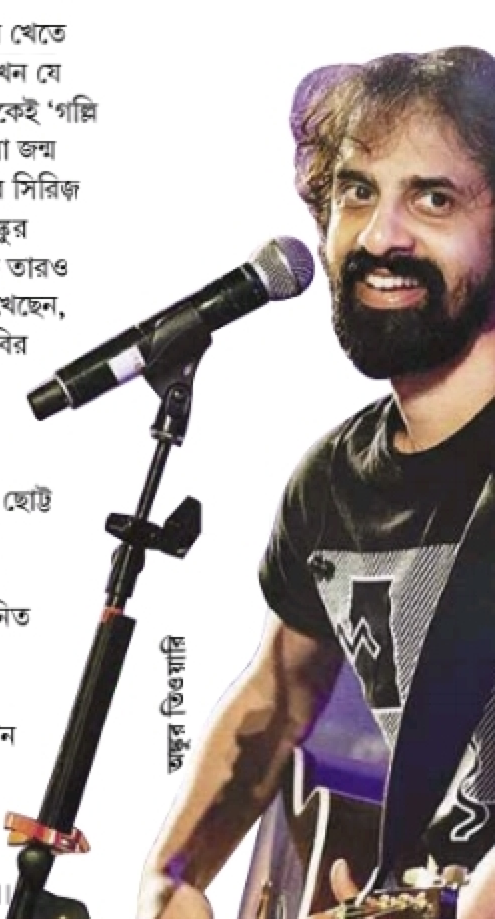
'কাফিরানা'র দৃশ্য।

নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি গানের জগতে। এবং প্রত্যেকেই জান লড়িয়ে নিজের সেরাটা দিচ্ছেন। তাতে করে নানা নতুন আইডিয়া, ক্যারেক্টার তৈরি হচ্ছে। শ্রোতারা নানা ধরনের গান শুনতে পারছেন। গোটা ব্যাপারটা তাঁদের এবং মিউজ়িক ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক।''

নিকিতা মনে করেন, ওয়েব সিরিজ়ের এতটা রমরমা আখেরে সংগীতশিল্পীদের সুবিধাই করছে। তাঁর মতে, ''প্রথমত আমরা নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক কাজ করতে পারছি। দ্বিতীয়ত, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজ়িকের জায়গাটা জোরদার হচ্ছে। শুধু বলিউডের মিউজ়িকের বাইরেও অনেক ফ্রেশ কনটেন্ট শুনতে পাচ্ছি আমরা।'' শিল্পী নিজেও নানা অরিজিনাল কনটেন্ট নিয়ে কাজ করছেন এখন। ''নিজের লেখা বিভিন্ন গান নিয়ে একটা অ্যালবাম করার কথা ভাবছি। আমি কিন্তু আদতে সিঙ্গার-সংরাইটার। শ্রোতাদের কাছে নিজের সেই সত্তাটাকেও তুলে ধরতে চাই এবার,'' বললেন হাসতে হাসতে।

অঙ্কুর তিওয়ারি

জোয়া আখতারের সঙ্গে একদিন খেতে বসেছিলেন অঙ্কুর তিওয়ারি। তখন যে আড্ডা মেরেছিলেন, সেখান থেকেই 'গল্লি বয়'এর মিউজিকের ভাবনাগুলো জন্ম নেয়। এই 'গল্লি বয়' এবং ওয়েব সিরিজ় 'মেড ইন হেভেন'এর পরেই অঙ্কুর পরিচিত নাম হয়ে ওঠেন। অথচ তারও অনেক আগে তিনি স্ক্রিনপ্লে লিখেছেন, 'গাট্টু' বা 'তুম মিলে'র মতো ছবির জন্য। শব্দের সঙ্গে তাঁর প্রেমটা শুরু হয়েছিল ছোটবেলায়, বেলজিয়ামে থাকতে। ফরাসি গান শুনতেন বাবা-মা। ভাষাটা ছোট্ট অঙ্কুরের বোধগম্য হত না। তাই নিজের মতো করে শব্দগুলোকে বানিয়ে নিত সে। গল্প সাজিয়ে নিত না-বোঝা গান থেকে। এখনও তাই নিজেকে 'স্টোরিটেলার' বলতেই পছন্দ করেন অঙ্কুর। গান লেখারও সেই শুরু। হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়েছিলেন বটে, তবে শেষমেশ পেশা



অঙ্কুর তিওয়ারি

'মিউজিক সুপারভাইজ়ার' তিনি। নিজের ভাষায় বলতে গেলে ''মিউ সুপারভাইজার আদতে স্ক্রিনপ্লে অ গোটা ছবির মিউজ়িকটাকে সাজায় মিউজ়িক, সাউন্ড এবং সাইলেন্সের গল্পটা কীভাবে এগোতে পারে, গ উত্তরণ কীভাবে হতে পারে, সেটা ছবির কোথায় গান থাকবে বা থাক না, গানের কথা-সুর কেমন হবে— সিদ্ধান্ত নেওয়াই মিউজ়িক সুপারভ এক্তিয়ারে পড়ে।''

ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজ়িকের ভক্ত যাঁ অঙ্কুরের ব্যান্ড 'অঙ্কুর অ্যান্ড দ্য গ ফ্যামিলি'র সঙ্গে তাঁরা অবশ্য অনে ধরেই পরিচিত। ২০০৯ সালে তৈ এই ব্যান্ড যে ধরনের গান বানায়, তাদেরই ভাষায়, 'উর্দু অ্যান্ড হিন্দি অ্যাকুস্টিক ব্যালাড ফোক রক/রক রোল'। সেখানে অঙ্কুর ভোকালিস্ট অ্যালবাম 'জন্নত', বাচ্চাদের অ্যাল 'বাচ্চা পার্টি', ইলেকট্রনিকা অ্যাল 'লিটল হোয়েল'— সব রয়েছে তাঁ ঝুলিতে। আবার 'শেফ'এর মতো ছবির তিনি অন্যতম গীতিকার! নি বলেন, যে তাঁর মাথায় সব সময় ঘোরে। গল্প ঘোরে। ছবি তৈরি হয়। সেগুলোকে সাজান মনে মনে। ''অ কোনও গ্র্যান্ড প্ল্যান নেই। এক পা- করে এগোই খালি,'' বয়ান শিল্পীর



সাচেত-পরম্পরা



সাচেত-পরম্পরা

'কবীর সিংহ' ছবিটা মিশ্র, এবং অনেক ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু ছবির 'বেখয়ালি' গানটা মুক্তি পাওয়ার আগে থেকেই চার্টবাস্টার! এই গানটা বানিয়েছেন মিউজিক্যাল ডুয়ো সাচেত টন্ডন এবং পরম্পরা ঠাকুর। দু'টো ভার্সনের মধ্যে একটা গেয়েছেন সাচেত। 'মেরে সোনেয়া'ও সাচেত-পরম্পরারই সুর করা এবং গাওয়া। এর আগে শাহিদের 'বত্তি গুল মিটার চালু' ছবিরও দু'টো গান কম্পোজ করেছিলেন দু'জনে। ''তখনই আমাদের কাজ ভাল লেগেছিল শাহিদ স্যারের। 'কবীর সিংহ'র পরিচালকের সঙ্গে উনিই আমাদের সিটিং করতে বলেন,'' বয়ান সাচেতের। এক রিয়্যালিটি শো'এর ফাইনালিস্ট সাচেত এবং পরম্পরা একসঙ্গে কাজ শুরু করেন ২০১৬ সালে। 'টয়লেট: এক প্রেম কথা' ছবিতে তাঁদের সুরে এবং কণ্ঠে 'সুবাহ কি ট্রেন' শ্রোতাদের প্রশংসাও পায়। 'ভূমি' ছবির 'মেরে বাদ' গানটি লেখেন এবং সুর করেন দু'জনে। সেই শুরু। তারপর 'বত্তি গুল...', 'কবীর সিংহ' হয়ে 'সাহো', 'অর্জুন পাতিয়ালা', 'জবরিয়া জোড়ি'— সর্বত্রই চুটিয়ে গান বানাচ্ছেন এবং গাইছেন এই জুটি।

অরিজিনাল গানের কদর সাচেত-পরম্পরার কাছে সকলের আগে। কিন্তু পুরনো গান রিক্রিয়েট করতেও আপত্তি নেই তাঁদের। যদিও গানের মূল ভাবকে কোনওভাবেই নষ্ট করতে চান না তাঁরা। পরম্পরার কথায়, ''রিমিক্সটা ট্রেন্ড হয়ে গিয়েছে, কারণ মানুষ শুনছেন। যেদিন শুনবেন না, ট্রেন্ডটাও থাকবে না আর। তাই রিমিক্সের পাশাপাশি নিজস্ব গান বানিয়ে চলাটাও দরকার।'' ছবির গান বানান তাঁরা। তাই ছবির মেজাজের সঙ্গে সাযুজ্য রাখাটা জরুরি তাঁদের কাছে। তবে সবচেয়ে জরুরি হল এমন গান বানানো, যা সব রকমের শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নেয়। ভাল গান শ্রোতাদের কাছে পৌঁছবেই, বিশ্বাস করেন এই জুটি।

স্নেহা খানওয়ালকার

'গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর' ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির মিউজ়িক শুনে অনেকেরই মনে



হয়েছিল, ‘এ কী শুনলাম! এমনটা তো আগে শুনিনি’! ছবিদু’টোর সংগীত যিনি করেছিলেন, সেই স্নেহা খানওয়ালকারের জার্নি কিন্তু শুরু হয়েছিল আরও অনেক আগে। ২০০৪ সালে, ‘দ্য হোপ’ ছবি দিয়ে। বড় ব্রেক পেয়েছিলেন ২০০৭ সালে, রামগোপাল বর্মার ‘গো’ ছবিতে। তারপর ‘ওয়ে লাকি! লাকি ওয়ে!’, ‘লাভ, সেক্স অওর ধোঁকা’, ‘ভেজা ফ্রাই টু’তেও কাজ করেছেন। সম্প্রতি স্নেহার কাজ শোনা গিয়েছে নন্দিতা দাসের ছবি ‘মান্টো’য়। এই ইঁদুরদৌড়ের যুগেও প্রচুর কাজ-প্রচুর রোজগারে বিশ্বাস করেন না। কম কাজ করব, কিন্তু ভাল কাজ করব— এটাই শিল্পীর নিজস্ব নীতি। ইলেকট্রনিক মিউজ়িককে ফোক গানের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়াটা স্নেহার সিগনেচার। একবার বলেছিলেন, “স্টুডিওয় বসে, প্রচুর টাকা খরচ করে নামজাদা শিল্পীদের নিয়ে সেই একই রকম কাজ করায় মজাটা কোথায় বলুন তো? তার চেয়ে খোলা ময়দানে বেরিয়ে নতুন কিছু করাটা ভাল না?” বোধহয় এই নতুন কিছু করার তাগিদেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে লোকাল সাউন্ড এবং মিউজ়িক সংগ্রহ করেন তিনি। সেগুলোকে কাজে লাগান ছবিতে। তবে স্নেহার বক্তব্য, তিনি সাউন্ড ক্রিয়েট করেন না। শুধু এমন মিউজ়িশিয়ানদের সঙ্গে কাজ করেন, যাঁরা গানের নির্যাসটাকে ঠিকঠাক বের করে আনতে পারেন।

অলকানন্দা দাশগুপ্ত

‘সেক্রেড গেম্‌স’এর কল্যাণে চিত্রপরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের মেয়ে অলকানন্দার ফ্যান ফলোয়িং এখন ঈর্ষণীয়! কেবল সাধারণ শ্রোতারাই নন, টুইট করে তাঁর প্রশংসা করেছেন স্বয়ং এ আর রহমান! কিন্তু তাঁর শুরুটা হয়েছিল অনেক আগেই। অমিত ত্রিবেদীকে


অলকানন্দা দাশগুপ্ত

অ্যাসিস্ট করা দিয়ে। সঙ্গে ছিল কম্পোজ়ার হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি ‘শালা’ (মরাঠি ভাষায়)। “যে সব হিন্দি ছবির গান শুনে আমরা বড় হয়েছি, সেগুলোর সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে পারতাম না। নিজের মতো করেই যে মিউজিক বানাতে পারব,

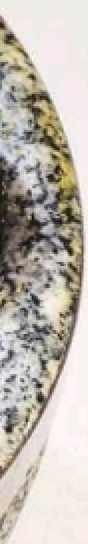
এই বিশ্বাসটা আমার ছিল। আর কো
অপশনও ছিল না আমার কাছে,”
তাঁর। শ্রোতারা যে তাঁর কাজ পছন্দ
করছেন, সেটা অলকানন্দা বুঝতে
আরেকটু পরে। মরাঠি ছবি ‘ফ্যানি
হিন্দি ‘আনওয়ার কা আজব কিস্‌স
সময় থেকে। বললেন, “গান নিয়ে
আলোচনা হয় শ্রোতাদের মধ্যে, সে
নিয়েও ততটাই হওয়া উচিত! সেটা
হচ্ছে, বুঝতে পারলাম ‘ফ্যানড্রি’ অ
‘আনওয়ার...’এর পরেই।” ‘সেক্রে
গেম্‌স’ ছাড়াও ‘ব্রিদ’, ‘লায়লা’তে
করেছেন অলকানন্দা। ওয়েব সিরি
কি নিজের শিল্পীসত্তাটাকে খুঁড়ে দে
সুযোগ বেশি মেলে ছবির তুলনায়
এল, “সিরিজ়টা যদি মনের মতো
তাহলে মেলে। কিন্তু কাজটা যেহেতু
খাটনির এবং অনেকদিনের, তাই
পছন্দ না হলে মুশকিল!”
পুরনো-নতুন নানা গানকে ধরে-ধ
রিমিক্স করাটা এখন চল হয়ে গিয়ে
অনেকে রিমিক্সগুলো শুনছেনও
ভালবেসে। এ প্রসঙ্গে অলকানন্দা
বললেন, “রিমিক্স যদি ভাল করে
হয়, তাহলে আমি কোনও সমস্যা
না তাতে! কিন্তু কাল যদি আমায়
ছবিতে চারটে গানের রিমিক্স করতে
হয়, এবং গানগুলো মুক্তি পাওয়ার
আমায় বিরাট কম্পোজ়ারের তকমা
দেওয়া হয়, তাতে আমার আপত্তি
গানগুলো তো আমার কম্পোজ় ক
নয়! কম্পোজ়ার হিসেবে ক্রেডিট কে
নেব? যিনি যে কাজটা করছেন, তাঁ
সেটুকুর জন্যই কৃতিত্ব পাওয়া উচি
এটাই বলব।”

শেষ পাতে বেশ তো!

নামে মিষ্টি, কিন্তু জিভের ডগা ছুঁলেই ঝাল! কিংবা হয়তো একটা আস্ত জেলির বলের উপর রক্তপ্রবালের মতো মায়াবি গার্নিশিং। চেনা র‌্যাসপবেরির স্বাদটাই যদি বদলে দেওয়া যায় নিমেষে! সব উপকরণই তো হাতের মুঠোয়। বিদেশি ডেজ়ার্টে দেশি ছোঁয়া। এ রকম ছ'টি রেসিপি সংগ্রহ করলেন দেবমাল্য চক্রবর্তী।



মাচা উইথ র‌্যাসপবেরি ম্যাকারুন





র‍্যাসপবেরি অ্যান্ড বিট রুট কোরাল

সব সময়ই যে খাবার শেষ হলে মিষ্টি খেতে হবে, তার কি কোনও মানে আছে! তার জন্য কিছু রেসিপি জেনে নেওয়া দরকার, তাই না?

মাচা উইথ র‍্যাসপবেরি ম্যাকারুন

উপকরণ: ম্যাকারুনের জন্য— এগ হোয়াইট ২০০ গ্রাম, ক্যাস্টর সুগার ৬০০ গ্রাম, জল পরিমাণমতো, আমন্ড পাউডার ২০০ গ্রাম, আইসিং সুগার ২০০ গ্রাম, মাচা পাউডার ২ গ্রাম।

র‍্যাসপবেরি ক্যাভিয়ারের জন্য—র‍্যাসপবেরি পিউরি ৫০০ গ্রাম, আগর আগর পাউডার ৫ গ্রাম।

প্রণালী: আমন্ড পাউডার, আইসিং সুগার এবং এগ হোয়াইট দিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। এর পর ইটালিয়ান মিরিগিউ তৈরি করে পেস্টের উপরে ঢেলে দিন। তারপর সিলপ্যাট ম্যাটের উপর বেকিং ট্রে রেখে সেখানে পুরোটা সাজিয়ে, ২০ থেকে ৩০ মিনিট ১৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বেক করুন। ততক্ষণে র‍্যাসপবেরি পিউরি এবং আগর আগর একসঙ্গে বয়েল করতে থাকুন। মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে গেলে তেলে ফোঁটা ফোঁটা করে ফেলতে থাকুন। হয়ে গেলে সরিয়ে রাখুন। ম্যাকারুনের উপর এটা দিয়ে গার্নিশ করে পরিবেশন করুন।

র‍্যাসপবেরি অ্যান্ড বিট রুট কোরাল

উপকরণ: বিট জেলির জন্য— বিট পিউরি ৪০০ গ্রাম, মধু ১০০ গ্রাম, পিঙ্ক পেপারকর্ন ২ গ্রাম, পেকটিন পাউডার ৪ গ্রাম, জেলাটিন ৫ গ্রাম।

বিট স্পঞ্জের জন্য—শুকনো বিট পাউডার ৭০ গ্রাম, এগ হোয়াইট ৩০০ গ্রাম, চিনি ২০ গ্রাম, ময়দা ৯০ গ্রাম, নুন পরিমাণ মতো, সাদা তেল ১০০ গ্রাম।

ফিলিংয়ের জন্য—র‍্যাসপবেরি পিউরি ৫০০ গ্রাম, আইসিং সুগার ১৭৫ গ্রাম, হুইপড ক্রিম ৩৫০ গ্রাম, জেলাটিন প্রয়োজন মতো।

র‍্যাসপবেরি অ্যান্ড বিট সসের জন্য—র‍্যাসপবেরি পিউরি ১০০ গ্রাম, বিট পিউরি ১০০ গ্রাম, আগর আগর ৩ গ্রাম, চিনি প্রয়োজন মতো।

প্রণালী: প্রথমেই বিট জেলি তৈরি করে নিন। মিক্সারে বিট পিউরি দিয়ে স্ট্রেন করে নিন। সেটি স্টপ পটে ঢেলে দিয়ে মধু এবং পেকটিন পাউডার দিয়ে বয়েল করুন। শেষে পিঙ্ক পেপার কর্ন যোগ করুন। গরম থেকে বের করে এনে জেলাটিন দিয়ে হাফ স্ফিয়ার মোল্ডে ঢেলে ফ্রিজারে ঢুকিয়ে দিন। এর পরে সস। তার জন্য রাসপবেরি পিউরি এবং বিট জুসে চিনি এবং আগর আগর দিয়ে বয়েল করুন। একটি পাত্রে রেখে ফ্রিজারে তিন ঘণ্টা রেখে দিন। হয়ে গেলে হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে

> "...চাটু বচনের মিষ্টি রচন জানে;
> ক্ষীরে সরে কেউ মিষ্টি বানিয়ে আনে।"
>
> *প্রহাসিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*



> র‍্যাসপবেরি, চকোলেট কিংবা ভ্যানিলা খুবই হয়তো কমন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে থেকেই নতুন কিছু করার চেষ্টা করি। মাথার মধ্যে, কিচেনের মধ্যে রিসার্চ চলতে থাকে। ফ্লেভারগুলো কম্বাইন করি। উদ্দেশ্যে, একটা এশিয়ান টাচ দেওয়া। টিপিক্যাল খাবার খেতে কে-ই বা পছন্দ করে। প্রত্যেকের স্বাদের ধারণাটা আলাদা।
>
> ***ভাস্কর চক্রবর্তী, এগজিকিউটিভ পেস্ট্রি শেফ, জে ডব্লু ম্যারিয়ট***



ব্লেন্ড করে নিয়ে ছেঁকে সরিয়ে রাখুন। বিট কেকের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো মিক্সিং বোলে রেখে হ্যান্ড ব্লেন্ডারে মিশিয়ে নিন। সেটা স্ট্রেন করার পর ক্রিম চার্জারে ঢেলে দিন। দু'টো সিলিন্ডার দিয়ে চার্জ করে দু'ঘণ্টা মতো রেখে দিন। পেপার কাপে ঢেলে মাইক্রোওয়েভে ৩০ সেকেন্ড বেক করুন। এরপর সিলিকন স্ফিয়ার মোল্ডে অর্ধেক রাসপবেরি মুস ঢেলে দিন। ওই মোল্ডের মাঝখানে বিট জেলি বল রেখে আবার মুস ঢেলে দিন। একদিন ফ্রিজারে রাখুন।



প্যানফর্তে



সল্টেড পিস্তাশিয়ো ফাইনানশিয়ার

পরের দিন গোটাটা মোল্ড থেকে বের করে সসে ডুবিয়ে নিন। উপরে স্পঞ্জ কেক লাগিয়ে পরিবেশন করুন।

সল্টেড পিস্তাশিয়ো ফাইনানশিয়ার

উপকরণ: বাটার ১০০ গ্রাম, মাচা টি পাউডার ২০ গ্রাম, আইসিং সুগার ১০০ গ্রাম, ময়দা ৩৫ গ্রাম, এগ হোয়াইট ৪টি, ম্যালডন সল্ট ১ গ্রাম (যদি না পাওয়া যায়, যে কোনও ভাল খনিজ লবণ ব্যবহার করতে পারেন বুঝেশুনে।

প্রণালী: এগ হোয়াইট, মাচা টি পাউডার দিয়ে ময়দা মেখে নিন। ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাটার গলিয়ে নিয়ে যখন সোনালি রং হবে, সেটা মিশ্রণে ঢেলে দিন। ফাইনানশিয়ারের মোল্ড বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সেই মোল্ডে মিশ্রণটি বসিয়ে তাতে ম্যালডন সল্ট ছিটিয়ে দিন। ১৫ থেকে ১৮ মিনিট মতো বেক করুন। ঠান্ডা হতে দিন, তারপর পরিবেশন করুন।

প্যানফর্তে

উপকরণ: কোকো পাউডার ৪০ গ্রাম, মিক্সড রোস্টেড নাটস ৩৩৫ গ্রাম, ক্যানডিড ফ্রুট ২০০ গ্রাম, দারচিনি ১৫ গ্রাম, আদাগুঁড়ো ১০ গ্রাম, গোলমরিচগুঁড়ো ৭ গ্রাম, লঙ্কাগুঁড়ো, ডার্ক চকোলেট ৯০ গ্রাম, ক্যাস্টর সুগার ২০০ গ্রাম, মধু ২১০ গ্রাম, ময়দা পরিমাণমতো।

প্রণালী: প্রথমেই ডার্ক চকোলেট গলিয়ে রাখুন। মধু এবং চিনির সঙ্গে বাকি উপকরণগুলো মিশিয়ে গরম করে নিন। এরপর তাতে গলিয়ে রাখা চকোলেট ঢালুন। ময়দাও মিশিয়ে নিন এতে। সবটা ভাল করে মেখে লেচি তৈরি করুন। ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ২০ থেকে ২৫ মিনিট রেখে বের করে নিন। একটু ঠান্ডা হলে টুকরো করে নিন ছুরি দিয়ে। তারপর পরিবেশন করুন।

ওয়াসাবি ক্রেম ব্রুলে

উপকরণ: ক্রেম ব্রুলে মিক্সের জন্য— ডেয়ারি ক্রিম ১০০ গ্রাম, ডিমের কুসুম ১টা, চিনি ২০০ গ্রাম, ওয়াসাবি পেস্ট ৪০ গ্রাম।

বিট রুট স্পঞ্জ কেকের জন্য—বিট রুট পিউরি পরিমাণমতো, বিট রুট পাউডার প্রয়োজন অনুযায়ী, এগ হোয়াইট ১টি, সুগার ৩০ গ্রাম, ময়দা ৮০ গ্রাম।

ক্রেম ব্রুলে: ক্রিম গরম করে ১০০ গ্রাম চিনি এবং ডিমের কুসুম ঢেলে ফেটিয়ে নিন। তারপর একটি পাত্রে



ওয়াসাবি ক্রেম ব্রুলে

আরও কিছু ক্রিম ঢেলে নিয়ে হালকা আঁচে গরম করুন কিছুক্ষণ। মিশ্রণটিতে এবার ওয়াসাবি ক্রিম মিশিয়ে নিন। আইস বাথে পুরো মিশ্রণটিকে ঠান্ডা করতে দিন। পছন্দমতো আকৃতির মোল্ডে ঢেলে নিয়ে ২০ থেকে ২৫ মিনিট ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেক করুন। হয়ে গেলে চিলারে দু'ঘণ্টা রেখে দিন। বার করে নিয়ে ক্যাস্টর সুগার ছড়িয়ে দিন উপরে। ধীরে ধীরে বার্ন টর্চ দিয়ে উপরের অংশটা গরম করতে থাকুন। তারপর বিট রুট স্পঞ্জ কেকের সঙ্গে গার্নিশ করে পরিবেশন করুন। তবে হ্যাঁ, পরিবেশন করতে যেন দেরি করবেন না! তাহলে ভিতরের নরম অংশটি গলে যেতে পারে।

বিট রুট স্পঞ্জ কেক: সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। একটি এসপুমা জারে মিশ্রণটি ঢেলে দু'টো নাইট্রোজেন চার্জার দিয়ে চার্জ করুন। এরপর একটি কাগজের কাপে সেটা ঢেলে মাইক্রোওয়েভে দু'মিনিট রেখে দিন। এটা যেহেতু গার্নিশিংয়ের জন্য, তাই ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। পরে প্রয়োজন মতো বের করে গার্নিশ করতে পারবেন।

ক্রোসতাতা

উপকরণ: লেচি তৈরির জন্য— ময়দা ২৫৬ গ্রাম, চিনি ৪৫ গ্রাম, নুন ২ গ্রাম, আনসল্টেড বাটার ২২৭ গ্রাম, ডিমের কুসুম ১টা, ঠান্ডা দুধ ৪৫ গ্রাম।

ফিলিংয়ের জন্য— গ্রিন অ্যাপল ৫০০ গ্রাম, ব্রাউন সুগার ৮০ গ্রাম, বাটার ২০ গ্রাম, দারচিনি গুঁড়ো ২ গ্রাম, কিশমিশ ২০ গ্রাম।

প্রণালী: ময়দায় চিনি, নুন দিন পরিমাণ মতো। আনসল্টেড বাটার কিউব করে দিন তার মধ্যে। ঠান্ডা দুধ এবং ডিমের কুসুম মিশিয়ে নিন। সবটা দিয়ে একটা লেচি তৈরি করে নিন। তৈরি হয়ে গেলে চিলারে চারঘণ্টা রেখে দিন। ওই সময়ের মধ্যে ব্রাউন সুগার এবং বাটার দিয়ে ক্যারামেল তৈরি করতে থাকুন। তাতে কুচোনো আপেল দিন। তারপর যোগ করুন কিশমিশ এবং দারচিনি গুঁড়ো। মিশ্রণটা ঠান্ডা হতে দিন। চারঘণ্টা হয়ে গেলে চিলার থেকে লেচি বের করুন। ২ মিলিমিটার মোটা হয় এমন করে তৈরি করুন লেচি। তারপর আপেলের ফিলিং দিয়ে মুড়ে দিন। মোটামুটি হয়ে গেলে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেক করুন। সোনালি রং হয়ে এলে গরম গরম বের করে পরিবেশন করুন। এসব রেসিপি ট্রাই করে দেখুন পুজোর সময়। চমকে দিন অতিথিদের। শেষ পাত হোক বা প্রথম, মিষ্টি হোক সবটা!



ক্রোসতাতা

ছবি: শুভদীপ ধর

লোকেশন সৌজন্য: জে ডব্লু কিচেন, জে ডব্লু ম্যারিয়ট





বো নেস-অন-উইন্ডারমেয়ার

যে মন থেকে সৃষ্টি হয়, তাকে প্রবল প্রশ্রয় দিতে পারে একমাত্র প্রকৃতি। এই প্রকৃতি একেবারেই তার আদিম নির্জনতা ও প্রশান্তি নিয়ে ছেয়ে আছে ইংল্যান্ডের লেক ডিস্ট্রিক্টে। কীভাবে 'লেক পোয়েট'রা খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের অনুপ্রেরণা, পৌঁছে অনুভব করলেন পায়েল সেনগুপ্ত।

প্রকৃতি, মন ও রোম্যান্টিকতা

নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থা, প্রকৃতির উপর আসক্তি, অদ্ভুত ধরনের, অতিলৌকিক ও গথিক জিনিসের প্রতি আকর্ষণ, অতীত নিয়ে আচ্ছন্নতা, একটা অদ্ভুত ধরনের ইতিবাচকতা, যা কখনও কখনও বাস্তবকেও অতিক্রম করে যেতে পারে, এরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগতের দিকে তাকানো, এবং কল্পনা ও নিজের অভিজ্ঞতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস— বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই ছ'টি উপাদানই নাকি ডিফাইন করে ইংরেজি সাহিত্যের রোম্যান্টিসিজমকে। অবশ্যই এটা কোনও সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ নয়। বরং একটু ঘুরিয়ে নাক দেখানো বলতে পারেন, একটু ঘুরপথে লেক ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে ঢোকা। উইলিয়াম ওয়র্ডসওয়ার্থ ও স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের লিরিক্যাল ব্যালাডস ১৭৯০ সাল থেকে সাহিত্যে যে রোম্যান্টিক ঝড় আনল, তার সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন দুনিয়ার সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। শিল্পবিপ্লব, বাষ্প ইঞ্জিন, গৃহবিপ্লব, রিলিজিয়ন ও র‍্যাশনালিজম ইত্যাদি তথাকথিত নাগরিক কঠিন বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। বরং প্রাচীন মানুষজনের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা, আবেগ, Muse-এর অনুপ্রেরণা, ইন্দ্রিয় স্পর্শাতীত এক ইউটোপিয়ান প্রেমকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল অতিলৌকিক জগৎ। এই জগৎকে মূর্তিমান করে তোলা সম্ভব প্রকৃতির সাহায্য পেলেই। I wanderd lonely as a cloud/That floats on high o'er vales and hills... ওয়র্ডসওয়ার্থ লিখলেন তাঁর 'ড্যাফোডিলস' কবিতায়। চোখের সামনে প্রকৃতির প্রতিমুহূর্তে বেঁচে ওঠার গল্প ওয়র্ডসওয়ার্থ কবিতায় আঁকতে পেরেছেন, কারণ গ্রাসমেয়ারের ডাভ কটেজে


গথিক চার্চ

করে দিতে পারে কবিত্বের রস। শুধু তাই নয়, যিনি এরকম পরমাসুন্দরী প্রকৃতির সাহচর্য পেয়ে কবি বা চিত্রশিল্পী হয়ে উঠবেন, তাঁর সৃষ্টিতে প্রকৃতিও ধরা দেবে আদিম ও অকৃত্রিম ফর্ম নিয়ে। কিন্তু যন্ত্র ও টেকনোলজির এই বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনও অকবিকে কবি হয়ে উঠতে গেলে প্রথমে পৌঁছতে হবে তার কাছাকাছি, বুঝে নিতে হবে তার মানচিত্র ও চরিত্র।

Beside the lakes, beneath the trees

পাহাড়ি উপত্যকা ও অরণ্য অর্থাৎ Fells সম্পৃক্ত লেক ডিস্ট্রিক্ট উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডের কামব্রিয়া কাউন্টির মধ্যেই পড়ে এবং মানচিত্র অনুযায়ী বেশ কয়েকটা Fells বা সবুজ পাহাড়ে তাকে ভাগ করে নেওয়া যায়। যেমন, Northern Fells: দক্ষিণ-পশ্চিমে কেসিক (Keswick), উত্তর-পূর্বে Caldbeck পর্যন্ত ব্যাস নিয়ে একটা বৃত্ত এঁকে ফেলা যায়। এখানকার দ্রষ্টব্য Bassenthwaite লেক, যা পুরো উত্তর-পশ্চিম অংশ জুড়ে বিস্তৃত। Western Fells-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় জায়গা, Buttermere ও Wasdale. এই অংশে অবস্থিত Wastwater ইংল্যান্ডের গভীরতম লেক। Central fell, eastern fell, fareastern fell, southern fell সব নিয়েই বিস্তৃত লেক ডিস্ট্রিক্টের সৌন্দর্য। সাদার্ন ফেল-এর Scafell Pike



শুধু তাই নয়, যিনি এরকম পরমাসুন্দরী প্রকৃতির সাহচর্য পেয়ে কবি বা চিত্রশিল্পী হয়ে উঠবেন, তাঁর সৃষ্টিতে প্রকৃতিও ধরা দেবে তার আদিম ও অকৃত্রিম ফর্ম নিয়ে।

যেখানে তাঁর শৈশব ও রাইডাল মাউন্টে যেখানে তাঁর জীবনের সর্বাধিক সময় কেটেছে, সেখানে একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত চরিত্র প্রকৃতি নিজে। ভৌগোলিক সীমানা দিয়ে যে অঞ্চলকে 'লেক ডিস্ট্রিক্ট', 'লেক ল্যান্ড' বা 'দ্য লেক্স' নামে অভিহিত করা হয়েছে, তার অফিশিয়াল বাউন্ডারির কাছাকাছি পৌঁছনোর আগে থেকেই টের পাওয়া যায় একটা নৈসর্গিক বিপ্লবের আভাস। Nature vs nurture-এর যে দ্বন্দ্ব সাহিত্য থেকে শিল্পকলা সর্বত্র তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে বসে আছে, সে এখানে এসে একেবারে বাকরহিত হয়ে যায়। ক্লাসিক্যাল সাহিত্য বা শিল্পে প্রকৃতি 'trimmed', 'tamed'। কিন্তু রোম্যান্টিকরা তুলে ধরেছিলেন প্রকৃতিকে আপসহীন ওরিজিনালিটিতে, 'wild', 'untamed', 'raw'. এই রক্তমাংসের প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে হলে তার গভীরে শ্বাস নিতে হয়। লেক ডিস্ট্রিক্টে পা দিয়ে উপলব্ধি করলাম প্রকৃতির অকৃপণ সংসর্গ মুহূর্তে বদলে দিতে পারে একটি জীবন। ইংরেজি সাহিত্যে লেক ডিস্ট্রিক্টের অসংখ্য রেফারেন্স মোটেই বিস্ময়কর কোনও ব্যাপার নয়। কারণ এখানকার ঘন নীল জলের হ্রদ, সবুজ উপত্যকা আর নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি যে কোনও ধরনের মানুষকেই করে তুলতে পারে প্রকৃতি আসক্ত, ইনজেক্ট


ক্রুজ় সফরের জন্য জমজমাট ফেরিঘাট



ইংল্যান্ডের সবচেয়ে উঁচু ভূমি। লেক ডিস্ট্রিক্ট নাম যখন, সেখানে ওয়াটার বডি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। Mere, tarns এবং waters ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন উপত্যকায় বিভক্ত হয়ে। যেমন, উইন্ডার মেয়ার, বাক্রেনওয়েট লেক, বাটার মেয়ার, গ্রাসমেয়ার, রাইডাল ওয়াটার, থার্লমেয়ার, আলসওয়াটার এবং এরকমই আরও কয়েকটি। লেক ডিস্ট্রিক্টের ইতিহাস কিন্তু প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন বছরের পুরনো। Borrowdale Volcanics-এর খুব শক্ত লাভা আর ছাই থেকেই Scafell pikes, Langdale pikes-এর মতো জায়গাগুলো তৈরি হয়েছে। সবুজ পাহাড় বা fells-এর উপরে থাকা ছোট লেকগুলোকে tarns বলা হয়, যেখানে glacier বা হিমবাহ জমে জমে তৈরি হয়েছে lakes. অনেকটা অংশে বিস্তৃত ও গভীর লেককে বলা হয় mere. লেক ডিস্ট্রিক্ট ন্যাশনাল পার্ক কিন্তু, উইন্ডারমেয়ার জুড়ে বিস্তৃত। লেক ডিস্ট্রিক্টের সবচেয়ে বড় লেক উইন্ডারমেয়ার। Bowness on Winder mere থেকেই অনেক টুরিস্টের মতো আমাদেরও যাত্রা শুরু হয়েছিল।

...the waves beside them danced

লেক ডিস্ট্রিক্টের ব্যস্ততম এই লেকটিতে ক্রুজ করলে আশপাশের প্রকৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি বুঝে নেওয়া যায়। ক্রুজের প্রতিটি স্টপই ইংল্যান্ড নিসর্গের এক অদ্ভুত সাযুজ্য বহন করে। ঘন সবুজ আর ছোট ছোট কাঠের বাড়িতেই বাসস্থান এবং রেস্তরাঁ। উইন্ডারমেয়ার থেকে গ্রাসমেয়ার যাওয়ার পথেই পড়ে অ্যাম্বলসাইড। লেকের ধারে হোটেল ও



রেস্তরাঁয় গমগম করা এই জায়গাটি একটি অন্যতম জংশন। উইন্ডার মেয়ার থেকে ড্রাইভ করে বা বাসে সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় গ্রাস মেয়ার। আমরা অবশ্য হুডখোলা বাসের ছাদে বসে রাস্তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গিয়েছিলাম নিসর্গসাহিত্যের জনক ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাড়ি Dove Cottage-এ। এখন এটি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিউজিয়াম। বোন ডরোথিকে নিয়ে এই বাড়িতেই থাকতেন কবি। তারপর স্ত্রী মেরিকে নিয়ে সংসার শুরু করেন এখানেই। তিন ছেলেমেয়ের পর আরেকটু বড়সড় বাড়ির জন্য কাছেই রাইডাল মাউন্টে সকলকে নিয়ে থাকতে



গ্রাসমেয়ারের পাহাড়ি উপত্যকা

শুরু করেন তিনি। টমাস ডি কুইন্সিও এরপর এই কটেজে ছিলেন বছরদুয়েক। শান্ত, নির্জনতা ও সবুজ উপত্যকা ছাড়াও গ্রাস মেয়ারের আরও একটি আকর্ষণ হল জিঞ্জার বাটারমিষ্ট। এখানকার শান্ত রোডসাইড কাফেতে বসে জিঞ্জার বাটারের কোনও পদ টেস্ট করা উচিত অবশ্যই, সেটা যতই কবিত্ব-বিরোধী হোক না কেন! এখান থেকে খুব কাছেই রাইডাল হাউস, আর তিরতির করে বয়ে যাওয়া রাইডাল ওয়াটার। খাড়াই পথ বেয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের দ্বিতীয় বাড়ি পৌঁছে মন আরও শান্ত হয়ে যায়। নীচের কোলাহল থেকে সুদূরবর্জিত এই বাড়িটি প্রকৃতি নামক মিউজের আরও ঘনিষ্ঠ। কবির নিজের হাতে তৈরি করা বাগানটি মেনটেন করার জন্য সকাল-সন্ধে পরিশ্রম করেন কর্মীরা। পর্যটকদের ভিড় এখানে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু বাসভবনটি মিউজিয়াম হলেও সজ্জার দিক থেকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত ঘুরে এলে মনে হয় শুধু ছবি নয়, কবি যেন স্বয়ং উপস্থিত সেখানে। কোনও একটা ঘর থেকে শুনতে পাব তাঁর কণ্ঠস্বর। রাইডাল ওয়াটার ছোট লেক। তাকে ঘিরেও আছে ছোট ছোট পাহাড়। গ্রাস মেয়ার থেকে কিরকস্টোন pass-এ ট্রেক করা যায়, যেখান থেকে Thirlmere reservoir দেখা যায় সুন্দরভাবে। ড্রাইভ করে গেলে ক্লদ মনের পেন্টিংয়ের মতো সুন্দর আলোছায়া ঘেরা এই রাস্তা ধরে আমরা চলে যেতে পারি অন্যদিকেও। আলসওয়াটার অর্থাৎ লেক ডিস্ট্রিক্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম লেকে পৌঁছে যাওয়া যায় হাই মাউন্টেনস রোড ধরে। পথের দুধারে সবুজের সঙ্গে বাদামি পাহাড় এক অদ্ভুত কালার কনট্রাস্ট তৈরি করে। আলসওয়াটারের পাহাড়ি উপত্যকা ও জনবসতিতে ওল্ড ব্রিটিশ রুরাল লাইফের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে এই জায়গায়। লেকের চারিদিকে ঘেরা পাহাড় আরও ঝুঁকে পড়েছে জলের কাছাকাছি। পর্যটক হিসেবে অবসরযাপনের অনেকগুলি অবকাশ এখানে। কাসলরিগ স্টোন সার্কলে পা ছড়িয়ে বসে লেক ও সবুজ পাহাড় বা fell-এর প্যানোরামিক ভিউ দেখা, পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখা উঁচুনিচু সবুজ গালিচা, আবিষ্কার করা প্রান্তিক কোনও ছোট নির্জন গথিক স্টাইলের গির্জা, আলসওয়াটার পুলি ব্রিজ থেকে গ্লেনরাইডিং পিয়ের পর্যন্ত ক্রুজে গোটা লেক উপলব্ধি করা যায়। যে



লেকে বোটিং বিনোদন



অ্যাম্বলসাইডের জমজমাট কাফে



কেসিক টাউন

কোনও পয়েন্টে নেমে পড়ে ছোট ছোট গ্রাম ও ছোট ছোট কাফে আবিষ্কার করা যায় অনায়াসেই। Wray castle-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিখ্যাত কার্টুনিস্ট, ইলাস্ট্রেটর ও সায়েন্টিস্ট Beatrix Potter-এর নাম, যাঁর সৃষ্টি, Peter Rabbit সাড়া জাগিয়েছিল একসময়। Hawkshead-এ বিয়াট্রিক্স পটার গ্যালারিতে রয়েছে পাণ্ডুলিপি ও ইলাসট্রেশনের ওরিজিনাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট। অ্যাম্বলসাইডের আরমিট লাইব্রেরিতেও মিউজ়িয়ামে সায়েন্টিফিক রিসার্চার ও ইলাস্ট্রেটর বিয়াট্রিক্সের জীবনকে আবিষ্কার করা যাবে। বিয়াট্রিক্সের মতো রয়েছেন ব্রন্টি পরিবারও। শার্লট, এমিলি, অ্যান, ব্র্যানওয়েল বাবা প্যাট্রিক ব্রন্টির সঙ্গে থাকতেন Hawroth-এ। রুদ্ধশ্বাস সৌন্দর্যের এই ল্যান্ডস্কেপই রয়েছে বিখ্যাত উপন্যাস Wuthering Heights-এ। এই বন্য নাটকীয় প্রকৃতি কল্পনার ক্ষেত্র আঁকতে থাকে মাথার মধ্যে, যেখানে রয়েছে সাফল্য ও ব্যর্থতা, প্রেম-ভালবাসার উত্থানপতন আর বিশ্বের বিখ্যাত একটি সাহিত্যিক পরিবারের প্যাশনেট ও ট্র্যাজিক কাহিনি। উইন্ডার মেয়ার থেকে কেসিক আবার এক অপূর্ব যাত্রা। এখানকার ডারওয়েন্টওয়াটার লেক ডিস্ট্রিক্ট ন্যাশনাল পার্কের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেসিক সেন্টার থেকে ১০ মিনিট মতো হাঁটলেই ফেরিঘাট। কিন্তু ফেরিঘাট যাওয়ার আগে ছোট্ট এই শহরটি ঘুরে দেখে ফেলতে হবে। ছোট্ট গথিক স্ট্রাকচারের বিভিন্ন বাড়ি, চার্চ, কাফে, মার্কেটপ্লেস সবটা নিয়েই যেন এক বৃত্তাকার আকর্ষণ তৈরি হয়। মনে হয় বারবার ঘুরে বেড়াই। ছোট্ট পেনসিল মিউজ়িয়ামটি ধরে রেখেছে গ্রাফাইটের জন্ম ও তার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ইতিহাস। ক্যাটবেলস থেকে ফ্রিয়ার্স ক্রেগ পর্যন্ত গেলেই লেকসাইড ও বিস্তৃত বরোডেল ভ্যালি। ক্রুজ় করলে লেক ও তার মাঝের বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে আসা যায়। আবার উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ট্রেল করেও অনুভব করা যায় প্রকৃতিকে। কিচ্ছুটি না করে ঘাসের উপর স্রেফ বই পড়ে বা চারপাশে দৃষ্টি ডুবিয়েও আটকে দেওয়া যায় সময়ের তাড়াহুড়ো। লেক ডিস্ট্রিক্ট ন্যাশনাল পার্ক বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদেরও একটি নির্বিঘ্ন বাসস্থান, বিশেষ করে লাল কাঠবেড়ালি ও কিছু মাংসাশী গাছপালার। ইংল্যান্ডের একমাত্র সোনালি ঈগলের জুটি ছিল লেক ডিস্ট্রিক্টেই। ২০০৪-এর পর থেকে স্ত্রী ঈগলকে দেখা না গেলেও এখনও রয়েছে পুরুষ ঈগল, এবং ভূতাত্ত্বিকদের মতে সে ইংল্যান্ডের একমাত্র সোনালি ঈগল এখন। ১৮১০ সালে 'গাইড টু দ্য লেকস' বলে একটি বই লেখেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। লেক ডিস্ট্রিক্টকে অসম্ভব জনপ্রিয় করে তোলে এই বই। মাউন্টেন বাইকার্স ও রিভার র‍্যাম্বলারদের ফেভারিট ডেস্টিনেশন এটি। উইকএন্ড ড্রাইভে সকলে সরঞ্জাম নিয়েই পৌঁছে যান দ্য লেকস-এ। ব্রিটিশ সামারে লিটারেচার, ফিল্ম ও জ্যাজ় ফেস্টিভ্যালে গমগম করে এই জনপ্রিয় জায়গা। কেন্ডাল ও কেসিক মাউন্টেন ফেস্টিভ্যাল রীতিমতো বিখ্যাত।

ছবি: লেখক

কীভাবে যাবেন

বার্মিংহ্যাম থেকে ট্রেনে করে অক্সেনহোম, সেখান থেকে উইন্ডারমেয়ার দু'বার ট্রেন বদল করতে হয়। ইউকে-র যে কোনও জায়গা থেকে রেলওয়েতে কানেক্টেড লেক ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন পয়েন্ট।

কোথায় থাকবেন

বিলাসবহুল থেকে পকেট ফ্রেন্ডলি, পছন্দমতো হোটেলে বুকিং করে নিতে পারেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। রয়েছে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর হোম স্টে ও কাফে।



নৃত্যের দর্শনযাত্রায় অক্লান্ত পথিক

সদা হাস্যময় মুখ, জীবনে যা পেয়েছেন তাই যেন বেশি তাঁর কাছে। কলকাতায় ছয়ের বেশি দশক ধরে নৃত্যশিল্পের উত্তরাধিকার তৈরি করে চলেছেন থাঙ্কমণি কুট্টি। দীর্ঘ কর্মজীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ উঠে এল কথোপকথনে। শুনলেন পায়েল সেনগুপ্ত।

এত ভাল সময় আর পাওয়া যাবে না

নিজের জীবনকে ফিরে দেখতে গেলে প্রথমেই আসে ছেলেবেলার কথা, নাচের প্রশিক্ষণ। সেই নাচ, যা ক্রমশ তাঁর জীবনের সমার্থক হয়ে উঠবে... "বারো বছর বয়সে, ১৯৫২ সালে আমার নাচের শুরু। কেরালা কলামণ্ডলমের যিনি প্রতিষ্ঠাতা সেই বালাতোল নারায়ণ মেননের ছোট মেয়ে এসেছিলেন বিয়ের পর। সেই সময় ওঁর নাচ দেখে আমি এতটাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম বলার নয়। নাচের প্রতি আকর্ষণ তখন থেকেই অনুভব করতে শুরু করি। তাঁর ছোট মেয়ের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের জানাশোনা ছিল। উনি এসে বলেছিলেন, 'নাচ শিখতে চাও? তা হলে কিন্তু খুবই ডেডিকেটেড হতে হবে। আমার বাবার স্কুল রয়েছে, কেরালা কলামণ্ডলম। তুমি ওখানে আসতে পারো, অডিশনের জন্য।' আমি তো খুবই এক্সাইটেড ছিলাম। অডিশন মানেই কিন্তু সিলেকশন ছিল না। ও বাবাকে বলে রেখেছিল, এই মেয়েটিকে কিন্তু নিতেই হবে। কিন্তু গুরুজি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, নাচের জন্য ওর ফিচার্স তেমন শার্প নয়, ওকে আমার পছন্দ হয়নি। উনি মুখে বলেছিলেন বটে, কিন্তু ঘটনাটা ঘটল একটু অন্যরকম। অডিশনে আমি পৌঁছতে পারিনি, জ্বরের কারণে। অডিশনে উনি অন্যান্যদের সিলেক্ট করলেন এবং বললেন, আর-এক জন রয়েছে আমার ঘরে। এভাবেই আমার প্রাইমারি সিলেকশন হল। প্রথমে ২৫ জন, সেখান থেকে আবার চার জন। একটা স্পেশ্যাল পিস দেওয়া হত, ফাইনালে সেটাই করে দেখাতে হত। যদিও অ্যাপিয়ারেন্সের

দিক থেকে আমাকে ওঁর তেমন পছন্দ ছিল না, কিন্তু আমার ফুটওয়ার্ক দেখে ওঁর মনে হয়েছিল আমি ট্যালেন্টেড। আমারও গুরুকুল শুরু হল। ভোর পাঁচটা থেকে গানের রেওয়াজ, তারপর ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, ব্রেকফাস্ট, ক্লাস করে লাঞ্চ, তারপর প্র্যাকটিক্যাল। আমরা চারজন স্টুডেন্ট, আর টিচার ছিলেন দু'জন। ফলে ঘুম থেকে ওঠার পর আর আমরা টিচারদের চোখের আড়াল হওয়ার সুযোগ পেতাম না। আমরাও চাইতাম, ওঁরা যেন আমাদের নিয়ে খুশি হন। কারণ কোনও কারণে যদি গুরুকুল ছাড়তে হত, তা হলে পুরো খরচটাই দিতে হত বাবা-মাকে। এমনটাই নিয়ম ছিল। তবে নিয়ম শুধু নয়, আমাদের কাছে টিচার মানেই ছিলেন ভগবানের মতো। তাঁকে অমান্য করা বা অখুশি করার কথা আমরা ভাবতেই পারতাম না। এইভাবেই আমাদের চার বছরের প্রশিক্ষণ চলল। নিয়ম যতই কড়া হোক, দিনগুলো







"আমার প্যাশন নাচ শেখানো, যেন সবটাই দিয়ে যেতে পারি। আমি নিজের হাতে সব বাড়ির কাজ করি, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বোঝে, কোনও কাজটাই ছোট নয়। পড়াশোনা হোক বা নাচ, যে ফিলোসফি আমি পেয়েছি জীবন থেকে, ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে যেতে পারলে ধন্য মনে করব।"





ছিল খুব সুন্দর, জীবনের সেরা সময়। এত ভাল সময় আর কখনও ফিরে আসবে না। উই এনজয়ড লাইক এনিথিং। আমাদের হস্টেল ছিল খুবই বিলাসবহুল জায়গায়। ওই কম্পাউন্ডে নেহরু এলেও থাকতেন। কেরালা কলামণ্ডলমের প্রতিষ্ঠাতা বালাতোল নারায়ণ মেনন ছিলেন ওই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সিলভার জুবিলি অনুষ্ঠানে কে আসেননি! নেহরু এসেছিলেন, পারফর্ম করেছিলেন কুমারী কমলা, বালা সরস্বতীর মতো শিল্পীরা। তখন তো কুমারী কমলার নাচ দেখে এত ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলাম, বলার নয়। মনে হয়েছিল নাচ করলেই আমার জন্য ভাল হবে।

কলকাতা আমার কাছে মঙ্গলময়

জীবনের সঙ্গে কলকাতা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাবে, একথা ওই সময় ভাবাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেরকমটাই হয়ে গেল। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কেরালা থেকে কলকাতার জার্নি শুরু হল...

"১৯৫৭ সালে আমাকে প্রথম দেখতে আসেন গোবিন্দন কুট্টি। আসলে আমি যেখানে থাকতাম, নাচ জানা মেয়ে বলতে আমি একাই সেখানে ছিলাম, 'মঞ্জিরী'। ফলে ফ্যাশন একটু বেশিই ছিল। তা ছাড়া এদিক-ওদিক প্রোগ্রাম থাকার জন্য আমার লাইফস্টাইলও একটু অন্যরকম ছিল। ফলে আমাকে নিয়ে বাবা চিন্তিত ছিলেন, ভাবতেন বিয়ে হয়ে গেলেই ভাল হয়। এইরকম ভাবতে ভাবতেই গোবিন্দন কুট্টির সঙ্গে যোগাযোগ। উনি ওখানকারই টিচার ছিলেন। কেরালা কলামণ্ডলম থেকেই উনি কথাকলি নিয়ে পাশ করেছিলেন। ওখানকার খুব বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন রামন কুট্টিনায়ার, সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির মেম্বার, মিস্টার কুট্টি ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী। রামন কুট্টিনায়ারের সঙ্গেই উনি আমাদের



বাড়িতে প্রিয় নটরাজ মূর্তির সঙ্গে

বাড়িতে প্রথম আসেন। সেসময় আমি বলে দিয়েছিলাম যে আমি এখন বিয়ে করব না। বাবা বললেন, আপনি বরং বছরখানেক পরে আসুন। তখন যদি ও রাজি হয়, বিয়ে হবে। বাবা অবশ্য আমাকে জোর করেননি। আমি নিজেই ভাবলাম, বিয়ে হয়ে গেলে আমিও খানিকটা নিশ্চিন্ত হব। লোকজনের মাথাব্যথা নিয়ে না ভেবে মন দিয়ে নাচ করতে পারব। তা ছাড়া মিস্টার কুট্টি তখন অলরেডি কলকাতায় সেটলড। কলকাতার বিশেষ কোনও রকম যোগসূত্র ছিল কেরলের সঙ্গে। আমি জানতাম বিয়ে হলে আমাকে ওখানে চলে যেতে হবে এবং কলকাতা ওয়াজ় সামথিং ফর মি। ১৯৫৪ সালে উনি কলকাতায় আসেন, থাকতে শুরু করেন ওখানকার মালয়ালি সমাজে। মৃণালিনী সারাভাইয়ের ট্রুপে ছিলেন তখন, সেই সূত্রেই কলকাতায় আসা। মালয়ালি সমাজের মেম্বার রাজুগোপালের কুট্টিকে খুব পছন্দ ছিল। উনি তাঁকে বলেছিলেন এখানে মালয়ালি সমাজ ও সংস্কৃতির বিশেষ কোনও লোকজন নেই। আপনি এখানে থাকুন না, সেটা ১৯৫২ সাল নাগাদ। কিন্তু মিস্টার কুট্টি তখন চলে আসেন। এরপর কলকাতা থেকে ওঁরা অফিশিয়াল চিঠি পাঠান। মিস্টার কুট্টি সেসময় এখানে এসে থাকতে শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে আমাদের বিয়ে হয়। মিস্টার কুট্টি তখন অলরেডি সেট্‌লড। ওঁর বন্ধুরা তখন বলে যে এবার বিয়ে করো, আর বিয়ে করলে নাচ জানা মেয়েকেই কোরো। আমাদের বিয়ে হয় ১৫ মে, আমরা কলকাতায় আসি ২ জুন। হাওড়া স্টেশনে মিস্টার কুট্টির সব ছাত্রছাত্রীরা এসেছিলেন প্রচুর ফুল, বোকে ইত্যাদি নিয়ে। মালয়ালিই বেশি ছিলেন, অল্প সংখ্যক বাঙালিও ছিলেন। এত উষ্ণ অভ্যর্থনা আমি এক্সপেক্টই করিনি। তখনও আমার প্রায় স্টুডেন্ট লাইফই চলছে, ১৭ বছর বয়স। বাবার কাছে বকুনিই খেতাম। সেখান থেকে এইরকম ওয়র্ম ওয়েলকাম আমার কাছে বিরাট ব্যাপার ছিল। তবে কলকাতায় আমার সব কিছু ভাল হয়েছে। এখানে আসার পরেরদিন থেকেই আমি স্টুডেন্ট পেয়ে যাই, মিস্টার কুট্টির ছাত্রছাত্রীরাও অনেকে আমার কাছে শিখতে শুরু করেন। মিস্টার কুট্টি তখন এখানকার হিরো। নিয়মিত পারফর্ম করছেন টেগোরের শ্যামা, শাপমোচন। গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তখন ওঁর কো-পারফর্মার। সম্প্রতি উনি মারা গিয়েছেন। আমি এদিক থেকে নিজেকে খুবই ভাগ্যবতী মনে করি। কারণ বালাতোল ছিলেন কেরালার কবি, টেগোরেরই কনটেম্পোরারি, সেখানে আমি বড় হয়েছি, আর আমার কাজ শুরু করেছি টেগোরের জায়গায় এসে। সেইসময় এখানে মণিশঙ্কর বলে একজন খুব বিখ্যাত গুরু ছিলেন। তিনি আমাকে আর মিস্টার কুট্টিকে একসঙ্গে দেখলেই প্রণাম করতেন। আমি এত অপ্রস্তুত হয়ে পড়তাম, কী বলব! কতবার বলেছি ওঁকে, উনি বলতেন, আমি তোমাদের দু'জনকে দেখি না। আমি দেখি হর-পার্বতীকে। আমি ও মিস্টার কুট্টি তখন প্রচুর প্রোগ্রাম করেছি। ১৯৫৯, ১৯৬৩ আর ১৯৬৬ সালে আমার তিন ছেলে হয়েছে। আমিও তারপর অনেকটাই ফ্রি হয়ে গিয়েছি। শেখানোর পাশাপাশি পারফর্মও করেছি। ওই কথাটা তখনও আমার মাথায় ছিল যে, আমি দেখতে ভাল নই, কিন্তু আমি ট্যালেন্টেড। স্টেজ প্রেজেন্টেশনের সময়ও আমি সেকথা মাথায় রেখে প্রেজেন্ট করেছি নিজেকে। কলকাতা থেকে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি কখনও, কারণ কলকাতা আমার কাছে সবসময়ই মঙ্গলময়।"

স্টুডেন্টস আর সামথিং এলস টু মি

কোথাও একটা জেনারেশন গ্যাপের আক্ষেপ রয়েছে তাঁর গলায়। নৃত্যকলার সঙ্গে ভারতীয় দর্শন বা পুরাণ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অথচ এখন যারা শিখতে আসেন, তাদের অনেকেই এই সব বিষয়ে জানে না। ছাত্রছাত্রীদের তিনিই বোঝান, ডান্স আসলে একটা দর্শন। "আমি মনে করি, ডান্স একটা স্রোত, এই স্রোত-এর মধ্যে যেতে যেতে আমার এতগুলো বছর কেটে গেল। প্রত্যেকদিনই আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা, যা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমার ছেলেদের আমি বলি যে, তোরা অনেক পড়েছিস, অনেক জায়গা দেখেছিস ম্যাপে। কিন্তু আমি এইসব জায়গায় নিজে গিয়েছি, এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনও কিছুরই তুলনা



স্বামী গোবিন্দন কুট্টির সঙ্গে

হয় না। আমি ছাত্রীদের একটা দর্শন বা ফিলোসফি বোঝানোর চেষ্টা করি। প্রকৃতিই আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। প্রকৃতির শেডগুলোই আমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। যখনই আমি সময় পাই, আমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বসে বোঝানোর চেষ্টা করি। খুব ছোটরা তো এসব বুঝবে না, কিন্তু নাচের ব্যাপারে যারা সিরিয়াস ও যাদের ভবিষ্যতেও নাচের সঙ্গে জুড়ে থাকার ইচ্ছে রয়েছে, আমারই স্কুলে যারা এখন শেখাচ্ছে, তাদের সঙ্গে এগুলো আলোচনা হয়। আমার প্যাশন ক্রমশ পারফর্ম্যান্স থেকে টিচিংয়ে শিফট করে গিয়েছে। কারণ ডান্সার হতে গেলে অনেক মেনটেন করতে হয় নিজেকে। স্টেজ প্রেজেন্টেশনের একটা ব্যাপার তো রয়েইছে। কিন্তু টিচার হলে সেদিক থেকে অনেকটা ফ্রি থাকা যায়। কিন্তু টিচারদেরও যে সেটা দরকার নেই, একথা আমি বলব না। কারণ তাঁদেরও ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। আন্টির মতো আর কেউ নয়, এসব তো শুনতে ভাল লাগে! শেখানোর ব্যাপারে আমি কোনও কম্প্রোমাইজ় করিনি কোনওদিন। এখনও নয়। এক ছাত্রীর বাবা এজন্য আমাকে থ্রেটও দিয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতে চাইতেন, আমার বেস্ট স্টুডেন্ট কে! আমি কোনওদিনও বলিনি। এখানে আসার পর থেকেই একজন একজন করে আমার ছাত্রছাত্রী বেড়েছে। এখন শুধু স্কুলেই আমার ১৫০০-র বেশি ছাত্রছাত্রী। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এতজনকে আমি সময় দিই কী করে। আমি বলি, একসঙ্গে তো এত ছাত্রছাত্রী হয়নি



আমার। যে যেমন এসেছে, তেমন করেই আমি তাদের সময় দিয়েছি, ফলে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। ছাত্রীরা আমার কাছে একেবারে অন্য কিছু, সামথিং এলস টু মি। আমি আমার ছেলে, বউ কারও প্রতি নির্ভরশীল নই। কিন্তু ছাত্রীদের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তারা আমার মনের মতো করে তৈরি হচ্ছে। মালবিকা (সেন) খুব ব্যস্ত এখন। ইলিনা, তানিয়া, দেবার্ঘ্য, সৌমেন... কতজনের নাম বলব! ছাত্রছাত্রীরাই তো আমাকে ঘিরে রেখেছে। গুরু মানে শুধু তো পায়ের উপর পা তুলে বসে থা সুখ-দুঃখ সবকিছু ভাগ করে নেওয়া যেমন আমায় ঘিরে থাকে, আমিও ওদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে। এ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছাত্রীদের থাকতে চাই।"

ঈশ্বর আমায় প্রয়োজনের বেশি দি

কথায় কথায় তিনি জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্নিগ্ধ হাসি মুখে কেবলই নাচ ও ছাত্রীদেরই কথ কিন্তু তাও বলে ফেললেন, "মাঝে মিস্টার কুট্টিকে খুব মিস করি। যে প্রয়োজনে সবসময় ওঁকে কনসাল্ট করতাম। উনি সারাজীবন আমার প থেকেছেন, কখনও কোনওকিছুতে দেননি। বিয়ের পর অনেকদিন উনি আমাকে ফরেন টুরে যেতে দেননি। ওঁর অনেক টুর করা হয়ে গিয়েছিল। আমি একদিন বলেই ফেললাম, এব আমি যাবই। তারপর আর বাধা দে একসঙ্গে জাপান, ইউকে টানা অনে টুর করেছি। আগে মনে হত, এটা পেলাম না, ওটা কেন হল না, এখন আমার কোনও আক্ষেপ নেই। মনে যা পেয়েছি, সবটাই অনেক বেশি। আমাকে দুহাতে পূর্ণ করেছেন।

ছবি: শুভদীপ ধর ও পরিবার